Contents

আহলেহাদীছ আন্দোলন

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

Type your text

দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ্ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশক : **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**
কাজলা, রাজশাহী, বাংলাদেশ
হা,ফা,বা, প্রকাশনা-১

প্রথম প্রকাশ : রামাযান ১৪১৬ হিঃ
মাঘ ১৪০২ বাং
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ খৃঃ

দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১১ খৃঃ

কম্পোজ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ :

নির্ধারিত মূল্য : ২০০ (দুইশত) টাকা মাত্র।

AHLE HADEES ANDOLON : UTPATTI O KRAMA BIKASH; DAKKHIN ASIAR PREKKHIT SHAHA (Ahlehadeeth Movement: It's origin and development; with special reference to the south Asian region). Ph.D. thesis of Rajshahi University, Bangladesh in 1992. Written by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Published by **Hadees Foundation Bangladesh**. Kajla, Rajshahi. Ph. & Fax 0721-861365. Price: US Doller: 10$.

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

كلمة الناشـــر

আহলেহাদীছ কোন মতবাদের নাম নয়। এটি একটি পথের নাম। যে পথ আল্লাহ্‌র সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র পথ। সেই পবিত্র পথে আহবান জানায় যে আন্দোলন, তাকেই বলা হয় আহলেহাদীছ আন্দোলন। এ আন্দোলন তাই ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির আন্দোলন।

আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরে কৃত ডক্টরেট থিসিসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে পেরে আমরা সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌র শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করছি। আল-হামদুলিল্লাহ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই গুরুত্বপূর্ণ থিসিসটির গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের খ্যাতিমান প্রফেসর জনাব ডঃ এ, কে, এম, ইয়াকুব আলী এবং পরীক্ষক ছিলেন তিনি সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ডঃ এ, বি, এম, হাবীবুর রহমান চৌধুরী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান জনাব ডঃ মুহাম্মাদ ওসমান গণী। ১ম ও ২য় বর্ষে গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির সদস্য ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রবীণ অধ্যাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা-র প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান। তাঁদের সকলের ঐকান্তিকতা ও সর্বসম্মত রায়ে অত্র থিসিসটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদ ও সিন্ডিকেট কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।

মতবাদবিক্ষুব্ধ বিশ্বের জ্ঞানীসমাজের নিকটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বহু প্রাচীন দাওয়াতকে নতুন আঙ্গিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ইতিহাসের গতি পরিক্রমায় বাস্তব বাণীচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করে মাননীয় গবেষক এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। গভীর তত্ত্ব, অমূল্য তথ্য, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, গতিময় লেখনী, অনুপম শব্দশৈলী, ভাবের দ্যোতনা, বক্তব্যের ঋজুতা, কুরআন-হাদীছ-ফিক্‌হ-ইতিহাস-সাহিত্য প্রভৃতির অনন্য সমাহারে অত্র গবেষণা সন্দর্ভটি বাস্তবিকই এক অতুলনীয় সৃষ্টি।

ইসলামের স্বচ্ছ আকাশে বিভিন্নরূপী স্বার্থদ্বন্দ্ব ও গোঁড়ামী সঞ্জাত রায় ও অন্ধ অনুসরণের যে গাঢ় মেঘ যুগে যুগে ঘনীভূত হয়েছে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ-এর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দানকারী আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগে যুগে তার সংস্কার সাধনে এগিয়ে এসেছে। বর্তমান পৃথিবীতে পুঞ্জীভূত ধর্মীয় ও বৈষয়িক সমস্যাবলী বিদূরণে আহলেহাদীছ আন্দোলন নির্ভেজাল ইসলামের দিকে মানব সমাজকে উদারভাবে আহবান জানায়। যা যাবতীয় তাকলীদ, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অপনোদন কামনা করে এবং মুক্তবুদ্ধি ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র আলোকে মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার উদাত্ত আহবান জানায়। বর্তমান গতানুগতিক পৃথিবীতে আহলেহাদীছ আন্দোলন ও তার উপরে কৃত অত্র গবেষণা সন্দর্ভটি পূর্ব গগণে রক্তিম সূর্যের উদয়ের ন্যায় সকলের মধ্যে আশার আলো জাগিয়ে তুলবে- আমরা সেই কামনা করি।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে রচিত হ'লেও গভীর তত্ত্ব সমৃদ্ধ অত্র গবেষণা গ্রন্থের প্রথমার্ধের আলোচনায় বিশ্বের সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মৌলিক নীতিমালা বিধৃত হয়েছে। ফলে শুধু দক্ষিণ এশিয়ার পাঠকদের জন্য নয়, সারা বিশ্বের আগ্রহী জ্ঞানী সমাজের জন্য থিসিসটি এক অফুরন্ত জ্ঞানের স্বর্ণদুয়ার হিসাবে গণ্য হবে বলে আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করি।

যে সকল বরেণ্য মনীষী থিসিসটি প্রকাশকালে মূল্যবান বাণী প্রদান করে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, আমরা তাঁদেরকে গভীর শ্রদ্ধা ও শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মাননীয় সিনিয়র নায়েবে আমীর, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন জনাব শায়খ আবদুস সামাদ সালাফী (সউদী মাবঊছ)-কে যিনি আরবীতে মূল্যবান 'ভূমিকা' লিখে দিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আন্তরিক দো'আ করছি শ্রদ্ধেয় লেখকের স্নেহাস্পদ দুই পুত্র আহমাদ আবদুল্লাহ ছাক্বিব (১১) ও আহমাদ আবদুল্লাহ নাজীব (৯)-এর জন্য, যারা থিসিসের সমস্ত আরবী, ফার্সী ও উর্দূ-র অধিকাংশ নিজেরা 'হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটারে' টাইপ করেছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্নেহাস্পদ আবু তাহের (বিন মরহুম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুন্ নূর সালাফী, রংপুর) ও মুহাম্মাদ নূরুল মোমেন, বগুড়া -কে, যাদের কঠিন পরিশ্রমের ফলে পুরা থিসিসটি 'হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটারে' মেক-আপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সবশেষে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ) ঢাকা- এর সম্মানিত সকল ট্রাস্টিবৃন্দকে এবং যে সকল ভাই প্রকাশিতব্য অত্র থিসিস গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য প্রদান করেছেন এবং আমাদের সকল সাথী ও শুভানুধ্যায়ী ভাইদেরকে, যাদের আন্তরিক দো'আ, শ্রম ও সহযোগিতার ফলে থিসিসটি প্রকাশ করতে আমরা

সমর্থ হয়েছি। পরিশেষে আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবায়ে কেরামের উপরে যাবতীয় দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক!

লেখকের পরিচয়ঃ

জন্ম

বাংলা ১৩৫৪ সালের ২রা মাঘ রবিবার দিবাগত রাত ১১-টায় লেখক বর্তমান সাতক্ষীরা যেলার সদর থানাধীন বুলারাটি গ্রামের সম্ভ্রান্ত 'মন্ডল' বংশের 'মৌলভী বাড়ী'-তে জন্মগ্রহণ করেন। মাতা বছীরুন্নেসা (মৃঃ ২৫শে রামাযান ১৪০৪ হিঃ মোতাবেক ২৬ শে জুন ১৯৮৪, ১১ই আষাঢ় ১৩৯১ মঙ্গলবার সকাল ৯-২০মিঃ, বয়স ৭৪ বছর) ছিলেন অত্যন্ত পর্দানশীন ও পুণ্যবতী মহিলা এবং পিতা 'উস্তাযুল আসাতিযাহ' মাওলানা আহমাদ আলী (বাংলা ১২৯০-১৩৮৩/১৮৮৩-১৯৭৬) মৃত্যুঃ ১৯ শে মে মোতাবেক ৫ই জৈষ্ঠ বুধবার দিবাগত রাত ৯-২০মিঃ, বয়স ৯৩ বছর) ছিলেন খ্যাতনামা আলিম, লেখক, বাগ্মী, শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা। দাদা মুন্শী যীনাতুল্লাহ ছিলেন গ্রামের বুযর্গ সরদার। নানা বাহার আলী পন্ডিত ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা যেলার বসিরহাট মহকুমাধীন ঘোড়ারাস গ্রামের আহলেহাদীছ নেতা ও সকলের শ্রদ্ধেয় মুরব্বী।

বংশ তালিকা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বিন (২) মাওলানা আহমাদ আলী বিন (৩) মুন্শী যীনাতুল্লাহ বিন (৪) আলহাজ্জ যমীরুদ্দীন বিন (৫) রফী মাহমূদ বিন (৬) আবদুল হালীম বিন (৭) উযীর আলী বিন (৮) সাইয়িদ শাহ নাযীর আলী আল-মাগরেবী (রাহেমাহুমুল্লাহ)। বর্ণনাকারী লেখকের আপন চাচাতো ভাই মৌলভী আবদুর রশীদ নূরী (মৃঃ ১৪.১২.১৯৮৪খৃঃ,বয়স ৭৯ বছর) বলেন যে, এই বংশের মূল ব্যক্তি সাইয়িদ শাহ নাযীর আলী একজন উঁচুদরের আলিম ছিলেন। মরক্কো বা আরব দেশ হ'তে তিনি ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানে আগমন করেন। তাঁর উন্নত চরিত্র মাধুর্যে ও হাদীছ ভিত্তিক তাবলীগে মুগ্ধ হ'য়ে পশ্চিমবঙ্গের ২৪পরগনা যেলাধীন বারাসাত মহকুমার 'ফল্তী' গ্রামের লোকেরা 'আহলেহাদীছ' হ'য়ে যান। তিনি উক্ত গ্রামের মন্ডলের (সর্দারের) কন্যার পাণি গ্রহণ করেন এবং এদেশেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেই হ'তে এই বংশ 'সৈয়দ' বংশের বদলে 'মন্ডল' বংশ হিসাবে পরিচিত হয়। এই বংশের প্রতি স্তরে এক বা একাধিক যোগ্য আলিম ছিলেন। মাওলানা আবদুল্লাহ,

মাওলানা সিরাজুল ঈমান, মাওলানা আবদুর রহমান, মাওলানা আহমাদ আলী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম এই বংশেরই কৃতি সন্তান।-

*বর্ণনাঃ ১১.৭.১৯৭৬ খৃঃ। **বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ** শেখ আখতার হোসেন, সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী (জীবনী পুস্তক)। দৌলতপুর, খুলনাঃ হোসেন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৮৬ খৃঃ।*

শিক্ষা জীবন

মায়ের নিকটেই তাঁর লেখাপড়ার হাতে খড়ি হয়। অতঃপর ছাত্র- জীবনের শুরুতে তিনি স্থানীয় আলীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। তারপর বাড়ী হ'তে ১৪ মাইল দূরে পাথরঘাটা গমন করেন ও সেখানে পিতার নিকটে মসজিদে থেকে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে আরবী- উর্দূ-ফার্সী শিক্ষা করেন। কিছুদিন পরে পিতার প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং পিতার সাথেই মসজিদে কাটিয়ে উক্ত মাদ্‌রাসা হ'তে দাখিল, আলিম ও ফাযিল এবং ১৯৬৯ সালে জামালপুর যেলাধীন আরামনগর আলিয়া মাদরাসা হ'তে কামিল (মুহাদ্দিছ)পাশ করেন। সকল পরীক্ষাতেই তিনি ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। আলিমে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা এডুকেশন বোর্ডে ১৬ তম ও কামিলে ১ম শ্রেণীতে ৫ম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া কলেজ হ'তে আই.এ ও খুলনা এম. এম. সিটি কলেজ হ'তে বি.এ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ১৯৭৬ সনে (১৯৭৮-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত) আরবী-তে এম.এ ১ম শ্রেণীতে ১ম হ'য়ে উত্তীর্ণ হন। সর্বশেষে তিনি **'আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিন এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ লিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ১৯৯২ সালের ২০ শে আগষ্ট তারিখে সর্বোচ্চ সম্মান সূচক পি.এইচ-ডি (Ph.D) ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন

ইতিপূর্বে পিতৃহারা লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় ৭৮ উত্তর যাত্রাবাড়ী জামে'আ মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার চাকুরী গ্রহণ করেন। অতঃপর এম.এ পাশ করার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউটে ১৯৮০ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর খন্ডকালীন 'লেকচারার' হিসাবে যোগদান করেন। অতঃপর একই সালের ১০ই ডিসেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে 'লেকচারার' হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৯৫ সালে বিভাগ বিভক্ত হবার পরে বর্তমানে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে 'সহযোগী অধ্যাপক' হিসাবে কর্মরত আছেন।

সাংগঠনিক জীবন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী *'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'* নামক যুবসংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ১৯৮১ সালের ৭ই জুন তারিখে *'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'* কায়েম করেন। ১৯৮৯ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় *'তাওহীদ ট্রাস্ট' (রেজিঃ)* নামে একটি সমাজ কল্যাণ সংস্থা এবং ১৯৯২ সালের ১৫ই নভেম্বর রাজশাহী-তে *'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'* নামে অত্র প্রকাশনা সংস্থার গোড়াপত্তন করেন।

অতঃপর ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর শুক্রবারে *'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'* নামক জাতীয়ভিত্তিক আহ্‌লেহাদীছ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হ'লে তাঁর উপরে 'ইমারত'-এর গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বর্তমানে তিনি শেষোক্ত সংগঠনের 'আমীরে জামা'আত' হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা ও কুয়েতসহ কয়েকটি দেশে আমন্ত্রিত মেহমান হিসাবে সফর করেছেন এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন সমূহে ভাষণ দান করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী ও প্রচুর সাংগঠনিক ব্যস্ততার মাঝেও তিনি কঠিন অধ্যবসায়ের মাধ্যমে লেখনী পরিচালনা করে চলেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর অন্যূন ১৫টি বই প্রকাশিত হ'য়ে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং আরও কয়েকটি বই প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় অর্ধ শতাধিক।

পরিশেষে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য এবং যাবতীয় দরূদ ও ছালাত তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম ও পরিবারবর্গের উপরে বর্ষিত হউক!!

সচিব

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

অত্র থিসিস-এর মাননীয় তত্ত্বাবধায়ক, কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক জনাব ডঃ এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী-র

বাণী

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ্ আল-গালিবের অভিসন্দর্ভ 'আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'তে যাচ্ছে জেনে আনন্দ বোধ করছি। আমার তত্ত্বাবধানে অভিসন্দর্ভটি সমাপিত হয় এবং মূল্যায়নের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁকে পি-এইচ.ডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়। আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন একটি সংস্কারবাদী আন্দোলন। এটির মূল লক্ষ্য হলো যাবতীয় শিরক-বিদয়াত পরিহার করে মুসলিম জনগোষ্ঠিকে সনাতন ইসলাম মুখী করা। গ্রন্থটি দু'টি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে গ্রন্থকার আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মূলনীতি ও শিক্ষা এবং দ্বিতীয় খন্ডে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে বাংলাদেশে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও কার্যক্রম উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর নিজস্ব কিছু চিন্তাধারা ও মত আছে , যার সাথে অনেকের ভিন্ন মত থাকতে পারে। তবুও এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর উদ্যোগ গ্রহণ প্রশংসার্হ। গ্রন্থটি পাঠে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও গবেষক, প্রাগ্রসর ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ বোদ্ধা পাঠক উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

ও স্বকীয়ত্বে ভাবীকালের
জ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠি হ'তে পেরেছে। অধিকন্তু
ওয়া ও সন্দর ভাবে বুঝিয়ে
ার না

(প্রফেসর এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী)
সভাপতি
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

*অত্র থিসিস-এর মূল্যায়ন কমিটির সম্মানিত সদস্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পন্ডিত ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক **ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খান**-এর*

বাণী
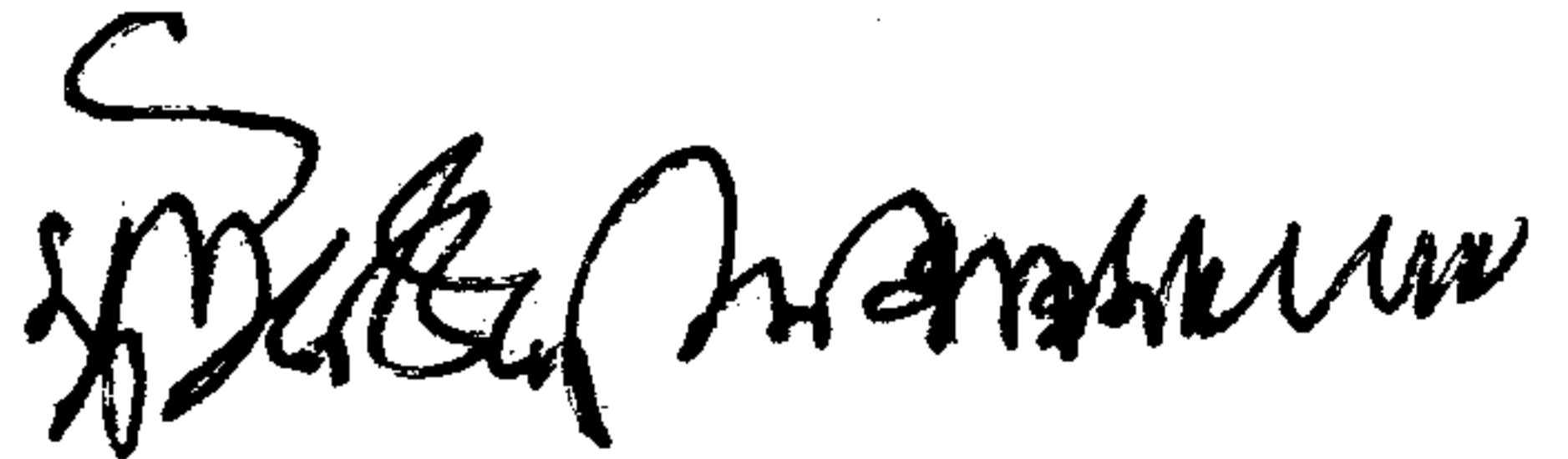
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' পি-এইচ.ডি থিসিসটির পান্ডুলিপি পড়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। তা পড়ে ইসলামী ভাবধারার একজন গবেষক হিসাবে আমি আনন্দ-বিস্মিত হই।

আরবী ভাষায় তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ দখল, হাদীছ পাঠে তাঁর সুপরিচিত দক্ষতা, কুরআন-হাদীছের হুকুম-আহকাম নির্ণয়ে তাঁর সরল সাধারণ কিন্তু নিশ্ছিদ্র বুরহান ভিত্তিক প্রমানসই যুক্তির অবতারণা, আমাকে নতুন প্রজন্মের হাতে বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইসলাম চর্চার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত করেছে।

জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মান্ধাতা আমলের প্রচলিত কল্পিত যুক্তিবিদ্যা, হাইপোথেটিক্যাল লজিক বা হুজ্জতের স্থলে, আল-কুরআন বাস্তব ঘটনা মূলে প্রমানসই অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমান মূলে এভিডেন্স বা বুরহান ভিত্তিক যুক্তির অবতারণা করে। মুসলমানদের জ্ঞান চর্চার ঐতিহ্যে বুরহান ও হুজ্জতের আদলে যথাক্রমে উদ্ভাবিত আহকাম ও কিয়াসের সমন্বিত ব্যবহার বিদ্যমান রয়েছে। বুরহান থেকে উদ্গত আহকাম ও হুজ্জত থেকে উদ্গত কিয়াস-এর সত্তাগত পার্থক্য ও ব্যবহারগত তারতম্য হৃদয়ংগম করার প্রতি অমনোযোগী হওয়ার কারণে কালক্রমে মুসলমানেরা নানা জাতীয় মাসআলা-মাসায়েলের কল্পিত তর্ক-বিতর্ক থেকে প্রথমে অবাস্তব ধর্মীয় বাক-যুদ্ধে এবং পরবর্তীতে বাস্তব মাযহাবী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মাসআলা-যুদ্ধের বিপাক থেকে বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগণকে উদ্ধার করার জন্য পুনরায় বুরহান ও হুজ্জতের পার্থক্য এবং আহকাম ও কিয়াস-এর তারতম্য নিরূপন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ডঃ গালিবের আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কিত থিসিস গ্রন্থটি এক নূতন দিগন্তের উন্মোচন করবে বলে আশা করা যায়। তদুপরি শাস্ত্রগত ভাবে গ্রন্থটি আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিশেষতঃ ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক যুগে অত্র আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের অভাব পূরণ করবে। আমি এ গ্রন্থটির বহুল প্রচার এবং উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে পঠন-পাঠন কামনা করি।

(ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খান)
প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
এবং মহাপরিচালক, বায়তুশ শরফ
ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম

*থিসিস -এর মুদ্রিত কপিটি পাঠ করার পর লেখকের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান**-এর প্রেরিত*

বাণী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব -এর পি-এইচ.ডি থিসিস 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' একটি মৌলিক অবদান। এতে এমন অনেক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, যা বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। 'আহলেহাদীছ' একটি দল, না একটি গোষ্ঠী, না একটি মযহাব, না কোন বাতেল ফিরকা, এ নিয়ে জনমনে প্রশ্ন ছিল। ডঃ গালিব তাঁর গবেষণায় প্রমান করেছেন যে, এটি এর কোনটি নয়, বরং একটি আন্দোলন। যে আন্দোলনের সূচনা হয় ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট কুসংস্কার কুরআন ও হাদীছের আলোকে অপনোদনের জন্য। তিনি একজন স্বার্থক গবেষক হিসেবে বিষয় বস্তুর যথার্থতা প্রতিপাদন করেছেন প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করে। এটি একটি গবেষণা গ্রন্থ হিসেবেই নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক তথ্য নির্দেশিকা হিসেবেও বরিত হবে। স্নেহধন্য ডঃ গালিবের কাছে পাঠকরা ভবিষ্যতে আরও সৃষ্টিধর্মী অবদানের আশা রাখে। গ্রন্থটি সুধীজনের প্রশংসা লাভ করবে, আমি বিশ্বাস করি। আল্লাহ এটিকে কবুল করুন এবং এর রচয়িতাকে উপযুক্ত প্রতিদান দিন, আমীন!

(ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান)
প্রফেসর আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অত্র থিসিসের সম্মানিত পরীক্ষক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ডঃ ওসমান গণী (পি-এইচ.ডি, ডি-লিট)-এর প্রেরিত

বাণী

গবেষক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ্‌ আল-গালিব রচিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' থিসিসটি আমি খুঁটিয়ে পড়েছি। একটি লাইনও বাদ দিইনি। খানিকটা পড়েই আমার খুব ঔৎসুক্য হয়। তাই আগাগোড়া মন দিয়ে পড়েছি সাগ্রহে।

"আহলেহাদীছ" আন্দোলনটিকে প্রধানতঃ দু'টো ভাগে ভাগ ক'রে দেখানো হয়েছে। প্রথম ভাগে - ইসলামের মূল সত্তার (আল্লাহ ও রসূলের) দিকে আপসহীন (ঈমানের) তেজদীপ্ত আহবান। দ্বিতীয় ভাগে - বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী রক্তক্ষয়ী লেলিহান ক্ষুধার বিরুদ্ধে এবং পরাধীনতার গ্লানি হ'তে স্বদেশ ও সমাজ জীবনকে মুক্ত করার জন্য উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও অর্জনে তার জীবন-মরণ প্রতিজ্ঞা সহ জেহাদ ঘোষণা ও অবিস্মরণীয় অবদান। উপসংহারে আন্দোলনের ইতিবৃত্ত ও ইতিহাস। দু'টো অধ্যায়েই গবেষকের বক্তব্যে কোথাও জটিলতা, জড়তা, দুর্বলতা ও দুর্বোধ্যতা লক্ষ্য করিনি। যুক্তি গুলো স্বচ্ছ সবল সপ্রমান ও বলিষ্ঠ, তত্ত্ব ও তথ্যে ভরা। কোথাও কোন সন্দেহ বা স্ববিরোধ নেই। গ্রন্থটি আপন মৌলিকত্বে ও স্বকীয়ত্বে ভাবীকালের জ্ঞানান্বেষীদের জন্য জ্ঞান চর্চায় ও জ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পেরেছে। অধিকন্তু গ্রন্থটির বর্ণনা ভঙ্গির সাবলীলতা, সুন্দর ভাবে সাজিয়ে দেওয়া ও সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার কৌশলটি পাঠক চিত্তকে চঞ্চল না করে অবিচল করে। অস্থির ও অধীর না করে স্থির ও ধীর করে।

কোথাও কোথাও ধর্মের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াকে নিয়ে কিছুটা শুকনো কচ্‌কচানির কথা বাদ দিলে গবেষক তাঁর গবেষনা নিবন্ধে অনন্য সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছেন। পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আহলেহাদীছ (মুসলিম) আন্দোলনের যে অবদান তিনি অবলীলাক্রমে তুলে ধরেছেন, তা একান্ত ভাবেই প্রশংসনীয়, যদি না অবহেলা করি। গবেষক প্রচুর খেটে প্রমান করেছেন-এই মহৎ বেদনা, এই মহৎ আন্দোলন স্বাধীনতার পূর্বতন বীজ রূপে না রয়ে গেলে আজকের দিনের স্বাধীনতার সোনার ফসল সবুজ শালবন এত সত্ত্বর আদৌ আমাদের হাতে

আস্‌ত কি? কখনও না। সুতরাং এই আন্দোলনের আবেদন ও অবদান দুই-ই অবর্ণনীয় ও অবিস্মরণীয়। গবেষক এই সহজ সত্যটি সরল ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছেন।

অতএব জাতীয় জীবনের নির্জীবতাকে বীর্যবান করতে, জাতির গ্লানিহীন গৌরবময় অতীতের মহান ঐতিহ্যমন্ডিত অবদানকে জানতে ও (অনাগতকালকে) জানাতে এরূপ একটি (উচ্চাঙ্গের থিসিস) মূল্যবান গ্রন্থ স্বাধীন দেশের সকলের নিকট বিশেষ করে মুসলিম জাহানের ঘরে ঘরে প্রচারিত হওয়া উচিত।

প্রীতিভাজন ডঃ গালিব-এর অমূল্য থিসিসটি গ্রন্থাকারে বের হচ্ছে জানতে পেরে আমি যারপর নেই আনন্দিত হ'লাম। গ্রন্থটি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকটে গৃহিত হৌক এটাই আমার একান্ত কামনা।

প্রীতিমুগ্ধ
(ওসমান গণী)

(ডঃ ওসমান গণী)
প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
শান্তিনিকেতন ও এশিয়াটিক সোসাইটি
কলিকাতা
এবং ইসলামী বিষয়ে বহু গ্রন্থপ্রণেতা

*অত্র থিসিস-এর সম্মানিত পরীক্ষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক জনাব ডঃ এ. বি.এম. **হাবীবুর রহমান চৌধুরী**-র*

বাণী

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিন এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' শীর্ষক অমূল্য গবেষনা অভিসন্দর্ভটি সত্ত্বর প্রকাশিত হ'তে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমাদের বিভাগে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে (ঐ সময় আরবী ও ইসঃ স্টাডিজ একত্রিত বিভাগ ছিল) আমরা স্নেহাস্পদ গালিব-এর তীক্ষ্ণ প্রতিভা এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। পরবর্তীতে আমি তাঁর গবেষনা-অভিসন্দর্ভের পরীক্ষক হিসাবে পুরো থিসিস্‌টি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়েছি। যুগে যুগে ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট শিরক-বিদ'আতও কুসংস্কার সমূহকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সংস্কারের লক্ষ্যে ছাহাবাযুগ হ'তে আহলেহাদীছ আন্দোলন চলে আসছে। এই দীর্ঘ ইতিহাসকে ও বিরাট বিষয়কে সহজে বুঝিয়ে দেওয়ার ও দক্ষিন এশিয়ার প্রেক্ষাপটে গুছিয়ে উপস্থাপন করার এবং দলীল ও যুক্তি দিয়ে প্রমান করার অতুলনীয় যোগ্যতার পরিচয় আমি তাঁর থিসিসে দেখতে পেয়েছি। পবিত্র কুরআন, হাদীছ, ফিক্‌হ, ইতিহাস ও সর্বোপরি সাহিত্যিক মূল্যায়নে থিসিস্‌টি সত্যিই অতুলনীয়। তাঁর গবেষনা কর্মটি মৌলিক তত্ত্ব সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল আলোচনায় ভরপুর, যা জ্ঞানের জগতে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। গবেষনা অভিসন্দর্ভটি প্রকাশিত হ'লে এদেশের জ্ঞানী সমাজ বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে। এই অমূল্য থিসিস্‌টি বিশ্বের অন্যান্য ভাষাতে অনুদিত হওয়া একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ পাক গ্রন্থটিকে কবুল করুন এবং রচয়িতাকে উপযুক্ত প্রতিদান দিন ও তাঁর মহান পিতামাতার রূহের মাগফিরাত করুন। আমীন!

(ডঃ এ.বি.এম.হাবীবুর রহমান চৌধুরী)
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ ও ধর্ম-দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের আরয
كلمة المؤلف

নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ........

কাউকে জানানোর জন্যে নয় বরং আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে কিছু জানার উদ্দেশ্যেই এ আন্দোলনের উপরে গবেষণার ব্যাপারে কৃতসংকল্প হই। এই সংকল্পের সাথে কিছু সংশয়ও ছিল। কিন্তু সে সংশয় যে এত কঠোর বাস্তবতা নিয়ে দেখা দিবে সে অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে হ'ল। 'হক' জেনে রাস্তায় নেমে পিছে হটার মত মেযাজ কখনই ছিলনা। ফলে বাধা যত বেড়েছে, সংকল্প তত দৃঢ় হয়েছে।

বাধার ধরণ ছিল তিন প্রকারের- (১) গবেষণার বিষয়টি ছিল দারুণ স্পর্শকাতর এবং দেশীয় অধিকাংশ বিদ্বানের লালিত মাযহাব ও মতবাদের বিরোধী (২) বিষয়টির উপাত্ত ও উপাদানের দুষ্প্রাপ্যতা এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে এর দুঃখজনক স্বল্পতা (৩) ঈর্ষাপরায়ণ কিছু বিদ্বানের চরম অনুদারতা। শেষোক্ত বাধাটিই ছিল আমার জন্য সব চাইতে মর্মবিদারক, কম বেশী যা আজও অব্যাহত আছে। আমি তাদেরকে আমার বন্ধু মনে করি। তাদের দেওয়া মুছীবতে আমি ছবর করি। যা আমার গুনাহের কাফ্‌ফারা হবে এবং পরকালীন মুক্তির অসীলা হবে বলে আশা করি। তবুও রূঢ় বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই সম্মুখপানে অগ্রসর হয়েছিলাম এবং অবশেষে আল্লাহ্‌র রহমত লাভে সমর্থ হয়েছি। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। আমি একটি ব্যাপারে স্বস্তিলাভ করেছি যে, আমার অত্র থিসিস-এর সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক, মূল্যায়ক ও দেশী-বিদেশী পরীক্ষক মন্ডলীর কেউই 'আহলেহাদীছ' ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ থিসিসটি লেখকের একক রুচিতে হয়নি। গবেষক, তত্ত্বাবধায়ক ও মূল্যায়ন কমিটির ত্রয়ী রুচির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে। গবেষণা কর্মের নিরপেক্ষতা ও মান উন্নত করার জন্যই মূলতঃ এ ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তবুও আমি দ্বিধাহীন ভাবে বলতে চাই যে, আহলে হাদীছ আন্দোলনের বিশাল জলধির তীরে একজন অকিঞ্চন ছাত্র হিসাবে আমি কিছু সংখ্যক নুড়ি কুড়িয়েছি মাত্র। এখনো ডুব দিতে পারিনি। আমি ভবিষ্যত ডুবুরীদের আহবান জানাচ্ছি, তাঁরা যেন আল্লাহ্‌র সর্বশেষ অহিভিত্তিক এই নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের জ্ঞান সমুদ্রে ডুব দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন এবং সকল বাধা ও ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে আসেন।

মানুষ সর্বদা ভুলের শিকার। তাই শত চেষ্টা ক'রেও ভুল এড়াতে পারিনি। থিসিসের সর্বত্র টীকাসমূহে তথ্যসূত্র প্রদত্ত হ'ল, যাতে সুধী পাঠক বৃন্দ সূত্র যাচাই করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হন। এর পরেও সংশোধনের দুয়ার সর্বদা খোলা রইল। গ্রহণযোগ্য সংশোধনী পেলে পরবর্তী সংস্করণে তা অবশ্যই সংযুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

বলা আবশ্যক যে, মূল থিসিস-এর সাথে বর্তমান প্রকাশনায় নেপাল, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ ও শ্রীলংকায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি পরিশিষ্ট-ক -তে যুক্ত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ৪র্থ অধ্যায়টি এবং দু'একটি অধ্যায়ের আলোচনায় ও টীকায় মাঝে-মধ্যে কিছু সংযোজন ঘটেছে, মূল থিসিস-এর কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে মাননীয় গবেষণা নির্দেশকের পরামর্শক্রমে যা ইতিপূর্বে সংযোজন করা হয়নি। এই গ্রন্থের প্রায় সকল সূত্রগ্রন্থ (Reference) লেখকের নিকটে মওজুদ রয়েছে। সাহিত্যের অংগনে السرقة و الإنتحال বলে একটা কথা বহুলভাবে প্রচলিত আছে। সম্মানিত লেখকবৃন্দ এ গ্রন্থ হ'তে কোন উদ্ধৃতি পেশ করতে চাইলে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। যাতে লেখক কিছু নেকী অর্জনের সুযোগ পান। এটাকে এড়িয়ে সরাসরি তথ্যসূত্রের নাম করলে চরম অকৃতজ্ঞতা হবে। তাছাড়া লেখকের কোন ভুল থাকলে সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে, যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

কারু জীবনী বা অনুরূপ সহজলভ্য কোন বিষয়ের উপর 'ডক্টরেট' করা যেত। কিন্তু কেবল মাত্র ডিগ্রীই লক্ষ্য ছিলনা বলেই আহলেহাদীছ আন্দোলনের মত একটি স্পর্শকাতর, বিশাল ও কঠিন বিষয়কেই বেছে নিয়েছিলাম। প্রতি পদে পদেই রীতিমত যুদ্ধ করে আমাকে এগোতে হয়েছে। তবুও আমি দৃঢ় সংকল্প ছিলাম যে, এমন একটি বিষয়ে আমি 'ডক্টরেট' করতে চাই যা শেষ হবার পূর্বেই আমার মৃত্যু হ'লে যেন আমি জান্নাতের আশা করতে পারি। এখন দেখছি আমি শেষ করিনি, কেবল দরজা খুলেছি। আল্লাহ পাক হয়ত কেবল এতটুকুতে সন্তুষ্ট নন, তিনি চান গবেষণার বাস্তবায়ন। কিন্তু সে পথ যে আরও বন্ধুর, আরও কঠোর, আরও পিচ্ছিল। বর্তমানে সাংগঠনিক ভাবে সেপথেই পা বাড়িয়েছি। একমাত্র সহায় আল্লাহ।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কোন মতবাদ বা School of thought-এর দিকে আহবান জানায় না বরং একটি পথের দিকে আহবান জানায়। যে পথ আল্লাহ-প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এ পথের শেষ ঠিকানা জান্নাত।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই মৌলিক দাওয়াত উপলব্ধি করে যদি আল্লাহ্‌র কোন মুজাহিদ বান্দা তা কবুল করেন এবং নিজ ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে ও বাংলার সমাজ জীবনে বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহ'লে আমাদের এ শ্রম 'ছাদাক্বায়ে জারিয়া'য় পরিণত হবে এবং দীন লেখকের গুনাহের কাফ্‌ফারা হবে ইনশাআল্লাহ।

লাইব্রেরীর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ হ'তে সমাজের বিস্তীর্ণ ভূমিতে পেশ করার জন্য 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' যে সৎ সাহসের পরিচয় দিয়েছে, সে জন্য আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। গবেষণা ও প্রকাশনার সকল স্তরে যারা যে টুকু সহযোগিতা আমাকে নিঃস্বার্থভাবে দান করেছেন, আমি তাঁদের সকলের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছি, তিনি যেন তাদেরকে উত্তম জাযা প্রদান করেন এবং দীন লেখকের ও তার মরহুম মাতা-পিতার গুণাহ- খাতা মাফ করেন। আমীন!

بسم الله الرحمن الرحيم

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

إظهار التشـــكر

আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ ও সালাম শেষে আমি আন্তরিক শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করছি অত্র গবেষণা সন্দর্ভের মাননীয় তত্ত্বাবধায়ক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ এ, কে, এম, ইয়াকুব আলীর প্রতি, যাঁর যথাযথ নির্দেশনা ও পরিশ্রম ব্যতীত এই সন্দর্ভ রচনা সম্ভব ছিল না। অধ্যায় রচনা, উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ এবং সার্বিক ব্যাপারে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ অত্র সন্দর্ভটিকে বর্তমান মানে উন্নীত হ'তে সহায়তা করেছে। এজন্য আমি তাঁর নিকটে চির ঋণী ও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

অতঃপর আমি শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করছি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতি, যার প্রদত্ত ফেলোশীপ ও আর্থিক সহযোগিতা ব্যতীত আমার পক্ষে এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। সাথে সাথে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারীর প্রতি, যিনি অফিসিয়াল সহযোগিতা ছাড়াও আমাকে গবেষণার ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান উপদেশ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমি শুক্‌রিয়া আদায় করছি মূল্যায়ন কমিটির সকল মাননীয় সদস্য বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন আহমাদ খানের প্রতি, অত্র সন্দর্ভের ব্যাপারে যাঁর আন্তরিক উৎসাহ আমি কখনোই ভুলতে পারব না। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ কুয়েতের আহলেহাদীছ সংস্থা 'জম্‌ঈয়াতু এহ্‌ইয়াইত্ তুরাছিল ইসলামী' ও তার 'মুদীর' (বর্তমানে 'রঈস') শায়খ তারেক আল-ঈসা এবং রিয়াযের কেন্দ্রীয় দারুল ইফ্‌তা-এর মাননীয় কর্মকর্তাগণের প্রতি, যাঁরা বহু মূল্যবান কিতাবাদি 'হাদিয়া' স্বরূপ প্রেরণ করার ফলেই আমার পক্ষে অত্র সন্দর্ভ রচনা সম্ভব হয়েছে বলা চলে। আমি শুক্‌রিয়া জানাচ্ছি করাচীর জামে'আ সাত্তারিয়া ও দারুল হাদীছ রহমানিয়ার বাংগালী ও বিহারী ছাত্রবৃন্দের প্রতি এবং করাচীর কেন্দ্রীয় জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছের আমীর মাওলানা আবদুর রহমান সালাফী ও তাঁর ভাই জামে'আ সাত্তারিয়ার মুদীর মাওলানা মুহাম্মাদ সালাফী, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও জামা'আতে মুজাহেদীনের নায়েবে আমীর মাওলানা যাফরুল্লাহ্ ও প্রচার সম্পাদক মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া আযীয, সিন্ধু প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীছের সাধারণ সম্পাদক ও করাচী দারুল হাদীছ রহমানিয়ার মুদীর শায়খ আবদুল্লাহ্ নাছের রহমানী, লাহোরের 'দারুদ দা'ওয়াতিস সালাফিইয়াহ্'র পরিচালক হাফেয আহমাদ শাকির, সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ শায়খ আলীম নাছেরী, হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, হাফেয না'ঈমুল হক না'ঈম, লাহোরে অবস্থানরত ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে

অধ্যয়নরত আমার প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ, রিয়ায প্রবাসী ক্বারী আবদুল মান্নান আরশাদ, লাহোরের ইদারা ছাক্বাফাতি ইসলামিয়ার পরিচালক ও 'মা'আরিফ' গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা ইসহাক ভাট্টি, ভারতের খ্যাতনামা আলিম দিল্লীর মারকাযে আবুল কালাম আযাদের পরিচালক মাওলানা আবদুল হামীদ রহমানী, দিল্লীর মাসিক মাজাল্লা আহলেহাদীছের সম্পাদক মাওলানা হাকীম আজমল খাঁ ও পাক্ষিক তারজুমানের সহ-সম্পাদক মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ, কেরালার 'সালাফী সমাজকল্যাণ সংস্থা'র সম্পাদক আবদুল হক সুল্লামী, বেনারস জামে'আ সালাফিইয়াহ্‌র ছাত্র বেলাল হুসাইন (রাজশাহী) ও মুণীরুদ্দীন (কিষানগঞ্জ, বিহার), আযমগড় দারুল মুছান্নিফীনের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ভারতের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্বাযী আতহার মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ-এর খ্যাতিমান লেখক ভারতের প্রবীণ মুহাদ্দিছ শায়খ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (মৃঃ ৫.১.৯৪ খৃঃ), ইউ,পি-এর জামে'আ ফায়েযে আম, মউ-এর হেড মাওলানা জনাব মাহফূযুর রহমান ফায়যী ও উক্ত শহরের তিনটি আহলেহাদীছ মাদরাসার বাংগালী ছাত্রবৃন্দ, কলিকাতার মাসিক আহলেহাদীস পত্রিকার সম্পাদক ও প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীসের সাধারণ সম্পাদক হাফেয মাওলানা আইনুল বারী, মালদহ কারবোনার মাওলানা মুহাম্মাদ হোসাইন নাদভী, পশ্চিম দিনাজপুরের প্রবীণ আলিম মাওলানা আহমাদ হুসাইন শ্রীমন্তপুরী, নেপালের বর্ষিয়ান আলিম মাওলানা আবদুর রঊফ ঝান্ডানগরী ও সেখানকার মাসিক 'নূরে তাওহীদ'-এর তরুণ সম্পাদক মাওলানা আবদুল্লাহ মাদানীসহ অন্যান্য সকলের প্রতি, যাঁরা ৫২ দিনের দক্ষিণ এশিয়া সফরের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে কিতাবপত্র দিয়ে ও অন্যান্য উপদেশ ও সহযোগিতা দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন।

আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করছি বর্তমানে স্বদেশ ভারতে প্রত্যাগত ভ্রাতৃসম সঊদী মাব'ঊছ মওলানা আবদুল মতীন সালাফীকে, যার আন্তরিকতা ও সার্বিক উৎসাহ-উদ্দীপনা অত্র সন্দর্ভ রচনার মুহূর্তগুলিতে বারবার ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' তরুণ ভাইদের প্রতি ও দেশী উলামায়ে কেরাম ও বন্ধুদের প্রতি, যারা বিভিন্নভাবে অত্র সন্দর্ভ রচনায় আন্তরিকভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বিভাগীয় সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দ ও কর্মচারীগণের প্রতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি ও পাবলিক লাইব্রেরীসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও টাইপিষ্ট ভাইদের প্রতি, যাদের সার্বিক সহযোগিতা না পেলে অত্র সন্দর্ভ রচনা ও যথাসময়ে পেশ করা সম্ভব হ'ত না।

পরিশেষে আজকের এই স্বর্ণালী মুহূর্তে আমি গভীর কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে স্মরণ করছি আমার মরহুম মাতা-পিতাকে, যাঁদের উৎসাহ ও দিক-নির্দেশনায় আমি দ্বীনী ইল্‌মের পথে পা বাড়িয়েছিলাম। আমার প্রতি মুহূর্তের স্মৃতিতে যাঁরা দীপ্তিময় হয়ে আছেন ও থাকবেন, কিন্তু আজকের এ স্মরণীয় মুহূর্তে যাঁরা হারিয়ে গেছেন চর্মচক্ষুর অন্তরালে চিরদিনের মত.....। আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লাহুম অরহাম্‌হুম অ-'আ-ফিহিম ওয়া'ফু আন্‌হুম। ওয়া ছাল্লাল্লাহু 'আলা নাবীইয়িনা মুহাম্মাদ অ-আলিহী ওয়া ছাহাবিহী ওয়া সাল্লামা।

أحب الصالحين و لستُ منهم + لعل اللّهَ يرزقني صلاحا

আহ্লেহাদীছ আন্দোলন

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ

১ম খণ্ড
الجزء الأول

عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه قال قال رسولُ اللّه صلى اللّه عليه و سلم إنما الأعمالُ بالنيَّاتِ و إنما لِكُلِّ امْرِءٍ ما نَوَى فَمَنْ كانت هِجْرَتُه إلى اللّهِ و رسولِه فهجرتُه إلى اللّهِ و رَسولِه و مَنْ كانت هجرتُه إلى دنيا يُصِيْبُهَا أو إمرأةٍ يَتَزَوَّجُهَا فهجرتُه إلى ما هاجَرَ إليه ، متفق عليه -

অধ্যায়-১

الفصل الأول

ভূমিকা

المقدمة

মূলতঃ কোন রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের উদ্ভব হয়নি। বরং মুসলিম সমাজে যে সব কুসংস্কার ও শিরক-বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, সেসবের মূলোৎপাটন করে কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার দিক-নির্দেশনা হিসাবে এ আন্দোলনটি যাত্রা শুরু করে ও বিকাশ লাভ করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগ হ'তেই কুরআন ও হাদীছ মুসলিম সমাজের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য দু'টি প্রধান উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালে গ্রীক ও অন্যান্য দর্শন মুসলিম মনীষীদের দ্বারা লালিত হ'তে থাকে এবং এর ফলেই যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে ও রায় প্রয়োগ করে কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা দানের প্রবণতা দেখা দেয়। বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ গড়ে ওঠে এবং তা ইসলামের মৌলিক চিন্তাধারার মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। এ পর্যায়ে খারেজী, শী'আ, ক্বাদারিয়াহ, জাবৃরিয়াহ, মুরজিয়াহ, মু'তাযিলা প্রভৃতি মতবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরন্তু রায় ও কিয়াসকে ব্যবহার করে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর সমাধান প্রদান থেকে মাযহাবী উছূল বা আইন-সূত্রসমূহ গড়ে ওঠে। কিন্তু মুহাদ্দিছগণ মহানবী (ছাঃ) -এর সুন্নাহ্‌কে সমাজে পূর্ববৎ চলমান রাখতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতার জন্য হাদীছ পরবর্তীযুগে মুসলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে ব্যাপ্তি লাভ করে এবং তার পঠন-পাঠনের জন্য বিভিন্ন দরসৃগাহ গড়ে ওঠে। মহানবী (ছাঃ) -এর ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সমাজের পরিশীলন করা এসকল মুহাদ্দিছের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। হাদীছের বিপরীতে অন্য কিছু গ্রহণ করা তাঁদের নিকটে বিদ'আত বলে গণ্য হয়েছে। তবে ইজতিহাদের দরজা তাঁদের মতে সবসময়ের জন্য উন্মুক্ত থাকার কারণে উদ্ভূত সমস্যাবলীর হাদীছ ভিত্তিক সমাধানে কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি হয়নি।

ইসলাম বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করায় অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় রীতি-নীতি মুস-লিম সমাজে অনুপ্রবেশ লাভ করে। এর ফলে সাধারণ জনগণ কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক ইসলাম হ'তে অনেক দূরে সরে পড়ে। আক্বীদা ও আমলে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে মুসলিম খেলাফতের পতন ও অবক্ষয় যুগে শাসকগণ বিলাসবহুল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন ও সাথে সাথে রাজনৈতিক অস্থিরতা সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে উলামায়ে সূ'ও সুযোগসন্ধানী আমাত্যগণ এমন সব রেওয়াজ চালু করেন, যার সাথে কুরআন ও হাদীছের সঠিক যোগসূত্র ছিল না। মুহাদ্দিছগণ এসবের বিরুদ্ধে তৎপর হন এবং হাদীছ ভিত্তিক জীবন গঠনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁদের এই কর্মপন্থা পরবর্তীতে সূচিত আহলেহাদীছ আন্দোলনের পটভূমি হিসাবে গণ্য করা যায়।

প্রধানতঃ শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর (১১১৪-১১৭৬ হিঃ/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ) লেখনীর অনুপ্রেরণায় এবং তাঁর পৌত্র শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬/ ১৭৭৯-১৮৩১) পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের প্রভাব ও দিল্লীর মাদরাসা রহী-মিয়ার শায়খুল হাদীছ মিয়াঁ নযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২) মুখ্য প্রচেষ্টায় খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ বা দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এর পর থেকে উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে এ আন্দোলন নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে স্থিতিলাভ করে এবং সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে ইসলামের সঠিক পথের সন্ধান দানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, উত্তর ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে বর্তমান পাকিস্তান এলাকায় এবং পূর্ব ভারতের বাংলা ও বিহার এলাকায় অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে আহলেহাদীছ জনসংখ্যা সর্বাধিক। এই আধিক্যের কারণ হিসাবে বলা যায় যে, সীমান্ত অঞ্চল জিহাদের ঘাঁটি ছিল। পরবর্তীতে পাটনা জিহাদ পরিচালনার কেন্দ্র এবং বাংলা ও বিহার অঞ্চল লোক ও রসদ প্রেরণের উৎসস্থল ছিল। এই সময় আহলেহাদীছগণ 'মুহাম্মাদী' হিসাবেই পরিচিত ছিলেন।

সংস্কার আন্দোলন হিসাবে আহলেহাদীছের বিশেষ গুরুত্ব আছে। কিন্তু এর উপরে গবেষণামূলক উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার দ্বারা এর সঠিক মূল্যায়ন হলে জ্ঞানকোষে মূল্যবান তথ্যাবলী সংযোজিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করার প্রয়াস পেয়েছি ও সেগুলোর ভিত্তিতে এ আন্দোলনের প্রকৃতি ও ধারা পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছি।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি দু'টি খণ্ডে বিন্যস্ত হয়েছে। ১ম খণ্ডে 'আহ্‌লুল হাদীছ' শব্দের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা, আহলেহাদীছ -এর নামকরণ, বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি এবং আন্দোলন হিসাবে এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর আহলেহাদীছগণের 'আক্বীদা' বর্ণিত হয়েছে। এরপর বিগত ও বর্তমান যুগে আহলেহাদীছদের গৃহীত কর্মপন্থার আলোকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পাঁচদফা মূলনীতি নির্ণীত হয়েছে- যা একটি নতুন সংযোজন।

২য় খণ্ডে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতি আলোচিত হয়েছে। উপমহাদেশীয় ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী একে প্রাথমিক যুগ, অবক্ষয় যুগ ও আধুনিক যুগ-এ বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। একই সাথে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গতিধারা ও নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ আন্দোলন দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার আন্দোলন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই অভিসন্দর্ভে তত্ত্বীয় ও বাস্তবতার নিরিখে বিষয়টি গভীরভাবে নিরীক্ষা করে যে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে, তা পরবর্তী গবেষকদের অধিক অভিজ্ঞান লাভে উৎসাহিত করবে বলে আশা রাখি।

অধ্যায়-২

الفصل الثاني

হাদীছ, সুন্নাহ, খবর, আছার

الحديث والسنة و الخبر و الأثر

ফারসী সম্বন্ধ পদে[১] 'আহ্‌লেহাদীছ'ও আরবী সম্বন্ধ পদে 'আহ্‌লুল হাদীছ' একই অর্থ বহন করে, যার অর্থ হাদীছের অনুসারী।[২] পবিত্র কুরআন ও হাদীছের বহুস্থানে 'আল্লাহ্‌র কিতাব'কে 'হাদীছ' নামে অভিহিত করা হয়েছে।[৩] আহলেহাদীছগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার নীতিতে বিশ্বাসী[৪] বিধায় এখানে 'আহলেহাদীছ'- এর প্রকৃত অর্থ দাঁড়াবে 'কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী' বা অন্য কথায় 'আহ্‌লে ছহীহ হাদীছ'। সাধারণভাবে 'আহলেহাদীছ' হিসাবেই এই দল পরিচিত। হাদীছ, তাফসীর, ফিক্‌হ ও ইতিহাসে আহ্‌লুল হাদীছ, আহ্‌লুস্‌ সুন্নাহ, আহ্‌লুল আছার প্রভৃতি নামগুলি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুসন্ধানের পূর্বে হাদীছ, সুন্নাহ, খবর ও আছার-এর উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে করি। কারণ উক্ত চারটি শব্দ পারিভাষিকভাবে প্রায় সমার্থবোধক হ'লেও অর্থ ও ভাবগত দিক থেকে এগুলোর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা পেশ করা হ'ল।

ক ঃ হাদীছ (الحديث لغة)

হাদীছ 'হাদ্‌ছ' (حَدْث) ধাতু হ'তে উৎপন্ন হয়েছে, যার অর্থ নবোদ্ভূত বস্তু যা পূর্বে ছিল না।[৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শরীয়ত বিষয়ে নব উদ্ভাবিত মতও পন্থাকে 'মুহ্‌দাছাহ্‌' (محدثة) নামে অভিহিত করেছেন।[৬] আর এজন্যেই 'হাদীছ' কথা বা বাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ কথা বা বাণী একটার পর একটা শব্দ আকারে মুখ হ'তে বা লেখনীর মাধ্যমে নতুনভাবে বের হয়ে আসে।[৭] এতদ্ব্যতীত বর্ণনা, সংবাদ, নূতন, অনাদির বিপরীত প্রভৃতি অর্থে ও 'হাদীছ'- এর ব্যবহার হয়ে থাকে।[৮] হাদীছ শব্দের উৎপত্তি 'উহ্‌দূছাহ' (أحدوثة) ধাতু হতেও হয়ে থাকে। যার অর্থ নবজাত বা নব উদ্ভূত এবং এর বহুবচন 'আহাদীছ' (أحاديث)।[৯] স্মর্তব্য যে,

বৈয়াকরনিকদের দৃষ্টিতে নিয়মবহির্ভূত ভাবে হ'লেও হাদীছ-এর বহুবচন 'আহাদীছ' হিসাবে প্রচলিত।[১০]

মোট কথা 'হাদীছ' শব্দটির ধাতুগত ব্যবহার যেভাবেই হোক না কেন, সেখানে ইখ্বার বা সংবাদ দেওয়ার অর্থ স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়ে।

'হাদীছ' পারিভাষিক অর্থে (الحديث إصطلاحا)

শরীয়তের পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতির বর্ণনাকে 'হাদীছ' বলা হয়।[১১] ত্বীবী (মৃঃ ৭৪৩ হিঃ) বলেন, নবী, ছাহাবী, তাবেঈ সকলের কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতির বর্ণনাকে 'হাদীছ' বলে।[১২] ইবনু হাজার (৭৭৩-৮৫২) বলেন 'যা নবী (ছাঃ) -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়, তাই-ই হাদীছ।[১৩]

কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে হাদীছ ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নবুঅতপূর্ব ও নবুঅত-উত্তর সকল আচরণকে বুঝানো হয়।[১৪] শেষোক্ত এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী নবুঅত-পূর্ববর্তী যুগে রাসূলের সকল কথা ও কর্ম, আমল ও আচরণ মুসলিম উম্মাহ্র জন্য পালনীয় সুন্নাত হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু উম্মতের ঐক্যমত অনুযায়ী নবুঅত-পরবর্তীযুগে রাসূলের কথা, কর্ম ও আচরণসমূহের যথার্থ অনুসরণই মুমিনের কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত। হেরা গুহার 'তাহান্নুছ' (التحنّث) বা একান্ত সাধনা যদি সুন্নাত হ'ত, তাহ'লে নবুঅত পরবর্তী জীবনে মৃত্যু অবধি রাসূল (ছাঃ) নিজে বা তাঁর কোন ছাহাবী অবশ্যই উক্ত সুন্নাতের উপরে আমল করতেন। তাঁরা তা করেননি। বরং দেখা যায় যে, তাঁরা নিয়মিত জুম'আ-জামা'আতে যোগদান করেছেন, রামাযানে ছিয়াম পালন করেছেন, ই'তিকাফ করেছেন, জিহাদের ময়দানে জীবন দান করেছেন। তবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, নবুঅত-পূর্ব জীবনে রাসূলের আচরণসমূহ পরবর্তী জীবনে তাঁর নবী হওয়ার অকাট্য দলীল হিসাবে বিবেচিত হবে, যদিও তা উম্মতের জন্য পালনীয় সুন্নাত বা হাদীছের পর্যায়ভুক্ত নয়।[১৫]

কুরআনের বহুস্থানে আল্লাহ পাক স্বীয় কালামকে 'হাদীছ' বলেছেন। অমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও কুরআনকে 'হাদীছ' বলেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।[১৬] অথচ কুরআন হ'ল 'ক্বাদীম' বা চিরন্তন, যা 'হাদীছ' বা নূতনের বিপরীত। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ওমর আল-ফাখ্র রাযী (৫৪৪-৬০৬) বলেন যে, কুরআনের ভাষা ও বাক্যসমষ্টি মাখলূক্ব বা সৃষ্ট (যদিও তার মূল ভাবটি ক্বাদীম বা চিরন্তন)।[১৭] জাহ্মিয়া ও মু'তাযিলাদের মতে মৌলভাব ও ভাষা (لفظا و معنى) উভয় দিক দিয়েই কুরআন সৃষ্ট। এরিষ্টটলের

অনুসারী আল-ফারাবী, ইবনে সীনা, তূসী প্রমুখ দার্শনিকদের মতে আল্লাহ্র কালামের স্বতন্ত্রভাবে কোন বাহ্যিক রূপ নেই (لا حقيقة له فى الخارج)। উচ্চ কল্পনাশক্তির মাধ্যমেই তা উপলব্ধি করা যায় মাত্র (وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية)। যার সার কথা দাঁড়ায়, বর্তমান কুরআন চিরন্তন নয় বরং সৃষ্ট। কেলাবিয়াহ ও আশ'আরীদের মতে কুরআনের ভাব ক্বাদীম, ভাষা সৃষ্ট।[১৮]

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন 'বরং তা হ'ল সম্মানিত কুরআন, যা সুরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ)।[১৯] 'আপনার প্রভূর পক্ষ হ'তে পবিত্র রূহ (জিব্রীল) তা নিয়ে সত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়েছেন।[২০] এখানে 'কুরআন' বলতে ভাব ও ভাষায় সমৃদ্ধ পূর্ণ কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে, ভাষাহীন ভাবসর্বস্ব কুরআনকে নয়। অতএব কুরআন যেমন ছিল তেমন অবস্থাতেই অপরিবর্তিতভাবে 'লওহে মাহফূয' থেকে দুনিয়ায় নাযিল হয়েছে। অবশ্যই তা শব্দ, অর্থ ও বাক্যবিহীন শূন্যগর্ভ কিতাব ছিলনা। তাই কোন যুক্তিতেই কুরআনকে মাখলূক্ব বা সৃষ্ট বলা চলেনা। বরং আল্লাহ যেমন চিরন্তন তাঁর কালামও তেমনি নিঃসন্দেহে চিরন্তন বা ক্বাদীম। অতএব কুরআনকে 'হাদীছ' (নতুন সৃষ্টি) বলার পক্ষে রাযী ও অন্যান্য পণ্ডিতের প্রদত্ত ব্যাখ্যা যুক্তিসম্মত নয়। মাওয়ার্দী (৩৬৪-৪৫০ হিঃ) বলেন, 'কুরআনকে 'হাদীছ' বলার কারণ হ'তে পারে দু'টিঃ (১) কুরআন আল্লাহ্র বাণী। এখানে বাণী অর্থেই কুরআনকে 'হাদীছ' বলা হয়েছে। (২) নাযিল হওয়ার সময়কালের বিচারে অন্যান্য আসমানী কিতাবের তুলনায় কুরআন নূতন।[২১]

শাওকানী (১১৭২-১২৫০ হিঃ) বলেন 'কুরআনে আল্লাহ পাক তাঁর নবীর মাধ্যমে যেসব বিষয় নাযিল করেছেন, সেসব বিষয়ে তিনি লোকদেরকে খবর দিয়েছেন। অতএব খবর দেওয়া ও বর্ণনা করা অর্থে কুরআন অবশ্যই 'হাদীছ'।[২২]

আলূসী (মৃঃ ১২৭০ হিঃ)-এর মতে 'ক্বাদীম' বা চিরন্তন-এর বিপরীত হিসাবে নয় বরং 'বাণী' হিসাবেই কুরআনকে 'হাদীছ' বলা হয়েছে।[২৩]

উপরের আলোচনাসমূহ হ'তে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কুরআন মূলতঃ ভাব ও ভাষায় (معنى و لفظا) চিরন্তন বা 'ক্বাদীম'। কিন্তু নুযূল বা অবতরণকালের বিচারে তুলনামূলকভাবে তা সাম্প্রতিক বা হাদীছ। কুরআন 'আহসানুল হাদীছ'[২৪] বা সর্বোত্তম বাণী হিসাবে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছে। অতএব বাণী হিসাবে আমরা আল্লাহ্র বাণী ও রাসূলের বাণীকে একই মর্মে 'হাদীছ' বলতে পারি। তবে বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা এখানে 'হাদীছ' বলতে কেবল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র বর্ণনাকেই বুঝাব।

'সুন্নাহ্' আভিধানিক অর্থে (السنة لغة) ঃ

'সুন্নাহ্' অর্থ দাগ। ছুরি ধার করার উদ্দেশ্যে পাথরের উপর বারবার ঘর্ষণের ফলে সেখানে যে দাগ পড়ে যায়, সেটাই 'সুন্নাহ্'। নিয়মিতভাবে কোন কাজ করলে তাকে 'সুন্নাহ্' বলা হয়। যেমন আরবরা বলে থাকে سننت الماء 'আমি অবিরামভাবে পানি প্রবাহিত করেছি।' এজন্য কিসাঈ (মৃঃ ১৮৯ হিঃ) সুন্নাহ্‌র অর্থ করেছেন دائم বা নিয়মিত। শাওকানী (১১৭২-১২৫০) অর্থ নিয়েছেন 'প্রচলিত পদ্ধতি' (الطريقة المسلوكة) হিসাবে। খাত্তাবী (মৃঃ ৩৬১ হিঃ) বলেন, সুন্নাহ্‌র মূল অর্থ 'প্রশংসনীয় রীতি' (الطريقة المحمودة)। তবে শর্তসাপেক্ষে অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[২৫]

আলবানী-এর মতে 'সমাজ জীবনে প্রচলিত সাধারণ রীতিকে' (الطريقة المسلوكة والمعتدة في الحياة) 'সুন্নাহ্' বলা হয়।[২৬] এতদ্ব্যতীত আরবদের পরিভাষায় 'সুন্নাহ্' অর্থ এমন রীতি যা ইতিপূর্বে কেউ চালু করেনি।[২৭] এমনিভাবে 'সুন্নাহ্' অর্থ আকৃতি, রূপরেখা, তরীকা বা পদ্ধতি। সেখান থেকে এসেছে নবী (ছাঃ)-এর কর্মপদ্ধতি- যা হাদীছের মাধ্যমে শাব্দিক রূপ লাভ করেছে।[২৮]

'সুন্নাহ্' শার'ঈ অর্থে (السنة شرعا)ঃ

সায়ফুদ্দীন আমেদী (৫৫১-৬৩১ হিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর শরী'আত বিষয়ক কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে 'সুন্নাহ্' বলা হয়, যা অহিয়ে গায়ের মাত্‌লু অর্থাৎ অনাবৃত্ত অহি এবং অহিয়ে মাত্‌লু অর্থাৎ কুরআন নয়।[২৯] ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৩০] আবু ইসহাক শাত্বেবী (মৃঃ ৭৯০ হিঃ) বলেন যে, বিশেষ করে কুরআনে বর্ণিত হয়নি, এমন যেসকল বিষয় রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সুন্নাহ্ পর্যায়ভুক্ত, কুরআনের ব্যাখ্যা আকারে হৌক কিংবা না হৌক।[৩১] আলবানী বলেন-

'অহির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এরূপ নিজ সত্তাগত ও দুনিয়াবী বিষয়সমূহের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরী'আত বিষয়ক সকল কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে 'সুন্নাহ্' বলে।[৩২] কারো মতে নবুঅত লাভের পূর্বে কিংবা পরে রাসূলের সকল কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতি এবং তাঁর আকৃতি -প্রকৃতি বা চরিত্রগত সকল বিষয়ই সুন্নাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত।[৩৩] 'হাদীছ' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

'সুন্নাহ্' বিভিন্ন পরিভাষায় (السنة في الإصطلاحات)ঃ

পৃথক বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যের কারণে পণ্ডিতগণের নিকট 'সুন্নাহ' বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

১. মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায়ঃ দ্বীন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সকল কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে 'সুন্নাহ্' বলে। এর প্রয়োগ অতি ব্যাপক।

২. উছূলীদের পরিভাষায়ঃ মৌলিক বিধানগত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে 'সুন্নাহ্' বলা হয়। এতদুদ্দেশ্যে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত ও উছূলীদের নিকট 'সুন্নাহ্' হিসাবে গৃহীত। যেমন কুরআন সংকলন করা, কুরায়শী কিরাআতের উপরে উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করা ইত্যাদি।

৩. ফক্বীহ্‌দের পরিভাষায়ঃ ফরয-ওয়াজিবের অতিরিক্ত রাসূলের কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে 'সুন্নাহ্' বলা হয়। এ ছাড়াও বিদ'আতের বিপরীত অর্থে 'সুন্নাত' পরিভাষাটি ফক্বীহ্‌দের নিকটে প্রচলিত। যেমন বলা হয়ে থাকে সুন্নতী তালাক ও বিদ'আতী তালাক।[৩৪]

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, মুহাদ্দিছগণের পরিভাষা অন্য পরিভাষা সমূহকেও শামিল করে। কারণ উক্ত পরিভাষা অনুযায়ী দ্বীন সংক্রান্ত রাসূলের (ছাঃ) যাবতীয় কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতি 'সুন্নাহ্'র অন্তর্ভুক্ত। তা শার'ঈ বিধান পর্যায়ের হৌক যা উছূলীদের বিষয়বস্তু, কিংবা ব্যবহারিক সুন্নাত-মুস্তাহাব-মুবাহ পর্যায়ের হৌক- যা ফক্বীহদের বিষয়বস্তু।

খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক জোসেফ শাখ্‌ত (Joseph Schacht) 'সুন্নাহ্'র ব্যাখ্যায় বলেন 'মুহাম্মাদী আইনের সর্বোৎকৃষ্ট মতবাদ অনুযায়ী 'সুন্নাহ্' হ'ল নবী (ছাঃ)-এর 'দৃষ্টান্তমূলক আচরণসমূহের' (Model behaviour) নাম। ... কিন্তু সঠিক অর্থে 'সুন্নাহ্' বলতে 'পূর্বদৃষ্টান্ত' (Precedent) ও 'জীবনপদ্ধতি' (way of life) -কে বুঝায়। গোল্‌ডযিহের (Goldziher) দেখিয়েছেন যে, 'সুন্নাহ্' 'পৌত্তলিকদের পরিভাষা' (Pagan term), যা পরে ইসলামে গ্রহণ করা হয়েছে। মার্গোলিয়থ (Margoliouth) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আইনের উপাদান হিসাবে 'সুন্নাহ্'র প্রকৃত অর্থ হ'ল 'আদর্শ' (Ideal) যা পরবর্তীতে কেবলমাত্র নবী (ছাঃ) কর্তৃক আচরিত দৃষ্টান্ত সমূহের সঙ্গে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, উছমানের সময়কাল (২৩-৩৫ হিঃ) পর্যন্ত 'সুন্নাহ্' কথাটি 'সুন্নাতে নববী' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং কেবলমাত্র 'প্রচলিত রীতি' (merely what was customary) অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রফেসর শাখ্‌ত স্বীয় গ্রন্থে মার্গোলিয়থের ব্যাখ্যাকে সঠিক ও শাফে'ঈ (১৫০-২০৪)-এর ব্যাখ্যাকে বেঠিক প্রমাণ করার জন্য দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করেছেন এবং 'সুন্নাহ্'-এর অর্থ 'সর্বস্বীকৃত প্রথা' বা 'সামাজিক প্রথা' (Generally agreed practice or al-Amr al-Mujtama alaih) বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।[৩৫] যার সারকথা দাঁড়ায় এই যে, ছাহাবা, তাবে'ঈন, ফক্বীহ, মুজতাহিদ এবং পরবর্তী যুগে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে প্রচলিত সকল সামাজিক প্রথা-ই 'সুন্নাত' হিসাবে পরিগণিত হবে।

মিসরের বিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর আলী হাসান আবদুল কাদের আর এক ধাপ এগিয়ে সরাসরি ইমাম শাফে'ঈকেই দায়ী করে বলেন যে, 'সুন্নাহ্' কথাটি 'সামাজিক প্রথা' অর্থে ইসলামী যুগে হিজায, ইরাক সর্বত্র চালু ছিল। কিন্তু শাফে'ঈর কারণে দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষদিকে এসে এই রীতির ব্যত্যয় ঘটে এবং তা কেবলমাত্র 'সুন্নাতে নববী' অর্থেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।[৩৬]

এক্ষণে আমরা দেখাতে চাইব যে 'সুন্নাহ্' শব্দটি তার আভিধানিক অর্থে জাহেলী ও ইসলামী যুগে সমভাবে প্রচলিত ছিল।

১. জাহেলী যুগের কবিতায় 'সুন্নাহ্' তার আভিধানিক অর্থেঃ যেমন (ক) খালিদ বিন উৎবা আল-হুযালী নিজের বিশ্বাসঘাতকতার পক্ষে সাফাই পেশ করে বলেন[৩৭]

لا تجز عَنْ عن سنة أنت سِـرْتَها + و أول راضٍ سـنة من يَسيرها

অর্থঃ (হে আবু যুওয়াইব! প্রেমিকার নিকট প্রেরিত দূত হিসাবে বিশ্বাসঘাতকতার) যে রীতি তুমি চালু করেছিলে, সেই রীতি অনুযায়ী (আজ আমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য) তুমি পেরেশান হয়োনা। কারণ যে ব্যক্তি এই রীতি চালু করেছে, সে প্রথমেই এতে রাযী ছিল।'

(খ) মু'আল্লাক্বা খ্যাত কবি লাবীদ বিন রাবী'আহ আল-'আমেরী বলেন,[৩৮]

مِـنْ مـعشـرٍ سـنـت لـهـم آباءهـم + ولكل قوم سـنـة و إمـامـهـا

অর্থ ঃ (আমার প্রশংসিত গোত্রনেতার এটা কেবল ব্যক্তিগত গুণ নয় বরং) তিনি এমন এক বংশধারা থেকে এসেছেন, যাদের বাপ-দাদারা এই (সুন্দর) রীতি চালু করেছিলেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক গোত্রেরই নিজস্ব রীতি ও তার প্রচলনকারী রয়েছে।'

(গ) ইসলামী যুগে 'সুন্নাহ্'র ব্যবহার আভিধানিক অর্থেঃ যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবি হাস্সান বিন ছাবিত আনছারী (মৃঃ ৫৪ হিঃ) বানু তামীমের জওয়াবে নবী বংশের প্রশংসায় বলেন,[৩৯]

إنّ الذوائبَ من فهر وإخوتهم + قد بيّنوا سنةً للناس تتبع

অর্থঃ নিশ্চয়ই (আরব) নেতৃবৃন্দ ফিহ্র ও তার ভাইদের (অর্থাৎ কুরাইশদের) বংশধর। তারা লোকদের জন্য নীতি-নিয়ম চালু করেছেন, যা অনুসৃত হয়ে থাকে।'

(ঘ) উমাইয়া যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ফারাযদাক্ব বলেন,[৪০]

فجاء بسنة العُمَرين فيها + شفاءٌ للصدور من السقام

অর্থঃ তিনি এলেন দুই ওমরের রীতির অনুসরণে। যা ছিল সকল রোগ হ'তে হৃদয়ের আরোগ্য স্বরূপ।'

২. কুরআনে 'সুন্নাহ্' শব্দের ব্যবহার আভিধানিক অর্থেঃ

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلاً-

অর্থঃ আমাদের রাসূলগণের মধ্যে আপনার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল এবং আপনি আমাদের নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না।[৪১]

৩. হাদীছে 'সুন্নাহ্' শব্দের ব্যবহার আভিধানিক অর্থেঃ

عن ابن عباس (رض) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أبغضُ الناسِ إلى اللّه ثلثةٌ مُلْحِدٌ فى الحرم و مُبْتَغٍ فى الاسلام سنةَ الجا هليةِ ومُطَّلِبُ دم امْرِءٍ بغير حق لِيُهْرِيْقَ دَمَه ، رواه البخارى فى كتاب الديات -

অর্থঃ আল্লাহ্র সর্বাপেক্ষা ক্রোধের শিকার হ'ল তিনধরনের লোক। ১- হরম শরীফের মধ্যে সীমা লংঘনকারী ২- ইসলামের মধ্যে জাহেলিয়াতের রীতি প্রবর্তনকারী ৩- হক ব্যতিরেকে মানুষের রক্ত প্রবাহিতকারী।[৪২]

আরও দেখা যায় যে, ইসলামী পরিভাষায় 'সুন্নাহ্' বলতে সাধারণতঃ 'সুন্নাতে নববী' বুঝানো হয়- যখন শরীয়ত বিষয়ক কোন কাজ রাসূলের দিকে সম্পর্কিত করা হয়। এটি শাফেঈর বহু পূর্বে নবীযুগ হ'তেই প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

١- تَرَكْتُ فيكم أمرين لن تَضِلُّوا ما مسَّكتم بهما كتابَ اللّٰهِ وسنةَ نبيهِ رواه مالك في الموطا-

(১) 'আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবেনা যতদিন ঐ দু'টি বস্তুকে কঠিনভাবে আঁকড়ে থাক্‌বে। (ক) আল্লাহ্‌র কিতাব ও (খ) তাঁর নবীর সুন্নাত।'[৪৩]

٢- إن الدينَ بَدَأ غريبا و سيعودُ كما بدأ فطوبىٰ للغرباءِ ، و هُمُ الذين يُصْلِحُون ما أفسدّ الناسُ من بعدى من سنتى رواه أحمد عن ابن مسعود بإسناد صحيح كما قاله الألبانى -

(২) '....... দ্বীন নিঃসঙ্গ প্রবাসীর ন্যায় যাত্রা শুরু করেছিল। পুনরায় সে তার শুরুর অবস্থায় ফিরে আসবে। অতএব সুসংবাদ সেই নিঃসঙ্গ লোকগুলির জন্য যারা আমার মৃত্যুর পরে লোকদের দ্বারা বিনষ্ট সুন্নাতগুলিকে পুনঃসংস্কারে ব্রতী হবে।'[৪৪]

٣- عن أنس قال جاء ثلاثةُ رَهْطٍ إلى أزواج النبى صلى الله عليه و سلم يَسْألون عن عبادةِ النبيِّ صلى الله عليه و سلم ، فلمّا أُخْبِرُوا بها كأنهم تَقَالُّوها ... فجاء النبىُّ صلى الله عليه وسلم إليهم فقال .. أمَا واللّٰه إنِّى لأخشاكم للّٰهِ وأتقاكم له لكنى أصومُ وأَفْطُرُ و أُصَلِّى و أَرْقُدُ و أتزوَّجُ النساءَ ، فمن رَغِبَ عن سنتى فليس منى » متفق عليه -

(৩) '.... যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়।'[৪৫]

٤- عن ابن عمرَ قال ... أفرسولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أحَقُّ أن يُتَّبَعَ سنتُه أم سنةُ عمرَ؟

(৪) সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি ও রাসূলের (ছাঃ) সুন্নাত অনুযায়ী আবদুল্লাহ বিন উমার (হিঃ পূর্ব ১০- হিঃ ৭৪) তামাত্তু হজ্জের অনুমতি দিতেন। কিন্তু উমার ফারূক (হিঃ পূঃ ৪০- হিঃ ২৩) এটা নিষেধ করতেন। লোকেরা ইবনে উমারকে বলল 'আপনি কিভাবে আপনার

পিতার বিরোধিতা করেন?' ইবনে উমার বললেন 'তোমাদের ধ্বংস হৌক, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় পাও না? যদি ওমর এটা বলে থাকেন- তবে তা ভাল উদ্দেশ্যেই বলেছেন। এর দ্বারা তিনি উম্‌রাহ পূর্ণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তোমরা কেন সেজন্য তামাত্তু হজ্জকে হারাম করে দিচ্ছ? অথচ আল্লাহ সেটাকে হালাল করেছেন এবং রাসূলুলাহ (ছাঃ) তার উপরে আমল করেছেন। তাহ'লে রাসূলের সুন্নাত তোমাদের নিকট অধিক অনুসরণযোগ্য না ওমরের সুন্নাত?'[৪৬] এখানে 'রাসূলের সুন্নাত' কথাটি পারিভাষিক অর্থে এবং 'ওমরের সুন্নাত' কথাটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে 'সুন্নাহ্' কথাটি তার আভিধানিক অর্থে প্রাচীন ও ইসলামী যুগে সমভাবে প্রচলিত থাকলেও ইসলামী পরিভাষায় 'সুন্নাহ্' বলতে সাধারণতঃ সুন্নাতে নববীকে বুঝানো হ'য়ে থাকে। এটি শাফেঈর সৃষ্ট নয় কিংবা শাখ্‌তের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'পূর্বদৃষ্টান্ত' ও মার্গোলিয়থের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'সামাজিক প্রথা' নয়।

খবরঃ (الخبر لغة و شرعا) 'খবর' অর্থ সংবাদ।[৪৭] মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় হাদীছ ও খবর একই অর্থে প্রচলিত।[৪৮] হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে 'হাদ্দাছানা' ও 'আখ্‌বারানা' দু'টি পরিভাষা সমভাবে চালু আছে।[৪৯] অনেকে 'হাদীছ'কে খাছ করেছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'ঈনে এযামের (কথা, কর্ম ও সম্মতির) সঙ্গে এবং 'খবর'-কে খাছ করেছেন ঐতিহাসিক বিষয়সমূহের সঙ্গে। সেকারণে হাদীছ ও সুন্নাহ্ বিষয়ে অভিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকে 'মুহাদ্দিছ' এবং ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে 'আখবারী' বলা হয়।[৫০] ইবনু হাজার (৭৭৩-৮৫২) বলেন যে, বিশেষজ্ঞদের নিকটে 'খবর' হাদীছেরই প্রতিশব্দ।[৫১]

আছারঃ (الأثر لغة و شرعا) 'আছার' অর্থ চিহ্ন, ঐতিহ্য,[৫২] যা বিগতদের নিকট হ'তে বর্ণিত।[৫৩] ইবনু হাজার 'মাওকূফ' ও মাক্‌তূ (যে সকল হাদীছ যথাক্রমে ছাহাবী ও তাবেঈ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ) হাদীছকে 'আছার' বলেন।[৫৪] অনেকে 'আছার'-কে ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের উক্তি ও আচরণের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। আলবানী এটাকে উত্তম বলেছেন।[৫৫] ইবনুছ ছালাহ (৫৭৭-৬৪৩) বলেন যে, খোরাসানী পণ্ডিতগণ 'মাওকূফ' হাদীছকে 'আছার' ও মারফূ (যে সকল কথা ও কাজ সরাসরি রাসূলের সঙ্গে সম্পর্কিত) হাদীছকে 'খবর' বলে থাকেন।[৫৬] নববী (৬৩১-৬৭৬)-এর মতে (মারফূ, মাওকূফ, মাক্‌তূ) সকল প্রকারের হাদীছই মুহাদ্দিছ গণের নিকট 'আছার' নামে অভিহিত হয়ে থাকে।[৫৭]

যেমন أثرت الحديث 'আমি হাদীছ বর্ণনা করেছি।' এজন্য মুহাদ্দিছগণকে 'আছারী' (أثرى) বলা হয়।[৫৮]

হাদীছ, সুন্নাহ, খবর ও আছার- হাদীছ শাস্ত্রে বহুল প্রচলিত এই চারটি পরিভাষা আলোচনা শেষে একথা বলা চলে যে, এগুলির মধ্যে আভিধানিক অর্থে কিছু কিছু পার্থক্য থাক্‌লেও সকল পরিভাষাকেই হাদীছ বিশারদগণ 'ইখ্‌বার' ও 'তাহ্‌দীছ' তথা খবর দেওয়া ও বর্ণনা করা অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন নাসাঈ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থকে 'সুনান' বলা হয়েছে।

অমনিভাবে তাহাভী (২৩৭-৩২১)-এর 'মুশকিলুল আছার' 'শারহু মা'আনিল আছার' সাখাভীর (৮৩১-৯০২) 'তাহযীবুল আছার' প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থকে 'আছার' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে খবরে ওয়াহিদ, খবরে মুতাওয়াতির প্রভৃতি হাদীছের শ্রেণী বিভাগ সমূহ।

তবুও অনেক পণ্ডিত হাদীছ ও সুন্নাহ্‌র ব্যবহারগত পার্থক্য দেখাতে চেয়েছেন। যেমন আবদুর রহমান বিন মাহ্‌দী (১৩৫-১৯৮) বলেন, সুফিয়ান ছওরী (৯৭-১৬১) হাদীছের ইমাম, আওযা'ঈ (৮৮-১৫৭) সুন্নাহ্‌র ইমাম এবং মালেক (৯৩-১৭৯) হাদীছ ও সুন্নাহ্ উভয়ের ইমাম।[৫৯]

আসলে এগুলি শাব্দিক পার্থক্য বৈ কিছুই নয়। কেননা হাদীছ ও সুন্নাহ্‌র বিষয়বস্তু এক এবং সবকিছুই হাদীছ-এর মাধ্যমে শাব্দিক রূপ লাভ করেছে। সে কারণে আমরা জম্‌হুর মুহাদ্দেছীনে কেরামের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করে বলতে পারি যে, হাদীছ, সুন্নাহ, খবর ও আছার- এ চারটি শব্দের মধ্যে আভিধানিক অর্থে কিছু পার্থক্য থাক্‌লেও পারিভাষিক ও প্রায়োগিক অর্থে কোন পার্থক্য নেই। বরং সবগুলিই হাদীছের অর্থ প্রকাশ করে থাকে। তবে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, হাদীছ কথাটি পারিভাষিক দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে নির্দেশ করার জন্য মুসলিম মনীষীদের দ্বারা নির্দিষ্ট হ'লেও হাদীছ যখন কর্মে বাস্তবায়িত হয়, তখন তা সুন্নাত-এর আকার ধারণ করে। সেকারণ আহলুল হাদীছ ও আহ্‌লুস্ সুন্নাহ বাস্তবে একই অর্থ প্রকাশ করে। পরবর্তী অধ্যায়ে আহ্‌লুর রায়-এর বিপরীতে আহ্‌লুল হাদীছের নামকরণ ও পরিচিতি সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করব।

টীকাসমূহ-১

১. ফারসী সম্বন্ধপদে 'আহলে রায়' অর্থ জ্ঞানী, 'আহ্‌লে বায়েত' অর্থ ঘরের বাশিন্দা----------- (أهل رائے ، دانشمند ، عقلمند - فارسي تركيب) দ্রষ্টব্যঃ মুহায্‌যাবুল লুগাত- উর্দূ, (লাক্ষ্ণৌ-হিন্দঃ মুদ্রণকাল উল্লেখ নেই) ১ম খণ্ড পৃঃ ৪২৯।

২. ক. প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে, ইন্‌জীলের অনুসারীদেরকে কুরআনে 'আহ্‌লুল ইন্‌জীল' বলা হয়েছে (মায়েদাহ ৪৭, - وَ لْيَحْكُمْ أهلُ الإنجيل بما أنزَلَ اللّٰهُ فيه)

খ. 'আহলুল ইসলাম' অর্থ ইসলাম কবুলকারী বা অনুসারী।-দ্রঃ ইবনু মানযুর আফরিকী মিসরী 'লিসানুল আরব' (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, মুদ্রণকাল উল্লেখ নেই), ১১শ খণ্ড 'লাম' অধ্যায় পৃঃ ২৮।

গ. 'আহ্‌লুল মায্‌হাব' একই মাযহাবের অনুসারী।-দ্রঃ আহমাদ বিন ফারিস বিন যাকারিয়া, 'মু'জামু মিক্বইয়াসিল লুগাহ্‌' তাহকীকঃ আবদুস সালাম মুহাম্মদ হারূণ (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র ১৩৯৯ হিঃ / ১৯৭৯ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫০।

ঘ. 'আহ্‌ল' ও 'আছহাব' একই অর্থে ব্যবহৃত হয় (أهل الشيئ أى أصحابه) কোন বস্তুর মালিক বা সাথী। 'আহ্‌ল' একবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। -ডঃ ইব্রাহীম আনীস, 'আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব' (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, মুদ্রণকাল উল্লেখ নেই) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩১; 'লিসানুল আরব' ১১শ খণ্ড পৃঃ ২৮।

৩. ক. কুরআনে কুরআনকে 'হাদীছ' নামে আখ্যায়িত করার উদাহরণঃ

১ - নিসা ৭৮ (فَمَا لِهٰؤُلَآءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا)

২ - নিসা ৮৭ (وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا)

৩ - আ'রাফ ১৮৫ (فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ)

৪ - ইউসুফ ১১১ (مَا كَانَ حَدِيْثًا يُفْتَرَى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْئٍ ،)

৫ - কাহাফ ৬ (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلٰى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَسَفًا)

৬ - ত্বাহা ৯ (وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى)

৭ - যুমার ২৩ (اللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا)

৮ - জাছিয়াহ ৬ (فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَ آيَاتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ)

৯ - তূর ৩৪ (فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِثْلِهٖ إِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ)

১০ - নাজম ৫৯ (أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ تَعْجَبُوْنَ ؟)

১১-ওয়াক্বি'আহ ৮১ (أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُوْنَ ؟)

১২ - ক্বলম ৪৪ (فَذَرْنِيْ وَ مَنْ يُكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ؟)

১৩ - মুরসালাত ৫০ (فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ؟)

১৪ - গাশিয়াহ ১ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ؟)
মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী সংকলিত 'আল-মু'জামুল মুফাহ্‌রিস' (বৈরুত ঃ দারুল জীল, ১৪০৭/১৯৮৭) পৃঃ ১৯৫।

খ. হাদীছে কুরআনকে 'হাদীছ' নামেঃ যেমন জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন (أمابعد فإنَّ خَيْرَ الحديث كتابُ الله) মুসলিম, মিশকাতুল মাছাবীহ (দিল্লী ঃ আছাহ্‌হুল মাতাবে প্রেস, ১৩৫০/১৯৩২ খৃঃ) 'আল-ইতিছাম বিল কিতাবে ওয়াস্ সুন্নাহ্' অধ্যায়, পৃঃ ২৭; ঐ (বৈরুতঃ আল-মাক্‌তাবুল ইসলামী ১৪০৫/১৯৮৫, তাহকীকঃ নাছিরুদ্দীন আলবানী) ১ম খণ্ড পৃঃ ৫১।

গ. হাদীছে হাদীছকে 'হাদীছ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন- আবু হুরায়রাহ (রাঃ) প্রমুখাত বর্ণিত -

(أنه قال قلتُ يا رسولَ اللّٰه مَنْ أسْعَدُ النّاس بشَفَاعَتِكَ يومَ القيامة فقال لقد ظننتُ يا أبا هريرة َ أنْ لايَسْأَلُني عن هذا الحديث أحَدٌ أوّلَ منكَ لمَا رأيتُ مِنْ حِرْصِكَ علي الحديث، أسعدُ الناسِ بشفاعتي يومَ القيامةِ مَنْ قال لَآ إله الا اللّٰهُ خالصًا من قِبَلِ نفسِهِ)

ছহীহ বুখারী (মীরাটঃ হাশেমী প্রেস ১৩২৮হিঃ) কিতাবুর রিক্বাক্ব 'ছিফাতুল জান্নাতে ওয়ান্ নার' অধ্যায়, ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৭২; ছহীহ বুখারী (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ, অফসেট ছাপা) ৭ম খণ্ড পৃঃ ২০৪।

8. AHL-I-HADITH: .... They do not hold themselves bound by "Taklid" .... but consider themselves free to seek guidance in matters of religious faith and practices from the authentic traditions, which together with the Quran are in their view the only worthy guide for true muslims. H.A.R. Gibb & others, Encyclopedia of Islam (Leiden: E. J. Brill, 1960) Vol. I. P. 259.

৫. (حَدَثَ.. هو كون الشيء لم يكن) আবুল হাসান আহমাদ বিন ফারিস বিন যাকারিয়া, 'মু'জামু মিক্বইয়াসিল লুগাহ' তাহকীকঃ আবদুস সালাম মুহাম্মাদ হারূণ (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র ১৩৯৯/১৯৭৯) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১।

৬. (و شرُّالأمور مُحْدَثَاتُهَا و كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ) মুসলিম, মিশকাতুল মাছাবীহ, 'আল- ই'তিছাম বিল্ কিতাবে ওয়াস্ সুন্নাহ্' অধ্যায়, (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫ খৃঃ) ১ম খন্ড পৃঃ ৫১।

৭. ক. (و الحديث من هذا لانه كلامٌ يَحْدُثُ منه الشيءُ) ৫নং টীকা দ্রষ্টব্য।

খ. (و اما الحديث فهو في اللغة الكلام الذى يتحدث به و ينقل بالصوت والكتابة) নাছিরুদ্দীন আলবানী, 'আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন' ১ম সংস্করণ (দারুস সালাফিইয়াহ, কুয়েতঃ ১৪০৬/১৯৮৬) পৃঃ ১৫।

০ আলবানী (জন্মঃ ১৯১৩ খ্রীঃ) মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী দামেস্কী সিরিয়ার জামা'আতে

আহ্‌লেহাদীছের আমীর। ১৯২২ সালে পিতা খ্যাতনামা হানাফী আলেম নূহ বিন আদমের সাথে ইউরোপের আলবেনিয়া হ'তে সিরিয়ায় হিজরত করেন। '৬০-এর দশকে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শায়খুল হাদীছ' ছিলেন। তিনি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও রিজালশাস্ত্রবিদ। ইতিমধ্যেই তাঁর প্রকাশিত ৩৭ খানা বৃহদাকার হাদীছ বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থ সুধীসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর লেখনী এখনও অব্যাহত রয়েছে। -সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম (লাহোর ১৫শ বর্ষ ২৩ সংখ্যা) ৩রা জানুয়ারী ১৯৬৪ সাল।

৮. ক. (الحديث هو إسم من التحديث و هو الإخبار) ডঃ ছুবহী ছালেহ, 'উলূমুল হাদীছ' ২য় সংস্করণ (দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়, দামেস্কঃ ১৩৮৩/১৯৬৩) পৃঃ ৩।

খ. (الحديث الجديد و الخبر) বুত্বরুস আল-বুসতানী, 'কুত্বরুল মুহীত্ব' (বৈরুতঃ মাকতাবা লুবনান, ১৯৬৯ সালের ছাপা হতে ফটোকৃত) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬৮।

গ. HADITH: Narrative, Talk, Encylopaedia of Islam (Leiden : E. J. Brill, 1971), Vol. III, P. 23.

ঘ. HADIS : Narratives, Encyclopaedia Americana (Newyork, 1949) Vol. XIII, P. 609.

ঙ. (الحديث نقيض القديم) লিসানুল আরব ২য় খণ্ড পৃঃ ১৩১।

৯. ক. ৮(ক) নং টীকা পৃঃ ৩। খ. ফাদার লুইস মালূফ, 'আল-মুনজিদ' আরবী-উর্দূ অভিধান (করাচী, দারুল ইশা'আত ১৯৬৭) পৃঃ ২৩৩।

১০. (الحديث لغة الجديد و يجمع على أحاديث على خلاف القياس) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'উছূলে হাদীছ'-এর উপর লিখিত পুস্তক 'মিন আত্বইয়াবিল মুনাহ্' ৩য় সংস্করণ (মদীনাঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ১৪০০ হিজরী) পৃঃ ৬।

১১. (إعلم أن الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبى و فعله و تقريره) শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী, 'মিশকাতুল মাছাবীহ'-এর মুকাদ্দামা পৃঃ ১।

০ **আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী** হানাফী (৯৫৮-১০৫২ হিঃ/১৫৫১-১৬৪২ খৃঃ) -এর পিতা সম্রাট আকবরের সময়ের (৯৬৪-১০১৪/১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) কিছু পূর্বে তুরস্ক হ'তে দিল্লীতে এসে বসবাস শুরু করেন। শায়খ আবদুল হক দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মিশকাতের আরবী ভাষ্য 'লাম'আত', ফারসী ভাষ্য 'আশি'আতুল লাম'আত', শারহু সিফ্‌রিস সা'আদাত' ও রাসূলের জীবনী 'মাদারিজুন নবুআত' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। -মুহাম্মদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী 'তারীখে আহলে হাদীছ' (ওখ্‌লা, নয়াদিল্লীঃ মাকতাবা তাওহীদ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩) পৃঃ ৩৯৬।

১২. (قال الطيبى : الحديث أعم من أن يكونَ قولُ النبى صلى الله عليه و سلم و الصحابى و التابعى و فعلُهم و تقريرُهم) ০ **ত্বীবীঃ শারফুদ্দীন** হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ত্বীবী (মৃঃ ৭৪৩ হিঃ)। তিনি দার্শনিক ও বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। তিনি

যামাখ্‌শারীর (৪৬৭-৫৩৮) তাফসীর 'কাশ্‌শাফ'-এর ভাষ্য লেখেন ও তাঁর ভ্রান্ত আকীদাসমূহ খণ্ডন করেন। তিনি 'মিশকাত'-এর ভাষ্য লেখেন। -মিরক্বাত-এর টীকা সংখ্যা ১০১, লেখকঃ আবদুল হালীম (দিল্লীঃ কুতুবখানা ইশা'আতুল ইসলাম, চুড়িওয়ালাঁ, দিল্লী-৬, তারিখবিহীন) ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৩-৭৫।

১৩. (قال ابن حجر فی شرح البخاری : المراد بالحدیث فی عرف الشرع ما یضاف الی النبی صلی الله علیه وسلم و کأنه ارید به مقابلة القران لانه قدیم)

০ **ইবনু হাজারঃ** শিহাবুদ্দীন আবুল ফযল আহমদ বিন আলী .... ইবনুহাজার আস্‌ক্বালানী শাফেঈ (৭৭৩-৮৫২) মিসরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। সাহিত্যে ও কবিতায় বিশেষ পারদর্শিতা থাক্‌লেও হাদীছশাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্যের জন্য তিনি জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। 'তাহ্‌যীবুত্‌ তাহযীব' 'তাক্বরীবুত তাহযীব' 'আল-ইছাবাহ' সহ শতাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছাড়াও ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ বিশ্বস্ত ও বিশ্ববিশ্রুত ভাষ্যগ্রন্থ 'মুকাদ্দামা' খণ্ড বাদে বৃহদায়তন তেরটি খণ্ডে সমাপ্ত 'ফাৎহুল বারী' তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি। -সৈয়ূতী, জীবনীগ্রন্থ 'তাবাক্বাতুল হুফ্‌ফায' তাহকীকঃ আলী মুহাম্মাদ ওমর (কায়রোঃ মাকতাবা ওয়াহ্‌বাহ্‌ ১ম সংস্করণ ১৩৯৩/১৯৭৩) পৃঃ ৫৪৭-৪৮।

উল্লেখ্য যে, ১২ ও ১৩ নং টীকা দু'টি সৈয়ূতী, 'তাদরীবুর রাবী' হ'তে গৃহীত। তাহকীকঃ আবদুল ওয়াহ্‌হাব আবদুল লতীফ (মদীনাঃ আল-মাকতাবাতুল ইল্‌মিয়াহ ১৩৭৯/১৯৫৯) পৃঃ ৬।

০ **সৈয়ূতীঃ** জালালুদ্দীন আবদুর রহমান বিন আবুবকর আস-সৈয়ূতী শাফেঈ (৮৪৯-৯১১) বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। প্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ 'জালালায়েন'- এর প্রথমাংশ সূরায়ে বাক্বারাহ্‌র শুরু হ'তে সূরায়ে ইস্‌রা-র শেষ পর্যন্ত ভাষ্যকার ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ছয় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। - সৈয়ূতী, 'তাবাক্বাতুল হুফ্‌ফায'-এর ভূমিকা পৃঃ ১০-১৪, লেখক- আলী মুহাম্মাদ ওমর।

১৪. (ক) الحديث في الإصطلاح يرادف السنة عند المحدثين و يراد بهما كل ما أثر عن رسول الله (ص) قبل البعثة و بعدها و غالبا يراد به ما يروى عن الرسول (ص) بعد النبوة من قول او فعل او تقرير و السنة عند علماء الحديث هى كل ما أثر عن الرسول (ص) من قول او فعل او تقرير او صفة خَلْقية او خُلُقية او سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة كتحنثه فى غار حراء ام بعدها ، والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث-

দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদের প্রাক্তন অধিকর্তা (ডীন) অধ্যাপক ডক্টর উজাজ আল-খাত্বীব, 'আল-মুখ্‌তাছারুল ওয়াজীয'। (বৈরুতঃ মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ ১৪০৫/১৯৮৫) পৃঃ ১৯, ১৬।

(খ) ডক্টর মুছতফা সাবাঈ-এর ডক্টরেট থিসিস (আযহার ১৯৪৯) 'আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতু-হা' (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী ২য় সংস্করণ ১৩৯৬/১৯৭৬) পৃঃ ৪৭।

(গ) রিয়ায বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছতফা আল-আ'যমীর ডক্টরেট থিসিস

(কেমব্রিজ ১৯৬৬) 'দিরাসাত ফিল হাদীছ' (রিয়ায বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, মুদ্রণকাল নেই) পৃঃ ১।

১৫. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, 'মাজমূ'উল ফাতাওয়া' সংকলকঃ আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম নাজ্দী (মক্কাঃ মাকতাবা নাহ্যাতুল হাদীছাহ, মুদ্রণ- কায়রো ১৪০৪ হিঃ) ১৮শ খণ্ড (হাদীছ), পৃঃ ১০-১১।

০ **ইবনু তায়মিয়াহঃ** তাক্বীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আবদুল হালীম বিন আবদুস সালাম বিন আবদুল্লাহ .... ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) মূলতঃ হাররানের এবং পরে দামেস্কের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা ও দাদা ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ,মুফতী ও মুজতাহিদ। তাঁদের নিকটেই তাঁর ইল্মের হাতে খড়ি হয়। বিশ বছর বয়স হওয়ার পূর্বেই তিনি ফৎওয়া দেওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হন এবং একুশ বছর বয়সে তিনি 'দারুল হাদীছ' শিক্ষায়তনে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ইবনু তায়মিয়াহ তাফসীর, হাদীছ, ফিক্হ, উছূলে ফিক্হ, গণিত, এলজাবরা, ফারায়েয, কালামশাস্ত্র সহ সে যুগের সকল বিদ্যায় সমকালীন মুসলিম বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, ইবনু তায়মিয়াহ যে হাদীছ জানেন না, সেটি হাদীছ-ই নয়। যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮) বলেন যে, ফাৎওয়া দেওয়ার ব্যাপারে তিনি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করতেন না। বরং সর্বদা অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে ফৎওয়া দিতেন। একজন মুজতাহিদ হওয়ার যোগ্যতা তাঁর ছিল। তাঁকে বিচারপতির পদ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ৭১২ হিজরীতে তিনি তাতারী হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সিরীয় সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধে গমন করেন।

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। বড় বড় তিন শতাধিক (খণ্ডে বিভক্ত) কিতাবসমূহ ছাড়াও তাঁর রয়েছে অসংখ্য রেসালাহ ও ফৎওয়া। মিনহাজুস সুন্নাহ, আর-রাদ্দু আলাল মান্তেক্বিইঈন, ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুসতাক্বীম, আস-সিয়াসাতুশ শার'ইইয়াহ প্রভৃতি গ্রন্থ ছাড়াও সম্প্রতি সউদী আরব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর বৃহদায়তন ফাতাওয়া সংকলন 'মাজমূ'উল ফাতাওয়া' ইবনু তায়মিয়াহ্র বিশ্বখ্যাতি তুঙ্গে এনে দিয়েছে।

তাঁর সংস্কারধর্মী তৎপরতায় ক্ষুব্ধ আলেম সমাজের চক্রান্তে আট বারে মোট সাত বৎসর ইবনু তায়মিয়াহ্কে জেলখানায় কাটাতে হয়। সেখানে বসে তিনি ১৯ খণ্ডে মোট পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। জেলখানায় ছোট ভাই যয়নুদ্দীন আবদুর রহমান তাঁকে দেখাশুনা করতেন এবং শেষবারে তিনি ভাইয়ের সঙ্গে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। কবর পূজার বিরুদ্ধে লেখায় হিংসুক আলেমদের চক্রান্তে শেষবারে তাঁকে আড়াই বছরের জেল দেওয়া হয় এবং সেখানে অবশেষে তাঁকে দোয়াত কলম হ'তেও বঞ্চিত করা হয়। এরপরেই তিনি অসুখে পড়েন এবং বিশ দিন পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দু'ভাই ৮০ বার কুরআন খতম করেন। ৮১ বারে ২৭ পারায় সূরায়ে 'ক্বামার' শেষ হ'লে ইমাম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ইন্না লিল্লাহি .... কুরআন ও সুন্নাহ্র অকুতোভয় সিপাহ্সালার, কপর্দকহীন চিরকুমার, যুগস্রষ্টা মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ, মর্দে মুজাহিদ ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্র মৃত্যুতে সারা দেশ শোকে

ভেঙ্গে পড়ে। সুদূর ইয়ামন ও চীনদেশেও তাঁর গায়েবানা জানাযার খবর পাওয়া যায়। দু'লক্ষ শোকাতুর পুরুষ ও পনর হাযার মহিলা ইমামের জানাযায় শরীক হন। দামেস্কের 'সূফীদের গোরস্থানে' স্বীয় ভাই শারফুদ্দীন আবদুল্লাহর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। -ইবনু রাজাব, 'কিতাবুয্ যায়েল আলা তাবাক্বাতিল হানাবিলাহ' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ১৩৭২/১৯৪৩) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৮৭-৪০৮; সৈয়ূতী, 'তাবাক্বাতুল হুফ্ফায পৃঃ ৫১৬-১৭; দাউদী (মৃঃ ৯৪৫ হিঃ), 'তাবাক্বাতুল মুফাস্সিরীন'(কায়রোঃ মাকতাবা ওয়াহ্বাহ্ ১৩৯২/১৯৭২, তাহকীকঃ আলী মুহাম্মাদ ওমর) ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৫-৪৯; ছালাহুদ্দীন, দা'ওয়াতু শায়খিল ইসলাম (জোগাবাঈ-নয়াদিল্লীঃ ১ম সংস্করণ ১৯৯২) পৃঃ ২৭-৩৪।

১৬. ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭. রাযী, 'তাফসীরুল কাবীর' (মিসরঃ বাহিইয়াহ্ প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৩/১৯৩৪) ২৬শ খণ্ড পৃঃ ২৬৭।

o **রাযীঃ** আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ওমর আল-ফাখ্র রাযী (৫৪৪-৬০৬) মূলতঃ তাবারিস্তানের ও পরে 'রায' শহরের অধিবাসী ছিলেন। পিতা যিয়াউদ্দীন ওমর ছিলেন 'রায' শহরের বিচারপতি ও খতীব। অপ্রতিদ্বন্দ্বী কালামশাস্ত্রবিদ, আশ'আরী দার্শনিক ও মুফাস্সির ইমাম রাযী ৩২ খণ্ডে সমাপ্ত স্বীয় বৃহদায়তন তাফসীর গ্রন্থ 'মাফাতীহুল গায়েব ওরফে তাফসীরুল কাবীর'-এর জন্য জগতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। কালাম শাস্ত্রের কূটতর্কে জড়িয়ে পড়ায় শেষজীবনে তিনি দারুনভাবে অনুতপ্ত হন এবং আশ'আরী মতবাদ ত্যাগ করে সালাফী আকীদায় ফিরে আসেন। ইরানের হিরাত শহরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। -দাউদী, 'তাবাক্বাতুল মুফাস্সিরীন' ২য় খণ্ড পৃঃ ২১৩-১৭; মাগরাভী, 'আল-মুফাস্সিরূন' (রিয়াযঃ দার তাইয়িবা, ১ম সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৭-৫১; রাযী, 'তাফসীরুল কাবীর'-এর ভূমিকা পৃঃ (و) ।

১৮. ইবনুল কাইয়িম, 'মুখ্তাছার ছাওয়ায়েক্বুল মুরসালাহ্'(রিয়াযঃ মাকতাবা রিয়ায আল-হাদীছাহ্, মুদ্রণকাল উল্লেখ নেই, সংক্ষেপায়নঃ মুহাম্মাদ বিন মূছেলী) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৮৬-৯৮; ইবনু তায়মিয়াহ, 'মাজমূ'উল ফাতাওয়া' ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৫২৬ ও ১৫শ খণ্ড পৃঃ ২২২।

o **ইব্নুল কাইয়িমঃ** শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর বিন আইয়ূব ... ইবনুল কাইয়িম আল্-জাওযিয়াহ (৬৯১-৭৫১) দামেস্কের অধিবাসী ছিলেন। তাফসীর, হাদীছ, ফিক্হ, উছূলে ফিক্হ, আরবী ব্যকরণ ও কালামশাস্ত্র সহ বিভিন্ন বিদ্যায় সমকালীন ইসলামী বিশ্বে শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলেন। ইবনু রাজাব (৭৩৬-৭৯৫) বলেন, 'আমি তাঁর চাইতে গভীর বিদ্যার অধিকারী এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনকারী আর কাউকে দেখিনি।' একই মতাদর্শের অনুসারী হওয়ার কারণে স্বীয় উস্তায ইবনু তায়মিয়াহ্র ন্যায় তাঁকেও কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে কয়েকবার জেল খাটতে হয়েছে। প্রাণপ্রিয় উস্তাযের শেষ কারাজীবনের তিনি স্বেচ্ছাসঙ্গী ছিলেন। বুযর্গ উস্তাদের মৃত্যুর পর তিনিই ছিলেন তাঁর ইল্মের যোগ্য উত্তরাধিকারী। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। যাদুল মা'আদ, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন, ইগাছাতুল লাহ্ফান, ছাওয়ায়েকুল মুরস-

লাহ, ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়াহ প্রভৃতি তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ। ইত্তিবায়ে সুন্নাহ্র উপরে লিখিত তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'আল-ক্বাছীদাতুন নূনিয়াহ' অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও জনপ্রিয়। মৃত্যুর পর দামেস্কের 'বাব ছাগীর' কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। -ইবনু রাজাব, 'কিতাবুয যায়েল' ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৪৪৭-৫২; দাঊদী, 'তাবাক্বাতুল মুফাস্সিরীন' ২য় খণ্ড পৃঃ ৯০-৯৩।

১৯. সূরায়ে বুরূজ ২১-২২ بَلْ هو قرآنٌ مجيدٌ، في لَوْحٍ مَحْفوظٍ-

২০. নাহ্ল ১০২ قُلْ نَزَّلَهُ روحُ القُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالحقِّ لِيُثَبِّتَ الذين امنوا و هُدًى و بُشْرٰى للمسلمين-

২১. মাওয়ার্দী, 'তাফসীরুল মাওয়ার্দী' (তাহ্কীকঃ খিযির মুহাম্মদ খিযির, সম্পাদনাঃ ডক্টর আবদুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ, কুয়েতঃ ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয় ১৪০২/১৯৮২) ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৬৬।

০ **মাওয়ার্দী** ঃ আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বিন হাবীব আল-মাওয়ার্দী শাফেঈ (৩৬৪-৪৫০) মূলতঃ বাছরী পরে বাগদাদের অধিবাসী হন। বহুদিন বিভিন্নস্থানে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। ফিক্হ, উছূলে ফিক্হ, তাফসীর, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'তাফসীরুল কুরআন' এবং রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ 'আল-আহকামুস্ সুলত্বানিয়াহ' খুবই প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ তাঁকে মু'তাযিলা বলেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। ইবনুছ ছালাহ (৫৭৭-৬৪৩) বলেন, অধিকাংশ বাছরীদের মত কেবল 'তাকদীর' সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি মু'তাযিলাদের ন্যায় মত পোষণ করতেন, অন্য কোন বিষয়ে নয়।- দাঊদী, 'তাবাক্বাতুল মুফাস্সিরীন' ১ম খণ্ড পৃঃ ৪২৩-২৫।

২২. শাওকানী, 'তাফসীর ফাৎহুল ক্বাদীর'-এর সংক্ষিপ্ত রূপঃ মুহাম্মাদ সুলায়মান আবদুল্লাহ আল-আশক্বার, 'যুব্দাতুত্ তাফসীর' (কুয়েতঃ ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয় ১৪০৬/১৯৮৫) পৃঃ ৬০৯।

০ **শাওকানীঃ** মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ শাওকানী পরে ছান'আনী (১১৭২-১২৫০/১৭৫৮-১৮৩৫) ইয়ামনের ছান্'আ শহরে জন্ম ও ইয়ামনের বিচারপতি ছিলেন। বাহ্রায়নের 'শাওকান' নামক শহরের দিকে পিতৃপুরুষের সম্বন্ধ থাকায় তিনি 'শাওকানী' নামে পরিচিত। তাকলীদ পন্থী পরিবারে জন্মলাভ করেও তিনি স্বাধীন চিন্তার অধিকারী সালাফী মুজতাহিদ হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ফিক্হ, উছূলে ফিক্হ ছাড়াও সমসাময়িক কালে প্রচলিত গর্হিত আকীদাও রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে তাঁর বহু গ্রন্থ ও রিসালাহ্ রয়েছে। তাঁর প্রণীত তাফসীরগ্রন্থ 'ফাৎহুল ক্বাদীর', উছূলে ফিক্হের গ্রন্থ 'ইরশাদুল ফুহূল', তাকলীদ-এর বিরুদ্ধে লিখিত 'আল-ক্বাওলুল মুফীদ' এবং ফিকহুল হাদীছ-এর উপরে লিখিত 'নায়লুল আওত্বার' খুবই প্রসিদ্ধ। -নায়লুল আওতার (মিসরঃ বাবী হালবী প্রেস, ১৩৮০/১৯৬১) -এর ভূমিকায় 'বাদ্রুত্ তালে' হ'তে সংকলিত; মাগরাভী, 'আল-মুফাস্সিরূন' ২য় খণ্ড পৃঃ ২২৩।

২৩. আবুছ ছানা শিহাবুদ্দীন সাইয়িদ মুহাম্মাদ আফেন্দী বাগদাদী ওরফে আলূসী, তাফসীর 'রূহুল বায়ান' ২৩শ খন্ড (মিসরঃ ইদারাহ তাবা'আতুল মুনীরিয়াহ) পৃঃ ২৫৮।

২৪. যুমার ২৩ (اللّٰهُ نَزَّلَ أَحسنَ الحديث) শানে নুযূলঃ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একদা কয়েকজন ছাহাবী আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)-কে সর্বোত্তম বাণী সম্পর্কে অবহিত করার অনুরোধ করেন। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়। এখানে 'সর্বোত্তম হাদীছ' কথাটিকে সরাসরি আল্লাহ্‌র দিকে সম্বন্ধ করার অর্থ কুরআনের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং একথা জগদ্বাসীকে জানিয়ে দেওয়া যে, কুরআনের ন্যায় সর্বোত্তম বাণী প্রদান অন্য কারু পক্ষে সম্ভব নয়। -যামাখ্‌শারী, তাফ্‌সীর 'আল-কাশ্‌শাফ' (মিসরঃ ১৩৪৪ হিঃ) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৯৭।

০ **যামাখ্‌শারীঃ** মাহমূদ বিন উমার (৪৬৭-৫৩৮ হিঃ) ইরানের খাওয়ারিযম-এর 'যামাখ্‌শার' নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী এই বিশ্ববিশ্রুত বিদ্বান আরবী সাহিত্য ও ব্যকরণে গভীর পারদর্শী ছিলেন। ফিক্‌হের দিক দিয়ে তিনি 'হানাফী' ও আক্বীদার দিক দিয়ে 'মু'তাযিলী' ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বিশ-এর অধিক মূল্যবান গ্রন্থাবলী ছিল। 'আল-কাশ্‌শাফ' তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ। উক্ত তাফসীরে পবিত্র কুরআনের ব্যকরণ ও আলংকরিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। মু'তাযিলী আক্বীদার মিশ্রন ঘটায় মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের নিকটে এই তাফসীর তেমন কোন মর্যাদা মন্ডিত নয়। অনেক দিন যাবৎ কা'বা শরীফে অবস্থান করায় তিনি 'জারুল্লাহ' বা 'আল্লাহ্‌র প্রতিবেশী' উপাধি প্রাপ্ত হন। বরফের উপর দিয়ে চলতে গিয়ে পা ফস্‌কে পড়ে গেলে তাঁর পা কেটে ফেলতে হয়। নিজের লিখিত তাফসীর গ্রন্থের প্রশংসায় তিনি বলেন,

إن التفاسير في الدنيا بلا عدد + و ليس فيها لَعَمرى مثل كشافي

إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته + فالجهل كالداء و الكشاف كالشافي

অর্থঃ- নিশ্চয়ই দুনিয়াতে অসংখ্য তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু আমার জীবনের কসম! আমার 'কাশ্‌শাফ' -এর মত একটিও নেই। যদি তুমি হেদায়াত চাও, তাহ'লে এটি অধ্যয়ন করাকে অপরিহার্য করে নাও। কেননা মূর্খতা হ'ল রোগ ও 'কাশ্‌শাফ' হ'ল তার আরোগ্যকারী।' -দাঊদী, 'তাবাকাত' (বৈরুত ছাপা) ২য় খন্ড পৃঃ ৩১৪-১৬; যাহাবী, সিয়ার (বৈরুত ছাপা) ২০শ খন্ড পৃঃ ১৫১-৫৬।

২৫. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ শাওকানী, 'ইরশাদুল ফুহূল' (মিসরঃ বাবী হালবী ১৩৫৬/১৯৩৭) পৃঃ ৩৩।

০ **কিসাঈঃ** পারসিক বংশোদ্ভূত আবুল হাসান আলী বিন হাম্‌যাহ বিন আবদুল্লাহ কূফী আল-কিসা'ঈ (১১৯-১৮৯) পবিত্র কুরআনের খ্যাতনামা ক্বারী সপ্তকের অন্যতম। একটি মজলিসে ভাষাগত একটি ভুলের কারণে লজ্জিত হ'য়ে তিনি ব্যাকরণ (নাহু) শিখতে বদ্ধপরিকর হন এবং মু'আয আল-হাররা' ও পরে খলীল নাহ্‌ভীর শিষ্যত্ব বরণ করেন। পরবর্তীতে যুগস্রষ্টা ব্যাকরণবিদ হিসাবে আবির্ভূত হন। ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪)

বলেন, ব্যাকরণে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে গেলে তাকে কিসাঈর শিষ্য হ'তে হবে। খোরাসানের পথে খলীফা হারূণের (১৭০-১৯৩) সফরসঙ্গী থাকা অবস্থায় 'রায়' শহরের নিকটবর্তী 'আরাম্বুইয়া' গ্রামে ৭০ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। -যাহাবী, 'সিয়ার' (বৈরুতঃ মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সংস্করণ ১৪০২/১৯৮২) ৯ম খণ্ড পৃঃ ১৩১; ডঃ শাওক্বী যায়েফ, 'আল-মাদারিসুন নাহ্‌ভিয়াহ' (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ২য় সংস্করণ ১৯৭২) পৃঃ ১৭২-৭৫।

০০ খাত্তাবীঃ আবু হাফ্‌ছ ফারূক বিন আবদুল কাবীর বিন ওমর আল-বাছ্‌রী আল-খাত্তাবী (মৃঃ ৩৬১ হিঃ)।

২৬. আলবানী, 'আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন' পৃঃ ১৫।

২৭. যেমন- (سننت لكم سنة فاتبعوها إذا عملت عملا لم تستبق إليه) অর্থঃ আমি তোমাদের জন্য একটি রীতি চালু করেছি, তোমরা তা অনুসরণ কর (একথা ঐ সময় বলা হয়) যখন তুমি এমন কোন কাজ কর, যা তোমার পূর্বে কেউ করেনি এবং তুমি আশা কর যে, অন্যেরা তোমার ঐ কাজের অনুসরণ করুক।' -ডক্টর উজাজ আল-খাত্বীব, 'আল-মুখতাছার' পৃঃ ১৫।

২৮. Sunnite: The Sunnite is the follower of the Sunnah (Form, outline, mode, usage), or the view and usage of the Prophet.... The Sunnah of the Prophet would be found embodied in a tradition (hadith). Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 12, P. 114. Edited by James Hastings. Printed in Great Britain by MORRISON & GIBB Limited. N.D.

২৯. আমেদী বলেন, (السنة في الشرع.. تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو.. و يدخل في ذلك أقوال النبي (ص) و أفعاله و تقاريره) সায়ফুদ্দীন আমেদী, 'আল-ইহকাম' (মুদ্রণস্থান ও প্রেসের নাম বিহীন ১৩৮৭/১৯৬৮) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫৬।

০ **আমেদীঃ** সায়ফুদ্দীন আবুল হাসান আলী বিন আবু আলী বিন মুহাম্মাদ হাম্বলী শাফেঈ (৫৫১-৬৩১ হিঃ) সিরিয়ার 'আমিদ' শহরে জন্ম ও দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রণীত সর্বমোট ২০ খানা মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে 'আল-ইহকাম' সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ। -১ম খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩০. ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যায় বলেন, (هي ما صدر منه صلى الله عليه و سلم من الأفعال و الأقوال التي ليست بالإعجاز (اى القران) শাত্বেবী স্বীয় 'মুওয়াফিক্বাত' গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড ৩য় পৃষ্টায়) ইবনু তায়মিয়াহ্‌র এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

৩১. ইমাম আবু ইসহাক শাত্বেবী (মৃঃ ৭৯০ হিঃ) সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যায় বলেন, (يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن النبي (ص) على الخصوص مما لم ينصّ عليه في الكتاب العزيز بل إنما نصّ عليه من جهته عليه السلام كان بيانا لما في الكتاب او لا) শাত্বেবী, 'আল-মুওয়াফিক্বাত' তাহকীকঃ মুহাম্মাদ আবদুলাহ দারায (মিসরঃ মাকতাবা তিজারিয়াহ

কুব্‌রা, ২য় সংস্করণ ১৩৯৫/১৯৭৫) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩।

৩২. (ক) নাছিরুদ্দীন আলবানী সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যায় বলেন, (السنة فى الإصطلاح هى ما صدر عن النبى(ص) من قول او فعل او تقرير مما يراد به التشريع للأمة ، فيخرج بذلك ما صدر عنه (ص) من الأمور الدنيوية و الجبلية التى لا دخل لها بالأمور الدينية و لا صلة لها بالوحى) আলবানী, 'আল-হাদীছু হুজ্‌জিয়াতুন' পৃঃ ১৫।

(খ) Tradition is the raw materials. The custom the finished product, the Ideal of the believer. A. S. Triton, ISLAM BELIEF AND PRACTICES (Hutchinson's University Library, 1951) P. 31.

৩৩. ১৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৪. যেমন ডক্টর উজাজ আল-খাত্বীব উদ্ধৃত করেন- ١- السنة عند علماء الحديث هى كل ما اثر عن الرسول صلي الله عليه وسلم من قول او فعل اوتقرير ... والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث عند المحدثين - ٢ - السنة فى اصطلاح علماء اصول الفقه .. هى كل ما صدر عن النبى صلى الله عليه وسلم غير القران الكريم من قول اوفعل او تقرير مما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعى - ٣ - السنة فى اصطلاح الفقهاء هى كل ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض ولا الوا جب .. كقولهم .. طلاق السنة كذا..) - ডক্টর উজাজ, 'আল-মুখতাছার' পৃঃ ১৬-১৯।

৩৫. (ক) Joseph Schacht: ORIGINS OF MUHAMMADAN JURISPRUDENCE. (LONDON: Oxford University Press, 1959.) P. 58.

(খ) ডক্টর মুছতফা আল-আ'যমী, 'দিরাসাত' পৃঃ ৬-৯, গৃহীতঃ Margoliouth: THE EARLY DEVELOPMENT OF MUHAMMADANISM, PP. 69-70.

৩৬. ডক্টর মুস্তফা আল-আ'যমী, 'দিরাসাত' পঃ ৬; গৃহীতঃ ডক্টর আলী হাসান আবদুল কাদের (মিসর) প্রণীত 'নায্‌রাতুন আম্মাতুন ফী তারীখিল ফিক্‌হিল ইসলামী' পৃঃ ১২২-২৩।

৩৭. 'দিরাসাত ফিল হাদীছ' পৃঃ ২, গৃহীতঃ 'দীওয়ানুল হুযালিইঈন' পৃঃ ১৫৭।

৩৮. মাওলানা মুহিউদ্দীন (শিক্ষক আশরাফুল উলূম, ঢাকা কর্তৃক উর্দূ অনুবাদসহ 'সাব'আ মু'আল্লাক্বাত' এর ৪র্থ মু'আল্লাক্বা, পংক্তি সংখ্যা ৮১ (ঢাকাঃ ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার ১৯৭৫) পৃঃ ১৭৩।

০ **লাবীদ বিন রাবী'আহ আমেরী** (মৃঃ ৪১ হিঃ/৬৬১ খৃঃ)ঃ দানশীলতা, কবিত্ব ও বীরত্বে বিখ্যাত 'হাওয়াযেন' গোত্রে তাঁর জন্ম হয়। জাহেলী আরবের শ্রেষ্ঠ কবি সপ্তকের তিনি অন্যতম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর একটি কবিতা খুবই পসন্দ করতেন। যেখানে তিনি বলেছেন- (ألا كلُّ شيىءٍ ما خلا اللّهَ با طلٌ + وكلُّ نعيمٍ لا مُحالةَ زائلٌ) অর্থঃ 'আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছুই বাতিল, সকল নে'মত অবশ্যই ধ্বংসশীল'। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আর কবিতা লেখেননি। ওমর ফারূকের এক আবেদনের জওয়াবে তিনি

সূরায়ে বাক্বারাহ্র কয়েকটি আয়াত লিখে বলেন- এইগুলি আমার কবিতার আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। ১৫৭ বছর বয়সে তিনি কূফায় মারা যান। -ঐ পৃঃ ১৩৬; গোলাম সামদানী কোরায়শী, 'আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৭) পৃঃ ২৯-৩০।

৩৯. কবি হাস্সানের উক্ত ২২ লাইনের কবিতা শোনার পরপরই বনু তামীমের প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণ করে। - 'দীওয়ানু হাস্সান' (দার বৈরুতঃ ১৩৯৮/১৯৭৮) পৃঃ ১৪৫।

০ **হাস্সান বিন ছাবিত খাযরাজী** আনছারী (মৃঃ ৫৪ হিঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী ও সভাকবি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ব্যঙ্গ করে মুশরিকদের পক্ষ হ'তে যত কবিতা ছড়ানো হ'ত, তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তার জওয়াব দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন- আপনি ওদের ব্যঙ্গ করুন। আল্লাহ জিব্রীলের মাধ্যমে আপনাকে সাহায্য করবেন। জীবনের ষাট বছর তিনি জাহেলী জীবন ও বাকী ষাট বছর ইসলামী জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর কাব্য সংকলন 'দীওয়ানু হাস্সান' খুবই প্রসিদ্ধ। - যাহাবী, সিয়ার ২য় খণ্ড পৃঃ ৫১২-২৩।

৪০. দিরাসাত পৃঃ ৩, গৃহীতঃ নাক্বাইয নং ১০১৩।

০ **ফারাযদাক্বঃ** (২১-১১৪/৬৪১-৭৩৩ খৃঃ) উমাইয়া যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হাম্মাম বিন গালিব দারেমী তামীমী ওরফে 'ফারাযদাক্ব' ইরাকের বছরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সমসাময়িক কবি জারীর-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর কাব্য সংকলন 'দীওয়ান' ও 'নাক্বাইয' খুবই প্রসিদ্ধ। -আল-মুনজিদ (বৈরুতঃ দারুল মাশরিক, ২৮শ তম সংস্করণ, ১৯৮৬) পৃঃ ৪১০।

৪১. সূরায়ে বনী ইস্রাঈল ৭৭। কুরআনে 'সুন্নাহ্' শব্দের ব্যবহার আভিধানিক অর্থে মোট ১৬ জায়গায় এসেছে। যেমন ১- আনফাল ৩৮; ২- হিজ্র ১৩; ৩,৪- বনী ইস্রাঈল ৭৭,৭৭; ৫- কাহাফ ৫৫; ৬,৭,৮- আহযাব ৩৮, ৬২, ৬২; ৯,১০,১১- ফাত্বির ৪৩, ৪৩,৪৩; ১২- মু'মিন ৮৫; ১৩,১৪- ফাৎহ ২৩,২৩; ১৫- (সুনান) আলে ইমরান ১৩৭; ১৬- (সুনান) নিসা ২৬। - মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী সংকলিত 'মু'জাম' (বৈরুতঃ দারুল জীল ১৪০৭/১৯৮৭) পৃঃ ৩৬৭।

৪২. ছহীহ বুখারী, দিয়াত (রক্তমূল্য) অধ্যায়, (মীরাটঃ হাশেমী প্রেস ১৩২৮ হিঃ) ২য় খণ্ড পৃঃ ১০১৬; ঐ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্মিয়াহ, মুদ্রণকাল বিহীন) ৮ম খণ্ড পৃঃ ৩৯।

৪৩. মুওয়াত্ত্বা, 'ক্বদর' অধ্যায়, (মুলতান, পাকিস্তানঃ মাকতাবা ফারূকিয়া, তাবি) পৃঃ ৫৬১; মিশকাত (দিল্লীঃ আছাহ্হুল মাতাবে ১৩৫০/১৯৩২) পৃঃ ৩১; মিশকাত (বৈরুতঃ মাকতাব ইসলামী, ৩য় সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫ তাহকীকঃ আলবানী) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৬। ইমাম মালিক বিন আনাস কর্তৃক বর্ণিত ও তদীয় 'মুওয়াত্ত্বা' নামক হাদীছ সংকলন হ'তে গৃহীত অত্র হাদীছটি মু'যাল (যেখানে পরপর দু'জন রাভীর নাম উহ্য থাকে) পর্যায়ের। তবে হাকেম কর্তৃক 'হাসান' সনদে ইবনে আব্বাস হ'তে বর্ণিত একই মর্মের আরেকটি হাদীছ অত্র হাদীছকে শক্তিশালী করে। -ঐ পাদটীকা। মূল মুওয়াত্ত্বা শরীফে 'নাবীইহি' রয়েছে। কিন্তু মিশকাত শরীফে 'রাসূলিহী' সংকলিত হয়েছে - লেখক।

৪৪. তিরমিযী, মিশকাত (দিল্লী) পৃঃ ৩০; মিশকাত (বৈরুত) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬০। হাদীছে উল্লেখিত প্রথম অংশটি ছহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রাহ কর্তৃক এবং শেষ অংশটি (যারা আমার মৃত্যুর পরে....) মুসনাদে আহমাদে ছহীহ সনদে ইবনে মাসঊদ কর্তৃক বর্ণিত। শেষ অংশটি সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাছ (আহমাদ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৮৪) এবং আবদুল্লাহ বিন আমর হ'তেও ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে আমর বিন আওফ হ'তে বর্ণিত তিরমিযীর অত্র হাদীছটির সনদ খুবই বাজে (واه جدا)। যদিও তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান ছহীহ' (দিল্লী ছাপাঃ ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৫) বলেছেন।-আলবানী।

৪৫. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত (দিল্লী) পৃঃ ২৭; মিশকাত (বৈরুত) ১ম খণ্ড পৃঃ ৫২।

৪৬. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১হিঃ), 'মুসনাদ' (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ২য় সংস্করণ 'কানযুল উম্মাল'সহ ১৩৯৮/১৯৭৮) ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৫।

৪৭. Khabar : News, Information. Encyclopaedia of Islam, (Leiden,Brill, 1971), Vol. III, P. 23.

৪৮. (الخبر و الحديث فى المشهور بمعنى واحد) আবদুল হক দেহলভী (৯৫৮-১০৫২), মুকাদ্দামা মিশকাত (দিল্লী ১৩৫০ হিঃ) পৃঃ ১।

৪৯. হাফেয ইবনু কাছীর, 'ইখ্তিছারু উলূমিল হাদীছ' আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির -এর ভাষ্য 'আল-বা'ইছুল হাছীছ'-সহ (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ১০৪।

০ **ইবনু কাছীরঃ** হাফেয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন উমার ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪) দামেস্ক নগরীতে লালিত পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অন্যান্য উস্তাদ ছাড়াও বিশ্ববিখ্যাত মুজাদ্দিদ শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ্র (৬৬১-৭২৮) নিকট তিনি অধিক শিক্ষালাভ করেন। অল্প বয়সেই তিনি যুগান্তকারী ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ' এবং 'তাফসীর' গ্রন্থ রচনা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি মোট ষোলখানা অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। স্বীয় উস্তাদ ইবনু তায়মিয়াহ্র ন্যায় তিনিও কুচক্রীমহলের নানাবিধ নির্যাতনের শিকার হন। ইবনু হাজার (৭৭৩-৮৫২) তাঁকে মুহাদ্দিছ-ফকীহ গণের মধ্যে গণ্য করেন। যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮) তাঁকে বিশ্বস্ত, মুহাদ্দিছ ও মুফতী বলে অভিহিত করেছেন। সৈয়ূতী (৮৪৯-৯১১) তাঁকে হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে সিদ্ধহস্ত বলেছেন। মৃত্যুর পরে দামেস্কে সূফীদের গোরস্থানে তদীয় উস্তাদ ইবনু তায়মিয়াহ্র পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। - আল-বা'ইছুল হাছীছ (ইখতিছারসহ) পৃঃ ১২-১৬; দাঊদী (মৃঃ ৯৪৫ হিঃ), 'তাবাক্বাতুল মুফাস্সিরীন' ১ম খণ্ড পৃঃ ১১০; সৈয়ূতী, 'তাবাক্বাতুল হুফ্ফায' পৃঃ ৫২৯-৩০।

৫০. সৈয়ূতী, 'তাদরীবুর রাবী শারহু তাক্বরীবিন নববী' ২য় সংস্করণ (মদীনা ১৩৭৯/১৯৫৯) পৃঃ ৬।

৫১. ইবনু হাজার, 'শারহু নুখ্বাতিল ফিক্র' (দেওবন্দ-ভারতঃ মাকতাবা থানবী, তারিখ বিহীন) পৃঃ ৫।

৫২. Athar: Trace, Vestige. Encyclopaedia of Islam. (Leiden, Brill, 1971) P. 23.

৫৩. (والأثرهو الشيء المنقول عن السابقين) আলবানী, 'আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন' পৃঃ ১৫।

৫৪. ইবনু হাজার, 'শারহু নুখবাহ' পৃঃ ৮৬।

৫৫. আলবানী, 'আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন' পৃঃ ১৬।

৫৬. মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ (মিসরঃ সা'আদাহ প্রেস ১৩২৬ হিঃ) পৃঃ ১৮-১৯।

০ **ইবনুছ ছালাহঃ** হাফেয তাক্বিউদ্দীন আবু আমর ওছমান বিন ছালাহুদ্দীন আবদুর রহমান বিন ওছমান বিন মূসা কুর্দী শাহারযূরী শাফেঈ ওরফে ইবনুছ ছালাহ (৫৭৭-৬৪৩) হাদীছ, তাফসীর, ফিক্হ ও উছূলে ফিক্হে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। সৈয়ূতী বলেন যে, 'তিনি প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, দুনিয়াত্যাগী ও বিশুদ্ধ সালাফী আক্বীদার অধিকারী ছিলেন।' ইবনু খাল্লেকান (৬০৮-৮১) বলেন যে, তিনি স্বীয় যুগের অন্যতম সেরা মুফাস্সির, মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ ও মুফতী ছিলেন। উছূলে হাদীছ-এর উপরে লিখিত 'মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ' নামে খ্যাত তাঁর রচিত ছোটগ্রন্থ 'কিতাবু উলূমিল হাদীছ' তাঁকে জগদ্বিখ্যাত করেছে। -দাঊদী, 'তাবাক্বাত' ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৭৭; সৈয়ূতী, 'তাবাক্বাতুল হুফ্ফায' পৃঃ ৪৯৯; তাকিউদ্দীন সুবকী (৬৮৩-৭৫৬), 'তাবাক্বাতুশ শাফেঈয়াহ' (বৈরুতঃ অফসেট ছাপা, সাল বিহীন) ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৩৭।

৫৭. সৈয়ূতী, 'তাদরীব' পৃঃ ১০৯।

৫৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬।

০ **নবভীঃ** মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া বিন শারফ হুরানী শাফেঈ (৬৩১-৬৭৬) স্বীয় যুগের খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ ছিলেন। দুনিয়াত্যাগী এই চির-কুমার বিদ্বান দামেস্কের দারুল হাদীছ আশরাফিয়ার 'শায়খুল হাদীছ' ছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে একটি দিরহামও কখনও গ্রহণ করেননি। ছহীহ মুসলিম-এর জগদ্বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ 'শারহু নববী' এবং ছহীহ হাদীছ-এর সংকলন 'রিয়াযুছ ছালেহীন' ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আরও অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে। দামেস্কে জীবন কাটালেও মৃত্যুর পূর্বে নিকটবর্তী স্বীয় গ্রাম 'নাওয়া'-তে নীত হন এবং সেখানেই মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।- সৈয়ূতী, 'তাবাক্বাতুল হুফ্ফায' পৃঃ ৫১০; ইন্দোনেশিয়া ছাপা 'রিয়াযুছ ছালেহীন'-এর ভূমিকা।

৫৯. ডক্টর ছুবহী ছালেহ, 'উলূমুল হাদীছ' (দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২য় সংস্করণ ১৩৮৩/১৯৬৩) পৃঃ ৬।

অধ্যায় ঃ ৩

الفصل الثالث

আহলেহাদীছ ঃ নামকরণ ও পরিচিতি

أهل الحديث:تسميته و تعارفه

কোন দল বা আন্দোলনের নামকরণের মূলে সাধারণতঃ দু'টি কারণ লক্ষ্য করা যায়ঃ ১- স্বতন্ত্র পরিচিতি ও ২- বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা। আহলেহাদীছ নামকরণের মূলেও উক্ত দু'টি কারণ বর্তমান রয়েছে।

(ক) স্বতন্ত্র পরিচিতিঃ

৩৭ হিজরীর পরে আলী-মু'আবিয়া রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের রেশ ধরে যখন খারিজী, শী'আ, মুরজিয়া, ক্বাদারিয়া, জাব্‌রিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তখন মুসলিম সমাজে 'আহলুস্ সুন্নাহ' ও 'আহ্লুল বিদ'আ' নামে সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দু'টি দলের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হিঃ) বলেন, লোকেরা ইতিপূর্বে কখনও হাদীছের সনদ বা সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ এল, তখন লোকেরা বলতে লাগ্‌ল আগে তোমরা বর্ণনাকারীদের পরিচয় বল। অতঃপর যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী 'আহলেসুন্নাত' দলভুক্ত তাহ'লে তাঁদের বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। কিন্তু 'আহলে বিদ'আত' দলভুক্ত হ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না।[১]

বিদ'আতীদের উত্থান বুঝতে পেরে দূরদর্শী খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হিঃ) ব্যাপকভাবে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এজন্য তিনি মদীনার গভর্ণর ও প্রধান কাযী প্রসিদ্ধ তাবেঈ আবু বকর ইবনে হযম আনছারীকে হাদীছ সংগ্রহের নির্দেশ দেন। তারীখে ইস্পাহানে বলা হয়েছে যে, খলীফা এই নির্দেশ সকল ওয়ালীর (গভর্ণরের) নামে জারি করেছিলেন। আবু বকর ইবনে হযমের নিকট লিখিত রাষ্ট্রীয় ফরমানে তিনি

বলেছিলেন, "রাসূলের হাদীছ যেখানে যা পাওয়া যায় তা লিখে ফেলুন। কেননা আমি ইল্‌মের বিলুপ্তি ও আলিমদের গত হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি। রাসূলের হাদীছ ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করা হবেনা। আলিমগণ যেন ইল্‌ম ছড়িয়ে দেন। তাঁরা যেন মজলিসে বসে পড়েন, যাতে অজ্ঞরা হাদীছ জানতে পারে। কেননা ইল্‌ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না যতক্ষণ না তা গুপ্ত হয়ে যায়।" বুখারীর ভাষ্যকার আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) বলেন, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হাদীছ সংকলনের এটাই ছিল সূচনা।[২] বরং এটা ছিল হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সূচনা। কেননা ব্যক্তিগতভাবে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের কার্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল।[৩] এখানে 'ইল্‌ম ও উলামা' বলতে 'হাদীছ ও হাদীছবিদগণকে' বুঝানো হয়েছে। সালাফে ছালেহীন 'ইল্‌ম' বলতে 'সুন্নাহ্' বুঝতেন। এর বাইরে সবকিছুকে 'রায়' মনে করতেন।[৪] এভাবে প্রথম শতাব্দী হিজরীর প্রথমার্ধের শেষ দিক হ'তে মুসলিম সমাজে 'আহলুস্ সুন্নাহ' নামক দলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

৩৭ হিজরীর পূর্বে মুসলিম উম্মাহ্‌র আকীদায় তেমন কোন ভিন্নতা ছিলনা। তাদের সমস্যার সমাধান পদ্ধতি প্রায় একই রূপ ছিল। কুরআন ও হাদীছ হ'তে সরাসরি তারা সমাধান গ্রহণ করতেন। কারও কোন বিষয়ে জানা না থাক্‌লে আলেমদের নিকট থেকে হাদীছ জেনে নিতেন। কুরআন ও হাদীছে সমস্যার স্পষ্ট কোন সমাধান না পাওয়া গেলে সেখানে দেওয়া মূলনীতির আলোকে ছাহাবায়ে কেরাম পরামর্শের ভিত্তিতে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, যাকে 'ইজমায়ে ছাহাবা' বলা হয়। সকলে একত্রিত হওয়ার সুযোগ না থাক্‌লে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এককভাবেও তাঁরা সমাধান দিতেন। তবে সে বিষয়ে পরে কোন দলীল অবগত হ'লে এবং তা ইতিপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তা পরিত্যাগ করে দলীল অনুযায়ী আমল করতেন। মোট কথা নিজের বা অপরের সকল প্রকারের রায় ও কিয়াস হ'তে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়ার রীতিই ছিল ৩৭ হিজরীর পূর্বেকার আমলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আর তাই তাঁরা এসময় 'আহলুস্ সুন্নাহ্' ও 'আহ্‌লুল হাদীছ' উভয় নামে অভিহিত হয়েছেন। বিখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (মৃঃ

৭৪ হিঃ) মুসলিম তরুণদের দেখ্লে খুশী হ'য়ে বলতেন- "রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী **আহ্লুল হাদীছ**।"[৫] অমনিভাবে প্রখ্যাত তাবেঈ ইমাম শা'বী (২২-১০৪ হিঃ) ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে **'আহ্লুল হাদীছ'** বলতেন।[৬] তিনি নিজেও **'আহ্লুল হাদীছ'** হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৭] ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হিঃ) বলেন, আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদের জন্মের বহু পূর্ব হ'তে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রাচীন একটি মাযহাব পরিচিত ছিল। সেটি হ'ল ছাহাবায়ে কেরামের মাযহাব, যাঁরা তাঁদের নবীর কাছ থেকে সরাসরি ইল্ম হাছিল করেছিলেন।'[৮] ইমাম আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ বিনুল হাসান লালকাঈ (মৃঃ ৪১৮ হিঃ) স্বীয় গ্রন্থের শুরুতে 'উম্মতের উপর আছহাবে হাদীছদের শ্রেষ্ঠত্ব' (فضل أصحاب الحديث على الأمة) এবং 'রাসূলুল্লাহ্র দিকে আহলেহাদীছ গণের সম্পর্কিতকরণ' (إنتساب أهل الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) নামক দু'টি অধ্যায় শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর হ'তে ছাহাবা, তাবেঈন ও তৎপরবর্তী যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও স্থানে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত আহলেহাদীছ আন্দোলনের ১৯১ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের নামসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন।[৯] ইমাম আবু ইসমাঈল আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯ হিঃ) ইমাম মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ হ'তে তাঁর যুগ পর্যন্ত তাঁর ভাষায় أئمة أهل الحديث হিসাবে ৪৭ জন সেরা আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের নামোল্লেখ করেছেন।[১০] অমনিভাবে ইবনু নাদীম (মৃঃ ৩৭০ হিঃ) 'মুহাদ্দিছ ও আছহাবে হাদীছ ফকীহগণ' (فقهاء المحدثين وأصحاب الحديث) শিরোনামে ৬৪ জন নেতৃবৃন্দের পরিচয় তুলে ধরেছেন।[১১] অবশ্য সেখানে তিনি ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯) ও তাঁর অনুসারী ১৮ জন মালেকী আলিম, ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪) ও তাঁর অনুসারী ৩৬ জন শাফেঈ পণ্ডিত, ইমাম দাউদ বিন আলী যাহেরী (২০০-২৭০) ও তাঁর অনুসারী ১০ জন বিশেষজ্ঞ এবং ইবনে জারীর তাবারী (২২৪-৩১০ হিঃ) ও তাঁর অনুসারী ২ জন

পণ্ডিতের নাম পৃথক শিরোনামে বিবৃত করেছেন।[১২] আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩ হিঃ) স্বীয় 'ইয়াকূত ওয়াল জাওয়াহের' কিতাবে অনুসরণীয় ইমামদের যুগ হ'তে তাঁর যুগ পর্যন্ত বিরাট সংখ্যক বিদ্বানমণ্ডলীর একটি জামা'আতের তালিকা প্রদান করেছেন, যাঁরা নির্দিষ্ট কোন একটি মাযহাবের তাকলীদ করতেন না।[১৩] ইমাম খতীব বাগদাদী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) কয়েকজন আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরেছেন তাঁর বিশ্ববিশ্রুত 'তারীখু বাগদাদ' নামক ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থে।[১৪] এতদ্ব্যতীত شرف أصحاب الحديث ('আহলেহাদীছ গণের মর্যাদা') নামে তাঁর একটি স্বতন্ত্র ও সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক রয়েছে, যেখানে তিনি এতদসম্পর্কিত বহু হাদীছ ও আছার সনদ সহকারে সংকলিত করেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে অনুমিত হয় যে, নামবাচ্য হিসাবে 'আহলেহাদীছ' ছাহাবা যুগ হ'তেই পরিচিত ছিল। অবশ্য ছাহাবা ও তাবেঈদের 'আহ্লুল হাদীছ' নামকরণ ছিল কেবল বৈশিষ্ট্যগত কারণে, পৃথক পরিচিতির জন্য নয়। কারণ অন্য পরিচয়ে তখন কোন দলই মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু ৩৭ হিজরীর পরবর্তী যুগে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটতে থাক্লে তাদের বিপরীতে যাঁরা মহানবী (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পথ ও পন্থা অনুসরণ করেন, তাঁরা 'আহ্লুল হাদীছ' বা 'আহ্লুস সুন্নাহ' নামে পরিচিত হন, যা আমরা ইতিপূর্বে দু'জন শ্রেষ্ঠ তাবেঈ ইমাম শা'বী (২২-১০৪ হিঃ) ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হিঃ)- এর বক্তব্য হ'তে অনুমান করতে পারি।

(খ) বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতাঃ

আহ্লেহাদীছের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল বিনাশর্তে ছহীহ হাদীছ মেনে নেওয়া। শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ) বলেন, ছাহাবা ও তাবেঈন হ'তে অব্যাহত ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁদের নিকট কোন হাদীছ পৌঁছে গেলে বিনা শর্তে তাঁরা তার উপরে আমল করতেন।[১৫] অন্যত্র তিনি স্পেনের বিখ্যাত ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হযম আন্দালুসী যাহেরী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন এভাবে-

'ছহীহ-শুদ্ধ ভাবে ইজমা প্রমাণিত হয়েছে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও

তাবে তাবেঈন-এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের পক্ষ হ'তে এই মর্মে যে, তাঁদের কোন একজনের সকল কথা মেনে নেওয়া নিষেধ। অতএব ঐ ব্যক্তি জেনে রাখুক যে ব্যক্তি আবু হানীফার সকল কথা গ্রহণ করেছে কিংবা মালেক, শাফেঈ বা আহমাদের সকল কথাকে গ্রহণ করেছে, তাঁদের কোন কথা ছাড়েনি বা অন্যের কথার প্রতিও দৃকপাত করেনি এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র উপরে ভিত্তি রাখেনি, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ইজমায়ে উম্মাতের বিরোধিতা করেছে। ঐ নীতি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোন লোক ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈদের তিনটি প্রশংসিত যুগে ছিল না। ঐ ব্যক্তি মুমিনদের গৃহীত পথের বাইরে গিয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঐ অবস্থা হ'তে পানাহ্ দিন।[১৬] ছাহাবা, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদেরকে লক্ষ্য করেই হয়ত ইবনে হযম একথা বলে থাকবেন। কেননা তাঁদের যুগের মুনাফিক, ফাসিক ও অন্যান্য গুমরাহ মুসলমানদের মধ্যে যে উক্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, একথা সর্বজনবিদিত।

হাদীছ পাওয়ার পরে ইজতিহাদী ফৎওয়া পরিত্যাগ করে হাদীছ অনুযায়ী আমল করার বহু দৃষ্টান্ত ছাহাবা ও তাবেঈন হ'তে সংকলন করেছেন দ্বাদশ শতকের ইমাম ছালেহ বিন মুহাম্মাদ ফুল্লানী (১১৬৬-১২১৮ হিঃ/ ১৭৫২-১৮০৩ খৃঃ) স্বীয় যুগান্তকারী গ্রন্থে। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ওমর ফারূক, ইবনে মাসউদ, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, ওমর বিন আবদুল আযীয, সালেম বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর সহ উম্মতের সেরা ব্যক্তিবর্গ। যাঁরা সর্বাবস্থায় নিজেদের রায়ের উর্ধে হাদীছকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার উপরে আমল করে গিয়েছেন। কোন অবস্থায়ই নিজেদের রায়কে হাদীছের উর্ধে স্থান দেওয়ার জন্য কোনরূপ কৌশল বা বাহানার আশ্রয় নেননি। উমার বিন আবদুল আযীয (৯৯-১০১ হিঃ) তো খলীফার ফায়ছালা জারি করার পর তা বাতিল করেন হাদীছ জানতে পারার কারণে।[১৭]

অন্যান্য সকল দল ও মাযহাব হ'তে আহলেহাদীছদের পৃথক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তুলে ধরে হিজরী তৃতীয় শতকের ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম ইবনু কুতায়বাহ দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬ হিঃ) বলেন 'যদি একথা বলা হয় যে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ আকীদা ও আমলকে সঠিক দাবী করে এবং অন্য দলকে বেঠিক বা ভ্রান্ত মনে করে থাকে, এমতাবস্থায় আহলেহাদীছগণ সম্পর্কে একথা

কিভাবে বলা যেতে পারে যে তারাই মাত্র হক-এর উপরে আছেন? তবে তার জওয়াবে একথা বলা হবে যে, সমস্ত দল বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হ'লেও একটি বিষয়ে তারা সকলে একমত যে, যে ব্যক্তি যে কোন মূল্যের বিনিময়ে কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে আঁক্‌ড়ে থাকবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই আলোকপ্রাপ্ত হবে এবং তার জন্য হেদায়াতের রাস্তা খুলে যাবে, তবে উক্ত বৈশিষ্ট্য আহলেহাদীছদের জন্য কেউই অস্বীকার করবেনা নিতান্ত হঠকারী (ظالم) কোন ব্যক্তি ছাড়া। কারণ আহলে -হাদীছগণ দ্বীনী কোন বিষয়কে কারও ব্যক্তিগত রায়, কিয়াস ও ইস্‌তিহ্‌সানের উপরে ছেড়ে দেননা। একই ভাবে তাঁরা বিগত যুগের কোন দার্শনিক বা বর্তমান যুগের কোন কালামশাস্ত্রবিদেরও মুখাপেক্ষী থাকেন না।[১৮]

মোট কথা নিজের বা অপরের সকল প্রকার রায় ও কিয়াস হ'তে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়াই ছিল ইসলামের সোনালী যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ সময় সৃষ্ট রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্বে ও অন্যান্য কারণে কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যাগত মতভেদ মাথাচাড়া দেয়। ইতিমধ্যে গ্রীক দর্শনের আমদানীর ফলে মুসলিম বিদ্বানগণ ক্রমেই যুক্তিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন, যা প্রথম যুগের সহজ সরল হাদীছ ভিত্তিক জীবন পরিচালনার রীতিতে ব্যত্যয় ঘটায়। ইমাম ইবনু কুতায়বাহ্‌ (২১৩-২৭৬ হিঃ) এই যুক্তিবাদকে حجة العقل বা 'যুক্তির দলীল' বলে অভিহিত করেছেন।[১৯] আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের মধ্যেও এর ঢেউ লাগে। ফলে ফিক্‌হ শাস্ত্র এই সময় 'আহ্‌লুল হাদীছ' ও 'আহ্‌লুর রায়' নামে দু'টি প্রধান ধারায় বিভক্ত হ'য়ে যায়। অষ্টম শতকের খ্যাতনামা মনীষী ও সমাজবিজ্ঞানী আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ইবনু খালদূন আল-মাগরেবী (৭৩২-৮০২ হিঃ) এ বিষয়ে আলোকপাত করে বলেন, 'বিদ্বানগণের মধ্যে ফিক্‌হ (ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্র) দু'টি তরীকায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি হ'ল রায় ও কেয়াসপন্থীদের তরীকা। তারা হলেন ইরাকের অধিবাসী। দ্বিতীয়টি হ'ল হাদীছপন্থী বা আহ্‌লুল হাদীছদের তরীকা। তারা হলেন হেজাযের অধিবাসী। ইরাকীদের মধ্যে হাদীছ খুবই কম ছিল ... ফলে তারা কিয়াস বেশী করেন ও এতে দক্ষতা অর্জন করেন। আর একারণেই তারা 'আহ্‌লুর রায়' বা রায়পন্থী নামে অভিহিত হয়েছেন।[২০]

এক্ষণে উভয় দলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ষষ্ঠ শতকের খ্যাতনামা বিদ্বান আবুল ফাত্‌হ মুহাম্মাদ বিন আবদুল করীম শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হিঃ) বলেন, 'উম্মতের মুজতাহিদ ইমামগণ দু'ভাগে বিভক্ত, তৃতীয় কোন ভাগে নয়, আছহাবুল হাদীছ ও আছহাবুর রায়। আছহাবুল হাদীছগণ হেজাযের অধিবাসী। তাদেরকে 'আছহাবুল হাদীছ' এজন্য বলা হয় যে, তাঁদের সার্বিক লক্ষ্য নিয়োজিত থাকে

হাদীছ সংগ্রহের প্রতি এবং তাঁরা সমস্ত আহকাম বা আদেশ-নিষেধের ভিত্তি রাখেন দলীল সমূহের উপরে। হাদীছ বা আছার পেলে তাঁরা কোন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কিয়াসের দিকে ফিরে তাকান না। ... পক্ষান্তরে আহ্‌লুর রায়গণ হ'লেন ইরাকের অধিবাসী। তাঁরা আবু হানীফা নু'মান বিন ছাবিত (৮০-১৫০ হিঃ) -এর অনুসারী। ... তাঁদেরকে 'আহ্‌লুর রায়' এজন্য বলা হয় যে, তাদের অধিক লক্ষ্য থাকে কিয়াসের কারণ সন্ধানের প্রতি এবং কুরআন-হাদীছের আহকাম হ'তে সৃষ্ট মর্মার্থের প্রতি এবং তার উপরেই তাঁরা উদ্ভূত ঘটনাসমূহের ভিত্তি স্থাপন করেন। কখনও কখনও তাঁরা 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ের হাদীছের উপরে প্রকাশ্য কিয়াসকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।[২১] শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হিঃ/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ) উভয় দলের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আরও সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরে বলেন 'কিয়াস করলেই তাকে 'আহলুর রায়' বলা হয়না। ... কেননা আহমাদ, ইসহাক এমনকি শাফেঈ ও 'আহলুর রায়' নন। যদিও তাঁরা কেয়াস করেছেন এবং কুরআন-হাদীছ থেকে মাসআলার সমাধান বের করেছেন। বরং 'আহলুর রায়' বলতে তাঁদেরকে বুঝানো হয়, যারা (কোন বিষয়ে) মুসলিম উম্মাহ্‌র সম্মিলিত অথবা অধিকাংশের ঐক্যমত থাকা সত্ত্বেও বিগত কোন বিদ্বানের প্রবর্তিত উছূল বা ফেক্‌হী মূলনীতির ভিত্তিতে সমাধান বের করে থাকেন। হাদীছ ও আছার সমূহ সন্ধানের চাইতে বিগত কোন ঘটনার উপরে বর্তমান ঘটনার সাদৃশ্য বিধান এবং বিগত কোন বিদ্বানের উদ্ভাবিত উছূলের দিকে প্রত্যাবর্তনের দিকেই তাদের অধিকাংশ প্রচেষ্টা নিয়োজিত থাকে।[২২]

উপরোক্ত আলোচনায় কয়েকটি বিষয় অনুমিত হয়। যেমন (১) আহলুল হাদীছগণের ইস্তিদলালী পদ্ধতি প্রধানতঃ কুরআন, হাদীছ ও আছারে ছাহাবার উপরে ভিত্তিশীল। পক্ষান্তরে আহলুর রায়গণের ইস্তিদলালী পদ্ধতি প্রধানতঃ নিজেদের ইমাম বা মাযহাবী পন্ডিতগণের রচিত উছূল বা ফেক্‌হী মূলনীতি সমূহের উপরে ভিত্তিশীল (২) আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায় উভয়ে কেয়াস ও ইজতিহাদে বিশ্বাসী। কিন্তু উভয়ের দলীল গ্রহণের ভিত্তি ও পদ্ধতি ভিন্ন (৩) আহলুর রায়গণ নির্দিষ্ট ইমামের বা তাঁর মাযহাবের বিদ্বানদের গৃহীত উছূলের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার কারণে এক একজন ইমামের অনুসারী 'মুকাল্লিদ' হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছ সমূহের নিরপেক্ষ ও নিঃশর্ত অনুসরণ ব্যাহত হয়েছে।[২৩]

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ), শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ), আহমাদ (১৬৪-২৪১), ইসহাক (১৬৬-২৩৮), বুখারী

(১৯৪-২৫৬), আবু দাউদ (২০২-২৭৫), তিরমিযী (২০৯-২৭৯) প্রমুখ উম্মতের সেরা মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ ও মুজতাহিদগণকে 'আহ্‌লুল রায়' না বলে আবদুল কাহির বাগদাদী, শাহ অলিউল্লাহ প্রমুখ বিদ্বানগণ 'আহলুল হাদীছ' বলেছেন।[২৪] পক্ষান্তরে হাদীছের সংগ্রহ কম থাকার কারণে বাধ্য হয়ে কিয়াসের উপরে অধিক নির্ভরশীল হওয়ার ফলে শহরস্তানী, ইবনু খালদূন প্রমুখ বিদ্বানগণের ভাষায় ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) -কে 'আহ্‌লুর রায়দের ইমাম' বলা হয়েছে।[২৫] কিন্তু সাথে সাথে এটাও বিচারযোগ্য যে, তিনি তাঁর রায়-এর তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করার বিরুদ্ধে সকলকে তীব্রভাবে নিষেধ করে গিয়েছেন এবং 'যখন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে তখন সেটাই আমার মাযহাব' বলে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়ে গেছেন।[২৬] আল্লামা আবদুল ওয়াহ্‌হাব শা'রানী হানাফী (৮৯৮-৯৭৩ হিঃ) বলেন, 'যদি (তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে) হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের স্বর্ণযুগে আবু হানীফা বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে অবশ্যই তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং যত কিয়াস করেছেন, সবই বাদ দিতেন। তাঁর মাযহাবেও কিয়াস কম হ'ত, যেমন অন্য মাযহাবগুলিতে হয়েছে। আবু হানীফা -এর মাযহাবে কিয়াস বেশী হওয়ার কারণ এই যে, তাঁর সময়ে হাদীছের হাফেযগণ শহরে গ্রামে হাদীছ সংগ্রহের কাজে লিপ্ত ছিলেন- যা পরে সংকলিত হয় (কিন্তু তিনি সে যুগ পাননি)। ফলে দলীল না পাওয়ার কারণে তিনি কিয়াস করতে বাধ্য হয়েছেন, যা অন্য ইমামদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। ... যারা ইমাম আবু হানীফাকে হাদীছের উর্ধে কেয়াসকে অগ্রাধিকার দানের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন, তাঁরা সম্ভবতঃ তাঁর মুকাল্লিদ অনুসারীদের কথাবার্তা থেকেই সেটা অনুমান করেন। যারা তাদের ইমামের নিকট হ'তে প্রাপ্ত কেয়াসের উপরে আমল করাকে অপরিহার্য গণ্য করে নিয়েছেন এবং ইমামের মৃত্যুর পরে (ক্ষেত্র বিশেষে) প্রাপ্ত ছহীহ হাদীছের উপরে নির্ভর করেননি। এক্ষণে ইমাম এ ব্যাপারে ওযরযোগ্য বিবেচিত হলেও অনুসারীগণ ওযরযোগ্য নন। ... কেননা প্রত্যেক ইমামই একথা বলে গিয়েছেন যে, 'ছহীহ হাদীছই আমাদের মাযহাব'।[২৭]

শা'রানীর আলোচনা থেকে একটি বিষয় ফুটে উঠেছে যে, আহলেসুন্নাতের সকল ইমাম ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে একবাক্যে স্বীকার করেছেন ও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য তাঁদের অনুসারীদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সে কারণে আমরা তাঁদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলতে পারি। তাঁদের মুকাল্লিদ অনুসারীগণ পরবর্তীকালে ইমামদের নামে 'মাযহাব' রচনা করেছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছের উর্ধে ইমামের বা পরবর্তী কোন মাযহাবী বিদ্বানের ফৎওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ফলে মালেক, শাফেঈ অবশ্যই আহলেহাদীছ

হ'লেও তাঁদের অনুসারী মালেকী বা শাফেঈগণ তাকলীদের কারণে অনেক সময় আহলেহাদীছ থাকেন না। কারণ নিরপেক্ষভাবে হাদীছ গ্রহণ ও সর্বাবস্থায় ছহীহ হাদীছকে অগ্রাধিকার দান করার যে মৌলিক বৈশিষ্ট্য আহলেহাদীছদের রয়েছে, তাকলীদের কারণে অনেক ক্ষেত্রে মুকাল্লিদগণ তা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

মাযহাবী গোঁড়ামী ও অধঃপতনের যুগেও কুরআন হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ও তার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যে বিশ্বাসী, ছাহাবা যুগের মহান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মুসলমানগণ সর্বদা হাদীছ অনুযায়ী জীবন গঠনে ব্রতী ছিলেন। তাঁরা আহলে সুন্নাতের মুজতাহিদ ইমামগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁদের প্রদত্ত যে সকল সিদ্ধান্ত ছহীহ হাদীছের অনুকূলে ছিল, তা মেনে চলতেন। কিন্তু যা বিরোধী প্রমাণিত হ'ত, তা পরিত্যাগ করে হাদীছের অনুসারী হ'তেন। এই ভাবে আহলে সুন্নাতের সকল বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং নিরপেক্ষ ও নিঃশর্তভাবে ছহীহ হাদীছ অনুসরণের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হাওয়ার কারণে তাঁরা সকল যুগে 'আহলুল হাদীছ' নামে পরিচিত হন। যেমন হিজরী পঞ্চম শতকের ইমাম ইবনু হযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাঁদের বিরোধী পক্ষকে বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হ'লেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) অতঃপর আহলুল হাদীছগণ এবং (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন, যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত এবং (ঙ) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল 'আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুবর্তী হয়েছেন।'[২৮]

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ছাহাবায়ে কেরাম, মুহাদ্দেছীন ও হাদীছপন্থী ফক্বীহ বিদ্বানগণই কেবল আহলেহাদীছ ছিলেন না বরং তাঁদের নীতির অনুসারী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী 'আম জনসাধারণও সকল যুগে 'আহলুল হাদীছ' নামে কথিত হ'তেন এবং আজও হয়ে থাকেন। যেমন 'আহলুর রায়'-এর পন্ডিতগণ ছাড়াও তাঁদের সাধারণ অনুসারীগণ বিভিন্ন মাযহাবী নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন।

আহলেহাদীছ নামকরণের তাৎপর্য (وجه تسميتهم بأهل الحديث) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম আবুল কাসেম হেবাতুল্লাহ বিনুল হাসান লালকাঈ (মৃঃ ৪১৮ হিঃ) বলেন, 'তাঁদের এই নামটি কিতাব ও সুন্নাতের সমষ্টি হ'তে গৃহীত। কারণ 'আহলুল হাদীছ' নামটি কুরআন ও হাদীছ উভয়কে শামিল করে এবং এ ব্যাপারে তাদের প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত রয়েছে। ১. কুরআন ও হাদীছের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে তাদের যুক্ত থাকা এবং ২. ঐ দুই বস্তুকে খাছ করে গ্রহণের ব্যাপারে

তাঁদের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া।' অতঃপর তিনি বলেন 'আহলেহাদীছগণই উম্মতের হেদায়াতপ্রাপ্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ দল। তারা কঠোরভাবে সুন্নাতের ধারণকারী, তারা রাসূলের বদলে অন্য কাউকে কামনা করেননা। তাঁরা সুন্নাত হতে ফিরে আসেননা। যুগের উত্থান-পতন তাঁদেরকে সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বিরত রাখতে পারে না। কোন ঘটনা-দুর্ঘটনা তাঁদেরকে দিক পরিবর্তন করাতে পারেনা। নতুন কোন বিদ'আতী পন্থা-পদ্ধতি তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু হ'তে এক বিন্দু হটাতে পারেনা। মিথ্যাবাদী ও ঝগড়াটে ব্যক্তিদের ঝগড়া ও কুটতর্ক তাঁদেরকে পথচ্যুত করতে পারেনা। 'আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণতা দানকারী যদিও অবিশ্বাসীরা তা পসন্দ করেনা।'[২৯] অমনিভাবে হিজরী পঞ্চম শতকের ইমাম আবু ইসমাঈল আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯ হিঃ) আহলেহাদীছদের আটটি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের কথা آداب أهل الحديث শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।[৩০]

হিন্দুস্থানে পরিচালিত আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে উপমহাদেশের খ্যাতনামা হানাফী মনীষী, ইতিহাসবিদ ও জীবনীকার আবুল হাসান আলী নাদভী (জন্মঃ ১৯১৪ খৃঃ) বলেন, 'হিন্দুস্থানে আহলেহাদীছ আন্দোলন চারটি বুনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ১- খালেছ তাওহীদ বিশ্বাস ২- ইত্তিবায়ে সুন্নাত ৩- জিহাদী জায্বা এবং ৪- আল্লাহ্র নিকটে বিনীত হওয়া। ... অন্য দলগুলিকে দেখ, সেখানে তাওহীদ আছে তো ইত্তিবায়ে সুন্নাতে অলসতা আছে। ইত্তিবায়ে সুন্নাতের জায্বা আছে তো জিহাদের জায্বা নেই। কোথাও যিক্র-ফিক্র আছে তো ইত্তিবায়ে সুন্নাত নেই। লোকেরা বিশেষ বিশেষ বিষয় গুলিকে নিয়ে সেগুলিকে আমলের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু জামা'আতে আহলেহাদীছ-এর মধ্যে উপরোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য একত্রিত হ'য়ে শহীদায়েনের (সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদ) ছূরতে আত্মপ্রকাশ করেছে...।[৩১]

আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ আহ্লেহাদীছ-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- 'আহলেহাদীছ বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের অনুসারীদেরকে বুঝায় ... যারা প্রাথমিক যুগের আছহাবুল হাদীছ বা আহ্লুল হাদীছদের ন্যায় মত পোষণ করেন (আহ্লুর রায়দের বিপরীতে)। যারা 'তাকলীদ'-এর বন্ধনকে স্বীকার করেন না .... বরং ধর্মীয় বিশ্বাস ও আমলের ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছ সমূহ হ'তে হেদায়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করেন। যাঁরা কুরআন ও হাদীছকে একজন খাঁটি মুসলমানের জন্য যথার্থ পথপ্রদর্শক বলে মনে করেন। ...

আহ্লেহাদীছগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের মূলনীতি সমূহের দিকে ফিরে যেতে সচেষ্ট এবং তাঁরা আকীদা ও আমলের মৌলিক সরলতা ও স্বচ্ছতাকে পুনরুদ্ধার করতে চান। বিশেষ করে তাওহীদের প্রকৃত ভাবমূর্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁরা জোর দেন। সৃষ্টিজগতের কাউকে অলৌকিক শক্তি এবং অদৃশ্য জ্ঞান বা ইল্মুল গায়েবের অধিকারী হওয়ার বিষয়টিকে তাঁরা অস্বীকার করেন। সে কারণে তাঁরা কোন অলি বা সাধু ব্যক্তির অলৌকিক শক্তিকে অগ্রাহ্য করেন এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অতিভক্তি প্রদর্শন করেন না।* তাঁরা মুসলিম সমাজে ধর্মের নামে সৃষ্ট কোন বিদ'আত কিংবা হিন্দুয়ানী প্রথা বা অন্য যে কোন অনৈসলামী রীতি-নীতিকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। তাঁদের এই সংস্কারমূলক কার্যক্রম আরবের ওয়াহ্হাবীদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাঁদের বিরোধীরা এই কারণেই তাঁদেরকে কখনও কখনও 'ওয়াহ্হাবী' বলে দুর্নাম করে থাকে।**[৩২]

অপর একজন পণ্ডিত টাইটাস মার্রে (Titus Murray) বলেন, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, একমাত্র তাকেই যারা ধর্মের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন, তারাই হলেন আহলেহাদীছ। ইসলামের প্রথম যুগের মূলনীতির দিকে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে এবং তার মৌলিক সরলতা ও আকীদা ও আমলের স্বচ্ছতা পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে তারা জোর দিয়ে থাকেন। যথা- ১. আল্লাহ্র একত্ব বা তাওহীদ ২. ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে প্রচলিত চার মাযহাবের বন্ধনকে অস্বীকার ... এবং ৩. চার ইমাম পর্যন্ত ইজতিহাদ শেষ হয়ে গিয়েছে বলে প্রচলিত ধারণা প্রত্যাখান। তারা বলেন যে, ইসলামী শরীয়তে যথাযোগ্য জ্ঞানের অধিকারী যে কোন মুসলিম পণ্ডিত যে কোন সময়ে স্বাধীনভাবে কুরআন ও হাদীছ ব্যাখ্যা করতে পারেন।[৩৩] এস. এম. যুইমার (S. M. Zwemer) তাঁর Islam in India প্রবন্ধে বলেন, আহলেহাদীছগণ কঠোর স্বচ্ছতাবাদী।[৩৪] অমনিভাবে এইচ. ক্রেমার (H. Craemer) তাঁর Islam in India today নামক প্রবন্ধে বলেন, 'আহলেহাদীছ-এর প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল প্রচলিত চার মাযহাবের বন্ধন হ'তে মুক্তিলাভ করা, যাতে করে ইসলামকে আধুনিক যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়। তাঁরা কুরআন ও হাদীছের দিকে ফিরে যেতে চান কেবল অতীতের প্রতি অন্ধ আবেগ বশে নয় বরং আধুনিক পৃথিবীর প্রয়োজন পূরণে (ইজতিহাদের) অধিকতর স্বাধীনতা লাভের জন্য।[৩৫]

টাইটাস মার্রে তাঁর প্রবন্ধে আহলেহাদীছের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে

তুললেও তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনকে নাজ্‌দের 'ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনে'র দ্বারা প্রভাবিত একটি আন্দোলন বলতে চেয়েছেন। অমনিভাবে এস. এম. যুইমার আহলেহাদীছ, হাম্বলী মুকাল্লিদ এবং ওয়াহ্‌হাবীকে একাকার করে ফেলেছেন।[৩৬] এইচ. ক্রেমার আর এক অনৈতিহাসিক দাবী করেছেন। তিনি আহলেহাদীছকে সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর (১৭৮৬-১৮৩১ খৃঃ) যুগের ওয়াহ্‌হাবীদের আধুনিক প্রতিনিধি, গায়ের মুকাল্লিদ এবং মিসরীয় ও আরবীয় সালাফীদের ভারতীয় প্রতিরূপ (Indian duplicate) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৭] অথচ এসবের মধ্যে একমাত্র 'আহলেহাদীছ' নামটিই ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে প্রচলিত আছে। বস্তুতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন, তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য কোন কিছুই অন্য কোন মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত নয়। বরং কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'তে উৎসারিত ইসলামের সোনালী যুগ হ'তে বহমান এই নির্ভেজাল স্রোতস্বিনী হ'তে উৎসারিত হ'য়ে যুগে যুগে বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে বিভিন্ন নামে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন সমূহ পরিচালিত হয়েছে। নাজ্‌দের ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলন, তিউনিসিয়ার সনৌসী আন্দোলন,[৩৮] থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, সূদান ও মিসরের 'আন্‌ছারুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়াহ্' কুয়েতের সালাফী আন্দোলন, ইন্দোনেশিয়ার 'জামাআতে মুহাম্মাদিয়াহ' ভারতের 'জিহাদ আন্দোলন' বাংলাদেশের 'মুহাম্মাদী আন্দোলন' এসবগুলিকে আমরা এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসাবে পেশ করতে পারি। তবে যেখানে যে নামেই পরিচিত হৌক না কেন, ছহীহ হাদীছকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন বাহানার আশ্রয় না নিয়ে সকল সমস্যায় সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিকে নিঃশর্তভাবে ফিরে যাওয়া এবং তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি, দল বা আন্দোলনকেই মাত্র 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলা যেতে পারে।

হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের দু'জন খ্যাতনামা মুসলিম ভূ-পর্যটক ও ঐতিহাসিকের ভ্রমণ প্রতিবেদন থেকেও তৎকালীন সময়ে 'আহলেহাদীছ' নামে জামা'আতে আহলেহাদীছ-এর অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়া চলে। চতুর্থ শতকের ভূ-পর্যটক শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বেশারী আল-মাক্‌দেসী (মৃঃ ৩৭৫ হিঃ) আরব উপদ্বীপ হ'তে শুরু করে তৎকালীন পৃথিবীর মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহ ভ্রমণ সমাপ্ত করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনার সাথে সাথে مذاهبهم শীর্ষক বিশেষ শিরোনামে সেখানকার মাযহাবী চিত্র তুলে ধরেছেন।[৩৯] তিনি প্রচলিত মাযহাব চতুষ্টয় ও অন্যান্য মাযহাব সহ 'আহলেহাদীছ'কে পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন।

ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে তিনি ভারতবর্ষের সিন্ধু অঞ্চলে আসেন। সে এলাকার মুসলিম অধিবাসীদের মাযহাব বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'সেখানকার অধিকাংশ মুসলিম 'আছহাবে হাদীছ' (أكثرُهم أصحابُ حديث)। আমি কাযী আবু মুহাম্মাদ মানছূরী নামে দাঊদী (যাহেরী) মাযহাবের একজন নেতৃস্থানীয় পণ্ডিতকে দেখলাম। তিনি সেখানে দারস দিয়ে থাকেন। তিনি অনেক সুন্দর গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। মুলতানের অধিবাসীরা শী'আ মতাবলম্বী ....। সকল শহরেই কিছু কিছু হানাফী ফকীহ রয়েছেন। এখানে মালেকী বা মু'তাযিলী কেউ নেই, হাম্বলী মাযহাবের উপরেও কোন আমল নেই।'[৪০]

আল্লামা আবুল ফাৎহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল করীম বিন আহমাদ শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮) হিঃ) 'আছহাবুল হাদীছ' বলতে হেজাযবাসী এবং ইমাম মালেক বিন আনাস (৯৩-১৭৯) হিঃ), মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেঈ (১৫০-২০৪), সুফিয়ান ছওরী (৯৭-১৬১ হিঃ), আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১) ও দাঊদ বিন আলী ইছফাহানী (২০০-২৭০ হিঃ) -এর মাযহাবের অনুসারীদেরকে বুঝিয়েছেন।[৪১] মাকদেসী বর্ণিত ভ্রমণ বৃত্তান্তে অনুরূপ ব্যাখ্যাই ফুটে উঠেছে। তবে ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনার ভূমিকাতে তিনি তাঁর যুগে বিশ্ব মুসলিমের সর্বত্র চারটি মাযহাবের অবলুপ্তি সহ মোট যে আঠাশটি মাযহাবের বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে ফিক্বহের বিষয়ে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও দাঊদী (যাহেরী) এবং আছহাবুল হাদীছের হাম্বলিয়াহ, রাহ্ভিয়াহ্, আওযা'ঈয়াহ ও মানযারিয়াহ মোট চারটি মাযহাবের নাম উল্লেখ করেছেন।[৪২] তাছাড়া ফেকহী মাযহাবসমূহের মধ্যে মালেকী, শাফেঈ ও দাঊদীগণকেও তিনি তাঁর বর্ণনায় 'আহলেহাদীছ' হিসাবে গণ্য করেছেন, যদিও সব কিছু তিনি পৃথক নামেই পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষণে তাঁর সম্পূর্ণ আলোচনা একত্রিত করলে দেখা যাবে যে ৩৭৫ হিজরীর পূর্বে একমাত্র ইরাক ছাড়া তৎকালীন ইসলামী জগতের সকল অঞ্চলে আহলেহাদীছদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। যেমন তিনি ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনার শুরুতে সামগ্রিক আলোচনায় বলেন, "উছমানের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রথমে যে শী'আ, খারেজী, মুরজিয়া ও মু'তাযিলা নামে চারটি মাযহাবের জন্ম হয়, তারই রেশ ধরে বাকী সকল ফির্কার জন্ম হয়েছে এবং আজও জন্ম হচ্ছে, যা মাহ্দীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে। .... এদের মধ্যে 'সাওয়াদুল আযম'-ই মাত্র মুক্তি পাবে। আমি তো কেবল চারটি মাযহাবের মধ্যেই 'সাওয়াদুল আযম' দেখতে পাচ্ছি। ১. আবু হানীফার অনুসারীগণ প্রাচ্যে, ২. মালেক-এর অনুসারীগণ মাগরিবে (মরক্কোতে), ৩. শাফেঈ-এর অনুসারীগণ শাশ ও নিশাপুরে

এবং ৪. আছহাবুল হাদীছগণ শাম (সিরিয়া), আকূর ও রিহাব অঞ্চলে। বাকী সমস্ত এলাকা বিভিন্ন মাযহাবের লোক দ্বারা মিশ্রিত।[৪৩]

মাকদেসীর প্রায় পৌনে এক শতাব্দী কাল পরে অন্যতম ঐতিহাসিক ও উছূলী পণ্ডিত আবদুল কাহির বিন তাহির বিন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯ হিঃ/ ১০৩৭ খৃঃ) তৎকালীন পৃথিবীতে আহলেহাদীছদের অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখেন, 'রূম সীমান্ত, আলজেরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান, বাবুল আবওয়াব (রায়) প্রভৃতি এলাকার সকলেই আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে ছিলেন। এমনিভাবে আফ্রিকা সীমান্ত, স্পেন ও পশ্চিম সাগরের পশ্চাদবর্তী সীমান্ত এলাকার সকল অধিবাসী আহলেহাদীছ ছিলেন। একইভাবে আবিসিনিয়ার তীরবর্তী ইয়ামন সীমান্তের সকল অধিবাসী (আহলেহাদীছ ছিলেন)। তবে তুরস্ক ও চীন অভিমুখী মধ্য তুর্কিস্তান (ما وراء النهر) সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে দু'টি দল ছিল। একদল শাফেঈ ও একদল আবু হানীফার অনুসারী।'[৪৪]

মাকদেসী ও আবদুল কাহির বাগদাদী বর্ণিত তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের সার্বিক মাযহাবী চিত্র সামনে রাখলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী হিজরীতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম এলাকাসমূহে আহলেহাদীছগণ নিজস্ব নাম, আকীদা ও আমলগত বৈশিষ্ট্য নিয়েই বসবাস করতেন। এটি এমন এক সময়ের বিবরণ, যখন আহলুর রায়, মু'তাযিলা, তুর্কী ও বুয়াইয়াগণ আব্বাসীয় খেলাফতের সহায়তায় তাদের মতবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। মামূন (১৯৮-২১৮ হিঃ/৮১৩-৮৩৩ খৃঃ), মু'তাছিম বিল্লাহ (২১৮-২২৭ হিঃ/৮৩৩-৪২ খৃঃ) ও ওয়াছিক বিল্লাহ (২২৭-২৩২/৮৪২-৪৭ খৃঃ) কর্তৃক মু'তাযিলা মতবাদ গ্রহণ করার ফলে তাঁদের সময়ে ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১ হিঃ) ও অন্যান্য আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের উপরে যে অমানুষিক অত্যাচার ও লোমহর্ষক নির্যাতন চালানো হয়, তা ভাবতেও গা শিউরে উঠে।[৪৫] এই ধরনের সার্বিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চাপের মুখেও খোদ মক্কা, মদীনা ও সিরিয়া সহ ইউরোপ, আফ্রিকা, রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, নিকট প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ শহর ও মুসলিম এলাকাসমূহে এমনকি সুদূর ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু দেশে পর্যন্ত আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যাধিক্য বিরাজ করা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার বৈ-কি! সুলায়মান নাদভী (১৩০২-১৩৭২/১৮৮৪-১৯৫৩) এজন্যই বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "সেই প্রাচীন যুগেও এখানে (সিন্ধুর রাজধানী মানছূরাতে) আহলেহাদীছের অবস্থান তাজ্জবের কথাই বটে!'[৪৬]

আহ্‌লেহাদীছ বিভিন্ন নামে

'আহ্‌লেহাদীছ' বিভিন্ন হাদীছের কিতাব ও বিশ্বস্ত ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহে 'আছহাবুল হাদীছ' আহ্‌লুস সুন্নাহ, আহ্‌লুস সুন্নাতে ওয়াল জামা'আত, আহ্‌লুল হক, আহ্‌লুল আছার, মুহাদ্দেছীন, মুহাম্মাদী, আছারী প্রভৃতি নামে কথিত হয়েছেন। সালাফে ছালেহীনের অনুসারী হওয়ার কারণে তাঁরা 'সালাফী' হিসাবেও পরিচিত।[৪৭] আহ্‌লেহাদীছগণ মিসর, সূদান, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে 'আনছারুস্ সুন্নাহ' সঊদী আরব ও কুয়েত প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে 'সালাফী' ইন্দোনেশিয়াতে 'জামা'আতে মুহাম্মাদিয়াহ' এবং ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ প্রভৃতি এলাকায় 'মুহাম্মাদী' ও 'আহ্‌লেহাদীছ' নামে পরিচিত।[৪৮] বাংলাদেশে বহু আহ্‌লেহাদীছের নামের শেষে 'ফারাযী' লকব দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এঁদের পূর্বপুরুষের অনেকেই ফরিদপুরের হাজী শরীয়াতুল্লাহ (১১৯৫-১২৫৫ হিঃ/১৭৮১-১৮৪০ খৃঃ) -এর 'ফারায়েযী' আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন অথবা ফারায়েযীগণের অনেকে পরবর্তীতে 'আহ্‌লেহাদীছ' হয়েছেন, কিন্তু পূর্বের লকব বজায় রেখেছেন। পাবনার চর এলাকায় এঁদেরকে 'কাবুলী' এবং বিহারের ছাহেবগঞ্জ এলাকায় 'পাহাড়িয়া জামা'আত' বলা হয়। এ নামগুলি ঊনবিংশ শতকে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বৃটিশ বিরোধী সীমান্তের জিহাদ কেন্দ্রগুলিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

উপমহাদেশে আহ্‌লেহাদীছগণের মধ্যে 'গোরাবায়ে আহ্‌লেহাদীছ' ও 'মুজাহেদীন' নামে দু'টি দল আছে। যারা অন্যান্য আহ্‌লেহাদীছের সঙ্গে মূলতঃ 'ইমারত'-এর প্রশ্নে বিভক্ত হয়েছেন। এঁরা 'ইমারত' ও 'বায়'আত' সম্পর্কিত ছহীহ হাদীছগুলিকে আক্ষরিক অর্থে পালন করতে চান। পক্ষান্তরে অন্যান্য আহ্‌লেহাদীছগণ উক্ত মর্মের হাদীছগুলিকে উদারভাবে গ্রহণ করেন ও নেতৃত্বের পদ্ধতিগত পরিবর্তন সঙ্গত মনে করেন।

'মুজাহেদীন' জামা'আত আমীর সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (১২০১-১২৪৬ হিঃ/১৭৮৬-১৮৩১ খৃঃ) ও আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬ হিঃ/১৭৭৯-১৮৩১ খৃঃ) -এর রেখে যাওয়া জিহাদ আন্দোলনের উত্তরসূরী হিসাবে নিজেদেরকে মনে করেন ও সর্বদা 'জিহাদ' জারি রাখার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

হিজরী প্রথম শতাব্দী হ'তেই মুসলিম উম্মাহ 'আহলুস সুন্নাহ' ও 'আহ্‌লুল বিদ'আ' দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। শেষোক্ত দলের পণ্ডিতগণ সেই হ'তেই 'আহ্‌লুল হাদীছ' বিদ্বানগণের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে এসেছেন এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। অথচ ঐসব বাজে নামের কোনটাই তাদের প্রাপ্য নয়।

ইমাম আবু উছমান ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯ হিঃ) বলেন যে, বিদ'আতীদের দেওয়া বাজে নামসমূহ স্রেফ দলীয় যিদ ব্যতীত কিছুই নয়। অথচ আহ্‌লে সুন্নাতের অন্য কোন নামই হ'তে পারেনা 'আহ্‌লেহাদীছ' ব্যতীত।[৪৯] শায়খ আবদুল কাদের জীলানী (৪৯১-৫৬১ হিঃ) বলেন, বিদ'আতীদের নিদর্শন হ'ল আহ্‌লেহাদীছদের নিন্দা করা ... এসবই কেবল দলীয় যিদ ও ক্রোধাগ্নি ব্যতীত কিছুই নয়। অথচ আহ্‌লেসুন্নাতের জন্য 'আহ্‌লেহাদীছ' ছাড়া অন্য কোন নাম নেই।[৫০]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) আহ্‌লুর রায়গণকে আহ্‌লেসুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেননি। বরং তাদেরকে অন্যান্য ভ্রান্ত দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৫১] ইমাম আবু উছমান ছাবূনী[৫২] (৩৭২-৪৪৯ হিঃ), ইমাম ইবনু কুতায়বা দীনাওয়ারী[৫৩] (২১৩-২৭৬), ইমাম হেবাতুল্লাহ লালকাঈ[৫৪] (মৃঃ ৪৪৮ হিঃ) প্রমুখ পণ্ডিতগণ আহ্‌লেহাদীছকেই মাত্র 'আহ্‌লেসুন্নাত' গণ্য করেছেন। আল্লামা আবদুল কাহির বিন তাহির বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯ হিঃ) 'আহ্‌লুল হাদীছ' ও 'আহ্‌লুর রায়'-কে যুক্তভাবে 'আহ্‌লেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের' দলভুক্ত গণ্য করেছেন।[৫৫] মুহাম্মাদ বিন আবদুল করীম শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হিঃ) ও তাই বলেন।[৫৬]

শায়খ আবদুল কাদের জীলানী (৪৯১-৫৬১ হিঃ) আহ্‌লেহাদীছকেই মাত্র আহ্‌লেসুন্নাত বলেছেন।[৫৭] তিনি 'আহ্‌লুর রায়' বলে পৃথক কোন দলের উল্লেখ না করে নু'মান বিন ছাবিত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অনুসারী কিছু লোক যারা ধারণা করেন যে, ঈমান কেবল আল্লাহ ও রাসূলকে জানা ও স্বীকৃতি দানের নাম (আমল ঈমানের অংশ নয়), তাদেরকে তিনি মুর্জিয়াদের ১২টি উপদলের অন্যতম উপদল হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[৫৮] তবে এ দুনিয়াতে যিনি যে নামেই পরিচিত বা অভিহিত হৌন না কেন, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে মানসূখ নয়, এমন কোন স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে নিজের ইমাম বা মাযহাবের বিপরীত হ'লেও তাকে নিঃশর্তে গ্রহণ ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া নিরপেক্ষ মুসলিম হিসাবে সকলের জন্য কর্তব্য বলে ধারণা করা চলে।

বিগত যুগের ন্যায় বর্তমান যুগেও আহ্‌লেহাদীছদেরকে বিভিন্ন দুর্নামের ভাগী হ'তে হয়। ভারতবর্ষে আহ্‌লেহাদীছগণকে ওয়াহ্‌হাবী, লা-মাযহাবী, রাফাদানী, গায়ের মুকাল্লিদ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অনেকে বে-দ্বীন অর্থেই তাদেরকে লা-মাযহাবী বলে থাকেন।[৫৯] বরং প্রচলিত চার মাযহাব বহির্ভূত মুসলমানদেরকে এক কথায় 'বিদ'আতী' জাহান্নামী ও প্রথম পথভ্রষ্ট' অভিহিত করে দায়িত্বশীল সরকারী প্রতিষ্ঠান হ'তে বই লিখে জনসাধারণ্যে প্রচার করা হয়ে

থাকে।[৬০] দায়িত্বশীল মহলের অবস্থা যখন এই, তখন অন্যেরা আহলেহাদীছ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করেন তা সহজেই অনুমেয়।

উপরের আলোচনায় এটুকু অন্ততঃ প্রতীয়মান হয় যে, স্বনামে, অন্য নামে বা বিকৃত নামে যেভাবেই হৌক না কেন, ছাহাবা যুগ থেকে এযাবত মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে 'আহ্‌লে হাদীছ' হিসাবে একটি দল বিরাজমান ছিল, আজও আছে। যাদের আক্বীদা ও আমলগত বৈশিষ্ট্য অন্যান্য মুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায় হ'তে স্বতন্ত্র, যা ইতিপূর্বেকার আলোচনায় প্রতীয়মান হয়।

আহ্‌লেহাদীছ-এর সংজ্ঞাঃ

পূর্বে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ দাঁড়াতে পারে। যেমন (১) আহ্‌লেহাদীছগণ সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই তাদের যথার্থ পথ প্রদর্শক হিসাবে গণ্য করেন (২) সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁরা বিগত কোন একজন মুজতাহিদের রচিত নির্দিষ্ট উছূলের দিকে ফিরে যান না বরং সর্বাবস্থায় প্রথমে কুরআন, অতঃপর হাদীছ, অতঃপর ছাহাবায়ে কেরামের আছার, অতঃপর আহ্‌লে সুন্নাতের অনুসরণীয় প্রথম যুগের মুজতাহিদগণের রায় সমূহ নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে তার আলোকে সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন (৩) তাঁরা 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ের ছহীহ হাদীছকে ক্বিয়াসের উপরে স্থান দিয়ে থাকেন (৪) তাঁরা সকল যুগের সকল আহ্‌লে সুন্নাত বিদ্বানকে শ্রদ্ধা করে থাকেন, কিন্তু কোন একজন নির্দিষ্ট মুজতাহিদের মাযহাব (School of thought)-এর তাক্বলীদ করেন না (৫) তাঁরা যুগ সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদ বা শরীয়ত গবেষণার দুয়ার সকল যুগের সকল শরীয়ত অভিজ্ঞ যোগ্য আলিমের জন্য উন্মুক্ত বলে মনে করেন।

এক্ষণে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির আলোকে আমরা আহ্‌লে হাদীছ-এর নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি। যেমন "যারা সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'তে সরাসরি অথবা তার ভিত্তিতে প্রদত্ত ফায়ছালাকে সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন ও নিঃশর্তভাবে তা গ্রহণ করেন, তাঁদেরকে 'আহ্‌লেহাদীছ' বলা হয়।"

টীকাসমূহ-২

১. (عن محمد بن سيرين قال .. لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنةُ قالوا سَمُّوا لنا رجالَكم فَيُنْظَرُ إلى أهل السنة فَيُوْخَذُ حديثُهم ويُنْظَرُ إلى أهل البدع فلا يوخذ حديثُهم ،) মুক্বাদ্দামা মুসলিমঃ (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ১৫।

২. (باب كيف يُقْبَضُ العلمُ.. كَتَبَ عمرُ بْنُ عبد العزيزِ إلى أبي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أُنْظُرْ ما كان من حديث رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فاكْتُبْهُ فإِ نِّي خِفْتُ دُرُوْسَ العلمِ و ذهابَ العُلَماءِ ولا يُقْبَلُ إلاحديثُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَلْيُفْشُوا العلمَ وَلْيَجْلِسُوا حتى يُعْلَمَ مَنْ لا يَعْلَمُ فان العلمَ لا يَهْلِكُ حتى يكونَ سراً، قال ابن حجر يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث الخ) .... ছহীহ বুখারীঃ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্মিয়াহ, অফসেট ছাপা, তারিখ বিহীন) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩; ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ খায়রিয়াহ প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৩১৯/১৯০১ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪০।

৩. ডঃ মুছতফা সাবাঈ, 'আস্-সুন্নাহ' (বৈরুতঃ ২য় সংস্করণ ১৩৯৬/১৯৭৬) পৃঃ ৫৮-৬১; ডঃ মুছতফা আযমী, 'দিরাসাত' (রিয়ায বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ১৩৯৬/১৯৭৬) পৃঃ ৭১-৮৩।

৪. ফাৎহুল বারী (মিসরী ছাপা) ১৩শ খণ্ড পৃঃ ২২৭।

৫. (عن أبي سعيد الخدريّ أنه كان اذا رأى الشبابَ قال مرحبًا بوصية رسول الله صلي الله عليه وسلم أمَرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نُوَسِّعَ لكم فى المجلس و أن نُفَهِّمَكُمُ الحديثَ فإنكم خُلُوْفُنَا و أَهْلُ الحديث بعدنَا) – ইমাম আবু বকর আহমাদ বিন আলী আল-খত্বীব বাগদাদী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ), আহলে হাদীছের মর্যাদা শীর্ষক পুস্তক 'শারফু আছহাবিল হাদীছ' (লাহোর, রিপন প্রেস, তারিখ বিহীন) পৃঃ ১২।

৬. ما حدثت إلا بما أجمع عليه أهل الحديث ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উছমান যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিঃ), হাফেযুল হাদীছগণের জীবনী 'তায্‌কেরাতুল হুফফায' (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৩।

৭. হাফেয খত্বীব বাগদাদী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ), 'তারীখু বাগদাদ' (কায়রোঃ ১৩৪৯/১৯৩১ খ্রীঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ২২৭।

৮. (و مِنْ أهل السنة والجماعة مذهبٌ قديمٌ معروفٌ قبل أن يَخْلُقَ اللّهُ أبا حنيفةَ ومالكا والشافعيَّ وأحمدَ فإنه مذهبُ الصحابةِ الذين تَلَقَّوْهُ عن نبيهم ..) – ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ, 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ' (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্মিয়াহ, তাবি, ১৩২২ হিঃ মিসরী ছাপা হ'তে ফটোকৃত) ১ম খণ্ড পৃঃ ২৫৬।

৯. ইমাম লালকাঈ প্রণীত আহলেহাদীছের আকীদার উপরে লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ..' তাহকীকঃ ডঃ আহমাদ সাআদ হামাদান (রিয়াযঃ দার

তাইয়িবা, সম্ভবতঃ ১৪০২/১৯৮২ খ্রীঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ২৯-৪৯। যেমন-

১- ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে নেতৃস্থানীয়গণঃ

১. আবু বকর ছিদ্দীক (মৃঃ ১৩ হিঃ) ২. ওমর বিনুল খাত্তাব (শাহাদাত ২৩ হিঃ) ৩. ওছমান বিন আফ্‌ফান (শা-৩৫) ৪. আলী ইবনু আবী তালিব (শা-৪০) ৫- যুবায়ের বিনুল আওয়াম (-৩৬) ৬- সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাছ (-৫৪) ৭- সাঈদ বিন যায়েদ (-৫০) ৮- আবদুর রহমান বিন আওফ (-৩১) ৯- আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (-৩২) ১০- মু'আয বিন জাবাল (-১৭) ১১- উবাই বিন কা'আব (-২২) ১২- আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (-৬৮) ১৩- আবদুল্লাহ বিন ওমর (-৮৪) ১৪- আবদুল্লাহ বিন আমর বিনুল আছ (-৬৫) ১৫- আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (১-৭৩) ১৬- যায়েদ বিন ছাবিত (মৃঃ ৪৫ অথবা ৪৬, ৫১, ৫৬ হিঃ) ১৭- আবুদ্দারদা (-৩১ অথবা ৩২) ১৮- উবাদাহ বিন ছামিত (-৩৪) ১৯- আবু মূসা আশ'আরী (-৪৪; ছিফ্‌ফীন যুদ্ধে আলী পক্ষীয় শালিশ) ২০- ইমরান বিন হুছাইন (-৫২) ২১- আম্মার বিন ইয়াসির (-৩৭) ২২- আবু হুরায়রাহ (-৫৭; হাদীছের শ্রেষ্ঠ হাফেয ছাহাবী) ২৩- হুযায়ফা বিনুল ইয়ামান (-৩৬) ২৪- ওকবা বিন আমির (-৪১ সম্ভবতঃ) ২৫- সালমান ফারসী। ইনি ২৫০ বা ২৮০ বছর এবং কারো মতে ৩৫০ বছর বেঁচেছিলেন ও ৩৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ২৬- জাবির বিন আবদুল্লাহ (-৭৪) ২৭- আবু সাঈদ খুদরী (-৭৪) ২৮- হুযায়ফা বিন আসীদ আল-গিফারী (-৪২) ২৯- আবু উমামা ছুদাই বিন আজলান (-৮৬) ৩০- জুনদুব বিন আবদুল্লাহ ৩১- আবু মাসঊদ উকবা বিন আমর (-৪০) ৩২- ওমায়ের বিন হাবীব ইবনু খুমাশাহ ৩৩- আবুত্‌ তোফায়েল আমির বিন ওয়াছিলাহ (মৃঃ ১০০ হিঃ অথবা তার পরে; সর্বশেষ মৃত ছাহাবী) ৩৪- আয়েশা বিনতে আবু বকর উম্মুল মুমিনীন (-৫৮) ৩৫- উম্মে সালামাহ হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া উম্মুল মুমিনীন (-৬২) রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম।

২- মদীনাবাসী তাবেঈগণ - ১ম স্তরঃ ক-

১. সাঈদ বিনুল মুসাইয়িব (১৫-৯৪ হিঃ)। ইনি মদীনার সেরা সাতজন ফক্বীহ ও সকল তাবেঈর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান (৬৫-৮৬) তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসাবে স্বীয় দুই পুত্র ওয়ালীদ ও সুলায়মানকে মেনে নেওয়ার আহবান জানালে তিনি অস্বীকার করেন। ফলে তাঁকে কারারুদ্ধ করে প্রহার ও নির্যাতন করা হয়। ২- ওরওয়াহ বিন যুবায়ের বিনুল আওয়াম (২৩-৯৪)। মদীনার শ্রেষ্ঠ সাতজন ফক্বীহের অন্যতম ছিলেন। উমাইয়াদের শাসন অপসন্দ করায় তিনি মদীনা হতে বেরিয়ে 'আকীক' নামক স্থানে বসবাস করেন। ৩- কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবুবকর ছিদ্দীক (৭০ বছর বয়সে ১০১, ১০২, ১০৬ বা তার পরে মৃত্যু বরণ করেন)। মদীনার সর্বাধিক মুত্তাক্বী ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছগণের অন্যতম। ৪- সালেম বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর (-১০৬ বা ১০৮) মদীনার ফক্বীহ সপ্তকের অন্যতম ছিলেন। ৫- সুলায়মান বিন ইয়াসার (৭৩ বছর বয়সে ৯৪ হিঃ বা তার পরে মৃত্যুবরণ করেন) মদীনার ফকীহ সপ্তকের অন্যতম ছিলেন। ৬- মুহাম্মাদ বিনুল হানাফিইয়াহ (-৮১) মায়ের বংশ বনূ হানীফার দিকে সম্পর্কিত আলী

(রাঃ)-এর পুত্র। ইসলামের প্রাথমিক যুগের যবরদস্ত পরহেযগার আলেম হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৭- আলী বিন হুসাইন বিন আলী 'যয়নুল আবেদীন' (৩৩-৯২ বা তার পরে)। ধৈর্য ও পরহেযগারীতে ইনি কিংবদন্তীর মত ছিলেন। ৮- মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসাইন (৫৬-১১৪)। ইনি 'ইমাম বাকের' নামে খ্যাত। ফকীহ তাবেঈদের অন্যতম ছিলেন। ৯- ওমর বিন আবদুল আযীয (৬০-১০১)। '১ম শতাব্দী হিজরীর মুজাদ্দিদ' খলীফা হিসাবে খ্যাত। ১০- কা'আব আল-আহবার (-৩২)। এই খ্যাতনামা ইহুদী আলেম আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন ও ওমর (রাঃ)-এর সময়ে মদীনায় আসেন। সিরিয়ার 'হিমৃছ' নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। বিগত যুগের উম্মতের অবস্থাদি সম্পর্কে ছাহাবীগণ তাঁর নিকট থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতেন। ১১- যায়েদ বিন আসলাম (-১৩৬)। ইনি মদীনার খ্যাতনামা মুফাস্‌সির ছিলেন।

খ- ২য় স্তরঃ

১. মুহাম্মাদ বিন মুসলিম ওরফে ইবনু শিহাব যুহ্‌রী (৫০-১২৪) হাদীছের খ্যাতনামা হাফেয ও ফক্বীহ। ইনিই দ্বিতীয় শতকের প্রথম হাদীছ সংকলক ছিলেন। ২- রাবী'আহ বিন ফাররূখ (-১৩৬) মদীনার মুফতী ছিলেন ৩- আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ বিন হুরমুয। মদীনার অন্যতম সেরা ফকীহ ছিলেন। ৪- যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইন (-১২২) 'বনূ হাশিম-এর বাগ্মী' নামে পরিচিত, ফকীহ ও বীর পুরুষ ছিলেন। উমাইয়া খলীফা হিশাম বিন আবদুল মালিক (১০৫-১২৫)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। ৫- আবদুল্লাহ বিন হাসান (-১৪৫)। মদীনার এই খ্যাতনামা তাবেঈ কূফার মানছূরা জেলখানায় মৃত্যুবরণ করেন। ৬- জা'ফর বিন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন ওরফে 'ইমাম জাফর ছাদিক' (৮০-১৪৮) মদীনার বুযর্গ তাবেঈদের অন্যতম ছিলেন।

গ-৩য় স্তরঃ

১. মালিক বিন আনাস (৯৩-১৭৯) ওরফে ইমাম মালিক, 'মুওয়াত্ত্বা' নামক বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থের সংকলক। ২- আবদুল আযীয বিন সালামা আল-মাজেশূন (-১৬৪) মদীনার প্রসিদ্ধ ফকীহদের অন্যতম ছিলেন।

ঘ- তৎপরবর্তীগণঃ

১. আবদুল মালিক বিন আবদুল আযীয (-২১২) ২- ইসমাঈল বিন আবু উওয়াইস (-২২৬), ইমাম মালিক-এর ভাগিনেয়। ৩- আহমাদ বিন আবুবকর যুহ্‌রী (-২৯২)। ৪- ইয়াহ্‌ইয়া বিন আবু কাছীর (-১২৯)। ইমাম আহ্‌মাদ তাঁকে ইমাম যুহ্‌রী (৫০-১২৪) -এর ন্যায় গণ্য করেন এবং কেউ কেউ তাঁকে ইমাম যুহ্‌রীর উপরে স্থান দিয়েছেন।

৩- মক্কাবাসী তাবেঈগন- ১ম স্তরঃ ক-

১. আতা বিন আবী রিবাহ (-১১৪) ২- তাউস বিন কায়সান (-১০৬) ৩- মুজাহিদ বিন জাবার (-১১৪) খ্যাতনামা মুফাস্‌সির। ৪- আব্দুল্লাহ বিন ওবায়দুল্লাহ ওরফে ইবনু আবী মুলাইকাহ (-১১৭)। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (১-৭৩)-এর খিলাফত কালে (৬৪-৭৩) ইনি মক্কার কাযী ছিলেন।

খ- পরবর্তীগণঃ

১. আমর বিন দীনার (-১২৬) ২- আবদুল্লাহ বিন তাঊস বিন কায়সান (-১৩২) ৩- আবদুল মালিক বিন আবদুল আযীয ওরফে ইবনু জুরাইজ (-১৫০) ৪- নাফে' বিন ওমর আল-জামহী (-১৭৯) ৫- সুফিয়ান বিন ওয়ায়না (১০৭-১৯৮) ৬- ফুযাইল বিন আয়ায (-১৮৭) ৭- মুহাম্মাদ বিন মুসলিম তায়েফী (-১৭৭) ৮- ইয়াহ্‌ইয়া বিন সালীম তায়েফী (১৯৫) ৯- মুহাম্মাদ বিন ইদরীস ওরফে ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪)। ফিলিস্তিনের গাযায় জন্মগ্রহণ, মক্কায় বসবাস ও মিসরে মৃত্যুবরণ করেন। হাদীছ ও ফিক্‌হের খ্যাতনামা ইমাম। ১০- আবদুলাহ বিন ইয়াযীদ (-২১৩) ১১- আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের আল-হুমায়দী (-২১৯) রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম।

৪- সিরিয়া ও আলজিরিয়ার তাবেঈগণ- ১ম স্তরঃ

১. আবদুল্লাহ বিন মুহাইরীয (-৯৯) ২- রাজা' বিন হায়ওয়াহ (-১১২) সিরিয়ার আলিমদের নেতা (شيخ أهل الشام) হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ইশারায় খলীফা সুলায়মান বিন আবদুল মালেক (৯৬-৯৯) তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসাবে চাচাতো ভাই ওমর বিন আবদুল আযীয (৬০-১০১)-কে মনোনীত করেন। ৩- উবাদাহ বিন নুসাই (-১১৮) ৪- মায়মূন বিন মিহ্‌রান (-১১৭) ৫- আবদুল করীম বিন মালিক আল-জাযারী (-১২৭)।

খ- পরবর্তীগণঃ

১. আবদুর রহমান বিন আমর ওরফে ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭)। সিন্ধুর বংশোদ্ভূত, দামেস্কে বসবাস ও বৈরুতে মৃত্যু বরণ করেন। স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। ২- মুহাম্মাদ বিন ওয়ালীদ যুবায়দী (-১৪৮) ৩- সাঈদ বিন আবদুল আলী তানূখী (-১৬৭) ৪- আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (-১৫৩) ৫- আবদুল্লাহ বিন শাওযাব খোরাসানী (-১৪৪)। ৬- ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আল-ফাযারী (-১৮৫)।

গ- পরবর্তীগণঃ

১. আবদুল আ'লা বিন মাসহার ওরফে আবু মাসহার দিমাশ্‌কী (-২১৮)। 'কুরআন সৃষ্ট' এই মু'তাযিলী আকীদার বিরোধিতা করায় আব্বাসীয় খলীফা মামূন (১৯৮-২১৮)-এর কারাগারে নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ২- হিশাম বিন আম্মার (-২৪৫) ৩- মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান ওরফে 'লাভীন' (لوين)। ইল্‌মুল ফারায়েয-এ অভিজ্ঞ ছিলেন। কূফায় জন্ম, সিরিয়ায় বসবাস ও সেখানেই ২৪০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৫- মিসরীয় তাবেঈগণ- ১ম স্তরঃ ক-

১. হায়ওয়াহ বিন শুরাইহ (-১৫৮) ২- লাইছ বিন সা'আদ (৯৪-১৭৫) ৩- আবদুল্লাহ বিন লাহি'আহ (-১৭৪)।

খ- পরবর্তীগণঃ

১. আবদুল্লাহ বিন অহাব (-১৯৭) ২- আশহাব বিন আবদুল আযীয (-২০৪) ৩- আবদুর রহমান বিন কাসিম (-১৯১) ৪- ইসমাঈল বিন ইয়াহ্‌ইয়া মুযানী (-২৬৪); ইমাম

শাফেঈর নিকটতম ও খ্যাতনামা শিষ্য। ৫- ইউসুফ বিন ইয়াহ্ইয়া বুওয়াইত্বী (-২৩১)। ইমাম শাফেঈ-র শিষ্য। 'কুরআন সৃষ্ট' কি-না এ কথার জওয়াব দিতে অস্বীকার করায় আব্বাসীয় খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র (২২৭-২৩২) হুকুমে তাঁকে বাগদাদে ডেকে এনে বন্দী করা হয় ও কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হয়। ৬- রবী' বিন সুলায়মান (-২৭০) ৭- মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ (-২৬৮)। 'কুরআন সৃষ্ট' এই মু'তাযিলী ফিৎনায় ইনিও সরকারী নির্যাতনের শিকার হন।

৬- কূফাবাসী তাবেঈগণঃ

১. আলক্বামা বিন ক্বায়েস (-৬২) ২- আমির বিন শারাহীল (-১০৫) ৩- সাঈদ বিন ফীরোয ওরফে আবুল বাখ্‌তারী। উমাইয়া গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৭৬-৯৬)-এর লোকেরা তাঁকে হত্যা করে। ৪- ইব্‌রাহীম বিন ইয়াযীদ ওরফে ইমাম নাখ'ঈ (-৯৬)। তাঁর বয়স ৪০ পূর্ণ হয়নি। ৫- তালহা বিন মুছরিফ (-১১২) ৬- যুবাইদ বিনুল হারিছ (-১২৩) ৭- হাকাম বিন উতাইবাহ (৫০-১১৩) ৮- মালিক বিন মিগওয়াল (-১৫৭) ৯- ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ তায়মী (-১৪৫) ১০- আবদুল মালিক বিন সাঈদ। ১১- হামাযাহ বিন হাবীব (-১৫৬) ১২- মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান ওরফে ইমাম ইবনু আবী লায়লা (-১৪৮) ১৩- সুফিয়ান বিন সাঈদ ওরফে ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১) ১৪- শারীক বিন আবদুল্লাহ (-১৭৭) ১৫- যায়েদাহ বিন কুদামা (-১৬১) ১৬- আবুবকর বিন আইয়াশ (-১৯৩) ১৭- আবদুল্লাহ বিন ইদরীস (-১৯২) ১৮- আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ (-১৯৫) ১৯- ইয়াহ্ইয়া বিন আবদুল মালিক (-১৮৬) ২০- অকী' বিনুল জাররাহ (-১৯৭) ২১- হাম্মাদ বিন উসামাহ (-২০১) ২২- জা'ফর বিন 'আওন (-২০৯) ২৩- মুহাম্মাদ বিন উবায়েদ (-২০৪) ২৪- ফযল বিন দাকীন (-২১৯)। 'কুরআন সৃষ্ট'-এই ফিৎনায় ইনিও পরীক্ষিত হন। ২৫- আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইউনুস (-২২৭) ২৬- আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ওরফে ইমাম আবুবকর ইবনু আবী শায়বাহ (-২৩৫) ২৭- তাঁর ভাই উছমান বিন মুহাম্মাদ (-২৩৯) ২৮- মুহাম্মাদ বিনুল 'আলা আল-হামাদানী (-২৪৮)।

৭- বছরাবাসী তাবেঈগণ- ১ম স্তরঃ ক-

১. আবুল আলিয়াহ রুফাই বিন মিহ্‌রান (-৯৩) ২- হাসান বিন ইয়াসার ওরফে হাসান বছরী (২১-১১০) ৩- মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০) ৪- আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (-১০৪)।

খ- পরবর্তীগণঃ

১. আইয়ূব সাখ্‌তিয়ানী (-১৩১) ২-ইউনুস বিন উবায়েদ (-১৩৯) ৩- আবদুল্লাহ বিন আওন (-১৫১) ৪- সুলাইমান বিন তুরখান তায়মী (-১৪২) ৫- আবু আমর বিনুল 'আলা (-১৫৪)। খ্যাতনামা ব্যাকরণবিদ ও প্রসিদ্ধ ক্বারী সপ্তকের অন্যতম। ৬- হাম্মাদ বিন সালামাহ (-১৬৭) ৭- হাম্মাদ বিন যায়েদ (-১৭৯) ৮- ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্ত্বান (-১৯৮) ৯- মু'আয বিন মু'আয (-১৯৬) বছরার কাযী ছিলেন। ১০- আবদুর রহমান বিন মাহদী (-১৯৮) ১১-অহাব বিন জারীর (-২০৬) ১২- আলী বিন আবদুল্লাহ ওরফে ইবনুল মাদীনী (-২৩৪) ১৩- আব্বাস বিন আবদুল আযীম আম্বরী

(-২৪৬) ১৪- মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার (-২৫২) ১৫- সাহাল বিন আবদুল্লাহ তাসতারী (-২৮৩)।

৮- ওয়াসিত্বাসী বিদ্বানগণের মধ্যেঃ

১. হুশাইম বিন বাশীর (-১৮৩) ২- আমর বিন আওন (-২২৫) ৩- শায বিন ইয়াহ্ইয়া ৪- অহাব বিন বাক্বিয়াহ ওরফে ওয়াহ্বান (وهبان) (-২৩৯) ৫- আহমাদ বিন সিনান (-২৫৬)।

৯- বাগদাদবাসী বিদ্বানগণের মধ্যেঃ

১. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ওরফে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১) ২- ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন (-২৩৩)। ইনি প্রায় ৭৭ বৎসর বেঁচে ছিলেন। ৩- আবু ওবায়েদ কাসেম বিন সাল্লাম (-২২৪) ৪- আবু ছওর ইবরাহীম বিন খালেদ (-২৪০) ৫- যুহাইর বিন হারব আবু খায়ছামা (-২৩৪) ৬- হাসান বিন ছাবাহ আল- বারায (-২৪৯) ৭- আহমাদ বিন ইবরাহীম দারূকী (-২৪৬) ৮-মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (২২৪-৩১০)। খ্যাতনামা মুফাস্সির ও ইতিহাসবিদ। ৯- আহমাদ বিন সালমান (-৩৪৮) ১০- মুহাম্মাদ বিনুল হাসান (-৩৫১)।

১০- মুছেলবাসীদের মধ্যেঃ

১. মা'আফী বিন ইমরান আল মূছেলী (-২৮৪)।

১১- খোরাসানবাসীদের মধ্যেঃ

১. আবদুল্লাহ বিন মুবারক আল-মারওয়াযী (১১৮-১৮১) ২- ফযল বিন মূসা সায়নানী (-১৯২) ৩- নযর বিন মুহাম্মাদ (-১৮৩) ৪- নযর বিন শুমাইল মাযেনী (-২০৩) ৫- নাঈম বিন হাম্মাদ (-২২৮)। ইনিও 'কুরআন সৃষ্ট'-এই মু'তাযিলী ফিৎনায় পরীক্ষিত হন। ৬- ইসহাক বিন ইবরাহীম ওরফে ইমাম ইসহাক বিন রাহ্ওয়াইহ (১৬৬-২৩৮)। হাদীছ ও ফিক্হের বিখ্যাত ইমাম। ৭- আহমাদ বিন সাইয়ার (-২৬৮) ৮- মুহাম্মাদ বিন নছর আল-মারওয়াযী (২০২-২৯৪) সমরকন্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি স্বীয় যুগে আহলেহাদীছগণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম ছিলেন (قال الحاكم : كان إمام أهل الحديث فى عصره بلا مدافعة، طبقات الحفاظ للسيوطى ص ٢٨٥) ৯- ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া নিশাপুরী (১৪২-২২৬)। ১০- মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া যুহলী (-২৫৮) ১১- মুহাম্মাদ বিন আসলাম তূসী (-২৪২) ১২- হামীদ বিন যানজাবিয়া নাসাভী (-২৫১) ১৩- ওবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ সারখাসী (-২৪১) ১৪- আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান সমরকন্দী (-২৫০) ১৫- মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওরফে ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬) ১৬- ইয়াকূব বিন সুফিয়ান ফাসাভী (-২৭৭) ১৭-সুলায়মান বিন আশ'আছ সিজিস্তানী ওরফে ইমাম আবু দাউদ (২০২-২৭৫) ১৮-আহমাদ বিন শু'আইব আবু আবদুর রহমান ওরফে ইমাম নাসাঈ (২১৫-৩০৩) ১৯- আবু ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা ওরফে ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯) ২০-মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ওরফে ইমাম ইবনু খুযায়মা (২২৩-৩১১) ২১- মুহাম্মাদ বিন আকীল বাল্খী (-৩১৬)।

১২-রায়বাসীদের মধ্যেঃ

১. ইবরাহীম বিন মূসা আল-ফাররা' (-২৩০) ২- ওবায়দুল্লাহ বিন আবদুল করীম ওরফে ইমাম আবু যুর'আ রাযী (-২৬৪) ৩- মুহাম্মাদ বিন ইদরীস ওরফে আবু হাতেম রাযী (-২৭৭) ৪- মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন ওয়ারিহ্ (-২৭০) ৫- আবু মাসঊদ আহমাদ বিনুল ফোরাত (-২৫৮) ৬-আবদুর রহমান বিন ইমাম আবু হাতেম রাযী (-৩২৭)।

১৩-তাবারিস্তানবাসীদের মধ্যেঃ

১. ইসমাঈল বিন সাঈদ শালান্জী (-২৩০ বা ২৪৬) ২- হুসাইন বিন আলী তাবারী ৩- আবু নাঈম আবদুল মালিক বিন আদী আল-ইস্তিরাবাদী (-২৮৮) ৪- আলী বিন ইবরাহীম আল-ক্বাযভীনী (-৩৪৫)।

মোট=১- ছাহাবীদের মধ্যে=৩৫; ২- মদীনাবাসী তাবেঈঃ ১ম স্তর=১১, খ-২য় স্তর=৬, গ-৩য় স্তর=২, ঘ-তৎপরবর্তীগণ=৪; ৩-মক্কাবাসী তাবেঈঃ ১ম স্তর=৪, খ-পরবর্তীগণ=১১; ৪- সিরিয়া ও আলজেরিয়ার তাবেঈঃ ১ম স্তর=৫, খ-পরবর্তীগণ=৬, গ-পরবর্তীগণ=৩; ৫- মিসরী তাবেঈঃ ১ম স্তর=৩, খ-পরবর্তীগণ=৭; ৬-কূফাবাসী তাবেঈঃ ২৮; ৭-বছরাবাসী তাবেঈঃ ১ম স্তর=৪, খ-পরবর্তীগণ=১৫; ৮- ওয়াসিত্বাসী বিদ্বানগণের মধ্যে=৫; ৯- বাগদাদবাসীগণের মধ্যে=১০; ১০-মূছেলবাসীদের মধ্যে=১; ১১- খোরাসানীদের মধ্যে=২১; রায়বাসীদের মধ্যে=৬; ১৩- তাবারিস্তানবাসীদের মধ্যে=৪, সর্বমোট=১৯১। -লালকাঈ, 'উছূলু ই'তিক্বাদ' ১ম খণ্ড পৃঃ ২৯-৪৯।

১০. ইমাম ছাবূনী, 'আহলেহাদীছের আক্বীদা' বিষয়ক পুস্তক 'আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ' তাহক্বীকঃ বদর আল-বদর (ছাফাত, কুয়েতঃ দার সালাফিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৪ / ১৯৮৪ খ্রীঃ) পৃঃ ১১০-১১১। যেমন ১- ইমাম সাঈদ বিন জুবায়ের (ইরাকের উমাইয়া গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৭৬-৯৬) তাঁকে ৯২ হিজরীতে মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে হত্যা করেন) ২- জারীর বিন আবদুল হামীদ কূফী (১১০-১৮৮) ৩-মুহাম্মাদ বিন আসলাম তূসী (-২৪২) ৪- মুসলিম বিনুল হাজ্জাজ কুশায়রী ওরফে ইমাম মুসলিম (২০৪-২৬১) ৫- উছমান বিন সাঈদ ওরফে ইমাম দারেমী (২০০-২৮০) ৬- আবু ইয়াকূব ইসহাক বিন ইসমাঈল বাসৃতী ৭- হাসান বিন সুফিয়ান নাসাঈ (-৩০৩) ৮- আবু সাঈদ ইয়াহ্ইয়া বিন মানছূর আল-হারভী (-২৮৭) ৯- আবু হাতিম আদী বিন হামদাভিয়া ছাবূনী ও তাঁর দুই পুত্র 'সুন্নাতের দুই তরবারি' নামে খ্যাত, ১০- আবু আবদুল্লাহ ছাবূনী ও ১১- আবু আবদুর রহমান ছাবূনী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

১১. ইবনু নাদীম বাগদাদী(মৃঃ ৩৭০ হিঃ), 'কিতাবুল ফিহ্রিস্ত' (বৈরুতঃ মাকতাবা খাইয়াত্ব, তারিখবিহীন) পৃঃ ২২৫-২৩৪)। যেমন ১- আবু আবদুর রহমান মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান (-১৫৯) ২- আবদুর রহমান বিন যায়েদ (হারূণ-এর খেলাফতের (১৭০-১৯৩) প্রথমদিকে মৃত্যুবরণ করেন) ৩- আবদুর রহমান বিন আবুয যিনাদ (-১৭৪) ৪- আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ (-১৫০) ৫- মুগীরাহ বিন কাসিম আয-যাবী (-১৩৬) ৬- মুহাম্মাদ বিন ফুযাইল আয-যাবী (-১৯৫) ৭- ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া আবু সাঈদ (-১৮৩) ৮- ফযল বিন দুকাইন আবু নু'আইম (-২১৯) ৯- ইয়াহ্ইয়া বিন আদম (-২০৩) ১০-সাঈদ বিন মিহরান ইবনু আবী আরূবাহ (-১৫৭) ১১- ইসমাঈল বিন উলাইয়াহ (১১৬-১৯৩)

১২- ইবরাহীম বিন ইসমাঈল (১৫২-২১৮) ১৩-রওহ বিন উবাদাহ (২০০ হিজরীর পরে মৃত্যু) ১৪- ইমাম মাকহুল (-১১৬) ১৫- অলীদ বিন মুসলিম (-১৯৪) ১৬- আবদুর রায্‌যাক বিন হুমাম (-২১১) ১৭- ইয়াযীদ বিন হারূণ (-২০৬) ১৮-ইসহাক্ব আল-আযরাক্ব (-১৯৫) ১৯- আবদুল ওয়াহ্‌হাব বিন আতা (মৃঃ ২০০ হিজরীর পরে) ২০- ইবরাহীম বিন তুহমান হারাভী ২১- হাসান বিন ওয়াকিদ মারওয়াযী ২২- আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিনুল হাজ্জাজ মারওয়াযী ২৩- আবু বকর আহমাদ বিন আবু খায়ছামা (-২৭৯) ২৪- তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ২৫- হাসান বিন আলী আল-মা'মারী ২৬- হুসাইন বিন মওদূদ আল-হাররানী আবু আরূবাহ ২৭- সুরাইজ বিন ইউনুস আবুল হারিছ মারওয়াযী ২৮- আবু উমার হিফ্‌ছ আয-যারীর ২৯-ফযল বিন শাদান রাযী ৩০-ইবরাহীম বিন ইসহাক হারবী (-২৮৫) ৩১- মুতাইয়িন বিন আইয়ূব (-২৯৮) ৩২- জা'ফর বিন মুহাম্মাদ আল-ফিরিয়াবী (-৩০০) ৩৩- খলীফা বিন খাইয়াত্ব আল-বাছারী (১৬০-২৪০। 'তাবাক্বাত'-এর স্বনামধন্য লেখক। ৩৪- আবু মুসলিম আল-কুজাই ৩৫- আবুবকর বিন সুলায়মান; ইমাম আবু দাউদের মুহাদ্দিছ পুত্র (-৩১৬)। ৩৬- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মাখলাদ (২৩৩-৩৩১) ৩৭-কাযী আবু আবদুল্লাহ হুসাইন বিন ইসমাঈল মাহামেলী (২৩৫-৩৩০) ৩৮- জা'ফর আদ-দাক্বাক্ব (-৩৩০) ৩৯- আবু মুহাম্মাদ ইয়াহ্‌ইয়া বিন ছা'এদ (-৩১৮) ৪০- আবুল কাসেম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বাগাভী (২১৪-৩১৭) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

১২. কিতাবুল ফিহ্‌রিস্ত পৃঃ ২০১-১৬ এবং ২৩৪।

১৩. অলিউল্লাহ দেহলভী, 'ইকদুল জীদ' (লাহোরঃ উর্দূ অনুবাদসহ, ছিদ্দীকী প্রেস, তারিখ বিহীন) পৃঃ ৯৮।

১৪. খতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ (কায়রোঃ ১৩৪৯/১৯৩১ খ্রীঃ) ১০ম খণ্ড পৃঃ ৩১০, ১২শ খণ্ড পৃঃ ২৪৫, ১৪শ খণ্ড পৃঃ ১০৯।

১৫. (وقد تَواتَرَ عن الصحابة والتابعينَ أنهم كانوا إذا بَلَغَهم الحديثُ يَعْملون به من غيرأن يُلاحظوا شرطا) - শাহ অলিউল্লাহ প্রণীত 'আল-ইনছাফ ফী বায়ানে আসবাবিল ইখ্‌তিলাফ' তাহকীকঃ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (বৈরূতঃ দারুন নাফাইস, ১ম সংস্করণ ১৩৯৭/১৯৭৭) পৃঃ ৭০।

১৬. হুজ্জাতুল্লাহির বালিগাহ (মিসরী ছাপা ১৩২২ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১২৩-২৪; ঐ (কায়রো ছাপা ১৩৫৫ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫৫।

১৭. খলীফা প্রদত্ত ফায়ছালা ছিল নিম্নরূপঃ (عن مَخْلَد بن خُفافٍ قال إبْتَعْتُ غلاما فاستغللتُه ثم ظهرتْ منه على عيب فخاصمتُ فيه إلى عُمَرَ بْنِ عبد العزيز فقَضَى لى بردِّه وقضى عليَّ بردِّ غلَّتِه فأتيتُ عروةَ فأخبرتُه فقال أروحُ إليه العشيَّةَ فأُخْبِرُه أن عائشةَ أخبرَتْني أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فى مثل هذا أن الخَراجَ بالضمانِ فعجلْتُ إلى عُمَرَ فأخبرتُه مما أخبرَني به عروةُ عن عائشةَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمرُ بن عبد العزيز فما أيسرَعليَّ من قضاءٍ قضيتُه واللّهُ يعلمُ أن لم أُرِدْ فيه إلا الحقَّ فبلغَتْني فيه سنةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد قضاء عمر وأنفذ سنةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فراحَ إليه عروةُ فقَضَى لى أن أخذ الخراج من الذى قَضَى به عليَّ له)- = ইমাম ফুল্লানী

(১১৬৬-১২১৮), ঈকাযু হিমাম (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ১৩৯৮/১৯৭৮) পৃঃ ৬-৯।

১৮. (فإن قالوا فإن أهلَ المقالاتِ المختلفةِ يَرَى كُلُّ فريقٍ منهم أن الحقَّ فيما اعتقدَه وإن مُخالفَه على ضلالٍ و هَوًى وكذلك أصحابُ الحديث فيما انتحَلُوا، فمنْ أين عَلِمُوا علمًا يقينًا أنهم على الحق؟ قيل لهم إن أهل المقالات و إن اختلفوا و رأى كُلُّ صِنْفٍ منهم أن الحقَّ فيما دعا إليه ، فأ نهم مُجْمَعُون لا يختلفون على أنّ مَنِ اعتصمَ بكتاب الله عز و جل و تمسَّك بسنةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استضاء بالنور واستفتح باب الرشد وطلب الحق من مظانه ،وليس يدفع أصحابَ الحديث عن ذلك إلا ظالمٌ لانهم لايردون شيئا من أمر الدين إلى استحسان و لا إلى قياس ونظر ولا إلى أصحاب الكلام المتأخرين).... ইমাম ইবনু কুতাইবা (২১৩-২৭৬) রচিত বাহ্যতঃ পরস্পরবিরোধী হাদীছ সমূহের সামঞ্জস্য বিধান সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থ (মোট ৪৬৪ পৃষ্ঠা) 'তাবীলু মুখতালাফিল হাদীছ' (মিসরঃ কুর্দিস্থান প্রেস ১৩২৬ হিঃ/ ১৯০৮ খৃঃ) পৃঃ ১০৩।

১৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৪।

২০. (وانقسَمَ الفقهُ فيهم إلى طريقتين ، طريقةُ أهلِ الرأى والقياسِ وهم أهلُ العراقِ وطريقةُ أهلِ الحديثِ وهم أهلُ الحجازِ وكان الحديثُ قليلا فى أهل العراقِ لِمَا قدَّمْناه فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهلُ الرأيِ ومُقَدَّمُ جماعتِهم الذى استقرَّ المذهبُ فيه وفى أصحابه أبو حنيفة و إمام أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعى من بعده ثم أنكر القياسَ طائفةٌ من العلماءِ وأبطلوا العمَلَ به و هم الظاهريةُ.. وكانت هذه المذا هبُ الثلاثةُ هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمة)- তারীখু ইবনে খালদূন (বৈরুতঃ মুওয়াস্সাসাতুল আ'লামী, তারিখ বিহীন) ১ম খণ্ড (মুকাদ্দামা) পৃঃ ৪৪৬।

২১.(ক) (أصنا ف المجتهدين .. ثم المجتهدون من أئمة الأمة محصورون فى صنفين لا يعدوان إلي ثالثٍ أصحابُ الحديث و أصحابُ الرأ ى -أ صحا بُ الحديث و هم أهل الحجاز و إنما سُمُّوا أصحابُ الحديث لان عنايتهم بتحصيل ا لاحاديث و نقل الاخبار و بناء الاحكام على النصوص و لا يَرجِعون إلى القياس الجلى و الخفى ما وجدوا خبرا أو أثرا ... و أصحابُ الرأ ى و هم أهل العرا ق هم أصحابُ أبى حنيفةَ النعمانَ بنِ ثا بتٍ... و إنما سُمُّوا أصحابُ الرأ ى لان أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس والمعنى المستنبط من الاحكام و بناء الحوادث عليها و ربما يقدمون القيا سَ الجليَّ على آحاد ا لاخبار)

শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ্, তাহকীকঃ সাইয়িদ গীলানী, তারিখ বিহীন) ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৬-৭ (খ) ইবনে হযম, 'আল-ফিছাল ফিল মিলাল' (বৈরুতঃ মাকতাবা খাইয়াত ১৩২১ হিঃ) ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৫ (গ) আহলেহাদীছ-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন

(من المعلوم لكل من له خبرة أن أهل الحديث من أعظم الناس بحثا عن أقوال النبى (ص) و طلبا لعلمها و أرغب الناس فى إتباعها و أبعد الناس عن إتباع هوى يخالفها...فهم فى أهل الإسلام كأهل الإسلام فى أهل الملل،) তিনি বলেন, ঐ, 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ' (মাতবা'আ কুব্‌রা আমীরিয়াহ, হিঃ ১৩২৩ হ'তে ফটো অফসেট ছাপা, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ, তারিখবিহীন) ২য় খণ্ড পৃঃ ১৭৯ (ঘ) ঐ, মুখতাছার, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক শায়খ আব্দুল্লাহ গুনাইমান কর্তৃক সংক্ষেপায়িত (বার্মিংহাম-ইংল্যান্ডঃ ৭, স্মল হীথ, দারুল আরকাম ১৪১১/১৯৯১) ১ম খণ্ড পৃঃ ২৬২।

২২. كل من قاس و استنبط فهو من أهل الرأي ، كلا والله .. فأن أحمد و إسحاق بل الشافعي أيضا ليسوا من أهل الرأي بالإتفاق و هم يستنبطون و يقيسون ، بل المراد من أهل الرأي قومٌ توجَّهُوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو بين جمهورهم إلي التخريج علي أصل رجلٍ من المتقدمين فكان أكثر أمرهم حمل النظير علي النظير والرد إلي أصل من الأصول دون تتبع الأحاديث و الأثار– হুজ্জাতুল্লাহ (মিসরী ছাপা ১৩২২ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১২৯; ঐ (কায়রো ছাপা ১৩৫৫ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬১।

২৩. এ ব্যাপারে শাহ ছাহেব আহলুর রায় বিদ্বানদের রচিত কয়েকটি 'উছূল' উল্লেখ করে তার দ্বারা কিভাবে ছহীহ হাদীছের উপরে আমল ব্যাহত হয়েছে, তার উল্লেখ করেছেন। যেমন উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন (১) আহলুর রায়গণ উছূল রচনা করেছেন যে, 'নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশক হওয়ার কারণে খাছ (অর্থাৎ কুরআনের আয়াত) কোনরূপ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না' (الخاص قطعي لا يحتمل البيان لكونه بيّنا)। এই ফেক্‌হী মূলনীতির অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁরা ছহীহ হাদীছে বর্ণিত সুস্থিরভাবে ছালাত আদায় বা তা'দীলে আরকানকে ছালাতের আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেননি। কেননা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, হে মুমিনগণ তোমরা রুকূ কর ও সিজদা কর এবং তোমাদের প্রভূর ইবাদত কর' (হজ্জ ৭৭)। এখানে 'রুকূ' অর্থ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মাথা ঝুঁকানো এবং 'সিজদা' অর্থ মাটির উপরে কপাল ঠেকানো। এমতাবস্থায় উপরোক্ত হাদীছ এবং 'হাদীছে আ'রাবী' যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্রুত ছালাত আদায়কারী জনৈক বেদুইন আ'রাবীকে ধীরে সুস্থে ছালাত আদায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য একই সময়ে তাকে তিনবার ছালাত আদায় করিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন- 'ওঠ পুনরায় ছালাত আদায় কর কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি' (قُمْ فصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ)। এই সব ছহীহ হাদীছকে আহলুর রায়গণ কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করেননি। কেননা তাহলে সেটা (তাঁদের ভাষায়) খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কুরআনকে মানসূখ করার শামিল হবে, যেটা জায়েয নয়।[ক]

(২) অমনিভাবে উছূল রচনা করা হয়েছে 'আম' (সাধারণ হুকুম) 'খাছ'-এর ন্যায় অকাট্য'(العام

(قطعي كالخاص) এই মূলনীতি অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁরা 'সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত ছালাত নেই' এই মর্মের ছহীহ হাদীছ গুলিকে কুরআনের সাধারণ হুকুমকে নির্দিষ্টকারী হিসাবে গ্রহণ করেননি। কেননা কুরআনে 'আম'বা সাধারণ হুকুম হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন থেকে যা সহজ মনে কর পাঠ কর' (মুয্যাম্মিল ২০)।[খ]

ক. হাফেয আহমাদ ওরফে মোল্লা জীওন (মৃঃ ১১৩০/১৭১৭ খৃঃ) রচিত উছূলে ফিক্‌হের বিখ্যাত কিতাব 'নূরুল আন্‌ওয়ার' (ক্বামারুল আক্বমার সহ) করাচী ছাপা (কালাম কোম্পানী, তীর্থদাস রোড, মৌলবী মুসাফির খানার বিপরীতে, মুদ্রণকাল বিহীন) পৃঃ ১৯-২০।

খ. হুজ্জাতুল্লাহ (কায়রো ছাপা) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬০।

(৩) আরেকটি উছূল তৈরী করা হয়েছে যে, 'ফক্বীহ নন এমন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের উপরে আমল করা ওয়াজিব নয়, যখন তা যুক্তির বিরোধী হবে।গ যেমন আনাস ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ), যদি তাঁদের বর্ণিত হাদীছ কিয়াসের অনুকূলে হয় তবে তা আমল যোগ্য হবে। কিন্তু যদি কিয়াসের বরখেলাফ প্রতীয়মান হয়, তবে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কিয়াস বর্জন করা যাবেনা।ঘ শাহ ছাহেব এগুলি ছাড়া আরও অনেকগুলি উছূলের উদাহরণ পেশ করে এগুলিকে পরবর্তী পন্ডিতদের রচিত বলে মন্তব্য করেছেন।ঙ উপরের আলোচনা থেকে আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়-এর ইস্তিদলালী পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য অনুমান করা চলে।

গ. و أصلوا أنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأي.. প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬১।

ঘ. (والراوى إن عرف با لفقه و التقدم فى الاجتهاد كا لخلفاء الرا شدين و العبادلة كان حديثُه حجةً يُتْرَكُ به القيا سُ ... وإن عرف با لعدالة و الضبط دون الفقه كأنس وأبى هريرة إن وَافَقَ حديثُه القيا سَ عَمِلَ به و إن خا لَفَه لم يُتْرَكْ إلا بالضرورة) হাফেয আহমাদ ওরফে মোল্লা জিওন, নূরুল আনওয়ার (ক্বামারুল আকমার সহ) করাচী ছাপা, মুদ্রণকাল বিহীন (با ب اقسا م السنة ، بيان احوا ل الرا وى) পৃঃ ১৮২।

ঙ. (وإنما الحق أن أكثرَها أصولٌ مُخَرَّجَةٌ علي قولهم و عندى أن المسئلة القائلة بأ ن الخاصَ مُبَيِّنٌ ولايلحقه البيانُ وأن الزيا دة نسخٌ وأن العامَ قَطعِيٌّ كالخا صِ و أن لا ترجيحَ بكثرة الرواة و أنه لايجب العملُ بحديث غير الفقيه إذا انسدَّ بابُ الرا ئي و أن لا عبْرَةَ بمفهوم الشرطِ و الوصفِ أصلا وأن موجبَ الامرِ هو الوجوبُ البتة وأمثالُ ذلك أصولٌ مُخَرَّجَةٌ على كلام الائمة و إنه لاتصح بها روا يةٌ عن أبى حنيفة و صا حبيه) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো ঃ দারুত তুরাছ ১৩৫৫ হিঃ/১৯৩৬ খৃঃ) با ب حكا ية حا ل النا س قبل الما ئة الرابعة '৪র্থ শতাব্দী হিজরী পূর্বেকার লোকদের অবস্থা' অধ্যায়, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬০।

২৪. হুজ্জাতুল্লাহ (মিসরী ছাপা) ১ম খণ্ড পৃঃ ১২৯; আবদুল কাহির বাগদাদী, 'আল-ফারকু

বায়নাল ফিরাক্ব' (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ, তারিখবিহীন, তাহকীকঃ মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ) পৃঃ ২৬।

২৫. শহরস্তানী, 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৭; ইবনু খালদূন, 'তারীখ' ১ম খণ্ড (মুকাদ্দামা) পৃঃ ৪৪৬।

২৬. (إذا صَحَّ الحديثُ (أى بعدى) فهو مذهبي) মুহাম্মাদ আমীন ওরফে ইবনু আবেদীন, শামী রাদ্দুল মুহতার (দিল্লী ১২৭২ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬; ঐ, (বৈরূতঃ দারুল ফিক্‌র ১৩৯৯/১৯৮৯) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৭; শা'রানী, 'কিতাবুল মীযান' (দিল্লীঃ আকমালুল মাতাবে, ১২৮৬ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৩।

২৭. (.. أنه لو عاشَ حتى دُوِّنَتْ أحاديثُ الشريعةِ ..لأخذَ بها وتركَ كُلَّ قياسٍ كان قاسَه وكان القياسُ قَلَّ فى مذهبه كما قَلَّ في مذهبِ غيرِه بالنسبةِ إليه لكنْ لَمَّا كانت أدلةُ الشريعة مُفَرَّقَةً فى عصرِه من التابعين وتابعِ التابعين فى المَدَائنِ والقُرَى والثغورِكَثُرَ القياسُ فى مذهبِه بالنسبةِ إلى غيرِه من الائمة فإنَّ الحفاظَ كانوا قد رَحَلُوا في طلبِ الاحاديث وجَمْعِها فى عصرِهم من المدائنِ و القُرَى ودَوَّنُوها.. فكان هذا سببُ كَثْرةِ القياسِ فى مذهبه وقِلَّته فى مذهبِ غيرِه ويَحْتَمِلُ أن الذى أضافَ إلى الامامِ أبى حنيفةَ أنه يُقَدِّمُ القياسَ على النصِّ ظَفَرَ بذلك فى كلامِ مُقَلِّدِيْه الذين يَلْزِمُون العملَ بما وَجَدوه عن إمامِهم من القياسِ ويَتْرُكُوْنَ الحديثَ الذى صَحَّ بعد موتِ الامامِ ، فالامامُ مَعْذُوْرٌ وأتباعُه غيرُ مَعْذُورِينَ .. وقد تقدَّمَ قولُ الائمةِ كُلِّهِم " إذا صَحَّ الحديثُ فهو مذهبُنا) ইমাম শা'রানী, 'কিতাবুল মীযান' (দিল্লী ছাপা) ১ম খণ্ড পৃঃ ৭২-৭৩।

২৮. (قال أبو محمد وأهلُ السنةِ الذين نَذْكُرُهم أهلَ الحقِّ و مَنْ عَدَ اهم فأهلُ الباطلِ فإنهم الصحابةُ رضى الله عنهم و كُلُّ مَنْ سَلَكَ نَهْجَهم من خِيَارِ التابعين رحمةُ الله عليهم ثم أهلُ الحديثِ و مَنْ تَبِعَهم من الفقهاءِ جَيْلاً فجَيْلا إلى يومِنا هذا و مَنِ اقتدَى بهم من العَوامِ فى شَرْقِ الارضِ و غَرْبِها رحمةُ الله عليهم) আবু মুহাম্মাদ ইবনু হাযম, মানবজাতির ইতিহাস সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল' (বৈরূতঃ মাকতাবা খাইয়াত্ব ১৩২১/১৯০৩) ২য় খণ্ড পৃঃ ১১৩।

২৯. ইমাম লালকাঈ, 'উছূলু ই'তিকাদ' তাহকীকঃ ডঃ আহমাদ সা'আদ হামাদান (রিয়াযঃ দার তাইয়িবা, সম্ভবতঃ ১৪০২/১৯৮২ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ২২-২৫।

৩০. ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' তাহকীকঃ বদর আল-বদর (ছাফাত, কুয়েতঃ দারুস্ সালাফিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪ খৃঃ) পৃঃ ৯৭-১০১।

৩১. (هندوستان میں تحریک أهل حدیث جن بنیادوں پر قائم ہوئی وہ چار تھیں : عقیدہ توحید، إتباع سنت، جذبہ جہاد، اور إنابت إلى الله... دوسرے لوگوں میں دیکھیئے کہ اگر توحید ہے تو إتباع سنت میں کوتاہی ہے ، اگر إتباع سنت کا جذبہ ہے تو جذبہ جہاد

مفقود هے ، اگر کهیں ذکر و فکر هے تو إتباع سنت نهیں هے- غرضیکه لوگوں نے خا ص
خا ص چیزوں کو لیکر انهیں کوعمل کا دار و مدار بنا لیا هے ، بخلاف اسکے جماعت أهل
حدیث میں چاروں خصوصیتوں کا إجتماع هوکر شهیدین کی صورت میں نمودار هوا -
اور جس جما عت نے ان چاروں کا مظاهره بیك وقت کیا وه جماعت صادقپور هے- جن کا
خلوص اور تعلق مع الله هر شك و شبهه سے بالا تر هے- واقعه یه هے که ان چاروں
خصوصیتوں کی جامعیت کے بغیر کوئی بڑا کام نهیں هو سکتا ، اور بڑی سے بڑی
تحریکیں ان کی بغیر کسی طرح کے ٹهوس نتا ئج پیدا نهیں کرسکتیں- طبیعتوں کو
بدلنا رسموں کو پهیر دیٹا اور قلوب کو حرارت ایما نی سے بهر دینا نه تو إعلانا ت
سےهوتا هے اور نه کسی دوسری چیز سے- یه اسی جا معیت سےهوتا هے جس کےمتعلق کها
گیا هے " هم باللیل رهبا ن و بالنها ر فرسان "... سید صا حب کی جماعت کے اندر دعوت
و عزیمت کا خا ص وہی إهتمام تها جو کئی سو سال پهلے کے مسلمانوں کا إمتیاز تها)
ভারতের বিহার প্রদেশের দারভাঙ্গা হ'তে প্রকাশিত মাসিক "আল-হুদা" ১৬ই জুলাই ১৯৬১ সংখ্যার বরাতে 'তাহরীকে জিহাদ' (গুজরানওয়ালা, ১৯৮৬) পৃঃ ৪৯-৫০; ১৯৮৪ সালের মার্চে দারভাঙ্গার মাদরাসা আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ্‌র বার্ষিক দিস্তারবন্দী অনুষ্ঠানেও তিনি আহ্‌লেহাদীছদের একই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন যা নাদ্‌ওয়ার মুখপত্র লাক্ষ্ণৌ-এর পাক্ষিক 'তা'মীরে মিল্লাত' ১৫.৫.১৯৮৪ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩২. AHL-I-HADITH: The followers of prophetic tradition "...who profess to hold the same views as the early Ashab al-hadith or Ahl-al-hadith (as opposed to Ahl-al-ray). They do not hold themselves bound by 'Taklid'... but consider themselves free to seek guidance in matters of religious faith and practice from the authentic traditions, which together with the Kuran are in their view the only worthy guide for true muslims. ... The Ahl-i-hadith try to go back to first principles and to restore the original simplicity and purity of faith and practices. Emphasis is accordingly, laid in particular on the reassertion of 'Tawhid' ..... and the denial of occult powers and knowledge of hidden things (ilm al-ghayb) to any of his creatures. This involves a rejection of the miraculous powers of saints and of the exaggerated veneration paid to them. They also make every effort to eradicate customs that may be traced either to innovation (bid'a) or to Hindu or other Non-islamic systems. In all these, their reformist programme bears a striking resemblance to that of the Wahhabis of Arabia; and as a matter of fact their adversaries often nickname them Wahhabis ....". H.A.R. GIBB & OTHERS. Encyclopaedia of Islam. (Leiden: Brill. 1960) Vol. 1. P.259.

* তবে আহ্‌লেহাদীছগণ অবশ্যই 'কারামাতে আউলিয়া'-তে বিশ্বাসী, যা 'আকীদা' অধ্যায়ে

বর্ণিত হয়েছে।

** যদিও 'ওয়াহ্‌হাবী' ও 'আহলেহাদীছ' এক নয়।

৩৩. Whatever the Prophet Muhammad taught in the Quran and the authoritative Traditions (Ahadith Sahih), that alone is the basis of the religion known as the Ahl-i-hadith'. The tenets of the sect give clear expression to the zeal which seeks to go back to first principles and to restore the original simplicity and sincerity of faith and practice. Emphasis is put upon the followings (1) Unity of Allah (2) The rejection of the four recognised school of canon law and ... They reject the common notion that the idjtihad of the founders of these four schools are of final authority, and rather contend that every believer is free to follow his own interpretations of the Quran and the traditions, provided he has sufficient learning to enable him to give a valid interpretation. TITUS MURRAY, INDIAN ISLAM (New Delhi: Oriented books reprint corporation, 2nd edition, 1979) P. 189.

৩৪. The Ahl-al-hadith (Wahhabis) are rigid purists ..... The actual followers of the teachings of Ibn Hambal calling themselves Ahl-ul-hadith in Bengal, the united provinces and the North West Provinces number over nine millions. = S. M. Zwemer, His article ISLAM IN INDIA Compiled in his book ACROSS THE WORLD OF ISLAM. (New York: Fleming H. Revel Co.) P. 322.

৩৫. Their main object is to get rid of the authority of the four schools, In order to adjast Islam to modern conditions. They go back to the Koran, and the traditions, not out of blind veneration for the past, but in order to vindicate a greater freedom over against the requirements of the modern world. `H. CRAEMER, the article ISLAM IN INDIA TODAY published in research Journal THE MOSLEM WORLD edited by S. M. Zwemer (New York. Vol. XXI, No. II, April 1931) P. 166.

৩৬. ৩৪নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৭. The Ahl-i-Hadith are a curious mixture. One can hear about them the statement that they are conservative and also that they are liberal minded. Both statements are true. Another name of the Ahl-i-Hadith is ghair Muqallid. .... They are the modern representatives of the Wahhabies of the time of Sayyid Ahmed of Ray Bareli. ...... They are the Indian duplicate of the Egyptian and Arabian Salafi. H. Craemer, The MOSLEM WORLD. P. 166.

৩৮. সনৌসী আন্দোলন লিবিয়াতে শুরু হয় ১৮৪২ সালে, মাহ্‌দী আন্দোলন সূদানে ১৮৮১ সালে ও মোহাম্মাদিয়া আন্দোলন ইন্দোনেশিয়াতে ১৯১১ সালে। -Wilfred Cantwell Smith ISLAM IN MODERN HISTORY (Princeton University Press 1957) p. 52.

৩৯. যেরুজালেমের অধিবাসী মাকদেসী ৩৭৫ হিজরীর শেষে তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণগ্রন্থ 'আহসানুত্

তাক্বাসীম' রচনা সমাপ্ত করেন ও তার পরে এক সময় মৃত্যুবরণ করেন। এটাই ছিল সে যুগের সেরা ভূগোলগ্রন্থ। -জুরজী যায়দান, 'তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিইয়াহ' (দারুল হিলাল ১৯৫৭ খৃঃ) পৃঃ ৩৭৯-৮০। মাকদেসী নিজেকে 'হানাফী' বলেছেন। -আহ্‌সানুত তাক্বাসীম, ২য় সংস্করণ (লণ্ডনঃ ই,জে,ব্রীল ১৯০৬ খৃঃ) পৃঃ ৩৯।

৪০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৮১; আরবী মূল এবারত (Text) নিম্নরূপঃ

جمل شئون هذا الإقليم (أى السند) : مذاهبهم ، أكثرُهم أصحابُ حديثٍ و رأيتُ القاضى أبا محمد المنصورى داؤديا إماما فى مذهبه و له تدريس و تصانيف قد صَنَّفَ كتباً عدةً حسنة و أهلُ الملتان شيعةٌ يُهَوْعِلُوْنَ فى الأذان و يُثَنُّوْنَ فى الإقامة و لا تَخْلُو القصباتُ من فقهاءَ على مذهب أبى حنيفةَ و ليس به مالكية و لا معتزلة و لا عمل للحنابلة ، إنهم على طريقةٍ مستقيمةٍ و مذاهبَ محمودةٍ و صلاحٍ و عفةٍ ، قد أراحَهم اللهُ من الغلوِ و العصبيةِ والهرج والفتنة – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক তাঁর পি-এইচ,ডি থিসিসে উক্ত উদ্ধৃতির ইংরেজী অনুবাদ করেছেন এভাবে- "The majority of the Muslims were Ashab Hadith, adherents of apostolic traditions, who were the followers of Imam Dawud al-Isbahani (d. 270), the Zahirite Literalist". -INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE. 2nd ED. 1976. p. 37. অনুবাদের এই মারাত্মক ভ্রান্তি আহলেহাদীছের মূল আদর্শকেই বাদ দিয়েছে। কারণ আহলেহাদীছগণ ইমাম দাউদ যাহেরী সহ নির্দিষ্ট কোন একজন ইমামের অনুসারী নহেন- যা আমরা এযাবত আলোচনা করে এসেছি।

৪১. (أصحابُ الحديث وهم أهلُ الحجاز، هم أصحابُ مالك بن أنس وأصحاب محمد بن إدريس الشافعى وأصحابُ سفيانَ الثورىِّ و أصحابُ أحمدَ بنِ حنبل و أصحابُ داؤدَ بنِ علىٍّ الاصفهانىِّ) 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৬।

৪২. ক. হাম্বলিয়াহ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (১৬৪-২৪১ হিঃ) -এর

খ. রাহ্‌ভিয়াহ, ইমাম ইসহাক বিন রাহ্‌ওয়ে (১৬৬-২৩৮) হিঃ) -এর

গ. আওযা'ইয়াহ, ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭ হিঃ)-এর

ঘ. মান্‌যারিয়াহ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল মানযার নিশাপুরী (মৃঃ ৩১৮ হিঃ)-এর অনুসারী। মাকদেসী, 'আহসানুত্ তাক্বাসীম' পৃঃ ৩৭।

৪৩. তাক্বাসীম ৩৮-৩৯।

৪৪. (ثغورُ الرومِ و الجزيرةِ و ثغورُ الشامِ و ثغورُ آذربيجانَ و بابُ الابوابِ كُلُّهم على مذهبِ أهلِ الحديثِ من أهل السنةِ و كذلك ثغورُ أفريقيةَ و أندلسَ و كل ثغرِ وراء بحرِ المغربِ أهْلُه من أصحابِ الحديثِ و كذلك ثغورُ اليمنِ على ساحلِ الزنجِ وأما ثغورُ أهلِ ماوراءَ النهرِ فى وجوهِ التُّرْكِ و الصينِ فهم فريقانِ إما شافعيةٌ و إما من أصحابِ أبى حنيفةَ)

আবদুল কাহির বাগদাদী, 'কিতাবু উছূলিদ দীন' (ইস্তাম্বুল, দাওলাহ প্রেস, ১৩৪৬/১৯২৮) ১ম খন্ড পৃঃ ৩১৭।

৪৫. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) -এর উপরে অত্যাচারের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য-আবু ইয়ালা, 'তাবাক্বাতুল হানাবিলাহ' (বৈরুত ছাপা, সালবিহীন) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬৩-১৭৬।

৪৬. (مسلمانوں میں أکثر أهلحديث هيں ... اس قديم عهد ميں يہاں أهلحديث كا هونا بڑى حيرت أنگيز بات هے -) সাইয়িদ সুলায়মান নাদভী, 'আরব ও হিন্দ কে তা'আল্লুক্বাত' (এলাহাবাদঃ হিন্দুস্থান প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৯৩০) পৃঃ ৩৪৭-৪৮।

৪৭. ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি,'তারীখে আহ্‌লেহাদীছ' (ওখলা, নয়াদিল্লী)ঃ মাকতাবা তাওহীদ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩ খৃঃ) পৃঃ ১২৮, ১৩০; 'দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিয়াহ্' (লাহোরঃ ১ম সংস্করণ ১৩৮৮/১৯৬৮ খৃঃ) ৩য় খণ্ড পৃঃ ৫৭৯।

৪৮. উর্দূ সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' (লাহোরঃ শীশ মহল রোড) ৪০ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, তাং ১৭-৬-১৯৮৮ইং।

৪৯. (و كل ذلك عصبيّةٌ و لا يَلْحَقُ أهلَ السنة إلا إسمٌ واحدٌ و هو أهلُ الحديث ، وقال أحمدُ بنُ سنانِ القطّانُ ليس فى الدنيا مُبْتَدِعٌ إلا و هو يَبْغَضُ أهلَ الحديث فاذا ابتدعَ الرجلُ نزعَتْ حَلاوةُ الحديث من قلبه ، نَقَلَه الصابونيُّ) ইমাম আবু উছমান আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' (কুয়েতঃ দারুস সালাফিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪, তাহকীকঃ বদর আল-বদর) পৃঃ ১০৫-১০৬।

৫০. (فصل) إعلم أن لاهل البدعِ علاماتٌ يُعْرَفُوْنَ بها ، فعلامةُ أهلِ البدعة الوَقيعَةُ فى أهل الأثر ... و كل ذلك عَصَبِيَّةٌ و غِيَاظٌ لاهلِ السنة و لا إسمَ لهم إلا إسمٌ واحدٌ و هو أصحابُ الحديث ولا يَلْتَصِقُ بهم ما لَقَّبَهُمْ به أهلُ البدَعِ كما لم يَلْتَصِقْ بالنبيِّ صلى الله عليه و سلم تسميةُ كُفَّارِ مكةَ ساحِرًا و شاعِرًا و مجنونًا .. و لم يكن إسمُه عند الله .. و عند سائرِ خَلْقه إلا رسولا نبيًا بَرِيًّا من العَاهَات كلِّها) শায়খ আবদুল কাদের জীলানী, 'কিতাবুল গুনিয়াহ' (মিসরী ছাপা ১৩৪৬ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৯০-৯১।

৫১. (قال أحمد) و أما أصحابُ الرأى فانهم يُسَمُّوْنَ أصحابَ السنة نابتةً و حشويةً و كَذَبَ أصحابُ الرأى هم أعداءُ الله بَلْ هم النابتةُ والحَشْوِيَةُ تَرَكُوْا آثارَ الرسول صلى الله عليه و سلم و حديثَه و قالوا بالرأى و قاسوا الدينَ بالاستحسان و حَكَمُوا بخلاف الكتاب و السنة و هم أصحابُ بدعةٍ جَهَلَةٌ ضلالٌ و طُلَّابُ دنيا بالكَذْبِ و البُهْتَان) কাযী আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আবু ইয়ালা (মৃঃ ৫২৭ হিঃ), 'তাবাক্বাতুল হানাবিলাহ' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, সালবিহীন। ১৩৪২ হিজরীতে দামেস্ক-এর মাকতাবা উমূমিয়া যাহেরিয়া হ'তে গৃহীত মূল কপির পুনঃমুদ্রণ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৫-৩৬।

৫২. ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' পৃঃ ১০৫-৬।

৫৩. ইমাম ইবনে কুতাইবা, 'তাবীলু মুখ্তালাফিল হাদীছ' (মিসরঃ কুর্দিস্থান প্রেস ১৩২৬/১৯০৮ খৃঃ) পৃঃ ১০৩।
৫৪. ইমাম লালকাঈ, 'শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহ্লিস সুন্নাহ' ১ম খণ্ড (রিয়াযঃ দার তাইয়েবা, সম্ভবতঃ ১৪০২/১৯৮২ খৃঃ, তাহকীকঃ ডঃ আহমাদ সা'আদ হামাদান) পৃঃ ২২-২৪।
৫৫. আবদুল কাহির বাগদাদী, 'আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক্ব' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, সালবিহীন, তাহকীকঃ মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ) পৃঃ ২৬।
৫৬. শহরস্তানী, 'কিতাবুল মিলাল' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, সালবিহীন, তাহ্কীকঃ সাইয়িদ গীলানী) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪১, ১৪৬, ২০৬।
৫৭. আবুদল কাদের জীলানী, 'কিতাবুল গুনিয়াহ্' ১ম খণ্ড পৃঃ ৯০।
৫৮. প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৩।
৫৯.(ক) The word La-Madhabi means a man who does not follow any particular school of Law. In this sence application of the Ghyr Muqallid is appropriate. But it was applied to them by way of reproach to suggest that they were La-Dini.
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রফেসর ডঃ সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী, পি-এইচ. ডি থিসিস "Moulana Karamat Ali and his projects of reforms." টাইপ কপি পৃঃ ১৬৫ (খ) পাঞ্জাবের গবর্ণরের নামে ১৮৮৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর প্রেরিত ১৭৫৮ নং নির্দেশে ভারত সরকার 'আহলেহাদীছ'কে 'ওয়াহ্হাবী' বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। -ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, 'আহলেহাদীছ কা মাযহাব' (লাহোরঃ দার সালাফিইয়াহ, শীশ মহল রোড ১৪০৫/১৯৮৫) পৃঃ ১১৩।
৬০. মোহাম্মদ ওসমান গণী, 'আনোয়ারুল মুকাল্লেদীন' (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম প্রকাশঃ এপ্রিল ১৯৮৫) ই, ফা, বা প্রকাশনা ১২১৪, ই, ফা, বা গ্রন্থাগার ২৯৭, পৃঃ ১৫, ১৬।

ہوتے ہوئے مصطفے کی گفتار + مت دیکھ کسی کا قول و کردار
اصل دین آمد کلام اللہ ذاشتن + پس حدیث مصطفے بر جان مسلم داشتن

অধ্যায়-৪

الفصل الرابع

আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

حركة أهل الحديث : نشأتها و تطوراتها

স্বতন্ত্র পরিচিতি ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জামা'আত হিসাবে ছাহাবাযুগ হ'তে আহলেহাদীছ-এর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও অবস্থান সম্পর্কে আমরা বিগত অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি। এক্ষণে আন্দোলন হিসাবে এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা মূল্যায়ন করার চেষ্টা পাব। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে যে, আদর্শভিত্তিক কোন দল বা জামা'আত প্রচার বা আন্দোলন ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না। আহলেহাদীছ জামা'আতও তার সূচনাকাল থেকেই মূলতঃ দা'ওয়াত ও তাবলীগ-এর উপরে ভর করেই বেঁচে আছে। এই দা'ওয়াত কখনো বাধাহীনভাবে চলেছে, কখনো বাধাগ্রস্ত হয়ে প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক প্রতিরোধের মুকাবিলা ছাড়াও কখনো কখনো চরম রাজনৈতিক প্রতিরোধের মুখেও পড়তে হয়েছে। তবুও সাগরের জোয়ার-ভাটার ন্যায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সাথে সাথে এ আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করেছে, যা এক সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ জীবনে ঢেউ তোলে ও একটি ব্যাপক সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

আন্দোলন অর্থ হরকত বা নড়াচড়া। প্রচলিত অর্থে আন্দোলন বলতে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তির সার্বিক প্রয়াস ও চেষ্টা-সাধনাকে বুঝায়। আন্দোলন সাধারণতঃ দু'ধরনের হ'য়ে থাকে। ১- প্রচারমূলক (منهج العرض) ২- প্রতিরোধমূলক (منهج الرد)। আহলেহাদীছ আন্দোলন তার উৎপত্তির সূচনা থেকে এ পর্যন্ত উক্ত দু'পদ্ধতিতে এগিয়ে চলেছে।

ক্রমবিকাশ ও গতিধারা বিবেচনা করে আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে মোটামুটি ছয়টি যুগে বিভক্ত করে পেশ করতে চাই। ১- স্বর্ণযুগ (-৩৭ হিঃ পর্যন্ত) ২- বিদ'আতীদের উত্থানযুগ (৩৭-১০০ হিঃ) ৩- সংকট ও সংস্কার যুগ (১০০-১৯৮ হিঃ) ৪- সুন্নাত দলনের যুগ (১৯৮-২৩২) ৫- সংকট পরবর্তী যুগ

(২৩২ -৪র্থ শতাব্দী হিজরী) ৬- তাকলীদী যুগ (৪র্থ শতাব্দী হিজরী হ'তে পরবর্তী যুগ)।

১- স্বর্ণযুগ (-৩৭ হিঃ পর্যন্ত)ঃ

শেষ নবী (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন কুরআন ও হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আন্দোলনে প্রথম কাতারের মানুষ। তাঁরা ইসলামকে প্রাথমিক হামলা সমূহ হ'তে সাফল্যজনকভাবে প্রতিরোধ করেন। একদিকে তাঁরা যেমন মুনাফিক, মুরতাদ, যাকাত অস্বীকারকারী ও মিথ্যা নবীদের রক্তক্ষয়ী আন্দোলন এবং তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোমক ও পারসিকদের সফল মুকাবিলা করেন। অন্যদিকে তেমনি কুরআন সংকলন, হাদীছের পঠন-পাঠন ও বর্ণনার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার আন্দোলন চালিয়ে যান। ছাহাবীদের হাতে বিজিত তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র তখন কেবল কুরআন ও হাদীছের প্রচার ও প্রসার চলেছে। সর্বত্র ক্বালাল্লাহ ও ক্বালার রাসূল-এর ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়েছে- যাকে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের হৃদস্পন্দন বলা চলে। ছাহাবী আবু সাঈদ খুদ্‌রী, তাবেঈ ইমাম শা'বী সম্ভবতঃ একারণেই ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে "আহ্‌লুল হাদীছ" বলে অভিহিত করেছেন- যা আমরা পূর্বেকার অধ্যায়ে দেখে এসেছি।[১]

ইসলামের সর্বাপেক্ষা নির্ভেজাল ও সোনালী ঐতিহ্যে ভরা এই যুগে ছিটেফোঁটা দু'একটি প্রশ্ন ছাড়া আকীদাগত বিষয়ে কোন বিভ্রান্তি দেখা দেয়নি।[২] ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (১৩-২৩ হিঃ) বনূ গোনায়েম গোত্রের ছুবাইগ বিন আসাল (صبيغ بن عسل) নামক জনৈক ব্যক্তি কুরআনের 'মুতাশাবিহ' আয়াতসমূহ নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করলে তিনি তাকে দরবারে ডাকিয়ে এনে নিজ হাতে বেত্রাঘাত করে তার মাথা হতে রক্ত ঝরিয়ে দেন। তখনই সে তওবা করে।[৩] এর পর থেকে স্বর্ণযুগে আর কোন বিদ'আতী আকীদা মাথা চাড়া দিয়েছিল বলে জানা যায় না।

২-বিদ'আতীদের উত্থান যুগ (৩৭-১০০ হিঃ)ঃ

ইসলামে ফের্কাবন্দীর মূল কারণ ছিল দু'টিঃ রাজনৈতিক ও উছূলী। মূলতঃ রাজনৈতিক ফের্কাবন্দীকে টিকিয়ে রাখার জন্যই উছূলী বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং পরে এর সঙ্গে যোগ হয় শরীয়তের ব্যাখ্যাগত মতভেদ এবং গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের কুটতর্ক। রাজনৈতিক কারণ সমূহের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিল হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব। ৩য় খলীফা উছমান (২৩-

৩৫)-এর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের আশু বিচারের দাবীতে অটল সিরিয়ার গবর্নর মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের সাথে ৪র্থ খলীফা আলী (রাঃ) আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ৩৭ হিজরী সনে উভয় পক্ষের সম্মতিতে দু'জন খ্যাতনামা ছাহাবীকে শালিশ নিয়োগ করেন। কিন্তু আলী পক্ষীয় একটি বিরাট দল এই শালিশী বৈঠকের বিরোধিতা করেন। তাদের ধারণা মতে 'কিতাবুল্লাহ' মওজুদ থাকতে কোন মানুষকে শালিশ নিয়োগ করা অন্যায় ও গুনাহে কবীরাহ। আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়ে এই গুনাহের কাজ করেছেন। অতএব তাঁরা হত্যাযোগ্য অপরাধী। 'লা হাকামা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোন শালিশ নেই) এই শ্লোগান দিয়ে তারা আলী বিরোধিতায় লিপ্ত হ'লেন।[৪] ইতিহাসে এই দল 'খারেজী' (বহির্গত) নামে অভিহিত। অপরদিকে সৃষ্টি হ'ল আলী সমর্থক গোঁড়া আরেকটি দল। এই দু'দলের বাইরে নিরপেক্ষ আরেকটি দল ছিলেন, যারা আলী ও মু'আবিয়া উভয় পক্ষকে মুমিন গণ্য করে উভয় দলের বিচারের ভার আল্লাহ্‌র উপরে ছেড়ে দেন। ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার এই রাজনৈতিক বিভক্তির ফলে উদ্ভূত বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং তা পরবর্তীতে খারেজী, শী'আ ও মুরজিয়া নামে পৃথক পৃথক বিদ'আতী ধর্মীয় মতবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। ১ম শতাব্দী হিজরীর শেষার্ধে ইরাকের মা'বাদ জুহ্‌নী (মৃঃ ৮০ হিঃ) সর্বপ্রথম বছরায় তাকদীরকে অস্বীকারকারী 'ক্বাদারিয়া' মতবাদের প্রচার করেন।[৫]

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযাম এইসব ভ্রান্ত মতবাদ ও বিদ'আতী আক্বীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক দাওয়াতী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সাথে সাথে প্রশাসনিকভাবেও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। হযরত আলী (রাঃ) চরমপন্থী খারেজী ও অতিভক্ত শী'আদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। এমনকি শী'আদের কিছু উপদলকে তিনি বেত্রদণ্ড প্রদান করেন ও কিছু লোককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারেন।[৬] এই যুগে বিদ'আতী দলগুলির বিপরীতে আহ্‌লেহাদীছ গণের নামীয় ও দলীয় স্বাতন্ত্র্য ফুটে ওঠে, খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০)-এর বক্তব্যে যা ইতিপূর্বে আমরা দেখে এসেছি।[৭]

৩- সংকট ও সংস্কার যুগ (১০০-২৩২ হিঃ)ঃ

এটি ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক যুগ। এযুগে স্বয়ং আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন বিদ'আতী আকীদা মাথাচাড়া দেয়। প্রধানতঃ চারজন বিদ্বানের মাধ্যমে এযুগে চার ধরনের বিদ'আতের প্রসার ঘটে। যেমন-

১-জাহ্‌ম বিন ছাফ্‌ওয়ান সমরকন্দী (নিহত ১২৮ হিঃ) প্রচারিত 'জাহ্‌মিয়া' মতবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী আল্লাহ্‌র কোন গুণ নেই। 'ঈমান' স্রেফ আল্লাহ্‌কে

জানার নাম। কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম নয় বরং সৃষ্টবস্তু। মানুষের নিজস্ব কোন ইচ্ছাশক্তি নেই। বরং আল্লাহ মানুষের মাধ্যমে তাঁর কর্ম পরিচালনা করেন। যেমন তিনি বায়ু ও পানিকে পরিচালিত করেন।[৮] ক্বাদারিয়া মতবাদের উল্টা অদৃষ্টবাদী এই মতবাদটি 'জাব্‌রিয়া' নামেও পরিচিত।

২- জা'আদ বিন দিরহাম খোরাসানী (নিহত ১২৪ হিঃ)। জাহ্‌ম বিন ছাফওয়ানের ন্যায় একই মতবাদের অত্যন্ত সক্রিয় প্রচারক ছিলেন। আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে অস্বীকার করার সাথে তিনি যে আরশে অবস্থান করেন সেটাকেও অস্বীকার করেন।

৩-ওয়াছিল বিন আতা বছরী (৮০-১৩১ হিঃ)। ইনি মু'তাযিলা মতবাদের উদ্‌গাতা ছিলেন। জাহ্‌মিয়াদের ন্যায় এই মতবাদও (ক) আল্লাহ্‌কে গুণহীন সত্তা ও কুরআনকে সৃষ্ট মনে করে। (খ) এই মতবাদ অনুযায়ী কবীরা গোনাহ্‌গার ব্যক্তি না মুমিন, না কাফির। সে তওবা না করে মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। (গ) মানুষের লৌকিক জ্ঞানই তার ভালমন্দের মাপকাঠি এবং মানুষ নিজেই তার ভালমন্দের স্রষ্টা। (ঘ) উছমান, আলী, তালহা, যোবায়ের ও তাঁদের পক্ষে বিপক্ষের যারা পরস্পরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাদের একটি পক্ষ নিশ্চিত ভাবে 'ফাসেক' হওয়ার কারণে জাহান্নামী এবং তাদের কারও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। জাহ্‌মিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি মতবাদ মূলতঃ গ্রীক দর্শন থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছে।[৯]

৪- মুক্বাতিল বিন সুলায়মান বল্‌খী (মৃঃ ১৫০ হিঃ)। নির্গুণবাদী জাহ্‌মিয়া ও মু'তাযিলা মতবাদের বিপরীতে তিনি 'মুশাব্‌বিহাহ' বা সাদৃশ্যবাদী মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন বলে কথিত। অবশ্য তাঁর সম্পর্কে কোন কোন বিদ্বান ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। পরে মুহাম্মাদ বিন কাররাম (মৃঃ ২৫৫ হিঃ) এই মতবাদের প্রচারে বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ্‌কে সাধারণ প্রাণীদেহের সাথে তুলনা করেন।[১০]

৪- সুন্নাত দলনের যুগ (১৯৮-২৩২)ঃ

১৫০ হিজরীর পরে গ্রীক দর্শন সঞ্জাত যুক্তিবাদের প্ররোচনায় একদল কালামশাস্ত্র বিদ বুদ্ধিজীবীর অভ্যুদয় ঘটে। এইসব 'মুতাকাল্লেমীন' ও 'মু'তাযেলী' বুদ্ধিজীবীদের কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগের সহজ-সরল হাদীছ ভিত্তিক জীবন পরিচালনায় ব্যত্যয় সৃষ্টি হয় এবং বিদ্বানগণ ইসলামের মূল আকীদাগত সুক্ষ সুক্ষ বিষয় নিয়ে কুটতর্কে জড়িয়ে পড়েন। যার ফলে বহু মুসলমান আকীদাগত বিভ্রান্তিতে পতিত হন। এই যুগের দ্বিতীয় পর্বে (১৯৮-২৩২) মামূন, মু'তাছিম ও ওয়াছিক বিল্লাহ পরপর খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁরা সকলেই

মু'তাযিলী মতবাদ গ্রহণ ও তার পক্ষে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে আহলেহাদীছ বিদ্বান গণের উপরে নেমে আসে এক মহা পরীক্ষার যুগ। আহলেহাদীছ গণের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের (১৬৪-২৪১) উপরে পতিত হয় লোমহর্ষক নির্যাতনের প্রলম্বিত ইতিহাস।[১১] সেজন্য এই যুগকে 'সুন্নাত দলনের যুগ' বলা যেতে পারে।

সংকট ও সুন্নাত দলন যুগে (১০০-২৩২) তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও অন্যান্য আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ 'প্রচার ও প্রতিরোধ' (منهج العرض و الرد) উভয়বিধ পন্থায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। বিদ'আতী আলেমদের সাথে বিভিন্ন তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুগে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মুজাদ্দিদ খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (৯৯-১০১) স্বয়ং এইসব বিদ'আত প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। তিনি ক্বাদারিয়া নেতা গায়লান দামেস্কী (নিহত ১০৫ হিঃ)-কে দরবারে ডাকিয়ে এনে তার মতবাদের সপক্ষে দলীল পেশ করতে বলেন। গায়লান সূরায়ে দাহ্র-এর ৩নং আয়াত পেশ করলে খলীফা তাকে আরও সামনে পড়ে যেতে বলেন। অতঃপর উক্ত সূরার সর্বশেষ দু'টি আয়াত পাঠ অন্তে খলীফা তাকে জিজ্ঞেস করেন, বল এখন তোমাদের বক্তব্য কি? তারা লা-জওয়াব হয়ে উপস্থিত সঙ্গীসাথীসহ 'তওবা' করে চলে যায়। কিন্তু খলীফার মৃত্যুর পরে পুনরায় গায়লান তার পূর্ব মতে ফিরে যায়। পরবর্তী খলীফা হিশাম বিন আবদুল মালেক (১০৫-১২৫) তাকে দরবারে ডাকিয়ে এনে একটি বিতর্কসভার আয়োজন করেন। পরাজিত হ'লে তাকে হাত-পা কেটে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেন। পরবর্তীতে তিনি আরেকজন ক্বাদারিয়া নেতাকে দরবারে ডাকিয়ে এনে আহলেহাদীছগণের অন্যতম নেতা ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭ হিঃ)- এর সঙ্গে বিতর্ক সভা করান। পরাজিত হ'লে তাকে ও উপরোক্ত ভাগ্য বরণ করতে হয়। জাহ্মিয়া নেতা জাহ্ম বিন ছাফওয়ান উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গ্রেফতার হয়ে ১২৮ হিজরীতে ইসফাহান অথবা মারভে নিহত হন। অন্যতম জাহ্মিয়া নেতা জা'আদ বিন দিরহামকে কূফার গবর্ণর আবদুল্লাহ আল-কাসারী ১২৪ হিজরীতে ঈদুল আযহার দিন খুৎবার পরে মিম্বরের নিকটে নিজ হাতে যবহ করে দেন।[১২]

এইভাবে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম-এর ব্যাপক দাওয়াতী তৎপরতা এবং সাথে সাথে প্রশাসনিক কঠোরতার ফলে এইসব বিদ'আতী ফিৎনা উমাইয়া যুগে (৪০-১৩২/৬৬১-৭৫০ খৃঃ) খুব বেশী প্রসার লাভ করতে পারেনি। আব্বাসীয় যুগের (১৩২-৬৫৬/৭৫০-১২৫৮ খৃঃ) প্রথমার্ধে (১৯৮-২৩২) মু'তাযিলা ফিৎনা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খুবই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'লে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের

উপরে চরম পরীক্ষা নেমে আসে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১) এই সময় কঠোরতম পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তবুও সকলপ্রকার নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করেও হাদীছ পন্থী বিদ্বানগণ ছাহাবা যুগের আকীদা ও আমলকে অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টায় ব্রতী থাকেন।

৫-সংকট পরবর্তী যুগ (২৩২-৪র্থ শতাব্দী হিজরী)ঃ

ওয়াছিক বিল্লাহ্ (২২৭-২৩২)-এর পরে তার ভাই মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ (২৩২-২৪৭) খলীফা নিয়োজিত হলে মু'তাযিলা মতবাদ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা হতে বঞ্চিত হয়। ফলে মু'তাযিলা সংকট দূরীভূত হয় এবং আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণ স্বাধীনভাবে কুরআন-হাদীছের প্রচার-প্রসার, পঠন-পাঠন, সংগ্রহ ও সংকলনের দিকে মনোনিবেশ করেন। তৃতীয় শতাব্দী হিজরী 'হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের স্বর্ণযুগ' হিসাবে পরিণত হয়। ছিহাহ সিত্তাহ্‌র মুহাদ্দিছগণ এ যুগেই ইসলামের শ্রেষ্ঠ খিদমত হিসাবে ছহীহ হাদীছ সমূহ যাচাই-বাছাই, সংকলন ও লিপিবদ্ধ করে জনগণের সামনে পেশ করেন। অসংখ্য খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বান এযুগে মূল্যবান লেখনী পরিচালনা করেন। ফলে এযুগের প্রথমার্ধকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের 'রেনেসাঁ যুগ' বলা যেতে পারে।

৬- তাকলীদী যুগ (৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পরবর্তী যুগ)ঃ

এই সময় মু'তাযিলাগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালেও উছূলী বিতর্ক শেষ হয়নি। ইসলামী খেলাফতের সীমানা বৃদ্ধির ফলে নও-মুসলিমদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। মামূনের যুগ (১৯৮-২১৮) হতে গ্রীক দর্শনের যে আরবী অনুবাদ শুরু হয়, এযুগে তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে ইহুদী, খৃষ্টানী, মজূসী, যরদশ্তী, হিন্দুস্থানী (সামানী), তুর্কী, ঈরানী ও অন্যান্য অনৈসলামী দর্শনের বইপত্র আরবীতে অনূদিত হয়ে ইসলামী বিশ্বের চিন্তা-চেতনায় এক ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।[১৩] কুরআন-হাদীছের বাহ্যিক অর্থের অনুসরণে ও ছাহাবা যুগের গৃহীত পথ ছেড়ে দিয়ে বিদ্বানগণ স্ব স্ব লৌকিক জ্ঞানের মাধ্যমে সব কিছুর সমাধান তালাশ করতে শুরু করেন। কালাম ও দর্শন শাস্ত্রের কুটতর্ক, বিভিন্ন মুজতাহিদ ইমামের ফেক্বহী মতপার্থক্য, ছূফীবাদের প্রসার ইত্যাদির কারণে মুসলমানদের সামাজিক ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ইমাম গাযালী (৪৫০-৫০৫ হিঃ) বলেন, এই সময় আব্বাসীয় খলীফাগণ বিশেষ করে হানাফী-শাফেঈ বিতর্কে ইন্ধন যোগাতে থাকেন। ফলে উভয়পক্ষে বহু ঝগড়া-বিবাদ ও লেখনী পরিচালিত হয়।[১৪]

এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/ ১৭০৩-১৭৬২) '৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের অবস্থা' শিরোনামে বলেন- '৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকেরা কেউ কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের উপরে নির্দিষ্টভাবে মুকাল্লিদ ছিলেন না। .. কোন বিষয় সামনে এলে মাযহাব নির্বিশেষে যেকোন বিদ্বানের নিকট হতে লোকেরা ফৎওয়া জিজ্ঞেস করে নিতেন। .. আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত তারা আর কারুরই অনুসরণ করতেন না। ... কিন্তু পরবর্তীতে ঘটে গেল অনেক কিছু। যেমন (১) ফিক্‌হ বিষয়ে মতবিরোধ (২) বিচারকদের অন্যায় বিচার (৩) সমাজ নেতাদের মূর্খতা (৪) হাদীছ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ 'মুহাদ্দিছ' ও 'ফক্বীহ' নামধারী লোকদের নিকটে ফৎওয়া তলব ইত্যাদি কারণে হকপন্থী কিছু লোক বাদে অধিকাংশ লোক হক-বাতিল যাচাই করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে এবং প্রচলিত যেকোন একটি মাযহারের তাকলীদ করেই ক্ষান্ত হয়। ... বর্তমানে লোকদের অন্তরে তাকলীদ এমনভাবে আসন গেড়ে বসেছে, যেমন ভাবে পিঁপ্ড়া সবার অলক্ষ্যে দেহে ঢুকে কাম্ড়ে ধরে থাকে' (সংক্ষেপায়িত)।[১৫] তাকলীদের মায়াবন্ধনে পড়ে মানুষ ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কে কত বড় ইমাম বা কে কত বড় দলের অনুসারী, এটাই তখন প্রধান বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মাযহাবী তাকলীদের বাড়াবাড়ির পরিণামে হানাফী-শাফেঈ দ্বন্দ্বে ও শী'আ মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে অবশেষে ৬৫৬ হিজরীতে হালাকু খাঁর আক্রমণে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে মিসরের বাহরী মামলূক সুলতান রুকনুদ্দীন বায়বারাসের আমলে (৬৫৮-৬৭৬/১২৬০-১২৭৭ খৃঃ) মিসরীয় রাজধানীতে সর্বপ্রথম চার মাযহারের লোকদের জন্য পৃথক পৃথক কাযী নিয়োগ করা হয়, যা ৬৬৫ হিজরী থেকে ইসলাম জগতের সর্বত্র চালু হয়ে যায় ...এবং চার মাযহাবের বহির্ভূত কোন উক্তি বা সিদ্ধান্ত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'লেও তা অনুসরণ করা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়।'[১৬] বুরজী মামলূক সুলতান ফারজ বিন বারকূক-এর আমলে (৭৯১-৮১৫হিঃ) ৮০১ হিজরী সনে মুকাল্লিদ আলেম ও জনগণকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মুসলিম ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র কা'বা গৃহের চারপাশে চার মাযহাবের জন্য পৃথক পৃথক চার মুছাল্লা কায়েম করা হয়।[১৭] এইভাবে তাকলীদের কু-প্রভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র বিভক্তি স্থায়ী রূপ ধারণ করে। ১৩৪৩ হিজরীতে বর্তমান সউদী শাসক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আযীয আলে-সঊদ উক্ত চার মুছাল্লা উৎখাত করেন। ফলে সকল মুসলমান বর্তমানে কুরআন-হাদীছের নিয়ম অনুযায়ী একই ইব্‌রাহীমী মুছাল্লায় এক ইমামের পিছনে এক সাথে ছালাত আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

বর্তমানে আমরা তাকলীদী যুগেই বাস করছি। যদিও প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত তাকলীদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ বিদ্বানদের প্রতিবাদী কণ্ঠ ও লেখনী সোচ্চার আছে এবং তার ফলে অনেকেই তাকলীদের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরনে ব্রতী হয়েছেন বা হচ্ছেন।

তাকলীদী যুগেও আহলেহাদীছ আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও গতিধারা পূর্বের ন্যায় 'প্রচার ও প্রতিরোধ' কৌশলের উপরে ভিত্তিশীল ছিল বা আছে। বিদ'আতী ফেরকাগুলির নেতৃবৃন্দের সাথে তাদেরকে মুখোমুখি তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে। যেমন ক্বাদারিয়া নেতা গায়লান দামেষ্কীর বিরুদ্ধে খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয ও পরে ইমাম আওযাঈর বিতর্ক অনুষ্ঠান;[১৮] মু'তাযিলা খলীফা মু'তাছিম বিল্লাহ্‌র দরবারে তার সাথে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের বিতর্ক অনুষ্ঠান ও নির্যাতন বরণ;[১৯] খ্যাতনামা আহলেহাদীছ মুফাস্‌সির ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (২২৪-৩১০ হিঃ) জনৈক জনপ্রিয় বক্তার ভুল তাফসীরের প্রতিবাদ নিজ ঘরের দরজায় লেখার অপরাধে ভক্ত জনতার অজস্র প্রস্তর বর্ষণে ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া;[২০] সুলতানের পক্ষ হতে আয়োজিত মিসরীয় আদালত কক্ষে যুগের সেরা ছূফী আলেমদের ভুল আকীদার বিরুদ্ধে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্‌ (৬৬১-৭২৮)-এর মুখোমুখি তর্কযুদ্ধে জয়লাভ, বিরোধী কুচক্রী আলেমদের ষড়যন্ত্রে ৮ বারে মোট সাতবছর কারা যন্ত্রণা ভোগ ও সেখানেই মৃত্যুবরণ, শিরক ও বিদ'আতী আকীদা ও রস্‌ম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে ছোট বড় তিন শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন;[২১] তাঁর প্রিয় ছাত্র হাফেয ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১)-এর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে হক প্রচার, কারাবরণ ও নির্যাতন ভোগ;[২২] প্রচলিত তাকলীদী প্রথার বিরুদ্ধে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হিঃ) -এর লেখনীযুদ্ধ ও কুরআনের ফারসী তরজমা প্রকাশ করায় দিল্লীর আলিমগণ কর্তৃক তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র;[২৩] ব্যাপক ধর্মীয় অনাচার, শিখ সন্ত্রাস ও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে; আপোষহীন জিহাদ ঘোষণাকারী পবিত্র কুরআন ও ত্রিশ হাযার হাদীছের স্বনামধন্য হাফেয মুজাহিদ নেতা আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬ হিঃ)-এর বিরুদ্ধে আলিমদের পক্ষ হতে 'কুফরী' ফৎওয়া প্রদান, তাদের চক্রান্তে প্রশাসন কর্তৃক তাঁর ওয়ায-নছীহতের উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও অবশেষে এক অসম যুদ্ধে বালাকোট প্রান্তরে শত্রুসৈন্যদের হাতে নির্মম ভাবে শাহাদাত বরণ এবং এ খবর পেয়ে দিল্লীর কিছু আলিমের খুশীতে শিরনী বিতরণ;[২৪] হাদীছ, তাফসীর, ফিক্‌হ, আকায়েদ সহ ২২২ খানা গ্রন্থের রচয়িতা, অনুবাদক ও প্রকাশক ভূপালের খ্যাতিমান নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান (১২৪৮-১৩০৭ হিঃ / ১৮৩৩-৯০খৃঃ)-এর অতুলনীয় ইল্‌মী খিদমত;[২৫] সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসরে প্রায় সোয়া

লক্ষ ছাত্রের স্বনামধন্য শিক্ষক শায়খুল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০হিঃ / ১৮০৫-১৯০২খৃঃ) নীরব শিক্ষা বিপ্লব ও কুচক্রী আলিমদের ষড়যন্ত্রে রাওয়ালপিণ্ডির জেলখানায় এক বছর কারা যন্ত্রণা ভোগ, হজ্জের ময়দান থেকে পুলিশের হাতে গ্রেফতার বরণ ও বাদশাহ্র দরবারে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিজের স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ ও মুক্তি লাভ;[২৬] বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামে-গঞ্জে আহ্লেহাদীছ আলিমদের ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিকভাবে শিরক ও বিদ'আত বিরোধী নিরন্তর মৌখিক, লৈখিক ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ও নির্যাতন ভোগ - সবকিছুই উক্ত আন্দোলনের অব্যাহত ক্রমবিকাশ ও অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার প্রমাণ বহন করে।

উপরের আলোচনায় আমরা বিভিন্ন যুগে আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের 'প্রচার ও প্রতিরোধ' (منهج العرض والرد) এই দ্বিবিধ গতিধারা ও ক্রমবিকাশ অবলোকন করেছি। সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ছাহাবা ও তাবেঈন কর্তৃক বিজিত তৎকালীন পৃথিবীর সকল ইসলামী এলাকায় কেবলমাত্র ক্বালাল্লাহ ও ক্বালার রাসূল-এরই গুঞ্জরন ছিল। বিজিত এলাকায় বিজয়ী সেনাদলের সাথে অথবা বিজয়ের পর পরই সেখানে গমন করতেন দাঈ ও শিক্ষকদের একটি বিরাট দল, যারা লোকদেরকে কুরআন ও হাদীছ শিক্ষা দিতেন- যা ছিল নবীযুগের নির্ভেজাল অহিভিত্তিক শিক্ষা। যেখানে ছিলনা পরবর্তী যুগের সৃষ্ট কোন দার্শনিক বা ফিক্হী দলাদলির সামান্যতম অবকাশ। সে কারণে বলা চলে যে, বিজেতা ছাহাবী, তাবেঈ ও তাঁদের অনুসারী মুসলিম জনসাধারণ ছিলেন হাদীছপন্থী বা আহলুল হাদীছ। নিঃসন্দেহে এটি ছিল আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক দিক।

এক্ষণে আমরা উক্ত আন্দোলনের বিকাশ ধারায় নতুন দিক ও পদ্ধতির সংযোজন লক্ষ্য করব। এই পদ্ধতিটি ছিল হাদীছ সংকলন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনার মাধ্যমে পরিচালিত বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পদ্ধতি। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় 'প্রচার ও প্রতিরোধ' কৌশল অব্যাহত রাখা হয়। রাসূলের নির্দেশক্রমে লেখক ছাহাবী আবদুল্লাহ বিন আমর বিনুল আছ (মৃঃ ৬৫ হিঃ)-এর মাধ্যমে প্রথম হাদীছ সংকলনের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (৯৯-১০১) কর্তৃক রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীছ সংকলনের সূচনা হয়। এই যুগে বিদ'আতী ফেরকা সমূহের উত্থান ঘটায় কেবলমাত্র আহ্লুস সুন্নাহ বা আহ্লুল হাদীছ বিদ্বানদের নিকট থেকেই হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। ছহীহ ও জাল হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে গিয়ে স্বর্ণযুগের সূত্রপাত করে এবং এসময়ে বিশ্ববিশ্রুত ছিহাহ সিত্তাহ সংকলিত হয়।

রাজনৈতিক বিরোধের সূত্র ধরে যে উছূলী বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং সাথে সাথে ক্বাদারিয়া, জাহ্‌মিয়া, মুরজিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি মতবাদসমূহের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে যে আক্বীদাগত বিভ্রান্তি শুরু হয় এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় শেষোক্ত মতবাদটি যখন ব্যাপকভাবে মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের একটি বিরাট অংশ এসবের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে কলমী যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁরা কুরআন ও হাদীছের প্রকাশ্য দলীলাদির মাধ্যমে প্রতিপক্ষের যুক্তিসমূহ খণ্ডন করেন এবং ইসলামের নির্ভেজাল আক্বীদা জনগণের নিকটে তুলে ধরেন, যা ঐসময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নব উত্থিত বিদ'আতী দল সমূহের ভ্রান্ত আক্বীদার প্রতিবাদে এই যুগে কয়েকজন আহলেহাদীছ বিদ্বানের লিখিত বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হ'ল। যেমন ১- আবু ওবায়েদ কাসেম বিন সাল্লাম (মৃঃ ২২৪ হিঃ) প্রণীত 'কিতাবুল ঈমান' ২- আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ জু'ফী (মৃঃ ২১৯ হিঃ), 'আর-রাদ্দু আলাল জাহ্‌মিয়াহ'। ৩- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ), 'আর-রাদ্দু আলায্ যানাদিক্বাহ ওয়াল-জাহ্‌মিয়াহ'। ৪- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওরফে ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬), 'আর-রাদ্দু আলাল জাহ্‌মিয়্যাহ'। ৫- আবদুল্লাহ বিন মুসলিম ওরফে ইমাম ইবনু কুতাইবাহ দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬), 'আল-ইখতিলাফু ফিল-লাফ্‌যি ওয়ার রাদ্দু আলাল জাহ্‌মিয়্যাহ' ও 'তাবীলু মুখ্‌তালাফিল হাদীছ'। শেষোক্ত যুগান্তকারী গ্রন্থে লেখক তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের প্রায় সকল বিদ'আতী ফের্কার ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ খণ্ডন করেছেন এবং আপাত বিরোধী হাদীছসমূহের সমন্বয় সাধন করেছেন। সাথে সাথে আহলেহাদীছগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের সারগর্ভ জওয়াব দান করেছেন। ৬- উছমান বিন সাঈদ দারেমী (২০০-২৮০), 'আর-রাদ্দু আলা বিশ্‌র আল-মুরাইসী'। ৭- আবদুর রহমান বিন আবু হাতিম (মৃঃ ৩২৭ হিঃ), 'আর-রাদ্দু আলাল জাহ্‌মিয়াহ' প্রভৃতি।

৪র্থ শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত প্রণীত উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ কেতাবগুলির নাম দেখ্‌লে মনে হয় কেবল জাহ্‌মিয়াদের বিরুদ্ধেই এযুগে লেখনী পরিচালিত হয়েছিল। মূলতঃ মতবাদের দিক দিয়ে জাহ্‌মিয়া, ক্বাদারিয়া, জাব্‌রিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি ফের্কাগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়ে পরস্পরে সুন্দর মিল রয়েছে। সেকারণ মূল ফের্কাটির শিরোনাম দিয়ে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সে সময়ের অন্য সকল বিদ'আতী ফের্কার ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহের প্রতিবাদ করেছেন।

এরপরে ঐসকল গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে, যেখানে কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে ইসলামের সঠিক আকীদা পেশ করা হয়েছে।- যেমন ১- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১) প্রণীত 'আস্-সুন্নাহ'। অতঃপর একই নামে প্রণীত নিম্নোক্ত বিদ্বান মণ্ডলীর গ্রন্থসমূহ। যেমন ২- ইমাম আবুবকর বিন আছরাম (মৃঃ ২৭২ হিঃ) ৩- আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল (২১৩-৯০) ৪- মুহাম্মাদ বিন নাছর আল-মারওয়াযী (২০২-২৯৪) ৫- আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হারূণ আল–খালাল (মৃঃ ৩১১ হিঃ) প্রমুখ। এতদ্ব্যতীত ৬- আবুবকর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ওরফে ইমাম ইবনু খুযায়মাহ (২২৩-৩১১) প্রণীত 'আত-তাওহীদ' ৭- আলী বিন ইসমাঈল ওরফে ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (২৬০-৩২৪) প্রণীত 'আল-ইবানাহ আন উছূলিদ- দিয়ানাহ্'। আশ'আরী মতবাদের উদ্গাতা ইমাম আশ'আরী জীবনের শেষদিকে এসে উক্ত মতবাদ পরিত্যাগ করে আহলেসুন্নাত-এর পথে ফিরে আসেন এবং ছহীহ আকীদা সম্বলিত উক্ত কিতাব প্রণয়ন করেন। এই কিতাবে 'প্রচার ও প্রতিরোধ' দু'টি পদ্ধতিই অবলম্বিত হয়েছে। ৮- ওবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন বাত্তাহ (-৩৮৭) প্রণীত 'আল-ইবানাহ'। ৯- মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ওরফে ইমাম ইবনু মান্দাহ (৩১০-৩৯৫) প্রণীত 'কিতাবুল-ঈমান' ১০- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবী যামনীন (-৩৯৯) প্রণীত 'উছূলুস্ সুন্নাহ' প্রভৃতি।

অতঃপর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পরবর্তীকালের সেরা গ্রন্থকার হিসাবে সেই সকল আহলেহাদীছ বিদ্বানদের নাম আমরা করতে পারি- যাঁরা তাঁদের গ্রন্থসমূহে 'প্রচার ও প্রতিরোধ'-এর দ্বিবিধ ধারা অবলম্বনে আহলেসুন্নাতের আকীদা ও আমলকে জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ধারায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল। ১- ইমাম হেবাতুল্লাহ বিনুল হাসান লালকাঈ (মৃঃ ৪১৮ হিঃ)। তাঁর রচিত 'শারহু উছূলি ই'তিক্বাদ' গ্রন্থটি তাঁকে অমর করে রেখেছে। ২- আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯) প্রণীত 'আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ' আকীদা বিষয়ে রচিত তাঁর অন্যতম সেরা পুস্তক। ৩-আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনে আহমাদ ওরফে ইমাম ইবনু হযম আন্দালুসী (-৪৫৬) প্রণীত 'কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহ্ওয়া ওয়াল্ নিহাল' তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ। ৪- আবুবকর আহমাদ বিন হুসাইন ওরফে ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮) রচিত 'আল-ই'তিক্বাদ' আকীদা বিষয়ে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ৫- আহমাদ বিন আবদুল হালীম ওরফে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮) রচিত 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ'-এর মাধ্যমে আহলেহাদীছের আকীদা সুন্দরভাবে তুলে ধরার

সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অকাট্য দলীলাদির মাধ্যমে বিদ'আতী ফের্কাসমূহের যুক্তিসমূহ খণ্ডন করে অন্যান্য প্রায় তিন শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর লিখিত কিতাবগুলি যুগ যুগ ধরে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পথে আলোকস্তম্ভ হিসাবে কাজ করবে। ৬-আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবুবকর ওরফে ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ (৬৯১-৭৫১) প্রণীত 'মুখ্‌তাছার ছাওয়াইক্বুল মুরসালাহ' ৭- আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল বিন উমার ওরফে হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪) প্রণীত হাদীছ ভিত্তিক 'তাফসীর' ও বৃহদায়তন ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' তাফসীর ও ইতিহাস শাস্ত্রের অনন্য গ্রন্থ। কুরআনের তাফসীরের নামে বিদ'আতীদের অপতৎপরতার প্রতিরোধে 'তাফসীরে ইবনে কাছীর'-এর অবদান অতুলনীয়। ৮-আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মাকদেসী (৭০৫-৭৪৪) প্রণীত 'আছ-ছারিমুল মুন্‌কি ফির-রাদ্দি আলাস-সুবকী' সহ শতাধিক খণ্ডে বিভক্ত প্রায় ৭০টি গ্রন্থ শিরক ও বিদ'আতী আকীদা ও রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে দু'ধারী তরবারি স্বরূপ। ৯-শিহাবুদ্দীন আবুল ফযল আহমাদ ইবনু আলী ওরফে হাফেয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (৭৭৩-৮৫২) প্রণীত বুখারী শরীফের সর্বশেষ বিশ্বস্ত ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাৎহুল বারী' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থাবলী যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহ্‌কে যাবতীয় বিদ'আতী আকীদা ও মাযহাবী তাকলীদের বেড়াজাল ছিন্ন করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আন্দোলনে আলোকবর্তিকা হিসাবে পথ দেখাবে।

উপরোক্ত কেতাবগুলি বিভিন্ন যুগে আহলেহাদীছ বিদ্বানদের রচিত অগণিত কিতাবসমূহের একটি ভগ্নাংশ মাত্র। আরও বহু কিতাব ছিল, যা হয়তবা হারিয়ে গেছে। নয়তবা আজও ছাপার মুখ দেখেনি কিংবা এখনও কোন প্রাচীন লাইব্রেরীর অন্ধ প্রকোষ্ঠে বন্দী হয়ে প্রকাশের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। উপরোক্ত কিতাব সমূহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল একটিই- মুসলিম উম্মাহ্‌কে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা এবং ঐ দুই উৎসের সঠিক বুঝ হাছিলের জন্য সালাফে ছালেহীনের গৃহীত পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং নবোদ্ভূত মতবাদ ও কল্পিত মাযহাবসমূহ হ'তে বিরত রাখা। আর এটাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

এক্ষণে আমরা আহলেহাদীছ-এর 'আক্বীদা' সম্পর্কে আলোকপাত করব।

টীকাসমূহ-৩

১. দ্রঃ অধ্যায়-৩ টীকা-৫, ৬।
২. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলের দীর্ঘ ২৩ বৎসরের নবুওতী জীবনে ছাহাবায়ে কেরাম মাত্র ১৩টি প্রশ্ন করেছিলেন। যার সবগুলির উত্তর কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। -ইবনুল কাইয়িম, 'ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন' (বৈরুতঃ দারুল জীল ১৯৭৩) ১ম খণ্ড পৃঃ ৭১।
৩. লালকাঈ, 'শারহু উছূলি ই'তিক্বাদ' মুকাদ্দামা, পৃঃ ১৯-২০।
৪. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু সা'আদ বাছরী (১৬৮-২৩০ হিঃ), 'আত-তাবাক্বাতুল কুবরা' (বৈরুতঃ দার ছাদির ১৪০৫/১৯৮৫) ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩২।
৫. ছহীহ মুসলিম হা/৮।
৬. ইবনু হাযম, 'কিতাবুল ফিছাল' ২য় খণ্ড পৃঃ ১১৫।
৭. অধ্যায় ৩ টীকা-১।
৮. শহরস্তানী, 'কিতাবুল মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৭।
৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬-৪৮।
১০. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৪, ১০৮
১১. দ্রঃ অধ্যায় ৩, টীকা-৪৫।
১২. ডঃ আহমাদ আমীন, 'ফাজ্‌রুল ইসলাম' (কায়রোঃ মাকতাবা নাহ্‌যাহ মিছরিয়াহ, ১১তম সংস্করণ ১৯৭৫) পৃঃ ২৮৫-৮৬; লালকাঈ, 'উছূলু ই'তিকাদ-মুকাদ্দামা' পৃঃ ২৯ (টীকা)-
(إن خالد بن عبد الله القسرى (والي الكوفة) قتل الجعد يوم عيد الأضحى بالكوفة و ذلك أن خالدا خطب الناس فقال فى خطبته تلك : أيها الناس ضحُّوا يقبل الله ضحاياكم ، فإنى مضحٍّ بالجعد بن درهم ، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا و لم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا- ثم نزل فذبحه فى أصل المنبر- البداية ٩/٣٦٤)
ইব্‌নু কাছীর, আল-বিদায়াহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ ২য় সংস্করণ ১৪০৮/১৯৮৮) ৯ম খন্ড পৃঃ ৩৬৪-৬৫।
১৩. লালকাঈ, 'উছূলু ই'তিকাদ-মুকাদ্দামা' পৃঃ ৪৩-৪৪।
১৪. অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহ (মিসরী ছাপা) ১ম খণ্ড পৃঃ ১২৩; ঐ (কায়রোঃ দারুত্ তুরাছ ১৩৫৫/১৯৩৬) ১ম খন্ড পৃঃ১৫৩।
১৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৩-২৪; ঐ (কায়রো ছাপা) ১ম খন্ড পৃঃ১৫৩।
১৬. ইউসুফ জয়পুরী, হাক্বীক্বাতুল ফিক্‌হ, সংশোধনেঃ দাউদ রায (বোম্বাই-ভারতঃ ইদারা দাওয়াতুল ইসলাম, মোমেনপুরা, বোম্বাই-১১, তাবি) পৃঃ ১১৫; আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী, ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি (ঢাকাঃ আল-হাদীছ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, ১ম সংস্করণ ১৯৬৩) পৃঃ ১৭-১৮; গৃহীতঃ মাকরেযী ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১৬১।
১৭. ঐ পৃঃ ১১৬; 'ফিরকাবন্দী' পৃঃ ১৮; গৃহীতঃ শাওকানী, বাদ্‌রুত্ তালে' ২য় খন্ড পৃঃ ২৬।
১৮ লালকাঈ, উছূলু ই'তিক্বাদ -মুকাদামা পৃঃ ৪৭।

১৯. দ্রঃ অধ্যায় ৩, টীকা-৪৫।

২০. ডঃ মুছতফা সাবাঈ, 'আস-সুন্নাহ্ ফিত্ তাশরী'ইল ইসলামী'। (বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) পৃঃ ৮৬-৮৭।

২১. সৈয়ূতী, 'তাবাক্বাতুল হুফ্ফায' পৃঃ ৫১৬-১৭ ও অন্যান্য।

২৩. আবু ইয়াহ্ইয়া ইমাম খান নওশাহরাভী, 'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ' (লাহোরঃ নিয়াযী প্রিন্টিং প্রেস, ২য় সংস্করণ ১৯৮১) পৃঃ ৬৬।

২৪. মিরযা হায়রাত দেহলভী, 'হায়াতে তাইয়িবাহ' (লাহোরঃ মাকতাবাতুস সালাম, ১৯৫৮ খৃঃ) পৃঃ ১৪০-১৪১, ১২৮-২৯, ৩৬৬-৬৯, ১৪০ -পাদটীকা; মেহের, জামা'আতে মুজাহিদীন পৃঃ ১২৩।

২৫. তারাজিম পৃঃ ২৫১-২৬১।

২৬. তারাজিম পৃঃ ১৪৮; নাযীর আহমদ রহমানী, 'আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত' (বেনারসঃ জামেয়া সালাফিইয়াহ ২য় সংস্করণ) পৃঃ ৩৬৯-৭২।

قال رسول الله (ص) لا نشرك بلله شيئا وإن قتلت أو حرقت
رواه أحمد عن معاذ (رض) —

অধ্যায়-৫

الفصل الخامس

আক্বীদা

العقيدة

১- আহলেহাদীছগণ (১) আল্লাহ্র উপরে (২) তাঁর ফিরিশ্তাগণের উপরে (৩) আল্লাহ প্রেরিত কিতাবসমূহ (৪) রাসূলগণ (৫) বিচার দিবস এবং (৬) তাক্বদীরের ভালমন্দের উপরে ঈমান পোষণ করেন।[১]

(১) আল্লাহ্র উপরে ঈমানঃ পারিভাষিক অর্থে আহলেহাদীছের নিকটে 'ঈমান' হ'ল মূল ও শাখাসহ হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম।[২]

প্রথম দু'টি মূল ও শেষেরটি হ'ল শাখা, যেটা না থাকলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না। খারেজীগণ তিনটি বিষয়কেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। সেকারণ কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের মতে কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। মুরজিয়াদের বারোটি উপদলের মধ্যে কার্‌রামিয়াগণ বিশ্বাস ও আমল ছাড়াই কেবল মুখের 'স্বীকৃতি' ঈমানের জন্য যথেষ্ট মনে করেন। সাধারণ মুরজিয়াগণ 'বিশ্বাস ও স্বীকৃতি'কে ঈমান বলে থাকেন।[৩] ইমাম আবু হানীফা ও কিছু সংখ্যক ফক্বীহ 'আমল'কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেননি বরং 'ঈমানের বাস্তব পদ্ধতি' (شرائع الإيمان) বলে মনে করেন।

আহলেহাদীছগণ আল্লাহ্র উপরে ঈমান রাখেন 'রব' হিসাবে, একক 'ইলাহ' হিসাবে, তাঁর অনন্য নাম ও গুণাবলী সহকারে, যা মাখলূকের নাম ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়।[৪] এই নির্ভেজাল একত্ববাদকেই বলা হয় 'তাওহীদ', যাকে তিনভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। যথাঃ ১- তাওহীদে রবূবিয়াত (توحيد الربوبية) ঃ সৃষ্টি ও পালনে আল্লাহ্র একত্ব ২- তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত (توحيد الأسماء و الصفات) ঃ নাম ও গুণাবলীর একত্ব ৩- তাওহীদে ইবাদাত বা উলূহিয়াত (توحيد العبادة او الألوهية) ঃ ইবাদাত বা উপাসনায় একত্ব।

১. তাওহীদে রবূবিয়াতঃ এর অর্থ হ'ল আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রূযীদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মরণদাতা প্রভৃতি হিসাবে বিশ্বাস

করা।[৫] কিছু সংখ্যক নাস্তিক ও প্রকৃতিবাদী ছাড়া দুনিয়ার প্রায় সকল মানুষ সকল যুগে আল্লাহ্‌কে 'রব' হিসাবে বিশ্বাস করে এসেছে। মুশরিক আরবরাও এ বিশ্বাস রাখ্‌ত। যেমন আল্লাহ পাক নিজেই কালামে পাকে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন।[৬] এমনকি তারা তাদের সন্তানদের নাম আবদুল্লাহ, আবদুল মুত্ত্বালিব ইত্যাদি রাখ্‌ত। তাই শুধুমাত্র তাওহীদে রবূবিয়াতের উপরে ঈমান আনলেই কেউ মুমিন হ'তে পারে না এবং আখেরাতে মুক্তি পেতে পারে না, যতক্ষণ না তাওহীদে ইবাদতের উপরে খালেছ ঈমান পোষণ করে।[৭]

২. তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাতঃ এর অর্থ হ'ল আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর একত্বের উপরে যেমন বর্ণিত আছে তেমনভাবেই বিশ্বাস করা। কোন রূপক অর্থ ও কল্পিত ব্যাখ্যা ছাড়াই আহলেহাদীছগণ আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াত ও ছহীহ হাদীছ সমূহকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র সত্তা ও আকৃতির কোন রূপ কল্পনা করেন না। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীকে বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সদৃশ মনে করেন না, কিংবা মূল অর্থ পরিত্যাগ করে কোন গৌণ অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁরা আল্লাহ্‌কে নিরাকার ও নির্গুণ সত্তা মনে করেন না।[৮] তারা আল্লাহ্‌র নাম ও নামীয় সত্তাকে (الإسم والمسمى) এক ও অবিভাজ্য মনে করেন[৯] এবং আল্লাহ্‌র সত্তাগত ও কর্মগত গুণাবলীকে আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্ন ও ক্বাদীম (সনাতন) বলে বিশ্বাস করেন।[১০] তাঁরা একথা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্‌র অহির মাধ্যমেই কেবল ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ে এবং বস্তুর ভাল-মন্দ বিষয়ে সঠিক ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।[১১] মুহাম্মাদ (ছাঃ) সহ দুনিয়ার সকল নবীই এ বিষয়ে কেবল অহির সাহায্যে জ্ঞান লাভ করেছেন।[১২] এমনকি 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই' এই মৌলিক বিষয়ে নিশ্চিত ঈমান আনয়নের জন্য কেবল মানবীয় জ্ঞান যথেষ্ট নয়, বরং অহি প্রয়োজন[১৩] এবং উম্মতের জন্য প্রয়োজন অহির নিকটে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। নইলে ঈমান আনার পরেও মুশরিক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।[১৪]

ইসলামে উছূলী ফের্কাবন্দীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল কারণ হ'ল 'তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত' সম্পর্কে আক্বীদাগত বিভ্রান্তি। উক্ত বিষয়ে মুসলিম বিদ্বানগণ মূলতঃ দু'দলে বিভক্ত হ'য়ে গেছেন। একদল আল্লাহ্‌র নিরেট একত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁকে নাম ও গুণহীন সত্তা মনে করেছেন। এঁরা প্রধান তিন দলে বিভক্ত। (ক) জাহ্‌মিয়া, যারা আল্লাহ্‌কে নাম ও গুণহীন সত্তা মনে করেন। এঁরা জাহ্‌ম বিন

ছাফওয়ান সমরকন্দীর (নিহত ১২৮ হিঃ) অনুসারী, যিনি ইসলামে সর্বপ্রথম সর্বেশ্বরবাদ (الحلول المطلق) বা অদ্বৈতবাদী দর্শনের (وحدة الوجود) আমদানীকারী জা'আদ বিন দিরহাম খোরাসানীর (নিহতঃ ১২৪ হিঃ) শিষ্য ছিলেন। এই ব্যক্তি ও তার অনুসারীরাই সর্বপ্রথম আরশে আল্লাহ্‌র অবস্থান, কুরআন আল্লাহ্‌র সনাতন কালাম হওয়া, আল্লাহ্‌র গুণযুক্ত সত্তা হওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এরপর থেকেই আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর একত্ব সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করা হ'তে থাকে, যা ইতিপূর্বে ছিল না।[১৫] জাহ্‌মিয়াগণ এমন একটি শূন্য সত্তার ইবাদত করেন যাঁর শ্রবণ, দর্শন ও দয়াগুণ কিছুই নেই। এঁরা জাহ্‌মিয়া, নাজ্জারিয়া, যার্‌রারিয়া প্রভৃতি উপদলে বিভক্ত।[১৬]

(খ) মু'তাযিলাঃ এঁরা আল্লাহ্‌কে গুণহীন নামীয় সত্তা মনে করেন। তাঁদের মতে আল্লাহর সত্তা যেমন সনাতন (ক্বাদীম), তাঁর গুণাবলীকেও তেমনি সনাতন মনে করলে 'শিরক' করা হবে। সে কারণ তাঁরা বলেন, আল্লাহ ইল্‌ম (জ্ঞান) ছাড়াই 'আলীম' (সর্বজ্ঞ), কুদরত (শক্তি) ছাড়াই 'ক্বাদীর' (সর্বশক্তিমান), হায়াত (জীবন) ছাড়াই 'হাই' (চিরঞ্জীব) ইত্যাদি।[১৭] তাঁরা আল্লাহ্‌র নাম ও নামীয় সত্তায় (الإسم و المسمى) পার্থক্য করে থাকেন। তাদের কথিত কলেমায়ে শাহাদাতের অর্থ হ'লঃ- 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সেই সত্তার যাঁর নাম আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সেই ব্যক্তির যাঁর নাম মুহাম্মাদ, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল।[১৮] মু'তাযিলাগণ ওয়াছিল বিন আতা (৮০-১৩১ হিঃ)-এর অনুসারী। এরা ওয়াছিলিয়াহ, হুযাইলিয়াহ, নিযামিয়াহ প্রভৃতি ১২টি উপদলে বিভক্ত।[১৯] জাহ্‌মিয়া ও মু'তাযিলা সকলে 'মু'আত্ত্বিলাহ' (নির্গুণবাদী) বলে অভিহিত।[২০]

(গ) আশ'আরিয়াঃ এঁরা আল্লাহ্‌র 'আলীম' (সর্বজ্ঞ), 'ক্বাদীর' (সর্বশক্তিমান), 'হাই' (চিরঞ্জীব), 'মুরীদ' (ইচ্ছাকারী), 'মুতাকাল্লিম' (কথক), 'সামী' (শ্রোতা), 'বাছীর' (দ্রষ্টা)-সহ মোট সাতটি গুণকে স্বীকার করেন ও বাকী সকল গুণকে অস্বীকার করেন।[২১] এরা আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আশ'আরীর (২৬০-৩২৪ হিঃ) অনুসারী। ৩০০ হিজরীতে তিনি এই মত পরিত্যাগ করে আহলে সুন্নাতের অনুসারী হন।[২২] তবে তাঁর অনুসারী দল পূর্বমতে রয়ে গেছে।

বিদ্বানদের দ্বিতীয় দলটি আল্লাহ্‌কে নাম ও গুণযুক্ত সত্তা মনে করেন। এই দলের কিছু বিদ্বান বাড়াবাড়ি করে আল্লাহকে মানব দেহের আকৃতি কল্পনা করে

নিয়েছেন, যারা 'মুজাস্‌সিমাহ' (কায়াবাদী) নামে পরিচিত হয়েছেন। কিছু বিদ্বান আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে বান্দার গুণাবলীর সদৃশ মনে করে 'মুশাব্বিহাহ' (সাদৃশ্যবাদী) নামে অভিহিত হয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার কল্পনা করে সর্বেশ্বরবাদী (حلولية) হয়ে গেছেন। এঁরা বেশ কয়েকটি উপদলে বিভক্ত।[২৩] উপরোক্ত দুই মতের মধ্যবর্তী পথ হ'ল এই যে, আল্লাহ পাক অবশ্যই নাম ও গুণযুক্ত সত্তা। তবে তাঁর সত্তা ও গুণাবলী বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই তার উপরে ঈমান আনতে হবে। এই মধ্যবর্তী পথই হ'ল আহলেসুন্নাত আহলেহাদীছের পথ ও গৃহীত আক্বীদা, যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের গৃহীত আকীদার অনুরূপ।[২৪]

লোকেরা আল্লাহ্‌র নামকেও বিকৃত করেছে। জাহেলী যুগের আরবরা তাদের কিছু কিছু দেবীর নাম আল্লাহ্‌র পরিবর্তে 'লাত', আযীযের বদলে 'উয্‌যা',[২৫] মান্নানের বদলে 'মানাত' রেখেছিল।[২৬] বর্তমানে হিন্দুরা ঈশ্বর, ভগবান, খৃষ্টানরা 'গড', মুসলমানদের কেউ কেউ মৃত বুযর্গকে 'গাউছুল আযম' 'মুশকিল কুশা' 'দস্তগীর' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে ও প্রার্থনা নিবেদন করে থাকে।[২৭] অথচ এসব কোন নামই আল্লাহ্‌র মনঃপুত নয়। বরং তাঁর উত্তম নাম সমূহ রয়েছে, যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে।[২৮] সেখানে আল্লাহ্‌র হাত, পা, চেহারা, আরশে অবস্থান, তাঁর কথা বলা, নিম্ন আকাশে অবতরণ, কেয়ামতের দিন মুমিন বান্দাদের দর্শন দান ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। আহলেহাদীছগণ এই সকল বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন এবং সকল প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মন্তব্য হ'তে বিরত থাকেন।[২৯] আল্লাহ বলেন, 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই' 'তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই' 'লোকদের প্রদত্ত বিশ্লেষণসমূহ হ'তে তোমার প্রভু মুক্ত'।[৩০]

৩- তাওহীদে ইবাদতঃ এর অর্থ হ'ল 'সর্বপ্রকার ইবাদতের জন্য আল্লাহ্‌কে একক গণ্য করা।' আল্লাহ্‌র জন্য সর্বাধিক ভালোবাসা সহ চরম প্রণতি পেশ করাকে 'ইবাদত' বলা হয়। সামগ্রিক অর্থে 'ইবাদত' ঐ সকল প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কাজের নাম, যা আল্লাহ ভালবাসেন ও যাতে তিনি খুশী হন।[৩১] 'ইলাহ' সেই সত্তা যাঁর নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করতে হয় ও যাঁকে ইবাদত করতে হয় মহব্বতের সাথে একনিষ্ঠ ভাবে ভীতিপূর্ণ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে।[৩২]

মানুষের জীবনে আকীদা ও আমলের দু'টি প্রধান দিক আছে। এর মধ্যে আকীদাগত দিক বা রূহানী জগতই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ কাজ করে এবং স্ব স্ব আকীদা মতে তার সার্বিক বৈষয়িক জীবন পরিচালিত হয়। একজন পূর্ণ মুমিন তার আধ্যাত্মিক জীবনে ছালাত-ছওম, যবহ্-মান্নত, হজ্জ-তাওয়াফ, প্রার্থনা-তাওয়াক্কুল ইত্যাদি ইবাদতের সকল পদ্ধতিতে যেমন ইলাহী বিধান মেনে চলবেন, বৈষয়িক জীবনেও তেমনি আল্লাহ্র কিতাব, রাসূলের (ছাঃ) সুন্নাত এবং যুগের শরীয়ত অভিজ্ঞ মুসলিম পণ্ডিতগণের ইজতিহাদ অনুযায়ী স্বীয় কর্ম পরিচালনা করবেন। যে ইজতিহাদ হবে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ও যুগের উদ্ভূত সমস্যাবলীর শরীয়ত অনুযায়ী সমাধান দেওয়ার জন্য।[৩৩] আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-কে বাদ দিয়ে অন্য যার কাছ থেকেই ফায়ছালা নেওয়া হবে অথবা অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করা হবে- সেই-ই হবে 'ত্বাগূত',[৩৪] যা থেকে দূরে থাকার জন্য এবং মানুষের সার্বিক জীবনের সকল প্রকার আনুগত্যকে তাগূতমুক্ত করে স্রেফ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে খালেছ ও নিরংকুশ করার জন্য যুগে যুগে নবীগণ মানবজাতিকে আহবান জানিয়ে গেছেন।[৩৫] তাই তাগূতকে অস্বীকার করা ব্যতীত আল্লাহ্র ইবাদত হাছিল হওয়া সম্ভব নয়।[৩৬] মূলতঃ এটাই হ'ল 'তাওহীদে ইবাদত' বা উলূহিয়াতের মূল কথা, যার উপরে দৃঢ় ঈমান পোষণ ব্যতীত কারু পক্ষে পূর্ণ মুমিন হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক জিন্ ও ইনসানকে কেবলমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।[৩৭]

আহলেহাদীছগণ উপরোক্ত তিনপ্রকার তাওহীদকেই গ্রহণ করেন ও সেভাবেই আল্লাহ্র উপরে ঈমান পোষণ করে থাকেন।[৩৮]

(২) **ফিরিশ্তাগণের উপরে ঈমানঃ** আহলেহাদীছের আকীদা হিসাবে বর্ণিত এক নম্বর ক্রমিকের ছয়টি বিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি হ'ল ফিরিশ্তাগণের উপরে ঈমান আনা। ফিরিশ্তাগণ নূরের তৈরী[৩৯] আল্লাহ্র এক বিশেষ সৃষ্টি, যারা অদৃশ্যভাবে সৃষ্টিকুলের সেবায় সর্বদা আল্লাহ্র হুকুমে তৎপর আছেন।[৪০] ফিরিশ্তাগণের সর্দার জিব্রীল আমীন আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে নবীদের নিকটে 'অহি' বহনের মহান দায়িত্ব পালন করে থাকেন।[৪১] কুরআন ও হাদীছে ফিরিশ্তা সম্পর্কে যা কিছু এরশাদ হয়েছে, সবকিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এগুলি অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান। এখানে 'অহি' ব্যতীত কল্পনার কোন স্থান নেই।

(৩) **রাসূলের প্রতি ঈমানঃ** 'রাসূল' বলতে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে বান্দার মধ্য

থেকে নির্বাচিত আল্লাহ্‌র বাণীবাহকগণকে বুঝায়। কুরআনে বর্ণিত পঁচিশ জন নবী ও রাসূল এবং হাদীছে যে সর্বমোট ৩১৫ জন রাসূল সহ এক লক্ষ চব্বিশ হাযার পয়গাম্বরের কথা বর্ণিত হয়েছে,[৪২] তাঁদের সকলেই এতে শামিল হবেন। নবী ও রাসূলগণ সম্পর্কে এই বিশ্বাস পোষণ করা ওয়াজিব যে, নবুঅত প্রাপ্তির আগে ও পরে স্বেচ্ছাকৃত যাবতীয় ছগীরা ও কবীরা গুনাহ হ'তে তাঁরা মাছূম ছিলেন।[৪৩] আল্লাহ্‌র যে সমস্ত বাণী তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সবই নির্ভুল ও যথাযথভাবে স্ব স্ব উম্মতের নিকটে পৌঁছে দিয়েছেন। উম্মতের কোন বিশেষ ব্যক্তির নিকটে বিশেষ কোন ইল্‌ম তাঁরা লুকিয়ে রেখে যাননি। তাবলীগে দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ খেয়ানত, অলসতা, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ইত্যাদি যাবতীয় রকমের ত্রুটি হ'তে তাঁরা মুক্ত ছিলেন।[৪৪] চারজন শ্রেষ্ঠ রাসূলের মধ্যে মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না।[৪৫] সকল নবীই ছিলেন স্ব স্ব গোত্রের জন্য, কিন্তু শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন জিন্ ও ইনসান সহ সকল মাখলূকাতের জন্য প্রেরিত বিশ্বনবী।[৪৬]

(৪) **আল্লাহ্‌র কিতাব সমূহের উপরে ঈমানঃ** শ্রেষ্ঠ চারখানা কিতাব তাওরাত, যবূর, ইন্‌জীল ও কুরআন ছাড়াও ইবরাহীম (আঃ) ও অন্যান্য নবী ও রাসূলের নিকটে প্রেরিত সকল গ্রন্থও পুস্তিকাকে আল্লাহ-প্রেরিত কিতাব ও ছহীফা হিসাবে বিশ্বাস করা ওয়াজিব।[৪৭] পবিত্র কুরআন তার পূর্বেকার সকল কিতাব ও ছহীফা সমূহের সত্যায়নকারী ও সর্বশেষ ইলাহী কিতাব।[৪৮]

(৫) **কিয়ামতে বিশ্বাসঃ** কিয়ামতের দিন সকল মৃতব্যক্তি স্ব স্ব দেহে পুনর্জীবন লাভ করবে।[৪৯] অতঃপর আল্লাহ্‌র দরবারে সারা জীবনের আমলের জন্য বিচারের সম্মুখীন হবে। প্রত্যেকের আমলনামা তার ডান অথবা বাম হাতে দেওয়া হবে। অতঃপর সে অনুযায়ী সে জান্নাতী বা জাহান্নামী হবে।[৫০]

(৬) **তাক্বদীরে বিশ্বাসঃ** হায়াত, মউত, রিযিক, জান্নাতী বা জাহান্নামী[৫১] এই প্রধান চারটি বিষয়সহ বান্দার সমগ্র জীবনের ভালমন্দ কাজকর্ম আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ্‌র ইল্‌মে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।[৫২] তাছাড়া একদল মানুষকে আল্লাহ পাক জান্নাতের জন্য ও একদলকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন,[৫৩] যার খবর তিনি ব্যতীত কোন সৃষ্টির পক্ষে জানা সম্ভব নয়। জানা না থাকার কারণেই জান্নাত পাওয়ার আশায় মুমিন বান্দা তার তাকদীরের উপরে আস্থা রেখে পূর্ণ উদ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। বিপদে সে ধৈর্য

হারায় না, আনন্দে সে আত্মহারা হয়না। ইহকালে সে সুষ্ঠু (balanced) নিশ্চিন্ত ও শান্তিময় জীবন যাপন করে।[৫৪] কারণ সে জানে যে তাকদীরের লিখনের বাইরে সে কিছুই প্রাপ্ত হবে না।[৫৫] জাব্রিয়াগণ অদৃষ্টবাদী হয়ে নিজেদেরকে ইচ্ছাশক্তিহীন জড়পদার্থ ভেবেছেন।[৫৬] ক্বাদারিয়াগণ তাকদীরকে অস্বীকার করে নিজেদেরকে স্ব স্ব ভাগ্য বিধায়ক মনে করেছেন।[৫৭] প্রকৃত পথ এ দুইয়ের মাঝখানে, যা আহলেসুন্নাত আহলেহাদীছের পথ ও গৃহীত আক্বীদা।

২-আহ্লেহাদীছের অন্যতম আক্বীদা এই যে, ইবাদতের জন্য যেমন আল্লাহ্কে একক গণ্য করতে হবে, অনুসরণের জন্য তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একক গণ্য করতে হবে।[৫৮]

কালেমায়ে শাহাদাতের প্রথম অংশের দাবী হ'ল গায়রুল্লাহ্কে অস্বীকার করে ইবাদতকে স্রেফ আল্লাহ্র জন্য খালেছ করা। দ্বিতীয় অংশের দাবী হ'ল আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্য তাঁর প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অনুসরণের ক্ষেত্রে একক গণ্য করা। যারা মানুষের জীবনকে বিচ্ছিন্ন ভাবেন ও বৈষয়িক ব্যাপারসমূহ পরিচালনার জন্য ইসলামী শরীয়ত যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন, তারা প্রকারান্তরে মানবজাতির বৈষয়িক বিষয় সমূহের জন্য আরেকজন রাসূল কামনা করেন।[৫৯] আহলেহাদীছগণ শেষনবীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ইলাহী বিধান ও তাঁর প্রদর্শিত ইসলামী শরীয়তের যথাযথ ও সার্বিক অনুসরণকে মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির আবশ্যিক পূর্বশর্ত বলে বিশ্বাস করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ইবাদতের বিষয়টি হ'ল 'তাওক্বীফী' যেখানে কোনরূপ কমবেশী করার অধিকার কারু নেই।[৬০] অতএব শরীয়ত পরিমণ্ডলে অন্য কারু প্রবেশাধিকার চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ। সেমতে 'ইস্তিহসান' অনুযায়ী কোন সিদ্ধান্ত নিলে সেটা নতুনভাবে শরীয়ত রচনার শামিল হবে।[৬১] আহলেহাদীছগণ আক্বীদা ও আহকাম বিষয়ে 'যঈফ' হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেন না।[৬২] তবে কোন বিষয়ে ফাসিদ কিয়াসের বদলে যঈফ হাদীছকে অগ্রগণ্য মনে করেন।[৬৩] তারা সর্বদা ছহীহ হাদীছ অনুসরণে সচেষ্ট থাকেন[৬৪] এবং 'মুতাওয়াতির' ও 'আহাদ' পর্যায়ের ছহীহ হাদীছকে ইসলামী আইনের উৎস হিসাবে গণ্য করেন।[৬৫]

৩- আহ্লেহাদীছগণ ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধিতে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে নেক আমলের দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহের দ্বারা ঈমানের ঘাটতি হয়।[৬৬] তাঁদের প্রধান দলীল সমূহের কয়েকটি নিম্নরূপঃ-

(১) আল্লাহ পাক এরশাদ করেন যে, 'মুমিন কেবল তারাই যাদের নিকটে আল্লাহ্র কথা বলা হলে ভয়ে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। যখন তাদের নিকটে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তাদের প্রভুর উপরে তারা একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়।'[৬৭]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন - 'ঈমানের সত্তুরের অধিক শাখা রয়েছে। যার মধ্যে সর্বোত্তম (فأفضلها) হ'ল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বনিম্ন (أدناها)) হ'ল রাস্তা হ'তে কষ্ট (বাধা) দূর করা।[৬৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে 'সত্তুরের অধিক দর্জা রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বোচ্চ (أعلاها) হ'ল..। [৬৯]

(৩) ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, 'পৃথিবীর সকল মুমিনের ঈমান আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমানের সাথে ওযন করা হ'লে আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমানের ওযন বেশী হবে।[৭০]

(৪) ইমাম হুসাইন বিন মাসঊদ বাগাভী (৪৩৬-৫১৬ হিঃ) বলেন, 'সকল ছাহাবী, তাবেঈ ও পরবর্তীকালে সুন্নাহ্র পণ্ডিতগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে, আমল ঈমানের অঙ্গ। ... তাঁরা সকলেই বলেন যে, ঈমান আনুগত্যের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গুনাহের দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।[৭১]

খারেজী ও মু'তাযিলীগণ আমলকে ঈমানের অঙ্গ মনে করলেও তারা ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধিতে বিশ্বাসী নন। খারেজীদের মতে কবীরা গুনাহ্গার ব্যক্তি 'কাফির' এবং মু'তাযিলীদের নিকটে সে 'মুমিনও নয় কাফিরও নয় বরং দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে' (منزلة بين المنزلتين) ফাসিক। মুর্জিয়াদের নিকটে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে মুত্তাক্বী ও ফাসিক্ব সকলের ঈমান সমান।[৭২]

৪- আহলেহাদীছের আক্বীদামতে কবীরা গোনাহগার মুমিন ঈমান হ'তে খারিজ নয়। সে তওবা না করে মারা গেলেও স্থায়ীভাবে জাহান্নামী নয়।[৭৩] আল্লাহ পাক শিরক ব্যতীত বান্দার যে কোন গুনাহ মাফ করে থাকেন।[৭৪] গুনাহের কারণে তাকে 'গুনাহগার' (عاصي), 'দোষযুক্ত' (ناقص), 'ফাসিক্ব' (فاسق) ইত্যাদি বলা যাবে। কিন্তু 'পূর্ণ মুমিন' (مؤمن حق) কিংবা 'কাফির' (كافر) বলা যাবে না।[৭৫] একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি মৃতের ন্যায় হ'লেও তাকে যেমন প্রাণহীন মৃত বলা যায় না, তেমনি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঈমানের দীপ্তি স্তিমিত হ'য়ে গেলেও কোন মুমিনকে ঈমানশূন্য কাফির বলা যায় না। তাছাড়া

কেয়ামতের দিনে নবীর শাফা'আত তো মূলতঃ কবীরা গুনাহগার মুমিনদের জন্যই হবে।

কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি খারেজীদের নিকটে কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী।[৭৬] মু'তাযিলাদের নিকটে ফাসিক এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অবশ্য কাফিরদের তুলনায় তাদের আযাব কিছুটা হাল্‌কা হবে।[৭৭] মুরজিয়াদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়, সেহেতু কবীরা গোনাহ তার ঈমানের কোন ক্ষতি করবে না। অতএব এব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য তারা কেয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান।[৭৮] একারণে তাদেরকে কেউ কেউ 'শৈথিল্যবাদী' বলেন।

৫- আহলেহাদীছের আক্বীদামতে আল্লাহ বান্দার ভাল-মন্দ সকল কর্মের মূল স্রষ্টা।[৭৯]

যেমন এরশাদ হয়েছে- 'আল্লাহ তোমাদেরকে ও তোমরা যা কর, সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন।'[৮০] বান্দা হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত কর্মশক্তি প্রয়োগে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। যেমন এরশাদ হয়েছে 'আমরা রাস্তা বাৎলে দিয়েছি। এক্ষণে তোমরা তা অনুসরণ করে কৃতজ্ঞ হও অথবা অকৃতজ্ঞ হও।'[৮১] এই কর্মশক্তির ভাল-মন্দ প্রয়োগের উপরে নির্ভর করছে বান্দার পুরস্কার অথবা শাস্তি লাভ। এরশাদ হচ্ছে 'স্ব স্ব আমলের বাইরে আজকের দিনে কাউকে কোন বদ্‌লা দেওয়া হবে না বা সামান্যতম যুলম করা হবে না।'[৮২] মোট কথা আল্লাহ হলেন কর্মের স্রষ্টা (خالق الأفعال) এবং বান্দা হ'ল কর্মের বাস্তবায়নকারী (فاعل الأفعال)। অদৃষ্টবাদী জাবৃরিয়াগণ বান্দাকে 'ইচ্ছা ও কর্মশক্তিহীন বাধ্যগত জীব' (مجبور في أفعاله لا قدرة له و لا إرادة و لا إختيار) বলে মনে করেন।[৮৩]

৬- আহলেহাদীছের অন্যতম আক্বীদা হ'ল 'আল্লাহ্‌র কালাম সৃষ্ট নহে' একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা।[৮৪]

অন্যান্য সকল গুণের ন্যায় আল্লাহর কথা বলার গুণ ও ক্বাদীম বা সনাতন, যা আল্লাহর নিজ সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যে কুরআন আমরা পড়ি বা শুনি, যা স্মৃতিতে ধারণ করি বা লিখি, তা সবই নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র কালাম। কুরআনের প্রতিটি বর্ণ, শব্দ, অর্থ, আওয়ায সবই আল্লাহ্‌র যা ক্বাদীম ও গায়র মাখলূক।[৮৫] কুরআন 'লওহে মাহফূযে' সুরক্ষিত ছিল।[৮৬] সেখান থেকে জিব্রীল (আঃ) মারফত ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে নাযিল হয়েছে।[৮৭] অতঃপর

যে ভাষায় কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে, আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) সেই ভাষাতেই যথাযথভাবে তা বিশ্ববাসীর নিকটে পৌঁছে দিয়েছেন।[৮৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কেতাব হ'তে একটি বর্ণ পাঠ করল, সে নেকী পেল। প্রত্যেক নেকী তার দশগুণ হয়। আমি বলিনা যে, (الم) একটি হরফ। বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ ও 'মীম' একটি হরফ।[৮৯] তিনি বলেন, 'তোমরা কি আমাকে আমার প্রভুর কালাম প্রচার করতে বাধা দিবে?[৯০] এ থেকে বুঝা যায় যে, কুরআনের প্রতিটি বর্ণ আল্লাহ্‌র।

এক্ষণে যদি কেউ বলেন যে, কুরআন মাখলূক কিংবা কুরআনের শব্দ মাখলূক ও মূল ভাবটি (معني) ক্বাদীম, কিংবা বর্তমান কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম হওয়া সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই কিংবা যদি কেউ কুরআনের কোন একটি হরফকেও অবিশ্বাস বা অস্বীকার করে, যে মুমিন নয়।[৯১]

৭- গায়েবে বিশ্বাসঃ আহলেহাদীছগণ ঐসব গায়েবী ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করেন, যে সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে খবর দিয়েছেন।[৯২] যেমন মি'রাজের ঘটনাবলী, কবরের সওয়াল-জওয়াব, আযাব-শাস্তি, কিয়ামতপূর্ব কালে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন ও সমগ্র পৃথিবীতে সাত বছর যাবত ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা,[৯৩] মানুষের সঙ্গে নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চাবুকের অগ্রভাগ, জুতার ফিতা এবং জীবজন্তুর কথোপকথন[৯৪] প্রভৃতি ছাড়াও কিয়ামত প্রাক্কালের দশটি নিদর্শন যেমন (১) পশ্চিম দিক হ'তে সূর্যের উদয় (২) 'দাব্বাতুল আরয'- এর আগমন (৩) দাজ্জালের আবির্ভাব (৪) ঈসা (আঃ) -এর অবতরণ (৫) ইয়াজূজ-মাজূজ -এর আগমন (৬) প্রাচ্যে (৭) পাশ্চাত্যে ও (৮) আরব উপদ্বীপে মাটিতে ধ্বস নামা (৯) ধোঁয়া উদগীরণ ও সবশেষে (১০) ইয়ামন অথবা অন্য বর্ণনা মতে এডেন-এর গর্তসমূহ (قعر عدن) হ'তে প্রচন্ডবেগে অগ্নি নির্গত হওয়া, যা লোকদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসবে। অন্য বর্ণনা মতে 'প্রচন্ড ঝড়' যা লোকদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে।[৯৫] অতঃপর সিংগায় ফুঁকদান, কিয়ামত অনুষ্ঠান, মৃতদের পুনর্জীবন লাভ, হাশরের ময়দানে জমায়েত হওয়া, বিচারের সম্মুখীন হওয়া, দাঁড়িপাল্লায় আমলের ওযন হওয়া, হাওয কাওছার, পুলছিরাত সবকিছুকেই নির্দ্বিধায় সত্য বলে বিশ্বাস করা।[৯৬]

৮- জান্নাত, জাহান্নাম ও তার ভিতরকার সবকিছু বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায়

আছে।[৯৭] যার প্রকৃত অবস্থা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। মি'রাজের সময়ে আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) স্বচক্ষে এগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন। কবরবাসীগণ জান্নাতের সুগন্ধি বা জাহান্নামের উত্তাপ কবরেই প্রাপ্ত হবে। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে স্ব স্ব ঠিকানা দেখানো হবে।[৯৮] কিয়ামতের দিন সকল মাখলূকাত ধ্বংস হবে। কিন্তু জান্নাত, জাহান্নাম ও তার ভিতরকার বস্তুসমূহ অক্ষত থাকবে।[৯৯]

৯- আহলেহাদীছগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌কে দর্শনে বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন।[১০০]

পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে স্পষ্টভাবে চাঁদ দেখার ন্যায় কিয়ামতের দিন মুমিনগণ স্পষ্টভাবে আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষ করবে।[১০১] দুনিয়াতে এই দর্শন সম্ভব নয়।[১০২] মুমিনদের জন্য কিয়ামতের দিনে তাদের ঈমানের সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক পুরস্কার হবে এটাই।[১০৩] কাফির-মুশরিকগণ এই মহা সৌভাগ্য হ'তে চিরবঞ্চিত হবে তাদের অবিশ্বাসের মর্মান্তিক প্রতিফল হিসাবে।[১০৪]

১০- আহলেহাদীছগণ শাফা'আতে রাসূল (ছাঃ)-এ বিশ্বাস পোষণ করেন।[১০৫]
শাফা'আত হবে তিন ধরনের।[১০৬] (১)হাশরের ময়দানে উপস্থিত সকলের জন্য। (২) জান্নাতীদেরকে জান্নাতে পাঠানোর জন্য (৩) কবীরা গোনাহ্‌গার মুমিনদের জন্য।[১০৭] খারেজী ও মু'তাযেলীগণ শেষোক্ত শাফা'আতকে অস্বীকার করেন। কেননা তাদের মতে কবীরা গুনাহ্‌গার ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী।[১০৮]

১ম ও ২য় শাফা'আত মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর জন্য নির্দিষ্ট। তন্মধ্যে প্রথম শাফা'আতটিই অধিক মর্যাদামন্ডিত। ৩য় শাফা'আত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও অন্যান্য সকল নবী, ফিরিশ্‌তা, উলামা, শুহাদা, ছিদ্দীক্বীন ও সকল নেক্‌কার মুমিন বান্দার জন্য উন্মুক্ত[১০৯] যাদেরকে আল্লাহ্‌পাক সুফারিশের জন্য বিশেষ অনুমতি দিবেন।[১১০] এতে বান্দার নিজস্ব কোন গৌরব নেই বা দুনিয়ায় থাকতে আগেভাগে কাউকে আল্লাহ্‌র নিকটে সুফারিশকারী মাধ্যম বা 'অসীলা' সাব্যস্ত করারও কোন উপায় নেই। এই মাধ্যম বেছে নেওয়ার ফলেই ইহুদী-নাছারা ও মুশরিকগণ দুনিয়াতে একদল মানুষকে রব-এর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।[১১১]

শাফা'আতের ফলে কারু শাস্তি মওকূফ হয়না। বরং শাফা'আতের দ্বারা দয়া-পরবশ হ'য়ে আল্লাহপাক কারো শাস্তি মওকূফ করে থাকেন। যেমন বৃষ্টি প্রার্থনার ফলে বৃষ্টি হয়না বরং দো'আ কবুল হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক বৃষ্টির রহমত বর্ষণ করে থাকেন।[১১২] সকলে সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র রহমতের ভিখারী।

তিনি কারো নিকটে বাধ্য নন।

১১- আহ্‌লেহাদীছগণ 'খত্‌মে নবুওতে' দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন[১১৩] এবং এই বিশ্বাসকে মুমিন হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত মনে করেন।

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষ নবী মানতে অস্বীকারকারী কিংবা সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি আহলেহাদীছের আকীদামতে নিঃসন্দেহে কাফির।[১১৪] তাঁকে শেষনবী হিসাবে স্বীকার করার পর তাঁর আনীত শরীয়তকে সর্বশেষ ও পূর্ণাংগ হিসাবে মানতে অস্বীকারকারী ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়।[১১৫]

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষ নবী হিসাবে বিশ্বাস করার উপরেই নির্ভর করে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য ও অগ্রগতি, নির্ভর করে ইসলামের পূর্ণাংগ দ্বীন হওয়া, নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া এবং কুরআনের সর্বশেষ আসমানী কিতাব হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নবীদের তুলনা একটি পাকা ভবনের ন্যায়, যাতে একটি ইটের জায়গা মাত্র খালি ছিল। আমিই সেই ইট এবং আমার মাধ্যমেই নবীদের সিলসিলা শেষ হ'য়ে গেছে।[১১৬] 'আমার পরে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা প্রত্যেকেই নিজেকে 'আল্লাহ্‌র নবী' ধারণা করবে। অথচ আমিই শেষ নবী। আমার পরে নবী নেই ((لانبى بعدى))।[১১৭]

১২- আহ্‌লেহাদীছের অন্যতম আকীদা হ'ল ছাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদার প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং তাঁদের সমালোচনা হ'তে বিরত থাকা।[১১৮]

ছাহাবায়ে কেরাম হলেন উম্মতের সেরা ব্যক্তিত্ব।[১১৯] আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে তাঁর হাবীব, সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠতম রাসূলের সাথী হিসাবে নির্বাচন করে ছিলেন। কিয়ামতে তাঁরাই হবেন রাসূলের শাফা'আত লাভের প্রথম হকদার।[১২০]

আহলেহাদীছের আকীদা মতে কোন ছাহাবীকে গালি দেওয়া বা সমালোচনা করা কবীরা গুনাহ। তাঁদের মধ্যে কোন পাপ চিন্তা বা দুনিয়াবী উচ্চাভিলাষ ছিলনা। তবে তাঁরা নবীদের ন্যায় মাছূম ছিলেন না। অতএব ইজতিহাদী ভুলের কারণেই তাঁদের কারু কারু মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত হয়েছে। আহলেহাদীছগণ ছাহাবীদের ব্যাপারে শী'আ ও খারেজীদের বাড়াবাড়ি হ'তে মুক্ত। তাঁরা ছাহাবীদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকেন ও সকল মুমিনের ব্যাপারে হৃদয়কে খোলাছা রাখাকে ঈমানী কর্তব্য বলে মনে করেন। রাফেযী ও শী'আদের ন্যায় তাঁরা ছাহাবীদের গালি দেন না।[১২১] খারেজীরা ওছমান ও আলীকে কাফের ও অবৈধ খলীফা মনে করে।[১২২] শী'আরা প্রথম তিন খলীফাকে কাফের ও আলীকেই একমাত্র বৈধ খলীফা মনে করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর পরিবারেই

মুসলিম উম্মাহ্র নেতৃত্ব বা ইমামতকে সীমায়িত করে থাকেন।[১২৩]

১৩- আহলেহাদীছগণ এ আক্বীদা পোষণ করেন যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের চারজন খলীফা হ'লেন উম্মতের চারজন সেরা ব্যক্তিত্ব। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবুবকর (রাঃ), অতঃপর ওমর বিনুল খাত্তাব (রাঃ), অতঃপর ওছমান গণী (রাঃ), অতঃপর আলী (রাঃ)।[১২৪] রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ত্রিশ বৎসর যাবত এঁদের হাতে 'খিলাফতে রাশিদাহ্' পরিচালিত হয়েছিল।[১২৫]

১৪- আহলেহাদীছগণ এ আক্বীদা পোষণ করেন যে, আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) যে দশজন ছাহাবীকে তাঁদের জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন, তাঁরা জান্নাতবাসী হবেন।[১২৬]

এতদ্ব্যতীত ছাহাবী ছাবিত বিন ক্বায়েস (মৃঃ ১২ হিঃ) উক্কাশা বিন মিহ্ছান (মৃঃ ১২ হিঃ) ও আবদুল্লাহ বিন সালাম (মৃঃ ৪৩ হিঃ) সম্পর্কেও আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।[১২৭] এছাড়াও ৩১৩ জন বদরী ছাহাবী এবং হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে 'বায়'আতুর রিয্ওয়ানে' উপস্থিত ১৪০০ শত ছাহাবীর সকলেই ক্ষমাপ্রাপ্ত ও জাহান্নাম হ'তে মুক্ত।[১২৮]

১৫- আহলেহাদীছের অন্যতম আক্বীদা হ'ল রাসূল-পরিবারকে মহব্বত করা ও তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা।[১২৯]

রাসূল-পরিবার বলতে চাচা আবু তালিবের তিন ছেলে আলী, জা'ফর ও আক্বীল এবং চাচা আব্বাস (মৃঃ ৩৩ হিঃ)-এর পরিবারবর্গকে বুঝায়, যাঁরা বনু হাশিমের অন্তর্ভুক্ত এবং যাঁদের জন্য ছাদ্কা খাওয়া হারাম। এঁদের সঙ্গে বনু আবদুল মুত্ত্বালিবের অনেকে যুক্ত আছেন। এঁরা জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেই নবীর নিরাপত্তার জন্য জানমাল নিয়ে সদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরাই প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'খুম্ম কূয়া'র নিকটে একদিন সকল ছাহাবীকে জমা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পরিবারের প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য উম্মতকে বিশেষ তাকীদ দিয়ে গেছেন।[১৩০]

রাসূল-পরিবার বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মানিতা স্ত্রীগণকেও বুঝানো হয়।[১৩১] 'উম্মাহাতুল মুমিনীন' বা উম্মতে মুসলিমার মাতা হিসাবে তাঁরা চিরকাল বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী।[১৩২] জান্নাতেও তাঁরা রাসূলের (ছাঃ) স্ত্রী হয়ে থাকবেন।এঁদের মধ্যে মা খাদীজা ও মা আয়েশা হ'লেন সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারিনী।[১৩৩] আহলে বায়তের প্রতি মর্যাদার ব্যাপারে আহলেহাদীছগণ খারেজী ও শী'আদের বাড়াবাড়ি হ'তে মুক্ত।[১৩৪]

১৬-আহলেহাদীছগণ 'কারামাতে আউলিয়ায়' বিশ্বাস পোষণ করেন।[১৩৫]

তাঁদের মতে এটা আল্লাহর পক্ষ হ'তে তাঁর কোন নেক বান্দার প্রতি কারামত বা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন বৈ কিছু নয়। আল্লাহ কখন কাকে কিভাবে এই মর্যাদা প্রদর্শন করবেন এটা একমাত্র তিনিই জানেন। এতে বান্দার কোন নিজস্ব গৌরব নেই।

পূর্বেকার উম্মতের মধ্যে 'আছহাবে কাহাফ' -এর মহানিদ্রা ও পুনর্জাগরণের ঘটনা, মসজিদের মেহরাবের মধ্যে বিবি মরিয়ামের জন্য জান্নাত হ'তে খাদ্য প্রেরণ, তাঁকে স্বামী ছাড়াই সন্তান প্রদান, মাতৃক্রোড়ে শিশু ঈসা (আঃ)-এর বাক্যালাপ প্রভৃতি কারামাতের প্রমাণ বহন করে।

আমাদের নবী (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় আবু বকর (রাঃ), আছিম বিন ছাবিত, খুবাইব (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবার কারামত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পরে ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবার কারামত প্রমাণিত হয়েছে। ছাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনের পরেও কিয়ামত পর্যন্ত 'কারামতে আউলিয়া' জারি থাকবে।[১৩৬] আহলেহাদীছের আকীদা মতে কারামতের কারণে কেউ উম্মতের 'বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত' ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবেন না। তিনি মানুষের রোগ আরোগ্যকারী, প্রয়োজন পুরণকারী বা ইল্মে গায়েবের অধিকারী হ'তে পারেন না। জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাঁর প্রতি তা'যীমী সিজ্দা করা, নযর-নেয়ায পেশ করা, মৃত্যুর পরে তাঁর অসীলায় প্রার্থনা নিবেদন করা স্পষ্ট শিরক হবে।[১৩৭]

মু'তাযিলাগণ ও কিছু কিছু আশ'আরী বিদ্বান কারামাতে আউলিয়াকে অস্বীকার করে থাকেন।[১৩৮]

১৭- যা স্বপ্নঘোর (أضغاث أحلام) নয় মুমিনের সেই সকল নেক স্বপ্নে (الرؤيا الصالحة) আহলেহাদীছগণ বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন।[১৩৯] নবীদের স্বপ্ন 'অহি' ছিল।[১৪০] বর্তমানে নবুঅত নেই, কিন্তু সুসংবাদ বা সত্যস্বপ্ন বাকী আছে। নেক স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয় এবং স্বপ্নঘোর বা দুঃস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়।[১৪১] আহলেহাদীছের আকীদা মতে কারামাতে আউলিয়ার ন্যায় 'সত্যস্বপ্ন' শরীয়তের কোন দলীল নয়।[১৪২]

১৮- আহলেহাদীছের আকীদা মতে ভাল-মন্দ সকল ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয।[১৪৩]

আল্লাহ বলেন- 'তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।[১৪৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- 'ভাল-মন্দ প্রত্যেক মুসলমানের পিছনে তোমাদের জন্য ছালাত

আদায় করা ওয়াজিব, যদি তিনি কবীরা গোনাহগারও হন।[১৪৫] বিদ্রোহী ফাসেক দল কর্তৃক মদীনা অবরোধের সময় তাদের পিছনে ছালাত আদায়ে অনিচ্ছুক মুমিনদেরকে নিয়মিত জামা'আতে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে খলীফা উছমান গণী (রাঃ) বলেছিলেন- 'মানুষের সমস্ত আমলের মধ্যে ছালাতই সর্বোত্তম। অতএব যখন কেউ এই উত্তম কাজটি করে, তখন তোমরা তাদের অনুগামী হও এবং তাদের মন্দ কার্যসমূহ হ'তে বিরত থাক।'[১৪৬] উমাইয়া সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক মক্কা নগরী অবরোধকালে ছাহাবী আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (মৃঃ ৭৪ হিঃ) কখনও হাজ্জাজের সৈন্যদের পিছনে কখনও আবদুল্লাহ্ বিন যোবায়ের (১-৭৩ হিঃ)-এর সৈন্যদের পিছনে ছালাত আদায় করতেন।[১৪৭]

১৯- আহলেহাদীছের আক্বীদা হ'ল ভাল-মন্দ সবধরনের মুসলিম আমীরের আনুগত্য করা।[১৪৮]

অবশ্য শরীয়ত বিরোধী কোন হুকুম মানতে মুসলিম প্রজাসাধারণ বাধ্য নহেন।[১৪৯] শাসক অপসন্দনীয় হ'লে ছবর করতে হবে।[১৫০] তাঁর হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে দু'আ করতে হবে।[১৫১] ইছলাহের উদ্দেশ্যে তাঁর সম্মুখে হক কথা বলতে হবে।[১৫২] সংশোধনের অযোগ্য বিবেচিত হ'লে কোন কোন আহলেহাদীছ বিদ্বানের মতে তাঁকে পদচ্যুত করতে হবে।[১৫৩] শত্রু কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হ'লে ভাল-মন্দ সব আমীরের অধীনে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে হবে।[১৫৪] প্রকাশ্য কুফরী প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিংবা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করা চলবে না।[১৫৫] নারীকে মুসলমানদের শাসন কর্তৃত্বে বসানো যাবে না। অমনিভাবে যারা নেতৃত্ব চেয়ে নেয় বা লোভ করে কিংবা আকাঙ্খা পোষণ করে তাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়া যাবে না।[১৫৬]

টীকাসমূহ-৪

১. (ক) (جملة ما عليه أهلُ الحديثِ و السنةِ .. الاقرارُ باللهِ و ملائكتِهِ و كتبِهِ و رُسُلِهِ و ما جاء من عند الله تعالى) ইমাম আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আশ'আরী (২৬০-৩২৪ হিঃ), 'মাক্বালাতুল ইসলামিঈন' তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ (প্রেসের নাম ও মুদ্রণের তারিখ বিহীন) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩২০-৩২৫। শিরোনাম -

باب هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث و أهل السنة

(খ) (عن عمر بن الخطاب قال ...قال أخبِرْنِي عن الايمانِ قال أن تؤمِنَ باللهِ و مَلائكتِهِ و

(.. كُتُبِهِ و رُسُلِهِ و اليوم الاخِرِ و تؤمِنَ بالقَدْرِ خَيْرِهِ و شَرِّهِ) মুসলিম, মিশকাতুল মাছাবীহ ২নং হাদীছ।

২. (ক) (قال أهلُ الجماعةِ الايمانُ هى الطاعاتُ كُلُّهَا بالقلبِ و اللسانِ و سائِرِ الجَوَارِحِ غير أنَّ له أصلاً و فرعًا) ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ... ইবনু মানদাহ (৩১০-৩৯৫ হিঃ), 'কিতাবুল ঈমান' তাহক্বীক্বঃ ডঃ আলী বিন মুহাম্মাদ আল-ফাক্বীহী (মদীনাঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ ১৪০১/১৯৮১ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩১।

(খ) (أما أهلُ السنةِ والجماعةِ و إن جعلوا الايمانَ مُؤَلَّفًا من الاركانِ الثلاثة القولُ باللسانِ و الاعتقادُ بالجَنَانِ والعملُ بالجوارحِ إلا أنَّهم يَجْعَلُوْنَ له أصلاً و هو التصديقُ بالقلبِ والإقرارُ باللسانِ و فَرْعًا و هو العَمَلُ) ইবনু মানদাহ 'কিতাবুল ঈমান' ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩১ ও ৩৩৯-টীকা।

৩. ইবনু মানদাহ, 'কিতাবুল ঈমান' ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯।

৪. (ক) আবু ইসমাঈল আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯ হিঃ), 'আক্বীদাতুস সালাফ' তাহকীকঃ বদর আল-বদর (কুয়েতঃ দার সালাফিইয়াহ ১ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪ খৃঃ) পৃঃ ৩-৪ (খ) আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম ইবনু কুতায়বা দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬ হিঃ), 'তাবীলু মুখতালাফিল হাদীছ' (মিসরঃ মাতবা'আ কুর্দিস্তান আল-ইল্মিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৩২৬/১৯০৮ খৃঃ) পৃঃ ২৮০ (গ) আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ), 'মাজমূউল ফাতাওয়া' সংকলনঃ আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসেম নাজদী (কায়রোঃ মাকতাবা নাহযাহ হাদীছাহ ১৪০৪ /১৯৮৪) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৩০, ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৯৫ (ঘ) খলীল হারাস, 'শরহ আকীদা ওয়াসিত্বিয়াহ' মূলঃ ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রিয়াযঃ দারুল ইফতা ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ২১ (ঙ) আবুল ফাত্হ মুহাম্মাদ বিন আবদুল করীম শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হিঃ), 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৪ (চ) নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-১৮৯০ খৃঃ), 'ক্বাৎফুছ ছামার' তাহকীকঃ ডঃ আছেম বিন আবদুল্লাহ কারিয়ূতী (মদীনাঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ৩১-৩২।

৫. (ক) কাতারের শারঈ আদালতের বিচারপতি শায়খ আহমাদ ইবনু হাজার আলে বিতামী, 'তাৎহীরুল জানান' (কুয়েতঃ জামঈয়াতু এহ্ইয়াইত্ তুরাছিল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ ১৩৯৪/১৯৭৩ খৃঃ) পৃঃ ১২-১৩ (খ) আল্লাহ্ পাক যে একক সৃষ্টিকর্তা বা 'খালেক' ও 'রব' এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যথাক্রমে কমবেশী ২৩২টি ও ৯০৮টি আয়াতে আলোচিত হয়েছে। -ফুয়াদ আবদুল বাকী, 'আল-মু'জাম' (বৈরুতঃ দারুল জীল ১৪০৭/১৯৮৭) পৃঃ ২৪১-২৪৪, ২৮৫-২৯৯।

৬. যেমন (ক) সূরায়ে জাছিয়াহ ২৩-২৪ আয়াত - أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ و أَضَلَّهُ اللّٰهُ

عليٰ عِلمٍ و خَتَمَ عليٰ سَمْعِهِ و قَلْبِهِ و جَعَلَ عليٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰه أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ - وقالوا ما هِيَ إلا حَيَاتُنَا الدنيا نَمُوْتُ و نَحْيَا و ما يُهْلِكُنَا إلا الدَّهْرُ و ما لهم بِذٰلِكَ مِنْ عِلمٍ إنْ هُمْ إلا يَظُنُّوْنَ-

(খ) সূরায়ে লুকমান ২৫ আয়াত - وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوات و الارض لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلِ الحَمْدُ لله ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُوْنَ - । (গ) একই মর্ম বর্ণিত হয়েছে সূরায়ে আন'আম ২৬, ইউনুস ৩১, বনী ইসরাঈল ৯৮, মুমিনূন ৮৪-৮৯, ৯১, আনকাবূত ৬১, ৬৩, যুমার ৩৮, যুখরুফ ৯, ৮২ প্রভৃতি আয়াতসমূহে।

৭. আহমাদ ইবনু হাজার, 'তাৎহীরুল জানান' পৃঃ ১৬; ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, 'মাজমূউল ফাতাওয়া' ১ম খণ্ড পৃঃ ২৩।

৮. (ক) আবু ইসমাঈল আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯ হিঃ), আক্বীদাতুস সালাফ পৃঃ ৩-৫ (খ) আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম ইবনু কুতায়বা দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬ হিঃ), তাবীলু মুখতালাফিল হাদীছ পৃঃ ২৮০ (গ) আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ), মাজমূউল ফাতাওয়া ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৩০ (من غير تحريف و لا تعطيل و من غير تكييف ولا تمثيل) ও ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৯৫ (ঘ) 'শারহু আকীদা ওয়াসিত্বিয়াহ' ব্যাখ্যা সংযোজনেঃ শায়খ ইসমাঈল আনছারী (রিয়াযঃ দারুল ইফতা ১৪০৩/ ১৯৮৩) পৃঃ ২১। (ঙ) শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' পৃঃ ১০৪ (চ) নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, ক্বাৎফুছ ছামার পৃঃ ৩১-৩২ এবং ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৬৭-(وهو إجراءُ أيات و أحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية و التشبيه عنها)।

৯. (ক) ইমাম আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ বিনুল হাসান লালকাঈ (মৃঃ ৪১৮ হিঃ), 'শারহু উছূলি ই'তিক্বাদ' তাহকীকঃ ডঃ আহমাদ সা'আদ হামাদান (রিয়াযঃ দার তাইয়েবা, মুদ্রণকাল বিহীন) ২য় খণ্ড পৃঃ ২০৪ (খ) ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১৮৬ (গ) ইমাম আবু বকর আহমাদ বিন হুসাইন বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ), 'আল-ই'তিক্বাদ' সম্পাদনায়ঃ শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ মুরসী (ফায়ছালাবাদ, পাকিস্তানঃ হাদীছ একাডেমী, মুদ্রণকাল বিহীন) পৃঃ ২২ (ঘ) কাযী আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আবু ইয়ালা, 'তাবাক্বাতুল হানাবিলাহ' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, মুদ্রণকাল বিহীন) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৯৯।

১০. ইমাম বায়হাক্বী, আল-ই'তিক্বাদ পৃঃ ২২; ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, ' আল-আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বিয়াহ' শরহ পৃঃ ১০৬।

১১. (ক) শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/ ১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ), 'আল-আক্বীদাতুল হাসানাহ' (আকবরাবাদ, দিল্লীঃ মুফীদে আম প্রেস ১৩০৪ / ১৮৮৪ খৃঃ) পৃঃ ৫ (فليس للعقل حُكمٌ فى حُسْنِ الاشياء و قُبْحِهَا) (খ) ইমাম লালকাঈ, 'শারহু উছূলি ই'তিক্বাদ' ১ম খণ্ড পৃঃ ১৯৩-১৯৬ (গ) মুহাম্মাদ বিন আবু ইয়ালা, 'তাবাক্বাতুল হানাবিলাহ' ২য় খণ্ড পৃঃ ৩০০-৩০১ (ঘ) শহরস্তানী, আল-মিলাল ১ম খণ্ড পৃঃ ৪২।

১২. যেমন মুহাম্মাদ (ছাঃ)- কে বলা হচ্ছে- (و ما كُنْتَ تَدْرِى ما الكتابُ و لا الايمانُ) শূরা ৫২, ইবরাহীম (আঃ) স্বীকার করেছেন- (لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّى لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ) আন'আম ৭৭, এমনিভাবে সকল নবীকেই অহির মাধ্যমে 'তাওহীদ' শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে - (وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ إلا نُوْحِيْ إليه أنه لَآ إِلٰهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ) আম্বিয়া ২৫ ইত্যাদি।

১৩. যেমন আমাদের নবীকে শেখানো হচ্ছে- (فاعْلَمْ أَنهٗ لَآ إِلٰهَ إِلا اللّٰهُ) মুহাম্মাদ ১৯।

১৪. যেমন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলা হচ্ছে - (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لا تَكُوْنَنَّ مِنَ المشركِينَ) আন'আম ১৪; (قُلْ هٰذه سبيلى أَدْعُوا إِلَى اللهِ على بَصِيْرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ وَ سُبْحَانَ اللهِ وَ مَا أَنَا مِنَ المشركِيْنَ) ইউসুফ ১০৮; (إِتَّبِعْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ، لَآ إِلٰهَ إِلا هُوَ وَ أَعْرِضْ عَنِ المشركِيْنَ) -আন'আম ১০৬।

১৫. (ক) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, 'মাজমূউল ফাতাওয়া' ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৬৬ (খ) ঐ, فتوى الحموية الكبرى فى الايمان بصفات الله على ظاهر معناها (লাহোরঃ মাকতাবা সালাফিইয়াহ, শীশমহল রোড, ১ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ১৩ (গ) ইমাম লালকাঈ, উছূলু ই'তিক্বাদ ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৮৭ টীকা-২ (ঘ) শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৬ টীকা-১ (ঙ) নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ৩১ টীকা-২।

১৬. শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৫-৯১।

১৭. প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৩-৪৬।

১৮. (أشهد أن الذى إسمه (الله) لا إله إلا هو و أشهد أن الذى إسمه (محمد) رسول الله ইমাম লালকাঈ, উছূলু ই'তিক্বাদ ২য় খণ্ড পৃঃ ২০৭।

১৯. শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬-৮৫।

২০. প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৬, ৯২।

২১. ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী লিখিত জীবনের সর্বশেষ গ্রন্থ 'আল-ইবানাহ আন উছূলিদ দিয়ানাহ' ভূমিকা, শায়খ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আনছারী ও হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) প্রমুখাৎ উল্লেখিত। (মদীনাঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ১৪০৭/১৯৮৭ খৃঃ) পৃঃ ১০ (খ) শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৫।

২২. ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, 'আল-ইবানাহ' ভূমিকা, আবু বকর বিন ফাওরাক প্রমুখাৎ বর্ণিত। পৃঃ ৭-১১।

২৩. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, 'মাজমূউল ফাতাওয়া' ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৯৬ ; শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড ৯৩, ১০৫, ১০৭-১০৮।

২৪. (ক) ইমাম আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৬ (খ)

শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ৯২ (গ) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, 'মাজমূউল ফাতাওয়া' ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৯৬ (ঘ) নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, ক্বাৎফুছ ছামার পৃঃ ৩১-৩২।

২৫. হাফেয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ), 'তাফসীরুল কুরআন' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ২য় সংস্করণ ১৪০৮/১৯৮৮ খৃঃ) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৭১ (ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (২২৪-৩১০ হিঃ) প্রমুখাৎ সূরায়ে নাজম ১৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত- (أَفَرَأَيْتُمُ اللّاتَ و الْعُزّٰى ، و مَنٰوةَ الثّالِثَةَ الأُخْرٰى ، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الانثٰى ، تِلْكَ إذاً .قِسْمَةٌ ضِيزٰى ، إنْ هِيَ إلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَ أَبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ، (نجم ١٩-٢٣)

২৬. মাওলানা আবদুস সাত্তার, তাফসীর সূরায়ে ফাতিহা (উর্দূ) 'তাফসীরে সাত্তারী' (করাচীঃ মাকতাবা আইয়ূবিয়াহ, বান্স রোড, ১৯৬৫ খৃঃ) পৃঃ ২৭২।

২৭. (ক) মাওলানা আবদুস সাত্তার (উর্দূ অনুবাদ) 'কুরআন মজীদ বা দো তরজমা' টীকাঃ মাওলানা আবদুল কাহ্হার, সূরায়ে নাজম ২২ নং আয়াতের টীকা-১ (করাচীঃ দারুস সালাম, বান্স রোড, ১৯৮২ খৃঃ) পৃঃ ৭৪২ (খ) শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী 'তাফহীমাতে ইলাহিয়ার' মধ্যে বলেন- 'আজমীরের পূজারী এবং লাত ও উয্যার পূজারী দু'জনই সমান।' -তাফসীরে সাত্তারী (উর্দূ) সূরায়ে ফাতিহা পৃঃ ২৭৩।

২৮.(ক) আল্লাহ বলেন, (اَللّٰهُ لآ إِلٰهَ إلا هُوَ لَهُ الاسْمَاءُ الحُسْنٰى ত্বা-হা ৮।

(খ) مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إلا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَ ابَاؤُكُمْ مَا انْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ইউসুফ ৪০ (গ) এতদ্ব্যতীত আ'রাফ ৭১, ১৮০, বনী ইসরাঈল ১১০, নাজম ২৩, হাশর ২৪। (ঘ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি উহা (সঠিক উপলব্ধির সাথে) গণনা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। - বুখারী, মুসলিম- عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) إنَّ لِلّهِ تعالى تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ إِسْمًا إلا واحداً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجنَّةَ – متفق عليه ، مشكوة ، بيروت، باب أسماء الله تعالي ، মুত্তা, মিশকাত হা-২২৮৭ তাহক্বীক্বঃ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়, ২য় খণ্ড পৃঃ ৭০৭; মিশকাত (জামে মসজিদ, দিল্লীঃ আছাহ্হুল মাতাবে প্রেস ১৩৫০/১৯৩২ খৃঃ) পৃঃ ১৯৯।

২৯. (ক) ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৩-৫ (খ) ইবনু কুতায়বাহ, 'তাবীলু মুখতালাফ' পৃঃ ২৮০ (গ) ইবনু তায়মিয়াহ, 'মাজমূউল ফাতাওয়া' ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৩০ (ঘ) ঐ, 'আকীদা ওয়াসিত্বিয়াহ'- শরহ পৃঃ ২১ (ঙ) শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৪ (চ) ছিদ্দীক হাসান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ৩১-৩২ প্রভৃতি-

উদাহরণ স্বরূপ (১) আল্লাহর হাত (قال يا إبليسُ ما منعَكَ أنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ)

ছোয়াদ ৭৫, (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ) -মায়েদাহ ৬৪; এতদ্ব্যতীত আলে ইমরান ২৬, ৭৩, ফাত্‌হ ১০, হাদীদ ২৯, মুমিনূন ৮৮, ইয়াসীন ৮৩, মুল্‌ক ১, যুমার ৬৭ **(২) আল্লাহ্‌র চেহারা** (وَ يَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذو الجَلالِ و الإكرام) -রহমান ২৭; এতদ্ব্যতীত বাক্বারাহ ১১৫, ২৭২, রূম ৩৮, ৩৯, দাহ্‌র ৯, লায়ল ২০ **(৩) আল্লাহর পা** (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فلا يَسْتَطِيْعُوْنَ) -ক্বলম ৪২

(৪) আল্লাহ্‌র কথা বলা (وَ كَلَّمَ اللهُ موسٰي تَكْلِيْمًا) নিসা ১৬৪; এতদ্ব্যতীত বাক্বারাহ ১৭৪, ২৫৩, আ'রাফ ১৪৩, ১৪৪, ইয়াসীন ৬৫, শূরা ৫১ **(৫) আরশে সমাসীন হওয়া**) (الرحمٰنُ علىٰ العَرْشِ اسْتَوٰى) -ত্বা-হা ৫; এতদ্ব্যতীত আ'রাফ ৫৪, ইউনুস ৩, রা'আদ ২, ফুরক্বান ৫৯, সাজদাহ ৪, হাদীদ ৪ **(৬) নিম্ন আকাশে অবতরণ করা** (و جاء رَبُّكَ والمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) -ফজর ২২; এতদ্ব্যতীত আন'আম ১৫৮, বাক্বারাহ ২১০ প্রভৃতি; যেমন রাসূলুলাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يَنْزِلُ رَبُّنَا تبارك و تعالى كُلَّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا حين يَبْقى ثُلُثُ الليل الأخِرُ فيقولُ مَنْ يَدْعُوْنِى فَاسْتَجِيْبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَاغْفِرَ لَهُ -

অর্থঃ- প্রতিরাতের তৃতীয় প্রহরে আল্লাহ নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন ও দুনিয়া বাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেন- 'কে আছ আমাকে আহবানকারী আমি তার ডাকে সাড়া দেব, কে আছ আমার নিকটে প্রার্থনাকারী আমি তার প্রার্থনা কবুল করব, কে আছ আমার নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী আমি তাকে ক্ষমা করে দেব'। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (বৈরুত ছাপা ১৪০৫/১৯৮৫) হা- ১২২৩ 'ছালাত' অধ্যায় 'কিয়ামুল লায়ল' শিরোনাম, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৮৬।

উপরোক্ত বিষয়গুলিতে মু'তাযিলাগণ 'আল্লাহ্‌র হাত' অর্থ করেছেন 'কুদরত ও নে'মত, 'আল্লাহ্‌র চেহারা' অর্থ কেউ করেছেন 'আল্লাহ্‌র সত্তা' কেউ করেছেন 'কিবলা', কেউ করেছেন 'ছওয়াব ও বদলা' কেউ বলেছেন এটি 'অতিরিক্ত'। হাফেয ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) আল্লাহর হাত ও চেহারার এসব গৌণ ও রূপক অর্থের প্রতিবাদে যথাক্রমে ২০টি ও ২৬টি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। -ইবনুল কাইয়িম, 'মুখ্‌তাছার ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ' সংক্ষেপায়নঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিনুল মূছেলী (মাকতাবা রিয়ায আল-হাদীছাহ, তারিখ বিহীন) ২য় খণ্ড পৃঃ ১৫৩-১৭৪ ও ১৭৪-১৮৮।

'আরশে অবস্থান' সম্পর্কিত সর্বমোট সাতটি আয়াতের অর্থ মু'আত্তিলাগণের কেউ করেছেন 'মালিক হওয়া', কেউ করেছেন 'আরশ সৃষ্টির ইচ্ছা' করা ইত্যাদি। এইভাবে এঁরা ২৫ প্রকারের সম্ভাব্য অর্থ ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। হাফেয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) এসবের প্রতিবাদে ৪২টি যুক্তি পেশ করেছেন। -ইবনুল কাইয়িম, প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৬-১৫২; হাফেয শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিঃ) উক্ত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় ৯৬টি হাদীছ, ২০টি আছার ও

আহলেসুন্নাত পণ্ডিতগণের ১৬৮টি বক্তব্য সংকলন করেছেন। -যাহাবী, 'মুখ্‌তাছারুল 'উলু' (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী ১ম সংস্করণ ১৪০১/১৯৮১)।

এ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম মালিক বিন আনাস (৯৩ -১৭৯ হিঃ) বলেছিলেন, (الإستواء معلوم والكيف مجهول و الإيمان به واجب والسوال عنه بدعة)

অর্থঃ 'সমাসীন' শব্দের অর্থ সুবিদিত, কিভাবে সেটা অবিদিত, এর উপরে ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা বিদ'আত।' -ইমাম লালকাঈ, 'উছূলু ই'তিকাদ' ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৮৭ টীকা-২; শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৩।

অমনিভাবে 'আল্লাহ্‌র নিম্ন আকাশে অবতরণ' সম্পর্কে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) প্রমুখাৎ উপরে বর্ণিত হাদীছ সহ হাফেয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) মোট ৩০ জন রাবী ছাহাবীর নাম ও তাঁদের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। -ইবনুল কাইয়িম, প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩০-২৫০।

খ্যাতনামা বিদ্বান আবদুল্লাহ বিন মুবারক (১১৮-১৮১) -কে মধ্য শা'বানের রাত্রিতে আল্লাহ্‌র অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি ধমক দিয়ে বলেন- 'রে যঈফ। তিনি প্রতি রাতেই অবতরণ করে থাকেন। তখন লোকটি বলল, হে আবু আবদুর রহমান! অবতরণের ফলে কি আরশ খালি হয়ে যায় না? জওয়াবে ইবনুল মুবারক (রহঃ) বললেন- তিনি যেভাবে ইচ্ছা অবতরণ করেন (يَنْزِلُ كَيْفَ يَشَــآءُ) -ইমাম আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবুনী (৩৭২-৪৪৯ হিঃ), 'আকীদাতুস সালাফ' পৃঃ ২৯।

৩০. (وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ) ইখলাছ ৪ । (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيىءٌ و هو السميعُ العليمُ) - শূরা ১১ । (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ) - ছাফ্‌ফাত ১৮০।

৩১. (العبادة تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له) (العبا دة هى إسمٌ جامعٌ لكل ما يُحِبُّهُ اللهُ و يَرْضَاهُ من الاقوا ل و الاعمال البا طنة و الظاهرة) ইবনু তায়মিয়াহ, 'আল-উবুদিয়াহ' টীকা সংযোজনঃ মুহাম্মাদ মুনীর দামেস্কী (রিয়াযঃ দারুল ইফতা, ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ১২, ৮।

৩২. (الإلٰهُ هو الذى يُولِّهُ فَيُعْبَدُ محبةً و إنابةً و إجلالا و إكرا مًا) ইবনু তায়মিয়াহ, 'মাজমূউল ফাতাওয়া' ১ম খণ্ড পৃঃ ২২।

৩৩. (ক) আবদুর রহমান আবদুল খালেক, 'আল-উছূলুল ইল্‌মিয়াহ লিদ-দাওয়াতিস্ সালাফিইয়াহ' (কুয়েতঃ দার সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৯৮২) পৃঃ ২৯; ঐ বঙ্গানুবাদঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি' ১ম সংস্করণ (ঢাকা, পাহলোয়ান প্রেস ১৪০৫/১৯৮৫) পৃঃ ২০ (খ) হাফেয ইবনুল কাইয়িম, 'ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন'। সম্পাদনা ও টীকা সংযোজনঃ ত্বা-হা আবদুর রঊফ সা'আদ (বৈরুতঃ দারুল জীল ১৯৭৩) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৭২-৩৭৭।

৩৪. (ক) (قال العلامة الحافظ ابن القيم: الطاغوتُ كل ما تجاوَزَ بِهِ العَبْدُ حَدَّهُ من معبودٍ او

متبوعٍ او مُطَاعٍ ، فطاغوتُ كلِ قومٍ مَنْ يَتَحَاكَمُوْنَ إليه غيرَ اللّٰهِ ورسولِهٖ او يعبدونَهٗ من دون اللّٰهِ او يَتَّبِعُوْنَهٗ على غير بصيرةٍ من اللّٰهِ او يُطِيْعُوْنَهٗ فيما لا يعلمون أنه طاعةُ اللّٰهِ আহমাদ ইবনু হাজার, 'তাৎহীরুল জানান ওয়াল আরকান মিন দারানিশ শিরকি ওয়াল কুফরান' পৃঃ ১৯, টীকা-১ (খ) হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) 'তাগূত'- এর ব্যাখ্যায় বলেন (المراد بالطا غوت أن يَتَحاكَمَ الرجلُ الى ما سوى الكتا ب والسنة من الباطل) -(মর্মার্থ)- والطاغوت من الطغيان اى التجاوز عن الحد المقبول (المعجم الوسيط) ইবনু কাছীর, 'তাফসীরুল কুরআন' নিসা ৬০ আয়াতের তাফসীর, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৩১

(গ) মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (১১১৫ - ১২০৬ / ১৭০৩ -১৭৯২ খৃঃ) বলেন, (الطاغوت عامٌ فى كل ما عُبِدَ من دون الله) ঐ, 'কিতাবুত তাওহীদ' সম্পাদনায়ঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (বৈরুতঃ আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬) পৃঃ ৬।

৩৫. (ولقد بَعَثْنَا فى كل أُمَّةٍ رسولا أنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ واجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ) নাহ্ল ৩৬।

৩৬. (إنَّ عبادة الله لا تحصُلُ الا بالكفر بالطاغوت) মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব, 'কিতাবুত তাওহীদ' পৃঃ ৬।

৩৭. (وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ و الإنْسَ إلا لِيَعْبُدُوْنَ) যারিয়াত ৫৬।

৩৮. (ক) আবদুর রহমান আবদুল খালেক, 'আল-উছূলুল ইল্মিয়াহ' (কুয়েত) পৃঃ ২৯; ঐ বঙ্গানুবাদঃ 'সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি' পৃঃ ২০ (খ) হাফেয ইব্নুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৭২-৩৭৭।

৩৯. আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছ - মিশকাতুল মাছাবীহ (বৈরুত ছাপা) 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, হাদীছ সংখ্যা ৫৭০১, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫৮৯।

৪০. (لا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ) তাহরীম ৬।

৪১. (قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالحقِّ لِيُثَبِّتَ الذين اٰمنوا...) নাহ্ল ১০২।

৪২. (ক) (و رُسُلاً قد قَصَصْنَاهُمْ عليك مِنْ قَبْلُ و رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عليك) নিসা ১৬৪ ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআন (বৈরুত ছাপা) ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৯৯; কুরআনে বর্ণিত ২৫জন নবী হলেনঃ আদম, ইদরীস, নূহ, হূদ, ছালেহ, ইবরাহীম, লূত্ব, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, ইউসুফ,আইয়ূব, শু'আইব, মূসা, হারূণ, আল-ইয়াসা (ইউশা'), ইউনুস, দাঊদ, সুলায়মান, ইল্ইয়াস, যুল-কিফল (অনেকের মতে), যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা, মুহাম্মাদ (ছাঃ)। -ঐ (খ) আহমাদ, মিশকাত (বৈরুত ছাপা), 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, হা/৫৭৩৭, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫৯৯ (আলবানী হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন)।

৪৩. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-ওয়াযীরুল ইয়ামানী (মৃঃ ৮৪০ হিঃ), 'আর-রওযুল বাসিম' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ১৩৯৯/১৯৭৯ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ

১১৮-১১৯।

৪৪. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, আকীদা ওয়াসিত্বিয়াহ-শরহ, সম্পাদনায়ঃ ইসমাঈল আনছারী (রিয়াযঃ দারুল ইফতা ১৪০৩/১৯৮৩ খৃঃ) পৃঃ ১৯।

৪৫. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত (বৈরুত ছাপা) 'ফাযায়েল' অধ্যায়, হা-৫৭৪৫,৪৬, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৬০১।

৪৬. (أُرْسِلْتُ إلى الخَلْقِ كافَّةً) মুসলিম, মিশকাত (বৈরুত ছাপা), হা-৫৭৪৮, ৩য় খন্ড পৃঃ ১৬০১; (كان النبيُّ يُبْعَثُ إلى قومِه خاصَّةً و بُعِثْتُ إلى الناسِ عامَّةً) মুত্তাফাক আলাইহ, ঐ (فأرسَلَهُ إلى الجنِّ و الإنسِ) দারেমী, ঐ, হা-৫৭৭৩, ঐ ৩য় খন্ড পৃঃ ১৬০৮।

৪৭. শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ২১০-২১২; ইবনু তায়মিয়াহ, 'মাজমূউল ফাতাওয়া' ৭ম খণ্ড পৃঃ ৩১২-৩১৩।

৪৮. সাইয়িদ সাবিক্ব, আল-আক্বাইদুল ইসলামিয়াহ (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র,২য় সংস্করণ ১৪০২/১৯৮২ খৃঃ) পৃঃ ১৬৩; আলে ইমরান ২-৪।

৪৯. ইবনু তায়মিয়াহ, আক্বীদা ওয়াসিত্বিয়াহ- শরহ পৃঃ ১৯।

৫০. আল-হা-ক্ক্বাহ ১৯-৩২, ইনশিক্বাক্ব ৭-১০।

৫১. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত, (বৈরুত ছাপা) 'তাকদীরে বিশ্বাস' অধ্যায়, হা- ৮২, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩১।

৫২. মুসলিম, মিশকাত (ঐ), হা-৭৯, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩০।

৫৩. মুসলিম, মিশকাত (ঐ), হা- ৮৪, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩১।

৫৪. (ক) (قُلْ لَنْ يُصِيْبَنَا إلا ما كَتَبَ اللّهُ لَنَا هو مَوليٰنا و على اللّهِ فَلْيَتَوكَّلِ المؤمنونَ) তাওবাহ ৫১ (খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) يدخُلُ الجنةَ من أمتي سبعونَ ألفًا بغير حسابٍ هُمُ الذين لا يَسْتَرقون ولا يَتطيَّرونَ و علٰي ربهم يتوكلون- মুত্তা, মিশকাত 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অধ্যায়, হা-৫২৯৫, ৩য় খন্ড পৃঃ ১৪৫৭।

৫৫. (عن صهيب قال قال رسول الله (ص) عَجَبًا لأمرِ المؤمنِ إنَّ أمرَه كُلَّهُ لهُ خَيْرٌ و ليس ذلك لأحد إلا للمؤمنِ إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فكان خيراً لهُ و إنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فكان خيراً لهُ-) মুসলিম, মিশকাত (ঐ), হা-৫২৯৭, ঐ ঐ।

৫৬. শহরস্তানী, আল-মিলাল ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৫।

৫৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৫।

৫৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড পৃঃ ৮০, ৩৩৩; ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১০৮; একে 'তাওহীদ ফিল ইত্তেবা' (التوحيد فى الإتباع) বা 'অনুসরণে একত্ব' বলা যেতে পারে।

৫৯. فرسالته عمومان .. عموم بالنسبة إلي المرسل إليهم و عموم بالنسبة إلي ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين و فروعه .. و لا يتم الإيمان به إلا بأثبات عموم رسالته في هذا و هذا .. فتقسيم الدين إلي شريعة و سياسة و إلي عقل و نقل كل ذلك تقسيم باطل .. لا حاجة للناس بعد رسول الله (ص) و دينه .. ولم يحوجهم الله إلي أحد سواه .. ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلي رسول اخر بعده- হাফেয ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৭৫-৩৭৬।

৬০. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩৪।

৬১. (ক) (حرامٌ علي أحد أن يقولَ بالإستحسانِ إذا خالفَ الإستحسانُ الخَبَرَ) ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ), 'আর-রিসালাহ' তাহকীকঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ, মুদ্রণকাল বিহীন 'ইস্‌তিহসান' অধ্যায়) পৃঃ ৫০৪; (খ) (قال الشافعي : مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ) সায়ফুদ্দীন আলী বিন আবী আলী বিন মুহাম্মাদ আমেদী (৫৫১-৬৩১ হিঃ), 'আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম' (মুদ্রণকাল ১৩৮৭/১৯৬৮ খৃঃ, প্রেসের নাম নেই) ৩য় খন্ড পৃঃ ১৩৬ (গ) একইরূপ উদ্ধৃতি পেশ করেছেন মুহাম্মাদ মুঈন বিন মুহাম্মাদ আমীন সিন্ধী, 'দিরাসাতুল লাবীব' (লাহোরঃ বায়তুস সালতানাহ ১২৮৪/১৮৬৮ খৃঃ) পৃঃ ২৯১।

৬২. হাফেয তাকিউদ্দীন উছমান বিন ছালাহুদ্দীন আবদুর রহমান ওরফে 'ইবনুছ ছালাহ' (৫৭৭-৬৪৩ হিঃ), 'মুকাদ্দামা' (মিসরঃ সা'আদাহ প্রেস ১৩২৬/১৯০৮ খৃঃ) পৃঃ ৩৯। তারগীব ও তারহীব ইত্যাদি বিষয়ে 'যঈফ' হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (১৬৪ ২৪১ হিঃ) ও ইমাম আবদুর রহমান বিন মাহদী (১৩৫-১৯৮ হিঃ) যে অনুমতি দিয়েছেন এবং ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) যার ব্যাখ্যায় সবিস্তার আলোচনা করেছেন (ফাতাওয়া, ১৮শ খণ্ড পৃঃ ৬৫-৬৮) ও তার ভিত্তিতে 'আহলেহাদীছ গণ প্রশাখাগত বিষয়ে ও ফযীলত সংক্রান্ত বিষয়ে যঈফ হাদীছ গ্রহণ করেন' বলে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন (ফাতাওয়া ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৫), তার জওয়াবে ভাষ্যকার আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির বলেন যে, এর দ্বারা ইমাম আহমাদ (রহঃ) 'হাসান' পর্যায়ের হাদীছ বুঝাতে চেয়েছেন, যা সকল পন্ডিতের নিকটে গ্রহণযোগ্য। তাঁদের সময়ে হাদীছ কেবল ছহীহ ও যঈফ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। - আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, 'আল-বা'ইছুল হাছীছ' (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ১ম সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ৮৭; ইমাম আহমাদের সময়ে 'হাসান' পর্যায়ের হাদীছকে 'যঈফ' গণ্য করা হ'ত। -হাফেয ইবনুল কাইয়িম, 'ই'লাম' ১ম খন্ড পৃঃ ৭৭; ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা তিরমিযী (২০৯-২৯৭ হিঃ) প্রথম 'হাসান' থেকে 'যঈফ' হাদীছকে পৃথক করেন। -আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, 'আল-বা'ইছুল হাছীছ' পৃঃ ৩৬।

৬৩. ইবনুল কাইয়িম, 'ই'লাম' ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৬।

৬৪. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৮০।

৬৫. ইবনুল কাইয়িম, মুখতাছার ছাওয়াইকুল মুরসালাহ ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৭১-৩৭২, 'খবরে ওয়াহিদ' শরীয়তের দলীল হওয়ার পক্ষে হাফেয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) ২১টি ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ৩৪টি দলীল পেশ করেছেন। -মুখতাছার ছাওয়াইক্ব ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৯৪-৪০৫; শাফেঈ, আর-রিসালাহ পৃঃ ৪০১-৪৭১।

৬৬.(ক) নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, ক্বাৎফুছ ছামার পৃঃ ৮৫ (খ) ইমাম ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ পৃঃ ৬৭-৭১ (গ) ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিঈন পৃঃ ৩২২ (ঘ) ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হযম আন্দালুসী (মৃ. ৪৫৬ হিঃ), 'কিতাবুল ফিছাল' শহরস্তানীর 'মিলাল'- সহ (বৈরুতঃ মাকতাবা খাইয়াত্ব ১৩২১/১৯০৩ খৃঃ) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৮৮ প্রভৃতি।

৬৭. إنما المؤمنونَ الذين إذا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قلوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عليهم اياتُهُ زادَتْهُمْ إيمانًا و علي رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُوْنَ-اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ- اولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ- আনফাল ২-৪, এতদ্ব্যতীত বাক্বারাহ ১০, আলে ইমরান ৯০, ১৭৩, ১৭৮, নিসা ১৩৭, তাওবাহ ১২৪, কাহাফ ১৩, আহযাব ২২, ফাত্বির ১০, মুহাম্মাদ ১৭, ফাত্হ ৪, মুদ্দাছ্ছির ৩১ প্রভৃতি।

৬৮. (عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الايمانُ بِضْعٌ و سبعون شُعْبَةً ، فأفضَلُهَا قولُ لا إله إلا الله و أدناها إماطَةُ الاذى عن الطريقِ والحياءُ شُعْبَةٌ من الايمانِ – متفق عليه) মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত (বৈরুত ছাপা) হা- ৫, ১ম খণ্ড পৃঃ ১০।

৬৯. ইমাম মুহিউস্ সুন্নাহ্ বাগাভী (৪৩৬-৫১৬), 'শারহুস সুন্নাহ' তাহকীকঃ শু'আইব আরনাঊত্ব ও মুহাম্মাদ যুহাইর শাভিশ (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৫।

৭০. (ক) (عن عمر قال لو وُزِنَ إيمانُ أبى بَكْرٍ بإيمانِ أهلِ الارض لَرَجَحَ بِه) ইমাম আবদুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (২১৩-২৯০ হিঃ), 'কিতাবুস সুন্নাহ' তাহকীকঃ ডঃ মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আল-ক্বাহত্বানী (দাম্মাম-সঊদী আরবঃ দার ইবনুল ক্বাইয়িম, ১ম সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬) হাদীছ সংখ্যা ৮২১, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৭৮ (খ) ইমাম ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ পৃঃ ৭০-৭১, সনদ ছহীহ।

৭১. ইমাম বাগাভী, 'শারহুস সুন্নাহ' ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৮-৩৯।

৭২. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ৬২, টীকা-১০০।

৭৩. (ক) ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ' পৃঃ ৭১, ৮২-৮৩; ইমাম বায়হাক্বী, 'আল-ই'তিক্বাদ' পৃঃ ৮৮; ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, 'মাজমূউল ফাতাওয়া' ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৮।

৭৪. إِنَّ اللّٰهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ - নিসা ৪৮, ১১৬ ; إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوٰهُ النَّارُ، وَ مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ- মায়েদাহ-৭২; এতদ্ব্যতীত যুমার ৩৯,আহক্বাফ ৪৬, ফাৎহ ১৪ প্রভৃতি।

৭৫. ইবনু তায়মিয়াহ্র মতে তাকে 'দোষযুক্ত মুমিন' (مؤمن ناقص) , 'গুনাহগার মুমিন' (مؤمن عاصي) অথবা 'ঈমানের কারণে মুমিন এবং কবীরা গোনাহের কারণে ফাসিক' (مؤمن بايمانه و فاسق بكبيرته) বলা যাবে। -ইবনু তায়মিয়াহ, 'মাজমূউল ফাতাওয়া' ৭ম খণ্ড পৃঃ ৬৭৩।

৭৬. শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ১১৪।

৭৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৫।

৭৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৯ ; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ক্বাৎফুছ ছামার পৃঃ ৬২, টীকা-১০০।

৭৯. ইমাম লালকাঈ, 'উছূলু ই'তিকাদ' ৩য় খণ্ড পৃঃ ৫৩৪ প্রভৃতি।

৮০. (واللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُوْنَ) ছাফ্ফাত ৯৬ ; (و فى السماءِ رِزْقُكُمْ وما تُوْعَدُوْنَ)- যারিয়াত ২২।

৮১. (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُوْرًا) দাহ্র ৩।

৮২. (فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ لا تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) ইয়াসীন ৫৪।

৮৩. শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৭।

৮৪. ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' পৃঃ৭; শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৬; নওয়াব ছিদ্দীক হাসান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ৭১-৮০ ইত্যাদি।

৮৫. প্রাগুক্ত টীকা সমূহ।

৮৬. সূরায়ে বুরূজ ২১-২২, তূর ২-৩।

৮৭. قُلْ مَنْ كان عَدُوًّا لِجبريلَ فانّه نَزَّلَهُ علىٰ قلبِكَ باذنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ و هُدًى و بُشْرٰى لِلْمؤمنِيْنَ- -বাক্বারাহ ৯৭, নাহ্ল ১০২, শূ'আরা ১৯২-১৯৫।

৮৮. (يا أيها النبيُّ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إليكَ مِنْ ربك و إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) মায়েদাহ ৬৭।

৮৯. তিরমিযী, মিশকাত (বৈরুত ছাপা) হা- ২১৩৭, সনদ ছহীহ-আলবানী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৫৯।

৯০. তিরমিযী, ইবনুমাজাহ, গৃহীতঃ ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' সনদ ছহীহ, পৃঃ ৮।

৯১. ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৯- ১৪; নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ৭৩-৭৪।

৯২. প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৩-১৩৭।

৯৩. আবু দাঊদ, মিশকাত (বৈরুত ছাপা), 'কিয়ামতের আলামত' অধ্যায়, হা- ৫৪৫৩ ও ৫৪৫৪, সনদ যথাক্রমে 'জাইয়িদ' ও 'হাসান'- আলবানী, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫০১; বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ আবদুল মুহসিন বিন হামাদ আল-আব্বাদ প্রণীত 'মাহদী' সংক্রান্ত পুস্তক الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة فى المهدى و يليه عقيدة أهل السنة والأثر فى المهدى المنتظر (মদীনাঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০২/১৯৮২)।

৯৪. তিরমিযী, মিশকাত, হা- ৫৪৫৯, সনদ ছহীহ-আলবানী, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫০৩।

৯৫. মুসলিম, মিশকাত, হা- ৫৪৬৪, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫০৫।

৯৬. মিশকাত (বৈরুত ছাপা), 'কিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫৩০-১৫৪৫।

৯৭. ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৬৬; নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ১৩৮; বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ-মিশকাত, হা- ৫৬৯৬-৯৭, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫৮৭।

৯৮. মুত্তাফাক আলাইহ-মিশকাত, হা- ১২৭; আহমাদ, আবুদাউদ- ঐ, হা- ১৩১; সনদ ছহীহ-আলবানী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৫, ৪৭-৪৮।

৯৯. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, ক্বাৎফুছ ছামার পৃঃ ১৩৮; ইমাম ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ পৃঃ ৬৬; ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, 'মাজমূউল ফাতাওয়া' ২য় খণ্ড পৃঃ ৪২৮।

১০০. ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৬৫ প্রভৃতি।

১০১. মুত্তাফাক আলাইহ- মিশকাত (বৈরুত ছাপা), হা- ৫৬৫৫, 'আল্লাহ দর্শন' বিষয়ক অধ্যায় ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫৭৪।

১০২. (ক) নওয়াব ছিদ্দীক হাসান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ১৩৯ (খ) (لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الأبْصَارَ و هو اللطيفُ الخبيرُ-) -আ'নআম ১০৪ (গ) মূসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর নূর দেখেছিলেন (و لَمَّا جاء موسٰي لِميقاتِنَا و كَلَّمَه رَبُّهُ ، قال رَبِّ أَرِني أَنظرْ إليكَ ، قال لَنْ تَرَاني ، فَلَمَّا تَجَلّي رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَه دكًا و خَرَّ موسٰي صَعِقًا، فلما أفاقَ قال سُبْحَانَكَ تُبْتُ إليكَ و أَنَا أَوَّلُ المؤمنينَ) -আ'রাফ ১৪৩; (عن أبى ذر قال سألتُ رسولَ اللّه صلى الله عليه و سلم هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ ؟ قال نُوْرٌ أَنَّى أَرَاهُ ؟ وعن ابن عباس .... قال : رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ) মুসলিম, মিশকাত হা- ৫৬৫৯ ও ৫৬৬০ ৩য় খন্ড পৃঃ ১৫৭৫।

১০৩. (فما أعْطُوْا شيئا أَحَبَّ إليهم من النظر إلى ربهم ...) মুসলিম, মিশকাত হা - ৫৬৫৬, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫৭৪; (وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ، إلي رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) ক্বিয়ামাহ ২২, ২৩।

১০৪. (كَلَّا إنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحجوبونَ ، ثم إنهم لَصَالوا الجحيمَ ، ثم يُقَالُ هذا الذى كُنْتُمْ به تُكَذِّبُوْنَ) মুত্বাফ্‌ফেফীন ১৫-১৭। কিয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করার হাদীছসমূহ 'মুতাওয়াতির'। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাহ্‌মিয়া,

মু'তাযিলা, খারেজী প্রভৃতিদের ন্যায় শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) এখানে দৃশ্যকে দৃশ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন - (و هو مرئى للمؤمنين يوم القيامة)শাহ অলিউল্লাহ, 'আল-আক্বীদাতুল হাসানাহ' পৃঃ ৪; নওয়াব ছাহেব কোন মন্তব্য ছাড়াই সেটা নিজ কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন- 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ১৪০-১৪১; অথচ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী এখানে আল্লাহ দর্শনকে পূর্ণিমার চাঁদ দর্শনের স্পষ্টতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে- আল্লাহ্‌কে চাঁদের দৃশ্যের সাথে নয় (وهو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئى بالمرئى) 'ক্বাৎফুছ ছামার' টীকা সংখ্যা- ২৮৫ (*); ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৬৬।

১০৫. ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, 'আল-ইবানাহ' পৃঃ ২১২; ইমাম ছাবূনী, 'আকীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৬১ ইত্যাদি।

১০৬. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ৯৫-৯৬ ইত্যাদি।

১০৭. ইমাম বায়হাক্বী, 'আল-ই'তিক্বাদ' পৃঃ ৯৬ ইত্যাদি। (عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى - তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনুমাজাহ, وعن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وهى لِمَنْ مات لا يُشْرِكُ بالله شيئا) তিরমিযী, ইবনুমাজাহ; উভয় হাদীছ ছহীহ- আলবানী, মিশকাত (বৈরুত ছাপা), 'কিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, হা-৫৫৯৮ ও ৫৬০০, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫৫৮।

১০৮. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, 'আক্বীদা ওয়াসিত্বিয়াহ'-শরহ পৃঃ ১৫০।

১০৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৯ ইত্যাদি।

১১০. (مَنْ ذا الذى يَشْفَعُ عندهٗ إلا بإذنه) বাক্বারাহ ২৫৫, আম্বিয়া ২৮, ত্বাহা ১০৯।

১১১. (إتَّخَذُوْا أحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰه) তাওবাহ ৩১।

১১২. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, 'মাজমূউল ফাতাওয়া' ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬৭; ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, 'আল-ইবানাহ' পৃঃ ২১১; (فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) নিসা ১৭৩।

১১৩. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ফাৎহুল বাব-লি-আক্বাইদি উলিল আলবাব'-উর্দূ (বেনারসঃ সাঈদুল মাতাবে প্রেস ১৩০৫/১৮৮৭ খৃঃ) পৃঃ ৫৮-৫৯।

১১৪. খালেদ আল-আরাবী, 'দাওয়াতে তাওহীদ'-উর্দূ (উড়িষ্যাঃ আনজুমানে দারুল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ, জেলা- বালেশ্বর পোঃ- বুতাত, সাঈদ মনযিল, ১৩৭৭/১৯৫৮) পৃঃ ১১।

১১৫. (فَكُلُّ مَنْ لم يَعْبُدِ اللّٰهَ بعد مَبْعَث محمدٍ صلى الله عليه و سلم بما شَرَعَهُ اللّٰهُ مِنْ واجبٍ و مستحَبٌ فليس بمسلم) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, 'মাজমূউল ফাতাওয়া' ১ম খণ্ড পৃঃ১৯০; (لا يَتِمُّ الايمانُ به إلا بإثبات عُمُوْمِ رسالتِهِ فى هذا و هذا أى فى علومِ العبادِ

وأعمالهم) হাফেয ইবনুল কাইয়িম, 'ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন' ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৭৫।

১১৬. (عن أبى هريرة قال قال رسول الله (ص) مَثَلِى و مَثَلُ الأنبياء كمثَلِ قصرٍ أُحْسِنَ بُنْيَانُهُ تُرِكَ منه موضعُ لَبِنَةٍ .. فكنتُ أنا سَدَدْتُ موضعَ اللَّبِنةِ خُتِمَ بِىَ البُنْيانُ و خُتِمَ بِىَ الرسُلُ و فى رواية : فأنا اللَّبِنَةُ و أنا خاتَمُ النبيين- মুত্তাফাক আলাইহ- মিশকাত (বৈরুত ছাপা),'শেষ নবীর ফাযায়েল' অধ্যায়, হা- ৫৭৪৫, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৬০১; ইমাম লালকাঈ, উছূলু ই'তিক্বাদ ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৭৮৩।

১১৭. আবু দাঊদ, মিশকাত (বৈরুত ছাপা) 'ফিতান' অধ্যায়, হা- ৫৪০৬, মুত্তাফাক আলাইহ-মিশকাত, 'আলীর মর্যাদা' অধ্যায়, হা-৬০৭৮, মুত্তা, মিশকাত, 'ইমারত' অধ্যায়, হা- ৩৬৭৫। শেষ নবী (ছাঃ)-এর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ইয়ামনে জনৈক 'আস্ওয়াদ আনাসী', ইয়ামামাতে 'মুসায়লামাহ' এবং মৃত্যুর পরপরই নাজ্‌দে 'তুলায়হা আসাদী' ও ইরাকে 'সাজা' নাম্নী জনৈকা মহিলা 'নবী' হবার দাবী করে। বর্তমানকালে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার বাটালা মহকুমাধীন 'কাদিয়ান' উপশহরের মির্যা গোলাম আহমাদ (১৮৩৫-১৯০৮ খৃঃ) ১৮৯১ সালে নিজেকে 'মসীহ ঈসা' ও ১৮৯৪ সালে 'মাহ্দী' এবং ১৯০৮ সালে মৃত্যুর দু'মাস আগে নিজেকে 'রাসূল ও নবী' দাবী করে। - শেখ আইনুল বারী, 'কাদিয়ানী কাহিনী' (কওমী প্রেস, ১নং মারকুইস লেন, কলিকাতা-১৬, ১ম সংস্করণ মার্চ ১৯৮৬) পৃঃ ১।

১১৮. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ১০৩; ইমাম ছাবূনী, 'আকীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৯৩; ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, 'মাজমূউল ফাতাওয়া' পৃঃ ১৭৩-১৭৬।

১১৯. সূরায়ে তাওবাহ ১১৭ আয়াত এবং হাদীছ- (عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خيرُ أُمَّتِى قَرْنِىْ ثم الذين يَلُوْنَهُم ثم الذين يلونهم) মুত্তাফাক আলাইহ-মিশকাত 'ছাহাবীদের মর্যাদা' অধ্যায়, হা- ৬০০১; (وعن عُمَرَ قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اكْرِمُوا أصْحَابِى فإنهم خِيَارُكُمْ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) নাসাঈ, আহমাদ, হাকেম (সনদ ছহীহ-আলবানী) - মিশকাত, হা- ৬০০৩, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৬৯৫।

১২০. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, 'আক্বীদা ওয়াসিত্বিয়াহ'-শরহ, পৃঃ ১৭৫; নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ১০৪।

১২১. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ৯৭, ১০৩; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ওয়াযীরুল ইয়ামানী (মৃঃ ৮৪০ হিঃ), 'আর-রওযুল বাসিম' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ১৩৯৯/১৯৭৯) ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৩-৫৭। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- عن أبى سعيد الخُدْرِىِّ قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تَسُبُّوا أصحابى فلو أنَّ أحَدَكُمْ أنفقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ما بَلَغَ مُدَّ أحَدِهِمْ و لا

(نَصِيفَهُ মুত্তাফাক আলাইহ- মিশকাত 'ছাহাবীদের মর্যাদা' অধ্যায়, হা- ৫৯৯৮; অন্যত্র তিনি বলেন, (عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهُ اللهُ في أصحابي لا تتخذوهم غَرَضًا من بعدي ...) তিরমিযী, মিশকাত, হা -৬০০৫; ইমাম বাগাভী, 'শারহুস্ সুন্নাহ' ১৪শ খণ্ড পৃঃ ৭০-৭১, তিরমিযী (হা-৩৮৬১) হাদীছটিকে 'হাসান' এবং ইবনু হিব্বান (হা-২২৮৪) 'ছহীহ' বলেছেন।- 'শারহুস সুন্নাহ' ঐ পৃঃ ৭১-টীকা।

১২২. শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ১১৫; নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ৬৩ টীকা সংখ্যা- ১০১।

১২৩. শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৬; নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ৬৩ টীকা সংখ্যা-১০১।

১২৪. ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৮৬; আবদুল্লাহ বিন আহমাদ (২১৩-২৯০), 'কিতাবুস সুন্নাহ' ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৭৩-৫৭৪; ইবনু তায়মিয়াহ, আকীদা ওয়াসিত্বিয়াহ -শরহ পৃঃ ১৭০।

১২৫. (ক) ইমাম বায়হাকী, 'আল-ই'তিক্বাদ' পৃঃ ১৬৭ (খ) ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৮৬-৮৭ (গ) ইমাম আবদুল্লাহ বিন আহমাদ, 'কিতাবুস সুন্নাহ' ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৭৩ (ঘ) ইবনু কাছীর 'আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ্' (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্মিয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৪০৮/১৯৮৮) ৮ম খণ্ড পৃঃ ১৭। ১. হযরত আবুবকর (১১-১৩ হিঃ)= ২ বছর, ২. হযরত ওমর (১৩-২৩ হিঃ)= ১০ বছর, ৩. হযরত ওছমান(২৩-৩৫ হিঃ)= ১২ বছর, ৪. হযরত আলী (৪ বছর ৯ মাস ও হযরত হাসান বিন আলী ৩ মাস- রামাযান হ'তে রবীউল আউয়াল ৪১ হিঃ; ৩৫-৪১ হিঃ)= ৬ বছর। সর্বমোট ৩০ বছর। যেমন এরশাদ হয়েছে-

(عن سعيد بن جُمْهَانَ عن سفينةَ مَوْلَى رسول الله صلى الله عليه و سلم مرفوعًا قال : الخلافةُ بعدي ثلاثونَ سَنَةً ثم قال سفينةُ أَمْسِكْ خلافَةَ أبي بكر سَنَتَيْنِ و عُمَرَ عَشْرًا وعثمانَ ثِنْتَيْ عشرةَ و عليٌّ ستًا و بعد انقضاء أيامهم عاد الامرُ إلى الملكِ العَضُوْضِ على ما أخبر عنه الرسولُ صلى الله عليه و سلم رواه النسائي و أبو داود و الترمذي و أحمد والبيهقي والبغوي في شرح السنة (ج ١٤ ص ٧٤) - سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني رقم ٤٥٩

১২৬. ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৮৩; ইমাম বায়হাকী, 'আল-ই'তিক্বাদ' পৃঃ ১৬৬-১৬৭। তিরমিযী, ইবনুমাজাহ- মিশকাত, 'দশজন ছাহাবীর মর্যাদা' অধ্যায়, হা- ৬১০৯, সনদ ছহীহ- আলবানী। 'আশারায়ে মুবাশ্শারাহ' দশজন ছাহাবী হলেন-

১- আবু বকর আবদুল্লাহ বিন উছমান (মৃঃ ১৩ হিঃ বয়স ৬৩ বৎসর)

২- উমার বিনুল খাত্ত্বাব (মৃঃ ২৩ হিঃ বয়স ৬০)
৩- উছমান বিন আফ্ফান (মৃঃ ৩৫ হিঃ বয়স অন্যুন ৮৩)
৪- আলী ইবনু আবী ত্বালিব (মৃঃ ৪০ হিঃ বয়স ৬০)
৫- আবু ওবায়দাহ আমের বিন আবদুল্লাহ বিনুল জাররাহ (মৃঃ ১৮ হিঃ বয়স ৫৮)
৬- আবদুর রহমান বিন আওফ (মৃঃ ৩২ হিঃ বয়স ৭৫)
৭- ত্বাল্হা বিন ওবায়দুল্লাহ (মৃঃ ৩৬ হিঃ বয়স ৬২)
৮- যোবায়ের বিনুল 'আওয়াম (মৃঃ ৩৬ হিঃ বয়স ৭৫)
৯- সাঈদ বিন যায়েদ বিন 'আমর (মৃঃ ৫১ হিঃ বয়স ৭১)
১০- সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাছ (মৃঃ ৫৫ হিঃ বয়স ৮২) রাযিয়াল্লাহু আনহুম।
= নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ৯৮, টীকা সংখ্যা- ২০৭।

১২৭. মুসলিম-মিশকাত, হা- ৬২০২; মুত্তাফাক আলাইহ- মিশকাত, হা- ৫২৯৬; মুত্তাফাক আলাইহ-মিশকাত, হা- ৬২০০, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৭৫০, ১৪৫৭, ১৭৪৯।

১২৮. মুত্তাফাক আলাইহ, বুখারী, মুসলিম, মুত্তাফাক আলাইহ-মিশকাত, 'জামেউল মানাক্বিব' অধ্যায়, হা- ৬২১৬-২০; ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৭৫৩-৫৪; বদরী ছাহাবার সংখ্যা ইবনে হিশামের বর্ণনায় এসেছে ৩১৪, বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে ৩১৩, ১৪ ও ১৫। -আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক বিন হিশাম বিন আইয়ূব বাছারী মিসরী (মৃঃ ২১৮ হিঃ), 'সীরাতু ইবনে হিশাম' পরিমার্জনঃ আবদুল সালাম হারূণ, ১০ম সংস্করণ (কুয়েতঃ দারুল বুহূছিল ইল্মিয়াহ ১৪০৫/১৯৮৪) পৃঃ ১৫৩; ইমাম বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ), 'দালায়েলুন নবুঅত' সম্পাদনাঃ ডঃ আবদুল মু'ত্বী ক্বাল'আজী, (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইল্মিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৬-৪০; এতদ্ব্যতীত সূরায়ে মারিয়াম ৭১-৭২ ও সূরায়ে ফাৎহ ১৮ আয়াত।

১২৯. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ১০১ ইত্যাদি। এখানে রাসূল-পরিবার বলতে ইমাম ত্বাহাভী (২৩৭-৩২১ হিঃ) বলেন, 'উক্ত পরিবারের যাঁরা কিতাব ও সুন্নাতের যথার্থ অনুসারী তাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে।' -ঐ টীকা সংখ্যা ২১৫।

১৩০. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, 'আক্বীদা ওয়াসিত্বিয়াহ' –শরহ, পৃঃ ১৭১-৭২; মুসলিম-মিশকাত, 'রাসূল পরিবারের মর্যাদা' অধ্যায়, হা- ৬১৩১, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৭৩২।

১৩১. উম্মাহাতুল মুমিনীনের সংখ্যা ১১ জন। তন্মধ্যে মা খাদীজা ও যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রাঃ) রাসূলের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। এঁদের মধ্যে প্রথম চারজন এবং ৬ ও ৯ নং স্ত্রী কুরায়শী ছিলেন। ৫, ৭, ৮ ও ১১নং স্ত্রী ছিলেন অন্যান্য আরব গোত্রের এবং ১০ নং স্ত্রী ছিলেন অনারব ইহুদী গোত্রের। তালাকপ্রাপ্তা বাঁদী মারিয়া ক্বিব্ত্বিয়ার গর্ভের সন্তান ইবরাহীম (রাঃ) ব্যতীত রাসূলের বাকী দুই ছেলে ক্বাসেম ও আবদুল্লাহ (লকব 'ত্বাইয়িব' ও 'ত্বাহির') এবং চার মেয়ে যায়নাব, রুক্বাইয়াহ, উম্মে কুলছূম ও ফাত্বিমা- সকলেই

ছিলেন মা খাদীজার গর্ভজাত সন্তান। উম্মাহাতুল মুমিনীনের তালিকা নিম্নরূপঃ-

একনজরে 'উম্মাহাতুল মুমিনীন'

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	বিয়ের বছর	তাঁর বয়স	নবীর বয়স	তাঁর মৃত্যু সন	নবীর সান্নিধ্য কাল	মৃত্যু কালে তাঁর বয়স	মন্তব্য
১.	খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ	-	৪০ বছর	২৫ বছর	১০ম নববী সন	প্রায় ২৫ বছর	৬৫	ইনি জীবিত থাকা পর্যন্ত নবী (ছাঃ) অন্য বিবাহ করেননি।
২.	সাওদা বিনতে যাম'আহ	১০ম নববী সন	৫০	৫০	১৯ হিঃ	১৪ বছর	৭২	দুই স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ২য় স্বামীর তিন ছেলে সহ নবীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পূর্বস্বামীর উক্ত তিন ছেলে নবীর ছাহাবী ছিলেন।
৩	আয়েশা বিনতে আবুবকর	১০ম নববী সন বাসর ১ম হিঃ	৯	৫৩	৫৭ হিঃ	৯ বছর	৬৩	ইনিই একমাত্র কুমারী স্ত্রী ছিলেন।
৪	হাফছাহ বিনতে ওমর	৩ হিঃ	২২	৫৫	৪১ হিঃ	৮ বছর	৫৯	বাকী সকলেই ছিলেন বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যক্তা।

৫.	যায়নাব বিনতে খুযায়মাহ	৩ হিঃ	৩০	৫৫	৩ হিঃ	৩ মাস	৩০	
৬.	উম্মে সালামাহ বিনতে আবী উমাইয়াহ	৪ হিঃ	২৬	৫৬	৬০ হিঃ	৭ বছর	৮০	
৭.	যায়নাব বিনতে জাহশ (ফুফাতো বোন ও পালিত পুত্র যায়েদ-এর তালাক দেওয়া স্ত্রী)	৫ হিঃ	৩৬	৫৭	২০ হিঃ	৬ বছর	৫১	
৮.	জুওয়াইরাহ বিনতে হারিছ	৫ হিঃ	২০	৫৭	৫৬ হিঃ	৬ বছর	৭১	
৯.	উম্মে হাবীবাহ রামলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান (আমীর মু'আবিয়ার বিমাতা বোন)	৬ হিঃ	৩৬	৫৮	৪৪ হিঃ	৬ বছর	৭২	
১০.	ছাফিইয়াহ বিনতে হুয়াই বিন আখতাব (খায়বরের ইহুদী বনী নযীর গোত্রের সর্দারকন্যা ও হযরত হারূণ (আঃ)- এর বংশধর)।	৭ হিঃ	১৭	৫৯	৫০হিঃ	পৌনে চার বছর	৬০	
১১.	মায়মূনা বিনতুল হারিছ	৭ হিঃ	৩৬	৫৯	৫১হিঃ	সোয়া তিন বছর	৮০	

-ইমাম বায়হাক্বী, 'দালায়েলুন নবুঅত' ৭ম খণ্ড পৃঃ ২৮৯। ইমাম বায়হাক্বী আরও কিছু ভিন্ন বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। - ঐ; কাযী মুহাম্মাদ সুলায়মান বিন সালমান মানছূরপুরী, 'রাহমাতুল লিল আলামীন' (সূইওয়ালাঁ, দিল্লীঃ ই'তিক্বাদ পাবলিশিং হাউস নং ১৪৯১, ১ম সংস্করণ, আগষ্ট১৯৮০) ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৫-১১৩, ১৮২।

১৩২. (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ..) আহযাব - ৬

১৩৩. ইবনু তায়মিয়াহ, 'আক্বীদা ওয়াসিত্বিয়াহ'-শরহ, পৃঃ ১৭২।

১৩৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৩; নওয়াব ছিদ্দীক হাসান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ১০৩।

১৩৫. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৫; ইবনু তায়মিয়াহ, আক্বীদা ওয়াসিত্বিয়াহ

-শরহ, পৃঃ ১৭৬-১৭৮; ইমাম বায়হাক্বী, আল-ই'তিক্বাদ পৃঃ ১৫৩-৫৯; চার খলীফার কারামত দ্রষ্টব্যঃ আবদুল ওয়াহ্‌হাব বিন তাক্বিউদ্দীন সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হিঃ), 'তাবাকাতুশ শাফেঈয়াহ কুব্‌রা' (সাইয়িদ মুহাম্মাদ আফেন্দী হুসাইনিয়া প্রেস থেকে ১৩২৪/১৯০৬ সালের মুদ্রণ হ'তে পুনরায় অফসেট মুদ্রণ- বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ সাল বিহীন) ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৪-৬৯।

১৩৬. আক্বীদা ওয়াসিত্বিয়াহ-শরহ, পৃঃ ১৭৭ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৭. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ১০৫, ১১৫-১৭।

১৩৮. ইবনু তায়মিয়াহ, আক্বীদা ওয়াসিত্বিয়াহ-শরহ, পৃঃ ১৭৯

১৩৯. ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, 'মাক্বালাতুল ইসলামিঈন' পৃঃ ৩২৩; ঐ 'আল-ইবানাহ' পৃঃ ৬২; নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ১১৯; সূরায়ে ইউসুফ ৪৪।

১৪০. সূরায়ে শূরা ৫১, ছাফ্‌ফাত ১০২, ইউসুফ ৪, ১০০; উক্ত মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ), ওবায়েদ বিন উমায়ের প্রমুখ ছাহাবী ও তাবেঈ হতে ছহীহ সনদে 'আছার' বর্ণিত হয়েছে।- নওয়াব ছিদ্দীক হাসান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ১১৯, টীকা সংখ্যা -২৪৪।

১৪১. বুখারী, মুত্তাফাক আলাইহ-মিশকাত (বৈরুত) 'স্বপ্ন' অধ্যায়, হাদীছ সংখ্যা ৪৬০৬, ৪৬১২ ইত্যাদি, ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৯৭।

১৪২. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ক্বাৎফুছ ছামার' পৃঃ ১০৫-১০৭।

১৪৩. ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৯২; আবুল হাসান আশ'আরী, 'মাক্বালাতুল ইসলামিঈন' 'আছহাবে হাদীছগণের সম্পর্কে বর্ণনা' অধ্যায়, পৃঃ ৩২৩।

১৪৪. (وَ أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ) বাক্বারাহ - ৪৩।

১৪৫. (عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .. والصلاةُ واجبةٌ عليكم خَلْفَ كُلِّ مسلمٍ بِرًا كان أو فاجرًا و إنْ عَمِلَ الكبائرَ - رواه أبوداود) আবুদাউদ-মিশকাত, 'ইমামত' অধ্যায় হা- ১১২৫, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৫১।

১৪৬. ছহীহ বুখারী, 'ফিৎনাগ্রস্থ ও বিদ'আতীর ইমামতি' অধ্যায়, (মীরাটঃ হাশেমী প্রেস ১৩২৮/১৯১০ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৬।

১৪৭. ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনু আবী শায়বাহ কূফী (মৃঃ ২৩৫ হিঃ), 'কিতাবুল মুছান্নাফ ফিল আহাদীছ ওয়াল আছার' তাহকীকঃ আবদুল খালেক আফগানী, 'ছালাত' অধ্যায় (বোম্বাই-ভারতঃ দার সালাফিইয়াহ, মোমেনপুরা, হামেদ বিল্ডিং , বোম্বে ৪০০০১১, ২য় সংস্করণ ১৩৯৯/১৯৭৯) ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৭৮।

১৪৮. ইমাম ছাবূনী, 'আকীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৯২-৯৩; ইমাম আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আশ'আরী, 'আল-ইবানাহ' পৃঃ ৬১।

১৪৯. عن علي قال قال رسول الله (ص) لاَ طاعةَ في معصيةٍ إنما الطاعةُ في المعروفِ ،

متفق عليه - و عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله (ص) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق رواه في شرح السنة بإسناد صحيح - মুত্তাফাক আলাইহ, শারহুস সুন্নাহ (সনদ ছহীহ-আলবানী)- মিশকাত, 'ইমারত' অধ্যায় হাদীছ সংখ্যা - ৩৬৬৫, ৩৬৯৬, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৮৬, ১০৯২।

১৫০. (ক) (مَنْ رأى من أميره شيئا يَكْرَهُه فَلْيَصْبِرْ ، متفق عليه) মুত্তাফাক আলাইহ; (খ) (قلنا يا رسولَ اللّه أفلا نُنَابِذُهُمْ عند ذلك ؟ قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاةَ لا ما أقاموا فيكم الصلاةَ و فى روايةٍ أفلا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قال : لا ما صَلَّوْا لا ما صَلَّوْا أى من كره بقلبه و أنكر بقلبه رواهما مسلم মুসলিম; (গ) (إنكم سَتَرَوْنَ بعدى أَثَرَةً و أموراً تُنْكِرُوْنَها، قالوا: فما تَأمُرُنَا يا رسولَ اللّه؟ قال: أَدُّوْا إليهم حَقَّهُمْ و سَلُوْا اللّهَ حَقَّكُمْ ، متفق عليه) মুত্তাফাক আলাইহ; (ঘ) (فإنما عليهم ما حُمِّلُوْا و عليكم ما حُمِّلْتُمْ ، رواه مسلم و فى رواية أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، متفق عليه) মুসলিম, মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা- ৩৬৬৮, ৩৬৭০-৭১, ৩৬৭২, ৩৬৭৩, ৩৬৭৫, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৮৬-৮৮।

১৫১. ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৯২-৯৩; আবুল হাসান আশ'আরী, 'মাকালাতুল ইসলামিঈন' পৃঃ ৩২৩।

১৫২. মুত্তাফাক আলাইহ, আহমাদ ও সুনানে আরবা'আহ (হাদীছ ছহীহ-আলবানী) - মিশকাত, হাদীছ সংখ্যা- ৩৬৬৬, ৩৭০৫।

১৫৩. ফাসেক শাসককে পদচ্যুত করতে হবে বলে ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) মত প্রকাশ করেছেন। তবে এর বিপক্ষ মতই অধিক শক্তিশালী বলে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-১৮৯০ খৃঃ) মন্তব্য করেছেন। -ছিদ্দীক হাসান খান, 'ফাৎহুল বাব লি-আক্বাইদি উলিল আলবাব' (উর্দূ) পৃঃ ৯৯।

১৫৪. ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৯২; আবু দাউদ- মিশকাত, 'ছালাত' অধ্যায়, হাদীছ সংখ্যা- ১১২৫, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৫১।

১৫৫. ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, 'মাক্বালাতুল ইসলামিঈন' পৃঃ ৩২৩; 'আল-ইবানাহ' পৃঃ ৬১; ইমাম ছাবূনী, 'আক্বীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৯৩; মুত্তাফাক আলাইহ (إلا أن تروا كفرا بَوَاحًا عندكم من الله برهان) মুসলিম -মিশকাত, হাদীছ সংখ্যা- ৩৬৬৬, ৩৬৭১, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৮৬, ১০৮৭।

১৫৬. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ফাৎহুল বাব' (উর্দূ) পৃঃ ১০১; সূরায়ে নিসা ৩৪, বুখারী-মিশকাত 'ইমারত' অধ্যায় হা- ৩৬৯৩, মুত্তাফাক আলাইহ হা- ৩৬৮৩ ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৯১,১০৮৯-

١- عن أبى بَكْرَةَ قال لَمَّا بلغ رسولَ اللّه (ص) أنَّ أهلَ فارسَ قد مَلَّكُوا عليهم بنتَ كِسْرٰى

قال: لن يُفْلِحَ قومٌ وَلَّوْا أمرَهم إمرأةً رواه البخارى-

٢- عن أبى موسى الأشعرىِّ قال .. فقال إنَّا واللّٰه لا نُوَلِّى على هذا العملِ أحداً سَأَلَه و لا أحداً حَرَصَ عليه و فى رواية لمسلم قال: لَنْ نَسْتَعْمِلَ على عَمَلِنَا مَنْ أرادَه، متفق عليه-

অর্থঃ ১- হযরত আবু বাক্‌রাহ (রাঃ) বলেন যে, পারস্যের অধিবাসীরা যখন তাদের রাজা কিস্‌রার (মৃত্যুর পরে তাঁর) মেয়েকে শাসন কর্তৃত্বে বসালো, তখন সেই সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,ঐ জাতি কখনোই সফলতা লাভ করবেনা, যারা নারীকে নেতৃত্বে বসিয়েছে।'–বুখারী। ২- হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, একদা আমি আমার দুই চাচাতো ভাইসহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হ'লাম । তখন তাদের একজন তাঁকে বল্‌ল, হে রসূল ! আল্লাহপাক আপনাকে যেসবের উপরে অভিভাবক করেছেন,ঐগুলির কোন একটির উপরে আমাকে 'আমীর' নিযুক্ত করুন! দ্বিতীয়জন ও অনুরূপ কথা বল্‌ল। জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন ,আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আমাদের এইসব কাজে এমন লোককে নেতৃত্বে নিয়োগ করিনা, যারা তা চেয়ে নেয় বা লোভ করে'।-মুত্তাঃ । মুসলিম শরীফের অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, আমরা আমাদের কাজে এমন ব্যক্তিকে কখনোই নেতা নিয়োগ করিনা,যারা তার আকাংখা পোষণ করে।'

উপরোক্ত হাদীছ দু'টির মর্মবাণীকে অক্ষুন্ন রেখেই মুসলিম রাজনীতিকদের নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ করা উচিত। যেমন সূরায়ে বাক্বারাহ ১৬৫, মায়িদাহ ৮, নিসা ৩৪, আন'আম ১১৭, আলে-ইমরান ১৫৯, হুজুরাত ১৩ প্রভৃতি আয়াত এবং উপরোক্ত হাদীছসমূহের আলোকে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সামাজিক অশান্তির জন্য প্রধানতঃ তিনটি বিষয়কে দায়ী করেছে। ১-ধর্মহীন বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা ২-সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এবং ৩-দল ও প্রার্থী ভিত্তিক প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা। এই অবস্থা নিরসনের জন্য তারা নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্য জাতির নিকটে পেশ করেছে।- (ক) সর্বত্র দল ও প্রার্থী বিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা এবং নির্বাচক ও নির্বাচিতদের জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলী নির্ধারণ করা (খ) জনগণ বা সংসদ নয় বরং আল্লাহ্‌কে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে গ্রহণ করা। (গ) বৈষয়িক ও কারিগরী শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষার সকল স্তরে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য স্ব স্ব ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা (ঘ) ইসলামী অর্থ ও বিচারব্যবস্থা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা।-ঐ, প্রচারিত লিফলেট অক্টোবর ১৯৯৫; ঐ, 'সাংবাদিক সম্মেলন' খুলনা ও বগুড়া প্রেস ক্লাব, তাং ২১.৪.১৯৯৪ ও ৫.১.১৯৯৫; দৈঃ হিযবুল্লাহ (খুলনা) ২২.৪.৯৪, দৈঃ পূর্বাঞ্চল ২২.৪.৯৪; দৈঃ সাতমাথা (বগুড়া) ৬.১.৯৫, দৈঃ করতোয়া ৬.১.৯৫; জাতীয় সম্মেলন স্মরণিকা'৯৫, **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** **কেন্দ্রীয়** কার্যালয়ঃ মাদ্‌রাসা মার্কেট (৩য় তলা), রাণীবাজার, রাজশাহী-৬১০০ ॥

অধ্যায়-৬

الفصل السادس

মূলনীতি

أصول التحريك

১. কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা।

২. তাক্বলীদে শাখ্ছীর অপনোদন।

৩. ইজতিহাদের দুয়ার উন্মুক্তকরণ।

৪. সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ।

৫. মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ।[১]

মূলনীতি আকারে এখানে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করা হ'লেও শেষের চারটি মূলতঃ প্রথম দফা মূলনীতিরই ব্যাখ্যা বলা চলে।

১ম দফা মূলনীতিঃ কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা।

আল্লাহ বলেন- 'তোমাদের নিকটে রাসূল যা নিয়ে আসেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।[২]... 'যখন আল্লাহ বা তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর জন্য সেখানে তাদের নিজস্ব কোন ফায়ছালা পেশ করার অধিকার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হ'ল।'[৩] ... 'তিনি নিজের খেয়াল-খুশীমত বলেন না, বরং যা বলেন তা প্রত্যাদিষ্ট অহি ব্যতীত কিছু নয়।'[৪] ... 'নিশ্চয়ই কুরআন এক মর্যাদাশীল গ্রন্থ। সম্মুখ বা পশ্চাত কোন দিক দিয়েই এতে বাতিল কিছুরই প্রবেশাধিকার নেই। এটি মহাজ্ঞানী ও চির প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ।'[৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- 'নিশ্চয়ই আমি কুরআন ও তারই মত আরেকটি বস্তু (সুন্নাহ্) প্রাপ্ত হয়েছি।'[৬] ... বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি মুসলিম উম্মাহ্কে অছিয়ত করে যান এই মর্মে যে, 'আমি তোমাদের নিকটে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা ঐ দু'টি বস্তুকে মযবুত ভাবে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; সে দু'টি বস্তু হ'ল আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।[৭] 'যাঁর

হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, আমার থেকে 'হক' ব্যতীত অন্য কিছু বের হয় না।[৮]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছগুলি দ্বারা কুরআন ও হাদীছের শাশ্বত সত্য হওয়া এবং মুসলিম জীবনে এ দুইয়ের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অগ্রাধিকার সাব্যস্ত হওয়া প্রমাণিত হয়। এক্ষণে প্রথম দফা মূলনীতির সপক্ষে বিদ্বানগণের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হ'ল।

খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও ইতিহাসবিদ ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনে আহমাদ ইবনে হযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেন, 'ইসলাম প্রত্যেক মুমিনের জন্য একথা অপরিহার্য করে দিয়েছে যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করা হবে না (পৃঃ ৫০)। ... 'ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এখানে দু'টি আয়াত বা দু'টি ছহীহ হাদীছ কিংবা একটি ছহীহ হাদীছ ও একটি আয়াত যদি পরস্পর বিরোধী মনে হয়, তাহ'লে দু'টির উপরেই আমল করা ওয়াজিব হবে (পৃঃ ৫১)। ...'সংক্ষিপ্ত হাদীছের বদলে বিস্তারিত হাদীছ গৃহীত হবে। দ্বীনের কোন কিছুই অস্পষ্ট নেই; আল্লাহ সবকিছুই বর্ণনা করে দিয়েছেন। ...'মওকূফ বা মুরসাল হাদীছ দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হবেনা।' ..... 'ছহীহ প্রমাণিত 'খবরে ওয়াহিদ' পর্যায়ের হাদীছসমূহ অবশ্যই দলীল হিসাবে গৃহীত হবে (পৃঃ ৫২)। ... 'বিনা দলীলে কোন আয়াত বা হাদীছকে মান্‌সূখ অথবা নির্দিষ্ট গণ্য করা যাবে না, কিংবা প্রকাশ্য অর্থ হ'তে গৌণ কিংবা রূপক অর্থে 'তাবীল' করা যাবে না বা এই নির্দেশটি ওয়াজিব পর্যায়ের নয় একথাও বলা যাবে না (পৃঃ ৫৩)।' .....কুরআন ও হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ ও উদ্দেশ্য গ্রহণ করা ওয়াজিব (পৃঃ ৫৫-৫৬)।' .... 'কোন বিষয়ে ইখতিলাফ দেখা দিলে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে যেতে হবে- কারু রায় বা কিয়াসের দিকে নয় কিংবা বিশেষ কিছু লোক সমষ্টির দিকে নয়।' ...... কোন স্থানে হাদীছপন্থী ও রায়পন্থী দু'জন আলিম থাকলে হাদীছপন্থী আলিমের নিকটে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হবে- রায়পন্থী আলিমের নিকটে নয় (পৃঃ ৬৭-৬৮)।'[৯]

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ) বলেন, 'আহলেহাদীছদের নিকটে কোন সমস্যার সমাধান কুরআনে স্পষ্ট পাওয়া গেলে অন্যত্র তা সন্ধান করা বৈধ নয়। কুরআনের হুকুম দ্ব্যর্থবোধক বা অস্পষ্ট হ'লে হাদীছ তার ফায়ছালাকারী হবে। যখন কুরআনে কোন হুকুম না পাওয়া যাবে,

তখন তা হাদীছ থেকে গ্রহণ করতে হবে। সে হাদীছ বিদ্বানগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত থাকুক বা না থাকুক .... 'কেউ তার উপরে আমল করুক বা না করুক। অতঃপর কোন মাসআলায় হাদীছ পাওয়া গেলে তার বিপরীতে কোন ছাহাবীর কথা বা মুজতাহিদের ইজতিহাদ গ্রহণীয় হবেনা। সার্বিক প্রচেষ্টার পরও যখন কোন সমস্যার সমাধানে হাদীছ না পাওয়া যাবে, তখন কওম ও এলাকা নির্বিশেষে ছাহাবা ও তাবেঈদের কোন একটি জামা'আতের ফৎওয়া গ্রহণ করা হবে। যদি খুলাফায়ে রাশেদীন ও ফকীহগণ কোন বিষয়ে একমত হন তবে সেটাই হবে যথেষ্ট। কিন্তু যদি তাঁদের মধ্যে ইখতিলাফ থাকে, তাহ'লে আহলেহাদীছগণ ঐ বিদ্বানের বক্তব্য (আছার) গ্রহণ করে থাকেন, যিনি তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বিদ্বান, সর্বাপেক্ষা পরহেযগার ও সর্বাপেক্ষা স্মৃতিধর অথবা যে কথাটি তাঁদের থেকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সেটিকে গ্রহণ করেন। যদি কোন ব্যাপারে ছাহাবা ও তাবেঈদের থেকে দ্বিবিধ উক্তি (আছার) পাওয়া যায়, তবে সেখানে দ্বিবিধ হুকুম পালনীয় হবে। অতঃপর যখন কোন বিষয় (হাদীছ বা ছাহাবীদের আছার) কিছুই না পাওয়া যায়, তখন আহলেহাদীছগণ কিতাব ও সুন্নাতের সাধারণ নির্দেশ, ইশারা ও উদ্দেশ্য সমূহ অনুধাবন করেন এবং উদ্ভূত সমস্যাটির কোন বিগত নযীর তালাশ করতে থাকেন- যা আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রায় অভিন্ন বিবেচিত হয়। এব্যাপারে আহলেহাদীছগণ উছূলের কোন ধরাবাঁধা নিয়মের অনুসরণ করেন না। বরং যা তাঁদের নিরপেক্ষ জ্ঞান সঠিক মনে করে ও হৃদয় শীতল করে তার উপরেই নির্ভর করেন। যেমন 'মুতাওয়াতির' হাদীছের জন্য রাবীদের অবস্থা ও সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই বরং যা লোকেদের অন্তরে পরম্পরাগতভাবে একীন সৃষ্টি করে থাকে তার উপরেই ভিত্তি করা হয়ে থাকে।'[১০]

আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য গৃহীত উপরোক্ত ১ম দফা মূলনীতির সপক্ষে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং ছাহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত কতগুলি দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়। যেমন-

১- খলীফা আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর যুগে (১১-১৩ হিঃ/৬৩২-৩৪ খৃঃ, জীবনকালঃ ৬৩ বছর)ঃ

(ক) ক্বাবীছাহ বিন যুওয়াইব (রাঃ) বলেন যে, একদা জনৈকা দাদী বা নানী তার পোতা বা নাতির সম্পত্তিতে তার অংশ কত জানার জন্য আবুবকর ছিদ্দীক-এর দরবারে এলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁকে বললেন 'আল্লাহ্‌র কিতাবে তোমার

জন্য কিছুই দেখছি না, রাসূলের (ছাঃ) কাছ থেকেও এসম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। তুমি এখন ফিরে যাও, আমি লোকদের নিকটে জিজ্ঞেস করে দেখি। অতঃপর সকলকে জিজ্ঞেস করা হ'লে ছাহাবী মুগীরাহ বিন শু'বা (মৃঃ ৫০ হিঃ বয়স ৭০) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসব ক্ষেত্রে ১/৬ অংশ দিয়েছেন। আবু বকর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার সাথে (সাক্ষী হিসাবে) আর কেউ আছেন কি? তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (মৃঃ ৪৩ হিঃ) দাঁড়িয়ে মুগীরাহ্‌র ন্যায় বললেন এবং আবু বকর (রাঃ) উক্ত হাদীছ অনুযায়ী রায় প্রদান করলেন।'[১১]

(খ) আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী ও সন্তানদেরকে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ দেননি। কন্যা ফাতিমা ও চাচা আব্বাস (রাঃ) খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ফাদাক-এর খেজুর বাগান ও খায়বারের সম্পত্তির অংশ দাবী করলেন। তখন খলীফা তাঁদেরকে নিম্নোক্ত হাদীছ শুনিয়ে নিবৃত্ত করেন- سَمِعْتُ رسولَ الله (ص) يقول : لا نُوْرَثُ ما تركنا صَدَقَةٌ 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে আমাদের (সম্পত্তির) কেউ উত্তরাধিকারী হয়না। আমরা যা রেখে যাই সবই 'ছাদাক্বাহ' অর্থাৎ সর্বসাধারণের।' প্রকাশ থাকে যে, নবী পরিবারের জন্য সর্বপ্রকার ছাদকা খাওয়া হারাম। তাই আবু বকর (রাঃ) বললেন 'নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ পরিবার এই মাল খেতে পারেনা।'[১২] একই মর্মের হাদীছ ওমর ও আয়েশা (রাঃ) হ'তেও বর্ণিত হয়েছে।[১৩] ওমরের খেলাফত-কালে (১৩-২৩ হিঃ) তিনি আলী ও আব্বাস (রাঃ)-কে পৃথক পৃথকভাবে উক্ত হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরাও এ বিষয়ে জানেন বলে বলেন[14] (قالا: قد قال ذلك صلى الله عليه و سلم) সে কারণ ওছমান ও আলী খলীফা থাকাকালেও তাঁরা কখনো তাঁদের শ্বশুরের সম্পত্তির অংশ দাবী বা ভোগ করেননি। অতএব এব্যাপারে শায়খায়নের বিরুদ্ধে শী'আদের অভিযোগ নিছক কল্পনাপ্রসূত বৈ কিছুই নয়। এই ঘটনা দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের কিছু সাধারণ হুকুম হাদীছ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন এখানে ইসলামের সাধারণ উত্তরাধিকার আইনকে নবী পরিবারের ক্ষেত্রে হাদীছের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

২- খলীফা ওমর ফারূক-এর যুগে (১৩-২৩/৬৩৪-৪৪ খৃঃ, জীবনকাল ৬০ বছর)ঃ

(ক) কূফার কাযী শুরাইহ[১৫] বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চেয়ে খলীফা ওমর

Contents

(রাঃ)-এর নিকটে লিখলে খলীফা তাঁকে জওয়াবে যে ফরমান লিখে পাঠান, তা ইসলামী আইনবিদদের জন্য দিকনির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে। ফরমানে ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন- 'তোমার নিকটে কোন সমস্যা উপস্থিত হ'লে তুমি (১) কিতাবুল্লাহ দ্বারা ফায়ছালা কর। খবরদার কুরআনের নির্দেশ কার্যকরী করার ব্যাপারে কোন ব্যক্তির দিকে দৃকপাত করবে না (২) যদি এমন কোন বিষয় আসে যা কিতাবুল্লাহ্র মধ্যে নেই, তাহ'লে রাসূলের সুন্নাতের মধ্যে তালাশ কর এবং তা দ্বারা ফায়ছালা দাও (৩) যদি এমন কোন বিষয় আসে যা কিতাব ও সুন্নাতের মধ্যে পাওয়া যায় না, তাহ'লে বিদ্বানগণের ঐক্যমত বা ইজমা-এর দিকে মনোনিবেশ কর এবং সেখান থেকে ফায়ছালা গ্রহণ কর (৪) অতঃপর যদি এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয় যে বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাতে কিছু বলা হয়নি, পূর্ববর্তী বিদ্বানগণও কিছু বলেননি, তখন তুমি দু'টি পথের একটি বেছে নাও। চাইলে নিজের রায় মোতাবেক ইজতিহাদ কর ও আগে বেড়ে যাও, আর যদি চাও অপেক্ষা করতে থাক। তবে অপেক্ষা করার মধ্যেই আমি তোমার জন্য মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি।'[১৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে "তুমি ইজতিহাদ কর এবং নেক্কার বিদ্বানগণের সঙ্গে পরামর্শ কর।[১৭] ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১) বলেন, কোন সমস্যায় ওমরের (রাঃ) নিকটে কুরআন বা হাদীছের কোন দলীল না থাকলে ছাহাবীদের ডেকে নিয়ে পরামর্শ করতেন ও সিদ্ধান্ত নিতেন।[১৮]

(খ) দুই সতীনের ঝগড়ার এক পর্যায়ে একজনের বেলুনের আঘাতে অন্যজন মারা যায় ও তার গর্ভস্থ সন্তান মৃত অবস্থায় পতিত হয়। বিষয়টি রাসূলের দরবারে পেশ করা হলে তিনি হুযাইল গোত্রের উক্ত নিহত মহিলার রক্তমূল্য তার জীবিত সন্তানদের ও স্বামীকে দেওয়ার জন্য এবং মৃত সন্তানের বিনিময়ে একটি ক্রীতদাস বা দাসী মুক্তির নির্দেশ প্রদান করেন। বিষয়টি ওমর ফারূক (রাঃ) -এর জানা ছিল না। ফলে তাঁর আমলে একই ধরনের একটি মামলা দায়ের করা হ'লে তিনি এ বিষয়ে কারু কোন হাদীছ জানা আছে কি-না ছাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তেহামার অধিবাসী হামাল বিন মালিক বিন নাবিগাহ্র নিকটে উপরোক্ত হাদীছ শ্রবণ করার পর ওমর ফারূক (রাঃ) বললেন 'যদি আমি আজ এ হাদীছ না শুনতাম, তাহ'লে এর বাইরে ফায়ছালা দিতাম।' অন্য বর্ণনায় এসেছে 'আমরা আমাদের রায় অনুযায়ী ফায়ছালা দেবার নিকটবর্তী হয়েছিলাম।'[১৯] অর্থাৎ সাধারণ শারঈ বিধান অনুযায়ী একটি জীবন হত্যার রক্তমূল্য হিসাবে উক্ত মৃত বাচ্চার বিনিময়ে একশত উট আদায় করার হুকুম জারি করতাম।[২০]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, ওমরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ছাহাবী যাঁর সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) বলেন 'আমার পরে কেউ নবী হ'লে ওমর নবী হ'ত।'[২১] অন্যতম ছাহাবী আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (মৃঃ ৩২ হিঃ) বলেন 'যদি ওমরের ইল্‌ম এক পাল্লায় রাখা হয় এবং জগদ্বাসীর সকলের ইল্‌ম অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তাহ'লে ওমরের ইল্‌মের পাল্লা ভারী হবে'[২২] তিনি পর্যন্ত নিজের রায়কে বাদ দিয়ে রাসূলের হাদীছকে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করছেন ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। হাফেয ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) ওমর (রাঃ) থেকে এধরনের ১৫টি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন, যে সব ব্যাপারে পূর্বে তাঁর হাদীছ জানা ছিল না। কিন্তু পরে জানতে পেরে সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করেছেন।[২৩]

(গ) মারামারি করার সময় আংগুল কেটে ফেলার এক আসামীকে ওমরের দরবারে হাযির করা হলে তিনি আংগুলের গুরুত্ব হিসাবে রক্তমূল্য নির্ধারণের পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ইয়ামনবাসী আমর বিন হযম পরিবারের নিকট হ'তে রাসূলের লিখিত ফরমান অবগত হলেন এই মর্মে যে, রক্তমূল্যের ক্ষেত্রে সকল আংগুলের গুরুত্ব সমান। হাত বা পায়ের প্রত্যেকটি আংগুলের বিনিময়ে রক্তমূল্য হ'ল দশ দশটি উট।' সাঈদ বিনুল মুসাইয়িব (মৃঃ ৯৪ হিঃ) বলেন, এই হাদীছ শোনার পর ওমর (রাঃ) স্বীয় সিদ্ধান্ত হ'তে প্রত্যাবর্তন করলেন। কাযী শুরাইহ -এর নিকটে একদা একজন এসে বলল 'বুড়ো আংগুল ও কড়ে আংগুলের মূল্য কি সমান হ'তে পারে? কাযী শুরাইহ তখন কঠোর ভাষায় বললেন- 'তোমার ধ্বংস হৌক! হাদীছ যাবতীয় কিয়াসকে প্রতিরোধ করে। তুমি কেবল অনুসরণ করে যাও, বিদ'আতী হয়োনা।'[২৪] ওমর ফারূক (রাঃ) -এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা এখানে স্মরণ যোগ্য। তিনি বলেন 'যার হাতে ওমরের জীবন তাঁর কসম খেয়ে বলছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নবীর রূহ কবয করেননি বা অহি উঠিয়ে নেননি, যতক্ষণ না তার উম্মত সকল প্রকার 'রায়' হ'তে মুক্ত হ'তে পেরেছে।[২৫]

৩- খলীফা ওছমান গণী (রাঃ) -এর যুগে (২৩-৩৫/৬৪৪-৬৫৬ খৃঃ জীবনকালঃ ৮৩ বছর)ঃ

যায়নাব বিনতে কা'আব (রাঃ) বলেন যে, আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) -এর বোন ফোরায়'আ বিনতে মালিক বিন সিনান আনছারী স্বীয় নিহত স্বামীর ইদ্দত পালনের উদ্দেশ্যে নিজ পিতার গোত্র বনু খুদ্‌রায় গমন করার জন্য রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ)-এর অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে স্বামীগৃহে চারমাস দশদিন ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেন।'

ওছমানের খেলাফতকালে (২৩-৩৫ হিঃ) একই ধরনের একটি সমস্যা উপস্থিত হ'লে বিষয়টি সম্পর্কে খলীফা ওছমান (রাঃ) ফোরায়'আর নিকটে জানতে পাঠান, অতঃপর রাসূলের উপরোক্ত ফায়ছালা অনুযায়ী ফরমান জারি করেন।[২৬]

৪- আলী (কাঃ অঃ) -এর খেলাফতকালে (৩৫-৪০/৬৫৬-৬৬১ খৃঃ জীবনকালঃ ৬০ বছর)ঃ

তাঁর খিলাফতকালের আপোষহীন নীতি ফুটে ওঠে তাঁর নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যে। সর্বাবস্থায় কিতাব ও সুন্নাতের নিঃশর্ত ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন-

'যদি দ্বীন ব্যক্তি বিশেষের রায় অনুযায়ী হ'ত, তাহ'লে মোজার নীচের অংশ মাসাহ করা অবশ্যই উত্তম ছিল উপরের অংশের চেয়ে। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -কে মোজার উপরাংশ মাসাহ করতে দেখেছি।'[২৭]

খুলাফায়ে রাশেদীনের উপরোক্ত উক্তি ও আমলসমূহ সকল ছাহাবায়ে কেরামের আমলেরই প্রতিনিধিত্ব করে। তবুও আমরা এখানে আরও কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ছাহাবী ও তাবেঈ-এর আমল উদ্ধৃত করব।-

৫- আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (মৃঃ ৩২ হিঃ জীবনকাল ৬০ বছর)ঃ

ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (১৩-২৩ হিঃ) ইরাকের কূফায় খেলাফতের পক্ষ হতে রাষ্ট্রীয় শিক্ষক ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বশীল থাকা অবস্থায় দু'টি বিষয়ে তিনি স্বীয় রায় অনুযায়ী ফৎওয়া দেন। একটি হ'ল (ক) জনৈক ব্যক্তি বিয়ের পরে তার শ্বাশুড়ীকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করার জন্য (মিলনের পূর্বেই) স্ত্রীকে তালাক দেয়। এই বিয়ে সিদ্ধ হবে কি-না জিজ্ঞেস করা হ'লে ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন 'এতে আর দোষ কি (لا بأس) একথা শোনার পর লোকটি উক্ত মহিলাকে (পূর্বতন শ্বাশুড়ীকে) বিয়ে করে এবং কয়েকটি সন্তান লাভ করে।'

(খ) ২য় ফৎওয়াঃ (কূফাতে) আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালের রৌপ্য স্থানীয় মুদ্রা ব্যবসায়ীদের নিকটে বিক্রি করতেন। তিনি বেশী দিয়ে বিনিময়ে কম নিতেন।

অতঃপর ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মদীনায় এলে তিনি উক্ত বিষয় দু'টি সম্পর্কে ছাহাবায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। প্রথমটির ব্যাপারে তাঁরা বিয়ে সিদ্ধ না হওয়ার কথা বললেন। দ্বিতীয়টির ব্যাপারে বললেন 'সমান সমান ওযনে ব্যতীত রৌপ্যের বিনিময় সিদ্ধ নয়।'

আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাঃ) নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং (কূফায়) ফিরে এসে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে খোঁজ করলেন। কিন্তু না পেয়ে অবশেষে তার গোত্রের নিকটে গেলেন ও তাদেরকে ডেকে বললেন 'আমি যে ব্যক্তিকে তার পূর্বতন শ্বাশুড়ী বিয়ে করার ফৎওয়া দিয়েছিলাম ঐ বিয়ে সিদ্ধ হয়নি।' অতঃপর মুদ্রাবাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের ডেকে বললেন 'ওহে মুদ্রাব্যবসায়ীগণ! তোমাদের সঙ্গে ইতিপূর্বে যে কারবার আমি করেছি তা সিদ্ধ হয়নি। সমান সমান ওযন ব্যতীত রৌপ্য বিনিময় সিদ্ধ নয়।[২৮]

৬. আবু সাঈদ খুদরী (মৃঃ ৭৪ হিঃ)ঃ

ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর জীবদ্দশায় এক ছা' করে খাদ্যবস্তু, খেজুর, যব, কিসমিস বা পনির 'যাকাতুল ফিৎর' হিসাবে আদায় করতাম। এই অবস্থা চালু ছিল। এমন সময় খলীফা হিসাবে মু'আবিয়া (ইমারত ৪১-৬০) হজ্জ বা ওমরাহ উপলক্ষ্যে মদীনায় এলেন। তাঁর সঙ্গে সিরিয়ার গমও এল। তিনি মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন 'আমি মনে করি সিরিয়ার দুই মুদ (অর্ধ ছা') গম (মূল্যের দিক দিয়ে) মদীনার এক ছা' খেজুরের সমতুল্য।' ছহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে যে, ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী মু'আবিয়ার উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন 'আমি যতদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকব ততদিন অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা কখনোই আদায় করব না। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় আমি যা দিতাম তাই-ই দিয়ে যাব।' দারাকুতনী, ইব্‌নু খুযায়মা ও হাকেম-এর বর্ণনায় এসেছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে অর্ধ ছা' গমের ফিৎরার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি জওয়াব দেন 'না-ওটা হ'ল মু'আবিয়ার মূল্যের হিসাব। আমি ওটা কবুল করিনা, আমলও করিনা।' ইবনু খুযায়মার বর্ণনায় এটাও এসেছে যে, 'তখন থেকেই সর্বপ্রথম অর্ধ ছা'-এর আলোচনা দেখা দেয়।' মুসলিম-এর ভাষ্যকার ইমাম মুহিউদ্দীন নবভী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) বলেন, 'যারা অর্ধ ছা' গমের কথা বলেন, তাঁরা মু'আবিয়ার কথা অনুযায়ী সেটা বলেন।' বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার

আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) বলেন, উক্ত আমল ঠিক নয়। কারণ এটি একজন ছাহাবীর আমল, যার বিরোধিতা করেছেন ছাহাবী আবু সাঈদ খুদ্‌রী ও আবদুল্লাহ বিন ওমর সহ বহু নেতৃস্থানীয় ছাহাবা, যাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দীর্ঘ সাহচর্যে কাটিয়েছেন এবং যাঁরা তাঁর হাল অবস্থা সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাছাড়া মু'আবিয়া (রাঃ) স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছেন যে, এটি তাঁর নিজস্ব রায় মাত্র, রাসূলের উক্তি নয়। রাসূলের (ছাঃ) উক্তি ও আমল হ'ল এক ছা' খাদ্যবস্তুর পক্ষে। অতএব দলীল মওজুদ থাকতে 'ইজতিহাদ' বাতিল হবে। তাছাড়া হাদীছে যেসব বস্তুর নাম এসেছে সেগুলির মূল্যমানে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সবগুলি এক ছা' পরিমাণ হিসাবে 'ছাদাক্বায়ে ফিৎর' আদায় করতে বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বস্তুর মূল্যকে প্রতিপাদ্য বিষয় মনে করেননি বরং তার পরিমাণ বা ওযনকেই প্রধান বিষয় গণ্য করেছিলেন। কিন্তু মু'আবিয়া (রাঃ) ইজতিহাদ করে সিরিয়ার চড়া মূল্যের অর্ধ ছা' গমের সঙ্গে মদীনার সস্তা মূল্যের এক ছা' খেজুরের তুলনা করেছিলেন।'[২৯] এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান আমীরের হুকুম পর্যন্ত ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলের হাদীছের বিপরীতে অগ্রাহ্য করেছেন শুধুমাত্র হাদীছের সার্বভৌম অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য।

৭- আবদুল্লাহ বিন ওমর বিনুল খাত্ত্বাব (মৃঃ ৭৪ হিঃ)ঃ

ওমর পুত্র আবদুল্লাহ একজন জালীলুর কদর ছাহাবী ছিলেন। তিনি ওমরাহ ও হজ্জের মধ্যবর্তী সময়ে ইহরাম ভঙ্গ করে হালাল হওয়া অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জ জায়েয বলতেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) এটা পসন্দ করতেন না। একদা কিছু লোক ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল 'আপনি কিভাবে আপনার পিতার বিরোধিতা করেন?' তখন আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) জওয়াবে বললেন 'তোমাদের ধ্বংস হৌক তোমরা কি আল্লাহ্‌কে ভয় পাওনা? যদি ওমর (রাঃ) এটাকে নিষেধ করে থাকেন, তবে সেটা ভাল উদ্দেশ্যেই করেছেন। তিনি এর দ্বারা ওমরাহ পূর্ণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার জন্য তোমরা তামাত্তু-কে হারাম করছ কেন? অথচ আল্লাহ সেটা হালাল করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটার উপরে আমল করেছেন, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অধিক অনুসরণযোগ্য না ওমরের সুন্নাত?[৩০]

৮- সালেম বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর (মৃঃ ১০৬ হিঃ)ঃ

খ্যাতনামা তাবেঈ সালেম বিন আবদুল্লাহ স্বীয় দাদা ওমর বিনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর ফৎওয়া অনুযায়ী হজ্জের সময়ে পাথর নিক্ষেপের পরে ও বিদায়ী

তাওয়াফের আগে সুগন্ধি মাখা নাজায়েয মনে করতেন। পরে একদা আয়েশা (রাঃ) বলেন 'আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সুগন্ধি মাখিয়েছি ইহরাম বাঁধার পূর্বে ও বিদায়ী তাওয়াফের পূর্বে।' শাফেঈ (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ জানতে পেরে সালেম (রাঃ) তাঁর দাদাজীর কথা পরিত্যাগ করেন।

আল্লামা ইউসুফ ইবনু আবদিল বার্র আন্দালুসী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ হাররানী দামেস্কী (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন- 'এটাই হ'ল প্রকৃত মুসলিমের কর্তব্য। এর অন্যথাচরণ মোটেই কাম্য নয়, যেমন তাকলীদপন্থী ফের্কাগুলি করে থাকে।' ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[৩১]

৯- ওমর বিন আবদুল আযীয (মৃঃ ১০১ হিঃ)ঃ

দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর মুজাদ্দিদ বলে খ্যাত, প্রসিদ্ধ তাবেঈ উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয-এর খিলাফতকালে (৯৯-১০১ হিঃ) বিশ্বস্ত তাবেঈ মাখলাদ বিন খুফাফ আল-গিফারী একটি গোলাম খরীদ করেন ও তার জন্য খাদ্য ক্রয় করেন। তিনি বলেন যে, (কিছু দিনের মধ্যেই) তার কিছু (গোপন ও পুরাতন) দোষ আমার নিকটে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে (যা বিক্রেতা আমাকে বলেনি)। আমি তখন খলীফার দরবারে অভিযোগ দায়ের করলাম। তিনি আমাকে খাদ্য সহ উক্ত গোলাম ফেরত দানের ফায়ছালা দেন। অতঃপর আমি ওরওয়া বিন যুবায়ের (২৩-৯৩ হিঃ)- এর নিকটে এলাম ও তাঁকে সব খুলে বললাম। তিনি বললেন, আমি সন্ধ্যায় খলীফার নিকটে যাব ও তাঁকে আয়েশা (মৃঃ ৫৭ হিঃ) বর্ণিত রাসূলের হাদীছ শুনাব যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের একটি ব্যাপারে যামানতের বিনিময়ে জরিমানা (الخراج بالضمان) আদায়ের নির্দেশ দান করেছিলেন। একথা শুনে আমি ওমর বিন আবদুল আযীযের নিকটে এলাম ও ওরওয়া বর্ণিত নবীর হাদীছ শুনালাম। ওমর (রাঃ) তখন বললেন, আমি যে ফায়ছালা দিয়েছিলাম তার চেয়ে এখন আমার জন্য ফায়ছালা কতই না সহজ হয়ে গেল। আল্লাহ জানেন আমি আমার ফায়ছালার মধ্যে 'হক' ব্যতীত কিছুই আশা করিনি। এক্ষণে এব্যাপারে আমার নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে হাদীছ পৌঁছে গিয়েছে। অতএব আমি আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ফায়ছালা জারি করলাম। এরপর ওরওয়া (রাঃ) খলীফার নিকটে গেলেন এবং খলীফা আমাকে (ক্রয়মূল্য ফেরত নেওয়া ছাড়াও) খাদ্য দানের

বিনিময়মূল্য গ্রহণের ফায়ছালা দান করলেন- যা ইতিপূর্বে বিক্রেতাকে প্রদানের জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।'[৩২] তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে লিখিত অন্য এক ফরমানে বলেন, 'রাসূলের সুন্নাতের বিপরীতে কারু কোন 'রায়' গৃহীত হবেনা।'[৩৩]

উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, খুলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযাম কোন সমস্যা এলেই পরস্পরের নিকট প্রথমে হাদীছ সন্ধান করতেন। হাদীছ পেয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের রায় এমনকি রাষ্ট্রীয় ফরমান পর্যন্ত বাতিল করে রাসূলের (ছাঃ) হাদীছকে অগ্রাধিকার দিতেন ও সেই অনুযায়ী ফায়ছালা দিতেন। এ ব্যাপারে কেবল বর্ণনাকারীর (সনদের) বিশ্বস্ততা যাচাই করা ছাড়া তাঁরা অন্য কোন শর্তারোপ করতেন না। যেমন শাহ্ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬ হিঃ) বলেন, 'ছাহাবা ও তাবেঈন হ'তে একথা অব্যাহত ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁদের নিকটে হাদীছ পৌঁছে গেলে বিনা শর্তে তার উপরে আমল করতেন।'[৩৪] উল্লেখ্য যে, এটা ছিল আল্লাহ্‌র হুকুমেরই নিঃশর্ত তাবেদারী মাত্র। আল্লাহ বলেন- 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার হুকুম দানের অধিকারীদের। যদি তোমরা কোন বিষয়ে ঝগড়া কর, তাহলে বিষয়টিকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটাই হ'ল উত্তম ও সর্বাংগসুন্দর পথ।'[৩৫] ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন সর্বাবস্থায় এই দুই উৎসের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতেন। শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) একথাটিই বলেছেন এভাবে-

(لا يحل القياس والخبر موجود) 'হাদীছ মওজুদ থাকা অবস্থায় কিয়াস বৈধ নয়।' উছূলী বিদ্বানগণের নিকটে একথাটি খুবই প্রসিদ্ধ যে, (إذا ورد الأثر بطل النظر) 'যখনই হাদীছ পাওয়া যাবে, তখনই 'রায়' বাতিল হবে।'[৩৬]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অনেক যরূরী বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছাহাবীদের হাদীছ জানা ছিলনা। অথচ তাঁদের তুলনায় কনিষ্ঠ ছাহাবীগণ সে সকল বিষয়ে হাদীছ জানতেন। তাঁদের নিকট থেকে হাদীছ জেনে নিয়ে খলীফাগণ ও শ্রেষ্ঠ ছাহাবীগণ সেমতে ফায়ছালা দিতেন। এ প্রসঙ্গে শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ) বলেন, 'কিছু কিছু ছহীহ হাদীছ তাবেঈ বিদ্বানগনের নিকটে পৌঁছেনি- যারা ফৎওয়া প্রদানের অধিকারী ছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের রায় অনুযায়ী ইজতিহাদ করেছেন অথবা সাধারণ

নির্দেশ সমূহের আলোকে ফায়ছালা দিয়েছেন অথবা বিগত কোন ছাহাবীর অনুসরণ করেছেন। দেখা গেল তৃতীয় শতকে (হাদীছ সংকলনের যুগে) মুহাদ্দেছীনের নিকটে উক্ত হাদীছগুলি প্রকাশিত হ'ল। কিন্তু দেশে প্রচলিত আমলের বিরোধী দেখে অনেকে তার উপরে আমল করল না। এমনিভাবে ফক্বীহদের নিকটে বহু হাদীছ অজানা ছিল- যা পরবর্তীতে হাদীছের সংকলক ও হাফেযগণের নিকটে প্রকাশিত হয়েছে।'[৩৭] অতএব বলা চলে যে, বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সকলের নিকট সমভাবে ছহীহ হাদীছ না পৌঁছানো। তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে হাদীছ সংকলনের পরবর্তীযুগে এখন আর সে সমস্যা নেই। মুহাদ্দেছীনে কেরাম হাদীছ ছহীহ-যঈফ-মওযূ যাচাই-বাছাই করে সুন্দরভাবে বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় রচনার মাধ্যমে হাদীছ শাস্ত্রকে ফিক্বহ শাস্ত্রের চাইতে সহজ করে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী তাঁর প্রেরিত অহি (যিক্র)-কে হেফাযত করেছেন।[৩৮]

আহলেহাদীছগণ সর্বাবস্থায় কিতাব ও সুন্নাতের নিঃশর্ত ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন এবং মুসলিম উম্মাহ্কে সকল দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র মূল উৎসের দিকে ফিরে যাওয়ার উদাত্ত আহবান জানিয়ে থাকেন।

আহলেহাদীছ বা সালাফীদের এই বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিসরীয় পন্ডিত আবু যুহ্‌রা বলেন, 'সালাফীগণ যুক্তির উপরে নির্ভর করেন না। কেননা যুক্তি অনেক সময় ভ্রান্ত হয়। বরং তাঁরা সর্বদা নির্ভর করেন নছ ও দলীলের উপরে অথবা ঐসবের উপরে যে দিকে দলীল ইংগিত প্রদান করে। কারণ দ্বীন হ'ল অহি, যা আল্লাহ্র নবী প্রাপ্ত হয়েছিলেন।'

তিনি বলেন, সালাফীদের মতে কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত 'আকীদা ও আহকাম' ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করার কোন পথ নেই। অতএব কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা যা প্রমাণিত হবে তা কবুল করতে হবে। তাকে প্রত্যাখ্যান করা সঠিক হবেনা। বরং তা দায়িত্বমুক্ত হবার শামিল হবে। কুরআনের মূল মতন (Text) বা সেই মর্মের হাদীছ সমূহ দ্বারা যতটুকু ব্যাখ্যা সাব্যস্ত হয়,তার বেশী কিছু তাফসীর, তাবীল বা তাখরীজ করার অধিকার জ্ঞানের নেই। এরপরেও যদি জ্ঞানের কিছু করার থাকে, তবে তা হ'ল অহিকে

যুক্তি সিদ্ধ প্রমাণ করা এবং অহি ও জ্ঞানের মধ্যকার বৈষম্য যদি কিছু আছে বলে মনে করা হয়, তবে তা দূর করা। জ্ঞান অহি-র সাক্ষ্যদাতা হবে, হুকুমদাতা নয়। অহিকে প্রতিষ্ঠাকারী ও সাহায্যকারী হবে, ভঙ্গকারী বা প্রত্যাখ্যানকারী নয়। জ্ঞান হবে অহির দলীল সমূহকে স্পষ্টকারী। সালাফীদের গৃহীত মূলনীতি অনুযায়ী জ্ঞান হবে সর্বদা অহির পৃষ্ঠপোষক, যা তাকে সর্বদা সহায়তা করবে ও শক্তিশালী করবে।'[৩৯]

টীকাসমূহ-৫

১. পরিচিতি-ক লিফলেট। প্রচারেঃ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ কেন্দ্রীয় কমিটি (প্রতিষ্ঠাকালঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ ইং), কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ মাদরাসা মার্কেট (৩য় তলা), রাণীবাজার পোঃ ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

২. (و ما اتاكمُ الرسولُ فَخُذُوه و ما نَهَاكُمْ عنه فانتهوا) হাশর ৭।

৩. (و ما كان لِمُؤْمِنٍ و لا مؤمنةٍ إذا قَضَى اللّٰهُ و رسولُهُ أمراً أَنْ يكونَ لهم الخِيَرَةُ مِنْ أمرِهِمْ ، ومَنْ يُعْصِ اللّٰهَ و رسولَه فقد ضَلَّ ضَلالاً مُبِيْنًا) আহযাব ৩৬।

৪. (و ما يَنْطِقُ عن الهَوَى ، إنْ هو إلا وَحْيٌ يُوْحٰى) নাজ্‌ম ৩-৪।

৫. (و إنَّهُ لكِتَابٌ عَزِيْزٌ، لا يَأتِيْهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ) হামীম সাজদাহ ৪১-৪২।

৬. (عن المقدام بن معديكرب قال قال رسول الله (ص) ألا إنى أوتيْتُ القرانَ و مثلَهُ معه ، ألا يُوْشِكُ رجلٌ شَبْعَانُ على أريكته يقول عليكم بهذا القرانِ ، فما وَجَدْتُمْ فيه من حلالٍ فأحِلُّوْهُ و ما وجدتم فيه من حرامٍ فَحَرِّمُوْهُ و إنَّ ما حَرَّمَ رسولُ اللّٰهِ صلى الله عليه و سلم كما حَرَّمَ اللّٰهُ .. رواه أبوداؤد) আবুদাউদ- মিশকাত, 'ই'তিছাম বিল কিতাব' অধ্যায়, সনদ ছহীহ, তাহকীকঃ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরুতঃ আল্-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৭।

৭. (عن مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : تَرَكْتُ فيكم أمرين لن تَضِلُّوْا ما مَسَّكْتُمْ بِهِمَا ، كتابَ اللّٰهِ و سُنَّةَ نَبِيِّهِ رواه فى الموطأ فى كتاب القدر- قال الالبانى هذا حديث معضل ولكن له شاهد من حديث ابن عباس بسند حسن أخرجه الحاكم (٩٣/١) و البيهقى فى السنن الكبرٰى عن ابن عباس أن النبى (ص) خطب الناس فى حجة الوداع وقال .. (١١٤/١٠) প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৬; মুওয়াত্ত্বা, 'ক্বদর' অধ্যায় (মুলতান-পাকিস্তান মাকতাবা ফারূকিয়া, তাবি) পৃঃ ৫৬১; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ১০ম খণ্ড পৃঃ ১১৪।

৮. (و عن عبد الله بن عَمْرٍو قال كنت أَكْتُبُ كُلَّ شيءٍ أَسْمَعُهُ من رسولِ الله صلى الله عليه و سلم وأريدُ حِفْظَهُ ، فنَهَتْنِى قريشٌ و قالوا أتكتُبُ كُلَّ شيءٍ تَسْمَعُه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم و رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فى الرِّضاءِ والغَضَبِ قال فأمسكتُ فذكرتُ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه و سلم فقال: والذى نفسى بيده ما خَرَجَ منه إلا حَقٌّ أشار بيده إلىٰ فِيهِ رواه الحاكم (١/١٠٥) وقال الذهبى: إن كان الوليد هو إبن أبى الوليد الشامى فهو على شرط مسلم- وقال فى السِيَرِ: نعم فإنى لا أقولُ إلا حقًّا) سير أعلام হাকেম (৩২১-৪০৫), আল-মুস্তাদরাক- তালখীছসহ (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল ৮৮/৩ আরাবী, তাবি) ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৫-১০৬; যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮), সিয়ার (বৈরুতঃ মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০২/১৯৮২) ৩য় খণ্ড পৃঃ ৮৮।

৯. আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনে আহমাদ ইবনে হযম (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ), 'আল-মুহাল্লা' তাহকীকঃ কাযী আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (দামেস্কঃ ইদারাতু তাবা-'আতিল মুনীরিয়াহ ১ম সংস্করণ, ১৩৪৭/১৯২৮ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৫০-৬৮।

১০. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 'আহলুল হাদীছ ও আহ্‌লুর রায়-এর পার্থক্য' শীর্ষক অধ্যায় (কায়রোঃ দারুত্ তুরাছ, ১ম সংস্করণ ১৩৫৫হিঃ/১৯৩৬ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৯; ঐ, আল-ইনছাফ (বৈরুতঃ দারুন নাফাইস, ১ম সংস্করণ ১৩৯৭/১৯৭৭) পৃঃ ৫০।

১১. (باب ميراث الجدة) عن قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قال جاءَتِ الجَدَّةُ (وفى روايةٍ أمُّ الام أو أم الاب) إلى أبى بكر فسألَتْهُ ميراثَها قال لها: ما لكِ فى كتابِ الله شئٌ و ما لكِ فى سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه و سلم شئٌ ، فَارْجِعِى حتىٰ أسْأَلَ الناسَ ، فسَأَلَ الناسَ فقال المغيرةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رسولَ الله صلى الله عليه و سلم أعطاها السُّدُسَ ، فقال هل معكَ غيرُكَ ؟ فقام محمد بن مَسْلَمَةَ فقال مِثْلَ ما قال المغيرةُ ، فأنْفَذَهُ لها أبوبكر ..) তিরমিযী (দিল্লীঃ মুজতাবায়ী প্রেস ১৩০৮/১৮৯০ খৃঃ) ২য় খণ্ড পৃঃ ৩১; মিশকাত (বৈরুত ছাপা) 'ফারাইয' অধ্যায়, হা-৩০৬১, ২য় খণ্ড পৃঃ ৯২১; হাকেম-তালখীছ সহ (বৈরুত ছাপা) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৩৮।

১২. ছহীহ বুখারী, 'কিতাবুল ফারাইয' (মীরাট, হাশেমী প্রেস ১৩২৮/১৯১০ খৃঃ) ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৯৫; ঐ, (বৈরুত ছাপা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তারিখবিহীন) ৮ম খণ্ড পৃঃ ৩।

১৩. প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৯৬ ও ৮ম খণ্ড পৃঃ ৪-৫।

১৪. প্রাগুক্ত ২য় খন্ড পৃঃ ৯৯৬ ও ৮ম খণ্ড পৃঃ ৪।

১৫. ০ খ্যাতনামা বিচারপতি শুরাইহ বিনুল হারিছ বিন ক্বায়েস কূফী রাসূলের যুগ পেয়েছিলেন কিন্তু রাসূলকে দেখেননি। তিনি ওমর, ওছমান, আলী, মু'আবিয়া সহ হাজ্জাজের যুগ (৭৬-৯৬ হিঃ) পর্যন্ত একটানা ষাট বৎসর যাবত বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১২০ বছর বেঁচেছিলেন। মৃত্যুর একবছর পূর্বে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নেন। তাঁর মৃত্যুর সাল সম্পর্কে ৭৮ হিঃ, ৮০, ৮২, ৮৭, ৯৩, ৯৬, ৯৭ ও ৯৯ বিভিন্ন মতভেদ আছে।- সৈয়ূতী, 'তাবাকাতুল হুফ্ফায' (কায়রো ১৩৯২/১৯৭৩) পৃঃ ২০।

১৬. (عن الشعبى عن شُرَيْحٍ (قاضى الكوفة ، إعلام ١/٦٣): أن عُمَرَ بْنُ الخَطَّابِ كَتَبَ إليه : إذا جاءك أمرٌ فى كتابِ اللّٰه عز وجل فاقْضِ به و لا يُلْفِتَنَّكَ عنه الرجالُ ، فإن أتاك ما ليس فى كتاب اللّٰه فانْظُرْ سنةَ رسولِ اللّٰه (ص) فاقْضِ بها ، فإن جاءك ما ليس فى كتاب اللّٰه و لم يَكُنْ فيه سُنَّةُ رسولِ اللّٰه (ص) فانظُرْ ما اجتمعَ عليه الناسُ فخُذْ به ، فإن جاءك ما ليس فى كتاب اللّٰه ولم يكن فيه سنةٌ من رسول اللّٰه (ص) ولم يَتَكَلَّمْ فيه أحَدٌ قبلك فَاخْتَرْ أىَّ الأمْرَيْنِ شِئْتَ ، إنْ شئتَ أن تَجْتَهِدَ برَأيِكَ ثم تَقَدَّمْ فتقدمْ ، وإن شئتَ أن تَأخَّرَ فتأخَّرْ ، و لا أرَى التأخُّرَ إلا خيراً لك - رواه البيهقى ١٠/١١٥) ইমাম বায়হাকী, সুনানুল কুবরা (হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্যঃ ১৩৫৫ হিঃ, হ'তে বৈরুত ফটো অফসেট ছাপা 'জাওহারুন নাক্বী'সহ) 'আদাবুল ক্বাযী' অধ্যায় ১০ম খণ্ড পৃঃ ১১৫; ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন (বৈরুত ছাপা ১৯৭৩) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬১, ৬৩, ৮৪, ২০৪।

১৭. (وفى رواية عن عامر عن شُرَيْحٍ القاضى: فاجْتَهِدْ رَأيَكَ و اسْتَشِرْ أهْلَ العلمِ و الصَّلاحِ) ইবনুল কাইয়িম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৪, ২০৪।

১৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৪।

১৯. ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪), আর-রিসালাহ তাহকীকঃ আহমদ মুহাম্মাদ শাকির (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, মুদ্রণকাল বিহীন) পৃঃ ৪২৭-২৮; শাফেঈ (রহঃ) এখানে হাদীছটিকে 'মুরসাল'রূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনুমাজাহ 'মুত্তাছিল' ও ছহীহ সনদে রেওয়ায়াত করেছেন। -ঐ পাদটীকা, আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির।

ভাষ্যকার আহমাদ শাকির বলেন-ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) এখানে ইংগিত দেন যে, উক্ত হাদীছে সত্যবাদী ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ের হাদীছ গ্রহণযোগ্য হওয়ার স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান রয়েছে। এখানে ওমর ফারূক (রাঃ) যদি এক ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ (খবরে ওয়াহেদ) গ্রহণযোগ্য বিবেচনা না করতেন, তাহ'লে হামাল বিন মালিককে তিনি বলতেন যে, 'তুমি তেহামা হ'তে আগত একজন নতুন ব্যক্তি। তুমি মাত্র অল্পকালের জন্য রাসূলুলাহ (ছাঃ) -কে দেখেছ বা সাহচর্য লাভ করেছ। কিন্তু আমরা দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করা সত্ত্বেও উক্ত হাদীছ শুনিনি। তাহ'লে তুমি কিভাবে জানলে? এমতাবস্থায় তুমি ভুলও বলতে পার, ভুলেও যেতে পার। কিন্তু দেখা গেল যে একক ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ওমর ফারূক (রাঃ) তার বক্তব্য শুনলেন ও সে মতে হাদীছ অনুযায়ী ফরমান জারি করলেন।' -আর-রিসালাহ, পৃঃ ৪২৮- পাদটীকা।

২০. ইয়ামনবাসীর নিকটে প্রেরিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর লিখিত পত্র। যাতে বিভিন্ন অপরাধে জরিমানার পরিমান উল্লেখিত হয়েছে। -নাসাঈ, দারেমী-মিশকাত, 'দিয়াত' অধ্যায় (বৈরুত ছাপা) হাদীছ সংখ্যা ৩৪৯২, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৩৭।

২১. (عن عقبة بن عامر قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لو كان بعدى نبىٌ لكان عمرُ) তিরমিযী-মিশকাত, সনদ 'হাসান'- আলবানী, 'মানাক্বিব' অধ্যায়, হাদীছ সংখ্যা-৬০৩৮,

৩য় খণ্ড পৃঃ ১৭০৪-০৫।

২২. (قال ابن مسعود.. لو وُضِعَ عِلْمُ عُمَرَ فى كَفَّةِ ميزانٍ و جُعِلَ عِلْمُ أهلِ الارض فى كَفَّةٍ لَرَجَحَ عِلْمُ عمرَ قال الاعمش ذَكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخْعِيِّ فقال واللهِ إنِّى لاحْسِبُ عمرَ ذهبَ بتسعةِ أعشارِ العلم ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াককেঈন (বৈরূত ছাপা) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৭২।

২৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৭০-৭২।

২৪. (عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال هذه و هذه سَوَاءٌ يعنى الخنْصَرَ و الإبهامَ) (و قال شريح : وَيْحَكَ إنَّ السنةَ مَنَعَتِ القياسَ ، إتَّبِعْ و لا تَبْتَدِعْ) বুখারী-ফাৎহুলবারী সহ 'আঙ্গুলের রক্তমূল্য' অধ্যায়, কায়রোঃ খায়রিয়া প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৩১৯ হিঃ/১৯০১ খৃঃ) ১২শ খণ্ড পৃঃ ১৮২-৮৩; শাফেঈ, আর-রিসালাহ (বৈরূত ছাপা) পৃঃ ৪২২।

২৫. (والذى نفسُ عمرَ بِيَدِه ما قَبَضَ اللهُ روحَ نبيهِ صلى الله عليه وسلم و لا رَفَعَ الوَحْىَ عنه حتىٰ أغْنىٰ أُمَّتَهُ كُلَّهُمْ عن الرأى) আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩ হিঃ), কিতাবুল মীযান (দিল্লীঃ আকমালুল মাতাবে, ১২৮৬ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬২।

২৬. মালেক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনুমাজাহ, দারেমী-মিশকাত (বৈরূত ছাপা) 'ইদ্দত' অধ্যায়, হাদীছ সংখ্যা ৩৩৩২, ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৯৫; তিরমিযী (দিল্লীঃ মুজতাবায়ী প্রেস ১৩০৮ হিঃ) 'সদ্য বিধবা স্ত্রী কোথায় ইদ্দত পালন করবে' অধ্যায়, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৪-৪৫।

২৭. عن عليٍّ قال: لو كان الدينُ بالرأى لكان أسْفَلُ الخُفِّ أوْلىٰ بالمسحِ من أعْلاه و قد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ على ظاهرِ خُفَّيْه رواه أبو داؤد فى كتاب الطهارة আবুদাউদ, তাহকীকঃ মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ, হাদীছ সংখ্যা ১৬২ (বৈরূত ছাপা, মুদ্রণকাল বিহীন) ১ম খণ্ড পৃঃ ৪২; ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবুবকর ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ), 'ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন' ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৮; শাহ অলিউল্লাহ আহমাদ বিন আবদুর রহীম (১১১৪-১১৭৬ হিঃ), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রোঃ ১৩৫৫ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৭।

২৮. ইমাম ছালেহ বিন মুহাম্মাদ ফুল্লানী (১১৬৬-১২১৮/১৭৫২-১৮০৩ খৃঃ), ঈক্বাযু হিমাম (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৮/১৯৭৮ খৃঃ) পৃঃ ৮; ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনু আবী শায়বা (মৃঃ ২৩৫ হিঃ), 'কিতাবুল মুছান্নাফ' তাহকীকঃ আবদুল খালেক আফগানী (বোম্বাই-ভারতঃ দারুস সালাফিইয়াহ, মোমেনপুরা ৪০০০১১, ২য় সংস্করণ ১৩৯৯/১৯৭৯ খৃঃ) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৭২; ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন (বৈরূত ছাপা) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৮২-৮৩; এতদসংক্রান্ত রাসূলের হাদীছ ও ইমামদের বক্তব্য দ্রষ্টব্যঃ তিরমিযী 'নিকাহ' অধ্যায় (দিল্লীঃ মুজতাবায়ী প্রেস ১৩০৮ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৩৩।

২৯. বুখারী- ফাৎহুলবারীসহ 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অধ্যায় (মিসরঃ খায়রিয়া প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৩১৯/১৯০১ খৃঃ) ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৩৯-৪১; ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী ইয়ামানী শাওকানী (১১৭২-১২৫০/১৭৫৮-১৮৩৫ খৃঃ), নায়নুল আওত্বার শারহু মুনতাক্বাল আখবার (মিসরঃ মুছতফা বাবী হালবী প্রেস, মুদ্রণকালবিহীন) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২০৪; ঐ, (মাকতাবা কুল্লিয়াত আযহারিয়াহ ১৩৯৮/১৯৭৮) ৫ম খণ্ড পৃঃ ২৩৬-৪২।

৩০. (عن سالم قال كان ابن عمر .. قال أفرسولُ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم أحَقُّ أنْ تَتَّبِعُوْا سنتَهُ أم سنةَ عُمَرَ؟) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১), 'মুসনাদ' (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ২য় সংস্করণ, হাশিয়া 'কানযুল উম্মাল'সহ ১৩৯৮/১৯৭৮) ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৫; তিরমিযীর রেওয়ায়াতে এসেছে- ؛ أأمْرُ أبى يُتَّبَعُ أم أمْرُ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم জামি তিরমিযী, তাহকীকঃ মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, হাদীছ সংখ্যা ৮২৪, 'হজ্জ' অধ্যায় (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ, ১৪০৮/১৯৮৭) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৮৫-১৮৬।

৩১. (قال الشافعى: فتَرَكَ سالمٌ قولَ جَدِّهٖ لِرِوَايَتِها ، قال ابن عبد البر و ابن تيمية : هذا شأنُ كُلِّ مُسْلِمٍ لا كما يَصْنَعُ فرقةُ التقليد) ছালেহ ফুল্লানী, 'ঈক্বাযু হিমাম' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ১৩৯৮/১৯৭৮) পৃঃ ৯; ইবনুল কাইয়িম, 'ই'লামুল মুওয়াক্‌কেঈন' (বৈরুতঃ দারুল জীল, ১৯৭৩) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৮৪-৮৫।

৩২. ঈক্বাযু হিমাম পৃঃ ৬-৭; ই'লামুল মুওয়াককেঈন ২য় খণ্ড পৃঃ ২৮১; 'আর-রিসালাহ' পৃঃ ৪৪৮-৪৯; বায়হাক্বী, সুনানুল কুব্‌রা (বিস্তারিত ভাবে) ৫ম খণ্ড পৃঃ ৩২১-২২; তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন।-(দিল্লীঃ মুজতাবায়ী প্রেস ১৩০৮ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৪; হাফেয আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবদুলাহ আল-হাকেম নিশাপুরী (৩২১-৪০৫ হিঃ) হাদীছটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী 'ছহীহ' বলেছেন এবং হাফেয শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিঃ) তা সমর্থন করেছেন। -ঐ, মুস্তাদরাক (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, মুদ্রণকাল বিহীন) ২য় খণ্ড পৃঃ ১৫।

৩৩. (لا رأىَ لأحَدٍ مع سُنَّةٍ سَنَّهَا رسولُ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم) ইমাম মারওয়াযীর 'আস্‌-সুন্নাহ' ২৬ পৃষ্ঠার বরাতে ডঃ মুহাম্মাদ মুছতফা আযমী, দিরাসাত ফিল হাদীছিন নববী ওয়া তারীখু তাদভীনিহি পৃঃ ১৯; ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াককেঈন ২য় খণ্ড পৃঃ ২৮২।

৩৪. (قد تواتَرَ عن الصحابَةِ والتابعيْنَ أنَّهم كانوا إذا بَلَغَهُمُ الحديثُ يَعْمَلون بِهٖ من غير أن يُلَاحِظُوْا شَرْطًا) শাহ অলিউল্লাহ, 'আল ইনছাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ' সম্পাদনাঃ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ '৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকদের অবস্থা' শীর্ষক অধ্যায়, (বৈরুতঃ দারুন নাফাইস ১৩৯৭/১৯৭৭) পৃঃ ৭০; ইমাম ছালেহ ফুল্লানী (১১৬৬-১২১৮/১৭৫২-১৮০৩) এর সপক্ষে ছাহাবা ও তাবেঈন হ'তে ১২টি ঘটনা (ঈকাযু হিমাম পৃঃ ৬-৯) এবং মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (১৯০০-১৯৬০ খৃঃ) ১৭টি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।-ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি (ঢাকাঃ

১৯৬৩) পৃঃ ৩৯-৫৯।

৩৫. (يايها الذين امنوا اَطِيْعوا اللّهَ و اَطِيْعوا الرسولَ و أُولِى الأمْرِ منكم ، فإن تَنَازَعْتُمْ فى شئٍ فَرُدُّوْهُ إلى اللّه و الرسول إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ باللّه و اليوم الاخرِ، ذلك خَيْرٌ و أحْسَنُ تَأويلاً) = নিসা ৫৯ আয়াত।

৩৬. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (জন্মঃ আলবেনিয়া ১৯১৩ সাল, বর্তমানে বসবাস দামেস্কে), 'আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন বি-নাফ্‌সিহী ফিল আকাইদি ওয়াল আহকাম' (কুয়েতঃ দারুস সালাফিইয়াহ ১ম সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬ খৃঃ) পৃঃ ২৭; ইমাম শাফেঈ, 'আর-রিসালাহ' পৃঃ ৫৯৯।

৩৭. (إنَّ بعضَ الاحاديث الصحيحة لم يَبْلُغْ علماءَ التابعينَ وسُدَّ إليهم الفَتْوَى فاجْتَهَدُوْا بآرائِهم أواتَّبَعُوْا العُمُومات أو اقْتَدَوْا بمَنْ مَضَى من الصحابة فافتوْا حسب ذلك) حجة اللّه البالغة للدهلوى ١٤٧/١ শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 'ফকীহদের মধ্যকার মতভেদ সমূহের কারণ' শীর্ষক অধ্যায় (কায়রোঃ ১৩৫৫ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৭।

৩৮. (إنَّا نحن نَزَّلْنَا الذكْرَ و إنَّا له لَحَافِظُوْنَ) = হিজ্‌র ৯ আয়াত। (لا تُحَرِّكْ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به ، إنَّ علينا جَمْعَهُ وقُرْأنَهُ ، فاذا قَرَأْنَاهُ فاتَّبِعْ قُرْأنَهُ، ثم إنَّ علينا بَيَانَهُ) ক্বিয়ামাহ ১৬-১৯ আয়াত।

৩৯. মুহাম্মাদ আহমাদ আবু যুহরা, আল-মাযাহিবুল ইসলামিয়াহ (মিসরঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মুদ্রণকাল নেই) অধ্যায়ঃ (السلفيون)' শিরোনামঃ منهاج هؤلاء السلفيين পৃঃ ৩১৫-১৬; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ John P. Macgregor, MUSLIM INSTITUTIONS (Trans. from the French) London: George Allien and Unwin Ltd. 3rd Ed. 1961. P. 211.

২য় দফা মূলনীতিঃ তাক্বলীদে শাখ্‌ছীর অপনোদন

তাক্বলীদ 'ক্বালাদাহ' শব্দ হ'তে বুৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ রশি বা গলাবন্ধ। 'ক্বাল্লাদাল বাঈরা'- সে উটের গলায় রশি বেঁধেছে।[১] সেখান থেকে 'মুক্বাল্লিদ' যিনি কারো আনুগত্যের রশি নিজের গলায় বেঁধে নিয়েছেন। পারিভাষিক অর্থে 'নবী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির প্রদত্ত শারঈ সিদ্ধান্তকে বিনা দলীলে মেনে নেওয়ার নাম 'তাক্বলীদ' বা 'তাক্বলীদে শাখ্‌ছী।' পক্ষান্তরে দলীলের অনুসরণকে

বলা হয় 'ইত্তেবা'।[২] ইসলামী শরীয়ত মুসলিম উম্মাহ্‌কে ইত্তেবায়ে রাসূলের নির্দেশ দিয়েছে- তাক্বলীদে শাখ্‌ছীর নয়। কোন মানুষ যেহেতু ভুলের উর্ধে নয় এবং কেউ ভবিষ্যত মঙ্গলামঙ্গলের খবর রাখেন না, তাই মানবরচিত কোন মতবাদ-ই, সে মতবাদ ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যাই-ই হৌক না কেন, প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সেই মতবাদে পৃথিবীতে শান্তিও আসতে পারেনা। এজন্যই নবী ব্যতীত অন্যের তাক্বলীদ নিষিদ্ধ এবং নবীর ইত্তেবা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তাক্বলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য হ'ল এই যে, তাক্বলীদ হচ্ছে দলীল ছাড়াই রায়-এর অনুসরণ। পক্ষান্তরে ইত্তেবা হ'ল দলীল বা রেওয়ায়াতের অনুসরণ।

'তাক্বলীদ' একটি বহু প্রাচীন জাহেলী প্রথা। বিগত উম্মতগুলির অধঃপতনের মূলে তাক্বলীদ একটি সর্বাপেক্ষা ক্রিয়াশীল উপাদান ছিল। তারা তাদের নবীদের গত হওয়ার পরে উম্মতের বিদ্বান ও সাধু ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ করে এবং ভক্তির আতিশয্যে তাদেরকে রব্-এর আসন দিয়ে সম্মান প্রর্দশন করতে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন 'তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তাদের আলিম ও দরবেশগণকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করে... ।'[৩]

ইমাম রাযী (৫৪৪-৬০৬ হিঃ) বলেন যে, অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে উক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'আরবাব' অর্থ এটা নয় যে, ইহুদী-নাছারাগণ তাদেরকে বিশ্বচরাচরের 'রব' মনে করত। বরং এর অর্থ হল এই যে,তারা তাদের আদেশ ও নিষেধ সমূহের আনুগত্য করত। যেমন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে নাছারা বিদ্বান আদী বিন হাতিম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর দরবারে হাযির হ'লেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরায়ে তাওবাহ্ পড়ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে উপরোক্ত (তাওবাহ ৩১) আয়াতে পৌঁছে গেলেন। আদী বললেন 'আমরা তাদের ইবাদত করি না।' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জওয়াবে বললেন 'আল্লাহ যে সব বস্তু হালাল করেছেন তা কি তারা হারাম করত না? অতঃপর তোমরাও তাকে হারাম গণ্য করতে। এমনিভাবে আল্লাহ যেসব বস্তু হারাম করেছেন তা কি তারা হালাল করত না? অতঃপর তোমরাও তাকে হালাল গণ্য করতে। আদী বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুলাহ (ছাঃ) বললেন, সেটাইতো ওদের 'ইবাদত' হ'ল।'[৪] রবী' বলেন, "আমি আবুল 'আলিয়াহ্‌কে জিজ্ঞেস করলাম 'বনী ইস্রাঈলের মধ্যে 'রবূবিয়াত'

সৃষ্টির ব্যাপারটা কি ধরনের? তিনি বললেন যে, তারা কিতাবুল্লাহ্‌র মধ্যে তাদের আলেম ও সাধু ব্যক্তিদের কথার বিরোধী কিছু পেলে তা গ্রহণ করত না বরং আলেম ও দরবেশদের কথাই গ্রহণ করত।' ইমাম রাযী বলেন যে, আমার উস্তাদ বলেন 'আমি মুকাল্লিদ ফকীহদের একটি দলকে দেখেছি, যখন আমি তাদের সম্মুখে কোন বিষয়ে অনেকগুলি আয়াত পড়ি, যা তাদের মাযহাবের বিরোধী, তখন তারা তা কবুল করেনা, এমনকি সেদিকে দৃকপাতও করেনা। তারা আমার দিকে বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে এই সব আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের উপরে কিভাবে আমল করা যেতে পারে, অথচ আমাদের পূর্বসূরী বিদ্বানদের পক্ষ হ'তে এর বিরোধী বক্তব্য প্রচলিত আছে। যদি তুমি বিষয়টিকে যথার্থ ভাবে অনুধাবন কর, তবে দেখবে যে, এই রোগ দুনিয়াবাসীর শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত আছে।'

এই রবূবিয়াতের ব্যাপারে দ্বিতীয় কথা হ'ল জাহিল ও বিদ'আতীরা যখন তাদের গুরু ও মুরশিদের সম্মানে বাড়াবাড়ি করে এবং পরমাত্মার মধ্যে আত্মার অনুপ্রবেশ ও একাকার হয়ে যাওয়ার মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন তাদের গুরু দুনিয়াদার হ'লে তাদের মধ্যে এমন ধারনা সৃষ্টি করে দেয় যে, গুরু যা বলেন ও বিশ্বাস করেন, তাই-ই সঠিক ও যথার্থ। কখনো কখনো তারা তাদের মুরীদানকে তাদের উদ্দেশ্যে সিজদাও করতে বলে এবং এও বলে যে তোমরা সকলে অ,মার গোলাম। মুসলিম উম্মাহ্‌র অবস্থা যখন এই তখন বিগত উম্মতগুলির অবস্থা এমন হবে তাতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে?'

'মোটকথা তাদের মধ্যে যে 'রবূবিয়াত' সৃষ্টির কথা কুরআনে বলা হয়েছে, তার অর্থ (১) এই হ'তে পারে যে, তারা আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরুদ্ধে আলেম ও দরবেশদের হুকুমের তাবেদারী করত। অথবা (২) তারা বিভিন্ন কুফরী প্রথা কবুল করেছিল যাতে তারা খোদ আল্লাহ্‌র সঙ্গেই কুফরী করে। ফলে তা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যকে 'রব' গণ্য করার শামিল হয়ে যায়। অথবা তারা (৩ ও ৪) 'হুলূল ও ইত্তিহাদ' বা পরমাত্মার মধ্যে আত্মার অনুপ্রবেশও এক হয়ে যাওয়ার ধারণায় দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। .... বলা বাহুল্য এই চারটি বিষয়ের সবগুলিই মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে বিরাজমান।"[৫] 'ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐসব আলেমগণ তাদেরকে সিজদা করার জন্য বলতেন না বরং তারা তাদেরকে

গুনাহের নির্দেশ দিতেন লোকেরা তারই অনুসরণ করত। এজন্যই আল্লাহ্‌পাক ঐসব আলেমকে 'রব' হিসাবে অভিহিত করেছেন।'[৬]

অন্যত্র আল্লাহ্‌পাক বলেন, 'লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে তাঁর সমকক্ষ হিসাবে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে ভালবাসে আল্লাহ্‌কে ভালবাসার ন্যায়। অথচ যারা মুমিন তাদের ভালবাসা আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বাধিক দৃঢ়তর ....।'[৭]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (৫৪৪-৬০৬ হিঃ) বলেন, বিদ্বানগণের অধিকাংশ এখানে 'সমকক্ষগণ' (আন্‌দাদ) বলতে 'মূর্তিসমূহ' (আওছান) বুঝিয়েছেন। অন্য মতে এখানে 'সমকক্ষ' অর্থ নেতৃবৃন্দ যাদের তারা আনুগত্য করত। ফলে তারা নেতৃত্বের জোরে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করত। সুদ্দী বলেন যে, দ্বিতীয় মতের লোকেরা প্রথম মতের লোকেদের উপরে কয়েকটি কারণে জয়ী। প্রথমতঃ 'ইয়ুহিব্বূনাহুম' ক্রিয়ার মধ্যে 'হুম' (তাহাদের) সর্বনামটি বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীর দিকে সম্পর্কিত (অতএব তা মূর্তি হ'তে পারে না)। দ্বিতীয়তঃ এটি যুক্তি বহির্ভূত বিষয় যে, তারা মূর্তিগুলিকে আল্লাহ্‌কে ভালবাসার ন্যায় ভালবাসে। অথচ তারা ভাল করেই জানে যে, মূর্তিগুলি কারু কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। তৃতীয়তঃ এই আয়াতের পরেই আল্লাহ্‌পাক কেয়ামত দিবসের বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'যেদিন অনুসরণীয়গণ (গুরু বা ইমামগণ) তাদের অনুসারীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে এবং আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে..'[৮] এটা কেবলমাত্র ঐক্ষেত্রে সম্ভব যখন কোন মানুষকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ গণ্য করা হয় (অন্য কিছুকে নয়)। তাদের প্রতি ঐ সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়, যে সম্মান ও আনুগত্য আল্লাহ্‌কে প্রদর্শন করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য।'[৯]

অন্যত্র আল্লাহ্‌পাক বিগত উম্মতগণের আচরণ বর্ণনা করে বলেন-'যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর, তারা বলে যে বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের কাছ থেকে যা পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব।'[১০]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী বলেন, আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তারা তাঁর নাযিলকৃত প্রকাশ্য দলীল সমূহের অনুসরণ করে। কিন্তু তারা

বলে যে, 'আমরা ওসবের অনুসরণ করব না বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করব।' তারা যেন তাক্বলীদের মাধ্যমে দলীলকে প্রতিরোধ করছে।"

রাযী বলেন- 'যদি মুক্বাল্লিদ ব্যক্তিটিকে বলা হয় যে, কোন মানুষের প্রতি তাক্বলীদ সিদ্ধ হবার শর্ত হ'ল একথা জ্ঞাত হওয়া যে, ঐ ব্যক্তি হক-এর উপরে আছেন একথা তুমি স্বীকার কর কি-না? যদি স্বীকার কর তা'হলে জিজ্ঞেস করব তুমি কিভাবে জানলে যে লোকটি হক-এর উপরে আছেন? যদি তুমি অন্যের তাক্বলীদ করা দেখে তাক্বলীদ করে থাক, তা'হলে তো গতানুগতিক ব্যাপার হ'য়ে গেল। আর যদি তুমি তোমার জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করে থাক, তাহ'লে তো আর তাক্বলীদের দরকার নেই, তোমার জ্ঞানই যথেষ্ট। যদি তুমি বল যে, ঐ ব্যক্তি হকপন্থী কি-না তা জানা বা না জানার উপরে তাক্বলীদ নির্ভর করে না, তাহ'লে তো বলা হবে যে, ঐ ব্যক্তি বাতিলপন্থী হলেও তুমি তার তাক্বলীদকে সিদ্ধ করে নিলে। এমতাবস্থায় তুমি জানতে পার না তুমি হকপন্থী না বাতিলপন্থী। জেনে রাখা ভাল যে, পূর্বের আয়াতে[১১] 'শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করার' জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করার পরেই এই আয়াত বর্ণনা করে আল্লাহ পাক এ বিষয়ে ইংগিত দিয়েছেন যে, শয়তানী ধোকার অনুসরণ করা ও তাক্বলীদ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব এই আয়াতের মধ্যে মযবুত প্রমাণ নিহিত রয়েছে 'দলীলের অনুসরণের' এবং চিন্তা-গবেষণা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ও দলীলবিহীন কোন বিষয়ের দিকে নিজেকে সমর্পণ না করার ব্যাপারে।[১২]

সূরায়ে তাওবাহ্‌র পূর্বোক্ত ৩১ নং আয়াত-এর ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী (১১৭২-১২৫০ হিঃ) বলেন যে, 'ইহুদী ও নাছারাগণ তাদের আলেমদের আদেশ ও নিষেধাবলীর প্রতি এ'রূপ আনুগত্য প্রদর্শন করত, যেন তাদেরকে তারা 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে। কেননা তারা তাদের প্রতি এমন আনুগত্য দেখাত, যেমন আনুগত্য রব-এর প্রতি দেখানো কর্তব্য ছিল।' তিনি বলেন যে, এই আয়াতে জ্ঞানীদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র বাইরে কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ ও বিগত কোন মনীষীর বক্তব্যে প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে সাবধান করা হয়েছে। কেননা এই উম্মতের মাযহাবধারী কিছু ব্যক্তি তাদের অনুসরণীয় বিদ্বানের প্রতি- তার কথা আল্লাহ ও রাসূলের প্রদত্ত দলীল সমূহের বিরোধী

হলেও এমন অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকে, যেভাবে ইহুদী-নাছারাগণ তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে 'রব'-এর আসনে বসিয়েছিল। তারা তাদের ইবাদত করত না ঠিকই, কিন্তু তাদের বর্ণিত হালাল বা হারামকে তারা হালাল বা হারাম গণ্য করত। মুসলিম উম্মাহ্র মুকাল্লিদগণের অবস্থাও ঠিক ঐরূপ। ইহুদী-নাছারা মুকাল্লিদ ও মুসলিম মুকাল্লিদগণের পারস্পরিক সামঞ্জস্য ঠিক যেমন ডিমের সঙ্গে ডিমের, খেজুরের সঙ্গে খেজুরের ও পানির সঙ্গে পানির। হে আল্লাহ্র বান্দারা! হে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসারীরা! তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কিতাব ও সুন্নাহ্কে একপাশে রেখে দিলে, আর নিজেদেরকে সমর্পণ করলে তোমাদেরই মত মানুষের নিকটে? .... অথচ তোমাদের ও তাদের সর্বাগ্রগণ্য ইমাম হ'লেন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ (ছাঃ)। ছেড়ে দাও মুহাম্মাদের কথার সম্মুখে অন্যের সকল কথা। তাঁর দ্বীনের মধ্যে ত্রুটি সন্ধান করে সেই-ই, যে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে।'[১৩]

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭/ ১৮৩২-১৮৯০ খৃঃ) রাযী ও শাওকানীর ন্যায় মন্তব্য করেছেন। আল্লামা সৈয়দ রশীদ রিযা (১২৮২-১৩৫৪/১৮৬৫-১৯৩৫ খৃঃ) উক্ত আয়াতের তাফসীরে ছাহাবী আদী বিন হাতিম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখ করার পর বলেন যে, 'এর মধ্যে বর্তমান যুগের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।'[১৪] এমনিভাবে সূরায়ে বাক্বারাহ্র ১৭০ আয়াতের তাফসীরে তিনি ইমাম আবদুল্লাহ বিন ওমর বায়যাভী (মৃঃ ৬৮৫ হিঃ ১২৭৮ খৃঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন এভাবে- 'এই আয়াতে তাক্বলীদ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল নিহিত রয়েছে ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যারা জ্ঞান ও ইজতিহাদের ক্ষমতা রাখেন। এক্ষণে দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে দলীল অবহিত হয়ে নবী ও মুজতাহিদগণের অনুসরণ প্রকৃতপক্ষে তাক্বলীদ নয় বরং তা হ'ল ইত্তেবা ঐ বিষয় সমূহের যা আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন।' অতঃপর সৈয়দ রশীদ রিযা বলেন, 'আমি বলি যে, বিশ্বস্ত আলিমকে অনুসরণ করা হবে কেবলমাত্র ঐ বিষয়ে যা তাঁর নিকটে পৌঁছে গেছে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ হ'তে। কিন্তু তার ইজতিহাদের অনুসরণ প্রকৃত অর্থে সেটা হ'ল তাঁর ধারণার অনুসরণ, আল্লাহ্র নাযিলকৃত সত্যের অনুসরণ নয়।'[১৫]

সূরায়ে মায়েদাহ্র ৩ নং আয়াতে দ্বীনের পূর্ণতা বিষয়ক আলোচনায় তিনি

তাক্বলীদ কিভাবে ইল্মকে ধ্বংস করেছে এবং তাক্বলীদপন্থী আলিমগণ কিভাবে কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করেছেন, তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাষায় ব্যক্ত করে বলেন- 'দ্বীনের পথে মানুষকে আহবান ও সেজন্য তাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দুঃখ ও নির্যাতনে ছবর করার ব্যাপারে বিগত পথ অনুসরণের ব্যাপারটি (فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ আন'আম ৯০) দ্বারা তাক্বলীদ প্রমাণ করার কোন সুযোগ নেই। কেননা এর প্রকৃত তাৎপর্য স্বচ্ছ সকালের চাইতেও স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। কিন্তু মুকাল্লিদ গ্রন্থকারদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে মন্দ রীতির উপরে চলেছেন। তাঁরা তাঁদের অনুসরণীয় পূর্বসূরী বিদ্বানদের বক্তব্যগুলিকে সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত ভেবে নিয়েছেন। অতঃপর সেগুলিকে প্রমাণ করা ও তার বিরোধী বক্তব্যগুলিকে বাতিল করার জন্য দলীলের সন্ধানে রত রয়েছেন- চাই তা বিভিন্ন হীলাবাযীর মাধ্যমে হৌক কিংবা তাবীল ও সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে হৌক। ফলে বাস্তবে দলীল হয় তাদের অনুসারী কিন্তু তাঁরা দলীলের অনুসারী হন না। অতঃপর যেসব দলীল (কুরআন ও হাদীছ) তাদের রচিত বা গৃহীত উছূল-এর অন্ততঃ বাহ্যিক ভাবেও অনুকূলে হয়, তারা তা গ্রহণ করেন। কিন্তু যা তার বিরোধী হয় ও তাকে বাতিল প্রতিপন্ন করে, সেদিক থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেন ও পরিত্যাগ করেন অথবা ঐ দলীলের 'তাহরীফ' বা শাব্দিক পরিবর্তন করেন কিংবা 'তাবীল' বা দূরতম ব্যাখ্যা করেন। অথচ এটা জানা কথা যে, আল্লাহ পাক আমাদের দ্বীনের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন ও আমাদের নবীর মাধ্যমে তাঁর নবীদের সিলসিলা সমাপ্ত করেছেন এবং তাঁকে প্রেরণ করেছেন বিশ্ববাসীর জন্য, যেখানে অন্য নবীগণ ছিলেন স্ব স্ব কওমের জন্য। অন্য সকল শরীয়ত ছিল সাময়িক কিন্তু আমাদের রাসূলের শরীয়ত হল চিরস্থায়ী। এর তাৎপর্য বিদ্বানগণের নিকট খুবই স্পষ্ট। এখানে মাযহাবসমূহের মধ্যে ও লোকদের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদের কোন স্থান নেই। মানবীয় উন্নতির জন্যই আমাদের দ্বীনকে পূর্ণ ও চিরস্থায়ী করা হয়েছে, যার উপরে আমল করা ওয়াজিব। এটা আমাদের অন্যতম প্রধান মূলনীতি, যেটা বুঝতে অনেক বিদ্বান সন্দেহে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন।'[১৬]

মোটকথা বিগত উম্মতগুলির বিভ্রান্ত লোকেরা এবং প্রাক-ইসলামী জাহেলী যুগের লোকেরা বাপ-দাদা ও দেশাচারের তাক্বলীদ করত। ইসলাম আসার পরে

জগদ্বাসীকে নতুন সমাজব্যবস্থার রূপরেখা দেওয়া হ'ল এবং ইতিপূর্বে প্রচলিত সকল ধর্ম মানসূখ ও যাবতীয় অনৈসলামী রীতিনীতি ও দেশাচার বাতিল ঘোষণা করা হ'ল। বিগত যুগের লোকদের আচরিত তাক্বলীদী প্রথার বিরুদ্ধে কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য সাবধানবাণী উচ্চারিত হ'ল। একই সাথে ইসলাম তার অনুসারীদের নিয়ে তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক একটি সম্পূর্ণ নতুন সমাজ গঠনে ব্রতী হ'ল। খিলাফতে রাশিদাহ্‌র ত্রিশ বছরে নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় রূপ জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করল। কিন্তু ছাহাবা ও তাবেঈ যুগের শেষে রাসূলের ভাষায় নিন্দিত ও বিভ্রান্তির যুগে প্রাক-ইসলামী যুগের ফেলে আসা তাক্বলীদী জাহেলিয়াত পুনরায় মুসলিম সমাজে ইমাম ও গুরুভক্তির নামে অনুপ্রবেশ করল, যা ক্রমে উৎকট রূপ ধারণ ক'রে কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করল।

দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর পরে প্রচলিত তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর বিভিন্ন মুজতাহিদ ইমামের নামে তাক্বলীদভিত্তিক বিভিন্ন মাযহাবী দলের প্রচলন ঘটে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে।[১৭] কিন্তু এসব তাক্বলীদী মাযহাব সমূহ উদ্ভবের পূর্বে মুসলিম উম্মাহ তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয়সমূহ কিভাবে সমাধান করতেন, এ প্রসঙ্গে শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ) ও ইমাম গায্‌যালীর (৪৫০-৫০৫ হিঃ) বক্তব্যের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল। যেমন- শাহ ছাহেব বলেন, দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর পর হ'তে কিছু কিছু 'তাখরীজ' শুরু হয়। তবে ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান কোন একজন নির্দিষ্ট বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপর সংঘবদ্ধ ছিল না। সে সময়ে আলিমও ছিলেন সাধারণ লোকও ছিলেন। সাধারণ লোকেরা তাদের পিতামাতা বা স্থানীয় আলিমের নিকট হ'তে ধর্মীয় বিষয়াদি জেনে নিতেন। যে কোন আলিম হৌক তাঁর কাছ থেকে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করতেন। এ ব্যাপারে কারু মাযহাব যাচাই করা হ'ত না। আলেমদের অবস্থা ছিল এই যে, যদি তিনি 'আহলুল হাদীছ' হ'তেন, তাহ'লে কোন মাসআলা এলে তিনি হাদীছ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতেন। যখন কোন ছহীহ হাদীছ বা 'আছারে ছাহাবা' পেয়ে যেতেন তারা তার উপরে আমল করতেন, দেখতেন না কতজন বিদ্বান ঐ হাদীছের উপরে আমল করেছেন বা ছেড়েছেন। যখন কোন ব্যাপারে

তাদের নিকটে দলীল স্পষ্ট হ'ত না, তখন বিগত কোন বিদ্বানের ফৎওয়া তালাশ করা হ'ত। যদি সেখানে দুই ধরনের উক্তি পাওয়া যেত, তাহ'লে অধিকতর নির্ভরযোগ্য উক্তিটি গ্রহণ করা হ'ত, চাই উক্তিটি মদীনাবাসী বিদ্বানের হৌক বা কূফাবাসীর। আর যদি উক্ত আলেম 'আহলুত্ তাখরীজ' (আহলুর রায়) হ'তেন, তাহ'লে তিনি স্বীয় মাযহাবের (উছূলের) মধ্যে ইজতিহাদ করতেন। .... এরপর থেকে ফিক্হ বিষয়ে লোকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়। লোকেরা ডাইনে-বামে চলে যায়।'[১৮]

এই সময়কার অবস্থা সম্পর্কে ইমাম গায্যালী বলেন- 'খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হবার পরে ইসলামী খেলাফত এমন লোকদের কুক্ষিগত হ'য়ে পড়ে, যারা শারঈ আহকাম ও ফৎওয়া বিষয়ে ছিলেন অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ। ফলে তারা সকল ব্যাপারে ফকীহদের উপরে নির্ভরশীল হ'য়ে পড়েন। অবশ্য তখনও ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এমন কিছু আলেম বিদ্যমান ছিলেন, যারা প্রথম যুগের ন্যায় স্বচ্ছ দ্বীনের উপরে মযবুত ছিলেন। যখন তাদেরকে (কোন সরকারী পদে) তলব করা হ'ত, তাঁরা পালিয়ে যেতেন বা এড়িয়ে যেতেন। সে যুগের লোকেরা যখন আলেমদের এই ইয্যত দেখ্ল, তখন তারা ইল্ম শিখতে লাগল সম্মান ও প্রতিপত্তি হাছিলের মাধ্যম হিসাবে। ফলে ফকীহগণ যারা এতদিন আহূত হ'তেন তারা এখন আহবানকারী হ'য়ে গেলেন। এড়িয়ে যাওয়ার কারণে যারা এতদিন সম্মানিত ছিলেন, প্রার্থী হওয়ার কারণে তাঁরা শাসকদের নিকটে মর্যাদাহীন শ্রেণীতে পরিণত হ'লেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম অনেকেই ছিলেন, যাঁদেরকে আল্লাহ পাক (স্বীয় ইল্মের উপরে দৃঢ় থাকার) তাওফীক দান করেছিলেন। ইতিপূর্বেই মুসলিম পণ্ডিতগণের কেউ কেউ কালামশাস্ত্রের উপরে গ্রন্থ রচনা শুরু করেছিলেন। সেখানে বহু কুট তর্কের অবতারণা করা হয়েছিল, যা কিছু কিছু নেতৃবৃন্দ ও শাসকের মনোযোগ আকর্ষণ করল এবং তাঁরা হানাফী ও শাফেঈ ফিক্হের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী হ'লেন। ফলে বিদ্বানগণ কালামশাস্ত্র এবং মালেক, সুফিয়ান ছওরী, আহমাদ বিন হাম্বলের বিষয় ছেড়ে দিয়ে হানাফী ও শাফেঈ ফিক্হের মধ্যকার বিতর্কিত বিষয়সমূহের দিকে এগিয়ে যান এবং উক্ত দুই মাযহাবের যুক্তিসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রতিযোগিতায় বহু ঝগড়া ও অসংখ্য বই-পুস্তিকাদি প্রণয়ন শুরু

করেন। এইভাবে স্ব স্ব মাযহাবের পক্ষে শরীয়তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাৎপর্য সমূহ উদ্ধার করাকেই তারা তাদের মৌল উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য করেন। এই অবস্থা এখনও চলছে। আমরা জানি না ভবিষ্যতের লিখন কি আছে!'

ইমাম গায্‌যালীর উপরোক্ত আলোচনা উদ্ধৃত করার পর শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) বলেন, 'ফকীহ্‌দের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের কারণে লোকেরা যে কোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করেই নিশ্চিন্ত হ'তে চেষ্টা করে এবং তাক্বলীদ তাদের অন্তরে এমনভাবে আসন করে বসে, যেমনভাবে পিঁপড়া অলক্ষ্যে দেহে ঢুকে কামড়ে পড়ে থাকে অথচ লোকেরা বুঝতে পারে না।'[১৯]

ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ যাহাবী তুর্কমানী দামেস্কী (৬৭৩-৭৪৮ হিঃ) হাদীছের হাফেযগণের নবম স্তরের বর্ণনায় ইমাম দাউদ বিন আলী ইসফাহানী যাহেরী (২০০-২৭০ হিঃ) ও ইমাম আবু দাউদ (২০২-২৭৫ হিঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিছগণের মৃত্যুর পরবর্তী তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষের দিকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- 'এই সময়ে 'আহ্‌লুর রায়' ফকীহ্‌দের নেতৃস্থানীয় অনেক আলেম, মু'তাযিলা, শী'আ ও কালাম শাস্ত্রবিদদের স্তম্ভবিশেষ বহু পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন, যারা যুক্তিবাদের উপরে ভিত্তি করে চলতেন এবং নবীর হাদীছকে কঠিনভাবে আঁকড়ে থাকার সালাফে ছালেহীনের তরীকা এড়িয়ে চলতেন। এই সময় ফকীহ্‌দের মধ্যে তাক্বলীদ আত্মপ্রকাশ করে ও ইজতিহাদের অবক্ষয় শুরু হয়।'

ইতিপূর্বে তিনি অষ্টম স্তরের বর্ণনায় বলেন, 'মুহাদ্দিছগণ একে একে মৃত্যুবরণ করতে থাকেন। (যারা বেঁচে ছিলেন) তাঁরা মর্যাদাহীন গণ্য হন। লোকেরা ইল্‌মে হাদীছ শিক্ষার্থীদেরকে ঠাট্টা করতে থাকে। হাদীছ ও সুন্নাহ্‌র শত্রুরা তাঁদেরকে বিদ্রুপ করতে থাকে। যুগের আলেমগণ অধিকাংশই ব্যবহারিক প্রশাখাগত বিষয়সমূহে বিনা তাহকীকে তাক্বলীদের উপরে জমে থাকেন। না বুঝে-সুঝে তারা হিকমত ও কালামশাস্ত্রের বুদ্ধিবাজিতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। ফলে মুছীবত ব্যাপক হয়ে পড়ে, স্বেচ্ছাচারিতা দৃঢ়তা লাভ করে। জনসমাজ থেকে ইল্‌মে হাদীছ উঠে যাওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।'[২০]

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী তাঁর প্রণীত বিভিন্ন গ্রন্থে তাক্বলীদ সম্পর্কে বিস্তারিত

আলোচনা করেছেন এবং সর্বত্র তিনি অন্ধ তাক্বলীদের (تقليد جامد) কঠোর সমালোচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন- (হে পাঠক) বর্তমান সময়ে তুমি বিশ্বের প্রায় সকল অঞ্চলে (মুসলিম) জনসাধারণের মধ্যে দেখবে যে তারা বিগত কোন বিদ্বানের মাযহাবের অনুসরণ করে থাকে এবং তারা মনে করে যে, মাত্র একটি মাসআলাতেও যদি তার অনুসরণীয় বিদ্বানের তাকলীদ হ'তে সে বেরিয়ে যায়, তাহ'লে হয়তবা সে মুসলিম মিল্লাত থেকেই খারিজ হয়ে যাবে। ঐ বিদ্বান যেন একজন নবী, যাকে তার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তার অনুসরণ তার উপরে ফরয করা হয়েছে। অথচ চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার কোন মুসলমান কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না।'[২১]

তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে এটা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফরী হবে যদি উম্মতের কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে- যার ভুল ও শুদ্ধ হওয়ার আশংকা রয়েছে- কেউ এই আকীদা পোষণ করে যে, আল্লাহ পাক আমার উপরে ঐ ব্যক্তির অনুকরণ অপরিহার্য করেছেন এবং ঐ ব্যক্তি আমার উপরে যা ওয়াজিব করেন তাই-ই ওয়াজিব। কেননা হক শরীয়ত ঐ ব্যক্তির বহু পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্বানগণ (হাফেযগণ) তা সংরক্ষণ করেছেন, রাবীগণ তা বর্ণনা করেছেন, ফকীহগণ তার উপরে হুকুমসমূহ নির্দেশ করেছেন। অবশ্য বিদ্বানগণ আলেমদের তাক্বলীদের উপরে এই অর্থে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে তাঁরা হ'লেন নবী (ছাঃ) হ'তে প্রাপ্ত শরীয়তের বর্ণনাকারী মাত্র। তাঁরা ইল্‌ম শিখেছেন অন্যেরা শিখেনি। ইল্‌ম হাছিলেই তাঁরা মাশগুল থাকেন অন্যেরা নয়। একারণেই লোকেরা আলিমদের তাক্বলীদ করে থাকে। কিন্তু যদি কোন হাদীছ ছহীহ প্রমাণিত হয় এবং মুহাদ্দিছগণ তার বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য প্রদান করেন ও লোকেরা তার উপরে আমল করে থাকেন ও বিষয়টি যদি পরিষ্কার হয়ে গিয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি সেই হাদীছের উপরে আমল না করেন এই অজুহাতে যে তার অনুসরণীয় ইমাম বা আলিম তাকে বলেননি, তাহ'লে সেটা হবে এক দূরতম বিভ্রান্তি।'[২২] তিনি বলেন- 'কোন ইমামের মুকাল্লিদদের নিকটে কোন মাসআলায় যদি রাসূলের (ছাঃ) কোন হাদীছ পৌঁছে যায়, যা তার ইমামের কথার বিরোধী এবং তার ধারণা যদি জোরালো হয় যে হাদীছটি ছহীহ, তাহ'লে অন্যের অজুহাতে রাসূলের (ছাঃ) হাদীছকে পরিত্যাগ

করার ব্যাপারে তার কোন কথা কাজে আসবে না। এটা কোন মুসলমানের শান নয়। যদি কেউ করে তবে তার মুনাফিক হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে।'[২৩]

মুজতাহিদের তাক্বলীদকে শাহ ছাহেব ওয়াজিব ও হারাম দু'ভাগে ভাগ করেছেন। ১- ওয়াজিব হ'ল রেওয়ায়াতের অনুসরণ করা। এর ব্যাখ্যা এই যে, কিতাব ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে আনকোরা ব্যক্তি, যিনি এসব অনুসন্ধান ও সমাধান বের করতে অক্ষম, তার দায়িত্ব হ'ল কোন বিদ্বানকে জিজ্ঞেস করা যে এই মাসআলায় রাসূলুলাহ (ছাঃ)-এর হুকুম কি? যখন উক্ত বিদ্বান তাঁকে খবর দিবেন তখন তিনি তা অনুসরণ করবেন। তাই সে খবর প্রকাশ্য দলীল থেকে গৃহীত হৌক বা তার সদৃশ বিষয়ের উপরে কিয়াস করে হৌক। সবকিছুই রাসূলুলাহ (ছাঃ)-এর রেওয়ায়াতের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে মর্মগতভাবে। এই ধরনের তাক্বলীদের (বরং ইত্তেবার) উপর যুগ যুগ ধরে উম্মতের ঐক্যমত চলে আসছে। বিগত উম্মতগুলির শরীয়তেও এ ব্যাপারে ঐক্যমত ছিল। এই তাক্বলীদের অর্থ হ'ল ঐ ব্যক্তি মুজতাহিদের কথার উপরে আমল করবে এই শর্তে যে, বিষয়টি সুন্নাতের অনুকূলে হবে। অতঃপর লোকটি সর্বদা তার সাধ্যমত সুন্নাতের সন্ধানে থাকবে। যখনই তার নিকটে মুজতাহিদের কথার বরখেলাফ কোন হাদীছ প্রকাশিত হবে, তখনই সে হাদীছ গ্রহণ করবে (এবং উক্ত কথা ছেড়ে দেবে)। এদিকেই ইশারা করেছেন ইমামগণ। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ আল-মুত্ত্বালেবী আল-মাক্কী আল-মিসরী (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, সেটাই আমার মাযহাব।' 'যখন তোমরা আমার কোন কথা নবীর হাদীছের বিপরীত পাবে, তখনই হাদীছ অনুযায়ী আমল করবে এবং আমার কথা দেওয়ালে ছুঁড়ে মারবে।' ইমাম মালিক বিন আনাস আবু আবদুল্লাহ আল-মাদানী, 'ইমামু দারিল হিজ্‌রাহ' (৯৩-১৭৯ হিঃ) বলেন 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি নেই যার সকল কথা গ্রহণীয় বা বর্জনীয়।' ইমাম আবু হানীফা নু'মান বিন ছাবিত আত্-তায়মী আল-কূফী, 'ইমামু আহ্লির রায়' (৮০-১৫০ হিঃ) বলেন 'যে ব্যক্তি আমার দলীল সম্পর্কে অবহিত নয়, তার জন্য আমার কথা অনুযায়ী ফৎওয়া দেওয়া উচিত নয়।' ইমাম শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩ হিঃ) এখানে 'হারাম' শব্দ উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল আবু আবদুল্লাহ আশ-শায়বানী আল-বাগদাদী, 'ইমামু আহ্লিল হাদীছ' (১৬৪-২৪১

হিঃ) বলেন 'তুমি আমার তাক্বলীদ করনা, মালেক, নাখ্ঈ, আওযাঈ বা অন্য কারও তাক্বলীদ করনা। বরং সমাধান গ্রহণ কর কিতাব ও সুন্নাহ থেকে, যেখান থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন।'

২. তাক্বলীদ হারাম ঐ সময়ে যখন কোন মুজতাহিদ ফকীহ সম্পর্কে কোন ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করেন যে, তিনি জ্ঞানের এমন উচ্চতম শিখরে পৌঁছে গিয়েছেন যেখানে তাঁর আর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে উক্ত মুজতাহিদের বক্তব্যবিরোধী কোন স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ তার নিকটে পৌঁছে গেলেও তিনি ঐ ফৎওয়া পরিত্যাগ করেন না বরং ধারণা করেন যে, তিনি যাঁর তাক্বলীদ করেন, তিনিই তাঁর ফৎওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দায়িত্বশীল থাকবেন। এই মুকাল্লিদ ব্যক্তিটি যাবতীয় গুণহীন বেওকুফের মত। .... এই আকীদা সম্পূর্ণ বাতিল এবং এই কথা সম্পূর্ণ বাজে। এর পক্ষে শরীয়ত বা যুক্তির কোন দলীল নেই। বিগত যুগে কেউ এমন করেননি। ঐ ব্যক্তি ত্রুটির সম্ভাবনাযুক্ত অন্য একজন ব্যক্তিকে অথবা তার ফৎওয়াকে আমলের জন্য ত্রুটিহীন- মাছূম এবং তার দায়িত্ব হ'ল কেবল তাক্বলীদ করা- এই মিথ্যা ধারণা পোষণ করেছে। এই ধরনের লোকদের উদ্দেশ্যেই তো আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন ঐ আয়াত (যুখরুফ ২২, ২৩) যাতে নবীদের জওয়াবে মক্কার মুশরিক ও বিগত উম্মতগুলির নেতৃবৃন্দ ও সমাজপতিদের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে- 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একটি তরীকার উপরে পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পথে চলব।' বিগত উম্মতগুলির মধ্যে (আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহে) 'তাহরীফ' (পরিবর্তন) কি এভাবেই হয়নি?'[২৪]

অতঃপর তাক্বলীদ সম্পর্কে শাহ অলিউল্লাহ তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে বলেন 'আমার মতে ফৎওয়া প্রার্থীর নিকট সকল মাযহাবের ফৎওয়া সমূহ বর্ণনা করার কোন দরকার নেই। বরং তার মধ্যে কোন একটি ফৎওয়া বর্ণনা করাই যথেষ্ট। কেননা মুকাল্লিদ অনির্দিষ্টভাবে যেকোন মুজতাহিদের ইচ্ছা তাক্বলীদ করবে।'

তিনি বলেন, 'ফকীহগণ কোন মুকাল্লিদের এক মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবে গমনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে যে কথা বলেছেন[২৫] ..... তারা যদি এর দ্বারা নির্দিষ্ট একটি মাযহাবভুক্ত হ'য়ে থাকার বাধ্যবাধকতাকেই ধারণা করে থাকেন,

তবে (বলা হবে যে) মুখে বলে বা নিয়তের মাধ্যমে একজন মুজতাহিদের অনুসরণকে অপরিহার্য গণ্য করার কোন শারঈ দলীল নেই। বরং দলীল ও মুজতাহিদের কথার উপরে আমলের প্রয়োজন কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে (সকল বিষয়ে নয়)। যেমন আল্লাহ বলেন 'জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জানো।'[২৬] জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কেবল তখনই হয় যখন কোন ঘটনা সংঘটিত হয়। আর তার প্রেক্ষিতে যদি মুজতাহিদের নিকটে কোন কথা প্রমাণিত হয়, তখন তার উপরে আমল ওয়াজিব হয়।'[২৭]

উপরের আলোচনায় শাহ ছাহেব যে তাক্বলীদকে ওয়াজিব বলেছেন, তা মূলতঃ তাক্বলীদ নয় বরং ইত্তেবা। কারণ 'তাক্বলীদ' হ'ল মুজতাহিদের রায়-এর অনুসরণ এবং 'ইত্তেবা' হল দলীলের অনুসরণ। অতএব মুজতাহিদের মুখ থেকে শোনা দলীলের অনুসরণকে তাক্বলীদ না বলে ইত্তেবা বলাই যুক্তিযুক্ত। অন্যদিকে মুজতাহিদের রায় ভিত্তিক সিদ্ধান্ত যদি দলীল পাওয়ার সঙ্গে শর্তযুক্ত থাকে, তাহ'লে সেটাকেও পুরোপুরি তাক্বলীদ বলা চলেনা। কেননা বিনা দলীলে মুজতাহিদের রায়-এর অনুসরণকে শাহ ছাহেব পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবুও এখানে 'তাক্বলীদ' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন সম্ভবতঃ এর ব্যাপক প্রচলনের দিকে খেয়াল করে। নইলে 'তাক্বলীদ' শব্দটি মূলতঃ মানুষের মর্যাদার বরখেলাফ। কুরআনে আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ অর্থে তাক্বলীদ নয় বরং 'ইত্তেবা ও ইতা'আত' শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। সারা কুরআনে 'ক্বালায়েদ' শব্দ মাত্র দু'জায়গায়[২৮] এসেছে হজ্জের সময়ে কুরবানীর জন্য 'গলাবন্ধ' পরিহিত পশু অর্থে। হাদীছেও অনুসরণ অর্থে কোথাও তাক্বলীদ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। 'তাক্বলীদ' পরিভাষাটি মূলতঃ পরবর্তীযুগের প্রচলন।

ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, হাদীছ ও ছাহাবাদের ইজমা থেকে দলীল নিয়ে তাক্বলীদ হারাম হওয়া এবং বিনা দলীলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্যের কথা গ্রহণ করা কারু জন্য হালাল নয় বলে যে মন্তব্য করেছেন, তার ব্যাখ্যায় শাহ অলিউল্লাহ বলেন, এই হুকুম ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (১) যার মধ্যে একটিমাত্র মাসআলায় হ'লেও ইজতিহাদ করার কিছুমাত্র যোগ্যতা রয়েছে (২) যার নিকটে রাসূলের

'হুকুমরহিত' (মানসূখ) নয় এমন আদেশ নিষেধ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে (৩) ঐ মূর্খ (عامى) ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে ফকীহদের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে কোন একজনের তাক্বলীদ করে এবং মনে করে যে ঐ ফকীহ থেকে ভুল সিদ্ধান্ত বের হওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ, তিনি যা বলেছেন তা অবশ্যই সঠিক এবং সে তার অন্তরে একথা লুকিয়ে রাখে যে, কোন অবস্থায়ই তাক্বলীদ পরিত্যাগ করা হবে না যদিও তার মাযহাবের খেলাফ দলীল প্রকাশিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ ঐ হানাফী ব্যক্তি যিনি কোন শাফেঈ বিদ্বানের নিকটে ফৎওয়া চাওয়া জায়েয মনে করেন না বা কোন শাফেঈ ইমামের পিছনে ছালাত আদায় সিদ্ধ মনে করেন না। অনুরূপভাবে ঐ শাফেঈ মুকাল্লিদ যিনি কোন হানাফী ফকীহ সম্পর্কে একইরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন। কেননা এগুলি ছাহাবা, তাবেঈন ও প্রথমযুগের তরীকা বিরোধী আচরণ।' তবে ইবনে হযম (রহঃ) -এর কথা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় (অর্থাৎ কেবলমাত্র ঐক্ষেত্রে তাক্বলীদ সিদ্ধ হবে) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের কৃত হালাল-হারাম ব্যতীত অন্যকিছু কবুল করেননা। কিন্তু সে বিষয়ে তার কোন ইল্‌ম নেই ও আপাত বিরোধী হাদীছ সমূহের সামঞ্জস্যবিধান ও হাদীছ থেকে সমাধান বের করার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ। এমতাবস্থায় তিনি একজন হেদায়াতপ্রাপ্ত আলিমের কথার অনুসরণ করেন এই ধারণায় যে তিনি সঠিক কথাই বলবেন এবং রাসূলের প্রকাশ্য সুন্নাতের অনুসরণে ফৎওয়া দিবেন। কিন্তু পরে যদি তিনি তাঁর ধারণার খেলাফ কিছু পান তাহ'লে কোনরূপ ঝগড়া বা যিদ না ক'রে সঙ্গে সঙ্গে ঐ মুহূর্তেই (হাদীছের দিকে) ফিরে যান।'[২৯] বলা চলে যে, এটা কখনই তাক্বলীদ নয় বরং অজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্বান ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করার চিরন্তন রীতিরই নামান্তর। একেই বলে 'রুজূ এলাল কিতাবে ওয়াস্ সুন্নাহ' অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া। একেই উছূলী বিদ্বানদের ভাষায় বলা হয়েছে (إذا ورد الأثر بطل النظر) 'যখনই হাদীছ পাওয়া যাবে, তখনই ইজতিহাদ বাতিল হবে।'[৩০] তাই পরক্ষণেই শাহ ছাহেব বলেন- 'যদি মা'ছূম রাসূলের পক্ষ হ'তে- যাঁর আনুগত্য আমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেছেন- মুকাল্লিদের মাযহাবের খেলাফ ছহীহ সনদ সূত্রে কোন হাদীছ পৌঁছে যায় এবং আমরা তা পরিত্যাগ করি ও উক্ত মুজতাহিদের কল্পনার

অনুসরণ করি, তাহ'লে আমাদের চেয়ে বড় যালিম আর কে হবে এবং সেদিন আমাদের জন্য কি ওযর থাকবে যেদিন আমরা বিশ্বপ্রভুর সম্মুখে দন্ডায়মান হব?'[৩১] হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কোন বিদ্বানের তাক্বলীদের উপরে যিদ করাকে শাহ ছাহেব 'ইহুদী স্বভাব' বলে ভীষণভাবে কটাক্ষ করে বলেন 'যদি তুমি ইহুদীদের নমুনা দেখতে চাও তাহ'লে দুষ্ট আলেমদের দিকে তাকাও, যারা দুনিয়ার সন্ধানী। যারা বিগত কোন ব্যক্তির তাক্বলীদে অভ্যস্ত। যারা কিতাব ও সুন্নাতের দলীলসমূহ হ'তে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কোন একজন আলিমের সুক্ষ্মবাদিতা, কঠোরতা ও সু-ধারণাযুক্ত সমাধান (ইস্তিহ্সান) -কে কঠিনভাবে আকড়ে ধরে। যারা মাছূম রাসূলের কালাম হ'তে বে-পরওয়া হয়ে বিভিন্ন জাল হাদীছ ও বাতিল ব্যাখ্যাসমূহ (তাবীল) - কে অনুসরণীয় হিসাবে গ্রহণ করে। তামাশা কেমন তারা যেন খোদ ইহুদী।'[৩২]

শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১ খৃঃ) অনির্দিষ্টভাবে যে কোন আলিমের তাক্বলীদ সম্পর্কে হাফেয ইরাকী প্রমুখাৎ ইজমার উদ্ধৃতি দেওয়ার পরে বলেন 'উদাহরণ স্বরূপ হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করা মূলতঃ তাক্বলীদে শাখ্ছী নয়। কেননা হানাফী মাযহাব বলতে আবু হানীফা, তাঁর দুই শিষ্য এবং যুফার প্রমুখ মুজতাহিদে মুৎলাকগণের ফৎওয়ার সমষ্টি বুঝায়। আবু হানীফার দিকে আবু ইউসুফের সম্বন্ধ, যেমন শাফেঈর দিকে আহমাদ বিন হাম্বলের সম্বন্ধ। যা বিভিন্ন মৌলিক ও প্রশাখাগত বিষয়ে তাদের পারস্পরিক মতবিরোধ হ'তে পরিস্ফূট হ'য়ে গেছে। তবুও সবগুলোকে মিলিতভাবে হানাফী মাযহাব কথাটা একটি ইচ্ছাধীন বিষয়। অমনিভাবে আমরা চার মযহাবকে এক গণ্য করতে পারি। তখন আর একে অপরের অনুসরণ করা কোন দোষের বিষয় হবে না, যেমন হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের অবস্থা (আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ বা যুফারের অনুসারী হ'লেও সকলকে 'হানাফী' বলায় তাদের উপরে যেমন কোন দোষ বর্তে না)। আমি বুঝতে পারিনা অনুসরণীয় ইমামের কথার বরখেলাফ রাসূলের স্পষ্ট হাদীছ সমূহের দিকে ফিরে যাওয়ার যাবতীয় ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একজন নির্দিষ্ট বিদ্বানের তাক্বলীদকে অপরিহার্য গণ্য করা সিদ্ধ হ'তে পারে? ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও যদি মুকাল্লিদ ব্যক্তিটি তার ইমামের কথা পরিত্যাগ না করে, তাহ'লে (বুঝতে হবে যে) তার মধ্যে শিরকের দোষ মিশ্রিত

আছে। যেমন আদী বিন হাতিম (রাঃ) প্রমুখাৎ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ....। উক্ত হাদীছে আলিমদের কথা অনুযায়ী ইহুদী মুকাল্লিদগণের কোন বিষয়কে হালাল বা হারাম গণ্য করা দ্বারা বুঝা যায় যে (১) তাদের এই তাক্বলীদ কোন আকীদাগত বিষয়ে ছিল না বরং তা ছিল আমলগত বিষয়ে (অতএব যদি কেউ বলেন যে, ব্যবহারিক বিষয়ে আমাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও আকীদাগত দিক দিয়ে আমরা সবাই এক- তাহ'লে তা গ্রাহ্য হবে না। কারণ আকীদা ও আমলে সর্ব বিষয়েই কেবলমাত্র রাসূলের আনুগত্য বহাল করতে হবে)। (২) এখানে গোটা তাক্বলীদকেই নিষিদ্ধ করা হয়নি। তাহ'লে তো প্রত্যেক মূর্খকেই মুজতাহিদ হ'তে হয় (৩) অমনিভাবে নিষিদ্ধ তাক্বলীদ দ্বারা তাদের আলিমদের কথার মোকাবেলায় দলীল সমূহকে ইন্‌কার বা প্রত্যাখ্যান করা বুঝানো হয়নি। তাহ'লে তো তারা ('কাফের' হ'ত) 'নাছারা' হিসাবেই গণ্য হ'ত না। বরং এর অর্থ হ'ল শারঈ দলীল সমূহকে তাদের আলেমদের কথার অনুকূলে তারা তাবীল বা অপব্যাখ্যা করেছিল। এ থেকে বুঝা গেল যে, একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথার অনুসরণ করা এই অর্থে যে, তার বিপরীত হাদীছ বা কুরআনের দলীলসমূহ প্রমাণিত হ'লেও তা ঐ ব্যক্তির কথার অনুকূলে ব্যাখ্যা করা হবে- তাহ'লে তার মধ্যে নাছারাদের স্বভাব ও শিরকের অংশবিশেষ মিশ্রিত হয়ে যাবে।'[৩৩]

শাহ্ অলিউল্লাহ্ বলেন 'আমি বলতে চাই ঐসব মুসলমানকে যারা নিজেদেরকে 'ফক্বীহ' হিসাবে অভিহিত করেছেন, যারা তাক্বলীদের ব্যাপারে দারুন কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। যখন তাদের নিকটে রাসূলের কোন ছহীহ হাদীছ পৌঁছে যায়, যে হাদীছের দিকে বিগতযুগের ফকীহদের একটি দল অনুগমন করেছেন, অথচ তাদেরকে ঐ হাদীছটি মানতে বাধা দেয় শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির তাক্বলীদ, যার দিকে তিনি সম্পর্কিত হচ্ছেন। এবং বলতে চাই ঐ সকল 'যাহেরী' বিদ্বানদেরকে যারা প্রত্যাখ্যান করেন ঐ সকল ফকীহগণকে যারা ইল্‌মের বাহক ও দ্বীনদারগণের ইমাম- তারা দু'জনই অজ্ঞতা, অদূরদর্শিতা ও ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। প্রকৃত 'হক' হ'ল এ দু'য়ের মাঝখানে।'[৩৪]

তিনি আরও বলেন- 'লোকেরা ধারণা করে যে, প্রচলিত মাযহাব সমূহের বাইরে যাওয়া শরীয়তের অনুসরণ ও আল্লাহ্‌র হুকুমের আনুগত্য করা হ'তে বের হয়ে যাওয়ার শামিল। তারা আরও মনে করে যে,ঐ মাযহাবগুলির বাইরে কোন উত্তম

ও মযবূত তরীকা নেই। অতএব ওগুলোর কোন একটি থেকে বেরিয়ে যাওয়া দ্বীনের প্রতি আনুগত্যের বন্ধন হ'তে মুক্ত হওয়ার শামিল। সাবধান হওয়া উচিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ সব ব্যক্তিকে ভীষণভাবে তিরস্কার করেছেন। এছাড়া আরও বহু সন্দেহ-সংশয় লোকদের অন্তরে উপস্থিত হয়ে থাকে।[৩৫]

তিনি বলেন 'নিছক মুকাল্লিদ কোন ব্যক্তি কখনই সত্যে উপনীত হ'তে পারেনা। বরং পৃথিবীর অধিকাংশ ফাসাদ ও বিশৃংখলা তাক্বলীদের উৎস হ'তেই পয়দা হয়েছে।'[৩৬] তাক্বলীদপন্থী আলেমদেরকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেন, এদের সমস্ত ইল্‌মের পুঁজি হ'ল হেদায়া, শরহে বেকায়া প্রভৃতির মধ্যে। এরা আসল বস্তু কিভাবে বুঝবে?[৩৭]

জীবন সায়াহ্নে স্বীয় সন্তানাদি ও ভক্তদেরকে উদ্দেশ্য করে যে সংক্ষিপ্ত 'অছিয়ত' তিনি করে যান, সেখানে বলেন- 'উম্মতের জন্য তার ইজতিহাদী বিষয়সমূহ কিতাব ও সুন্নাহ্‌র সম্মুখে পেশ করা ভিন্ন উপায় থাকতে পারে না। তারা ঐসব সমস্যাক্লিষ্ট ফকীহদের প্রতি কর্ণপাত করতে পারেনা, যারা কোন আলেমের তাক্বলীদ করেছেন এবং সুন্নাতের ইত্তেবা হতে বিরত রয়েছেন। (আমি অছিয়ত করছি যে) ওদের কথা শুনবে না, ওদের দিকে তাকিয়েও দেখবে না। ওদের থেকে দূরে থেকেই আল্লাহ্‌র নৈকট্য সন্ধান করবে।'[৩৮]

পরবর্তীকালে শাহ অলিউল্লাহ্‌র শিক্ষকতার মসনদে আসীন তাঁর আদর্শের বাস্তব নমুনা ভারতবর্ষে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের ইল্‌মী মহীরুহ শায়খুল ইসলাম সাইয়িদ নাযীর হুসাইন বিহারী দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) তাক্বলীদকে চারভাগে ভাগ করেছেন।-

১- ওয়াজিবঃ জাহিল ব্যক্তির জন্য। যে আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে যে কোন বিদ্বানের নিকট হ'তে প্রয়োজন মাফিক মাসআলা জেনে নিবে। তবে এই তাক্বলীদ হবে হাদীছের অনুকূলে হওয়ার শর্তসাপেক্ষে। যদি পরে দেখা যায় যে ফৎওয়াটি ছিল হাদীছ বিরোধী, তবে তখনই সেটা পরিত্যাগ করে তার জন্য হাদীছের অনুসরণ অবশ্যকর্তব্য হবে। ২- মুবাহঃ কোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করা এই নিয়তে যে, এই তাক্বলীদ কোন শারঈ বিষয় নয়। অন্য মাযহাবের হাদীছ সম্মত কোন মাসআলা ইনকার করবে না। বরং নিজেও

কখনও কখনও তার উপরে আমল করবে। ৩- হারামঃ ওয়াজিব মনে করে কোন একটি মাযহাবকে নির্দিষ্টভাবে তাক্বলীদ করা। ৪- শিরকঃ অজ্ঞতার কারণে কোন একজন মুজতাহিদের কথা অনুযায়ী আমল করা। কিন্তু পরে ছহীহ ও গায়র মানসূখ হাদীছ পাওয়া গেলেও তা প্রত্যাখ্যান না করা অথবা তাহরীফ ও তাবীল করে যে কোন ভাবেই হৌক হাদীছকে ঐ মুজতাহিদের কথার অনুকূলে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু কোন অবস্থাতেই অনুসরণীয় বিদ্বানের কথাকে পরিত্যাগ না করা।[৩৯]

শায়খুল ইসলামের উপরোক্ত বিভাগ মূলতঃ শাহ অলিউল্লাহ কৃত বিভাগ-এরই প্রতিধ্বনি। মুকাল্লিদগণের অধিকাংশই তৃতীয় অথবা চতুর্থ স্তরের অনুসারী।

অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ) তাক্বলীদের আরও দুঃখজনক বাণীচিত্র অংকন করে বলেন- 'আব্বাসী শাসনকালে মৌলিক ও প্রশাখাগত বিষয়গুলির পার্থক্য দৃঢ় রূপ ধারণ করে। হানাফী, শাফেঈ ও মালেকীগণ স্ব স্ব মাযহাবের উপরে গ্রন্থ রচনা করেন। মৌলিক বিষয়ে শী'আ, জাহ্‌মিয়া ও মু'তাযিলাগণ পরস্পর হ'তে উল্লেখযোগ্য ভাবে পৃথক হয়ে যায়। প্রত্যেকে নিজ নিজ মাযহাবের উপরেই খুশী ছিল। উমাইয়া শাসনকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজেকে হানাফী ইত্যাদি বলত না। বরং প্রত্যেকে দলীলসমূ: কে স্ব স্ব অনুসরণীয় ইমামদের মাযহাবের অনুকূলে ব্যাখ্যা করত। আব্বাসী শাসনামলে এসে প্রত্যেকে নিজের নিজের জন্য এক একটি নাম সাব্যস্ত করে নিল। কেউ নিজেকে হানাফী বল্ল কেউ শাফেঈ। ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজ নিজ ইমামের ব্যাখ্যা না দেখ্‌ত, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআন ও হাদীছের দলীল অনুযায়ী কোন ফায়ছালা দিত না। এভাবে যেসব মতভেদ কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলি এখন স্থায়ী রূপ ধারণ করল। যদিও আব্বাসী শাসনকাল তার প্রথম, মধ্য ও শেষযুগে আপোষে বিবদমান ছিল। তথাপি এই সময়ের পুরোটাই কাটে বিভিন্ন মাযহাবের প্রতিষ্ঠা, ফেকহী শাখা-প্রশাখা নির্গমন ও মাসআলাসমূহ বের করার মধ্য দিয়ে। ... এরপর যখন আরবী (কুরায়শী) শাসন শেষ হ'য়ে যায় এবং (আব্বাসী খেলাফত ধ্বংসের ফলে ৬৫৬ হিজরীর পরে) মুসলমানগণ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন যার যেটুকু মাযহাব স্মরণ ছিল সেটুকুকেই মূল হিসাবে গণ্য করে নেয়। ফলে যে মাযহাব

প্রথমে কিয়াসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল, এক্ষণে তাই-ই মূল হিসাবে দৃঢ় হ'য়ে গেল। এখন লোকদের বিদ্যা হ'ল একটি অনুমানের উপরে আরেকটি অনুমান করা ও একটি প্রশাখার উপরে কিয়াস করে আরেকটি প্রশাখা বের করা। আজমীদের (অনারব) এই শাসন বিলকুল মজূসীদের (অগ্নি উপাসকদের) শাসনের ন্যায়। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, এরা ছালাত আদায় করে ও কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে। আমরা এক্ষণে সেই পঞ্চম পরিবর্তনের যুগে জন্মলাভ করেছি। জানিনা এরপরে আল্লাহ্র ইচ্ছা কি আছে!!'[৪০]

সোয়া দুইশত বৎসর পূর্বে শাহ ছাহেবের এই মন্তব্য বর্তমান মুসলিম সমাজের তাক্বলীদ-ঊষর মাযহাবী পরিবেশে আরও বাস্তবতার দাবী রাখে। যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানগণ বিভিন্ন মাযহাবী নামে পরিচিত এবং পিতামাতার আচরিত মাযহাবের বাইরে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে কুরআন-হাদীছ অনুসরণের হিম্মত বিদ্বান মূর্খ কারুর পক্ষেই সম্ভব হয়না এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব ইমাম ও মাযহাবী ফকীহগণকে (মুখে স্বীকার না করলেও) বাস্তবে অভ্রান্ত ব্যক্তিত্বের আসনে বসিয়ে তাদের অন্ধ তাক্বলীদের মধ্যেই ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত।

অথচ যেসকল বিদ্বানের নামে মাযহাবসমূহ সৃষ্টি হয়েছে, তাঁদের কেউই ৮০ হিজরীর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেননি। যেমন আবু হানীফা নু'মান বিন ছাবিত কূফী (৮০-১৫০ হিঃ), মালিক বিন আনাস মাদানী (৯৩-১৭৯), মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেঈ মাক্কী (১৫০-২০৪), আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল বাগদাদী (১৬৪-২৪১), রবী'আতুর রায় মাদানী (মৃঃ ১৩৬ হিঃ), মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান ইবনু আবী লায়লা আনছারী মাদানী (মৃঃ ১৪৮ হিঃ), আবদুর রহমান বিন আমর আওযাঈ সিন্ধী কূফী (৮৮-১৫৭), সুফিয়ান বিন সাঈদ ছওরী কূফী (৯৭-১৬১), লাইছ বিন সা'আদ মিসরী (৯৪-১৭৫), ইসহাক্ব বিন রাহ্ওয়ে নিশাপুরী (১৬৬-২৩৮), দাউদ বিন আলী ইসফাহানী যাহেরী (২০০-২৭০), আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী বাগদাদী (২২৪-৩১০), ইমাম তাক্বিউদ্দীন আহমাদ বিন আবদুল হালীম ইবনু তায়মিয়াহ হাররানী দামেস্কী (৬৬১-৭২৮) প্রমুখ বিদ্বানমন্ডলী। এঁদের মধ্যে অগ্রবর্তী ইমাম আবু হানীফার জন্ম ৮০ হিজরীতে। অথচ ইসলামের স্বর্ণযুগ অতিবাহিত হয়েছে এঁদের পূর্বেই এবং

উপরোক্ত ইমামগণসহ আহলেসুন্নাত-এর সকল বিদ্বানই কুরআন ও হাদীছের বিপরীতে তাঁদের তাক্বলীদ করতে সকলকে কঠোরভাবে নিষেধ করে গেছেন। নবম শতকের ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ওয়াযীরুল ইয়ামানী (মৃঃ ৮৪০ হিঃ) মৃত ব্যক্তিদের তাক্বলীদ হারামের বিষয়ে বিদ্বানগণের 'ইজমা' বা ঐক্যমত উদ্ধৃত করেছেন।'[৪১] অমনিভাবে 'কোন মুজতাহিদ শারঈ কোন বিষয়ে স্পষ্ট দলীল না পাওয়ার কারণে নিজের পক্ষ হ'তে কোন রায় পেশ করলেও করতে পারেন। এটা তাঁর জন্য বিশেষ অনুমতি রয়েছে। কিন্তু অন্যদের জন্য দলীল ব্যতীত উক্ত রায়-এর অনুসরণ সিদ্ধ নয়। এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের ইজমা রয়েছে।'[৪২] ওমর ফারূক (রাঃ) যখন কোন বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে ফৎওয়া দিতেন, তখন বলে দিতেন- 'এটি ওমরের রায়। যদি এটা সঠিক হয়, তাহ'লে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে, আর যদি ভুল হয় তাহ'লে ওমরের পক্ষ হ'তে।'[৪৩] আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলতেন- 'যদি আমার রায় সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে, আর যদি ভুল হয় তাহ'লে আমার পক্ষ হ'তে ও শয়তানের পক্ষ হ'তে।'[৪৪] আবু হানীফা (রহঃ) ফৎওয়া দেওয়ার সময় বলে দিতেন যে, এটি নু'মান বিন ছাবিতের রায়। আমাদের সাধ্যপক্ষে এটিই উত্তম মনে হয়েছে। এর চেয়ে উত্তম পেলে সেটিই সঠিকতর বলে গণ্য হবে।'[৪৫]

মোল্লা আলী ক্বারী (মৃঃ ১০১৪/১৬০৫ খৃঃ) বলেন- 'এটা জানা কথা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহপাক কাউকে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ বা হাম্বলী হওয়ার জন্য বাধ্য করেননি। বরং বাধ্য করেছেন সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার জন্য যদি তিনি আলিম হন। আর যদি জাহিল হন তবে (অনির্দিষ্টভাবে) যে কোন আলিমের অনুসরণ করবেন।'[৪৬] শাহ অলিউল্লাহও অনুরূপ কথা বলেছেন।[৪৭]

জানা না জানা বিষয়টি আপেক্ষিক ব্যাপার। দু'জন বিজ্ঞ আলিমকেও দেখা যাবে যে, একই সময়ে একটি বিষয় একজনের জানা আছে, অন্যজনের নেই। ছাহাবায়ে কেরাম ও ইমামদের মধ্যে এরূপ নযীর যথেষ্ট রয়েছে। যেমন (১) একদা ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০) স্বীয় প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২)-কে বলেন 'তুমি আমার পক্ষ হ'তে কোন মাসআলা বর্ণনা করনা। আল্লাহ্র কসম আমি জানিনা আমি নিজ সিদ্ধান্তে সঠিক না বেঠিক' (২) একবার তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন- 'তোমাদের ধ্বংস হৌক তোমরা এইসব

কিতাবগুলিতে আমার উপরে কত মিথ্যা আরোপ করেছ, যা আমি বলিনি।' (৩) তিনি আরও বলেন- 'সাবধান হে ইয়াকূব (আবু ইউসুফ)! আমার নিকট থেকে যা-ই শুনো তাই-ই লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজকে যে রায় দেই, কালকে তা পরিত্যাগ করি, কাল যে রায় দেই, পরশু তা প্রত্যাহার করি।'[৪৮] ইমামের এই হুঁশিয়ারীর ফলস্বরূপ দেখা যায় যে, তাঁর শিষ্যগণ তাঁদের উস্তাদের সকল ফৎওয়া অন্ধের মত সমর্থন করেননি। বরং ইমাম গায্যালীর (৪৫০-৫০৫ হিঃ) হিসাব মতে ইমামের প্রধান দুই শিষ্য আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ তাঁদের উস্তাদের দুই তৃতীয়াংশ ফৎওয়ার বিরোধিতা করেছেন।[৪৯] শুধু ব্যবহারিক বিষয়েই নয় বরং উছূলে ফিক্হ বা ফেক্হী মূলনীতিতেও উক্ত শিষ্যদ্বয় ইমাম আবু হানীফার বিরোধিতা করেছেন।[৫০] ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ফিক্হের উপরে কোন কিতাব সংকলন করে যাননি। যদি 'ফিক্হে আকবর' ও 'মুসনাদে আবু হানীফা'- কে তাঁর কিতাব বলে ধরেও নেওয়া হয়, তাহ'লে বলা হবে যে, প্রথমোক্ত ছোট পুস্তকটি আক্বায়েদের উপরে লিখিত এবং শেষোক্তটি হাদীছের সংক্ষিপ্ত সংকলন। অমনিভাবে 'মুওয়াত্ত্বা' নামক প্রসিদ্ধ হাদীছ-সংকলন ব্যতীত ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯)-এর অন্য কোন গ্রন্থ নেই। ইবনু ওয়াহাব (إبن وهب) বলেন যে, অধিকাংশ প্রশ্নের জওয়াবে আমি তাঁকে 'জানিনা' বলতে শুনতাম।

যত মাসআলায় তিনি 'জানিনা' বলেছেন, এগুলো যদি আমরা লিখে রাখতাম, তাহ'লে বহু ভলিউম পূর্ণ হ'য়ে যেত।'[৫১] তাঁর শিষ্য ইবনুল ক্বাসিম-এর বর্ণনা সম্বলিত 'মুদাউওয়ানা' গ্রন্থে ইমাম মালেকের নামে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার সবই মালেক-এর নয়, বরং কিছু কিছু 'মুওয়াত্ত্বা'-এর চরম বিরোধী। অন্যদিকে শাফেঈ (১৫০-২০৪) প্রণীত অমরগ্রন্থ 'আর-রিসালাহ' ও 'কিতাবুল উম্ম' উছূলে ফিক্হ ও ফিক্হুল হাদীছের উপরে লিখিত। তাঁর 'মুসনাদ' ও হাদীছের সংকলন বৈ কিছুই নয়। নিজের রচনা সম্পর্কে শাফেঈ-র মন্তব্য তাঁর শিষ্য ইমাম আবু ইয়াকূব ইউসুফ বিন ইয়াহ্ইয়া বুওয়াইত্বী (بويطى) মিসরী (মৃঃ ২৩১ হিঃ) উদ্ধৃত করেছেন যে, 'আমি এই কিতাবগুলি রচনা করেছি। নিশ্চয়ই তার মধ্যে অনেক ভুল পাওয়া যাবে।[৫২] কেননা আল্লাহ বলেছেন- 'যদি এই কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট থেকে আস্ত, তাহ'লে তোমরা সেখানে বহু ইখতিলাফ দেখতে পেতে'[৫৩] - (শাফেঈ বলেন) অতএব তোমরা আমার এই কিতাবগুলিতে কুরআন

ও সুন্নাহবিরোধী কিছু পেলে আমি তা থেকে (কুরআন ও হাদীছের দিকে) প্রত্যাবর্তন করছি।'[৫৪] তিনি বলতেন 'আমার কথার বিপরীত ছহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে আমি আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে সেদিকে প্রত্যাবর্তন করছি।'[৫৫] স্বীয় জগদ্বিখ্যাত ছাত্র ইমাম আহমাদকে তিনি বলতেন- 'তুমি আমার চাইতে হাদীছ ও রিজাল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। অতএব ছহীহ হাদীছ পেলেই আমাকে অবহিত করবে, যাতে আমি সেদিকে ফিরে যেতে পারি।.... ।[৫৬]

অন্যতম প্রসিদ্ধ ছাত্র আবু ইব্রাহীম ইসমাঈল বিন ইয়াহ্ইয়া মুযানী মিসরী (১৭৫-২৬৪)-কে তিনি বলেন, 'হে আবু ইব্রাহীম! তুমি আমার সকল কথার তাক্বলীদ করবেনা। তুমিও চিন্তা-ভাবনা করবে। কারণ এটা হ'ল দ্বীন।'[৫৭] ইবনুল কাইয়িম বলেন- (তাক্বলীদের ভয়ে) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১) ফিক্হ বিষয়ে কোন কিতাব লেখেননি।[৫৮] বরং তিনি বেঁচে আছেন তাঁর ত্রিশ হাযার হাদীছের অতুলনীয় সংকলন 'মুসনাদে আহমাদ' -এর মধ্যে।

উপরের আলোচনায় বুঝা যায় যে, অনুসরণীয় চার ইমামের মধ্যে শাফেঈ (রহঃ) ব্যতীত বাকী তিনজনের কেউই ফেক্হী বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করে যাননি। এক্ষণে তাঁদের মাযহাব বলে গৃহীত মাসআলা সমূহের সংকলন হিসাবে যে সকল বিরাট বিরাট ফিক্হগ্রন্থ পরবর্তীকালে রচিত ও প্রচারিত হয়েছে, পরীক্ষায় দেখা যাবে যে, সেগুলিতে সংকলিত অধিকাংশ মাসআলা কিংবা সবগুলোই তাঁদের অনুসারী পরবর্তী বিদ্বানগণের রচিত। আবুল ফাৎহ মুহাম্মাদ বিন আবুল হাসান ইবনু দাক্বীকুল ঈদ (মৃঃ ৭০২ হিঃ) চার মাযহাবে প্রচলিত ছহীহ হাদীছ বিরোধী ফৎওয়া সমূহের একটি বিরাট সংকলন তৈরী করেছিলেন। যার ভূমিকাতে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, 'এই মাসআলাগুলি চার ইমামের নামে চার মাযহাবে চালু থাকলেও এগুলোকে তাঁদের দিকে সম্পর্কিত করা হারাম।' এগুলির মাধ্যমে তাঁদের উপরে মিথ্যারোপ করা হয়েছে মাত্র।'[৫৯] আল্লামা তাফ্তাযানী, শা'রাবী, অলিউল্লাহ দেহলভী, মোল্লা মুঈন সিন্ধী, আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী প্রমুখ বিদ্বানগণ সকলেই একথা স্বীকার করেছেন।[৬০]

উপরের আলোচনায় একথা প্রতীয়মান হয় যে, চার ইমাম-এর অধিকাংশ পরস্পরের ছাত্র হ'লেও তাঁরা যেমন কেউ কারু মুকাল্লিদ ছিলেন না। তেমনি তাঁদের শিষ্যরা স্ব স্ব উস্তাদের দিকে সম্পর্কিত হ'লেও তাঁরা তাঁদের মুকাল্লিদ

ছিলেন না। বরং তাঁরা স্ব স্ব উস্তাদের শিক্ষা অনুযায়ী সাধ্যপক্ষে হাদীছ থেকে মাসআলা সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। এর জন্য স্বীয় উস্তাদের ফৎওয়ার বিরোধিতা করতেও তাঁরা দ্বিধা করেননি। যদিও পরবর্তী যুগের ফক্বীহ নামধারী মুক্বাল্লিদ বিদ্বানগণ তাদের পূর্বসূরী বিদ্বানদের রীতি এবং ইমামদের মহান শিক্ষা লংঘন করে তাক্বলীদকেই নির্বিঘ্ন চলার পথ হিসাবে বেছে নিয়েছেন। ফলে কুরআন-হাদীছ গবেষণার দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। নবোদ্ভূত সমস্যাবলীর যুগোপযোগী সমাধান পেতে ব্যর্থ হ'য়ে আধুনিক যুগমানস ক্রমেই ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ এখন আর কেবল বিগত কোন মুজতাহিদের নির্দিষ্ট উছূলের তাক্বলীদ করেই ক্ষান্ত নয়, বরং তারা এখন সরাসরি ইসলাম বিরোধী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন ও মতবাদ সমূহের অন্ধ তাক্বলীদ করছে। ফলে একজন মুসলমান ধর্মীয় মতবাদে হানাফী, রাজনীতিতে গণতন্ত্রী ও অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রী ইত্যাদি হয়ে পড়েছে। অথচ ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও আয়েম্মায়ে দ্বীন সকলেরই শিক্ষা ছিল একটাই- সকল বিষয়ে সকল অবস্থায় ব্যক্তির তাক্বলীদ ছেড়ে দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাও এবং সরাসরি সেখান থেকেই সমাধান গ্রহণ কর।

আহলেহাদীছ আন্দোলন চিরকালই তাক্বলীদে শাখ্ছীর বিরোধিতা করে এসেছে এবং সকল যুগে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাওয়া ও সকল অবস্থায় তার সার্বভৌম অধিকারকে বাস্তবে নিশ্চিত করতে চেয়েছে, যা পূর্বোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হ'য়ে গেছে।

টীকাসমূহ-৬

১. আল-মুনজিদ প্রভৃতি।

২. মোল্লা আলী ক্বারী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) বলেন, (التقليد هو قبولُ قولِ الغيرِ بلا دليلٍ فكأنهُ لقبولِهِ جَعَلَهُ قَلادةً فى عُنُقِهِ ، و فى تعريف "مسلم الثبوت" مع فواتح الرحموت (ص ٦٢٤) هو العَمَلُ بقولِ الغيرِ من غيرِ حُجَّةٍ – و فى القول المفيد للشوكانى : التقليد هو الرجوعُ إلى قولٍ لا حُجَّةَ لِقَائِلِهِ عليه، والإتباعُ ما ثَبَتَ عليه الحجَّةُ – فالإتباعُ فى الدينِ مَسُوْغٌ و التقليدُ ممنوعٌ (ص ١٤) وكذا فى جامع بيان العلم و فضله لابن عبد البر ج ٢ ص ١١٧)

ইমাম শাওকানী (১১৭২-১২৫০/১৭৫৮-১৮৩৫ খৃঃ), 'আল-ক্বাওলুল মুফীদ' (মিসরী ছাপা ১৩৪০ হিঃ) পৃঃ ১৪; আবদুল আলী, ফাওয়াতেহুর রাহমূত শরহ্ মুসাল্লামুছ ছুবূত (নওলকিশোর, লাক্ষ্ণৌঃ ১২৯৫/১৮৭৮ খৃঃ) পৃঃ ৬২৪।

(قال الشوكانى.. اما التقليد فأصلهُ في اللغة ماخوذٌ من القَلادَة التي يقلد غيره بها و منه تقليد الهدى فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذى قلد فيه المجتهد كالقلادة فى عنق من قلده و فى الاصطلاح هو العمل بقول الغير من غير حجة فَيَخْرُجُ العملُ بقول الإجماع و رجوعُ العامى إلى المفتى (শাওকানী, 'ইরশাদুল ফুহূল' (মিসরঃ মুছতফা বাবী হালবী প্রেস, ১৩৫৬/১৯৩৭ খৃঃ) 'তাক্বলীদ' অধ্যায় পৃঃ ২৬৫।

৩. সূরায়ে তাওবাহ ৩১ (إتَّخَذُوْا أحْبَارَهُمْ و رُهْبَانَهم أرْبَابًا مِنْ دونِ اللهِ و المسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وما أُمِرُوْا إلا لِيَعْبُدُوْا إلهًا واحداً لَآ إلهَ إلا هو سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - عن عَدِى بن حاتم قال أتيتُ النبيَّ صلى اللّٰه عليه و سلم و فى عُنُقِىْ صُلَيْبٌ من ذَهَبٍ فقال يا عُدِى إطْرَحْ عنك هذا الوَثَنَ و سَمِعْتُه يَقْرَءُ فى سورة براءة " إتَّخَذُوْا أحْبَارَهُمْ ..." قال أمَا إنهم لم يكونوا يعبدونهم و لكنهم كانوا إذا أحَلُّوْا لهم شيئًا إسْتَحَلُّوْهُ ، وإذاحَرَّمُوْا عليهم شيئا حَرَّمُوْهُ - رواه الترمذى و قد حَسَّنَهُ الالبانى ، أنظر صحيح الترمذى رقم ٢٤٧١ فى كتاب التفسير-

৪. (الاكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الارباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلِهَةُ العالَمِ بل المراد انهم أطاعوهم فى أوَامِرِهم و نَوَاهِيْهِم - نُقِلَ عن عَدِى بن حاتم كان نصرانيًا فانتهَى إلىٰ رسولِ اللّٰه صلى الله عليه و سلم وهو يقرأسورة براءة فوصل الى هذه الاية فقلتُ لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ فقال :ألَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ ما اَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَه و يُحِلُّوْنَ ما حَرَّمَ اللهُ فتَسْتَحِلُّوْنَه قلت بلى قال فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ ، رواه الامام الرازى فى تفسيره والامام ابن جرير الطبرى فى تفسيره واللفظ لحديث أبى كُرَيْبٍ) ইমাম মুহাম্মাদ বিন ওমর আল-ফখর বিনুল খতীব রাযী (৫৪৪-৬০৬ হিঃ) 'তাফসীরুল কাবীর (মিসরঃ বাহিয়া প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৩৫৭/১৯৩৮ ১৬শ খণ্ড পৃঃ ২৭; ইমাম আবু ওমর ইউসুফ ইবনু আবদিল বার্র মাগরেবী (৩৬৮- ৪৬৩ হিঃ) 'জামেউ বায়ানিল ইল্ম' (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তারিখবিহীন) ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৯; ইবনু জারীর, তাফসীর (বৈরুতঃ ১৪০১/১৯৮৭) ১০ম খন্ড পৃঃ ৮০-৮১।

৫. ইমাম রাযী, 'তাফসীরুল কাবীর' ১৬শ খণ্ড পৃঃ ৩৭-৩৮

৬. و قال ابن عباس لم يَأمروهم أن يَسْجُدوا لهم و لكن أمروهم بمعصية اللّٰهِ فأطاعوهم فسمَّاهم اللّٰهُ بذلك أربابًا- جامع البيان فى تفسير القرأن لابن جرير ، بيروت ١٩٨٧ ج ١٠ ص ٨٠-٨١) আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (২২৪-৩১০), 'জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ১৪০৭/১৯৮৭) তাওবাহ ৩১ নং

আয়াতের তাফসীর, ১০ম খণ্ড পৃঃ ৮০-৮১;

৭. সূরায়ে বাক্বারাহ ১৬৫।

৮. প্রাগুক্ত, ১৬৬।

৯. ইমাম রাযী, তাফসীরুল কাবীর, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৩০।

১০. বাক্বারাহ ১৭০, লুক্বমান ২১, যুখরুফ ২২-২৩।

১১. বাক্বারাহ ১৬৮-১৭০।

১২. তাফসীরুল কাবীর, ৫ম খণ্ড পৃঃ ৭।

১৩. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী ইয়ামানী ছান'আনী (১১৭২-১২৫০ হিঃ/১৭৭৮-১৮৩৪), তাফসীর 'ফাৎহুল ক্বাদীর' (মিসরী ছাপাঃ মুছতফা বাবী হালবী প্রেস, ১৩৫০/১৯৩২) ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৩৭; ঐ, (২য় সংস্করণ ১৩৮৩/১৯৬৪) ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৫৩।

১৪. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, তাফসীর 'ফাৎহুল বায়ান ফী মাক্বাছিদিল কুরআন' (ভূপাল-ভারতঃ ছিদ্দীকী প্রেস, ১২৯১ হিঃ) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৪১-২৪২; মুখতাছার তাফসীরুল মানার (বৈরুতঃ মাকতাব ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪) ৩য় খন্ড পৃঃ ২৭০।

১৫. বাক্বারাহ, ১৭০ (و إذا قيل لهم اتَّبِعُوا ما أنْزَلَ اللّٰهُ قالوا بل نَتَّبِعُ ما ألفَيْنَا عليه آباءَنَا أوَ لو كان آباؤُهم لا يَعْقِلونَ شيئا ولايهتدون - قال البيضاوى أى لو كان آباءُهم جَهَلَةً لا يُفَكِّرون فى أمر الدين و لا يهتدون إلى الحق لاتبعوهم ، وهو دليل على المنع من التقليد لمن قَدَّر على النظر او الاجتهاد، و أما إتباعُ الغيرفى الدين.. أقول (اى رشيد رضا) إنما يُتَّبَعُ العالِمُ الثقة فيما يبلغه عن الله أو رسوله و إما الأخذ باجتهاده فهو إتباعٌ له فى ظَنِّه لا لمَا أنزلَ اللّٰهُ- সৈয়দ মুহাম্মাদ রশীদ রিযা (১২৮২-১৩৫৪/১৮৬৫-১৯৩৫ খৃঃ), 'মুখতাছার তাফসীরুল মানার' ১ম খণ্ড পৃঃ ১২৭।

১৬. সাইয়িদ রশীদ রিযা, 'তাফসীরুল কুরআন' (মিসরঃ দারুল মানার ২য় সংস্করণ ১৩৬৭/১৯৪৮ খৃঃ) ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৪১৬; প্রাগুক্ত (মুখতাছার)।

১৭. (..لم يكن فى عصرِ الصحابةِ رجلٌ واحدٌ إتَّخَذَ رجلا منهم يُقَلِّدُهُ فى جميعِ أقوالِهِ .. ولم يكن فى عصرِالتابعينَ و لا تابعِي التابعينَ ، فليكذِّبنا المقلِّدونَ برجلٍ واحدٍ سَلَكَ سبيلَهم الوخيمةَ فى القرونِ الفضيلة.. و إنما حَدَثَتْ هٰذهِ البدعةُ فى القرنِ الرابعِ المذموم على لسانِ رسولِ اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم) - হাফেয শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ (৬৯১-৭৫১ হিঃ)ঃ 'ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন' (বৈরুতঃ দারুল জীল ১৯৭৩ খৃঃ) ২য় খণ্ড পৃঃ ২০৮। মাননীয় লেখক এখানে তাক্বলীদের বিরুদ্ধে মোট ৮১টি দলীল পেশ করেছেন (২য় খণ্ড পৃঃ ২০৮-২৭৫)।

১৮. (و بعد القَرْنَيْنِ حَدَثَ فيهم شيئٌ من التخريجِ غيرَ أنَّ أهلَ المائَةِ الرابعةِ لم يكونوا مُجْتَمِعِينَ على التقليدِ الخالصِ على مذهبٍ واحدٍ .. إعلم أنَّ الناسَ كانوا قبلَ المائةِ الرابعةِ غيرُ مُجْمِعِيْنَ على التقليدِ الخالصِ لمذهبٍ واحدٍ بعَيْنِه)- হুজ্জাতুল্লাহ (কায়রোঃ ১৩৫৫

হিঃ/ ১৯৩৬ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫২; وهو إنما أحدثَ بعد مائتَى سَنَةٍ من الهجرة ছালেহ বিন মুহাম্মাদ ফুল্লানী (১১৬৬-১২১৮/১৭৫২-১৮০৩), 'ঈকাযু হিমাম উলিল আবছার" (বৈরুতঃ ১৩৯৮/১৯৭৮) পৃঃ ৭৫।

১৯. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রোঃ ১৩৫৫ হিঃ/১৯৩৬ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫৩; পরবর্তীতে রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদে এই ফেকহী ঝগড়া আরও মারাত্মক রূপ নেয় এবং তাক্বলীদী গোঁড়ামী আরও প্রকট আকার ধারণ করে। সে সম্পর্কে শাহ ছাহেব উপরোক্ত আলোচনা শেষ করেন এভাবে- فنشأت بعدهم قرونٌ على التقليد الصِّرْف لا يميِّزون الحَقَّ من الباطل و لا الجَدَلَ عن الاستنباط ، فالفقيهُ يومئذٍ الثَرْثَارُ .. و لم يأت قَرْنٌ بعد ذلك (أى بعد المائة الرابعة) إلا وهو أكثَرُ فتنةً و أوفَرُ تقليدا و أشَدُّ إنتزاعًا للامانة.. حتى اطمأنُّوا بترك الخَوْضِ فى أمر الدين و بِأنْ يقولوا (إنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا على أمَّةٍ و إنَّا على آثارهم مُقْتَدُوْنَ) و إلى الله المشتكى و هو المستعان .. ঐ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫৪।

২০. হাফেয শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮), 'তাযকেরাতুল হুফ্ফায' (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ২য় খণ্ড পৃঃ ৬২৭, ৬৩০।

২১. (و تَرَى العامَّةَ سِيَّمَا اليومَ فى كل قُطْرٍيَتَقَيَّدُوْنَ بمذهبٍ من المذاهبِ المتقدِّمِينَ يَرَوْنَ خروجَ الانسانِ من مذهبِ مَنْ قَلَّدَه ولو فى مسئلةٍ كالخروج من الملة ، كأنه نَبِيٌّ بُعِثَ إليه و افترضَتْ طاعتُهُ عليه و كان أوائلُ الامة قبلَ المائة الرابعة غيرَ مُتَقَيِّدِينَ بمذهبٍ واحدٍ- শাহ অলিউল্লাহ, 'তাফ্হীমাতুল ইলাহিয়াহ্- আরবী ও ফারসী, (ইউপি-ভারতঃ মদীনা অফসেট প্রেস, বিজনৌর, ১৩৫৫/১৯৩৬ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫১।

২২. (أشْهَدُ لله بالله أنه كَفَرَ بالله أن يَعْتَقِدَ فى رجلٍ من الامة ممن يُخْطِى و يُصِيْبُ أنَّ اللهَ كَتَبَ عليَّ إتباعَه حَتْمًا ، وأن الواجبَ عليَّ هو الذى يُوجِبُهُ هذا الرجلُ عليَّ و لكنَّ الشريعةَ الحقَّةَ قد ثبتَ قبل هذا الرجلِ بزمانٍ قد وَعَاها العلماءُ وأدَّاها الرواةُ و حَكَمَ بها الفقهاءُ ، و إنما اتفقَ الناسُ على تقليدِ العلماءِ على معنى أنهم رُوَاةُ الشريعةِ عن النبى صلى الله عليه و سلم و أنهم عَلِموا ما لم يعلَمْ و أنهم اشتغَلُوا بالعلم ما لم تشتغِلْ ، فلذلك قَلَّدُوا العلماءَ - فلو أن حديثا صَحَّ و شَهِد بصحَّته المحدِّثون و عَمِل به طوائفُ فظهرَ فيه الامرُ ثم لم يعمَلْ به هو لان متبوعَه لم يقُلْ به ، فهذا هو الضلالُ البعيدُ) - প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড পৃঃ ২১১।

২৩. (من كان مقلِّدا لواحدٍ من الائمة و بلغه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يُخالفُ قولَه فى مسئلةٍ و غلبَ على ظنِّه أن ذلك نقلٌ صحيحٌ ، فليس له عذرٌ فى أن يترُكَ حديثَه عليه السلام إلى قولِ غيرِه و ما ذلك شأنُ المسلمين و يُخْشَى عليه النفاقُ إن فَعَلَ ذلك)- প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড পৃঃ ১৩৮।

২৪. অলিউল্লাহ, ইক্বদুল জীদ (লাহোরঃ তাবি) পৃঃ ৮৪-৮৬; তাক্বলীদের বিরোধিতায় চার

ইমামের প্রসিদ্ধ কওল সমূহ নিম্নরূপঃ-

১. ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) বলেন- (الف) حرامٌ على مَنْ لم يَعْرِفْ دليلى أن يُفْتِيَ بكلامى ، كتاب الميزان للشعرانى ط/دهلى ج١/ ٦٢ و قال : إذا صَحَّ الحديثُ (أى من بعدى) فهو مذهبى ، شامى لابن عابدين ط/بيروت ج١/٦٧

২. ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হিঃ) বলেন- (ب) ما من أحد إلا و ماخوذٌ من كلامه و مردودٌعليه إلا رسولُ الله صلى الله عليه و سلم -

৩. ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন- (ج) إذا رأيتم كلامى يُخالفُ الحديثَ فاعْمَلوا بالحديث واضربوا بكلامى الحائطَ -

৪. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলেন- (د) لا تُقَلِّدْنى و لا تُقَلِّدَنَّ مالكاً و لا الاوزاعىَّ و لا النخعىَّ و لا غيرَهم و خُذ الاحكامَ من حيث أخذوا من الكتاب و السنة

শাহ্ অলিউল্লাহ্ দেহলভী, "ইক্দুল জীদ ফী আহ্কামিল ইজতিহাদে ওয়াত্ তাক্বলীদ" (লাহোরঃ ছিদ্দীকী প্রেস উর্দূ অনুবাদসহ, অনুবাদকের নাম ও মুদ্রণকাল উল্লেখ নেই) পৃঃ ৮৪-৮৬; ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩ হিঃ), 'কিতাবুল মীযান' (দিল্লীঃ আকমালুল মাতাবে প্রেস ১২৮৬/১৮৭০ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৩ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে সূরায়ে যুখরুফ ২২-২৩ আয়াতে বাপ-দাদার তাক্বলীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

(بل قالوا إنَّا وَجَدْنَا آباءَنَا علىٰ أُمَّةٍ و إنَّا علىٰ آثارهم مُهْتَدُوْنَ ، وكذلك ما أرْسَلْنَا من قبلك فى قريةٍ من نَذيْرٍ إلا قال مُتْرَفُوْهَا إنَّا وجدنا آباءَنَا على أُمَّةٍ و إنَّا علىٰ آثارهم مُقْتَدُوْنَ)

-২৫. ইক্দুল জীদ পৃঃ ১১০ ও ১১১।

২৬. নাহ্ল ৪৩-৪৪, (و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نُوْحِى إليهم فَاسْئَلُوْٓا أهلَ الذِّكْرِ إنْ كنتم لا تَعْلَمُوْنَ ، بِالْبَيِّنَاتِ و الزُّبُرِ و أنْزَلْنَا إليك الذكرَ لِتُبَيِّنَ للناسِ ما نُزِّلَ إليهم و لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ)- قال ابن كثير: أى أرسلناهم بالبينات و الكتب ، تفسير القرأن ط/ بيروت ج٢/ ٥٩٢

২৭. 'ইক্দুল জীদ' পৃঃ ১১২।

২৮. (يا ايها الذين امنوا لا تُحلُّوا شعائرَ اللّٰه و لا الشهْرَ الحرامَ و لا الهَدْىَ و لا القَلاَئدَ..) (جَعَلَ اللّٰهُ الكعبةَ البيتَ الحرامَ قياماً للناسِ و الشهرَ الحرامَ والهدىَ والقلائدَ.) মায়েদাহ ২, ৯৭।

২৯. ইক্দুল জীদ পৃঃ ৩৯-৪৭; হুজ্জাতুল্লাহ (কায়রো ছাপা ১৩৫৫/১৯৩৬ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫৪-১৫৬।

৩০. নাছেরুদ্দীন আলবানী, 'আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন' (কুয়েতঃ দার সালাফিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬) পৃঃ ২৭।

৩১. ২৯নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩২. اگر نمونه یهود خواهی که بینی علماء سوء که طالب دنیا باشند و خو گرفته بتقلید سلف و معرض نصوص از کتاب و سنت و تعمق و تشدد و یا استحسان عالمے را مستند ساخته از کلام شارع معصوم بے پرواه شده باشند و احادیث موضوعه و تاویلات فاسده را مقتدائے خود ساخته باشند تماشا کن کأنهم هم) ، الفوز الكبير (فارسى) للدهلوى ص ١٠
শাহ অলিউল্লাহ 'আল-ফওযুল কবীর' (ফারসী, দিল্লীঃ মুজতাবায়ী প্রেস) পৃঃ ১০, ঐ উর্দূ (মাকতাবা বুরহান, উর্দূ বাজার, দিল্লী; ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫ খৃঃ) পৃঃ ১৮; ঐ আরবী (কানপুর, ভারত; কাইয়ূমী প্রেস, ১৩৬৯ হিজরীতে ঢাকায় লিখিত) পৃঃ ১২।

৩৩. শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) 'তানভীরুল আইনাইন ফী ইছবাতি রাফ্'ইল ইয়াদাইন' (মীরাটঃ মুজতাবায়ী প্রেস ১২৭৯ হিঃ/১৮৬৩ খৃঃ) উর্দূ অনুবাদসহ পৃঃ ৩৭-৩৯।

৩৪. শাহ অলিউল্লাহ, 'তাফহীমাতে ইলাহিয়াহ' ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৯- (و منها أني أقول لهؤلاء المسمين أنفسهم بالفقهاء الجامدين على التقليد يبلغهم الحديث من أحاديث النبى (ص) بإسناد صحيح و قد ذهب إليه جمع عظيم من الفقهاء المتقدمين و لا يمنعهم إلا التقليد لمن لم يذهب إليه و لهؤلاء الظاهرية المنكرين للفقهاء الذين هم طراز حملة العلم و أئمة أهل الدين إنهم جميعا على سفاهة و إسخافة رأى و ضلالة و إن الحق أمر بين بين -)

৩৫. (و قد يزعَمُ الانسانُ أنَّ الخروجَ عن المذاهبِ المُدَوَّنَة خروجٌ عن رِبْقَة التقليد للشرع و الإنقياد لحكم اللهِ وأنْ ليس هنالك طريقةٌ مضبوطةٌ غيرَها ، فيكونُ الخروجُ عنها عنده مُرادفًا أو مُلازمًا للخروجِ عن ربقة الإنقياد فيَفْطَنُ بأنَّ النبيُّ (ص) مُعَاتِبٌ عليه و أمثالُ هذه الشُبهات ..) শাহ অলিউল্লাহ 'ফুয়ূযুল হারামাইন' (দিল্লীঃ আহমদী প্রেস ১৩০৮/১৮৮৯ খৃঃ) উর্দূ অনুবাদ সহ পৃঃ ৩১।

৩৬. (خود را مقلد محض بودن هرگز راست نمی آید و کارے نمی کشاید اکثر مفاسد درعالم از همین جهت ناشی شده - إزالة الخفا عن خلافة الخلفاء للدهلوى (فارسى) ص ٢٥٧
শাহ অলিউল্লাহ, 'ইযালাতুল খাফা' (ফারসী) ২৫৭ পৃষ্ঠার বরাতে আবু ইয়াহ্ইয়া ইমাম খান নওশাহ্রাবী, 'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ' (উর্দূ) ২য় সংস্করণ (লাহোরঃ নিয়াযী প্রিন্টিং প্রেস ১৩৯১/১৯৮১ খৃঃ) পৃঃ ৫৯।

৩৭. (جمعےکه سرمایه علم إیشان شرح وقایه و هدایه باشد، کجا إدراك سر این توانند کرد- إزاله ٨٤) 'ইযালাহ' পৃঃ ৮৪-এর বরাতে প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৯।

৩৮. (أول وصیت إین فقیرچك زدن است بکتاب و سنت در إعتقاد و عمل .. و در عقائد مذهب قدماء أهل سنت إختيار كردن .. و در فروع پیروی علماء محدثین که جامع باشند میان فقه و حدیث کردن و دائما تفریعات فقهیه را بر کتاب و سنت عرض نمودن ، آنچه موافق باشد

در خیز قبول آوردن و إلا کالائے بد بریش خاونددادن أمت را هیچ وقت از عرض مجتهَدات بر کتاب و سنت استغنا حاصل نیست و سخن مُقَشِّفه فقهاء که تقلید عالمی را دست آویز ساخته تتبع سنت را ترک کرده اند نشنیدن و بدیشاں التفات نکردن و قربت خدا جستن بدورے ایناں) শাহ অলিউল্লাহ, 'অছিয়াত নামা' (ফারসী) (কানপুর, ভারতঃ ১২৭৩/১৮৫৮ খৃঃ) পৃঃ ২; ঐ 'তাফহীমাতে ইলাহিয়াহ' ২য় খণ্ড পৃঃ ২৪০।

৩৯. সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২ খৃঃ), 'মি'য়ারুল হক' (উর্দূ) (দিল্লীঃ রহমানী প্রেস ১৩৩৭/১৯১৯ খৃঃ) পৃঃ ৪১-৪২।

৪০. শাহ অলিউলাহ দেহলভী, 'ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা (ফারসী)- (রায়বেরেলী-ভারতঃ ছিদ্দীকী প্রেস, সাল অস্পষ্ট, তবে নিশ্চিতভাবে ১২০০ হ'তে ১৩০০ হিজরীর মধ্যে) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫৭-৫৮; ঐ, উর্দূ অনুবাদ (করাচীঃ কুরআন মহল, মৌলবী মুসাফিরখানার সম্মুখে, সালবিহীন) পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ৩৬২-৬৩।

৪১. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী (১১৭২-১২৫০ হিঃ), 'আল-কওলুল মুফীদ' (মিসরঃ মা'আহিব প্রেস ১৩৪০/১৯২৩ খৃঃ) পৃঃ ২৮।

৪২. ইমাম শওকানী, 'হেদায়াতুস সায়েল'- এর বরাতে নাযীর হুসাইন দেহলভী, 'মি'য়ারুল হক' (দিল্লী) পৃঃ ২৭৪।

৪৩. (و كان عُمَرُ إذا أفْتَى الناسَ يقولُ هذا رأىُ عُمَرَ فإن كان صَوابًا فَمنَ اللّٰه و إن كان خَطاءً فَمِنْ عُمَرَ) আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, 'কিতাবুল মীযান' (দিল্লী) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬১।

৪৪. (وعن ابن مسعود .. فإن يكن صوابا فَمِن الله وإن يكن خطاءً فَمنِّى و من الشيطان..) হাফেয ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল 'মুওয়াক্কেঈন' ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৭।

৪৫. (هذا رأىُ نُعْمانَ بنِ ثابتٍ و هو أحسنُ ما قَدَرْنَا عليه فمَنْ جاء بأحسَنَ منه فهو أولَى بالصَّواب) হুজ্জাতুল্লাহ (কায়রো ১৩৫৫ হিঃ/১৯৩৬ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫৭।

৪৬. (و مِن المعلومِ أن اللّٰهَ ما كَلَّفَ أحداً أن يكونَ حنفيًا او مالكيًا او شافعيًا او حنبليًا بل كَلَّفَهم أن يَعملَوا بالسنةِ إنْ كانوا عُلماءَ او يُقَلدوا علماءَ إن كانوا جُهَلاءَ) সৈয়দ নযীর হুসাইন, 'মি'য়ারুল হক' পৃঃ ৫৩।

৪৭. (إعلم أنه لم يكلف الله تعالى أحدا من عباده بان يكون حنفيا او مالكيا او شافعيا او حنبليا بل كلفهم أن يعملوا بالسنة إن كانوا علماء أو يقلدوا علماء إن كانوا جهلاء) প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৩।

৪৮. (الف) لا تَرْوِ عنى شيئًا فإني واللّٰه ما أدرى مُخْطِيءٌ أنا أم مُصيبٌ ؟ (ب) وَيْحَكم كم يَكْذِبون عليَّ في هذه الكُتُبِ ما لم أقُلْ (ج) وَيْكَ يا يعقوبُ لا تكتُبْ كلَّ ما تسمَعُهُ منى فإني قد أرَى الرأىَ اليومَ فأترُكُهُ غداً ، و أرَى الرأىَ غداً و أترُكُهُ بعد غدٍ- رواه الخطيب فى تاريخه بإسناد متصل- হাফেয আবু বকর আহমাদ বিন আলী আল-খত্বীব বাগদাদী

(৩৯২-৪৬৩ হিঃ), 'তারীখু বাগদাদ' (মিসরঃ সা'আদাহ প্রেস ১৩৪৯/১৯৩১ খৃঃ) ১৩শ খণ্ড পৃঃ ৪০২; ১৪শ খণ্ড পৃঃ ২৫৮; ১৩শ খণ্ড পৃঃ ৪০২।

৪৯. (قال الغزالى فى كتابه المنخول : أنّهما خالفا أبا حنيفةَ فى ثُلُثَيْ مذهبِه) আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪/১৮৪৮-৮৬ খৃঃ), 'শরহে বেকায়ার' ভূমিকা, (দিল্লী ছাপা ১৩২৭ হিঃ) পৃঃ ২৮, শেষ লাইন।

৫০. তাজুদ্দীন আবদুল ওয়াহ্হাব বিন তাকিউদ্দীন সুবকী, 'তাবাকাতুশ শাফেঈয়াহ কুবরা' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ১ম খণ্ড পৃঃ ২৪৩। –

(روى السبكى نقلا عن الرافعي.. فأنهما يُخَالفانِ أُصولَ صاحبِهما..)

৫১. (لو كَتَبْنَا عن مالكٍ لا أدرى ، لَمَلأنا الألواحَ) ইউসুফ ইব্নু আবদুল বার্র কর্তবী আন্দালুসী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ), 'জামেউ বায়ানিল ইল্ম' (বৈরুত; দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তারিখবিহীন) ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৪।

৫২. শায়খ আহমদ দেহলভী, 'তারীখু আহ্লিল হাদীছ' (আরবী) (লাহোরঃ করীমী প্রেস ১৩৫২/১৯৩৩) পৃঃ ২১-২২।

৫৩. নিসা ৮২ (اَفَلا يَتَدَبَّرُوْنَ القرانَ ؟ ولو كانَ مِنْ عند غيرِ اللّه لَوَجَدُوْا فيه اخْتِلافًا كثيراً)

৫৪. (قال الشافعى..فما وَجَدْتُمْ فى كتابى هذه مما يُخَالِفُ الكتابَ والسنةَ فقد رجعتُ عنه) শায়খ আহমাদ, 'তারীখু আহ্লিল হাদীছ' পৃঃ ২২, ৩৫-৩৬।

৫৫. (وقال .. كُلُّ مسألةٍ صَحَّ فيها الخبرُ عن رسولِ اللّه (ص) عند أهلِ النقلِ بخلاف ما قُلْتُ فأنَا راجعٌ عنها فى حياتى و مماتى)- نقله الفلانى فى الايقاظ ، بيروت ص ١٠٤ ছালেহ ফুল্লানী, 'ঈকাযু হিমাম' পৃঃ ১০৪।

৫৬. (وقال الشافعى لتلميذه الامام أحمد : أنت أعلمُ بالحديثِ و الرجالِ منى ، فإن كان الحديثُ الصحيحُ فأعْلِمُونى به أىَّ شيىءٍ يكونُ كوفيًا او بصريًا او شاميًا حتى أذهَبَ إليه إذا كان صحيحًا) প্রাগুক্ত পৃঃ ১০২।

৫৭. وقال لتلميذه إبراهيمَ المُزَنى : لا تُقَلِّدْنى فى كلِ ما أقولُ و انظُرْ فى ذلك لنفسك فإنه دينٌ আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, 'কিতাবুল মীযান' ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৬; ইকদুল জীদ, পৃঃ ৯৭।

৫৮. (و قال العلامة إبنُ القيم .. و لأجلِ هذا (أى لأجل خوفِ التقليد) لم يُؤَلِّفْ أحمدُ كتابًا فى الفقه) ছালেহ ফুল্লানী, 'ঈকাযু হিমাম' পৃঃ ১১৩, শায়খ আহমদ, তারীখু আহ্লিল হাদীছ' পৃঃ ৩৬।

৫৯. ..أن نسبةَ هذه المسائلِ إلى الأئمة المجتهدينَ حرامٌ ছালেহ ফুল্লানী, 'ঈকাযু হিমাম' পৃঃ ৯৯

৬০.(ক) আল্লামা সা'আদুদ্দীন তাফতাযানী (৭২২-৭৯৩ হিঃ) 'তালবীহ'-এর মধ্যে হাদীছের রেওয়ায়াত সম্পর্কে যে বর্ণনা দান করেছেন, সেখানে আবু হানীফা (রহঃ)-এর প্রতি বিভিন্ন বিষয়কে যুক্ত করার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছেন - ..و قال العلامة التفتازانى)

الرابعُ كما دَلَّ العقلُ .. فلا يَسْتَنِدُ قولُ ذلك إلى أبى حنيفةَ ، دَلَّ النقلُ عن الثِّقات على أنه قولٌ موضوعٌ مُخْتَلَقٌ على السَلَفِ الصالحِ و مُسْتَحْدَثٌ من المتأخِّرين..) মোল্লা মুঈন বিন মুহাম্মাদ সিন্ধী, 'দিরাসাতুল্ লাবীব' (লাহোরঃ ১২৮৪ হিঃ/১৮৬৮ খৃঃ) পৃঃ ১৮৩।

(খ) হানাফী মাযহাবে প্রচলিত হাদীছ বিরোধী কিয়াস সমূহকে আবু হানীফার দিকে সম্বন্ধিত করার বিরুদ্ধে ইমাম শা'রাবী বলেন-

(وقال الشعراوى.. متى نَقَلَ أحدٌ عن أبى حنيفةَ قياسًا يُخَالِفُ نَصًّا صَحَّ بعده فله العُذرُ العظيمُ فى ذلك لكونه لم يجد النصَّ أصلا او وَجَدَه و لكن لم يَصِحَّ عنده ، فأنَّ اعتقادَنا و اعتقادَ كُلِّ مُنْصِفٍ فى الامامِ أبى حنيفةَ أنه كان يُقَدِّمُ النصَّ و الاثرَ على القياسِ و إنه لو عاشَ حتى دُوِّنَتْ أحاديثُ الشريعةِ التى صَحَّتْ بعده و ظَفِرَ و صَحَّتْ عنده لأخَذَبها و تَرَكَ القياسَ المخالفَ لها وكان القياسُ يَقِلُّ فى مذهبه كما قَلَّ فى مذهبِ غيره بالنسبة إليه - لكن لَمَّا كانت الأدلةُ مُتَفَرِّقَةً فى عصره مع التابعينَ فى الثُّغورِ و المَدَاين كَثُرَ القياسُ فى مذهبه لِعَدَمِ وُجودِ النصِّ فى تلك الرواية بخلاف غيرِه من الأئمة الثلاثة .. غَرَّ مَنْ غَرَّ من أهلِ الإطراءِ فى أئمتهم فأفرَطُوا فيهم و نَسَبُوا إليهم ما لم يَدَّعُوه .. وقالوا لو كان الحديثُ صحيحًا فى هذه المسئلة لصَحَّ عند أبى حنيفةَ مثلًا و لو صح لَعَمِلَ به.. و إذا لم يَصِحَّ عنده فلا عِبْرَةَ لصِحَّته عند غيره و لا إيجابَ علينا فى التمسُّك به و بهذا الجَهْلِ القَبِيْحِ يُتْرَكُ العملُ بالأحاديث الصحيحة ..) প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯০, ২৯১।

(গ) চার ইমামের নামে প্রচলিত ফৎওয়া সমূহ ও বিশেষ করে হানাফী ফিক্বহে বর্ণিত কেয়াসী ফৎওয়া সমূহের সব কিংবা অধিকাংশ ফৎওয়াই ইমাম আবু হানীফার নয়, এ সম্পর্কে মোল্লা মুঈন সিন্ধী নিজস্ব মত ব্যক্ত করেন এভাবে-

(وقال مُلاّ معين السندى.. و ليس كلُّ ما يُنْسَبُ إليهم من القياسات البعيدة التى تَشَبَّهَ التشريعَ الجديدَ و يُنْقَلُ فى كُتُبِ مذهبهم فهو ثابتُ النسبةِ إليهم ، بل أكثرُ ذلك أو كلُّهُ مما ارتكَبَهُ مَنْ غَلَبَ عليه الرأىُ من أتباعهم (ص ١٥٦) و قال إن الأقْيِسَةَ الغيرَ الجَلِيَّةَ التى كُتُبُ الحنفيةِ مَشْحُوْنَةٌ بها غالبُها لا يَسْتَنِدُ إلى أبى حنيفةَ خصوصًا القياسُ الخَفِىُّ الذى يُسَمُّوْنَهُ إستحسانًا و يُقَدِّمُونهُ على القياسِ الجَلِىِّ) প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯১।

(ঘ) হানাফী মাযহাবের গৃহীত কেয়াসী ফৎওয়া সমূহ এবং পরবর্তীদের রচিত উছূলকে ইমাম আবু হানীফার দিকে সম্বন্ধ করার বিরুদ্ধে শাহ অলিউল্লাহ্‌র (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২) মন্তব্য আরও কঠোর। -হুজ্জাতুল্লাহ (কায়রো১৩৫৫/১৯৩৬) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬০।

(ঙ) আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪/১৮৪৮-১৮৮৬) হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবের বিশ্বস্ত ফিক্বহ গ্রন্থগুলির অমার্জনীয় হাদীছ বিরোধিতা সম্পর্কে বলেন- (فكم من كتابٍ مُعْتَمَدٍ اعتمدَ عليه أجِلَّةُ الفقهاءِ مَمْلُوٌّ من الأحاديث الموضوعةِ و لاسِيَّمَا الفتاوى فقد وَضَحَ

لنا بتوسيع النظرِ أنَّ أصحابَهم وإن كانوا من الكاملين لكنهم فى نقلِ الأخبارِ من المتساهلين (نافع كبير ١٣) .. ألا تَرَى إلى صاحبِ الهداية من أجلّة الحنفية و الرافعيِّ شارحُ الوجيز من أجلّة الشافعيةِ مع كونهما ممن أشارَ إليه بالأنامل و يَعْتَمِدُ عليه الأماجدُ و الأماثلُ قد ذَكَروا فى تصانيفهما ما لم يُوْجَدْ لهُ أثَرٌ عند خَبيْرِ الحديث) জামে ছাগীর-এর ভূমিকা 'নাফে' কবীর' (মুছতাফায়ী প্রেস, লাক্ষ্ণৌ ১২৯১ হিঃ) পৃঃ ১৩; ইউসুফ জয়পুরী সংকলিত 'হাকীকাতুল ফিক্হ' সংশোধনেঃ দাউদ রায (বোম্বাইঃ ইদারা দাওয়াতুল ইসলাম, তারিখ বিহীন) পৃঃ ১৫১। এতদ্ব্যতীত ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী হানাফী (রহঃ)-এর বক্তব্য ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। - কিতাবুল মীযান, ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৩।

(চ) হাফেয ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১) এমন ৮২টি ছহীহ হাদীছ সংকলন করেছেন, যেগুলি নিজেদের রায় ও কেয়াসের বিরোধী বিবেচনায় 'আহ্লুর রায়' বিদ্বানগণ পরিত্যাগ করেছেন। -ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন (বৈরুত ছাপা ১৯৭৩) ১ম খণ্ড পৃঃ ২৪৬-৪৮।

(ছ) মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (১৮৯০-১৯৪১ খৃঃ) হানাফী মাযহাবের এমন ৬০০ শত মাসায়েল একত্রিত করেছেন, যা কুরআন-হাদীছের বিরোধী। -ঐ, 'সায়ফে মুহাম্মাদী' উর্দূ (দিল্লীঃ আযাদ বারকী প্রেস ১৩৪৮/১৯৩২ খৃঃ) মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৯; তিনি ১৫০টি হাদীছ সংকলন করেছেন, যার সাথেই তার ঠিক বিপরীত হানাফী মাসায়েল উল্লেখ করেছেন। -ঐ 'শাম্'এ মুহাম্মাদী' (দিল্লীঃ হায়দার বারকী প্রেস ১৩৫৩/১৯৩৭) মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৬; ফিক্হ গ্রন্থ 'দুর্রে মুখতার'-এর কুরআন-হাদীছ বিরোধী ৫০টি মাসায়েল -ঐ, 'ত্বরীকে মুহাম্মাদী' (করাচী- ৬ঃ ৭/৩ দিল্লী কলোনী, গুযরী রোড, মাকতাবা মুহাম্মাদিয়া, তাবি) পৃঃ ১৩৭-৫৩ এবং 'হেদায়া'-তে বর্ণিত ১০০ শত মাসায়েল যা হাদীছের বরখেলাফ। -ঐ, 'হেদায়াতে মুহাম্মাদী' (দিল্লীঃ বাড়াহ সদর, ৫ম সংস্করণ, তাবি) পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬। একই মর্মে উক্ত লেখকের 'দিরায়াতে মুহাম্মাদী' বইটি ও উল্লেখযোগ্য।

(জ) মুহাম্মাদ আবুল হাসান রচিত 'আয-যাফ্রুল মুবীন'উর্দূ (লাহোরঃ কাশ্মীরী বাজার, আহলেহাদীছ একাডেমী, ১৯৭৬) গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের ২৯টি মাসায়েল, যা প্রত্যাখ্যাত (১ম খণ্ড পৃঃ ২৪৫-৫২), জমহুর বিদ্বানগণের বরখেলাফ ১০১টি মাসায়েল (২য় খণ্ড পৃঃ ৫-৩৫), ছহীহ হাদীছের বিরোধী ১০৫টি মাসায়েল (পৃঃ ৩৬-১৯০) এবং কুরআন-হাদীছে ভিত্তি নেই এমন ১৫টি মাসায়েল (পৃঃ ১৯০-৯৩) একত্রিত করা হয়েছে ।

(ঝ) হেদায়াহ, দুর্রে মুখতার, তাওযীহ-তালবীহ প্রভৃতি কেতাবে মাযহাবী স্বার্থে রচিত বেশ কিছু জাল হাদীছ ও আছার উদ্ধৃত হয়েছে। কিছু হাদীছের সনদ ও মতনে নতুন শব্দ বা বর্ণ জুড়ে দিয়ে 'তাহরীফ' করা হয়েছে। কোন স্থানে বুখারী, দারাকুত্নী প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থের মিথ্যা হাওয়ালা (Reference) দেওয়া হয়েছে। এমনকি খোদ কুরআনের আয়াতেও তাফসীরের নামে শব্দ বৃদ্ধি করে 'তাহরীফ' এর অপচেষ্টা করা হয়েছে- এরূপ বহু দৃষ্টান্ত পূর্ণ হাওয়ালাসহ বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ হাকীম মুহাম্মাদ আশরাফ সিন্ধূ, 'নাতায়েজুত্ তাক্বলীদ' (লাহোরঃ দারুল ইশা'আত আশরাফিয়া, ১৩৬৪/১৯৪৫ খৃঃ) পৃঃ ৭৪-১০৩।

৩য় দফা মূলনীতিঃ ইজতিহাদের দুয়ার উন্মুক্তকরণ

'ইজতিহাদ' অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। শারঈ পরিভাষায় 'কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবার মধ্যে স্পষ্ট পাওয়া যায় না এমন বিষয়ে শারঈ হুকুম নির্ধারণের জন্য সার্বিক অনুসন্ধান প্রচেষ্টা নিয়োজিত করাকে 'ইজতিহাদ' বলা হয়।' 'ইজতিহাদ' দু'প্রকারের। ১- বর্তমানের কোন সমস্যাকে পূর্বকালের কোন সমস্যার সদৃশ বিধানের মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো। ২- শরীয়তের সার্বিক বিধানসমূহ অনুধাবন করা ও তার আলোকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা। প্রথম প্রকারের ইজতিহাদকে 'বিশুদ্ধ কিয়াস' (القياس الصحيح) বলাই উত্তম। এই প্রকারের ইজতিহাদ সকল যুগের সকল বিদ্বানের জন্য উন্মুক্ত এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের ইজতিহাদ সম্পর্কে হাম্বলীদের মত হ'ল এই যে, প্রতি যুগেই এর জন্য উপযুক্ত মুজতাহিদ থাকবেন। কিন্তু জমহুর বিদ্বানগণের মতে কোন কোন যুগ খালি থাকাও সিদ্ধ আছে। জমহুরের দলীল হ'ল রাসূলের হাদীছ-'কিয়ামতের প্রাক্কালে আল্লাহ পাক যোগ্য আলিমদের তিরোধানের মাধ্যমে ইল্‌ম উঠিয়ে নেবেন।'[১] হাম্বলীদের দলীল হ'ল বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত সেই প্রসিদ্ধ হাদীছ যেখানে বলা হয়েছে- 'আমার উম্মতের মধ্যে চিরকাল একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে, বিরোধিতাকারী বা পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, এইভাবে কিয়ামত এসে যাবে।'[২] 'ইসলাম শুরু হয়েছিল গুটি কয়েক লোকের মাধ্যমে আবার সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে। অতএব যাবতীয় সুসংবাদ সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য।[৩] এক্ষণে অল্পসংখ্যক হ'লেও কিয়ামত পর্যন্ত চিরকাল হকপন্থী দলের অস্তিত্ব থাকার অর্থই হ'ল হকপন্থী আলেমগণের অস্তিত্ব বজায় থাকা। অন্য হাদীছে এসেছে- 'প্রতি শতাব্দীর মাথায় এই উম্মতের জন্য একজন করে মুজাদ্দিদের উত্থান ঘটবে, যিনি দ্বীনের সংস্কার সাধন করবেন।'[৪] এসকল হাদীছ চিরকাল ইজতিহাদের বিদ্যমানতা, ইসলামের চিরঞ্জীবতা ও সর্বযুগীয় সমাধান হওয়ার প্রমাণ বহন করে। অবশ্য কিয়ামত প্রাক্কালের অবস্থা স্বতন্ত্র।[৫] চূড়ান্ত ধ্বংসের পূর্বক্ষণে দুনিয়াবাসীর মধ্যে যখন 'আল্লাহ' বলার মত তাওহীদবাদী লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না[৬] তখন মুজতাহিদ আলিম বিদ্যমান থাকার কথা ভাবাই অবান্তর।

'ইজতিহাদ' তথা শরীয়ত-গবেষণার জন্য কুরআনে বার বার তাকীদ এসেছে। হাদীছে এবং ছাহাবায়ে কেরামের জীবনে এর বহু নযীর মওজুদ রয়েছে।[৭] ইজতিহাদের জন্য কুরআন ও হাদীছে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন আবশ্যিক পূর্বশর্ত।[৮] কোন বিষয়ে প্রদত্ত ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অবশ্যই হবে ধারণাভিত্তিক এবং তা হবে সঠিক অথবা বেঠিক হওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত।[৯] যখনই কুরআন বা হাদীছের স্পষ্ট দলীল অবগত হবে, তখনই ইজতিহাদ বাতিল হবে[১০] এবং দলীলের অনুসরণ ওয়াজিব হবে। তবে এই সর্বাত্মক অনুসন্ধান প্রচেষ্টা চালানোর জন্য মুজতাহিদ বিদ্বান অবশ্যই ছওয়াবের অধিকারী হবেন (যদি নিয়ত খালেছ থাকে)। ইজতিহাদ সঠিক হ'লে তিনি দু'গুণ ছওয়াব পাবেন ও বেঠিক হ'লে একগুণ ছওয়াবের অধিকারী হবেন।[১১]

আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ধর্ম হিসাবে সমগ্র মানব জাতির জন্য ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। এতে মানবজীবনে সম্ভাব্য সকল সমস্যার মৌলিক সমাধান নিহিত রয়েছে। মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে নিত্য নতুন সমস্যার অন্ত নেই। কুরআন ও হাদীছের আলোকে উক্ত সমস্যা সমূহের সমাধান বের করার জন্য যুগে যুগে প্রত্যেক যোগ্য আলিমের উপরে ইজতিহাদ অপরিহার্য। নবীর জীবদ্দশাতে, খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এবং পরবর্তীতে ছাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদ করেছেন। ইজতিহাদ সঠিক হওয়ায় নবী (ছাঃ) খুশী হয়েছেন। কারণ বিশুদ্ধ কিয়াস সাধারণতঃ দলীলের অনুকূলেই হয়ে থাকে। আর তা কেবলমাত্র তিনিই করতে পারেন যিনি হাদীছ শাস্ত্রে অধিকতর পারদর্শী এবং বাস্তবজীবনে সুন্নাতের অধিকতর পাবন্দ। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, পরবর্তীকালে কিয়াস ও ইজতিহাদের নামে অনেক স্বেচ্ছাচার ঘটে গেছে।[১২]

সর্বশেষ ও গতিশীল জীবনধর্ম (Dynamic Religion) হিসাবে ইসলামে সর্বযুগে ইজতিহাদ অপরিহার্য। কিন্তু কিছু বিদ্বান চার ইমামের পরে ইজতিহাদের দুয়ার বন্ধ বলে দাবী করেছেন।[১৩] যদিও এ ব্যাপারে তাঁরা একমত নন যে, কখন থেকে ইজতিহাদের দরওয়াযা বন্ধ হয়েছে। কেউ বলেন, আবু হানীফা (রহঃ) ও তাঁর শিষ্যদের পরে কারু জন্য ইজতিহাদ বৈধ নয়। কেউ বলেন, দুইশত হিজরীর পরে আর ইজতিহাদ নেই। কেউ বলেন, ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭ হিঃ) ও আবদুল্লাহ বিন মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ)- এর পরে ইজতিহাদ বন্ধ।

আবার কেউ বলেন, শাফেঈ (১৫০-২০৪)-এর পরে আর ইজতিহাদ বৈধ নয়।[১৪] অথচ এইসব দাবীর কোন শারঈ ভিত্তি নেই। আল্লাহ্ পাক তাঁর রহ্মতকে নির্দিষ্ট একটি যামানায় কিছু সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং এ কথাই স্বতঃসিদ্ধ যে, নবী (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া অসীম ইল্মের পবিত্র আমানত কেবলমাত্র একজন অনুসরণীয় ইমামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তাছাড়া তাঁর আমলে বর্তমান যুগের সমস্যাবলীও ছিল না। বাস্তব কথা এই যে, মানুষের জীবনে চিরকাল নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে, আর ইসলামের মূলনীতির আলোকে সেসবের সমাধানও চিরকাল দিয়ে যেতে হবে। নইলে মুসলমান বাতিলের অনুসারী হতে বাধ্য হবে-যা একেবারেই নিষিদ্ধ। বারো শত বৎসর পূর্বেকার কোন ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত সেই যুগের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হলেও প্রলয়-ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত মানবজাতির অনাগত ভবিষ্যতের অগণিত সমস্যাবলীর সমাধানে তা যে সর্বদা সর্বাংশে যথেষ্ট বিবেচিত হবে, এরূপ চিন্তা করাও কঠিন বৈ-কি! তাই ইসলামের চিরঞ্জীবতা, গতিশীলতা ও সর্বযুগীয় সমাধান হওয়ার স্বার্থেই আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মূলনীতি হ'ল 'ইজতিহাদের' দুয়ার সকল যুগের সকল যোগ্য আলিমের জন্য উন্মুক্ত রাখা। তবে একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রকাশ্য অর্থের মধ্যে স্পষ্ট কোন সমাধান না পেলেই কেবল ইজতিহাদ সিদ্ধ হবে, অন্যথায় নয়।[১৫] ইবনুল ক্বাইয়িমের (৬৯১-৭৫১ হিঃ) ভাষায় 'যে অবস্থায় মৃত ভক্ষণ সিদ্ধ হয়।' শাফেঈ-এর বক্তব্যও প্রায় অনুরূপ।[১৬]

৪র্থ দফা মূলনীতিঃ

সকল সমস্যায় ইসলামকে একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণঃ

মানুষের জীবন আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক তথা ইবাদাত ও মু'আমালাত দু'ভাগে বিভক্ত। দু'দিকেই রয়েছে বিভিন্নমুখী সমস্যা। সেইসব সমস্যার সমাধানে মানুষ সাধারণতঃ অভিজ্ঞ জ্ঞানী-মনীষীদের শরণাপন্ন হ'য়ে থাকে। দুনিয়ার অধিকাংশ ধর্ম প্রধানতঃ মানুষের আধ্যাত্মিক বিষয়েই পথনির্দেশ দান করেছে। কিন্তু ইসলাম তার অনুসারীদেরকে আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক তথা দ্বীনী ও দুনিয়াবী সকল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত প্রদান করেছে।

জাহেলী যুগে উক্ত দু'টি বিষয় ধর্মনেতা ও সমাজপতিদের হাতে ছিল। তাদের

তৈরী করা ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি ও আইনের উপরেই সাধারণ জনগণকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নির্ভর করতে হ'ত। এদেরকেই মানুষ আল্লাহ্‌র ছায়া ভাবত। ইহুদী-নাছারাগণ তো তাদের আলিম ও সাধু ব্যক্তিদেরকে 'রব'-এর মর্যাদা দান করেছিল। ভয় ও ভক্তির চোরাগলি দিয়ে এরা হরণ করে নিয়েছিল মানুষের স্বাধীনতা। জনগণ তাদের স্বার্থের বলি হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। বর্তমান যুগেও বস্তুবাদী শক্তিগুলি স্ব স্ব দার্শনিক পণ্ডিত ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে উক্ত আসনে বসিয়েছে। জনগণের নামে সার্বভৌম ক্ষমতা তারা কতিপয় ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করেছে। নিজেদের ইচ্ছামত আইন তৈরী করে ওটাকেই জনগণের আইন বলে চালিয়ে দিয়েছে। গণআদালতের দোহাই পেড়ে তারা আল্লাহ্‌র আদালতে জওয়াবদিহীকে এড়াতে চেয়েছে।

অন্যদিকে ধর্মনেতারা নিজেদের কল্পিত মাযহাব ও তরীকা সমূহের বেড়াজালে জনগণকে বন্দী করে ফেলেছেন। জায়েয ও নাজায়েয, সুন্নাত ও বিদ'আত, শিরক ও তাওহীদ এমনকি হালাল-হারামও নির্ণীত হচ্ছে এঁদের নিজস্ব ফৎওয়ার উপরে।[১৭] ফলে ইহুদী-নাছারাদের আলিম ও দরবেশদের ন্যায় মুসলিম উম্মাহ্‌র এইসব ধর্মনেতারা প্রকারান্তরে জনগণের রব-এর আসন দখল করেছেন। যাদেরকে এড়িয়ে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করা কার্যতঃ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অথচ সকল ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মূল উৎস থেকে হেদায়াত গ্রহণ করাই ছিল মুসলিম উম্মাহ্‌র নিকটে ইসলামের মূল দাবী। আল্লাহ বলেন- 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার হুকুমের অধিকারীদের আনুগত্য কর। যদি তোমরা আপোষে কোন বিষয়ে ঝগড়া কর, তাহ'লে আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন ও সুন্নাহ্‌র) দিকে বিষয়টিকে ফিরিয়ে দাও-যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী হয়ে থাক,এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বাধিক কল্যাণকর।'[১৮] উক্ত আয়াতের আলোকে আহলেহাদীছ আন্দোলন মুসলিম উম্মাহ্‌র আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক তথা দ্বীনী ও দুনিয়াবী সকল বিষয়ে সর্বদা ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে বিশ্বাস করে ও সেদিকেই উম্মতকে উদাত্ত আহবান জানায়।

ইবাদত-এর মূলনীতি হ'ল 'তাওক্বীফী' (توقيفى) অর্থাৎ কেবলমাত্র শরীয়তই কোন ইবাদত চালু করতে পারে। অহির হেদায়াতের বাইরে কোন ব্যক্তি

ইবাদত-এর নামে কোন অনুষ্ঠান চালু করলে শারঈ পরিভাষায় সেটি 'বিদ'আত' হবে, যা দারুণভাবে নিন্দনীয় এবং যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদির নিয়ম-পদ্ধতি প্রভৃতি। পক্ষান্তরে মু'আমালাত বা বৈষয়িক কাজকর্মের মূলনীতি হল 'ইবাহাত' (الإباحة) বা সাধারণ অনুমতি। এখানে মানুষ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, যতক্ষণ না সেটা শরীয়তের হুদূদ (حدود الله) বা সীমারেখা লংঘন করে কিংবা শারঈ মূলনীতির বিরোধী হয়।[১৯]

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-'আমরা আমাদের রাসূলদেরকে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে কিতাব ও ন্যায়দণ্ড (الكتاب و الميزان) নাযিল করেছি যাতে মানুষ ন্যায় বিচার কায়েম করতে পারে..।[২০] অন্যত্র আল্লাহ বলেন- 'আপনার প্রভুর কলেমা সত্য ও সুবিচার দ্বারা পরিপূর্ণ।'[২১] বুঝা গেল যে, ইসলামী শরীয়ত নাযিলের মূল লক্ষ্য হ'ল মানবসমাজে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষণে চূড়ান্ত সত্য বা ন্যায়বিচার সেটাই হবে যা ইসলামী ন্যায়নীতি অনুযায়ী হবে অথবা তার বিরোধী না হবে। যেমন আল্লাহ পাকের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-'আপনি বলে দিন (হে নবী)! 'হক'-তোমাদের প্রভুর পক্ষ হ'তে এসেছে। অতঃপর যে চায় তা বিশ্বাস করুক, যে চায় তা প্রত্যাখ্যান করুক। আমরা (হক-লংঘনকারী) যালিমদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি.....।[২২] এর দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, প্রকৃত সত্য মানুষের 'রায়' বা জ্ঞান হ'তে আসে না বরং আল্লাহ্‌র 'অহি' থেকে আসে। আর 'অহি'- নির্দেশিত সত্যকে অস্বীকার, প্রত্যাখ্যান, লংঘন বা এড়িয়ে যাওয়ার অর্থই হ'ল সামাজিক অশান্তি ও পারলৌকিক শাস্তির সম্মুখীন হওয়া। যেমন আল্লাহ হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন- 'যারা রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা করে, তারা যেন এ বিষয়ে সতর্ক হয়ে যায় যে তাদেরকে গ্রেফতার করবে (বাতেনীভাবে কুফ্‌র, নিফাক্ব ও বিদ'আত প্রভৃতি) ফিৎনাসমূহ অথবা গ্রেফতার করবে (প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ, জেল-যুলম ইত্যাদি) মর্মান্তিক শাস্তিসমূহ।[২৩]

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়সমূহ মানুষের জীবনের একটি বিরাট অংশ 'মু'আমালাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শরীয়ত উপরোক্ত সকল বিষয়েই কখনও মূলনীতি আকারে ও কখনও বিস্তৃতভাবে

পথনির্দেশ দান করেছে। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে পবিত্রতা অর্জন, অযু-গোসল, বিবাহ ও পরিবার পালন, খাদ্য গ্রহণ, পোষাক পরিধান, নিদ্রা, জাগরণ এমনকি মিস্ওয়াক ও চুল আঁচড়ানোর বিধিবিধানও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সাধারণতঃ অগণিত হ'য়ে থাকে। তাছাড়া যুগে যুগে এইসকল সমস্যার ধরন ও প্রকৃতির পরিবর্তন হ'তে পারে। তাই এসব বিষয়ে ইসলাম খুঁটিনাটির বদলে সংক্ষিপ্ত ও চূড়ান্ত মূলনীতি ঘোষণা করেছে। যাতে ইসলামী রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদগণ স্ব স্ব যুগে উক্ত মূলনীতি সমূহের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে সুষ্ঠু সমাধান বের করতে পারেন এবং জাতি ও সমাজকে ন্যায় ও সত্যের পথ প্রদর্শন করতে পারেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হ'ল।-

(১) সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার মূল চাবিকাঠি নির্ভর করে সুষ্ঠু বিচারনীতির উপরে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলে দেওয়া হ'ল- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী (আদালতে) ফায়ছালা না দেয়, সে ব্যক্তি কাফির,... যালিম,... ফাসিক।[২৪] হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোন দলের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্ররোচিত না করে, তোমরা ন্যায়বিচার করবে। ইহাই তাক্ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ সবকিছুই খবর রাখেন যা তোমরা কর।[২৫] (২) জনগণের জান-মাল ও ইয্যতের হেফাযতের ব্যাপারে বলা হ'ল- 'ক্বিছাছের মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত।[২৬] '(ন্যায়ানুগ কারণ ব্যতীত) এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের জান, মাল ও ইয্যত হারাম।[২৭] (৩) মানবীয় সাম্যের ব্যাপারে বলে দেওয়া হ'ল- 'অনারবের উপরে আরবের ও আরবের উপর অনারবের, কালোর উপরে সাদার ও সাদার উপরে কালোর কোন মর্যাদা নেই। তোমরা প্রত্যেকেই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির তৈরী।[২৮] 'তোমাদের মধ্যে সবচাইতে সম্মানিত তিনি, যিনি সর্বাধিক তাক্ওয়াশীল।[২৯] (৪) সামাজিক নেতৃত্ব সম্পর্কে বলা হ'ল- 'পুরুষেরা মহিলাদের উপরে কর্তৃত্বশীল।[৩০] (৫) রাষ্ট্রিয় সার্বভৌমত্ব প্রশ্নে এরশাদ হয়েছে- 'নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ ক্ষমতা আল্লাহ্র জন্য[৩১] (৬) বিভিন্ন বৈষয়িক বিষয়াদি ফায়ছালার জন্য সাধারণ মূলনীতি বলে দেওয়া হ'ল-

'আপনি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করুন'।[৩২] রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়াদিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের নিকটে পরামর্শ নিতেন। কখনও নিজের মতে, কখনও ছাহাবায়ে কেরামের মতের উপরে সিদ্ধান্ত হ'ত। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে,মোট তেইশটি ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর চাইতে ওমর ফারূক-এর পরামর্শ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।[৩৩] তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল বদর যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী কাফিরদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে। এখানে ওমর (রাঃ)-এর রায়-এর সমর্থনে আল্লাহপাক আয়াত নাযিল করেন।[৩৪] (৭) সংখ্যা কখনও সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের মানদণ্ড নয়, সে বিষয়ে বলা হ'ল- 'যদি আপনি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং ধারণা ভিত্তিক কথা বলে থাকে।[৩৫] (৮) অর্থনৈতিক আয়-উপার্জন সম্পর্কে কতগুলি যরূরী মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন- (ক) ব্যক্তির হালাল উপার্জনের অবাধ অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন- 'তোমাদেরকে আল্লাহ যে রিযিক দান করেছেন, তার মধ্য হ'তে হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং আল্লাহ্‌র নে'মতের শুক্‌রিয়া আদায় কর।[৩৬] (খ) যাবতীয় হারাম উপার্জনের পথ বন্ধ ঘোষণা করে বলা হয়েছে- 'তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ বাতিল পন্থায় ভোগ কর না।[৩৭] ...... তোমরা অত্যাচার করনা এবং অত্যাচারিত হ'য়ো না।[৩৮] (গ) অবৈধ পুঁজি সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে বলা হ'ল- '(পুঁজি) যেন কেবল তোমাদের ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবর্তিত না হয়'।[৩৯] বলা হ'ল, যে ব্যক্তি (খাদ্য) মওজুদ করল (মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) সে মহাপাপী।[৪০] সূদকে হারাম করা হ'ল। আর ও বলা হ'ল 'প্রত্যেক ঋণ যার বিনিময়ে লাভ গ্রহণ করা হয়, সেটাই সূদ।[৪১] জুয়া-লটারী-হাউজী প্রভৃতি লোভনীয় ও অনিশ্চিত আয় নিষিদ্ধ করা হ'ল।[৪২] (ঘ) পুঁজির বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করার জন্য যাকাত ফরয করা হ'ল,[৪৩] মীরাছ বন্টনের ব্যাপারে নারী-পুরুষ সকলের জন্য সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতি ঘোষণা করা হল।[৪৪] মওজুদ করার বদলে ব্যবসায় পণ্যের ব্যাপক চলাচলকে উৎসাহিত করা হ'ল।[৪৫] (ঙ) হারাম ও অবৈধ পথে যাবতীয় ব্যয়-বন্টন নিষিদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে কল্যাণ কর্মে ব্যয়-বিনিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হ'ল। সকল প্রকার ব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং যাবতীয় অপচয় নিষিদ্ধ করা হ'ল।[৪৬] (৯) সামাজিক শৃংখলা রক্ষা এবং

শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বলা হল- 'বলুন! আমার প্রভু আমার উপরে হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকারের অশ্লীলতা এবং পাপকার্যকে ও অন্যায় বিদ্রোহকে ....।[৪৭] 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।[৪৮] 'প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয।[৪৯] (১০) যাবতীয় মাদকদ্রব্য ও মাদক সেবনের বিরুদ্ধে বলা হ'ল- 'সকল প্রকারের মাদকদ্রব্য হারাম,'[৫০] 'মদ পাপসমূহের উৎস'।[৫১] বলা হ'ল 'আমি লা'নত করছি দশটি বিষয়ে মদকে, মদ্যপানকারীকে, মদ্য পরিবেশনকারীকে, মদ্য বিক্রেতাকে, ক্রেতাকে, মদ্য তৈরীর বস্তু পচনকারীকে, মদ্য প্রস্তুতকারীকে, মদ্য বহনকারীকে ও যার নিকটে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে এবং মদের বিক্রয়মূল্য ভক্ষণকারীকে।[৫২]

উপরোক্ত মূলনীতি সমূহের আলোকে ছাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন বৈষয়িক ব্যাপারে ফায়ছালা দিয়েছেন। যেমন (ক) ওমর ফারূক (রাঃ) মদের দোকান সমূহ মদ তৈরীর এলাকা সমেত জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন (খ) আবুবকর (রাঃ) জনৈক পায়ুকামীকে এবং আলী (রাঃ) তাঁকে 'আল্লাহ্‌র অবতার' দাবীকারী যিন্দীক্বদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন (গ) ছাহাবায়ে কেরাম গর্ভাবস্থা দেখেই যেনার শাস্তি এবং মদের গন্ধ পেয়েই মদ্যপানের শাস্তি দিয়েছিলেন- সাক্ষীর অপেক্ষা করেননি। (খ) অমনিভাবে ভবিষ্যত ফিৎনার আশংকায় ওছমান গণী (রাঃ) কুরায়শী কিরাআতের মূল কুরআন ব্যতীত বাকী কিরাআতের সকল কুরআনের কপি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়াও খিলাফতে রাশিদাহ্‌র যুগে এমন বহু কিছু সমাধান এসেছিল, যা কুরআন ও হাদীছের অভ্রান্ত মূলনীতি সমূহের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে করা হয়েছিল।[৫৩]

মুসলিম জীবনের দ্বীনী ও দুনিয়াবী সকল বিষয়ে এই নিয়মই কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকতে হবে। নইলে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলাম 'আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার একটি সম্পর্কের নাম' -ইসলাম বিরোধীদের এই মিথ্যা দাবী মুসলমানদের মাধ্যমেই সত্য প্রমাণিত হবে। তাছাড়া দুনিয়াবী বিষয়গুলি পূর্ণাংগ ইসলামী শরীয়তেরই একটা অংগ। যখন সেগুলি ইসলামী ন্যায়নীতির অনুসরণে করা হয়, তখন সেগুলি শারঈ বা দ্বীনী বিষয়ে পরিণত হয়। পারিভাষিক অর্থেই মাত্র এগুলিকে দুনিয়াবী বিষয় বলা হয়ে থাকে। ইসলাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে।

ইসলামের নবী (ছাঃ) দ্বীনী ও দুনিয়াবী সকল বিষয়ের জন্য বিশ্ববাসীর উত্তম দৃষ্টান্ত।[৫৪] এক্ষণে ইসলামে বিশ্বাসী কোন মুমিন আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দু'টি বিষয়ের জন্য দু'জন নবী দাবী করতে পারেন না। তাই সূরায়ে নিসা-র ৫৯ ও ৬৫ নং আয়াতের দাবী অনুযায়ী আহ্‌লেহাদীছগণ সর্বযুগে ও সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ্‌কেই আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সকল সমস্যায় চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে বিশ্বাস করেন ও সেদিকে মানুষকে আহ্‌বান জানান।

৫ম দফা মূলনীতিঃ মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ

আল্লাহ বলেন, -'তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে মযবুতভাবে ধারণ কর, দলে দলে বিভক্ত হয়োনা।[৫৫] এখানে 'হাব্‌লুল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র রজ্জু বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) প্রমুখাৎ মারফূ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৫৬]

আল্লামা সৈয়দ রশীদ রিযা (১২৮২-১৩৫৪/১৮৬৫-১৯৩৫) উক্ত আয়াতের তাফসীরে যা বর্ণনা করেছেন তা এই যে, 'আমাদের উপরে আল্লাহ্‌র নির্দেশ হ'ল যে, আমরা নিজেদের তৈরী করা বিভিন্ন মাযহাব এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলির ঊর্ধে উঠে আল্লাহ্‌র কিতাবকে আক্‌ড়ে থাকব ও তার উপরেই ঐক্যবদ্ধ হব। এইভাবে ঐক্যবদ্ধ হবার পরে আর বিভক্ত হওয়া যাবেনা। কারণ বিভক্তির মধ্যেই ঐক্যের বিধ্বস্তি লুকিয়ে থাকে- যা সম্মান ও শক্তির চাবিকাঠি। এটা জানা কথা যে, ঐক্যের মাধ্যমে সম্মান বৃদ্ধির ফলে 'হক' সম্মানিত হয় এবং তা পৃথিবীতে বিজয় অর্জন করে। ঐক্যের শক্তিই 'হক' ও হকপন্থীদেরকে ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত হ'তে হেফাযত করে। এদিকে ইংগিত দিয়ে আল্লাহ বলেন- 'এটাই আমার সোজা পথ তোমরা এর অনুসরণ কর। অন্যান্য রাস্তাগুলিতে যেয়োনা। তাহ'লে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র রাস্তা হ'তে বিচ্যুত করে ফেলবে।[৫৭] এখানে আল্লাহ্‌র রাস্তা বলতে 'হাব্‌লুল্লাহ' এবং ফের্কাবন্দীর রাস্তা বলতে সেইসব রাস্তা বুঝানো হয়েছে যেদিকে যেতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও ফের্কাবন্দী দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক-যা মানুষ এড়াতে পারে না। এটা জ্ঞান ও বুঝের পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে।

যেমন আল্লাহ বলেন- 'আপনার প্রভু ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে এবং এজন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তবে তারা ব্যতিত যাদের উপরে আপনার প্রভু অনুগ্রহ করেন।[৫৮] অবশ্য সূরায়ে আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতের তাৎপর্য তা নয়।

দুই- যা দূর করার জন্য দ্বীনের আগমন ঘটেছে- সেটি হ'ল দ্বীন ও দ্বীনের আদেশ-নিষেধের উপরে ব্যক্তির নিজস্ব রায় ও ইচ্ছা অনুযায়ী ফায়ছালা প্রদান করা। এটিই হ'ল মানবজীবনে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর দিক। কেননা প্রথমোক্ত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য হেদায়াতের যে আলোর প্রয়োজন, দ্বিতীয়টি তা নিভিয়ে দেয়। কারণ এক্ষেত্রে মানুষ দ্বীনের হেদায়াতের আলোকে নিজেদের ভুল ও বিরোধ মীমাংসা না করে বরং নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে দ্বীনকে ব্যাখ্যা করে ও সেইভাবে ফায়ছালা প্রদান করে। ফলে দ্বীনের আলো থেকে সে মাহরূম হয় এবং পারস্পরিক বিরোধ ও ফের্কাবন্দীর অভিশাপ থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ হ'তে সে চিরবঞ্চিত হয়।

ইহুদী-নাছারাগণ দ্বীন নিয়ে বিরোধ করে অভিশপ্ত হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন- 'তোমরা তাদের মত হয়োনা, যারা বিভিন্ন ফের্কায় বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের নিকটে বিস্তারিত হেদায়াত আসার পরেও তারা আপোষে বিরোধ করেছে।[৫৯] ইহুদী-নাছারাগণ দ্বীন বিষয়ে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছিল। তাদের প্রত্যেক ফির্কা অপর ফির্কার বিরোধিতা করত। তারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে দা'ওয়াতের বদলে নিজেদের মাযহাবের দিকে মানুষকে দা'ওয়াত দিত। যদি তারা সত্যিকার অর্থে 'হাব্‌লুল্লাহ'-কে সমবেতভাবে ধারণ করত, তাহ'লে দ্বীনের নামে বিভিন্ন ফের্কায় বিভক্ত হ'ত না। মৌলিক ও প্রশাখাগত বিষয়সমূহে বিভিন্ন ফির্কার উদ্ভব ঘট্‌তনা। যার ফলে তারা আপোষে শত্রুতা, লড়াই-ফাসাদ এমনকি খুনোখুনিতে লিপ্ত হয় ও পরিণামে আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়। মুসলিম উম্মাহ্‌কে এ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

উপরের আলোচনায় বুঝা গেল যে, মতভেদ হ'তে নিস্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় নেই। তবে প্রত্যেক মতভেদ নিন্দনীয় নয় যদি নিয়ত সৎ থাকে। নিন্দনীয় যেটি সেটি হ'ল এলাহী হেদায়াতের উপরে নিজেদের 'রায়'-কে অগ্রাধিকার দেওয়া ও তার ভিত্তিতে ফির্কাবন্দী সৃষ্টি হওয়া। যেটা হয়েছিল ইহুদী-নাছারাদের আলিমদের মধ্যে। আল্লাহ্‌র ভাষায় .... যারা সমাজে 'রব'-এর আসন দখল করেছিল। এটা করার ফলে তাদের উপরে যেসব গযব নাযিল হয়েছিল, মুসলিম উম্মাহ্‌র উপরেও

তা নেমে আসতে পারে। ইহকালে পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষের আযাব এবং পরকালে জাহান্নামের মর্মান্তিক শাস্তি তাদের জন্য অপেক্ষা করবে।[৬০]

মোট কথা পারস্পরিক ইখতিলাফ ও বিরোধের সময় স্ব স্ব দলীয় অহমিকা ও ব্যক্তিগত মতামতকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সর্বদা 'হাব্‌লুল্লাহ'-র দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর যে বিষয়ে স্পষ্ট দলীল মওজুদ নেই, সে বিষয়ে অধিকাংশ সুন্নাতপন্থী পরহেযগার বিদ্বানদের রায় মেনে নিয়ে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন- 'যদি কোন বিষয়ে তোমরা ঝগড়া কর, তাহ'লে বিষয়টিকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।[৬১] 'যে ব্যক্তি হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরেও রাসূলের বিরোধিতা করল এবং মুমিনদের রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা অনুসরণ করল, আমরা তাকে তার রাস্তায় ফিরিয়ে দেব। তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব এবং সেটা হবে বড়ই মন্দ ঠিকানা।[৬২]

মানুষের একার পক্ষে যেমন বড় কোন কাজ করা সম্ভব নয়, তেমনি সকল মানুষকে একই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করাও সম্ভব নয়। সেকারণ হক-এর দা'ওয়াত দেওয়ার জন্য হকপন্থী কিছু লোককে সর্বদা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়, যা অবশ্যই একটা জামা'আত বা দলের রূপ ধারণ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কিংবা একটি দেশে একই সময়ে এই দলের সংখ্যা একাধিক হ'তে পারে। এই দলের অস্তিত্ব ব্যতীত ইসলাম টিকে থাকা সম্ভব নয়। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন- 'ইসলাম হয়না জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয়না আমীর ছাড়া এবং ইমারত চলেনা আনুগত্য ছাড়া।'[৬৩] এগুলি অবশ্যই হবে 'জামা'আতে খাছ্ছাহ' (الجماعة الخاصة)। রাসূলের (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হক পন্থী এই দলের অস্তিত্ব কিয়ামতপূর্ব কাল পর্যন্ত থাকবে।[৬৪] যদিও তারা সংখ্যায় অল্প থাকবেন।[৬৫] তথাপি তারা সর্বদা 'জামা'আতে আম্মাহ' (الجماعة العامة) বা সামগ্রিক মুসলিম ঐক্য ও সংহতির পক্ষে কাজ করে যাবেন, দলীয় হিংসা ও বিদ্বেষ হ'তে দূরে থাকবেন। পরস্পরকে নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করবেন ও সহযোগিতা করে চলবেন।[৬৬] ছাহাবা ও তাবেঈদের পরবর্তী যুগগুলিতে বিভিন্ন সময়ে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে তাওহীদ ও সুন্নাতের পক্ষে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনসমূহ পরিচালিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' তেমনি ছাহাবাযুগ থেকেই স্বীয় অনন্য বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে মুসলিম উম্মাহ্‌র সকল দলকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সার্বভৌম অধিকার নিঃশর্তভাবে বাস্তবে মেনে নেওয়ার একটি মাত্র শর্তে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আন্তরিক আহবান জানিয়ে আসছে।

টীকাসমূহ-৭

১. الإجتهادُ هو استفراغُ الجُهْد و بذلُ غايةَ الوَسْع إما فى دَرْكِ الاحكامِ الشرعيَّةِ و إما فى تطبيقِها فالاجتهادُ فى تطبيقِ الاحكامِ هو الضربُ الاول الذى لا يَخُصُّ طائفةٌ من الامة دون طائفةٍ و هو لا ينقطعُ باتفاقٍ ، والاجتهادُ فى درك الاحكامِ هو الضربُ الثانى الذى مَنْ هو أهلٌ له وقد اختلفوافى إمكانِ انقطاعه فقال الحنابلةُ : لا يَخْلُو عصرٌ من مجتهدٍ و قال الجمهور : يجوز أن يخلو (আবু ইসহাক্ব ইবরাহীম বিন মূসা গারনাত্বী মালেকী শাত্বেবী (মৃঃ ৭৯০ হিঃ), 'আল-মুওয়াফিক্বাত' শায়খ আবদুল্লাহ দারায-এর ভাষ্যসহ (মিসরঃ মাকতাবা তিজারিয়াহ ২য় সংস্করণ ১৩৯৫/১৯৭৫) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৮৯।

২. عن ثوبانَ .. قال قال رسول اللّه (ص) لا تَزَالُ طائفةٌ من أمتي ظاهِرينَ على الحقِّ لا يَضُرُّهم مَنْ خَذَلَهم حتى يأتِيَ أمرُ اللّهِ وهم كذلك رواه مسلم – ইমাম মুসলিম বিনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী নিশাপুরী (২০৬-২৬১ হিঃ) সংকলিত ছহীহ মুসলিম (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ১৪০৩/১৯৮৩) 'ইমারত' অধ্যায় ৫৩ নং পরিচ্ছেদ, হা-১৯২০, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫২৩-২৪।

৩. عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) بدأ الاسلامُ غريبًا و سيعودُ كما بدأ غريبًا فطُوْبىٰ للغُرَباءِ رواه مسلم ، وفى رواية لأحمدبسند صحيح عن ابن مسعودقال بعده " وهم الذين يُصْلِحُون ما أفْسَدَ الناسُ من بعدى من سُنَّتِي ، كما قاله الالبانى فى تحقيق رواية الغرباء للترمذى عن عمرو بن عوف رقم الحديث ١٧٠ فى حاشية المشكوة ، بيروت ١٩٨٥، ج١ ص٦٠ প্রাগুক্ত 'কিতাবুল ঈমান' ৬৫ নং পরিচ্ছেদ হা-১৪৫, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৩০; মিশকাত (বৈরুতঃ ১৯৮৫) হা-১৭০, ১ম খন্ড পৃঃ ৬০।

৪. عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه (ص) إن اللّهَ يَبْعَثُ لِهٰذهِ الامة علىٰ رأسِ كُلِّ مائةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لها دينَها ، رواه أبو داؤد – আবু দাঊদ (তাহক্বীকঃ মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ, বৈরুত আল-মাকতাবাতুল আছারিয়াহ, তারিখবিহীন) 'কিতাবুল মালাহিম' হাদীছ সংখ্যা ৪২৯১, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১০৯; ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্বি'ঈন (বৈরুতঃ ১৯৭৩) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৭৬।

৫. (ثم يبعثُ اللّهُ ريحًا كريحِ المِسْكِ مَسُّها مَسُّ الحرير، فلا تَتْرُكُ نفسًا فى قلبِهِ مثقالُ حَبَّةٍ من الايمانِ إلا قَبَضَتْهُ ثم يَبْقَى شرارُ الناسِ ، عليهم تقومُ الساعةُ ، و فى رواية لا تقوم الساعةُ إلا على شِرارِ الخَلْقِ ، هم شَرٌّ من أهلِ الجاهلية ، لا يَدْعُون اللّهَ بشيءٍ إلا رَدَّه عليهم – رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص فى كتاب الإمارة (بيروت ، دار الفكر، ط/١٩٨٣) ছহীহ মুসলিম (বৈরুত ছাপা ১৪০৩ /১৯৮৩) হা-১৯২৪, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫২৫।

৬. عن أنس قال قال رسولُ اللّه (ص) لاتقومُ السـاعةُ حتى لا يُقالَ فى الارضِ اللّهُ اللّهُ ، وفى

رواية قال : لاتقومُ السـاعةُ على أحد يقولُ اللّٰه اللّٰه رواه مسلم قال الالبانى أى يُوَحِّدُ اللّٰهَ كما فى رواية لاحمدبسند صحيح "يقول لآ إلٰه إلا اللّٰه " فليس المرادُ بالحديث ذكرُ اللّٰه باللفظ المفرَد (اللّٰهُ اللّٰهُ)..فإنه ذكْرٌ مُبْتَدَعٌ لا أصلَ له فى السنةِ– মিশকাত (বৈরূত ছাপাঃ ১৪০৫/১৯৮৫) 'কিতাবুল ফিতান' হা-৫৫১৬, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫২৭।

৭. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ইবনুল কাইয়িম, 'ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন' (বৈরুত ছাপাঃ ১৯৭৩ খৃঃ) الصحابة يجتهدون ويقيسون অধ্যায় ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৩-৫। এখানে লেখক ছাহাবায়ে কেরাম হতে ইজতিহাদের ১১টি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। পরবর্তী আলোচনায় কিয়াসে শারঈ-র ১০-এর অধিক উদাহরণ পেশ করেছেন- ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৫-২১৭। নিম্নের আয়াতগুলিকে ইজতিহাদের দলীল হিসাবে গ্রহণ করা চলে- يسئلونك عن الخمر والميسر) قل فيهما إثم كبير و منافع للناس و إثمهما أكبر من نفعهما و يسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الأيات لعلكم تتفكرون (বাক্বারাহ ২১৯; এতদ্ব্যতীত হাশর ২, আন'আম ২৬, যুমার ২১, ক্বামার ১৭, ২২, ৩২, নাহ্‌ল ৪৪ ইত্যাদি।

৮. و شرط الإجتهاد أن يَحْوِى علمَ الكتاب بمَعَانيه اللُّغَوِيَّة و الشَّرْعِيَّة و وجوهَهُ (أى أقسامه من الخاصِ و العام و الأمر و النهى و غيرِها من الأحكام و لكن لا يُشْتَرَطُ علمُ جميعِ ما فى الكتابِ بل قَدْرَ ما يَتعلَّقُ به الأحكامُ .. و يَحْوِى على علمِ السنةِ بِطُرُقِها .. و وجوه القياسِ – আহমাদ বিন আবু সাঈদ বিন ওবায়দুল্লাহ লাক্ষৌবী ওরফে মোল্লা জিউন (১০৪৭-১১৩০), 'নূরুল আন্‌ওয়ার শারহুল মানার' (কানপুর, ভারতঃ কাইয়ূমী প্রেস ১৩৫৯/১৯৪০) পৃঃ ২৪৬।

৯. (و حكمُهُ غَلَبَةُ الظنِّ على إحتمالِ الخطاء فالمجتهدُ عندنا يُخْطِى و يُصِيْبُ) ছাদরুশ শারী'আহ (মৃঃ ৭৪৭ হিঃ), তাওযীহ শারহু তানক্বীহুল উছূল (কলিকাতাঃ মাযহারুল আজাইব প্রেস, ১২৭৮/১৮৬১ খৃঃ) পৃঃ ৩১৮।

১০. (لا يَحِلُّ القياسُ والخبرُ موجودٌ) ইমাম শাফেঈ, 'আর-রিসালাহ' (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ, তারিখবিহীন) পৃঃ ৫৯৯।

১১. (عن أبى هريرة قال قال رسول الله (ص) إذا حَكَمَ الحاكمُ فاجتهَدَ فأصابَ فلهُ أجرَانِ و إذا اجتهَدَ فأخطَأَ فلهُ أجْرٌ ، رواه النسائى) ইমাম আবু আবদুর রহমান আহমাদ বিন শু'আইব নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হিঃ) সংকলিত 'সুনানুন নাসাঈ' আল্লামা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী লাহোরীর (১৩২৭-১৪০৮ হিঃ) শরহ সহ (লাহোরঃ মাকতাবা সালাফিইয়াহ, ১৩৭৬/১৯৫৬) 'আদাবুল কুযাত' অধ্যায় হা-৫৩৮৩, ২য় খণ্ড পৃঃ ৩০০; মিশকাত (বৈরূত ছাপা) 'ইমারত' অধ্যায় হা-৩৭৩২, ২য় খণ্ড পৃঃ ১১০২।

১২. এ ধরণের ৮২টি উদাহরণসহ আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ 'ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন' (বৈরূতঃ ১৯৭৩) ১ম খণ্ড পৃঃ ২৪৬-২৪৯; পরবর্তীযুগে রায় ও কিয়াসপন্থীদের দ্বারা দ্বীনের যে

মারাত্মক ক্ষতি হবে সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের পক্ষ হ'তে বহু হুঁশিয়ার বাণী সংকলন করেছেন হাফেয ইবনু আবদিল বার্র কর্তবী (৩৬৮-৪৬৩ হিঃ) স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ 'জামিউ বায়ানিল ইল্ম'-এর মধ্যে। ইমাম ছালেহ ফুল্লানী (১১৬৬-১২১৮হিঃ) -এর 'ঈক্বাযু হিমাম' (বৈরুত ছাপা ১৩৯৮/১৯৭৮)-এর মধ্যে এ ধরণের ৩২-এর অধিক বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।-পৃঃ ৯-১৫।

১৩. Salahuddin Khudabakhsh & D. S. Margoliouth, The RENAISS-ANCE OF ISLAM (Trans. from German) Idara-i-Adabiat-i-Delhi. Delhi 1979. p.211. (ثم إنَّ من الناسِ مَنْ حَكَمَ لوجوبِ الخَلْوِ من بعد العلامة النَّسَفِي و اختَتَمَ الإجتهادُ فى المذهبِ و أما الإجتهادُ المطلقُ فقالوا إختتَمَ بالائمةِ الأربعةِ حتى أوجَبُوْا تقليدَ واحدٍ من هؤلاءِ على الأمةِ و هذا كله هَوَسٌ من هَوَسَاتِهِم لم يأتوا بدليلٍ ولا يُعْبَأُ بكلامهم) বাহ্রুল উলূম মাওলানা আবদুল আলী লাক্ষ্ণৌবী, 'ফাওয়াতেহুর রাহ্মূত শরহ মুসাল্লামুছ ছুবূত' (লাক্ষ্ণৌ ঃ নওলকিশোর ১২৯৫ / ১৮৭৮) পৃঃ ৬২৪; (لا نُسَلِّمُ أنَّ الإجتهادَ يَنْحَصِرُ فى الإجتهادِ المطلقِ.. فيجوز أن يجتهدَ مَنْ ليس له رُتْبَةُ الإجتهاد) মোল্লা মুহাম্মাদ বিন মুঈন সিন্ধী, 'দিরাসাতুল লাবীব' (লাহোরঃ বায়তুস্ সাল্তানাহ ১২৮৪/১৮৬৮) পৃঃ ১২।

১৪. إن المقلدين حكموا على الله قدرا و شرعا بالحكم الباطل جهارا المخالف لما أخبر به رسوله فأخْلَوا الارضَ من القائمين لله بحججه و قالوا: لم يبق فى الأرض عالم منذ الأعصار المتقدمة فقالت طائفة: ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد.. واختلفوا متى انسد باب الإجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان،) হাফেয ইবনুল কাইয়িম, 'ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন' (বৈরুত ছাপা) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৭৫-৭৬।

১৫. (لا إجتهاد فى القطعيات) 'ইরশাদুল ফুহূল' (মিসরঃ বাবী হালবী প্রেস ১৩৫৬/১৯৩৭) পৃঃ ২৫০; ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন ২য় খণ্ড পৃঃ ২৭৯ হ'তে ২৯৩ পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৬. (إجتهاد الرأي إنما يباح للمضطر كما تباح له الميتة و الدم عند الضرورة.. وكذلك القياس إنما يصار إليه عند الضرورة - قال الإمام أحمد : سألت الشافعى عن القياس فقال: عند الضرورة ، ذكره البيهقى فى مدخله - ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন ২য় খণ্ড পৃঃ ২৮৪।

১৭. 'তাকলীদ' অধ্যায়ে ৫৯ ও ৬০ নং টীকা সমূহ দ্রষ্টব্য।

১৮. يا أيها الذين امنوا أطيعوا اللهَ و أطيعوا الرسولَ و أولي الأمرِ منكم ، فإن تنازعتُمْ فى شيءٍ فَرُدُّوْهُ إلى اللهِ و الرسولِ إنْ كنتمْ تؤمِنُوْنَ باللهِ و اليومِ الأخِرِ ، ذلك خيرٌ و أحْسَنُ تاويلاً- সূরায়ে নিসা ৫৯।

১৯. বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন (বৈরুতঃ ১৯৭৩) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ

৩৭২-৭৮।

২০. (لقد أرسلنا رُسُلَنَا بالبينات و أنزلنا معهم الكتابَ و الميزانَ لِيَقُوْمَ الناسُ بالقسْط ، و أنزلنا الحديدَ فيه بأسٌ شديدٌ و مَنَافِعُ للناسِ و لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ و رُسُلَهُ بالغيب ، إن اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ- হাদীদ ২৫।

২১. (و تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا و عَدْلاً، لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِه ، وهو السَّمِيعُ العليمُ) আন'আম ১১৫।

২২. (وقُلِ الحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ، فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ و مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ، إنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا) কাহাফ ২৯।

২৩. (.. فَلْيَحْذَرِ الذين يُخَالِفُونَ عن أمرِهٖ أنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُصِيْبَهُمْ عَذابٌ أليمٌ) নূর ৬৩ দ্র.'তাফসীর ইবনু কাছীর' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ২য় সংস্করণ, ১৪০৮/১৯৮৮) ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩১৯।

২৪. (.. وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فاولٰئك هُمُ الكافِرونَ- .. الظالِمونَ- ..الفاسِقونَ-) মায়িদাহ ৪৪, ৪৫, ৪৭-৫০।

২৫. (يٰا ايها الذين اٰمنوا كونوا قَوَّامِيْنَ لِلّٰه شُهَدَاءَ بالقسْط ، ولايَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ علىٰ أَنْ لا تَعْدِلُوا ، إعْدِلُوا، هو أقربُ لِلتَّقْوٰى، واتَّقُوا اللّٰهَ ، إنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ-) মায়িদাহ ৮।

২৬. (و لَكُمْ فِى القِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰا أُولِى الألبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ) বাক্বারাহ ১৭৯, মায়িদাহ ৪৫।

২৭. ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩৩; মুত্তাফাক আলাইহ-মিশকাত 'কুরবাণীর দিনে খুৎবা' অধ্যায়, হাদীছ সংখ্যা ২৬৫৯ (বৈরুত ছাপা) ২য় খণ্ড পৃঃ ৮১৬। (فإنَّ دماءكم و أموالَكم و أعراضَكم عليكم حرامٌ كحُرْمَةِ يَوْمِكم هذا فى بَلَدِكم هذا فى شَهْرِكم هذا ..)

২৮. عن جابر بن عبد الله قال خطبَنَا رسولُ اللّٰه (ص) وَسْطَ أيامِ التشريقِ خطبةَ الوداعِ فقال يٰأيها الناسُ ألا إنَّ ربَّكم واحدٌ، لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ على عَجَمِيٍّ و لا لعجميٍّ على عربيٍّ و لا لأسودَ على أحمرَ و لا لأحمرَ على أسودَ إلا بالتقوىٰ ، إنَّ أكرمَكم عند اللّٰه أتقاكم ، ألا هل بَلَّغْتُ ؟ قالوا بلىٰ يا رسولَ اللّٰه ... ، رواه أحمد فى مسنده ج٥ ص٤١١- মুসনাদে আহমাদ বৈরুতঃ দারুল ফিক্র ১৩৯৮/১৯৭৮) ৫ম খণ্ড পৃঃ ৪১১।

২৯. (..إنَّ اكرمَكم عند الله اَتْقاكم ، إنَّ اللّٰهَ عليمٌ خبيرٌ) হুজুরাত ১৩; তাফসীরে ইবনে কাছীর (বৈরুত ছাপা) সূরায়ে হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৩০. (الرجالُ قَوَّامُوْنَ علىٰ النساء ، نساء ٣٤) নিসা ৩৪।

৩১. (.. أنَّ القُوَّةَ لِلّٰه جَمِيْعًا، و أنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ العَذَابِ) বাক্বারাহ ১৬৫, রা'আদ ৩১।

৩২. (وشَاوِرْهم فى الأمرِ ، آل عمران ١٥٩) আলে ইমরান ১৫৯।

৩৩. হাকীম আবুল হাসান ওবায়দুল্লাহ খান, ইসলামী সিয়াসাত ইয়া সিয়াসী ইসলাম- উর্দু (শ্রীনগর-কাশ্মীরঃ ইসলামিক পাবলিকেশন্‌স ১৯৭৮ খৃঃ) পৃঃ ৯১।

৩৪. ما كان لِنَبِيٍّ أَنْ يكونَ لهُ أسْرٰى حتّٰى يُثْخِنَ فى الارضِ ، تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدنيا و اللّٰهُ يُرِيْدُ الأُخِرَةَ ،و اللّٰهُ عزيزٌ حكيمٌ- لولا كتابٌ من اللّٰهِ سَبَقَ لمسَّكم فيما أخَذْتُمْ عذابٌ عظيمٌ - আনফাল ৬৭, ৬৮।

৩৫. (وإنْ تُطعْ أكثرَ مَنْ فى الأرضِ يُضِلُّوْكَ عن سبيلِ اللّٰهِ ، إنْ يَتَّبِعُوْنَ إلا الظَّنَّ وإنْ هم إلا يَخْرُصُوْنَ) আন'আম ১১৭।

৩৬. (يٰأيها الناسُ كُلُوْا مِمَّا فى الأرضِ حَلاَلاً طَيِّبًا ، و لا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشيطانِ ، إنَّهُ لكم عَدُوٌّ مُبِيْنٌ - البقرة ١٦٨) বাক্বারাহ ১৬৮, ১৭২, এতদ্ব্যতীত মায়েদাহ ৮৮, নাহ্‌ল ১১৪।

৩৭. (لا تأكُلُوْا أموالَكم بينَكم بالباطلِ و تُدْلُوْا بها إلىٰ الحُكَّامِ لِتَأكُلُوْا فريقًا من أموالِ الناسِ بالإثمِ و أنتم تَعْلَمُوْنَ - البقرة ١٨٨) বাক্বারাহ ১৮৮, নিসা ২৯।

৩৮. (.. وأحَلَّ اللّٰهُ البَيْعَ و حَرَّمَ الرِّبٰوا..(البقرة ٢٧٥) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا و يُرْبِى الصَّدَقَاتِ و اللّٰهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثِيْمٍ (٢٧٦) يٰأيها الذين آمنوا اتَّقُوْا اللّٰهَ و ذَرُوْا ما بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ - فإن لم تَفْعَلُوْا فَأذَنُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ و رسولِهِ ، وإنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أمْوَالِكُمْ ، لا تَظْلِمُوْنَ ولا تُظْلَمُوْنَ -(٢٧٨، ٢٧٩) বাক্বারাহ ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৭৯।

৩৯. (.. كَيْ لا يَكُوْنَ دُوْلَةً بين الأغنيَاءِ منكم .. (الحشر ٧) হাশর ৭।

৪০. عن عمر قال قال رسول الله (ص) الجالبُ مَرْزُوْقٌ والمحتكِرُ مَلْعُوْنٌ رواه ابن ماجة و الدارمى و فى رواية لمسلم عن معمر.. من احتكرَ فهو خاطئٌ - মিশকাত (বৈরুত ছাপা ১৪০৫/১৯৮৫) ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৭৫-৮৭৬।

৪১. (كُلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو رِبَوا، الحديث نقله ابن القيم ، و قد روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا " من زادَ او ازدادَ فقد أرْبٰى".. ح ١٥٩٦ كتاب المساقاة) ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩৩;মুসলিম (বৈরুত ছাপা ১৪০৩/১৯৮৩) 'মুসাক্বাত' অধ্যায় হা-১৫৯৬, ৩য় খন্ড পৃঃ১২১৭।

৪২. (يٰا ايها الذين امنوا إنما الخَمْرُ و المَيْسرُ و الانصابُ و الازلامُ رِجْسٌ من عَمَلِ الشيطانِ فاجْتَنِبُوْهُ لعلكم تُفْلِحُوْنَ) মায়িদাহ ৯০; দ্রঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর (বৈরুত ছাপা) ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৫।

৪৩. (واَقِيموا الصلوٰةَ و أتُوا الزكوٰةَ و اركَعُوْا مع الراكعينَ) বাক্বারাহ ৪৩, ৮৩, ১১০, ১৭৭,২৭৭; নিসা ৭৭, ১৬২; মায়িদাহ ১২, ৫৫; আ'রাফ ১৫৬; তাওবাহ ৫, ১১, ১৮, ৭১; কাহাফ ৮১; মারিয়াম ১৩, ৩১, ৫৫; আম্বিয়া ৭৩; হজ্জ ৪১, ৭৮; মুমিনূন ৪; নূর ৩৭, ৫৬; নামাল ৩; রূম ৩৯; লুক্বমান ৪; আহযাব ৩৩; হামীম সাজ্দাহ ৭; মুজাদালাহ ১৩; মুয্যাম্মিল ২০; বাইয়িনাহ ৫= ১৯টি সূরায় মোট ৩২ জায়গায় 'যাকাত' সম্পর্কে বলা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৯ জায়গায় ছালাত ও যাকাত পরপর বর্ণিত হয়েছে।

৪৪. (يُوْصِيكم اللهُ فى اولادكم ، للذكَرِ مثْلُ حَظِّ الانثيَيْنِ،) নিসা ১১, ১২, ১৭৬।

৪৫. ৪০নং টীকা দ্রষ্টব্য; মিশকাত (বৈরুত ছাপা) ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৭৫।

৪৬. (يَا ايها الذين امنوا اَنْفِقُوْا من طيبات ما كَسَبْتُمْ و ممَّا اَخْرَجْنَالكم منَ الارض ، ولا تَيَمَّمُوْا الخبيثَ منه تُنْفِقُوْنَ و لَسْتُمْ بِاٰخذيه إلا اَنْ تُغْمِضُوْا فيه ، واعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ) বাক্বারাহ ২৬৭, ১৯৫, ২৬১, ২৭২ সহ সর্বমোট ১৮টি সূরার ৪৩টি আয়াতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তাঁর পথে ব্যয়-বন্টন সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

৪৭. و لا تَقْرَبُوْا الفَواحِشَ ما ظَهَرَ منها و ما بَطَنَ .. (الانعام ١٥١) আন'আম ১৫১, আ'রাফ ৩৩।

৪৮. (إقرأ باسم رَبِّكَ الذى خَلَقَ) আলাক্ব ১।

৪৯. (عن أنس قال قال رسول الله (ص) طلب العلم فريضة على كل مسلم ، رواه ابن ماجه و روى البيهقى و قال: هذا حديث متنه مشهور و إسناده ضعيف و قد روى من أوجه كلها ضعيف- قال الالبانى: و اعلم أن السيوطى قد جمع هذه الطرق حتى أوصلها إلى الخمسين و حكم من أجلها على الحديث بالصحة- و حكى العراقى صحته عن بعض الائمة و حسنه غير واحد والله أعلم- মিশকাত (বৈরুত ছাপা) 'ইল্‌ম' অধ্যায় হা-২১৮, ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৬।

৫০. (عن عائشة قالت: سئل رسول الله (ص) عن البِتْعِ و هو نبيذ العسل فقال: كل شرابٍ أسكرَ فهو حرامٌ - متفق عليه) মিশকাত 'হুদূদ' অধ্যায় হা- ৩৬৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৯, ৫২; ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৮০-৮৩ (عن جابر أن رسول الله (ص) قال: ما أسكر كثيرُهُ فقليلُهُ حرامٌ رواه الترمذى و أبوداود و ابن ماجه ، مشكوة ح/٣٦٤٥)

৫১. (.. و لا تَشْرَبِ الخَمْرَ فإنها مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ .. رواه ابن ماجة عن أبى الدرداء) মিশকাত 'ছালাত' অধ্যায় হা- ৫৮০ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৮৩।

৫২. (عن ابن عمر قال قال رسول الله (ص) لعنت الخمر على عشرة وجوه : لعنت الخمرُ بعينها و شاربُها و ساقيها و بائعها و مبتاعها و عاصرها و معتصرها و حاملها و المحمولة إليه و آكلَ ثمنها، رواه أبوداؤد و إبن ماجه) তাফসীর ইবনে কাছীর (বৈরুত) ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৭, মিশকাত (বৈরুত) 'বুয়ূ' অধ্যায় হা- ২৭৭৬, ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৪৬।

৫৩. বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ 'ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন' ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩২-৩৪, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৭২-৭৮।

৫৪. (لقد كان لكم فى رسولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُوا اللهَ و اليومَ الأٰخرَ و ذَكَرَ اللهَ كثيراً) আহ্‌যাব ২১ আয়াত।

৫৫. (و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ..) আলে ইমরান ১০৩ আয়াত।

৫৬. (قال رسول الله (ص) كتابُ اللّٰه هو حَبْلُ اللّٰه المَمْدُوْدُ من السماءِ إلى الارضِ ، رواه ابن جرير عن أبى سعيد الخدرى - نقله ابن كثير فى تفسيره) তাফসীর ইবনে কাছীর (বৈরুত) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৯৭।

৫৭. (و أنَّ هذا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ، و لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عن سبيلِهِ ، ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - الانعام ١٥٣) আল-আন'আম ১৫৩।

৫৮. (وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ الناسَ أُمَّةً واحدةً ولا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ - إلا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ و الناسِ أَجْمَعِيْنَ - هود ١١٨، ١١٩) হূদ ১১৮, ১১৯।

৫৯. (ولا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ و أُولٰئِكَ لهم عذابٌ عظيمٌ) আলে ইমরান ১০৫।

৬০. আল্লামা সৈয়দ রশীদ রিযা, 'মুখতাছার তাফসীরুল মানার' পরিমার্জনেঃ মুহাম্মাদ আহমাদ কিন'আন সম্পাদনায়ঃ যুহাইর শাভিশ (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী ১৪০৪/১৯৮৪) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬২-৭০।

৬১. (يَاَيها الذينَ اٰمنوا أَطِيْعُوا اللّٰهَ و أَطِيعُوا الرسولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إلى اللّٰهِ و الرسولِ ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الأٰخِرِ ، ذٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيْلا) নিসা ৫৯।

৬২. (و من يُشَاقِقِ الرسولَ من بعد ما تَبَيَّنَ لَهُ الهُدٰى و يَتَّبِعْ غيرَ سبيلِ المؤمنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جهنمَ و سَاءَتْ مَصِيْرًا) নিসা ১১৫।

৬৩. قال عمر بن الخطاب .. لا إسلامَ إلا بجماعةٍ و لا جَمَاعَةَ إلا بِأَمارَةٍ و لا إمارةَ إلا بطاعة ইউসুফ ইবনু আবদিল বার্র কর্তবী আন্দালুসী (৩৬৮-৪৬৩ হিঃ), 'জামিউ বায়ানিল ইল্‌ম' (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ, তারিখবিহীন) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬২।

৬৪. عن ثَوْبَانَ .. ولا تَزَالُ طا ئفةٌ من أُمَّتِي على الحقِّ ظاهِرِينَ ، لا يَضُرُّهم مَنْ خالَفَهم حتّٰى يأتِيَ أمرُ اللّٰه - رواه أبو داؤد و مسلم و الترمذي) মিশকাত 'ফিতান' অধ্যায় হা- ৫৪০৬, মু'আবিয়া হতে বর্ণিত 'এই উম্মতের ছওয়াব' অধ্যায় হা- ৬২৭৬, ৬২৮৩, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৪৮৮, ১৭৬৯,১৭৭১; (قليلٌ من عبادِيَ الشُّكُوْرُ) সাবা ১৩; (عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) بَدَأَ الإسلامُ غريبًا و سَيَعُوْدُ كما بدأ فطُوبٰى للغُرَبَاءِ ، رواه مسلم - মিশকাত (বৈরুত ছাপা) 'ইতিছাম বিল কিতাব' অধ্যায়, হা- ১৫৯ ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৬।

৬৬. বিভিন্ন যুগে জামা'আতবদ্ধ হ'য়ে দ্বীনের দা'ওয়াত ও তাবলীগ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ আবদুর রহমান আবদুল খালেক রচিত 'জামা'আত সংগঠনের মূলনীতি' أصول العمل الجماعي শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ, মাসিক 'আল-ফুরক্বান'। - সম্পাদকঃ জাসেম মুহাম্মাদ আল-'আউন (ছাফাত-কুয়েতঃ ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যা ১৯৯০); আবদুর রহমান আবদুল খালেক, 'শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ ওয়াল আমালুল জিমাঈ' (ছাফাত-কুয়েতঃ জমঈয়াতু এহ্‌ইয়াইত্ তুরাছিল ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৪১০/১৯৯০)।

২য় খণ্ড

الجزء الثانى

تاريخ أهل الحديث و تطوراتها في جنوب آسيا

فلو تسأل الأيام عنى ما دَرَتْ + و أين مكانى ما عرفْنَ مكانى

تغطيتُ عن دهرى بظل جناحِهِ + فعينى ترى دهرى و ليس يَرانى

ঐ ব্যক্তি সত্যিকারের জ্ঞানী নয়, যার ইতিহাস জ্ঞান নেই

অধ্যায়-৭

الفصل السابع

দক্ষিণ এশিয়ায় আহ্লেহাদীছ আন্দোলন

حركة أهل الحديث فى جنوب آسيا

প্রাথমিক যুগ (২৩-৩৭৫/৬৪৪-৯৮৪ খৃঃ)ঃ

দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারত উপ-মহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে আরব বণিকদের মাধ্যমে, এসব এলাকায় বসতি স্থাপনকারী আরব মুসলিমদের মাধ্যমে, খিলাফতে রাশিদার সময় হ'তে ক্রমাগত রাজনৈতিক অভিযান সমূহের মাধ্যমে এবং সেই সঙ্গে আগত ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈ বিদ্বানদের নিরন্তর দা'ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে। সেই হ'তে আজ পর্যন্ত উপমহাদেশে মুসলমানের বসবাস রয়েছে এবং বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও তাদের আক্বীদা ও আমলে এসেছে বহু পরিবর্তন, কুরআন ও সুন্নাহ্র স্বচ্ছ সলিলে ঘটেছে বহু মতের সংমিশ্রণ।

একথা অনস্বীকার্য যে, ছাহাবায়ে কেরামই ছিলেন ইসলামের বাস্তব নমুনা। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী তাঁদের সার্বিক জীবন পরিচালিত হ'ত। পরবর্তী যুগে সৃষ্ট মাযহাবী দলাদলি হ'তে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। উদ্ভূত কোন সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা কুরআন ও হাদীছ থেকে সিদ্ধান্ত তালাশ করতেন। না পেলে ছাহাবীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত (ইজমা) অনুসন্ধান করতেন। সেখানেও না পাওয়া গেলে কুরআন ও সুন্নাহ্র মূলনীতির আলোকে 'ইজতিহাদ' করতেন। পরবর্তীতে কোন ছহীহ হাদীছ অবগত হ'লে ইতিপূর্বেকার গৃহীত ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতেন। কোনরূপ ব্যক্তিগত বা দলীয় যিদ ও অহমিকা তাঁদেরকে হাদীছের অনুসরণ হ'তে বিরত রাখতে পারতনা। তাঁরা ছিলেন সুন্নাতের হেফাযতকারী, হাদীছের প্রচারক ও নিরপেক্ষ অনুসারী। তাঁরা হাদীছের প্রচলিত ও প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতেন। কোনরূপ দূরতম সম্ভাবনা ব্যক্ত করে 'তাবীল'-এর আশ্রয় নিতেন না। মোটকথা জীবন সমস্যার সমাধান সরাসরি

কুরআন ও হাদীছ হ'তে গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা সদা সচেষ্ট থাকতেন। আর এজন্য তাঁরা যথার্থভাবেই নিজেদেরকে 'আহ্লুল হাদীছ' নামে অভিহিত করতেন এবং প্রথম শতাব্দী হিজরীর শেষার্ধে সৃষ্ট খারেজী, শী'আ, মুর্জিয়া, জাব্‌রিয়া, ক্বাদারিয়া প্রভৃতি বিদ'আতী ফের্কাসমূহ হ'তে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতেন। তাবে-তাবেঈগণও এই তরীকার অনুসারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী এ ব্যাপারে স্মরণযোগ্য- 'শ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, তারপর পরবর্তীদের, তারপর তাদের পরবর্তীদের ..।' -ছাহাবীদের যুগ ১০০ বা ১১০ হিজরী, তাবেঈদের যুগ ১৮০, তাবে-তাবেঈদের যুগ ছিল ২২০ হিজরী পর্যন্ত।[১]

একথা বলা চলে যে, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের স্বর্ণযুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁদের হাতে বিজিত এলাকা সমূহের মুসলিমগণ তাঁদের ন্যায় 'আহলুল হাদীছ' ছিলেন। পরবর্তীতে বহু রাজনৈতিক চাপ ও উত্থান-পতন সত্ত্বেও পঞ্চম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শহর ও এলাকা সমূহে 'আহলুল হাদীছ' নামেই তাদের বসবাস যে উল্লেখযোগ্য হারে ছিল তা মাকদেসীর ভ্রমণবৃত্তান্ত ও আবদুল কাহির বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯/১০৩৭ খৃঃ) -এর বক্তব্যে বিবৃত হয়েছে।[২]

ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও তাঁদের অনুসারী মুহাদ্দিছ উলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমেই পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার ন্যায় দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম ইসলাম প্রচারিত হয়। তাঁদের হাতে ইসলাম ছিল তার নিজস্ব রূপে দীপ্যমান। সেই সময়ে আরবীয় বণিকদের মাধ্যমে যে ইসলাম দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে ও ব্যবসা কেন্দ্রে প্রচারিত হয়, তাও ছিল নির্ভেজাল এবং ছাহাবা ও তাবেঈ বিদ্বানদের আদর্শপ্লুত। কুরআন ব্যতীত তাঁদের সম্মুখে আর কোন গ্রন্থ ছিল না। রাসূল ও ছাহাবীদের আদর্শ ব্যতীত তাঁদের নিকটে আর কোন আদর্শ ছিল না। তাঁদের মাধ্যমে এদেশে কুরআন ও হাদীছের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। তাঁদের হাতেই ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের বীজ উপ্ত হয়েছে। তাঁদের ব্যাপক দা'ওয়াত ও তাবলীগের ফলে মাত্র ৭০ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ৯৩ হিজরীতে মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিম (৬৬-৯৬ হিঃ) যখন সিন্ধু আসেন, তখন মুসলিম জনগণের নিরাপত্তার জন্য কেবল মুলতানেই পঞ্চাশ হাযার সৈন্যের একটি বহর নিয়োগ করতে হয়। এতদ্ব্যতীত মানছূরা, আলোর

প্রভৃতি শহরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী সামরিক কেন্দ্র ছিল। এইভাবে মানছূরা, মুলতান, সিন্দান, কুছদার (বেলুচিস্তান), কান্দাবীল প্রভৃতি স্থানগুলি কেবলমাত্র আরব বসতি কেন্দ্র ছিলনা বরং কুরআন ও হাদীছের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেও মর্যাদাপূর্ণ ছিল।'[৩]

প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে, ইল্‌মে হাদীছের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে যুক্ত। সেকারণে উপমহাদেশে হাদীছ চর্চার যুগগুলিকে আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলনের যুগ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। এখানে উপমহাদেশকেই আমরা প্রধান ভূমিকায় রাখব। কারণ মুসলিম রাজনৈতিক উত্থান-পতন এখানেই সবচেয়ে বেশী হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের প্রচারকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আহলেহাদীছ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যদিও মুসলিম-অমুসলিম কোন কোন পন্ডিতের দৃষ্টিতে তারা 'শাফেঈ' বলে অভিহিত হয়েছেন। মাকদেসী (মৃঃ ৩৭৫ -এর পরে), আব্দুল কাহির বিন তাহির বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯/১০৩৭), মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হিঃ) 'শাফেঈ' মাযহাবকে 'আহলেহাদীছ' হিসাবে গণ্য করেছেন।[৪] এটি প্রযোজ্য হ'তে পারে যদি হাদীছের উপরে 'রায়'-এর প্রাধান্য না থাকে।

তিনটি যুগ

উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে আমরা তিনটি প্রধান যুগে চিহ্নিত করতে পারি। ১- প্রাথমিক যুগঃ ২৩-৩৭৫/৬৪৪-৯৮৪ খৃঃ, অন্যূন সাড়ে তিনশত বছর ২- অবক্ষয় যুগঃ ৩৭৫-১১১৪/৯৮৪-১৭০৩ খৃঃ, অন্যূন ৭৩৯ বছর এবং ৩- আধুনিক যুগঃ শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২) থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত। ৩৭৫ হিজরী থেকে অলিউল্লাহ যুগ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসর সময়কালকে আমরা উপমহাদেশীয় বিচারে 'অবক্ষয় যুগ' (Age of Decadece) বলেছি। কারণ 'গযনবী যুগে' (৩৮৮-৪৪৩/৯৯৭-১০৩০ খৃঃ) ক্ষমতাহারা শী'আদের গোপন দৌরাত্ম্য খুবই বেশী থাকায় সিন্ধুতে হাদীছ চর্চা ও আহলেহাদীছ আন্দোলন পুনরায় জোরদার হ'তে পারেনি। বাহমনী (৭৮০-৮৮৬/১৩৭৮-১৪৭২ খৃঃ) ও মুযাফ্‌ফরশাহী যুগে (৮৬৩-৯৮০ / ১৪৫৮-১৫৭২ খৃঃ) আহলেহাদীছ আন্দোলন কেবল দক্ষিণ ভারতেই জোরদার ছিল। কিন্তু রাজধানী দিল্লী হ'তে বাংলাদেশ পর্যন্ত উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিশাল

এলাকায় আহ্‌লুর রায়দের হুকুমত, সুবিধাভোগী আলেমদের চক্রান্ত ও ব্যাপক সামাজিক অনুদারতার ফলে আহলেহাদীছ আন্দোলন একেবারে নিবু নিবু পর্যায়ে চলে এসেছিল। অতঃপর আওরঙ্গযেব (১০৬৮-১১১৮/১৬৫৮-১৭০৭ খৃঃ)-এর পরবর্তী ভোগলিপ্সু শাসকদের আমলে দিল্লীর মাদরাসা রহীমিয়ার মাধ্যমে অলিউল্লাহ পরিবারের উত্থান আহলেহাদীছ আন্দোলনে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করে। শাহ ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১ খৃঃ) -এর জিহাদ আন্দোলনের সময়ে যা দ্রুতগতিতে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। মাদরাসা রহীমিয়ারই পরবর্তী বিহারী শিক্ষক শায়খুল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) বিপুল ছাত্রবাহিনীর মাধ্যমেই প্রধানতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ ধারণ করে এবং দক্ষিণ এশিয়ার বাইরেও বিস্তার লাভ করে।

প্রাথমিক যুগ (২৩-৩৭৫ হিঃ/ ৬৪৪-৯৮৪ খৃঃ)

এই যুগের মহান নেতৃবৃন্দ ছিলেন ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও মুহাদ্দিছবৃন্দ। এই সময়ে হিন্দুস্থানে ১৮ জন মতান্তরে ২৫ জন ছাহাবীসহ[৫] উমাইয়া খেলাফতের শেষ (১৩২/৭৫০ খৃঃ) পর্যন্ত সর্বমোট ২৪৫ জন[৬] তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈর শুভাগমন ঘটে। তন্মধ্যে সর্বশেষ ছাহাবী ছিলেন সিনান বিন সালামাহ বিন মুহবিক আল-হুযালী। ইনি মক্কা বিজয়ের দিন জন্মগ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) নিজে তার নাম রাখেন। আমীর মু'আবিয়ার শাসনকালে (৪১-৬০ হিঃ) ৪২ ও ৪৮ হিজরীতে দু'দুবার তাঁকে হিন্দুস্থান বা সিন্ধু এলাকার গবর্ণর হিসাবে প্রেরণ করা হয়। তাঁর মৃত্যু ও মৃত্যুসন সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ মতভেদ করেছেন। তবে বিভিন্ন তথ্য ও যুক্তির আলোকে ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক বলেন যে, 'তিনি ৫৩ হিজরী মোতাবেক ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে বেলুচিস্তানের 'খাযদার' (خضدار) নামক স্থানে শাহাদত বরণ করেন।'[৭]

ছাহাবা ও তাবেঈদের মাধ্যমে উপমহাদেশে ইল্‌মে হাদীছের বীজ বপন হ'লেও হাদীছের প্রচার ও প্রসারে তাঁরা বিশেষ মনোযোগী হ'তে পারেননি। কারণ রাসূলের (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্ত ছাহাবা ও তাবেঈগণকেই সাধারণতঃ বিভিন্ন অভিযানে নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হ'ত। ফলে যুদ্ধের পরিবেশে ইল্‌মে হাদীছের প্রচার আশানুরূপ হয়নি। ২য়তঃ

যুদ্ধাভিযান শেষে উপমহাদেশে তাঁদের অবস্থানকাল থাক্‌ত খুবই সংক্ষিপ্ত। ৩য়তঃ ইল্‌মে হাদীছের প্রচারের জন্য যে রাজনৈতিক ও সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রয়োজন ছিল, তা অনেক ক্ষেত্রে অর্জিত হয়নি। তবুও ইসলামের সাবলীলতা এবং ছাহাবা ও তাবেঈ বিজ্ঞ জনের অনুপম চরিত্র মাধুর্যে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এদেশের অগণিত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা ছাহাবা ও তাবেঈ বিদ্বানদের প্রভাবে শিরক ও বিদ'আত থেকে মুক্ত ছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

এছাড়া মুহাম্মাদ বিন কাসিম (৬৬-৯৬ হিঃ) দেবল, মুলতান ও তৎসন্নিহিত এলাকাসমূহে মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে কয়েকটি শহর গড়ে তোলেন। গড়ে ওঠে বায়যা, মাহ্‌ফূযা, মানছূরা প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগরীসমূহ। এসব এলাকায় মসজিদ সমূহ নির্মাণ করা হয়। নিয়োগ করা হয় পৃথকভাবে আমীর, খতীব ও কাযীবৃন্দ। মুসলমানগণ এইসব শহরে অত্যন্ত শান্তিতে ও নির্বিবাদে জীবন যাপন করতেন। আরব সেনাবাহিনীতে বিশেষভাবে এমনকিছু বিদ্বানকে পাঠানো হয়েছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৭৬-৯৬ হিঃ) যাদেরকে হিন্দুস্থান এলাকায় কুরআন-হাদীছ শিক্ষা দেওয়ার জন্যই নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা অনেকেই এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং কুরআন ও হাদীছের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। ফলে দেবাল, মুলতান, কুছদার (বেলুচিস্তান), লাহোর, মানছূরা (করাচী) প্রভৃতি শহরগুলি ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের জন্য আলিম ও মুহাদ্দিছ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।[৮]

এখানে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। সেটি হ'ল, এইযুগে হিন্দস্থান এলাকায় নিয়োজিত অধিকাংশ ওয়ালী ও কাযীগণ ছিলেন সততা, দ্বীনদারী এবং কুরআন ও হাদীছের ইল্‌মে সমৃদ্ধ উজ্জ্বল তারকাসদৃশ। তাঁদের প্রভাব ছিল প্রজাদের উপরে অসাধারণ। তাঁরা ছিলেন যুগের নমুনা ও সকলের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যেমন উছমান গণী (রাঃ) -এর সময়ে (২৩-৩৫ হিঃ) সিন্ধু এলাকায় কাযী হুকাইম বিন জাবালাহ আবাদী,[৯] আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের যুগে (৬৫-৮৬) সাঈদ বিন আসলাম কিলাবী, মুজা'আ বিন সি'র, মুহাম্মাদ বিন হারূণ বিন যিরা' আল-নুমাইরী[১০] প্রমুখ কাযীবৃন্দ যেমন একদিকে ছিলেন অনন্যসাধারণ বিচারকমন্ডলী, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন কুরআন ও হাদীছে পারদর্শী অতুলনীয়

পন্ডিত। কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত ন্যায়বিচারের ফলে মানুষ কুরআন ও হাদীছের আলোকে জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়, আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের যা প্রধান দাবী।

প্রাদেশিক আমীরদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিম (৬৬-৯৬) ছিলেন অনন্য গুণসম্পন্ন নেতা। তাঁর সময় থেকেই সিন্ধু ইসলামী খেলাফতের স্থায়ী প্রদেশের মর্যাদা পায়। খ্যাতনামা ছাহাবী আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর সম্ভাব্য শিষ্য তাবেঈ বিদ্বান তরুণ সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিম ২৭ বৎসর বয়সে ৯৩ হিজরীতে সিন্ধু আগমন করেন এবং ৯৬ হিজরীতে উচ্চমহলের রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার হ'য়ে নিহত হন। মাত্র তিন বছরের স্বল্পকালীন সময়ে সমগ্র বিজিত এলাকায় তিনি ইসলামী শাসনের এমন সুবাতাস বইয়ে দেন যে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মুগ্ধ প্রজাসাধারণ তাঁর বিয়োগ ব্যথায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল এবং অমুসলিমগণ ভক্তি শ্রদ্ধায় তাঁর মূর্তি গড়েছিল।[১১] তাঁর সময়ে চতুর্দিকে ইল্মে হাদীছের চর্চা হ'তে থাকে। আরব জগত হ'তে অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী উলামা ও মুহাদ্দেছীন সিন্ধুতে আগমণ করতে থাকেন। সিন্ধুর বহু ছাত্র আরব দেশে গিয়ে ইল্মে হাদীছের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। ফলে এই যুগে বহু হিন্দী উলামা ও মুহাদ্দিছ-এর জন্ম হয়।

এই যুগের (২৩-৩৭৫) উলামা ও মুহাদ্দেছীনকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১ম- ঐ সকল ভারতীয় বংশোদ্ভূত উলামা, যাঁরা আরব ভূমিতে জীবন কাটিয়েছেন ও মৃত্যুবরণ করেছেন। যেমন খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম মাক্হূল বিন আব্দুল্লাহ সিন্ধী (মৃঃ ১১৩ হিঃ) মূলতঃ কাবুলের মানুষ। কিন্তু সিরিয়াতে জীবন কাটান ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। অনুরূপভাবে তাবেঈ ইমাম আবদুর রহমান সিন্ধী, মূসা সিলানী (সিংহলী), আব্দুর রহমান বিন আবী যায়েদ বেলমানী (সিন্ধু ও গুজরাটের মধ্যবর্তী স্থান), হারেছ বেলমানী, তাবে-তাবেঈ মুহাম্মাদ বিনুল হারেছ বেলমানী, মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বেলমানী, আবদুর রহমান বিন আমর সিন্ধী ওরফে ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭ হিঃ), আবু মা'শার নাজীহ বিন আবদুর রহমান সিন্ধী (মৃঃ ১৭০ হিঃ), আবদুর রহীম বিন হাম্মাদ দেবলী, আবদুর রহমান বিন সিন্ধী, ক্বায়েস বিন বুস্র বিন সিন্ধী, ইয়াযীদ বিন আব্দুল্লাহ সিন্ধী প্রমুখ তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণ'।[১২]

২য়ঃ ঐসকল মুহাদ্দিছ যাঁরা এদেশেই জীবন কাটিয়েছেন এবং ইল্মে হাদীছের প্রসার ঘটিয়েছেন।

নিম্নে আমরা এই যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদের নাম উল্লেখ করব, যাঁরা দক্ষিণ এশিয়ায় ও ভারতবর্ষে ইল্মে হাদীছের প্রচারে ও আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রসারে সর্বাধিক অবদান রেখেছেন।

১ম যুগের (২৩-৩৭৫) কয়েকজন সেরা মুহাদ্দিছঃ

১- মূসা বিন ইয়াকূব ছাক্বাফী

আরবের ছাক্বাফী গোত্রের মশহুর মুহাদ্দিছ মূসা বিন ইয়াকূব ছাক্বাফীকে মুহাম্মাদ বিন কাসিম (৬৬-৯৬ হিঃ) আলোরের কাযী নিযুক্ত করেন। একই সাথে তাঁকে জুম'আর খুৎবা প্রদান ও ধর্মীয় বিষয়ক কার্যাবলীর দায়িত্বভার এবং বিশেষভাবে জনগণের নৈতিক সংস্কারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি একনিষ্ঠভাবে সুন্নাতের পাবন্দ ছিলেন। তাঁর পরিবারে কুরআন ও হাদীছের চর্চা খুব বেশী ছিল। তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই বংশানুক্রমে আলোরের কাযীর পদ অলংকৃত ছিল। তিনি স্থায়ীভাবে এদেশে বসবাস করেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও বহুদিন পর্যন্ত তাঁর পরিবার ইল্মে হাদীছে এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, ৬১৩ হিঃ/১২১৬ খৃষ্টাব্দেও এই পরিবারের অন্যতম বিখ্যাত পন্ডিত ইসমাঈল বিন আলী ছাক্বাফী সিন্ধী সমসাময়িক যুগে ইল্ম ও তাক্ওয়া এবং ভাষা ও সাহিত্যে অদ্বিতীয় হিসাবে গণ্য হতেন।[১৩] তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে তাঁর ঊর্ধতন কোন একজন পিতামহ 'মিনহাজুদ্দীন' নামে সিন্ধুতে মুসলিম বিজয়ের যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, তার কিয়দংশ পরবর্তীকালে পাওয়া যায়। আলী বিন হামিদ কূফী তা সংকলন করেন। অতঃপর সেখান থেকে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় পর্যন্ত ইতিহাস ফারসী ভাষায় 'ফতহনামা' বা 'চাচনামা' নামে ৬১৩ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।[১৪]

২-ইসরাঈল বিন মূসা বাছ্রী (মৃঃ ১৫৫/৭৭১ খৃঃ)

ইনি মূলতঃ বছরার অধিবাসী হ'লেও সিন্ধুতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এজন্য তাঁকে 'নাযীলুল হিন্দ' বলা হয়।[১৫] তিনি তাবে-তাবেঈ ছিলেন। তিনি হাদীছের একজন বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন। ছহীহ বুখারীতে চার জায়গায় তাঁর বর্ণিত হাদীছ

স্থান পেয়েছে। তিনি হাসান বাছরী (২১-১১০ হিঃ), আবু হাযেম আশজা'ঈ (মৃঃ ১১৫ হিঃ), মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হিঃ), ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (৩৪-১১৪) হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন সুফিয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১), সুফিয়ান বিন ওয়ায়না (১০৭-১৯৮), হুসাইন বিন আলী জু'ফী (মৃঃ ২০৫), ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্বান (১২০-১৯৮) প্রমুখ হাদীছশাস্ত্রের যুগস্রষ্ঠা দিকপালগণ। এইসব মহা মনীষীদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হওয়াটাই হাদীছ বিশারদ হিসাবে তাঁর জন্য সর্বাপেক্ষা বড় গর্বের বিষয়। সুনানের কিতাব সমূহেও তাঁর বর্ণিত হাদীছসমূহ রয়েছে।[১৬]

৩-আমর বিন মুসলিম বাহেলী (মৃঃ ১২৩/৭৪০ খৃঃ)

ট্রান্স অক্সিয়ানার দিগ্বিজয়ী সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিমের ভাই আমর বিন মুসলিম খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (৯৯-১০১/৭১৭-৭১৯ খৃঃ)-এর গবর্ণর হিসাবে সিন্ধুতে আগমন করেন। তাঁরই গবর্ণর থাকাকালীন সময়ে খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দাহিরপুত্র জীসাহ সহ হিন্দুস্থানের কয়েকজন রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৭] এই সময় খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয ইসলামী খেলাফতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীছ সংকলনের নির্দেশ জারী করেন। তিনি তাঁর ফরমানে স্পষ্ট করে বলে দেন যে, আহ্লুস্‌সুন্নাহ বা হাদীছপন্থীদের কাছ থেকেই কেবল হাদীছ গ্রহণ করতে হবে, বিদ'আতপন্থীদের কাছ থেকে নয়।' খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীযের সিন্ধুর প্রদেশিক আমীর আমর বিন মুসলিম আল-বাহেলী (মৃঃ ১২৩/৭৪০ খৃঃ) হাদীছপন্থী ছিলেন বলে ধারণা করা যায়। সিন্ধু এলাকায় ইল্‌মে হাদীছের প্রচার ও প্রসারে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি ইয়ালা বিন ওবায়েদ হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে আবু তাহের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছ নাসাঈ ও আবুদাঊদে স্থান পেয়েছে।[১৮]

৪- রবী' বিন ছুবাইহ সা'দী আল-বাছরী (মৃঃ ১৬০/৭৭৬ খৃঃ)

আব্বাসীয় খলীফা মাহ্দী-এর সময়ে (১৫৮-১৬৯/৭৭৫-৭৮৫ খৃঃ) সেনাপতি আবদুল মালিক বিন শিহাব মাসমাঈর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে যে নৌ-অভিযান প্রেরিত হয়, রবী' সেই সঙ্গে ভারতে আসেন। উক্ত বাহিনী দক্ষিণ ভারতের ভ্রুচ

বন্দরের নিকটবর্তী 'ভারভাট' নামক সমৃদ্ধিশালী বন্দরনগরী জয় করে। কিন্তু এই সময় উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক মহামারী ছড়িয়ে পড়লে দেশে ফেরার পথে আক্রান্ত হয়ে রবী' বিন ছুবাইহ পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন। ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৯]

রবী' বিন ছুবাইহ হাসান বাছরীর (২১-১১০ হিঃ) শিষ্য ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শোনা ছাড়াও তিনি হামীদ আত্-ত্বাবীল (মৃঃ ১৪২ হিঃ), ছাবিত আল-বুনানী (৪১-১২৭), মুজাহিদ বিন জাব্র (২১-১০৩) প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছজ্ঞ বিদ্বানগণের নিকট থেকেও হাদীছ শ্রবণ করেন। সমসাময়িক কালের রাবীদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা এত উচ্চে ছিল যে, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (১১৮-১৮১), সুফিয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১), ওয়াকী (১২৯-১৯৭), ইমাম আবুদাউদ তায়ালিসী (মৃঃ২০৩), আব্দুর রহমান বিন মাহদী (১৩৫-১৯৮) প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত হাদীছবিশারদ পন্ডিতগণ সকলেই তাঁর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি হাদীছশাস্ত্রের সেই ঝাণ্ডাবাহীদের অন্যতম ছিলেন, যারা দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীতে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কেউ কেউ তাঁকে 'তাবেঈ' হিসাবে গণ্য করেছেন।[২০]

১ম যুগে (২৩-৩৭৫) সিন্ধু এলাকায় আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রসমূহঃ

সিন্ধুতে হাদীছ চর্চা মূলতঃ ২য় শতাব্দী হিজরীর প্রথম দিকে শুরু হয়। কিন্তু ৪র্থ শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত তা তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেনি। এর কারণ হ'তে পারে মোটামুটি দু'টি। ১- খেলাফতের পূর্বাঞ্চলীয় হিন্দুস্থান ও সিন্ধু এলাকা একটি স্থায়ী প্রশাসনিক অঞ্চলের মর্যাদার বদলে বরং অনেকটা সামরিক কলোনী এলাকা হিসাবে গণ্য হওয়ায় এই এলাকায় আভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতার যথেষ্ট অভাব ছিল- যা ইল্মে হাদীছের চর্চার জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত ছিল। ২- যাতায়াতের কষ্ট ও অসুবিধার কারণে হেজায ও আরবের ইসলামী কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সিন্ধু তথা ভারতবর্ষের যোগাযোগ সহজ ও নিরাপদ ছিলনা। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল ব্যবসায়ী আরবগণই এদেশে আসা-যাওয়ার ঝুঁকি ও কষ্ট স্বীকার করেছেন। ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর স্বনামধন্য পর্যটক মাকদেসীও তাঁর সফর বৃত্তান্তে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।[২১]

তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষার্ধে (২৭০/৮৮৩ খৃঃ) মান্‌ছূরাহ ও মুলতানে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম হ'লে এলাকায় সার্বিকভাবে অগ্রগতির সূচনা হয়। সিন্ধুতে আরবদের শাসন তিনশত বৎসর যাবত কায়েম ছিল। তন্মধ্যে স্বাধীন যুগটি উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ভ্রমণকারীদের বর্ণনা মোতাবেক এই এলাকা তখন শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল। এই সময়ে ইল্‌মে হাদীছের যে অগ্রগতি সাধিত হয়, তা মূলতঃ আভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতার কারণেই সম্ভব হয়েছিল। এখানকার জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা ইল্‌মে হাদীছে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য হেজায, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি এলাকায় গমন করতেন এবং ঐ সমস্ত এলাকার ওলামায়ে কেরাম এই সব এলাকায় আগমন করতেন। বলাবাহুল্য চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে এসে সমস্ত সিন্ধু ইল্‌মে হাদীছের চর্চায় ভরপুর হ'য়ে ওঠে। ফলে অন্যান্য মাযহাবের লোক কিছু কিছু থাক্‌লেও আহ্‌লেহাদীছের সংখ্যা এখানে সর্বদা বেশী ছিল। এই সময় ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্র হিসাবে প্রধানতঃ দেবল ও মানছূরাহ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল। তবে পঞ্চম শতাব্দী হিজরীতে এসে কুছদার (বেলুচিস্তান)-কেও আমরা উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকায় দেখতে পাই।

সিন্ধুর কেন্দ্র সমূহ ও সেখানকার মুহাদ্দিছবৃন্দ

১- দেবলঃ দেবল সিন্ধুর প্রসিদ্ধ প্রাচীন বন্দর নগরী যা বর্তমান করাচী ও থাট্টার মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত ছিল।[২২] এখানেই মুহাম্মাদ বিন কাসিমের (৬৬-৯৬ হিঃ) হাতে সিন্ধুর রাজা দাহিরের পতন ঘটে। এই বন্দরের মাধ্যমেই আরব জগতের সঙ্গে সিন্ধুর ব্যবসায়িক ও ধর্মীয় যোগাযোগ সাধিত হয়। মুহাম্মাদ বিন কাসিম এখানে একটি মসজিদ কায়েম করেন ও প্রাথমিকভাবে চার হাযার আরব মুসলিমকে এখানে এনে আবাদ করেন। ক্রমে এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এটি স্বাধীন মানছূরা রাজ্যের প্রধান বন্দর নগরীতে পরিণত হয়। শহরে লোকসংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, একশত শহরতলীয় গ্রাম সমৃদ্ধ এই বন্দর নগরীতে ২৮০/৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এক ভূমিকম্পে কেবলমাত্র এই নগরীতেই দেড়লাখ লোক মৃত্যুবরণ করেন। ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে এই নগরী ইসলামী শিক্ষা ও ইল্‌মে হাদীছ চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এমনকি আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে এখানে বেশ কয়েকজন হাদীছের রাবীও জন্মগ্রহণ

করেন। এইসব মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের নিরলস তা'লীম ও দা'ওয়াতের ফলেই সিন্ধু ও হিন্দুস্থান এলাকায় আহ্লেহাদীছ আন্দোলন ব্যপ্ত হয়ে পড়ে।

দেবলের মুহাদ্দিছবৃন্দঃ

১- আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হারূণ দেবলী আল-রাযী (২৭৫-৩৭০ হিঃ)ঃ ইনি দেবলে জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদে গিয়ে জা'ফর বিন মুহাম্মাদ আল-ফারিয়াবী (মৃঃ ৩০১ হিঃ) এবং ইব্রাহীম বিন শারীক কূফীর নিকটে হাদীছ শিক্ষা করেন। হাদীছের রাবী হওয়া ছাড়াও তিনি ইল্মে কিরাআতে পারদর্শী ছিলেন। আহমাদ বিন আলী আল-বাদা (মৃঃ ৪২০ হিঃ), আবু ইয়ালা বিন দূমা (৩৪৬-৪৩১), কাযী আবুল 'আলা ওয়াসেত্বী (মৃঃ ৪৩১ হিঃ) তাঁর শিষ্য ছিলেন।[২৩]

২- শু'আইব বিন মুহাম্মাদ আবুল কাসিম দেবলীঃ ইনি ইবনু আবী ক্বাত্ব'আন নামে খ্যাত। ইনি মিসরে গিয়ে হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ বিন ইউনুস তাঁর নিকট থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন। ৩০৫ হিজরীতে তিনি ইছফাহান গমন করেন এবং ৩১৩ হিজরীর দিকে তিনি দামেস্কে গিয়ে হাদীছ বর্ণনা করেন।[২৪]

৩- মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আবু জা'ফর দেবলী (মৃঃ ৩২২/৯৩৪ খৃঃ)ঃ হাদীছ শিক্ষার জন্য ইনি মক্কা সফর করেন। তিনি মুহাদ্দিছ হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। তিনি মুহাম্মাদ বিন যাম্বুর, মুহাম্মাদ বিন আলী আছ-ছায়েগ এবং সাঈদ বিন আবদুর রহমান আল-মাখযূমী হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেন। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-মুকরী (মৃঃ ২৮১ হিঃ), আহমাদ বিন ইবরাহীম বিন ফাররাস মাক্কী আল-আত্তার, আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-হাজ্জাজ (মৃঃ ৩৬৮ হিঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন। ইল্মে হাদীছে পারদর্শী হওয়া ছাড়াও তিনি সুফিয়ান ইবনু ওয়ায়না (১০৭-১৯৮ হিঃ) -এর 'কিতাবুত তাফসীর' সাঈদ বিন আবদুর রহমান আল মাখযূমী (মৃঃ ২৪৯ হিঃ) -এর নিকট হ'তে এবং আবদুল্লাহ বিন মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) -এর 'কিতাবুল বির্র ওয়াছ ছিলাহ' তাঁর শিষ্য হুসাইন আল-মারওয়াযী (মৃঃ ২৪২ হিঃ) -এর নিকট হ'তে শিক্ষা করেন। ৩২২ হিজরীতে তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন।[২৫]

৪- আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আবুল আব্বাস দেবলী (মৃঃ ৩৪৩/৯৫৪ খৃঃ)ঃ ইল্মে

হাদীছ শিক্ষার জন্যই ইনি সে যুগে মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল হাদীছ শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে সফর করেন। মক্কাতে তিনি স্বদেশী মুহাদ্দিছ আবু জা'ফর দেবলী (মৃঃ ৩২২ হিঃ) ও মুফায্যাল বিন মুহাম্মাদ আল-জুন্দী (মৃঃ ৩০৮) -এর নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষা করেন। এমনিভাবে বছরাতে আবু খলীফা আল-ক্বাযী (মৃঃ ৩০৫ হিঃ), বাগদাদে জাফর বিন মুহাম্মাদ ফারইয়াবী (মৃঃ ৩০১ হিঃ), মিসরে আলী বিন আব্দুর রহমান ও মুহাম্মাদ বিন রাইয়ান, দামেস্কে হাফেয আহমাদ বিন ওমায়ের বিন হাওসা (মৃঃ ৩২০) বৈরুতে আবু আবদুর রহমান মাকহূল, হাফেয হুসাইন বিন আবু মা'শার (মৃঃ ৩১৮), তাস্তারে আহমাদ বিন যুহায়ের তাস্তারী (মৃঃ ৩১২ হিঃ), আসকার মুকাররমে হাফেয আবদান বিন আহমাদ জাওলাক্বী (২১০-৩০৬) ও নিশাপুরে আবুবকর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইবনে খুযায়মা (মৃঃ ৩১১) ছাড়াও সমকালীন অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের নিকট হ'তেও হাদীছ শিক্ষা করেন। ইবনে খুযায়মার মৃত্যুর আগেভাগেই তিনি নিশাপুর পৌঁছে যান এবং তৎকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই শিক্ষানগরীতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি হাদীছের শিক্ষক হিসাবে দরস দিতে থাকেন। তাঁর খ্যাতনামা ছাত্রমন্ডলীর মধ্যে 'মুস্তাদরাকে হাকেম'-এর বিশ্ববিশ্রুত সংকলক হাফেয আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ হাকেম নিশাপুরী (৩২১-৪০৫) অন্যতম। ৩৪৩ হিজরীতে তিনি নিশাপুরেই ইন্তেকাল করেন।[২৬]

সেই প্রাচীনযুগে শুধুমাত্র ইল্‌মে হাদীছের অন্বেষণে একজন ভারতীয় বিদ্বানের এইভাবে বিশ্বভ্রমণ সত্যিই আশ্চর্যের বিষয় বৈ-কি!

৫- হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আসাদ দেবলী (মৃঃ ৩৫০/৯৬১ খৃঃ)ঃ ইনি আবু ইয়ালা মূছেলী (মৃঃ ৩০৭)-এর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তাঁর সনদের সূত্র খ্যাতনামা ছাহাবী জাবির বিন আব্দুল্লাহ (মৃঃ ৭৮ হিঃ) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ৩৪০ হিজরীর দিকে তিনি দামেস্কে হাদীছের প্রচার ও শিক্ষাদান শুরু করেন। তাম্মাম তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য ছিলেন।[২৭]

৬- মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ দেবলী (মৃঃ ৩৫৪/৯৬৫ খৃঃ)ঃ ইনি অত্যন্ত নেককার ও সাধক আলেম ছিলেন। তিনিও ইল্‌মে হাদীছের জ্ঞান লাভের জন্য বিদেশে গমন করেন। তিনি বছরার আবু খলীফা ফযল বিন হাবাব আল-জামহী (মৃঃ ৩০৫), বাগদাদের জা'ফর বিন মুহাম্মাদ আল-ফারিয়াবী (মৃঃ

৩০১ হিঃ), আসকার মুকাররমের আবদান বিন আহমাদ আস্-সুক্কারী (২১০-৩০৬) প্রমুখ বিদ্বানদের নিকট হ'তে হাদীছ শিক্ষা করেন। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ হাকেম নিশাপুরী (৩২১-৪০৫) তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন।[২৮]

৭- খালাফ বিন মুহাম্মাদ দেবলী (মৃঃ ৩৬০ হিঃ)ঃ তিনি আলী বিন মূসা দেবলীর নিকট হ'তে দেবলে হাদীছের ইল্ম হাছিল করেন। পরে তিনি বাগদাদ গমন করেন ও সেখানে হাদীছের দরস দিতে থাকেন। সেখানে আবুল হোসায়েন বিনুল জুন্দী (৩০৬-৩৯৬) ও আহমাদ বিন ওমায়ের তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য ছিলেন।[২৯]

৮-ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ দেবলী (মৃঃ ৩৪৫/৯৫৬ খৃঃ)ঃ ইনি মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ আবু জা'ফর দেবলীর (মৃঃ ৩২২/৯৩৪খৃঃ) পুত্র ছিলেন। ইনিও পিতার ন্যায় হাদীছের রাবী ছিলেন। তিনি বাগদাদের হাফেয মূসা বিন হারূণ আল-বায্যায (মৃঃ ২৯৪ হিঃ) এবং মক্কার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ বিন আলী আছ-ছায়েগ আল-কাবীর (মৃঃ ২৯১) ও অন্যান্য ওলামায়ে হাদীছের নিকট হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেন।[৩০]

৯- আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আবুল আব্বাস দেবলী (মৃঃ ৩৭৩ হিঃ)ঃ ইনি একজন দুনিয়াত্যাগী হাফেয ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ ছিলেন। সপ্তাহে মাত্র একটি কাপড় নিজহাতে সেলাই ও জুমআর দিনে সোয়া দিরহাম মূল্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সর্বদা ছিয়াম ও তেলাওয়াতের মধ্যে দিন গুযরান করতেন। বহু কারামতের অধিকারী ছিলেন। রামাযানে সাহারীর সময় কেবলামুখী হ'য়ে তেলাওয়াতে রত থাকা অবস্থায় মিসরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কথিত আছে যে, তাঁর জানাযায় মিসরের সমস্ত লোক হাযির হয়েছিল, কেউ বাড়ীতে অবশিষ্ট ছিলনা।[৩১]

১০- আলী বিন মূসা দেবলীঃ ইনি খালাফ বিন মুহাম্মাদ দেবলীর (মৃঃ ৩৬০ হিঃ) উস্তায ছিলেন। ইনি দেবল ও বাগদাদ উভয় স্থানে হাদীছের দরস দিয়েছেন। আলী বিন মূসা চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর মুহাদ্দিছ ছিলেন।[৩২]

১১- মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আবুবকর দেবলীঃ তিনি মুহাম্মাদ বিন নুছাইর ইবনু আবী হামাযাহ এবং জা'ফর বিন হামাদান ইবনু আবী দাঊদ-এর নিকট হ'তে কিরাআত শিক্ষা করেন। তিনি একজন বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন। হাফেয আবুল

হাসান আলী বিন ওমর দারাকুতনী এবং আবদুল বাকী বিনুল হাসান তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর অন্যতম উস্তাদ ইবনু আবী দাউদ নিশাপুরী ৩৩৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। সে হিসাবে বলা চলে যে, তিনি চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর মানুষ ছিলেন।[৩৩]

১২- হাসান বিন হামেদ বিনুল হাসান দেবলী (মৃঃ ৪০৭/১০১৬ খৃঃ)ঃ ইনি একই সঙ্গে কবি, সাহিত্যিক, মুহাদ্দিছ ও বড়দরের ব্যবসায়ী ছিলেন। এতগুলো গুণের একত্র সমাবেশ ঘটায় তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ আরবী কবি আবু তাইয়িব আহ্মাদ আল-মুতানাব্বী (৩০৩-৩৫৪ হিঃ) একদা বাগদাদে তাঁর বাড়ীতে মেহমান হয়ে বলেন, لو كنت مادحا تاجرا لمدحتك 'যদি আমি কোন ব্যবসায়ীর প্রশংসা করে কবিতা লিখতাম তবে আপনাকেই প্রশংসা করতাম।'

তিনি আলী বিন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আল-মূছেলী (মৃঃ ৩৫৯ হিঃ), দা'লাজ (মৃঃ ৩৫১), মুহাম্মাদ আন-নাক্কাশ (মৃঃ ৩৫১), আবু আলী ছুমারী (মৃঃ ৩৬০) প্রমুখ বিদ্বানগণের নিকট হ'তে হাদীছ শ্রবণ করেন। ইল্মে হাদীছের প্রতি তাঁর এত বেশী আগ্রহ ছিল যে, যখন তিনি হাদীছ বর্ণনা করতেন তখন দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরত। ইল্মে হাদীছে তিনি এতই ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন যে, দামেস্ক ও মিসরের মত শিক্ষা নগরীতে তিনি হাদীছ শিক্ষা দিতেন। তিনি বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন। ৪০৭ হিজরীতে মিসরে পরলোক গমন করেন।[৩৪]

উপরের আলোচনা থেকে ধারণা করা যায় যে, সে যুগের দেবলী মুহাদ্দিছগণ সমস্ত ইসলামী দুনিয়ায় অত্যন্ত পরিচিত ও সমাদৃত ছিলেন। ফলে তাঁদের তৎপরতা দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও পরিব্যপ্ত ছিল। তবুও স্বদেশ তাঁদের খিদমত হ'তে মাহরূম হয়নি। বরং তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে দেবল ও তৎসন্নিহিত এলাকায় আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান থাকে।

২য় কেন্দ্রঃ মানছূরাহ

সিন্ধু প্রদেশের হায়দারাবাদ শহর হ'তে ৪৭ মাইল উত্তর-পূর্বে শাহজাদপুর শহর থেকে আট মাইল দূরে সিন্ধু নদীর তীরে (করাচীর সন্নিকটে) প্রাচীন মানছূরা নগরীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে।[৩৫]

সিন্ধু বিজয়ী সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিম (৬৬-৯৬ হিঃ)-এর পুত্র সেনাপতি আমর বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ১২৬/৭৪৪ খৃঃ) ১১০ হিজরী মোতাবেক ৭২৮ খৃষ্টাব্দে এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হতে সপ্তম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত 'মানছূরাহ' ছিল সিন্ধুর রাজধানী ও সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ নগরী।[৩৬] মানছূরাতে ইল্ম ও আলিমের খুব কদর ছিল। অধিকাংশ অধিবাসী আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে এখানে স্বাভাবিকভাবেই ইল্মে হাদীছের চর্চা খুব বেশী ছিল। মসজিদগুলি হাদীছের আলোচনায় সর্বদা গুলযার থাকত। এখানকার মুহাদ্দিছগণ সর্বদা হাদীছের দরস ও তাদরীসে মশগুল থাকতেন। তাঁরা হাদীছ বিষয়ক কেতাবাদি লিপিবদ্ধ করতেন। লেখনীর ক্ষেত্রে কাযী আবুল আব্বাস মানছূরীর নাম সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।[৩৭]

মানছূরার মুহাদ্দিছবৃন্দঃ

১-আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আবুল আব্বাস তামীমী আল মানছূরী

মানছূরার এই খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ বাল্যকালে স্বদেশে শিক্ষালাভের পর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেন। তিনি পারস্যে মুহাদ্দিছ আবুল আব্বাস বিন আছরাম (মৃঃ ৩৩৬ হিঃ) এবং বছরায় আবু রওক আহমাদ আল-হাযরানী (মৃঃ ৩৩২ হিঃ)-এর নিকট হ'তে হাদীছ শিক্ষা করেন ও বর্ণনা করেন। তিনি পারস্যের পশ্চিম এলাকা আরজান-এর ক্বাযী নিযুক্ত হন। ৩৬০/৯৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি বোখারায় গেলে খ্যাতনামা হাদীছ সংকলক আবু আবদুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী (৩২১-৪০৫) তাঁর নিকট থেকে হাদীছের পাঠ গ্রহণ করেন। এতেই বুঝা যায় স্বীয় যুগে তিনি কত বড় নামকরা মুহাদ্দিছ ছিলেন। ইমাম হাকেম বলেন যে, তিনি এযাবত যত মুহাদ্দিছের সাক্ষাত লাভ করেছেন, তন্মধ্যে আবুল আব্বাস মানছূরীকে সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন দেখতে পেয়েছেন। ৩৭৫/৯৮৫ খৃষ্টাব্দে ভূপর্যটক মাকদেসী যখন মানছূরাতে আসেন, তখন তিনি আবুল আব্বাস মানছূরীকে তাঁর নিজস্ব মাদরাসায় বসে হাদীছের দরস দিতে দেখেন। মানছূরী একজন উঁচুদরের লেখকও ছিলেন। ইবনু নাদীম (মৃঃ ৩৭০ হিঃ) তাঁকে 'যাহেরী' মযহাবের দশজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বানের অন্যতম হিসাবে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তথাপি তাঁর বিরুদ্ধে স্বীয় আকীদার সমর্থনে হাদীছ জাল করার অভিযোগ আছে।[৩৮]

২-আবদুল্লাহ বিন জা'ফর বিন মুররাহ মানছূরী (মৃঃ ৩৯০ হিঃ)

তিনি হাসান বিন মুকাররম ও তাঁর সহযোগী মুহাদ্দিছগণের শিষ্য ছিলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ইমাম হাকেম (৩২১-৪০৫) তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণের মানুষ ছিলেন।[৩৯]

উক্ত দু'জন সেরা হাদীছবিশারদ ছাড়াও মানছূরাতে ছোট বড় বহু মুহাদ্দিছ ছিলেন। যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ৩৭৫ হিজরী পর্যন্ত মানছূরাতে অধিকাংশ অধিবাসী 'আহলেহাদীছ' ছিলেন।

৩য় কেন্দ্রঃ কুছদার (বেলুচিস্তান)

কুছ্‌দার বেলুচিস্তানের দক্ষিণাংশে কালাত অঞ্চলে অবস্থিত। আরব শাসনামলে এই এলাকাকে 'তূরান' বলা হ'ত। কুছদার তখনকার সময়ে তুরানের রাজধানী ও সমৃদ্ধ নগরী ছিল। আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালে (৪১-৬০) সর্বপ্রথম ছাহাবী সিনান বিন সালামাহ মুহবিক্ব আল-হুযালী (৮-৫৩ হিঃ) কুছদার জয় করেন। কিন্তু বাশিন্দাগণ চুক্তি ভঙ্গ করে। পরে মানযার বিন জারূদ আল-আবাদী বুকান ও কীকান জয়ের পর এই এলাকা জয় করেন।[৪০] পরবর্তীকালে মুহাম্মাদ বিন কাসিম-এর সময়ে (৯৩-৯৬ হিঃ) সিন্ধুর অন্যান্য এলাকার ন্যায় এই এলাকাও নিয়মিতভাবে ইসলামী খেলাফতের অধীনস্থ হয়।[৪১] উল্লেখ্য যে, কুছদারে এক সময় খারেজীদের শাসন ছিল।

কিরমান, ফারিস ও খুরাসান হ'য়ে স্থলপথে আরবদের সঙ্গে এই শহরের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। আরবরা এখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের জন্য মসজিদ ছিল। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে প্রথম দিকে এখানে কোন হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কিছুটা স্থিতিশীলতা আসে এবং দেরীতে হ'লেও চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে এসে আমরা এখানে দু'একজন মুহাদ্দিছের সন্ধান লাভে সমর্থ হয়েছি- যাঁদের মাধ্যমে এইসব এলাকায় হাদীছভিত্তিক জীবন গঠনের আন্দোলন বিরাজিত থাকে। যেমন-

১-জা'ফর বিনুলখাত্তাব আবু মুহাম্মাদ আল-কুছদারীঃ

কুছদারে জন্মগ্রহণকারী এই বিদ্বান একজন দুনিয়াত্যাগী মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ

ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আবুল ফযল আবদুছ ছামাদ বিন মুহাম্মাদ বিন নাছীর আল-আছেমীর নিকটে হাদীছ শিক্ষা করেন এবং তাঁর কাছে হাদীছ শিক্ষা করেন হাফেয আবুল ফতূহ আবদুল গাফের বিন হুসাইন বিন আলী কাশগড়ী। তিনি বল্‌খে বসবাস করেন। মুহাদ্দিছ জাফর বিনুল খাত্তাব সেই সকল প্রাচীন হাদীছবিশারদগণের অন্যতম ছিলেন, যারা পঞ্চম শতাব্দী হিজরীর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন।[৪২]

২-সিবাওয়ায়েহ্ বিন ইসমাঈল বিন দাউদ বিন আবুদাউদ আল-কুছদারী

সিবাওয়ায়েহ্ বিন ইসমাঈল বিন দাউদ বিন আবুদাউদ আল-কুছদারী মক্কায় জীবন কাটান ও সেখানেই হাদীছ শিক্ষা দেন। তিনি আবুল কাসিম আলী বিন মুহাম্মাদ আল-হুসাইনী, আবুল ফাত্‌হ রাজা' বিন আবদুল ওয়াহেদ আল-ইছ্‌ফাহানী এবং হাফেয আবুল হুসাইন ইয়াহ্‌ইয়া বিন আবুল হাসান রাওয়াসীর নিকট হ'তে হাদীছ শিক্ষা করেন। ৪৬০ হিজরীর কিছু পরে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৪৩]

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ৯৩ হিজরীতে সিন্ধু এলাকা ইসলামী খেলাফতের অধীনস্থ অঞ্চলে পরিণত হ'লেও এবং ছাহাবা ও তাবেঈদের আগমন ঘট্‌লেও এই এলাকায় ইল্‌মে হাদীছের নিয়মিত চর্চা তাৎক্ষণিকভাবে শুরু হয়নি। আব্বাসীয় খলীফা মাহ্‌দী (১৫৮-১৬৯ হিঃ) পর্যন্ত এই এলাকায় খেলাফতের পক্ষ হ'তে অভিযানসমূহ প্রেরিত হ'ত এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক ঐক্য বজায় ছিল। কিন্তু মামূনের যুগ (১৯৮-২১৮) হ'তে সিন্ধু এলাকা বিভিন্ন আরব সর্দারদের অধীনে মাহানিয়া, হিবারিয়া, সামিয়াহ প্রভৃতি কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। যদিও সকলে আব্বাসীয় খলীফাদের নামে খুৎবা পাঠ করতেন।[৪৪]

সিন্ধুতে স্বাধীন আরব রাজ্যসমূহ কায়েম হ'লে এর ফলে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সৃষ্ট হয় এবং তা ইল্‌মে হাদীছ-এর প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। রাজনৈতিক শান্তি ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার ফলে চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর শেষার্ধে সিন্ধু এলাকায় ইল্‌মে হাদীছের চর্চা এত বেড়ে যায় যে, এখানকার ছাত্ররা আরব, সিরিয়া, ইরাক ও মিসরের হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে গমন করত। এমনকি

বাগদাদ ও খোরাসান থেকে মুহাদ্দিছগণ দেবল ও মানছূরাতে এবং এইসব এলাকার মুহাদ্দিছগণ মক্কা, দামেস্ক, বাগদাদ ও মিসরে গিয়ে হাদীছ শিক্ষা দান করতেন। সাম'আনী (মৃঃ ৫৬৬ হিঃ) -এর বর্ণনা মতে খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বান আবু ওছমান ছাবূনী (৩৭৩-৪৪৯ হিঃ) -এর নিকট হাদীছ শিক্ষার জন্য হিন্দুস্থানী ছাত্রগণ নিশাপুর পর্যন্ত গমন করেছিলেন।[৪৫] হাদীছের এই ব্যাপক চর্চার ফলে এই অঞ্চলে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং মাকদেসীর সাক্ষ্য অনুযায়ী ৩৭৫ হিজরীতে মানছূরা ও সিন্ধু অঞ্চলে আহ্‌লেহাদীছ জনসংখ্যা সর্বাধিক ছিল।[৪৬] কিন্তু আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই অব্যাহত অগ্রগতির মুখে হঠাৎ অশনিপাত ঘটে মুলতান ও মানছূরাতে শী'আ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে।[৪৭] এর পর শুরু হয় উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসে প্রায় সাড়ে সাতশত বৎসরের এক দীর্ঘ অবক্ষয় যুগ।

টীকাসমূহ-৮

১. হাফেয আহমাদ ইবনু হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ), ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ খায়রিয়াহ প্রেস ১৩২৫/১৯০৭ খৃঃ) ১৪শ খণ্ড পৃঃ ৩২৩।

২. 'নামকরণ ও পরিচিতি' অধ্যায় ৪৪-৪৯নং টীকা সমূহ দ্রষ্টব্য।

৩. Dr. Muhammad Ishaq. INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE. [Dacca University. 2nd. Ed. 1976] p. 22. ঐ উর্দূ অনুবাদঃ শাহেদ হুসাইন রায্‌যাকী, ইল্‌মে হাদীছ মেঁ বার্রে আযীম পাক ও হিন্দ কা হিছ্‌ছা' (লাহোরঃ ইদারা ছাক্বাফাতে ইসলামিয়া, ১ম সংস্করণ ১৯৭৭) পৃঃ ৪৫-৪৬।

৪. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বেশারী মাকদেসী (মৃঃ ৩৭৫-এর পরে), ভ্রমণগ্রন্থ 'আহসানুত্ তাক্বাসীম' (লন্ডনঃ ই, জে, ব্রীল, ২য় সংস্করণ ১৯০৬ খৃঃ) পৃঃ ৩৭; আব্দুল কাহির বাগদাদী, 'আল-ফারকু বায়নাল ফেরাক্ব' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তারিখবিহীন) তাহকীকঃ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ, পৃঃ ২৬-২৭, ৩১৫-১৬; শহরস্তানী, 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তাবি) তাহকীকঃ সাইয়েদ কীলানী ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৬।

৫. কাযী আতহার মুবারকপুরী (জন্মঃ ১৯১৬ খৃঃ), রিজালুস সিন্দ ওয়াল হিন্দ (কায়রোঃ দারুল আনছার ১৩৯৮/১৯৭৮) ২য় খণ্ড পৃঃ ৩১৯,৫৭৩; ঐ, আল্-ইকদুছ ছামীন ফী ফুতূহিল হিন্দ (কায়রো; দারুল আনছার ১৩৯৯/১৯৭৯)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে ১৪ জন ও শেষোক্ত গ্রন্থে ১৮ জনের বর্ণনা পাওয়া গেছে। তবে ১৯৮৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে লাহোরে

ইদারায়ে ছাক্বাফাতে ইসলামিয়াহ্‌র পরিচালক খ্যাতনামা লেখক মাওলানা ইসহাক ভাট্টি দীন গবেষকের নিকটে ২৫ জন ছাহাবীর তথ্য প্রকাশ করেন। উক্ত বিষয়ে প্রকাশিত তাঁর লেখাটি দেওয়ার জন্য তিনি খুঁজে না পেয়ে পরে পাঠাতে চেয়েছিলেন।

৬. কাযী আতহার মুবারকপুরী, 'রিজালুস সিন্দ ওয়াল হিন্দ' পৃঃ ৩১৯-৫৪২।

৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩১-৩৪; Ishaq, INDIA'S CONTRIBUTION PP. 17,18. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৩১-৩২।

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫-৪৬।

৯. আবু আমর খলীফা বিন খাইয়াত্ব (১৬০-২৪০ হিঃ), 'তারীখ', তাহকীকঃ ডঃ আকরাম যিয়া উমরী (রিয়াযঃ দার তাইয়িবা, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫/১৯৮৫) পৃঃ ১৮০।

১০. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯৬।

১১. কাযী আতহার মুবারকপুরী, 'রিজালুস সিন্দ ওয়াল হিন্দ' পৃঃ ৫০১; আহমাদ বিন ইয়াহ্‌ইয়া বালাযুরী (মৃঃ ২৭৯ হিঃ), 'ফুতূহুল বুলদান' সম্পাদনায়ঃ রিযওয়ান মুহাম্মাদ রিযওয়ান (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ৪২৮।

১২. কাযী আতহার মুবারকপুরী, 'আল-ইক্বদুছ ছামীন' পৃঃ ২১৬-২৩।

১৩. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৪৭।

১৪. মুবারকপুরী, 'আল্‌-ইকদুছ ছামীন' পৃঃ ১৫।

১৫. মুবারকপুরী, 'রিজালুস সিন্ধ ওয়াল হিন্দ' পৃঃ ৩৫৮।

১৬. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৪৯; রিজালুস সিন্দ পৃঃ ৩৫৮-৫৯।

১৭. বালাযুরী, 'ফুতূহুল বুলদান' পৃঃ ৪৪১।

১৮. 'ইল্‌মে হাদীছ', পৃঃ ৪৯।

১৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৯-৫০।

২০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫০; ইবনু হাজার আসকালানী, 'মুকাদ্দামা ফাৎহুল বারী' (কায়রো ছাপা, ১৩৪৭/১৯২৯ খৃঃ) পৃঃ ৪।

২১. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিশারী আল-মাকদেসী, 'আহ্‌সানুত্‌ তাক্বাসীম' পৃঃ ৪৭৪।

২২. স্থানটি বর্তমানে 'ভাম্বুর' নামে পরিচিত, যা করাচী মহানগরী হ'তে ২৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। খননকার্যের ফলে প্রাচীন নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হয়ে পড়েছে- আতহার মুবারকপুরী, 'রিজালুস সিন্দ ওয়াল হিন্দ' পৃঃ ৩৩।

২৩. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৫৬; আতহার মুবারকপুরী, রিজালুস সিন্দ ওয়াল হিন্দ পৃঃ ৪৭।

২৪. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৫৭; রিজালুস সিন্দ পৃঃ ১৪৭-৪৮।

২৫. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৫৩; আতহার মুবারকপুরী, রিজালুস সিন্দ পৃঃ ২০১।

২৬. 'রিজালুস সিন্দ' পৃঃ ৫৭।

২৭. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৫৫।

২৮. রিজালুস সিন্দ পৃঃ ২২৫; 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৫৫।

২৯. রিজাল পৃঃ ১০৭, ১৭৬।
৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১; 'ইল্মে হাদীছ' পৃঃ ৫৩।
৩১. রিজালুস সিন্দ, পৃঃ ৪৬।
৩২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৫-৭৬।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০-২১১।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০; 'ইল্মে হাদীছ' পৃঃ ৫৬।
৩৫. ইশতিয়াক হুসাইন কুরায়শী, উর্দু অনুবাদঃ হেলাল আহমাদ যুবায়রী, বার্রে আযীম পাক ও হিন্দ কি মিল্লাতে ইসলামিয়াহ (করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭) পৃঃ ৪৫-৪৬।
৩৬. রিজালুস সিন্দ পৃঃ ৪২
৩৭. 'ইল্মে হাদীছ' পৃঃ ৫৮।
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮-৫৯; রিজালুস সিন্দ পৃঃ ৪৯-৫০।
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯, রিজালুস সিন্দ পৃঃ ১৬৫।
৪০. ইয়াকূত বিন আবদুল্লাহ হামাভী বাগদাদী (মৃঃ ৬২৬ হিঃ), 'মু'জামুল বুলদান' (বৈরুতঃ দার ছাদির, তারিখবিহীন) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৫৩, বালাযুরী (মৃঃ ২৭৯ হিঃ), 'ফুতূহুল বুলদান' পৃঃ ৪২২।
৪১. মাকদেসী, 'আহসানুত্ তাক্বাসীম' পৃঃ ৪৭৮।
৪২. রিজালুস সিন্দ পৃঃ ৮১; 'ইল্মে হাদীছ' পৃঃ ৬০।
৪৩. আবদুর রহমান ফিরিওয়াঈ, 'জুহুদ মুখ্লিছাহ' (বেনারসঃ মাতবা'আ সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬) পৃঃ ২৭; রিজালুস সিন্দ পৃঃ ১৪৫; 'ইল্মে হাদীছ' পৃঃ ৬১।
৪৪. রিজালুস সিন্দ পৃঃ ১৯০-৯১; আল-ইকদুছ ছামীন পৃঃ ১৬।
৪৫. 'ইল্মে হাদীছ' পৃঃ ৫১।
৪৬. মাকদেসী, 'আহসানুত্ তাক্বাসীম' পৃঃ ৪৮১।
৪৭. ৩৭৫ হিজরীর পর পরই এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। Ishaq, INDIA'S CONTRIBUTION. PP. 42. 'ইল্মে হাদীছ' পৃঃ ৬১; মাকদেসী, তাক্বাসীম পৃঃ ৪৮১।

অধ্যায়-৮

الفصل الثامن

অবক্ষয় যুগ

دور الإنحطاط

(৩৭৫-১১১৪/৯৮৪-১৭০৩ খৃঃ পর্যন্ত প্রায় সোয়া সাতশো বছর)

৩৭৫ হিজরীতে ভূ-পর্যটক মাকদেসী যখন সিন্ধু ভ্রমণে আসেন, তখন সেখানে আহলেহাদীছের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও শাসনকর্তৃত্ব প্রত্যক্ষ করেন।[১] সেখান হ'তে পরবর্তী ৩৯২ হিজরীর মধ্যে যেকোন এক সময়ে মুলতান ও মানছূরার শাসন ক্ষমতা ইসমাঈলী শী'আদের হাতে চলে যায়। ফলে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সাথে সাথে সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পট-পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। শী'আরা সুন্নীদের উপরে নিষ্ঠুর আচরণ শুরু করে।[২] মুলতানের জামে মসজিদ বন্ধ করে দেয়। মাদরাসাগুলি ধ্বংস করা হয়। মুহাদ্দিছগণকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। হাদীছ শিক্ষার জন্য ছাত্রদের বিদেশ গমন নিষিদ্ধ করা হয়। দেবল ও মানছূরার হাদীছশিক্ষার কেন্দ্রগুলি স্তিমিত হয়ে পড়ে। হিন্দু হতে ধর্মান্তরিত[৩] স্থানীয় সামূরা (SAMURA) বা সূমরূ (سومرو) ইসমাঈলী শী'আ গোত্রটি ছিল এব্যাপারে খুবই তৎপর ও শক্তিশালী। তাদের প্রচন্ড সুন্নী-বিদ্বেষের ফলে সিন্ধু অঞ্চলে আরবগণ গঠনমূলক যা কিছু করেছিলেন প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে যায়। ৩৯২ হিজরী মোতাবেক ১০০০ খৃষ্টাব্দে গযনীর সুলতান মাহমূদ বিন সবুক্তগীন (৩৮৮-৪২১/৯৯৭-১০৩০খৃঃ) স্থলপথে হিন্দুস্থান বিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে লাহোরকে রাজধানী করে পাঞ্জাব ও সিন্ধু এলাকায় স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেও সুমরূ শী'আদের গোপন দৌরাত্ম্য ঠিকই বজায় ছিল।[৪] পরবর্তীতে ঘোরী, মামলূক, খাল্জী ও তুগলক সালতানাতের সময়েও তাদের এই সুন্নীবিদ্বেষ বজায় থাকে।[৫] তাছাড়া সুলতান মাহমূদ ইল্মে হাদীছের প্রতি যতটুকু দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তাঁর পরবর্তী সুলতানগণ তা দেননি।[৬] এই ভাবে ইল্মে হাদীছের প্রসার ও আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সৃষ্ট অবক্ষয় যুগ দীর্ঘায়িত হতে থাকে। এই ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুদারতার মধ্য দিয়ে

আহলেহাদীছ আন্দোলন নিবু নিবু ভাবে হ'লেও ভারত বর্ষের বিভিন্ন মুহাদ্দিছ ও ইল্মে হাদীছের কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে চলতে থাকে। সে হিসাবে আমরা অবক্ষয় যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে তিনটি প্রধান এলাকায় বিভক্ত করতে পারি। ১- উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় এলাকা ২- দক্ষিণ ভারতীয় এলাকা এবং ৩- উত্তর ও পূর্ব ভারতীয় এলাকা। এক্ষণে আমরা এইসব এলাকায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রসমূহের ও সেখানকার মুহাদ্দিছগণের পরিচয় তুলে ধরব।

(১) উত্তর-পশ্চিম ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলন

সুলতান মাহমূদের সময়কাল (৩৯২-৪২১/১০০০-১০৩০ খৃঃ) বাদে পঞ্চম শতাব্দী হিজরীর প্রথমার্ধ হতে দশম শতাব্দী হিজরীতে মাখদূম আব্দুল আযীয আবহারীর (মৃঃ ৯২৮/১৫২১ খৃঃ) সময়কাল[৭] পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চারশো বছর যাবৎ উত্তর-পশ্চিম ভারত তথা সিন্ধু, পাঞ্জাব ও তৎসন্নিহিত এলাকায় ইল্মে হাদীছের চর্চা স্তিমিত ছিল। এই সময় হেজাযের ইল্মে হাদীছের কেন্দ্রগুলির সাথে সিন্ধুর ইল্মী যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল।[৮] তবুও এই সময় কিছু কিছু আহলেহাদীছ বিদ্বান বিভিন্ন সময়ে ইল্মে হাদীছের খিদমত করেছেন ও মানুষকে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহবান জানিয়ে গেছেন। নিম্নে এযুগের কয়েকজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

১- ইসমাঈল লাহোরী (মৃঃ ৪৪৮/১০৫৬ খৃঃ):[৯] কুরআন ও হাদীছে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এই খ্যাতনামা আলিম ৩৯৮/১০০৭ খৃষ্টাব্দে বুখারা হতে লাহোর আসেন এবং ইল্মে হাদীছের চর্চা শুরু করেন। তাঁর ওয়াযের এমন প্রভাব ছিল যে, লাহোরের বহু অমুসলিম বাশিন্দা ইসলাম গ্রহণ করেন। লাহোর শহরের বহু মুসলমান হাদীছ অনুযায়ী জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হন। ৪১২/১০২১ খৃষ্টাব্দে লাহোর জয় ক'রে[১০] হাদীছভক্ত সুলতান মাহমূদ পাঞ্জাবের শী'আ প্রভাবিত অন্যান্য শহরকে বাদ দিয়ে হাদীছ প্রভাবিত লাহোরকে উত্তর ভারতের রাজধানী হিসাবে মনোনীত করার পিছনে মুহাদ্দিছ ইসমাঈলের প্রভাব একটি কারণ হিসাবে ধারণা করা যেতে পারে।

২- আলী বিন আমর বিনুল হাকাম লাহোরী (মৃঃ ৫২৯/১১৩৪ খৃঃ): ইনি খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ, কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। হাদীছজ্ঞ হিসাবে তাঁর খ্যাতি

বাগদাদ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বিখ্যাত সংকলক সমরকন্দের মুহাদ্দিছ সাম'আনীকে তাঁর ছাত্রদলের মধ্যে গণ্য করা যায়।[১১]

৩- আবদুছ ছামাদ লাহোরীঃ ইনি মুহাদ্দিছ আলী বিন আমর লাহোরীর ছাত্র ছিলেন। সমরকন্দে গিয়ে সাম'আনীর নিকটেও হাদীছ শিক্ষা করেন।[১২]

৪- হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন হাসান ছাগানী লাহোরী (৫৭৭-৬৫০/ ১১৮১-১২৫২ খৃঃ)ঃ ওমর বিন্নুল খাত্তাব (রাঃ) -এর বংশধর রাযিউদ্দিন হাসান বিন মুহাম্মাদ ছাগানী লাহোরী উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি বাগদাদ, ইয়ামন, হিজায প্রভৃতি স্থানের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছগণের নিকটে ইল্‌মে হাদীছে বুৎপত্তি লাভ করেন।[১৩] বুখারী ও মুসলিম হতে সংকলিত কওলী হাদীছের গ্রন্থ 'মাশারেকুল আনওয়ার' তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দেয়। অনাবশ্যক মাসায়েলী বিতর্ক থেকে দূরে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য এবং হাদীছকে জনগণের নাগালের মধ্যে এনে দেওয়ার জন্য তিনি এই কঠিন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন।[১৪] এমনিভাবে কেউ যাতে মওযূ' হাদীছ অনুসরণ না করে সেজন্য 'আল-মাওযূআত' নামে তিনি একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন।[১৫] ফেক্‌হী বিষয় ভিত্তিক সংকলিত হাদীছগ্রন্থ 'মাশারেকুল আনওয়ার'-কে মুহাদ্দিছ খুররম আলী বালহারী (মৃঃ ১২৬০ হিঃ) এমন একটি ফুলবাগিচার সাথে তুলনা করেছেন, যার রং এক কিন্তু সুগন্ধি পৃথক পৃথক।[১৬] ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক বলেন- 'তৎকালীন সময়ে ফিক্‌হের জালে আবদ্ধ হিন্দুস্থান ও মধ্য এশিয়ায় এই কিতাবখানিই মাত্র ইল্‌মে হাদীছের পতাকা উড্ডীন রেখেছিল।'[১৭]

(২) দক্ষিণ ভারতে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন

দক্ষিণ ভারতীয় আন্দোলনকে দাক্ষিণাত্যে বাহমনী যুগ ও গুজরাটে মুযাফ্‌ফর শাহী যুগ দু'ভাগে ভাগ করা চলে।

ক- বাহমনী যুগ (৭৮০-৮৮৬ হিঃ/১৩৭৮-১৪৭২ খৃঃ)

অনেক পন্ডিত এই যুগটিকে ভারতবর্ষে ইল্‌মে হাদীছের 'নবজন্ম লাভের যুগ' বলেছেন।[১৮] বাহমনী সুলতান ২য় মুহাম্মাদ শাহ (৭৮০-৭৯৯/১৩৭৮-১৩৯৭ খৃঃ) ইল্‌মে হাদীছের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। হেজায ও মিসর হতে

দাক্ষিণাত্যে অগণিত মুহাদ্দিছের আগমন ঘটে। ফলে গুলবর্গা, বেদার, দৌলতাবাদ, ইলিচপুর, চৌল, যাবিল প্রভৃতি শহর গুলি ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[১৯] ২য় মুহাম্মাদ শাহের পর থেকে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারীদের সময়ে ও বিশেষ করে সুলতান ২য় আলাউদ্দীনের (৮৩৮-৮৬২/১৪৩৪-৫৮) সময়ে ইরান হ'তে আগমন করেন ইল্‌মে হাদীছে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও পরবর্তীতে দীর্ঘ ৩৫ বৎসর যাবৎ বাহমনী সালতানাতের খ্যাতনামা উযীর ও প্রধান মন্ত্রী মাহমূদ গাওয়ান (৮১৩-৮৮৬/১৪১০-১৪৮২ খৃঃ)। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আরব বিশ্ব হ'তে বহু খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ দক্ষিণ ভারতে আগমন করেন। তিনি হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২/১৩৭২-১৪৪৮ খৃঃ) -এর ছাত্র ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি রাজধানী বিদরে একটি বৃহদায়তন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজস্ব কুতুবখানার তিন হাজার কিতাব ছাড়াও অন্যান্য সূত্র হ'তে ৩৫,০০০ হাজার কিতাব সংগ্রহ করে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করেন।[২০] কিন্তু অবশেষে তিনি সুলতান ৩য় মুহাম্মাদ শাহ (৮৬৭-৮৮৬/১৪৬৩-৮২ খৃঃ) কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।[২১] তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে শুধু বাহমনী রাজ্যেরই পতন শুরু হয়নি বরং দাক্ষিণাত্যে ইল্‌মে হাদীছের প্রসার ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের গতি মন্থর হয়ে যায়। একটি যুগের অবসান ঘটে। পরবর্তীতে দক্ষিণ ভারতে শী'আ অধিকার কায়েম হয় ও সেখানে সিন্ধুর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে শুরু হয়।

খ- মুযাফ্‌ফর শাহী যুগ (৮৬৩-৯৮০/১৪৫৮-১৫৭২ খৃঃ)

দাক্ষিণাত্যের বাহমনী রাজ্যে শী'আ অধিকার কায়েম হবার ফলে সেখানে আহলেহাদীছ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। সেখানকার মুহাদ্দিছগণ পার্শ্ববর্তী গুজরাট রাজ্যের হাদীছভক্ত সুলতান আবুল ফৎহ খান ওরফে মাহমূদ বেগরহা (৮৬৩-৯১৭/১৪৫৮-১৫১১ খৃঃ) -এর উদারতায় আকৃষ্ট হয়ে সেখানে আশ্রয় নিতে থাকেন। সুলতানের গুণগ্রাহিতার সুবাদে ইতিপূর্বেই সেখানে আরব বিশ্ব হতে বহু খ্যাতিমান মুহাদ্দিছের আগমন ঘটেছিল। মিসরের মুহাদ্দিছ অজীহুদ্দীন মুহাম্মাদ (৮৫৬-৯১৯/১৪৫২-১৫১৩ খৃঃ) -কে সুলতান মাহমূদ বেগরহা 'মালিকুল মুহাদ্দেছীন' খেতাবসহ মহামূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে গুজরাটে আনেন ও রাজ্যের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করেন। ৯১৮/১৫১২ খৃষ্টাব্দে

যখন ইয়ামন হ'তে ফাৎহুল বারীর হস্তলিখিত কপি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসে[২২] এবং সুলতান মুযাফ্ফর শাহ (৯১৭-৩২/১৫১১-২৫ খৃঃ) -কে উপঢৌকন দেওয়া হয়, তখন তিনি এতই খুশী হয়েছিলেন যে, হাদিয়া দাতাকে সমৃদ্ধ বন্দরনগরী 'ভ্রুচ' জায়গীর স্বরূপ দান করেন।[২৩]

মুযাফ্ফর শাহী সুলতানগণ ইল্মে হাদীছকে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যাপক অনুবাদ ও সংকলনের ব্যবস্থা করেন। সুলতান ৩য় মাহমূদ (৯৪৪-৬১/১৫৩৭-৫৩ খৃঃ) নিজ খরচে মক্কাতে একটি মাদরাসা কায়েম করেন। তিনি 'কানযুল উম্মাল' সংকলক শায়খ আলী মুত্তাক্বী জৌনপুরী (মৃঃ ৯৭৫/১৫৬৮ খৃঃ) ও শায়খ আব্দুল্লাহ সিন্ধী (৯৯৩/১৫৮৪ খৃঃ)-এর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছগণকে গুজরাটে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন। বাহমনী উযীর মাহমূদ গাওয়ান (৮১৩-৮৬/১৪১০-৮২ খৃঃ) -এর ন্যায় তিনিও ভাগ্যক্রমে আছফ খান নামে এক গুণবান উযীরের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু ৯৬১ হিজরীতে তাঁর হত্যাকান্ডের পর গুজরাটে চরম অরাজকতা শুরু হয়ে যায়।[২৪] অবশেষে ৯৮১/১৫৭২ খৃষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের (৯৬৩-১০১৪/১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) হাতে মুযাফ্ফরশাহী সালতানাতের পতন ঘটে।[২৫] এইভাবে অবক্ষয় যুগে দক্ষিণ ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের আরেকটি প্রধান কেন্দ্রের তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

দক্ষিণ ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী মুহাদ্দিছগণের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা চলে। যেমন- (১) শায়খ ইয়াকূব বিন আব্দুর রহমান হাশেমী (৭৪৯-৮৪৩/১৩৮৭-১৪৩৯ খৃঃ)ঃ মক্কায় জন্মগ্রহণকারী ও ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২/১৩৭২-১৪৪৮ খৃঃ)-এর ছাত্র এই মুহাদ্দিছ ৮৩০ হিজরীতে গুজরাটের খাম্বাইতে আসেন ও ৮৪৩ হিজরীতে দক্ষিণ বেরারে ইন্তেকাল করেন।[২৬] (২) মাহমূদ গাওয়ান (৮১৩-৮৮৬/১৪১০-১৪৮২ খৃঃ)ঃ ইরানের এই ক্ণজন্মা মনীষী কায়রোতে গিয়ে ইবনু হাজার আসকালানীর নিকটে ছহীহ বুখারী এবং যয়নুদ্দীন যরকেশী (মৃঃ ৮৪৫/১৪৪১ খৃঃ) -এর নিকটে ছহীহ মুসলিম এবং সিরিয়া গমন করে সেখানকার মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে ইল্মে হাদীছ শিক্ষা করেন ও পরবর্তীতে বাহমনী উযীর হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।[২৭] (৩) আব্দুল আযীয বিন মাহমূদ তূসী (৮৩৬-৯১০/১৪৩২-১৫১৪ খৃঃ)ঃ ইনিও

ইরানের অধিবাসী ছিলেন। ইবনু হাজারের ছাত্র মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আবহারীর শিষ্য ছিলেন। পরে মক্কায় গিয়ে হাফেয আব্দুর রহমান সাখাবী (মৃঃ ৯০২ হিঃ/১৪৯৬ খৃঃ)-এর নিকটে ইল্‌মে হাদীছ শিক্ষা করেন। মাহমূদ গাওয়ানের পুত্রের গৃহশিক্ষক ছিলেন।[২৮] (৪) ওমর বিন মুহাম্মাদ দামেস্কী (৮২৯-৯০০/১৪২৫-৯৪ খৃঃ)ঃ ইনিও হাফেয সাখাবীর ছাত্র ছিলেন। গুজরাটের খাম্বাইতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।[২৯] (৫) অজীহুদ্দীন মুহাম্মাদ মালেকী মিসরী (৮৫৬-৯১৯/১৪৫২-১৫১৩ খৃঃ) (৬) জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ওমর হাযরামী (৮৬৯-৯৩০/১৪৬৪-১৫২৪ খৃঃ) হাযারামাউতের অধিবাসী। (৭) হুসাইন বিন আব্দুলাহ কিরমানী (মৃঃ ৯৩২/১৫২৫ খৃঃ) মক্কার অধিবাসী (৮) রফীউদ্দীন সিরাযী সাফাবী (মৃঃ ৯৫৪/১৫৪৭ খৃঃ) ইরানের অধিবাসী (৯) আব্দুল মু'তী বিন হাসান হাযরামী (৯০৫-৮৯/১৪৯৯-১৫৮১ খৃঃ) মক্কার অধিবাসী (১০) শিহাবুদ্দীন আহমাদ আব্বাসী মিসরী (৯০৩-৯২/১৪৯৭-১৫৮৪ খৃঃ) (১১) আব্দুলাহ ঈদরূসী (৯১৯-৯০/১৫১৩-৮২) হাযারামাউতের অধিবাসী (১২) সাঈদ বিন আবু সাঈদ হাবাশী (মৃঃ ৯৯১/১৫৮৩ খৃঃ) (১৩) মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ফাকেহী হাম্বলী (মৃঃ ৯৯২-১৫৮৪ খৃঃ)। এঁরা দু'জনই মক্কায় ইবনু হাজার হায়ছামী (৯০৯-৯৭৪/১৫০৩-১৫৬৭ খৃঃ) -এর ছাত্র ছিলেন।

উপরের মুহাদ্দিছগণের সকলেই ছিলেন বিদেশী এবং যুগের চারজন সেরা মুহাদ্দিছ ইবনু হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২/১৩৭২-১৪৪৮ খৃঃ), যয়নুদ্দীন যাকারিয়া আনছারী (৮২৬-৯২৫/১৪২৩-১৫১৯ খৃঃ), আব্দুর রহমান সাখাবী (মৃঃ ৯০২-১৪৯৬ খৃঃ) ও ইবনু হাজার হায়ছামী (৯০৯-৯৭৪/১৫০৩-১৫৬৭ খৃঃ) -এর ছাত্র ছিলেন। প্রথমোক্ত দু'জনের নেতৃত্বে মিসরে ও শেষোক্ত দু'জনের নেতৃত্বে মক্কাতে ইল্‌মে হাদীছের মারকায কায়েম হয়।[৩০]

এক্ষণে আমরা দক্ষিণ ভারতের স্বদেশী মুহাদ্দিছ বৃন্দের নাম উল্লেখ করব, যাঁরা এতদঞ্চলে ইল্‌মে হাদীছের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন-

(১) রাজিহ বিন দাউদ গুজরাটি (মৃঃ ৯০৪/১৪৯৬ খৃঃ) (২) কুতুবুদ্দীন আব্বাসী গুজরাটি (৩) আব্দুল মালিক আব্বাসী গুজরাটি (মৃঃ ৯৭০/১৫৬৩ খৃঃ) (৪) আব্দুল আউয়াল হুসাইনী জৌনপুরী (মৃঃ ৯৬৮/১৫৬১ খৃঃ) (৫) শায়খ ত্বাইয়িব সিন্ধী (মৃঃ ৯৯৯/১৫৯০ খৃঃ) (৬) ত্বাহির বিন ইউসুফ সিন্ধী (মৃঃ ১০০৪/১৫৯৫

খৃঃ) (৭) অজীহুদ্দীন আলুবী গুজরাটি (৯১০-৯৯৮/১৫০৪-১৫৯০) (৮) আবু বকর বিন মুহাম্মাদ ভ্রুচী গুজরাটি (মৃঃ ৯১৫/১৫০৯ খৃঃ) (৯) উছমান বিন ঈসা সিন্ধী (মৃঃ ১০০৮/১৬০০ খৃঃ) (১০) 'কানযুল উম্মাল' সংকলয়িতা শায়খ আলী বিন হুসামুদ্দীন ওরফে আলী মুত্তাক্বী জৌনপুরী (৮৮৫-৯৭৫/১৪৮১-১৫৬৮ খৃঃ) ও তাঁর স্বনামধন্য ছাত্রমন্ডলী যেমন- (১১) শায়খ জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ত্বাহির ওরফে ত্বাহির পট্টনী গুজরাটি (৯১৪-৯৮৬/১৫০৮-১৫৭৮ খৃঃ) (১২) কাযী আবদুল্লাহ বিন ইদরীস সিন্ধী (মৃঃ ৯৫৫/১৫৪৮ খৃঃ) (১৩) রহমাতুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ সিন্ধী (মৃঃ ৯৯৩-১৫৮৫ খৃঃ) (১৪) শায়খ হামীদ বিন আবদুল্লাহ সিন্ধী (১৫) আবদুল হক দেহলভীর উস্তাদ শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব বিন ওয়ালিউল্লাহ বুরহানপুরী (৯৪৩-১০০১/১৫৩৬-৯২ খৃঃ) (১৬) শাহ মুহাম্মাদ বিন ফযলুল্লাহ গুজরাটি (মৃঃ ১০০৫/১৫৯৬ খৃঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেছীনে কেরাম। এই সকল সেরা মুহাদ্দিছের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতে প্রায় দুইশত বৎসর (৭৮০-৯৮০/১৩৭৮-১৫৭২ খৃঃ) পর্যন্ত আহলেহাদীছ আন্দোলন ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলের তুলনায় বেশী ছিল বলা চলে।[৩১]

(৩) উত্তর ও পূর্ব ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলন (৬০২-১১১৪/১২০৬-১৭০৩ খৃঃ)

সিন্ধু ও মালাবার উপকূলের ন্যায় দিল্লীতে ইসলাম আরব বণিক ও মুহাদ্দিছগণের মাধ্যমে আসেনি। বরং এখানে ইসলাম এসেছিল সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে। গযনীর শাসনকর্তা মুইয্‌যুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন সাম ওরফে সুলতান মুহাম্মাদ ঘোরী (মৃঃ ৬০২/১২০৬ খৃঃ) ও তাঁর দুই সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবক ও ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিল্‌জী-এর মাধ্যমে দিল্লী হ'তে বাংলাদেশ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ও পূর্বভারত বিজয় ও দিল্লীতে রাজধানী স্থাপনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। মুহাম্মাদ ঘোরীর তুর্কী গোলাম ও সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবক (৬০২-৬০৪/১২০৬-৮ খৃঃ)-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত মামলূক সালতানাত-এর শাসকগণ নওমুসলিম তুর্কী হানাফী ছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মধ্য এশিয়া হ'তে হানাফী আলিমগণ দিল্লীতে জমা হ'তে থাকেন। এমতাবস্থায় রাজধানী দিল্লী হ'তে যে ইসলাম উত্তর ও পূর্বভারতে প্রচারিত হয়, তা আলিমদের রায়নির্ভর ফেক্বহী মাযহাবভিত্তিক ইসলাম ছিল বলা

চলে। যাতে সংমিশ্রণ ঘটেছিল তুর্কী, ইরানী, আফগান, মোগল ও ভারতীয় বহু কিছু সংস্কার। ছাহাবা, তাবেঈন ও মুহাদ্দিছগণের প্রচারিত বিশুদ্ধ ইসলামের সাথে তার বিস্তর প্রভেদ ছিল।

এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪/১৮৪৮-১৮৮৬ খৃঃ) বলেন, ... 'ফিক্‌হ ব্যতীত লোকেরা কুরআন ও হাদীছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। .. আহ্‌লেহাদীছদেরকেও তারা জান্‌ত না। কেউ কেউ 'মিশকাত' পড়লেও তা পড়ত 'বরকত' হাছিলের জন্য- আমল করার জন্য নয়, বুঝবার জন্যও নয়। তাহকীকী তরীকায় নয় বরং তাকলীদী তরীকায় ফিক্‌হের জ্ঞান হাছিল করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। ...এই অবস্থা চলতে থাকে যতদিন না আল্লাহ পাক তাঁর খাছ মেহেরবাণীতে দশম শতাব্দী হিজরীতে কয়েকজন আলিমের মাধ্যমে ইল্‌মে হাদীছকে পুনরুজ্জীবিত করেন।'[৩২]

সুলায়মান নাদভী (১৩০২-১৩৭২/১৮৮৪-১৯৫৩) বলেন, "তুর্কী বিজয়ী যারা ভারতে এসেছিলেন, দু'চারজন সেনা অফিসার ও কর্মকর্তা বাদে তাদের কেউই না ইসলামের প্রতিনিধি ছিলেন, না তাদের শাসন ইসলামী নীতির উপরে পরিচালিত ছিল। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন নওমুসলিম তুর্কী ক্রীতদাস। ঘূরীগণ চতুর্থ শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত এবং মুগলগণ সপ্তম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। ... এরা ছিলেন আরব বিজয়ীদের থেকে অনেক পৃথক- যাদের মধ্যে ইসলাম জীবিত ছিল। যাদের মধ্যে অনেকেই ছাহাবী ছিলেন।'[৩৩]

ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক বলেন- 'এই সময় ভারত বর্ষের আলিমদের অধিকাংশ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। যাদের সার্বিক মনোযোগ ফিক্‌হের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, যা সরকারী চাকুরী লাভের জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত ছিল। তাদের মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কোন ফায়ছালা দেওয়ারও যোগ্যতা ছিলনা। হানাফী ফিক্‌হের আলোকেই তারা ইসলামী শরীয়তকে বিচার করতেন। এর প্রতিকূলে হাদীছ থাক্‌লেও তারা ভীষণভাবে তার বিরোধিতা করতেন। এব্যাপারে দিল্লীর হানাফী আলেমদের সঙ্গে খ্যাতনামা ছূফী মুহাদ্দিছ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (৬৩৪-৭২৫/১২৩৬-১৩২৫ খৃঃ) যে বিতর্ক

অনুষ্ঠিত হয়, তা খুবই প্রসিদ্ধ।[৩৪]

প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে, শিক্ষার পাঠ্যসূচী হ'তে ইল্‌মে হাদীছকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। খ্যাতনামা মিসরী মুহাদ্দিছ আল্লামা শামসুদ্দীন তুর্ক দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিল্‌জীর শাসনামলে (৬৯৬-৭১৬/১২৯৬-১৩১৬ খৃঃ) ৭০০/১৩০০ খৃষ্টাব্দে হাদীছ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ভারতে পদার্পন করেন। কিন্তু মুলতানে এসে তিনি জানতে পারলেন যে, আলাউদ্দীন জুম'আ-জামা'আতে যোগদান করেন না। তিনি ছালাতে অভ্যস্ত নন। তিনি দুঃখিত মনে ফিরে যাওয়ার সময় আলাউদ্দীনকে একটি ছোট্ট হাদীছ-পুস্তিকা ও চিঠি লিখে যান। তাতে তিনি বলেন যে, 'আলাউদ্দীনের যামানায় আলিমগণ ফিক্‌হের তা'লীম দিয়ে থাকেন। এতে ক্ষুব্ধ হ'য়ে তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন।'[৩৫] এই সময়ে ভারতের ৪৬ জন শ্রেষ্ঠ আলিমের মধ্যে শামসুদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়ার (মৃঃ ৭৪৭/১৩৪৬ খৃঃ) মধ্যেই কেবল ইল্‌মে হাদীছের প্রতি কিছুটা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।[৩৬] সম্ভবতঃ আলিমগণ এ সময় হাদীছের অধ্যয়নের চেয়ে ফিক্‌হের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন।

উপরোক্ত রাজনৈতিক অনুদারতার সাথে সাথে হাদীছ গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা ও অপ্রতুলতা ইল্‌মে হাদীছের প্রসারে ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতির পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল। বিভিন্ন হাদীছগ্রন্থের ভারতবর্ষে প্রবেশের সময়কাল হ'তে বিষয়টি আঁচ করা চলে। যেমন-

(১) মাশারেকুল আন্‌ওয়ারঃ হিন্দুস্থানী মুহাদ্দিছ ইমাম রাযিউদ্দীন হাসান বিন মুহাম্মাদ ছাগানী লাহোরী (৫৭৭-৬৫০/১১৮২-১২৫২ খৃঃ) সংকলিত এই হাদীছগ্রন্থ সপ্তম শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাবে দিল্লীতে আসে। মুহাম্মাদ তুগলকের সময়ে (৭২৫-৫২/১৩২৫-৫১ খৃঃ) দিল্লীতে এর একটি মাত্র কপি মওজুদ ছিল। সুলতান তার রাজকর্মচারীদেরকে পবিত্র কুরআন ও 'মাশারেকুল আনওয়ার' স্পর্শ করে আনুগত্যের শপথ নিতেন।

(২) সুনানে আবুদাঊদঃ সুলতান নাছীরুদ্দীন মাহমূদ (৬৪৪-৬৪/১২৪৬-৬৬ খৃঃ) -এর সময়ে প্রণীত 'ত্বাবাক্বাতে নাছীরী'-তেই সর্বপ্রথম সুনানে আবু দাউদ হ'তে উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এতে আন্দাজ করা যায় যে, সপ্তম শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে উক্ত হাদীছগ্রন্থ দিল্লীতে মওজুদ ছিল। কিন্তু পরে আর সন্ধান মেলেনি।

(৩) ছহীহায়েনঃ সপ্তম শতাব্দী হিজরীর শেষভাগে আল্লামা শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারীর (মৃঃ ৭০০/১৩০০ খৃঃ) মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে ছহীহায়েনের দরস শুরু হয়। তাঁর নিকট থেকে খ্যাতনামা ছাত্র ও জামাতা বিহারের শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া মুনীরী (৬৬১-৭৮২ /১২৬৩-১৩৮০ খৃঃ) উহা প্রাপ্ত হন।

(৪) মাছাবীহঃ জালালুদ্দীন বুখারী (মৃঃ ৭৮৫/১৩৮২) দিল্লীতে উক্ত কিতাব থেকে হাদীছের দরস দিতেন। বিহারের মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া মুনীরীর (৬৬১-৭৮২/১২৬৩-১৩৮০) গ্রন্থসমূহে উক্ত কিতাবের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। এতে বুঝা যায় যে, অষ্টম শতাব্দী হিজরীর মাঝামাঝি নাগাদ ইমাম মুহিউস্ সুন্নাহ বাগাভী (৪৩৬-৫১৬/১০৪৪-১১২২খৃঃ) সংকলিত এই হাদীছগ্রন্থ সর্বপ্রথম উত্তর ও পূর্বভারতে প্রবেশ লাভ করে।

(৫) মুসনাদে ফিরদৌস দায়লামীঃ হাফেয শীরাওয়াইহ্ বিন শাহারদার দায়লামী (৪৪৫-৫০৯/১০৫৩-১১১৫ খৃঃ) সংকলিত এই হাদীছগ্রন্থ অষ্টম শতাব্দী হিজরীতে মুহাদ্দিছ আমীর কাবীর আলী বিন শিহাব হামাদানীর (৭১৪-৮৬/১৩১৪-৮৪ খৃঃ) মাধ্যমে কাশ্মীরে আনীত হয়।

(৬) শারহু মা'আনিল আছারঃ আবু জা'ফর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ মিসরী ত্বাহাভী (২৩৯-৩২০/৮৫৩-৯৩৩ খৃঃ) সংকলিত এই হাদীছগ্রন্থ সর্বপ্রথম ফীরোয শাহ তুগলকের সময়ে (৭৫২-৭৯০/১৩৫০-১৩৮৮ খৃঃ) অষ্টম শতাব্দী হিজরীর শেষভাগে ভারতে পরিদৃষ্ট হয়।

(৭) মিশ্কাতুল মাছাবীহঃ অলিউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ তাবরেযী (মৃঃ ৭৩৭ হিজরীর পরে) সম্পাদিত ভারতবর্ষে বহুল প্রচলিত এই হাদীছ সংকলন নবম শতাব্দী হিজরীতে সর্বপ্রথম জৌনপুরের লাইব্রেরীতে দেখতে পাওয়া যায়।

(৮) সুনানে আরবা'আহ, বায়হাক্বী ও হাকেমঃ বিহারের হুসাইন বিন মুইয 'নওশাহে তাওহীদ' (মৃঃ ৮৪৪/১৪৪১ খৃঃ) স্বীয় লাইব্রেরীর জন্য হেজায হ'তে উক্ত কিতাবসমূহ আনিয়ে নেন। ফলে এইসব কিতাব ভারতবর্ষে নবম শতাব্দী হিজরীতে আগমন করেছে বলে ধরে নেওয়া যায়।[৩৭]

অবক্ষয় যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রসমূহ

এই সময় পাঁচজন ছূফী মুহাদ্দিছের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে ইল্‌মে হাদীছ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের পাঁচটি প্রধান কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[৩৮] ১- বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (৫৭৮-৬৬৬/১১৮৩-১২৬৮ খৃঃ) মুলতানে। ২- নিযামুদ্দীন আউলিয়া (৬৩৪-৭২৫/১২৩৬-১৩২৫ খৃঃ) দিল্লীতে। ৩- শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃঃ ৭০০/১৩০০ খৃঃ) বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে। ৪- শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্‌ইয়া মুনীরী (৬৬১-৭৮২/১২৬৫-১৩৮০ খৃঃ) বিহারে। ৫- আমীর কবীর আলী বিন শিহাব হামাদানী (৭১৪-৭৮৬/১৩১৪-৮৪ খৃঃ) কাশ্মীরে।

প্রতিটি কেন্দ্রে সৃষ্টি হয় একদল যোগ্য মুহাদ্দিছ শিষ্যমন্ডলী, যারা সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনের মর্মবাণী প্রচার করতে থাকেন এবং বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজের বেড়াজালে আবদ্ধ মুসলিম সমাজকে নিরপেক্ষভাবে হাদীছ অনুযায়ী জীবনগঠনে উদ্বুদ্ধ করেন।

১- মুলতান কেন্দ্র

ছাহাবী হিবার বিন আস্‌ওয়াদ (রাঃ) -এর বংশধর শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার (৫৭৮-৬৬৬/১১৮৩-১২৬৮ খৃঃ) নেতৃত্বে ইল্‌মে হাদীছের এই কেন্দ্র গড়ে ওঠে। তিনি এখানেই জন্ম ও মৃত্যুবরণ করেন এবং বুখারা, খোরাসান ও মদীনায় ইল্‌ম হাছিল করেন।[৩৯] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও পৌত্রগণ এই কেন্দ্র চালু রাখেন। উছ-এর অধিবাসী শায়খ জামালুদ্দীন মুহাদ্দিছ (মৃঃ হিজরী ৮ম শতকের প্রথমার্ধে) ও মখদূম জাহানিয়াঁ সাইয়িদ জালালুদ্দীন বুখারী (৭০৭-৭৮৫/১৩০৭-৮৩ খৃঃ) এই কেন্দ্রের মশহুর আহলেহাদীছ ছাত্র ছিলেন। 'মাশারেকুল আন্‌ওয়ার' ও 'মাছাবীহুস সুন্নাহ' থেকে তাঁরা নিয়মিত দরস দিতেন। এই কেন্দ্র হতে বহু মুহাদ্দিছ ছাত্র সৃষ্টি হয়। যাঁদের জীবনব্যাপী হাদীছের চর্চা ও নিরলস দা'ওয়াত ও তাবলীগের ফলে স্রোতে ভেসে যাওয়া মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে হাদীছ অনুযায়ী জীবনগঠনের তাকীদ সৃষ্টি হয় এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনে জীবন সঞ্চারিত হয়।

২য় - দিল্লী কেন্দ্র

'নিযামুদ্দীন আউলিয়া' নামে প্রসিদ্ধ ছূফী মুহাদ্দিছ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ

বুখারী বাদায়ূনীর (৬৩৪-৭২৫/১২৩৬-১৩২৫ খৃঃ) নেতৃত্বে এই কেন্দ্র গড়ে ওঠে। অনন্য প্রতিভাধর এই সাধক মাত্র বিশ বৎসর বয়সেই আরবী সাহিত্য ও ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ও যুগের নিয়মানুযায়ী 'ক্বাযী' হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু উস্তাদ কামালুদ্দীন যাহেদ-এর নিকটে 'মাশারেকুল আন্ওয়ার' হেফ্য করার ফলে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি প্রচলিত 'তাক্বলীদী' নীতি পরিত্যাগ করে 'মুহাদ্দিছগণের' নীতি গ্রহণ করেন। ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ, গায়েবী জানাযা প্রভৃতির পক্ষে তিনি ফৎওয়া প্রদান করতেন।[৪১] তাঁর মুরীদান ও খলীফাগণের মধ্যে বহু আলিমের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা ইল্মে হাদীছে পারদর্শিতা লাভ করেন ও যাঁদের প্রচেষ্টার ফলে আহলেহাদীছ আন্দোলন বিস্মৃতির তলে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। যেমন- (১) অযোধ্যার শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া (মৃঃ ৭৪৭/১৩৪৬ খৃঃ)। ইনিই প্রথম হিন্দুস্থানী মুহাদ্দিছ যিনি মাশারেকুল আন্ওয়ারের ভাষ্য লেখেন।[৪২] (২) দিল্লীর ফখরুদ্দীন যাররাদ (মৃঃ ৭৪৮/১৩৪৬ খৃঃ)। হেদায়ার পাঠদানের সময় বিভিন্ন মাসআলায় তিনি সর্বদা হাদীছকে অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি বলতেন "নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মান্য করা বিদ'আত" (إختيار المذهب المعين بدعة)।[৪৩] গিয়াছুদ্দীন তুগলকের দরবারে আহূত বিতর্কসভায় তিনিও স্বীয় উস্তাদ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার সাথে ছিলেন।[৪৪] (৩) ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বিন মুঈদুল মুল্ক বারনী (মৃঃ ৭৫৮/১৩৫৭-এর পরে) স্বীয় উস্তাদের শিক্ষার ফলে স্বীয় বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ 'তারীখে ফীরোযশাহী'র ভূমিকায় হাদীছ ও ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনায় এই ধারণা ব্যক্ত করেন যে, কুরআন ও হাদীছের চর্চার ফলে মানুষ উদারমনা ও মধ্যপন্থী হয়। দলীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা দূর হয়।'[৪৫] (৪) মুহিউদ্দীন বিন জালালুদ্দীন কাশানী (মৃঃ ৭১৯/১৩১৯ খৃঃ) (৫) নিযামুদ্দীন হাশেমী জাফরাবাদী (মৃঃ ৭৩৫/১৩৩৪)। ইনি 'যুবদাতুল মুহাদ্দেছীন' নামে খ্যাত ছিলেন। (৬) শায়খ নাছীরুদ্দীন 'চেরাগে দেহ্লী' (মৃঃ ৭৫৭/১৩৫৬ খৃঃ)। উস্তাদ নিযামুদ্দীনের মৃত্যুর পর ইনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[৪৬] (৭) সাইয়িদ মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ গেসূদারায (৭২১-৮২৫/১৩২১-১৪২২ খৃঃ) বিখ্যাত অলি ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। ইল্মে হাদীছ সহ বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে তিনি একশতের উপরে কিতাব লেখেন।[৪৭] (৮) শায়খ অজীহুদ্দীন দেহলভী (৯) কাযী শিহাবুদ্দীন

দৌলতাবাদী (মৃঃ ৮৪৯/১৪৪৫ খৃঃ) প্রমুখ বিদ্বানমন্ডলী।

৩য় কেন্দ্রঃ সোনারগাঁও (বাংলাদেশ)

এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃঃ ৭০০/১৩০০ খৃঃ) বুখারা হ'তে ইল্মে হাদীছের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রথমে দিল্লী আসেন। অল্পদিনে তাঁর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় আলেমগণ সক্রিয় হয়ে ওঠেন ও অবশেষে মামলূক সুলতান গিয়াছুদ্দীন বলবনের (৬৬৪-৬৮৭/১২৬৬-১২৮৭ খৃঃ) নির্দেশে তাঁকে দিল্লী ছাড়তে বাধ্য করা হয়।[৪৮] তিনি বিহার হ'য়ে বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে ৬৬৭/১২৬৯ খৃষ্টাব্দে উপনীত হন।[৪৯]

আবু তাওয়ামাই সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানের মাটিতে 'ছহীহায়েন' নিয়ে আসেন এবং সোনারগাঁয়ে তার দরস শুরু করেন। এদিক দিয়ে বাংলাদেশ সত্যিই গৌরবধন্য দেশ। আমৃত্যু তিনি এখানে ইল্মে হাদীছের দরস দেন। অসংখ্য দেশী-বিদেশী ছাত্রের এখানে আগমন ঘটে। আধুনিক পরিভাষায় যা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ছহীহ বুখারীর একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন।[৫০]

সপ্তম শতাব্দী হিজরী শেষে মুহাদ্দিছ আবু তাওয়ামার মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষার আলোকবর্তিকা পরবর্তী আড়াইশত বৎসর যাবত বাংলার যমীনে নিবু নিবু ভাবে হ'লেও আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখে। দশম শতাব্দী হিজরীর প্রথম দিকে বার ভূঁইয়াদের সময়ে (৯০০-৯৪৫/১৪৯২-১৫৩৮খৃঃ) তৎকালীন পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসাবে সোনারগাঁও একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবেও খ্যাত ছিল। ঐ সময় মুহাদ্দিছগণের কদর ছিল।[৫১] এতদ্ব্যতীত বাংলার স্বাধীন হুসেন শাহী সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ বিন আশরাফ মাক্কী (৯০০-৯২৪/১৪৯২-১৫১৮ খৃঃ) ইল্মে হাদীছের প্রসারে উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। রাজধানী একডালাতে মুহাম্মাদ বিন ইয়াযদান বখ্শ ওরফে 'খাজেগী শিরওয়ানী'র ন্যায় মুহাদ্দিছগণের অবস্থান ও ছহীহ বুখারী শরীফের লিপিকরণ এর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। সুলতান মালদহের 'পাণ্ডুয়া'তে নূর কুত্বে আলমের (৭৫০-৮৫০/১৩৪৯-১৪৪৬ খৃঃ) স্মরণে একটি এবং 'গোরাশহীদ' এলাকায় একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। যেখানে প্রচলিত ফেক্হী ও মা'কূলাতভিত্তিক সিলেবাসের বিপরীতে ইল্মে

হাদীছকে আবশ্যিক সিলেবাসে পরিণত করেন। এজন্য তাঁকে সমসাময়িক গুজরাটের মুযাফ্‌ফরশাহী সুলতানদের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে।[৫২]

মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামার কোন বাংগালী ছাত্রের নাম জানা না গেলেও বাংলাদেশ অঞ্চল যে ইল্‌মে হাদীছের প্রভাবে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, একথা বলা চলে।

৪র্থ কেন্দ্রঃ মুণীর (বিহার)

সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ বাইশ বৎসরের স্বনামধন্য ছাত্র ও আল্লামা শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃঃ ৭০০/১৩০০ খৃঃ)-এর জামাতা মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্‌ইয়া মুণীরীকে (৬৬১-৭৮২/১২৬৩-১৩৮০ খৃঃ) কেন্দ্র করে ইল্‌মে হাদীছের এই কেন্দ্র গড়ে ওঠে। তিনি শ্বশুরের নিকট থেকে প্রাপ্ত 'ছহীহায়নের' হাফেয ছিলেন এবং সনদ ও রিজালশাস্ত্র সহ ইল্‌মে হাদীছের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী ছিলেন। 'ছহীহায়েন' ছাড়াও হাদীছের অন্যান্য গ্রন্থাবলী তিনি হেজায হ'তে আনয়ন করেন। তিনি 'আমল বিল হাদীছ'-এর উত্তম নমুনা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে 'খরবূযাহ' খেতেন জানতে পারেননি বলে তিনি জীবনে 'খরবূযাহ' খাননি।[৫৩] আযানের মধ্যে রাসূলের নাম শুনে চোখে আঙ্গুল রাখা সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'এদেশে প্রচলিত এই নিয়মটি কোন হাদীছে পাওয়া যায় না।'[৫৪]

মুণীর কেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ছাত্রবৃন্দের মধ্যে শায়খ মুযাফ্‌ফর বল্‌খী (মৃঃ ৭৮৬/১৩৮৪ খৃঃ), হুসাইন বিন মুইয বিহারী (মৃঃ ৮৪৪/১৪৪১ খৃঃ) 'নওশাহে তাওহীদ' (তাওহীদের বরপুত্র), আহমাদ বিন হাসান বিন মুযাফ্‌ফর 'লঙ্গরে দরিয়া' (মৃঃ ৮৯১-১৪৮৬ খৃঃ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৫৫] বিহারের মুণীর কেন্দ্র মূলতঃ সোনারগাঁ কেন্দ্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিহার ও আশপাশ এলাকায় আহলেহাদীছ আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে। 'লঙ্গরে দরিয়ার' মৃত্যুর সাথে সাথে এই কেন্দ্রের তৎপরতা স্তিমিত হয়ে যায়।

(খ) ফলওয়ারী শরীফ

মুণীর-এর কেন্দ্র স্তিমিত হ'য়ে যাওয়ার পর বিহারের 'ফলওয়ারী শরীফ' ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। ইয়াহ্‌ইয়া মুণীরীর শিষ্য মিনহাজুদ্দীন রাস্‌তীর মাধ্যমে ৮ম শতাব্দী হিজরীতে এই কেন্দ্রের গোড়াপত্তন হ'লেও দশম শতাব্দী

হিজরীতে 'শায়খুল মুহাদ্দেছীন' ইয়াসীন গুজরাটির আগমনের পরেই এই কেন্দ্রের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[৫৬] মূলতঃ তাঁর প্রচেষ্টায় এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়, যা এই অঞ্চলে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের প্রসারে সহায়ক হয়।

৫ম কেন্দ্রঃ কাশ্মীর

খোরাসানের বিখ্যাত অলি ও মুহাদ্দিছ আমীর কবীর সাইয়িদ আলী বিন শিহাব হামাদানী (৭১৪-৭৮৬/১৩১৪-৮৪ খৃঃ) ও তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে কাশ্মীর আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। ৭৭৩/১৩৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি ৭০০ শত শিষ্য নিয়ে ইরান হ'তে কাশ্মীর আগমন করেন এবং খুবই সফলতার সাথে ইল্‌মে হাদীছের প্রসার ঘটান। কাশ্মীরের শাসক স্বয়ং তাঁর মুরীদ হন। তাঁর মৃত্যুর পরে সাইয়িদ জামালুদ্দীন, কাযী হুসাইন সিরাযী, হাজী মুহাম্মাদ কাশ্মীরী (মৃঃ ১০০৬/১৫৯৭ খৃঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিছগণের মাধ্যমে বিশেষ করে শেষোক্ত 'হাজী কাশ্মীরীর' মাধ্যমে এতদঞ্চলে ইল্‌মে হাদীছের প্রসার ও আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়।[৫৭]

আন্দোলনের অন্যান্য কেন্দ্রঃ

ইতিপূর্বে বর্ণিত উত্তর ও পূর্ব ভারতের পাঁচটি প্রধান কেন্দ্র ছাড়াও ভারতবর্ষের আরও কয়েকটি স্থানে ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। সেসবের মাধ্যমে শিরক-বিদ'আতে আচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার তথা আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়। যেমন- (১) মালবঃ সুলতান মাহমূদ খাল্‌জীর সময়ে (৮৪০-৮৭৪/১৪৩৬-৬৯ খৃঃ) মালবের রাজধানী 'মান্ডু' ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্রে পরিণত হয়। শায়খুল মুহাদ্দেছীন সা'আদুল্লাহ মান্ডুবী ও আলীমুদ্দীন মান্ডুবী এখানকার খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ছিলেন।[৫৮] (২) সিন্ধুঃ ইরান হতে বিতাড়িত মাখদূম আবদুল আযীয আব্‌হারীর (মৃঃ ৯২৮/১৫২২ খৃঃ) মাধ্যমে দীর্ঘ সাড়ে চারশত বৎসরের বিরতি শেষে সিন্ধুতে পুনরায় ইল্‌মে হাদীছের পুনরুজ্জীবন ঘটে। তিনি মিশকাতের ভাষ্য লেখেন।[৫৯] (৩) ঝাঁসি ও কাল্‌পীঃ বাগদাদের মুহাদ্দিছ সাইয়িদ মুহাম্মাদ ইবরাহীম দশম শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে এখানে এসে প্রথমে ঝাঁসি ও পরে কাল্‌পীতে ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্র গড়ে তোলেন। (৪) আগ্রাঃ দশম শতাব্দী হিজরীতে আগ্রায় ইল্‌মে হাদীছের তিনটি

কেন্দ্র গড়ে ওঠে।- (ক) মাদরাসা রফীউদ্দীন ছাফাবী (মৃঃ ৯৫৪-১৫৪৬) (খ) মাদরাসা হাজী ইবরাহীম মুহাদ্দিছ আকবরাবাদী (মৃঃ ১০১০/১৬০০ খৃঃ) (গ) মাদরাসা সাইয়িদ শাহ মীর (মৃঃ ১০০০/১৫৯১ খৃঃ)[৬০] (৫) লাক্ষ্ণৌঃ মদীনা হ'তে শায়খ যিয়াউদ্দীন মুহাদ্দিছ দশম শতাব্দী হিজরীতে এখানে আগমন করলে লাক্ষ্ণৌ ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্রে পরিণত হয়। (৬) জৌনপুরঃ শারকী শাসনামলে (৭৯৭-৮৮৬/১৩৯৪-১৪৭৯ খৃঃ) মুহায্‌যাবুদ্দীন জৌনপুরী নামে এখানে একজন মুহাদ্দিছের সন্ধান পাওয়া যায়, যিনি মক্কার হাফেয আবদুর রহমান সাখাবীর (মৃঃ ৯০২/১৪৯৫ খৃঃ) ছাত্র ছিলেন। তাছাড়া এখানকার কিছু আলিমকে 'যুবদাতুল মুহাদ্দেছীন' খেতাব দেওয়াতে ধারণা হয় যে, ফিক্‌হ ও মা'কূলাত শিক্ষার এই শহরে দক্ষিণ ভারত অথবা হেজায হ'তে সমৃদ্ধিময় শারকী শাসনামলে কিছু মুহাদ্দিছের আগমন ঘটেছিল।[৬১]

দু'জন আপোষহীন ব্যক্তিত্বঃ

১. শায়খ মুনাওয়ার বিন আবদুল মজীদ লাহোরী (মৃঃ ১০১০/১৬০০ খৃঃ)ঃ অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী এই মুহাদ্দিছ প্রথমে সম্রাট আকবর (৯৬২-১০১২/১৫৫৬-১৬০২ খৃঃ) কর্তৃক ৯৮৫/১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মালবের 'ছদর' নিযুক্ত হন। কিন্তু আপোষহীন তাওহীদী আকীদার কারণে তিনি আকবরের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন। ৯৯৫/১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ হ'তে গোয়ালিয়র দূর্গে পাঁচ বছর কারাবাস ছাড়াও তাঁর সকল সহায়-সম্পদ ও কিতাবপত্র বাযেয়াফ্‌ত করা হয়। কারাগারে থেকেও তিনি তাফসীর ও হাদীছের উপরে কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এইভাবে সরকারী নির্যাতন ভোগ করতে করতে অবশেষে তিনি দেহত্যাগ করেন।[৬২] আকবরের দ্বীনে এলাহীর বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ তিনিই ছিলেন প্রথম সার্থক প্রতিবাদী কণ্ঠ।

২. শায়খ আহমাদ বিন আবদুল আহাদ সারহিন্দী ওরফে 'মুজাদ্দিদে আল্‌ফে ছানী' (৯৭১-১০৩৪/১৫৬৪-১৬২৪ খৃঃ)ঃ ওমর ফারূক (রাঃ)-এর বংশধর পূর্ব পাঞ্জাবের সারহিন্দে জন্মগ্রহণকারী এই আপোষহীন ব্যক্তিত্ব ছিহাহ সিত্তাহ ও তাফসীর শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর ১০০৮/১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী আগমন করেন।[৬৩] এই সময় রাজদরবারে ধর্মের নামে প্রচলিত বিভিন্ন শেরেকী রেওয়াজ এবং খান্‌ক্বাহ গুলিতে মা'রেফাত শিক্ষার নামে তাওহীদবিরোধী শিরক ও

বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ দেখে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি দরবারী আলেম ও খানক্বাহী ছূফীদের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। সম্রাট জাহাংগীর (১০১৩-৩৫/১৬০৫-২৭ খৃঃ) তাঁকে গোয়ালিয়র দূর্গে আটক করেন। দুই বা তিন বৎসর পরে ভুল বুঝতে পেরে তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও স্বীয় দরবারে 'সিজদায়ে তাযীমী'সহ চালুকৃত ১১টি শেরেকী প্রথার সবগুলি বাতিল করার ওয়াদা করেন।[৬৪] এই ঘটনার পর তিনি সর্বত্র 'মুজাদ্দিদে আল্‌ফে ছানী' বা 'দ্বিতীয় সহস্র হিজরী সনের ধর্মসংস্কারক' হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।[৬৫]

মুজাদ্দিদের বড় কৃতিত্ব ছিল এই যে, ফিক্‌হ ও মা'কূলাতের ইল্‌মে অভ্যস্ত আলেমসমাজ ও জনগণকে তিনি সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে আসার অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে সক্ষম হন। দ্বিতীয়তঃ শরীয়ত ও তরীকতকে পৃথকভাবে চিত্রিত করে মুসলিম সমাজকে যেভাবে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলা হয়েছিল, নিরলস দা'ওয়াত ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে এবং নিজের জীবনের বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তা নিরসনে তিনি অনেকটা সক্ষম হয়েছিলেন।[৬৬] তৃতীয়তঃ প্রচলিত তাক্বলীদী রেওয়াজের বিরুদ্ধে কঠোর মত প্রকাশ করায় মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত দীর্ঘকালের এই প্রথায় একটা দারুণ ধ্বস নামে,[৬৭] যা পরবর্তী অলিউল্লাহ যুগের শুভ সূচনায় সহায়ক হয়।

শায়খ আহমদের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র ও শিষ্যগণ তাঁর সংস্কার কার্যক্রম চালু রাখতে চেষ্টা করেন। ১. পুত্র শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদ (১০০৩-৭০ / ১৫৯৪-১৬৫৯খৃঃ) ২. পৌত্র ফররুখ শাহ বিন সাঈদ (১০৩৮-১১১২/১৬৩৪-১৭০০ খৃঃ)। ইনি সনদসহ ৭০,০০০ হাযার হাদীছের হাফেয ছিলেন।[৬৮] ৩. অন্যতম পুত্র মা'ছূম বিন শায়খ আহমাদ (১০০৯-১০৮০/১৫৯৯-১৬৬৮ খৃঃ)। ৪. পৌত্র সায়ফুদ্দীন বিন মাছূম (মৃঃ ১০৯৮/১৬৮৭ খৃঃ)। ইনি 'মুহিউস্‌ সুন্নাহ' (সুন্নাতের পুনর্জীবন দানকারী) নামে খ্যাতি লাভ করেন।[৬৯] ৫. খাজা আযম বিন সায়ফুদ্দীন (১০৬৬-১১১৪/১৬৫৫-১৭০৩ খৃঃ)। 'ফায়যুল বারী' নামে ইনি ছহীহ বুখারীর ভাষ্য লেখেন। ৬.শাহ আবু সাঈদ বিন ছফিউল ক্বদর (১১৯৬ -১২৫০/১৭৮২-১৮৩৪) ইনি সায়ফুদ্দীন সারহিন্দীর প্রপৌত্র এবং শাহ আবদুল

আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৬-১৮২৩) ও শাহ রফীউদ্দীন বিন অলিউল্লাহ দেহলভীর (১১৬২-১২৩৩/১৭৫০-১৮১৭) ছাত্র ও 'শহীদে মিল্লাত' শাহ ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১)-এর সহপাঠী ও সমসাময়িক ছিলেন। এইভাবে সারহিন্দের মুজাদ্দিদ পরিবারের সাথে দিল্লীর মুজাহিদ পরিবারের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটে- যা পরবর্তীতে 'দা'ওয়াত ও জিহাদের' কর্মসূচীর মাধ্যমে উপমহাদেশে আহ্লেহাদীছ আন্দোলনে আধুনিক যুগের শুভ সূচনা করে।

০ এই সাথে আমরা দিল্লীর আরেকজন ব্যতিক্রমধর্মী মুহাদ্দিছের নাম করতে পারি, যিনি ছহীহ আকীদা ও সুন্নাতের পুনর্জাগরণের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করেছেন এবং সমসাময়িক আলেমসমাজের তাক্বলীদী আচরণের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার থাকতেন। তিনি ছিলেন মির্যা মাযহার জানজানাঁ (মৃঃ ১১৯৫/১৭৮১ খৃঃ)। তাক্বলীদপন্থী আলেমদের একদেশদর্শী আচরণে বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলতেন- 'কি তাজ্জবের ব্যাপার যে, মা'ছূম রাসূলের ছহীহ গায়র-মানসূখ হাদীছ মওজূদ থাকতে কাযী ও মুফতীদের ভুলের আশংকাযুক্ত ফেক্বহী ফৎওয়ার উপরে আমল করা হচ্ছে।'[৭০]

অবক্ষয় যুগের আলোচনা শেষে আমরা এবার আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের আধুনিক যুগে প্রবেশ করতে চেষ্টা পাব।

টীকাসমূহ-৯

১. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বেশারী মাকদেসী প্রণীত ভ্রমণ গ্রন্থ 'আহসানুত তাক্বাসীম' (লন্ডনঃ ই, জে, ব্রীল, ২য় সংস্করণ ১৯০৬) পৃঃ ৪৮১।

২. Dr. Muhammad Ishque, INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE (Dacca University, 2nd Ed. 1976) p. 42.

৩. ইশতিয়াক হুসাইন কুরায়শী, উর্দূ অনুবাদঃ হেলাল আহমাদ যোবায়রী, 'বার্রে আযীম পাক ও হিন্দ কি মিল্লাতে ইসলামিয়াহ' (করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ ১৯৬৭) পৃঃ ৫১।

৪. শাহেদ হুসাইন রায্যাক্বী, ইল্মে হাদীছ মেঁ বার্রে আযীম পাক ও হিন্দ কা হিছ্ছা' (লাহোরঃ ইদারা দাক্বাফাতি ইসলামিয়াহ, ১৯৭৭খৃঃ) পৃঃ ৬১-৬৩।

৫. সমরূগণ ১৪শ খৃষ্টাব্দে এসে 'সুন্নী' হয়ে যায়। -'বার্রে আযীম পাক ও হিন্দ' পৃঃ ৫৩।

৬. সুলতান মাহমূদ (মৃঃ ৪২১/১০৩০ খৃঃ) একজন উঁচুদরের হানাফী আলিম ছিলেন। তাঁর

রচিত 'আত্-তাফরীদ' হানাফী ফিক্‌হের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ (আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, 'জুহুদ মুখ্‌লিছাহ' পৃঃ ৩১-৩২)। একদা নিজ দরবারে ইমাম ক্বাফ্‌ফাল মারওয়াযীর নিকটে তিনি হানাফী ও শাফেঈ উভয় মাযহাবের ছালাতের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন এবং ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক প্রমানিত হওয়ায় তিনি সংগে সংগে 'শাফেঈ' মাযহাব গ্রহণ করেন।- আহমাদ ইবনু খাল্লেকান (৬০৮-৬৮১/১২১২-১২৮৩), 'অফইয়াতুল আ'ইয়ান' (মিসরঃ মায়মানিয়াহ প্রেস ১৩১০/১৮৯২ খৃঃ) ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৬; তাজুদ্দীন সুব্‌কী, 'তাবাকাতুশ শাফেঈয়াহ' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ অফসেট ছাপা, মূল মুদ্রণকাল ১৩২৪/১৯০৬, ২য় সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৪)। ছহীহ হাদীছকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে ঐতিহাসিক মোল্লা মুহাম্মাদ কাসিম হিন্দুশাহ ঈরানী ওরফে ফিরিশ্‌তা (৯৭৮-১০২১/১৫৭০-১৬১২ খৃঃ) সুলতান মাহমূদকে 'আহলেহাদীছ' বিদ্বানদের মধ্যে গণ্য করেছেন (از ائمه اهل حدیث بود) তারীখে ফিরিশ্‌তা (কানপুর, ভারতঃ নওলকিশোর ছাপা ১৩০১/১৮৮৩ খৃঃ) ১ম মাক্বালাহ, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৩।

৭. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১৩২।

৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৩।

৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৭১; কাযী আতহার মুবারকপুরী মুহাদ্দিছ ইসমাঈল লাহোরীর মৃত্যুসন ৪০৮ হিজরী বলেছেন। -রিজালুস সিন্দ পৃঃ ৭৭।

১০. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৯৯।

১১. প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৩।

১২. 'রিজালুস সিন্দ' পৃঃ ১৬৫।

১৩. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহুদ মখ্‌লিছাহ পৃঃ ৩৩-৩৪, রিজালুস সিন্দ পৃঃ ৯৪।

১৪. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ২৫৭-৬৯।

১৫. 'জুহুদ মুখলিছাহ' পৃঃ ৩৪।

১৬. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ২৬৭।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৮ ['Suffice it to say that it was the 'Mashariq al Anwar' which kept aloft the banner of the sunnah in the fiqh-ridden country of India and central Asia of the day.' INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE. pp. 230.]

১৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৮; জুহুদ মুখলিছাহ পৃঃ ৩৭।

১৯. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১২৬।

২০. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৬-১১৭।

২১. ডঃ সৈয়দ মাহমূদুল হাসান, 'ভারত বর্ষের ইতিহাস-মুসলিম ও বৃটিশ শাসন' (ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী, ৪০ নর্থব্রুক হল রোড, ৩য় সংস্করণ পূণর্মুদ্রণ জুন ১৯৮৪)পৃঃ ২১৯।

২২. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১৩০।

২৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৯।

২৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩০-৩১।

২৫. 'ভারত বর্ষের ইতিহাস' পৃঃ ২১৫।

২৬. 'জুহুদ মুখ্‌লিছাহ' পৃঃ ৪০; 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১১৫।

২৭. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১১৬-১১৭।

২৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৮।

২৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৮। ৩০. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১২।

৩১. এ বিষয়ে সমস্ত আলোচনার জন্য ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক -এর পি,এইচ-ডি থিসিস INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE (Dacca Univerisity 2nd Ed. 1976; আবদুর রহমান ফিরিওয়াঈ, 'জুহূদ মুখ্লিছাহ' (বেনারসঃ মাতবা'আ সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬; সুলায়মান নাদ্ভী (১৮৮৪-১৯৫৩ খৃঃ) আযমগড় (ইউ,পি, ভারত)ঃ 'মা'আরিফ' গবেষণা পত্রিকা ২২শ বর্ষ ৪ ও ৫ সংখ্যায় প্রকাশিত দীর্ঘ প্রবন্ধ 'হিন্দুস্তান মেঁ ইল্মে হাদীছ' দ্রষ্টব্য।

৩২. 'জুহূদ মুখ্লিছাহ' পৃঃ ৩৭।

৩৩. 'আরব ও হিন্দ কে তা'আল্লুক্বাত' (সংক্ষেপায়িত) পৃঃ ১৮৭-৯০।

৩৪. 'ইল্মে হাদীছ' পৃঃ ৭৯। আল্লামা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪/১৮৪৮-১৮৮৬ খৃঃ) বর্ণিত ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ নিযামুদ্দীন আউলিয়া 'সামা' (একপ্রকার মা'রেফতী গান) শুনতেন ও তা 'মুবাহ' মনে করতেন। এব্যাপারে তিনি ইমাম গাযালীর (৪৫০-৫০৫ হিঃ/১০৫৮-১১১১ খৃঃ) 'এহ্ইয়াউল উলূমে' বর্ণিত হাদীছ (السماعُ مُباحٌ لأهله) থেকে দলীল নিয়েছিলেন। তবে ওটা যে মূলতঃ হাদীছ নয়, সেটা তিনি পরে বুঝতে পারেন ও মত পরিবর্তন করেন। যাই হোক হাদীছ ভেবেই তিনি দিল্লীর সুলতান গিয়াছুদ্দীন তুগলক (৭৯০-৯১/১৩৮৮-৮৯)-এর দরবারে অনুষ্ঠিত বিতর্কসভায় প্রতিপক্ষ আলিমদের জওয়াবে সেটা পেশ করেন। এতে আলিমগণ ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন- 'হিন্দুস্থানে হাদীছের চেয়ে ফিক্হের আইনগত গুরুত্ব বেশী' (هندوستان میں فقهی روایات کی قانونی حیثیت خود أحادیث سے بهی زیاده هے)। তাদের কেউ কেউ বললেন- ঐ সব হাদীছ আমরা শুনতে চাইনা, যা আমাদের মাযহাবের শত্রু ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) গ্রহণ করেছেন' (إنا لا نَشْتَهِي أَنْ نَسْمَعَ هذه الاحاديثَ التي تَمَسَّكَ بها الشافعيُّ و هو عَدُوٌّ لِمَذْهَبِنَا) তারা এ ব্যাপারে ইমাম আবুহানীফা (৮০-১৫০)-এর রায় তলব করেন। তখন শায়খ ব্যথিত হয়ে বলেন- 'সেই দেশে মুসলমান কতদিন টিকে থাকবে, যেদেশে একজন ব্যক্তির রায়-কে হাদীছের উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে?' (ایسے ملك میں مسلمان كب تك باقی رهینگے جهاں ایك فرد كی رائے كو أحادیث پر فوقیت دیجاتی هے ؟) তিনি বলেন- সুবহানাল্লাহ! আমি তোমাদের কাছে রাসূলের (ছাঃ) হাদীছ বর্ণনা করছি, আর তোমরা আমার কাছে আবু হানীফার উক্তি দাবী করছ?' سبحان الله العظيم أنا أُحَدِّثُكُمْ عن رسولِ الله (ص) و تُطَالِبُنِيْ بقولٍ من أقوالِ أبي حنيفةَ ؟ 'ইল্মে হাদীছ' পৃঃ ৭৯; 'জুহূদ মুখলিছাহ' (আরবী) পৃঃ ৩৮।

৩৫. 'ইল্মে হাদীছ' পৃঃ ৭৩-৭৫।

৩৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৫। ৩৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৫-৯৮।

৩৮. ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক চারটি কেন্দ্র বলেছেন। -প্রাগুক্ত পৃঃ ৮০।

৩৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৬।

৪০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৪-৯৫।

৪১. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮২।

৪২. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৩।

৪৩. রঈস আহমাদ নাদবী ও সাথীগণ, 'জামা'আতে আহ্‌লেহাদীছ কি তাছনীফী খিদমাত' (বেনারস-ভারতঃ মাকতাবা সালাফিইয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৪০০/১৯৮০) পৃঃ ৭।

৪৪. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৮৪।

৪৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৪-৮৫।

৪৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৬।

৪৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৬-৮৭।

৪৮. ডঃ আতীকুর রহমান কাসেমী, 'আল্লামা শাওক নীমবীঃ হায়াত ও খিদমাত' (পাটনা-ভারত ১৯৮৭) পৃঃ ১৫।

৪৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫।

৫০. ফারুক মাহমুদ, প্রবন্ধঃ সোনার বাংলার অংগনে (ঢাকাঃ দৈনিক ইনকিলাব ৯ই আষাঢ় ১৩৯৫, ২৪শে জুন ১৯৮৮, শুক্রবার) পৃঃ ৮-৯; ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন জাতীয় দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর তৎকালীন সম্পাদক জনাব আখতার-উল-আলম বাগদাদ সফরের সময়ে সেখানকার লাইব্রেরীতে উক্ত পাণ্ডুলিপিটি দেখেন।-ঐ।

৫১. বর্তমানে ঢাকার জাদুঘরে রক্ষিত নুছরত শাহের আমলে (৯২৪-৩৯/১৫১৯-৩৩ খৃঃ) সোনারগাঁয়ে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে নির্মিত একটি মসজিদের উৎকীর্ণ আরবী শিলালিপি হ'তে একথা অনুমান করা চলে। বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ

(قال الله تعالى و أنَّ المساجِدَ لِلّهِ فلا تَدْعُوا مع اللهِ أحَداً- (جن ١٨) و قال النبيُّ صلى الله عليه و سلم مَنْ بَنَى مسجداً لِلّهِ يَبْتَغِيْ به وَجْهَ الله بَنَى اللهُ له مثْله فى الجنة - بَنَى هذا المسجدَ لله فى عَهْد السلطان بنِ السلطانِ ناصرُ الدنيا والدينِ أَبو المظَفَّر نُصْرَتْ شاه السلطانُ الحسينيُّ خَلَّدَ اللهُ مُلْكَه و سلطانَه ، و بَنَاهُ لِوَجْه اللهِ مع بيت السقاية مَلِكُ الأمَرَاءِ والوزراءِ قُدْوَةُ الفقهاءِ والمحَدِّثين تَقِيُّ الدين بنُ عينِ الدين المعروفُ بمبارك مُلا بن المجلس مختار بن المجلس سرور سلَّمَه اللهُ تعالى فى الدارين ، فى سنة تسع عشرين و تسع مائة ، سنة ٩٢٩ الهجرية) ঢাকা জাদুঘর, ২য় তলা ২০নং গ্যালারী, সংগ্রহ নং ৬৬.২৬২।

৫২. Dr. Muhammad Ishaque, INDIA'S CONTRIBUTION pp 115-116; 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১৩৫-১৩৬।

৫৩. সুলায়মান নাদভী, মা'আরেফ (আযমগড়, উত্তর প্রদেশ- ভারত) ২৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ২৯৫-৯৬; 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৮৯-৯০; আতীকুর রহমান, 'শাওক নীমবী' পৃঃ ২২।

৫৪. প্রাগুক্ত টীকা সমূহ।

৫৫. Dr. Muhammad Ishaque, INDIA'S CONTRIBUTION pp 66-71. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৯০-৯২।

৫৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৪-১৫; ঐ উর্দূ পৃঃ ১৩৫; 'শাওক নীমবী' পৃঃ ২৪।

৫৭. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৯২-৯৩, ১৬১।

৫৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩১। ৫৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩২।

৬০. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৩। ৬১. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৪।

৬২. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১৬৩।

৬৩. ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি, 'তারীখে আহলেহাদীছ' (ওখ্‌লা, নয়াদিল্লীঃ মাকতাবা তাওহীদ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩) পৃঃ ৩৯৮-৯৯।

৬৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪০০; মুহাম্মাদ হালীম, মুজাদ্দিদে আ'যম (লাহোরঃ আশরাফ প্রেস, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬৮) পৃঃ ৬৯; 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১৬৬।

৬৫. সর্বপ্রথম মাওলানা আবদুল হাকীম শিয়ালকোটি তাঁকে এই 'লকব' প্রদান করেন। পরে তা সর্বসাধারণ্যে চালু হয়ে যায়। -তারীখে আহলেহাদীছ পৃঃ ৩৯৯।

৬৬. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১৬৭।

৬৭. যেমন 'তাক্বলীদ'-এর বিরুদ্ধে তিনি বলেন, ١- اگر أحيانا از پير امر خلاف شريعت ظاهر شود، مريد در إيں امر تقليد پير نه كند - শরীয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, ٢- فردائے قيامت از شريعت خواهند برسيد ، از تصوف نه خواهند برسيد - دخول جنت و تجنب از نار وابسته باتيان شريعت است - ٣- شريعت را سه جزء است ، علم عمل و إخلاص - پس طريقت و حقيقت خادم شريعت اند - ٤- شريعت را پوست خيال ميكنند اور حقيقت را مغز ميدانند ، نمى دانند كه حقيقت معامله چيست .. (مكتوبات امام ربانى ١/٣١٣، ١/٤٨، ١/٤٠، ١/٤٠ مكتوب)

৬৮. 'জুহুদ মুখ্‌লিছাহ' পৃঃ ৫৭।

৬৯. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১৬৯।

৭০. العَجَبُ كُلُّ العجبِ أنَّ الحديثَ الصحيحَ غيرَ المنسوخِ لا يُعْمَلُ به مع أنه يُرْوَى عن النبيِّ المعصومِ عن الخطأ عليه السلام بِبِضْعِ وَسائطَ من الرواةِ الثقاتِ و يُعْمَلُ بالرواياتِ الفقْهيَّةِ التى نَقَلَها القُضَاةُ والمُفْتُوْنَ بوسائطَ عديدةٍ عن الإمامِ غيرِ المعصومِ مع أنَّ ضَبْطَهم و عَدْلَهم غيرُ معلومٍ - 'জুহুদ মুখ্‌লিছাহ' পৃঃ ৭৯।

অধ্যায়-৯

الفصل التاسع

আধুনিক যুগ ঃ ১ম পর্যায়

دور الجديد: المرحلة الاولى : الشاه ولى الله الدهلوى

(১১১৪-৯৩/১৭০৩-৭৯) ৬৫ বৎসর)

১১১৪/১৭০৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী অলিউল্লাহ যুগঃ[১]

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের পূর্ব থেকেই রাজধানী দিল্লীসহ ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা এক নাযুক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। ইসলামের কেবল নাম বাকী ছিল। কুরআনের তরজমা নিষিদ্ধ ছিল। ইল্‌মে হাদীছের চর্চা বন্ধ ছিল। দরবারী আলিমদের চালুকৃত ফৎওয়ার বিরোধিতা করা রীতিমত দুঃসাহসের ব্যাপার ছিল। খান্‌ক্বাহ ও দরগাহের বিদ'আতী পীরদের আশীর্বাদ-অভিশাপই যেন মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে উঠেছিল। জ্যোতিষীর গণনা ছাড়া রাজা-বাদশারাও বড় কোন কাজে হাত দিতেন না। তাছাউওফের নামে শতাধিক দল, দেহতত্ত্বের নামে প্রায় অর্ধশত দল এবং নবাবিষ্কৃত হাকীকত, তরীকত ও মা'রেফাতের ধূম্রজালে শরীয়তের স্বচ্ছ আলো থেকে মানুষ বঞ্চিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্য প্রায় মুছে গিয়েছিল। সংস্কারের যে বীজ শায়খ আহমাদ সারহিন্দী (৯৭১-১০৩৪/১৫৬৪-১৬২৪ খৃঃ) বপন করেছিলেন, শতবর্ষের ব্যবধানে তা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। সম্রাটের প্রাসাদ হ'তে গরীবের পর্ণকুটীর পর্যন্ত বিস্তৃত কুসংস্কারের মূল উৎপাটনের জন্য সমগ্র সমাজ একজন দূরদর্শী চিন্তানায়ক ও সমাজবিপ্লবীর আগমনের জন্য উন্মুখ হ'য়ে ছিল। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে 'ফৎওয়ায়ে আলমগীরী'র অন্যতম সংকলক ও দিল্লীর মাদরাসা রহীমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আবদুর রহীমের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন অষ্টাদশ শতকে হিন্দ উপমহাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল প্রেরণা সৃষ্টিকারী ও আধুনিক যুগের অগ্রনায়ক কুতুবুদ্দীন আহমাদ বিন আবদুর রহীম ফারূকী ওরফে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২)। পরবর্তীতে তাঁর স্বনামধন্য

পৌত্র শাহ ইসমাঈল বিন শাহ আবদুল গণী বিন শাহ অলিউল্লাহ (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১ খৃঃ) পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে যা একটি বাস্তব সামাজিক বিপ্লবের রূপ নেয় এবং উপমহাদেশে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি করে।

ইসলামী পুনর্জাগরণে অলিউল্লাহ্‌র অবদানঃ

১- ইল্‌মে তাফসীর

কুরআনের শিক্ষাকে সকলের সহজবোধ্য করার জন্য তিনি কুরআন বুঝার পদ্ধতি বিষয়ে বই লেখেন ও ফারসীতে কুরআনের তরজমা প্রকাশ করেন। এই অপরাধে (?) দিল্লীর আলেম সমাজ তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।[২]

২- ইল্‌মে হাদীছ

তখনকার সময়ে সরকারীভাবে কাযী ও মুফতী নিযুক্ত হওয়ার জন্য ফিক্‌হ ও মা'কূলাতের ইল্‌মে পারদর্শী হওয়া যরূরী ছিল। সেকারণে ইল্‌মে হাদীছ ও তাফসীরের প্রতি বাড়তি মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত কারু ছিলনা। শাহ অলিউল্লাহ মাদরাসা রহীমিয়াহ্‌তে ইল্‌মে কুরআন ও হাদীছের নিয়মিত দরস শুরু করেন। তিনি (১) হাদীছের যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী নিয়মনীতি প্রণয়ন করেন। যার ফলে মাসায়েল খুঁজে বের করতে সুবিধা হয়। এব্যাপারে তিনি 'সনদ'কে মানদন্ড হিসাবে গ্রহণ করেন ও সে অনুযায়ী হাদীছ গ্রন্থসমূহের স্তর বিন্যাস করেন। এর ফলে ছহীহ হাদীছ হ'তে সমাধান পাওয়া সহজতর হয় (২) তিনি সবসময় হাদীছের সূক্ষ্ম তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতেন। 'হুজ্জাতুল্লাহ্'-র ছত্রে ছত্রে যার প্রমাণ মেলে। এর ফলে হাদীছের প্রতি জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় (৩) যে সকল হাদীছ বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী মনে হ'ত, শাহ ছাহেব সেগুলির এমন সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য বিধান করতেন যে, কোন বিরোধ বাকী থাক্‌ত না। 'ইযালাতুল খাফা' প্রভৃতি গ্রন্থে তার প্রমাণ মেলে। এর ফলে হাদীছ সম্পর্কে উত্থাপিত অহেতুক সন্দেহবাদ দূর হয়।

৩- ফিক্‌হের খিদমত

প্রচলিত চার মাযহাবের মধ্যকার বিরোধীয় মাসআলা সমূহের সামঞ্জস্য বিধানে

শাহ্ ছাহেব মূল্যবান অবদান রাখেন। তিনি বলতেন 'হানাফী ও শাফেঈ দুই মাযহাবের ঐসব বিষয়কে টিকিয়ে রাখা হৌক যেগুলির সঙ্গে হাদীছের মিল আছে এবং ঐগুলিকে বাদ দেওয়া হৌক যেগুলির কোন ভিত্তি নেই।'[৩] .... তিনি বলেন, 'হাদীছের শব্দ হ'তে যে অর্থ বুঝা যায়, তার উপরে স্থির থাকতে হবে। কোন দূরতম ব্যাখ্যা বা 'তাবীল' করা যাবেনা। এক হাদীছ দ্বারা আরেক হাদীছকে বাতিল করা যাবে না। কারু কথা অনুযায়ী কোন ছহীহ হাদীছকে পরিত্যাগ করা যাবে না।'[৪] তাঁর দ্বিতীয় অছিয়ত হ'ল- 'আমি চার মাযহাবের বাইরে যাব না। এগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করব। প্রকৃত অবস্থা এই যে, আমার তবিয়ত তাকলীদকে অস্বীকার করে এবং তা থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নেয়।'[৫]

৪- তাছাউওফের খিদমত

শরীয়ত ও তরীকতের মধ্যে প্রচলিত দ্বৈত চিন্তাধারার অবসান ঘটানোর জন্য শাহ ছাহেব সুক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় নিয়ে 'লতীফায়ে জাওয়ারিহ' (لطيفه جوارح) বা অংগ-প্রত্যংগের লতীফা নামে প্রচলিত জ্ঞানের, আত্মার ও নফ্‌সের লতীফার সাথে চতুর্থ আরেকটি লতীফার প্রস্তাব রাখেন। কারণ শাহ্ ছাহেব প্রচলিত ছূফীবাদের ধারণা অনুযায়ী মানুষকে যাহেরী ও বাতেনী দ্বৈতশক্তির পৃথক সত্তাধিকারী বিবেচনা না করে মানবদেহের সকল শক্তির পারস্পরিক ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। মৃত্যুমুখে পতিত একটি বৃদ্ধ উটের উদাহরণ দিয়ে শাহ্ ছাহেব বলেন, শরীয়ত কোন ব্যক্তির আমলের হিসাব অতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করবে যতক্ষণ তার অংগ-প্রত্যংগ তথা 'লত্বীফায়ে জাওয়ারিহ' চালু থাকবে। যেমন উক্ত উটের সকল লতীফা অতক্ষণ পর্যন্ত চালু ছিল, যতক্ষণ তার অংগ-প্রত্যংগের লতীফাটি চালু ছিল।[৬] শাহ্ ছাহেবের এই প্রচেষ্টার ফলে শরীয়তের আলিম ও মা'রেফাতের পীর-আউলিয়াদের মধ্যকার দূরত্ব অনেকটা কমে আসে।

৫- শরীয়ত ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে অবদান

যুগ যুগ ধরে মুজতাহিদগণের মধ্যে শরীয়তের ব্যাখ্যাগত বিষয়ে আহ্‌লুলহাদীছ ও আহ্‌লুর রায়-এর দু'টি ধারা চলে আসছে। শাহ্ অলিউল্লাহ এক্ষেত্রে সমসাময়িক ভারতীয় আলিমদের বিপরীতে সালাফে ছালেহীন ও ফুক্বাহায়ে মুহাদ্দিছীনের তরীকা অনুসরণ করেন,[৭] যা দিল্লীর আলিমদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে ও

সর্বত্র আমল বিল-হাদীছের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

এতদ্ব্যতীত কোন বিষয়ে ছহীহ গায়র মানসূখ হাদীছ মওজুদ থাকতে কোন নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করার বিরুদ্ধে তিনি বিভিন্নভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। এই সকল বক্তব্যে তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌কে সর্বদা নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার তাকীদ দিয়েছেন। তিনি তাক্বলীদপন্থী ফক্বীহ ও কট্টরপন্থী যাহেরী (LITERALIST) উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন।[৮]

বাহ্যিক আমলগত ব্যাপারেও তিনি তাঁর লেখনীর মধ্যে মুহাদ্দিছীনের তরীকা সমর্থন করেছেন কখনও সরাসরিভাবে কখনো পরোক্ষভাবে। যেমন ছালাতে রাফ্‌উল ইয়াদায়েন করা, ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা, সরবে আমীন বলা ইত্যাদি।[৯] এব্যাপারে আল্লামা ফাখের যায়ের এলাহাবাদীর (১১২০-৬৪/১৭০৮-৫১ খৃঃ) সাথে তাঁর সরস আলোচনা খুবই প্রসিদ্ধ।[১০]

৬- অলিউল্লাহ্‌র রাজনৈতিক দর্শন

শাহ অলিউল্লাহ জাতি ও সমাজকে একটি ব্যক্তিসত্তা হিসাবে কল্পনা করেন- যা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয়। দেহের কোন একটি অংশে রোগ সংক্রমণ হ'লে যেমন সমস্ত দেহ রোগগ্রস্থ হয়, তেমনিভাবে সমাজের কোন সদস্যের অন্যায়াচরণের ফলে সমাজদেহ সংক্রমিত হয়। অতএব সমাজদেহকে সুস্থ রাখার জন্য সমাজের জ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্য হ'তে সৎ ও আমানতদার একজনকে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল নিয়োগ করতে হবে- যিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হবেন। সুষ্ঠু নীতিমালার ভিত্তিতে তিনি সমাজ শাসন ও পরিচালনা করবেন। এব্যাপারে শাহ ছাহেব কুরআনকে মূল হেদায়াত হিসাবে গণ্য করে ইল্‌মে হাদীছ, ইজমা ও বিগত মুজতাহিদগণের উক্তি সমূহকে সামনে রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। তৎকালীন দিল্লীর ঘুণে ধরা মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন 'ফাক্কু কুল্লি নিযাম' (فك كل نظام) 'সকল ব্যবস্থার উৎসাদন' চাই।[১১] দূরদর্শী চিন্তানায়ক হিসাবে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে মুসলমানদের বিদায় ঘন্টা শুনতে পেয়েছিলেন। মারাঠাদের বাড়াবাড়ি চরমে উঠলে তিনি

ইরানের দুর্ধর্ষ শাসক নাদির শাহের (১৭৩২-৪৭ খৃঃ) খ্যাতনামা সেনাপতি আফগান বীর আহমাদ শাহ্ আবদালীকে (১৭৪৮-৬৭ খৃঃ) ডেকে এনে তাদেরকে উৎখাত করেন। অতঃপর আপামর মুসলিম জনসাধারণকে তিনি জিহাদের পথে উদ্বুদ্ধ করেন। 'হুজ্জাতুল্লাহ্'র ২য় খণ্ডে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে যতদিন জিহাদের জায্‌বা ছিল, ততদিন তারা সকলক্ষেত্রে বিজয়ী ছিল। কিন্তু যখন থেকে এই জায্‌বা স্তিমিত হয়েছে, তখন থেকে তারা সর্বত্র লজ্জিত ও ধিকৃত হচ্ছে।'[১২] শিরক ও বিদ'আতে আচ্ছন্ন স্রোতে ভেসে চলা মুসলিম সমাজকে মূল তাওহীদী আক্বীদায় ফিরিয়ে আনার জন্য এবং সকল ফিক্বহী কুটতর্ক ও ঝগড়া পরিহার করে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা অবনতমস্তকে মেনে নিয়ে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ সমাজশক্তিতে পরিণত করার জন্য তিনি নিরলস লেখনী পরিচালনার সাথে সাথে মাদরাসা রহীমিয়াতে ইল্‌ম ও আমলের বাস্তব নমুনা হিসাবে যেসব মর্দে মুজাহিদ সৃষ্টি করেছিলেন,[১৩] তাদেরই বিপ্লবী উত্তরসূরীগণ পরবর্তীতে 'দা'ওয়াত ও জিহাদের' কর্মসূচী নিয়ে বালাকোট, মুল্‌কা, সিত্তানা, আসমাস্ত, চামারকান্দ, বাঁশের কিল্লার রক্ত রঞ্জিত জিহাদী ইতিহাস সৃষ্টি করেন। যার বাস্তব ফলশ্রুতিই হ'ল বর্তমানে উপমহাদেশের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলি। এক্ষণে বাকী রয়েছে কেবল অলিউল্লাহ দর্শনের প্রধান অংশ- 'সকল ব্যবস্থার উৎসাদন এবং কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন'- যা আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।[১৪]

শাহ্ ছাহেবের মৃত্যুর পরে তাঁর স্বনামধন্য চার পুত্র শাহ্ আবদুল আযীয (১১৫৯ ১২৩৯/ ১৭৪৭-১৮২৪ খৃঃ), শাহ রফীউদ্দীন (১১৬২- ১২৩৩/ ১৭৫০-১৮১৮), শাহ্ আবদুল কাদের (মৃঃ ১১৬৭-১২৫৩/১৭৫৫-১৮৩৮), শাহ্ আবদুল গণী (১১৭০-১২২৭/১৭৫৮-১৮১২ খৃঃ) ও অন্যান্য শিক্ষকদের মাধ্যমে তাঁর উক্ত মিশন জারি থাকে। অতঃপর তাঁরই পৌত্র শাহ্ ইসমাঈল বিন আবদুল গণীর (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১ খৃঃ) নেতৃত্বে পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে- যা একই সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ব্যাপক রূপ দান করে।

টীকাসমূহ-১০

১. 'অলিউল্লাহ পরিবার' (خاندان ولی الله) **বলতে** উক্ত পরিবারের **১২ জন** শ্রেষ্ঠ বিদ্বানকে **বুঝানো হয়** (و بعثنا منهم إثنى عشر نقيبا ، المائده ١٢)। ১. শাহ অলিউল্লাহ আহমাদ বিন আবদুর রহীম (১১১৪-৭৬/ ১৭০৩-৬২) ২. ঐ চারপুত্র ঃ শাহ আবদুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৭-১৮২৪) ৩. শাহ রফীউদ্দীন (১১৬২-১২৩৩/১৭৫০-১৮১৮) ৪. শাহ আবদুল কাদের (১১৬৭-১২৫৩/১৭৫৫-১৮৩৮) ৫. শাহ আবদুল গণী (১১৭০-১২২৭/১৭৫৮-১৮১২) ৬. অলিউল্লাহ পৌত্র শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল বিন শাহ আবদুল গণী (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) পবিত্র কুরআন ও ত্রিশ হাযার হাদীছের হাফেয এবং বালাকোটের শহীদ। ৭. শাহ আবদুল আযীযের জামাতা শাহ আবদুল হাই বিন হেবাতুল্লা বিন নূরুল্লাহ বড়ঢানভী (মৃঃ ১২৪৩/১৮২৮ খৃঃ) দিল্লীর অন্যতম সেরা এই বিদ্বান শাহ ইসমাঈল শহীদের সাথে একই দিনে সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর হাতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন ও সীমান্তের পাঞ্জতার ঘাঁটিতে অর্শ রোগে মৃত্যু বরণ করেন। শাহ ইসমাঈল নিজ হাতে তাঁকে গোসল ও কাফন-দাফন করান। ৮. অলিউল্লাহ পৌত্র শাহ মাখ্ছূছুল্লাহ বিন শাহ রফীউদ্দীন (মৃঃ ১২৭৩/১৮৫৭ খৃঃ) ৯. শাহ আবদুল আযীযের দৌহিত্র শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক 'মুহাজিরে মাক্কী' বিন মুহাম্মাদ আফযাল ফারূকী (১১৯২-১২৬২/ ১৭৭৮-১৮৪৬) ১০. ঐ ছোটভাই, শাহ মুহাম্মাদ ইয়াকুব 'মুহাজিরে মাক্কী' (মৃঃ ১২০০-৮৩ / ১৭৮৫-১৮৬৭ খৃঃ) ১১. মোল্লা আবদুল কাইয়ূম বিন শাহ আবদুল হাই বাড়ঢানভী (মৃঃ ১২৯৯/১৮৮২ খৃঃ)। মক্কা শরীফে শাহ মুহাম্মাদ ইসহাকের নিকট লালিত পালিত হন এবং তাঁরই খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন। ভূপালের রাণীর আমন্ত্রণে তিনি শেষ জীবনে ভূপালে ফিরে আসেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। ১২. শাহ মুহাম্মাদ উমার বিন শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ (জন্ম ও মৃত্যু সন জানা যায়নি)। শাহ ইসমাঈল শহীদের একমাত্র পুত্র ও শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক-এর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। যবরদস্ত আবিদ ও যাহিদ আলিম ছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ বার বার আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রকাশ থাকে যে, শাহ অলিউল্লাহ-এর ৩১তম ঊর্ধতন পুরুষ ছিলেন খলীফা ওমর বিনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)।- সূত্রঃ মেহের, 'জামা'আতে মুজাহেদীন' ও নওশাহ্রাবী, 'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ'। অলিউল্লাহ পরিবার সম্পর্কে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান মন্তব্য করেন- (و كلهم كانوا علماء نجباء حكماء فقهاء كأسلافهم و أعمامهم ، كيف لا ؟ و هم من بيت العلم الشريف و النسب الفاروقى المنيف - (أبجد العلوم للنواب) তারাজিম পৃঃ ৩৫; শাহ ছাহেব সম্পর্কে খ্যাতনামা অন্ধ আরবী কবি আবুল 'আলা আল-মা'আররী-র নিম্নোক্ত কবিতা প্রযোজ্য হ'তে পারে-

وَ إِنِّى وَ إِنْ كُنْتُ الأَخِيرَ زَمَانَهُ + لَآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الأَوَائِلُ

অর্থঃ 'সময়ের হিসাবে যদিও আমি শেষে এসেছি, তথাপি আমি এমন কিছু নিয়ে এসেছি,

যা পূর্বসূরীগণ আনতে সক্ষম হননি।'

শাহ অলিউল্লাহ্(রহঃ)-এর বংশতালিকা নিম্নরূপঃ

শাহ অলিউল্লাহ আহমাদ বিন (২) আবদুর রহীম বিন (৩) শহীদ অজীহুদ্দীন বিন (৪) মু'আযয্াম বিন (৫) আহমাদ বিন (৬) মুহাম্মাদ বিন (৭) ক্বাউওয়ামুদ্দীন ওরফে ক্বাযী ক্বাযেন (قازن) বিন (৮) ক্বাসেম বিন (৯)ক্বাযী কবীরুদ্দীন ওরফে ক্বাযী বুধ বিন (১০) আবদুল মালিক বিন (১১)কুতুবুদ্দীন বিন (১২) কামালুদ্দীন বিন (১৩) শামসুদ্দীন মুফতী বিন (১৪) শের মালিক বিন (১৫) মুহাম্মাদ আব্দে মালিক বিন (১৬) ফৎহ মালিক বিন (১৭) মুহাম্মাদ ওমর হাকেম মালিক বিন (১৮) আদেল মালিক বিন (১৯) ফারূক বিন (২০) বারজীস বিন (২১)আহমাদ বিন (২২)মুহাম্মাদ শাহ্‌রিয়ার বিন (২৩) উছমান বিন (২৪) হামান বিন (২৫) হুমায়ূন বিন (২৬) কুরাইশ বিন (২৭) সুলায়মান বিন (২৮) আফ্‌ফান বিন (২৯)আবদুল্লাহ বিন (৩০) মুহাম্মাদ বিন (৩১) আবদুল্লাহ বিন (৩২) ওমর বিনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম)। এই বংশের শায়খ শামসুদ্দীন মুফতী সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানে আসেন এবং 'রাহতাক' (رهتك) শহরে একটি মাদ্‌রাসা কায়েম করেন। পরে তিনি সেখানে শহরের মুফতী নিযুক্ত হন। ক্বাযী ক্বাযেন পর্যন্ত এই পদ তাঁর বংশেই নির্ধারিত ছিল। -তারাজিম পৃঃ ৪০।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

নিঃসন্তান পিতা শাহ আবদুর রহীম-এর ৬০ বৎসর বয়স পার হবার পরে নব পরীণীতা দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে শাহ অলিউল্লাহ, আহ্‌লুল্লাহ ও হাবীবুল্লাহ নামক পর পর তিনটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। ৭ বৎসর বয়সে শাহ অলিউল্লাহ পবিত্র কুরআনের হাফেয হন। ১০ বৎসর বয়সে 'শারহে জামী' শেষ ক'রে পিতার নিকটে ফিক্‌হ, উছূলে ফিক্‌হ, তাফসীর বায়যাভী, আক্বায়েদ, মানতিক, মিশকাত ও অন্যান্য কিতাব পড়তে শুরু করেন। এই সময় তাঁর অন্যান্য উস্তাদগণের মধ্যে মুহাম্মাদ আফযাল শিয়ালকোটি, অফ্‌দুল্লাহ মাক্কী, তাজুদ্দীন মাক্কী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ১১৪৩ হিজরীতে তিনি মদীনা শরীফ গমন করেন এবং শায়খ আবু তাহের কুর্দী (মৃঃ ১১৪৫ হিঃ)-এর নিকটে ছহীহ বুখারীর পাঠ শুরু করেন। একই সময়ে তিনি তাঁর নিকট থেকে অন্যান্য হাদীছের পাঠ দানের ও সনদ প্রদানের অনুমতি লাভ করেন। উস্তাদ প্রায়ই বলতেন- 'অলিউল্লাহ আমার নিকট থেকে শব্দের সনদ নিচ্ছে, আর আমি তার নিকট থেকে অর্থের সনদ নিচ্ছি।'

১৫ বৎসর বয়স থেকে বুযর্গ পিতা তাঁকে আধ্যাত্মিকতার সবক দিতে শুরু করেন এবং ১৭ বৎসর বয়সে তাঁকে 'বায়'আত' গ্রহণের অনুমতি দেন। সে বছরেই তিনি ইন্তেকাল করলে শাহ অলিউল্লাহ আমৃত্যু উক্ত 'বায়'আত ও ইরশাদ'-এর আসন অলংকৃত করেন।

গ্রন্থাবলীঃ তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা শতাধিক। কিন্তু সবগুলি সংরক্ষিত হয়নি। 'তারাজিম' লেখক ৫০টি বইয়ের তালিকা দিয়েছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি যেমনঃ- (১) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ -আরবী (২) ফাৎহুর রহমান - কুরআনের ফারসী অনুবাদ (৩) আল-ফওযুল

কাবীর -ফারসী ও আরবী (৪) আল-মুছাফ্‌ফা ও আল-মুসাউওয়া -মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক -এর ফারসী ও আরবী শরহ (৫) তারাজিমুল বুখারী -আরবী (৬) আল-ইনছাফ -আরবী (৭) ইক্বদুল জীদ-আরবী (৮) সাৎ'আত -আরবী (৯) ফুয়ূযুল হারামাইন -আরবী (১০) তাফহীমাতে ইলাহিয়াহ -আরবী ও ফারসী (১১) আল-আক্বীদাতুল হাসানাহ্ -আরবী (১২) আল-বালাগুল মুবীন -ফারসী (১৩) ইযালাতুল খাফা -ফারসী (১৪) আল-মাক্বালাতুল অযিইয়াহ, অছিয়াত নামা -ফারসী।- তারাজিম পৃঃ ৩৮-৪৬, ৬৭-৬৯।

২. আবু ইয়াহ্‌ইয়া ইমাম খান নওশাহ্‌রাবী, 'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ' (লায়ালপুর-পাকিস্তানঃ জামেয়া সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৩৯১/১৯৮১) পৃঃ ৬৬।

৩. শাহ অলিউল্লাহ, 'তাফহীমাতে ইলাহিয়ার' বরাতে ঐ প্রণীত 'সাত্ব'আত'-এর উর্দূ অনুবাদের ভূমিকাঃ সাইয়িদ মুহাম্মাদ মতীন হাশেমী, ডিসেম্বর ১৯৭৫ (লাহোরঃ ইদারা ছাক্বাফাতি ইসলামিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬) পৃঃ ২১।

৪. শাহ অলিউল্লাহ, 'ফুয়ূযুল হারামাইন' উর্দূ অনুবাদসহ (দিল্লীঃ মাতবা'আ আহমদী, ১৩০৮/১৮৯০) মাশহাদ ৩১, পৃঃ ৬২-৬৩।

৫. (و ثانيها : الوصاة بالتقيد بهذه المذاهب الاربعة لا أخرج منها و التوفيق ما استطعت و جبلتي تأبى التقليد و تأنف منه رأسا) প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৪-৬৫।

৬. শাহ অলিউল্লাহ প্রণীত 'আলতাফুল কুদ্‌স'-এর বরাতে ঐ প্রণীত 'সাত্ব'আত'এর উর্দূ অনুবাদের ভূমিকা, পৃঃ ২২।

৭. (أول وصيت إيں فقير چنك زدن است بكتاب و سنت در اعتقاد و عمل و پیوسته بتدبير هر دو مشغول شدن و هر روز حصه أز هر دو خواندن و اگر طاقت خواندن ندارد ترجمه ورقى از هر دو شنيدن و در عقائد مذهبِ قدماءِ أهل سنت إختيار كردن .. و در فروع پیروی علماءِ محدثين كه جامع باشند ميان فقه و حديث كردن و دائما تفريعات فقهيه را بر كتاب و سنت عرض نمودن ، آنچه موافق باشد در خيز قبول آوردن ، وإلا كالائے بد بريش خاوندادن – أمت را هيچ وقت از عرض مُجْتَهَدات بر كتاب و سنت إستغنا حاصل نيست و سخن مُقَشِّفَه فقها كه تقليد عالمى را دست آريز ساخته تتبع سنت را ترك كرده اند نشنيدن و بديشان التفات نكردن و قربت خدا جستن بدورى ايشان) অর্থঃ এই ফক্বীরের প্রথম অছিয়াত এই যে, উম্মতকে আক্বীদা ও আমলে কিতাব ও সুন্নাতের সাথে যুক্ত থাকতে হবে। এ দু'টি বিষয়ে গবেষনায় মশগুল থাকতে হবে। প্রতিদিন এ দু'টি হ'তে কিছু অংশ পাঠ করতে হবে। যদি পড়ার ক্ষমতা না থাকে, তাহ'লে এ দু'টি হ'তে কিছু অংশ শ্রবন করতে হবে। আক্বীদার বিষয়ে আহলে সুন্নাতের প্রথম যুগের প্রাচীন বিদ্বানদের পথ এখতিয়ার করতে হবে।... প্রশাখাগত বিষয়ে ফিক্‌হ ও হাদীছের ইল্‌মে পারদর্শী উলামায়ে মুহাদ্দেছীন-এর অনুসরন করতে হবে। ফিক্‌হের প্রশাখাগত বিষয়গুলিকে সর্বদা কিতাব ও সুন্নাতের সম্মুখে পেশ করতে হবে। যা অনুকূলে পাওয়া যাবে, তা গ্রহন করতে হবে। নতুবা পিছনে ছুঁড়ে

মারতে হবে। ইজতিহাদী বিষয়সমূহকে বর্তমান সময়ে কিতাব ও সুন্নাতের সম্মুখে পেশ করা ব্যতীত উম্মতের কোন গত্যন্তর নেই। 'ফক্বীহ' হবার মৌখিক দাবীদার যারা আলিমদের তাক্বলীদ করাকে দস্তাবেয বানিয়ে নিয়েছে, হাদীছে অনুসন্ধান প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেছে, -এদের কথা শুনবেনা, এদের দিকে দৃকপাত করবেনা। এদের হ'তে দূরে থেকেই আল্লাহ্‌র নৈকট্য অনুসন্ধান করবে।' - শাহ অলিউল্লাহ, 'অছিয়াতনামা' (কানপুর ছাপা ১২৭৩/১৮৫৭) ১ম অছিয়াত পৃঃ ১। এতদ্ব্যতীত একই ধরনের বক্তব্য দ্রঃ 'জুহুদ মুখ্‌লিছাহ' পৃঃ ৭৪, 'মুছাফ্‌ফার' ভূমিকা পৃঃ ৪ ও 'আল-জুয্‌উল লতীফ'-এর বরাতে ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি, 'তারীখে আহলেহাদীছ' পৃঃ ৪১৪, ৪১২।

৮. শাহ অলিউল্লাহ রচিত প্রায় সকল কিতাবেই এই সুর ধ্বনিত হয়েছে। তবে বিশেষ করে তাঁর বহুবিশ্রুত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-তে 'আহলুল হাদীছ ও আহলুল রায়-এর পার্থক্য' শীর্ষক অধ্যায়; ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদি ওয়াত্ তাকলীদ, তাফহীমাতে ইলাহিয়াহ, ফুয়ূযুল হারামাইন, আল-ইনছাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ, ইযালাতুল খাফা আন-খিলাফাতিল খুলাফা দ্রষ্টব্য।

৯. ঐ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (কায়রোঃ দারুত্ তুরাছ, ১ম সংস্করণ ১৩৫৫ হিঃ/১৯৩৬ খৃঃ) 'ছালাতের দো'আ ও তরীকা' অধ্যায়, ২য় খণ্ড পৃঃ ৭-১০। যেমন (১) ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে তিনি বলেন, (فان قرأ فليقرأ الفاتحة قرأة لا يشوِّشُ على الإمام ، و هذا أولى الأقوال عندى) (২) সশব্দে 'আমীন' সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, (أقول: الحديث الذى رواه أصحاب السنن ليس بتصريح فى الإسكاتة التى يفعلها الإمام لقرأة المامومين فان الظاهر أنها للتلفظ بآمين عند من يسر بها) (৩) 'রাফ্‌উল ইয়াদায়েন' সম্পর্কে তিনি বলেন, (و الذى يرفع أحب إليّ ممن لا يرفع فانّ أحاديثَ الرفع أكثرُ و أثبتُ) " যে ব্যক্তি ছালাতে 'রাফ্‌উল ইয়াদায়েন' করেন, তিনি আমার নিকটে অধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তির চেয়ে যিনি তা করেন না। কেননা 'রাফ্‌উল ইয়াদায়েন'-এর হাদীছ অধিক ও দৃঢ়তর।"

১০. আপোষহীন মুহাদ্দিছ ফাখের বিন ইয়াহ্‌ইয়া এলাহাবাদী (১১২০-৬৪/১৭০৮-৫১ খৃঃ) একবার দিল্লীর জামে মসজিদে সরবে 'আমীন' বলেন। লোকেরা তাঁকে ধরে শাহ ছাহেবের নিকটে নিয়ে গেলে তিনি তাদেরকে সশব্দে 'আমীন' বলার হাদীছ বলে সরিয়ে দেন। ফাখের তখন শাহ ছাহেবকে বললেন- 'আপনি কেন নিজেকে যাহির করছেন না?' উত্তরে শাহ ছাহেব বলেন, 'যদি আমি এই অবস্থায় না থাকতাম, তাহ'লে কে আপনাকে এদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাত?'- নওশাহরাবী, তারাজিম পৃঃ ৫৩; জুহুদ মুখলিছাহ পৃঃ ৭৫।

১১. ফুয়ূযুল হারামাইন পৃঃ ৮৯।

১২ সাত্ব'আত-এর ভূমিকা, গৃহীতঃ খালীক্ব আহমাদ নিযামী, 'শাহ অলিউল্লাহ কে সিয়াসী মাকতূবাত'। -পৃঃ ৩৪-৩৭; আবদালী অবশ্য বিভিন্ন কারণে মোট নয়বার ভারত অভিযান করেন এবং ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারীতে পানিপথের ৩য় যুদ্ধে তিনি সম্মিলিত মারাঠা

শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করেন। -ডঃ সৈয়দ মাহমূদুল হাসান, ভারতবর্ষের ইতিহাস (ঢাকাঃ জুন ১৯৮৪) পৃঃ ৪১১-১২; 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (কায়রো ছাপা) ২য় খণ্ড পৃঃ ১৭০-৭৬।

১৩. হুজ্জাতুল্লাহ,তাফহীমাত ও ফুয়ূযুল হারামাইন হ'তে গৃহীত।

১৪. যেমন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রচারিত লিফলেট এবং গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে- 'আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবেনা প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবেনা ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।' তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলা হয়েছে- 'নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।' তাদের প্রধান আহবান হ'ল- 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।' তাদের প্রধান শ্লোগান হল- 'মুক্তির একই পথ দা'ওয়াত ও জিহাদ' 'আমাদের রাজনীতি ইমারত ও খিলাফত' 'সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর।'- তাদের প্রচারিত 'পরিচিতি' গঠনতন্ত্র, বিভিন্ন দেওয়াল লিখন ও বিজ্ঞাপন সমূহ হ'তে গৃহীত। -প্রধান কার্যালয়ঃ 'দারুল ইমারত আহলেহাদীছ' নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী এবং রাণীবাজার মাদরাসা মার্কেট (৩য় তলা) পোঃ ঘোড়ামারা, রাজশাহী-৬১০০।

کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی
یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی

আধুনিক যুগঃ ২য় পর্যায় (ক)

دور الجديد: المرحلة الثانية (الف)

জিহাদ আন্দোলন ১ম পর্যায় শহীদায়েন (রহঃ)

حركة الجهاد للشهيدين

(১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) ৫২ বৎসর

পৃথিবীর বুকে এযাবত সৃষ্ট যেকোন সংস্কার প্রচেষ্টা মূলতঃ দু'ভাবেই সম্পাদিত হয়েছে। ১- চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে ২- রাজনৈতিক বিজয় সাধনের মাধ্যমে। প্রথমোক্তটিই সর্বাপেক্ষা মোক্ষম হাতিয়ার এবং স্থায়ী ফলদানকারী। দ্বিতীয়টি ক্ষণস্থায়ী এমনকি স্থায়ী হ'লেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনে ব্যর্থ হয়। উপমহাদেশে অন্যূন সাড়ে ছয় শো বছরের মুসলিম শাসন (১২০৬-১৮৬২ খৃঃ) ও প্রায় দু'শো বছরের (১৭৫৭-১৯৪৭ খৃঃ) ইংরেজ শাসন উক্ত ব্যর্থতার বাস্তব দলীল।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ যে যুগে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন, সেযুগে রাজধানী দিল্লীসহ সারা উপমহাদেশে ইসলামের চরম দুর্দিন ছিল। রাজনৈতিক দিক দিয়ে দিল্লীর মুসলিম সিংহাসন যেমন হিন্দু, মারাঠা ও ইংরেজ শক্তির হুমকির সম্মুখীন ছিল, ধর্মীয় দিক দিয়েও তেমনি মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও জনগণের অধিকাংশ চরম দেউলিয়াত্বের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিল। ব্যাপক নৈতিক ধ্বস নামার ফলে তাদের মধ্যে সর্বত্র হীনমন্যতার রোগ সংক্রমিত হয়ে পড়েছিল। এজন্য এসময় প্রয়োজন ছিল এমন একটা প্রচন্ড ঝাঁকুনির, যা ঘুমন্ত মুসলিম জনগণের ঈমানী চেতনা জীবিত করতে পারে এবং মুসলমানের ধর্মীয়, রাজনৈতিক তথা সার্বিক জীবনে এক সর্বব্যাপী বিপ্লবের সূচনা করতে পারে। এ সময় শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে সেই চেতনা সৃষ্টি করে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি এযাবতকালের অনুসৃত তাক্বলীদী জড়তার বিরুদ্ধে যেমন আমল বিল-হাদীছের তূর্যধ্বনি করেছিলেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তেমনি ইসলামী ঝান্ডাকে সমুন্নত রাখার ব্যাপারে জিহাদের বাস্তব পথনির্দেশ দান করেছিলেন। তাঁর রেখে যাওয়া পথেই পরবর্তীতে সৃষ্টি হয় ব্যাপকভিত্তিক জিহাদ আন্দোলন ও সেই সাথে শুরু হয় ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে আমল বিল-হাদীছ তথা

আহলেহাদীছ আন্দোলনের জোয়ার। পরবর্তীতে সশস্ত্র জিহাদ বন্ধ হয়ে গেলেও আহলেহাদীছ আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের জিহাদ আজও জারি (لا هجرة بعد الفتح و لكن جهاد و نية رواه مسلم عن عائشة ح ١٨٦٤) আছে। যেহেতু জিহাদ আন্দোলন ও আহলেহাদীছ আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেকারণ এক্ষণে আমরা 'জিহাদ আন্দোলন' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২)-এর বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আবদুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৭-১৮২৪) কর্তৃক বৃটিশ-ভারতকে 'দারুল হর্‌ব' বা যুদ্ধ এলাকা ঘোষণার বাস্তব ফলশ্রুতি হিসাবে ভারত উপমহাদেশে শতাধিক বর্ষব্যাপী জিহাদ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অলিউল্লাহ্-পৌত্র স্বনামধন্য আলিম শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ওমর ফারূক (রাঃ)-এর ৩৩তম অধঃস্তন পুরুষ আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল বিন শাহ আবদুল গণী (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) এবং টোংকের নওয়াব আমীর খান পিণ্ডারীর সেনাবাহিনীতে দীর্ঘ সাত বৎসরব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমরকুশলী যোদ্ধা রায়বেরেলীর সাইয়িদ আহমাদ (১২০১-১২৪৬ হিঃ/১৭৮৬-১৮৩১ খৃঃ) এই জিহাদের নেতৃত্ব দান করেন।

সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী আমীর খানের সেনাবাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং তাকে তিনি তাঁর অনুসারী বানাতে সক্ষম হন। কিন্তু তিনি পরে ইংরেজের সংগে আপোষ করায় সাইয়িদ আহমাদ ক্ষুব্ধ হন এবং ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন ভারতের ইল্‌মী রাজধানী দিল্লীর অলিউল্লাহ পরিবারের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করেন। উল্লেখ্য যে, সাইয়িদ আহমাদ মাদরাসা রহীমিয়াতে ইতিপূর্বে দু'বছর লেখাপড়া করেছিলেন। তাছাড়া টোংকের সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন সময়ে মাঝে মধ্যে অনেক চাঁদা আদায় করে তিনি এই মাদরাসায় প্রেরণ করতেন। ফলে তাঁর সম্পর্কে অলিউল্লাহ পরিবারে একটি উচ্চ ধারণা পূর্ব থেকেই বিরাজ করছিল। তিনি দিল্লীতে এলে উস্তাদ মাওলানা শাহ আবদুল আযীযের ইঙ্গিতে মাওলানা আবদুল হাই ও মাওলানা শাহ ইসমাঈল তাঁর হাতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন।[১] এরপর থেকেই শুরু হয় ভবিষ্যত সশস্ত্র

জিহাদের প্রস্তুতিপর্ব।

সাইয়িদ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈল দু'জনেই দিল্লীর মাদ্‌রাসা রহীমিয়ার ছাত্র হওয়ার কারণে শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ আবদুল আযীযের লেখনী ও শিক্ষা দ্বারা উভয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাঁদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রায় সবটুকুই ছিল প্রধানতঃ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্'র লেখনী ও শাহ আবদুল আযীয়ের শিক্ষার ফলশ্রুতি। এ সম্পর্কে জনৈক গবেষক যা বলেছেন তা অনেকটা যুক্তিসংগত। 'সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে এমন কিছুই ছিলনা যা শাহ অলিউল্লাহ এবং শাহ আবদুল আযীয পূর্বেই বলে যাননি। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ আব্দুল আযীয ছিলেন অতীব ধর্মপরায়ন এবং গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী। যাঁরা কলমের লেখনী ও মুখের বাণীর মাধ্যমে ইসলামের খিদমতের পথ বেছে নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে সাইয়িদ আহমাদ ছিলেন বাস্তবক্ষেত্রে একজন কর্মীপুরুষ। লেনিন যেরূপ কার্লমার্কসের রচনা ও বাণীকে বাস্তবরূপ দান করেছিলেন, সাইয়িদ ছাহেবও তেমনি শাহ অলিউল্লাহ এবং শাহ আবদুল আযীযের মতবাদকে বাস্তবে রূপায়িত করে গেছেন।'[২]

দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী মাদরাসা রহীমিয়ার শিক্ষায়তনে ইসলামী ভারতের ভূলুণ্ঠিত ঈমানী নেতৃত্বের ঝাণ্ডাকে পুনরায় উড্ডীন করার কঠিন প্রত্যয় নিয়ে ব্যক্তি তৈরীর প্রচেষ্টা শুরু করেন। একদিকে ক্ষুরধার লেখনী, অন্যদিকে মাদরাসায় বসে ছাত্রদের ঈমানী চেতনায় বিপ্লব সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি ভবিষ্যতের জন্য নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন একদল মর্দে মুজাহিদ যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি করে যান। সেই মুজাহিদ দলের প্রথম কাতারে ছিলেন তাঁর নিজের চারজন শ্রেষ্ঠ সন্তান। অতঃপর তাঁদের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় আল্লামা ইসমাঈল, আল্লামা আবদুল হাই ও সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর মত ভবিষ্যত মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ।

জিহাদ আন্দোলনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা কি ছিল, তা কিছুটা আঁচ করা যায় আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদের গবেষণাসমৃদ্ধ অমূল্য রচনা 'মানছাবে ইমামত' ফারসী গ্রন্থটি পাঠ করলে। ইমামতের তাৎপর্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সিয়াসাত বা রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শাহ ছাহেব স্পষ্টভাবে বলেন যে, "সিয়াসাতের তাৎপর্য হ'ল ইমামত

ও হুকুমতের মাধ্যমে আল্লাহ্র বান্দাদিগের এমন আইনের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করা, যে আইন তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের জন্য কল্যাণপ্রদ। এখানে মৌলিক নীতি হবে ব্যক্তি বা ব্যাষ্টিস্বার্থে জনগণের শোষণের পরিবর্তে নিঃস্বার্থভাবে তাদের কল্যাণ সাধন।'[৩]

অতঃপর তিনি রাজনীতিকে সিয়াসাতে ঈমানী ও সিয়াসাতে সুলতানী দু'ভাগে ভাগ করে ব্যক্তিশাসনের পরিবর্তে ঈমানী শাসনের রূপরেখা তুলে ধরেছেন। সেই হারিয়ে যাওয়া ঈমানী শাসন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই ভবিষ্যত ঈমানী রাষ্ট্রের রূপকার আল্লামা শাহ ইসমাঈল সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর হাতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। আম্ব, পাঞ্জতার ও পেশোয়ারে তারই সূচনা করেছিলেন তাঁরা নিজেদের হাতেই। তাঁদের এই শুভসূচনা ভবিষ্যতের স্বাধীন ইসলামী আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রথম সূতিকাগৃহ বৈ কিছুই ছিলনা।

জীবনীকার আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী শাহ ইসমাঈল সম্পর্কে বলেন যে, 'তিনি ছিলেন শাহ অলিউল্লাহ্র খান্দানের পবিত্র বৃক্ষের (شجرہ طوبٰی) একটি শাখা, শাহ ছাহেবের খ্যাতিমান পৌত্র, শাহ আবদুল গণীর পরকালীন নাজাত ও মাগফিরাতের অসীলা-সন্তান, শাহ আবদুল আযীয, শাহ আবদুল কাদের ও শাহ রফীউদ্দীনের প্রিয়তম ভাতীজা ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী শাগরিদ। শুধু তাই নয়, তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি যে কওম ও যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন সে কওম ও সে দেশের জন্য গর্বের বস্তু হিসাবে গণ্য হন। তিনি ইসলামের সেই সব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন, প্রতিভাবান, দুঃসাহসী ও অসাধারণ প্রতিভাবানদের অন্তর্ভুক্ত- শত শত বৎসরেও যাঁদের দু'একজন কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করে থাকেন।'[৪]

আল্লামা ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮ খৃঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'ভারতবর্ষ এযাবৎ মাত্র একজন মৌলভীর জন্ম দিয়েছে, তিনি হলেন মৌলভী মুহাম্মাদ ইসমাঈল।'[৫]

প্রসংগতঃ বলা যায় যে, তিনি কেবল শিখ ও ইংরেজ বিতাড়নের যুদ্ধেই অবদান রাখেননি। বরং ইসলামের নামে মুসলিম সমাজে পুঞ্জীভূত কুসংস্কার সমূহের বিরুদ্ধেও ঘোষণা করেছিলেন আপোষহীন জিহাদ। আর সেজন্য তিনি

সমসাময়িক ওলামা ও রেওয়াজপন্থী মুসলমানদের নিকট দারুনভাবে ধিকৃত হন। এমনকি কুফরী ফৎওয়ারও সম্মুখীন হন। কিন্তু তাঁর এই আপোষহীন জিহাদী আন্দোলন পরোক্ষভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে উদ্দীপিত করে তোলে। যে আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর রেখে যাওয়া মিশন আজও ভারতবর্ষে কমবেশী চালু আছে।

শাহ ইসমাঈল (রহঃ) ও জিহাদ আন্দোলন

পাঞ্জাবে মুসলমানদের উপরে শিখদের অবিরত লোমহর্ষক নির্যাতনের খবর শুনে ও দীর্ঘ দু'বছর যাবত পাঞ্জাবের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বাস্তব অভিজ্ঞতা হাছিলের পর দিল্লী ফিরে এসে শাহ ইসমাঈল গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।[৬] অবশেষে সশস্ত্র প্রতিরোধই এর একমাত্র পথ হিসাবে তিনি সাব্যস্ত করেন ও সেমতে মানসিক প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ইতিমধ্যে দেশ হ'তে ইংরেজ শাসন উৎখাতের উদ্দেশ্য নিয়ে সুদক্ষ সৈনিক সাইয়িদ আহমদ ব্রেলভীর (১২০১-১২৪৬/১৭৮৬-১৮৩১) দ্বিতীয়বার (১২৩১/১৮১৬ খৃঃ) দিল্লী আগমনের খবর শুনে তিনি যেন পথ খুঁজে পেলেন এবং বুযর্গ উস্তাদ ও চাচা শাহ আবদুল আযীযের ইশারায় তিনি ও মাওলানা আবদুল হাই (মৃঃ ১২৪৩/১৮২৮ খৃঃ) সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর হাতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁদের বায়'আতের সাথে সাথে অলিউল্লাহ-পরিবারের সকলে 'আমীরে জিহাদ' হিসাবে তাঁর হাতে বায়'আত নেন। শুরু হ'ল জিহাদের পরিকল্পনা ও ব্যাপক প্রস্তুতি। সৈয়দ আহমদ যুদ্ধের ময়দানের 'আমীর' হ'লেও আল্লামা ইসমাঈল ছিলেন প্রধান সেনাপতি ও সকল বিষয়ের মূল পরিকল্পক। তিনিই ছিলেন জিহাদের প্রাণপুরুষ। তাঁদের পরিচালিত 'দাওয়াত ও জিহাদ'-কে আমরা অভিন্ন লক্ষ্যে নিয়োজিত চারটি স্তরে ভাগ করতে পারি।[৭] যেমন- ১- সৈয়দ আহমদের হাতে 'বায়'আতে ইমারত' এবং পাঁচ বছর যাবত ব্যাপক দা'ওয়াত ও তাবলীগ (১২৩১-৩৬/১৮১৬-২১ খৃঃ) ২- হজ্জের সফরঃ সৌরবর্ষ হিসাবে ২ বছর ১০ মাস আটাশ দিন (১২৩৬-৩৯/১৮২১-২৪ খৃঃ) ৩- জিহাদের সক্রিয় প্রস্তুতি ও দেশব্যাপী সফর প্রায় দু'বছর (১২৩৯-৪১/১৮২৪-২৬) ৪- হিজরত, জিহাদ ও শাহাদতঃ ১২৪১ হিজরীর ৭ই জমাদিউছ ছানী মোতাবেক ১৮২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী সোমবার হ'তে ১২৪৬ হিজরীর ২৪শে যুলকা'দা মোতাবেক ১৮৩১ সালের ৬ই মে শুক্রবার পূর্বাহ্ন পর্যন্ত

মোট পাঁচ বছর তিন মাস উনিশ দিন। চারটি স্তরে সর্বমোট প্রায় ১৫ বছর।

১ম স্তরঃ বায়'আতে ইমারত-দা'ওয়াত ও তাবলীগ

(১২৩১-৩৬/১৮১৬-২১ খৃঃ)

১২৩১ হিজরীতে দিল্লীতে সৈয়দ আহমদের হাতে 'বায়'আতে ইমারত' শেষে "হুজ্জাতুল ইসলাম" আল্লামা ইসমাঈল ও "শায়খুল ইসলাম" আল্লামা আবদুল হাই সহ[৮] কমবেশী বিশজন সেরা আলিম ও বন্ধুবান্ধবসহ আমীর সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী মুহাররম ১২৩৪/নভেম্বর ১৮১৮ সালে দিল্লী হ'তে সারা ভারতবর্ষে ব্যাপক তাবলীগী সফরে বের হন।[৯] ইতিপূর্বে তাঁরা দিল্লী ও আশপাশে তাবলীগ করেন। অলৌকিক বক্তৃতা প্রতিভার অধিকারী আল্লামা ইসমাঈলের নছীহত ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে লোকেরা বিভিন্ন কুসংস্কার হ'তে তওবা করে এবং দলে দলে সৈয়দ আহমদের নিকটে বায়'আত করতে থাকে। সর্বত্র তাঁরা শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাথে সাথে সকলকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। এইভাবে প্রায় পাঁচ বৎসর যাবত ব্যাপক দা'ওয়াত ও তাবলীগের ফলে একদিকে যেমন বায়'আত কারীর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমনি শিখ ও ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে আগামীদিনের সর্বভারতীয় মুজাহিদ নেতা হিসাবে তাঁদের ভাবমূর্তি সর্বসাধারণের হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে যায়।

২য় স্তরঃ হজ্জের সফর

(১.১০.১২৩৬ হিঃ - ২৯.৮.১২৩৯ হিঃ / ২.৬.১৮২১ খৃঃ - ৩০.৪.১৮২৪ খৃঃ)

জলপথে পর্তুগীজদের ভয়ে ভারতের একদল আলিম 'এখন হজ্জের ফরযিয়াত মুলতবী হয়ে গেছে' এই মর্মে ফৎওয়া জারি করলে[১০] তার প্রতিবাদে প্রথমে আল্লামা ইসমাঈল একটি ফৎওয়া লিখে বিলি করেন। অতঃপর হিম্মতহারা মুসলমানদের হিম্মত ফিরিয়ে আনার জন্য ধনী-নির্ধন সকল মুসলমানকে তাঁদের সাথে হজ্জে যাওয়ার জন্য আমীরের নির্দেশক্রমে ব্যাপক ঘোষণা জারি করলেন। অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য যে, একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় পাঁচটি জাহাযে চারশত নরনারী নিয়ে ১লা শাওয়াল ১২৩৬ হিজরী মোতাবেক ১৮২১ সালের ২রা জুন তারিখে ঈদুল ফিৎরের ছালাত শেষে তাঁরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রায়বেরেলী ত্যাগ করেন। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীল শাহ ইউসুফ ফল্‌তীর নিকটে

মাত্র সাত টাকা অবশিষ্ট ছিল। সেটাও মিসকীনদের মধ্যে দান করে দিয়ে রওয়ানার সময় রিক্তহস্ত আমীর সৈয়দ আহমদ আল্লাহ্র নিকটে সফরের সফলতার জন্য করুণকণ্ঠে দো'আ করেন। সাথীদের নির্দেশ দিলেন যেন কারু কাছে কিছু না চায় এবং কোন অবস্থায় তাক্ওয়া পরিত্যাগ না করে। এ যেন ছিল জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার সময় তালূত কর্তৃক সৈন্যদের পিপাসা পরীক্ষার ন্যায়। কলিকাতায় নভেম্বর ১৮২১ হ'তে প্রায় তিন মাস অবস্থানের পর মোট দশটি জাহাযে ৭৫৩ জন হাজী নিয়ে কাফেলা জেদ্দার পথে রওয়ানা হয়ে যায়। এখানেই সর্বাপেক্ষা বেশী লোক বায়'আত করেছিল। ধনী ব্যবসায়ী মুনশী আমীনুদ্দীন, মৌলবী ইমামুদ্দীন বাংগালী প্রমুখ বায়'আত করার সাথে সাথে উদারহস্তে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। ৭/৮ মাস হারামাইনে কাটিয়ে ২ বছর ১০ মাস ২৮ দিন পর ২৯শে শা'বান ১২৩৯ মোতাবেক ১৮২৪ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে রামাযানুল মুবারকের পূর্বদিন এই বিরাট কাফেলা রায়বেরেলী ফিরে আসে ও বিদায়ী ভোজপর্ব শেষে তখনও দশহাযার টাকা উদ্বৃত্ত থাকে- যা বায়তুল মালে জমা করা হয়।[১১] আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুলের এই অনন্য দৃষ্টান্ত ভবিষ্যত মুজাহিদগণের জন্য প্রেরণা হয়ে থাকবে।

৩য় স্তরঃ হিজরত, জিহাদ ও শাহাদাত

৭.৬.১২৪১ - ২৪.১১.১২৪৬ হিঃ / ১৭.১.১৮২৬ - ৬.৫.১৮৩১ খৃঃ

(.......... ১২৩৩ বাং সোমবার হ'তে ২৭শে বৈশাখ ১২৩৮ বাং শুক্রবার পূর্বাহ্ন পর্যন্ত সৌরবর্ষ হিসাবে পাঁচ-বছর তিন মাস ঊনিশ দিন।)

হারামাইন শরীফাইন হ'তে প্রত্যাবর্তনের পর সর্বত্র জিহাদের দা'ওয়াতের কাজ শুরু হয়ে যায়। রায়বেরেলী হ'তে আমীর সৈয়দ আহমদ নিজে এবং ভারতের অন্যত্র আল্লামা ইসমাইল ও আল্লামা আবদুল হাইয়ের ব্যাপক তাবলীগী সফর চলতে থাকে। কুরআন ও হাদীছভিত্তিক জীবনগঠন, সমাজসংগঠন, মুসলমানদের উপরে অমুসলিম শাসকদের ব্যাপক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্যাতনের বিরুদ্ধে জিহাদী জায্বা পুনরুদ্ধার ইত্যাদিই ছিল তাঁদের বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু। শাহ ইসমাঈল তাঁর সকল বক্তব্যে একথা পরিষ্কার করে তুলে ধরেন যে, মুসলমানদের সামনে এখন তিনটি পথ খোলা রয়েছে। ১- তাকে 'হক' ছেড়ে বাতিলকে

আঁক্‌ড়ে ধরতে হবে ২- হক-এর উপরে দৃঢ় থাকার কারণে বাতিলপন্থীদের হামলায় ধৈর্য ধারণ করতে হবে ৩- অথবা বাতিলকে সাহসের সঙ্গে মুকাবিলা করে হক-এর সার্বিক বিজয়লাভের পথ সুগম করতে হবে। তিনি জাতিকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন যে, প্রথমটি কোন বাঁচার রাস্তা নয় বরং ওটাই প্রকৃতপ্রস্তাবে মরণের রাস্তা। দ্বিতীয়টির পরিণতি বেশীর বেশী এটাই হবে যে, তিলে তিলে মরতে হবে। কেবলমাত্র তৃতীয় পথটিই এখন আমাদের জন্য খোলা রয়েছে। আর সেটা হ'ল সরাসরি সম্মুখ মোকাবিলা বা জিহাদ। জিহাদ ত্যাগ করার কারণেই আজ মুসলমান সর্বত্র মার খাচ্ছে। দশ হাযার মাইল দূর থেকে নৌকা চালিয়ে বণিকের বেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক এদেশে এসে যুগ যুগ ধরে বসবাসকারী মুসলিম শক্তিকে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী বিশাল ভারতীয় ভূখণ্ডের শাসন ক্ষমতা হতে উৎখাত করল। অথচ মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থে-বিত্তে, অভিজ্ঞতায় ও অস্ত্রশক্তিতে সেরা হওয়া সত্ত্বেও নির্বিবাদে মার খেয়ে যাচ্ছে। কেউ আপোষ করছে, কেউ এটাকে কপালের লিখন ধরে নিয়েছে, কেউ আপোষ করতে না পেরে ধুকে ধুকে মরছে। আর মুষ্টিমেয় কিছু লোক আত্মমর্যাদায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের পরিকল্পনা করছে। তিনি সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে জানমাল দিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য সকল ভারতীয় মুসলমানের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।[১২] দেশব্যাপী এই প্রচারণার ফলে একদিকে যেমন মুসলমানরা জিহাদে উদ্বুদ্ধ হ'তে থাকেন, অন্যদিকে শাহ ইসমাঈলের আপোষহীন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং কুরআন ও হাদীছের প্রতি দা'ওয়াতের ফলে সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলন জোরদার হ'তে থাকে।

এইভাবে দীর্ঘ এক বৎসর দশ মাস যাবৎ সর্বত্র দা'ওয়াতী সফর শেষে জিহাদে গমনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জিহাদের স্থান হিসাবে সীমান্ত এলাকাকে নির্বাচন করা হয়।

কারণ (১) সারা হিন্দুস্থানে কোথাও এমন স্বাধীন ও নিরাপদ স্থান ছিলনা, যাকে জিহাদের কেন্দ্র বানানো যেতে পারে (২) সীমান্তের স্বাধীন মুসলিম স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যগুলির প্রতিনিধিরা বলেছিলেন যে, আমাদের ওখানকার লোকেরা শিখদের যুলমে অতিষ্ঠ হ'য়ে আছে। অতএব সেখান থেকে জিহাদ শুরু করলে লাখ লাখ লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে জিহাদে যোগ দিবে। তাছাড়া আমাদের জাতি জন্মযোদ্ধা।

তাদেরকে বিশেষ ট্রেনিং না দিলেও চলবে (৩) সর্বোপরি পাহাড়-জংগলের এলাকা হওয়ার কারণে যে কোন সুশিক্ষিত নিয়মিত বাহিনীকে মোকাবিলা করা কেবল সেখানেই সম্ভব (৪) সীমান্ত এলাকা ব্যতীত হিন্দুস্থানের অন্যত্র মুসলিম নওয়াবেরা সকলে ইংরেজ আশ্রিত ছিলেন (৫) সীমান্ত প্রদেশ ও তৎসন্নিহিত এলাকাসমূহে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা যথেষ্ট ছিল। সেখানকার স্বাধীন খান ও পাঠান সরদারদের লালিত বহু সুশিক্ষিত বাহিনী ছিল। অমুসলিম শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের সমর্থন পাওয়া গেলে জিহাদে জয়লাভ একরূপ নিশ্চিত বলা যায়। সবদিক বিবেচনা করে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন এলাকার পক্ষ হ'তে দাবী থাকা সত্ত্বেও সৈয়দ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈল অবশেষে সীমান্ত এলাকাকেই জিহাদ শুরুর কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[১৩]

অগ্রগামী বাহিনী, দক্ষিণ বাহু, বামবাহু, রসদবাহী দল ও মূলবাহিনী সহ পাঁচটি বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক আমীরের দায়িত্বে সোপর্দ করে ১২৪১ হিজরীর ৭ই জমাদিউছ ছানী মোতাবেক ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী সোমবার সৈয়দ আহমদের জন্মস্থান অযোধ্যার রায়বেরেলীর 'তাকিয়া' গ্রাম হ'তে জিহাদী কাফেলা আল্লাহ্‌র নামে রওয়ানা হয়ে যায়। মুজাহেদীনের প্রাথমিক সংখ্যা পাঁচ-ছয়শত ছিল।[১৪] তবে রাস্তায় চলার পথে বহু লোক তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন একথা প্রায় সকল জীবনীকার বলেছেন।

জিহাদে গমনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে চারদিক হ'তে ত্যাগ ও কুরবানীর বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। দলে দলে লোক মুজাহেদীনকে বিদায় জানাতে আসেন। অশ্রুসজল নেত্রে সকলেই কিছু না কিছু 'হাদিয়া' দিয়ে জিহাদে শরীক হওয়ার ছওয়াব লাভের চেষ্টা করেন। দশমাসের দীর্ঘ সফরে প্রায় তিন হাযার মাইল পথ পরিক্রমায় শ্রান্ত-ক্লান্ত মুজাহেদীনের ভাগ্যে এক মুহূর্ত বিশ্রামের অবকাশ হ'লনা। পথিমধ্যে সিন্ধু, হায়দরাবাদ, বেলুচিস্তান, কান্দাহার, গযনী, কাবুল সকল এলাকার শাসক ও আমীরদের নিকট জিহাদে অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হওয়ায় সৈয়দ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈলের পূর্বের ধারণা বানচাল হয়ে গিয়েছিল। তবুও তাঁরা ভাবতে পারেননি যে, এরা মুসলমান হ'য়ে এদেরই শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুজাহিদদের বিরোধিতায় যোগদান করবে। সরলপ্রাণ বীরহৃদয় শাহ ইসমাঈল অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হ'লেও এত সংকীর্ণ চিন্তায় তিনি বা

তাঁর সাথীরা কখনোই অভ্যস্ত ছিলেন না। সীমান্তের শী'আ ও পাঠান সর্দাররা যে কত ধূর্ত ও মুনাফিক চরিত্রের হ'তে পারে তা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের নিকট প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে। আমীর সৈয়দ আহমাদ নির্দেশ দিলেন 'কেউ যেন পোষাক পরিবর্তন না করে। যে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় যেন জিহাদের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে যায়।' মাত্র সাত মাইল দূরে আকূড়াতে অত্যাচারী শিখ রাজা রনজিৎ-এর সেনাপতি বুধ সিং ৮টি কামানসহ দশ হাযার সৈন্য নিয়ে শিবির গেড়েছে দেড় হাযার দীনহীন মুজাহিদের মুকাবিলা করার জন্য।[১৫] পেশোয়ারের নওশেরা এলাকাই ছিল শিখ নির্যাতনের মূল উৎসস্থল।[১৬] শুরু হ'ল সোয়া পাঁচ বছর ব্যাপী জিহাদ ও শাহাদতের রক্ত রঞ্জিত জান্নাতী ইতিহাস।[১৭]

দুর্ভাগ্য এই যে, অধিকাংশ স্থানেই স্থানীয় মুসলিম সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকতা গাযীদের বেশী ক্ষতি করেছিল। তাদের মধ্যে 'ইসলামিয়াত'-এর চাইতে 'আফগানিয়াত' এবং বংশীয় ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বেশী ক্রিয়াশীল ছিল। ফলে সৈয়দ আহমদের জিহাদের তাৎপর্য বুঝতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। যুদ্ধগুলির মধ্যে কেবল ১ম ও ২য় যুদ্ধটি সরাসরি শিখদের সাথে হয়। বাকী প্রায় সবগুলি যুদ্ধ বিশ্বাসঘাতক স্থানীয় মুসলিম সর্দারদের সাথে সরাসরি অথবা ইংরেজ-শিখ-মুসলিম মিলিত শক্তি কিংবা শিখ-মুসলিম যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

জিহাদ আন্দোলন ও আহলেহাদীছ আন্দোলন

দীর্ঘ সোয়া পাঁচ বৎসর ব্যাপী হিজরত ও জিহাদের সূচনা হ'তে শেষ পর্যন্ত যে মহান ব্যক্তিটি জিহাদ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসাবে বিবেচিত ছিলেন, তিনি হলেন দিল্লীর অলিউল্লাহ - পরিবারের আপোষহীন ব্যক্তিত্ব, 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্'র বাস্তব রূপকার, আহলেহাদীছ আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহ্‌সালার আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল (রহঃ)। বিশ্ববিশ্রুত দাদা, যোগ্যতম পিতা ও পিতৃব্যদের ইল্‌মের যথার্থ উত্তরাধিকারী আল্লামা ইসমাঈলের ব্যক্তিগত দা'ওয়াত ও তাবলীগের প্রভাব যেমন দিল্লীসহ সারা দেশের উপরে ছিল,জিহাদের ময়দানে তেমনি তা মুজাহিদ বাহিনীকে এবং তাদের যাত্রাপথে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর ও তাঁর সাথীদের নিরন্তর দা'ওয়াত ও তাবলীগে প্রচলিত অন্ধ তাক্বলীদের গোঁড়ামি ক্রমে দূর হ'তে শুরু করে এবং

লোক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'তে সরাসরি আলো গ্রহণ ও তদনুযায়ী জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়। তাই দেখা যায়, হজ্জের সফরে এবং হিজরত ও জিহাদের সফরে যেসব এলাকা দিয়ে তাঁরা গমন করেছিলেন, সেসব এলাকায় আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যা আজও উল্লেখযোগ্য হারে বর্তমান রয়েছে।

শাহ ইসমাঈল ও পাটনার ছাদেকপুরী পরিবারের ন্যায় অন্যান্য আহলেহাদীছ গাযীগণ জিহাদ আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করলেও হানাফী মতাবলম্বী গাযীগণও জিহাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেখানে কোনরূপ বাড়াবাড়ি ছিল না। পারস্পরিক ভালবাসা ও হৃদ্যতা নিয়ে সকলে মিলে মুসলমানের সাধারণ শত্রু শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। আমীরুল মুজাহেদীন সাইয়িদ আহমাদ (রহঃ) ব্যহ্যতঃ হানাফী মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সমষ্টি 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর মধ্যে স্বীয় মতামত অত্যন্ত ঋজুভাবে সকলের নিকট তুলে ধরে তিনি বলেন- 'সাধারণভাবে যে চার মাযহাবের অনুসরণ করা হ'য়ে থাকে, তা সঠিক। কিন্তু নবী (ছাঃ)-এর ইল্মকে কোন নির্দিষ্ট একজন মুজতাহিদ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ধারণা করা ঠিক নয়। এই জন্য যে, ইল্মে নববী সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। প্রত্যেক মুজতাহিদ তাঁর সমসাময়িক যুগের প্রয়োজন মোতাবেক তা হ'তে হিস্যা নিয়েছিলেন। অতঃপর যখন হাদীছের কিতাবসমূহ সংকলিত হ'ল, তখন ইল্মে নববী সব একত্রিত হ'য়ে গেল। এক্ষণে যদি কোন মাসআলায় বিশুদ্ধ, স্পষ্ট এবং গায়র মানসূখ বা হুকুম রহিত নয় এমন হাদীছ পাওয়া যায়, তবে সেক্ষেত্রে কোন মুজতাহিদের অনুসরণ করা চলবেনা। মুহাদ্দিছগণকে এব্যাপারে অনুসরণীয় গণ্য করতে হবে। তাদের প্রতি মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন অত্যন্ত যরূরী। তাঁরা পয়গম্বর (ছাঃ)-এর ইল্মের বাহক। সে হিসাবে এক দিক দিয়ে তাঁরা রাসূলের (ছাঃ) ছাহাবা হবার কারণে রাসূলের পাক দরবারে মকবূল উম্মত হওয়ার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন।'[১৮]

সৈয়দ আহমদের উপরোক্ত বক্তব্য আহ্লেহাদীছ আন্দোলনেরই যথার্থ প্রতিধ্বনি। উপমহাদেশের খ্যাতনামা হানাফী মনীষী, ইতিহাসবিদ ও জীবনীকার মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (জন্মঃ ১৯১৪ খৃঃ) একারণেই শহীদায়েন (সৈয়দ আহমদ শহীদ ও ইসমাঈল শহীদ)-কে একত্রিতভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন- 'খালেছ

তাওহীদী আকীদা, ইত্তেবায়ে সুন্নাত, জিহাদী জায্‌বা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীত হওয়া- এই চারটি বুনিয়াদের উপর হিন্দুস্থানে আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অন্যান্য দলগুলির কারো কাছে তাওহীদ আছে তো ইত্তেবায়ে সুন্নাতে অলসতা আছে, ইত্তেবায়ে সুন্নাতের জায্‌বা আছে তো জিহাদী জোশ নেই। কারু কাছে যিক্‌র ও ফিক্‌র আছে তো ইত্তেবায়ে সুন্নাত নেই। ফলকথা বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন ওগুলির কোন না কোন একটি নিয়ে উত্থিত হয়েছে। কিন্তু জামা'আতে আহলেহাদীছ-এর মধ্যে উপরোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য একত্রিত হ'য়ে শহীদায়েনের ছূরতে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরবর্তীতে ছাদেকপুরী (আহলেহাদীছ) জামা'আত উক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে প্রদর্শন করেছে। তাদের খুলূছিয়াত ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে গভীর সম্পর্ক সকল সন্দেহের উর্ধে। বাস্তব কথা এই যে, উক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাহার ব্যতীত বড় কোন অবদান রাখা সম্ভব নয়।'[১৯]

মাওলানা সুলায়মান নাদ্‌ভী (১৩০২-১৩৭২/১৮৮৪-১৯৫৩ খৃঃ) আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন- 'আহ্‌লেহাদীছ-এর নামে দেশে যে আন্দোলন চলছে বাস্তবে তা নতুন কোন বিষয় নয় বরং পুরানো পদচিহ্নের অনুসরণ মাত্র। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) যে আন্দোলন নিয়ে উত্থান করেছিলেন, তা ফিক্‌হের কয়েকটি মাসআলা মাত্র ছিল না বরং ইমামতে কুব্‌রা, খালেছ তাওহীদ এবং ইত্তেবায়ে নববীর বুনিয়াদী শিক্ষার উপরে ভিত্তিশীল ছিল। ..... এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি তা হ'ল ইত্তেবায়ে নববীর যে জায্‌বা হারিয়ে গিয়েছিল, তা বছরের পর বছরের জন্য পুনরায় সৃষ্টি হয়েছে। জিহাদের যে আগুণ ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় জ্বলে উঠেছে। এমনকি এমন একটা সময় গিয়েছে যখন 'ওয়াহ্‌হাবী ও বিদ্রোহী' প্রতিশব্দ হিসাবে বলা হ'ত। কতজনের মাথা কাটা হয়েছে, কতজনকে শূলে চড়ানো হয়েছে, কতজনকে দ্বীপান্তর দেওয়া হয়েছে, কতজনকে কয়েদখানার অন্ধ কুঠরীতে দম বন্ধ করে মারা হয়েছে,তার ইয়ত্তা কোথায়?"[২০]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করে বলেন- 'হিন্দুস্থানে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ হ'তে ওয়াহ্‌হাবীদেরকে একটি ভয়ংকর রাজনৈতিক দল হিসাবে গণ্য করা হ'ত। তার অন্যতম কারণ ছিল এই

যে, এই জামা'আতটিকে মাওলানা ইসমাঈল শহীদ প্রতিষ্ঠিত জামা'আত মনে করা হ'ত- যিনি জিহাদের উপরে এই আন্দোলনের বুনিয়াদ রচনা করেছিলেন এবং শিখদের বিরুদ্ধে বাস্তবে জিহাদ করেছিলেন। মাওলানা শহীদের পরে মাওলানা ছাদেকপুরীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয় এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। .... এইসব কারণে কাউকে 'ওয়াহ্‌হাবী' সন্দেহ করলেই বৃটিশ সরকার তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেফতার করত এবং মিথ্যা মামলা, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, যাবজ্জীবন কারাদন্ড, সম্পত্তি বাযেয়াফ্‌ত প্রভৃতি শাস্তি তাদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছিল। এই জামা'আতের শত শত আলিম ও ধনী ব্যবসায়ীকে কালাপানিতে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। .... প্রসিদ্ধ ওয়াহ্‌হাবী মামলা সমূহ ও ছাদেকপুরী পরিবারের মর্মান্তিক পরিণতি সমূহ এই জামা'আতেরই একক কৃতিত্ব।[২১]

ডঃ কিউ আহমদ বলেন, 'একটি ক্ষমতাধর বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে অর্ধশতাব্দীকাল অবধি ব্যাপক লড়াইয়ে নেতৃত্বদানের সার্বিক বোঝা বাস্তবিকপক্ষে এই (ছাদিকপুরী) পরিবারের উপরেই ন্যস্ত ছিল। স্বদেশীদের নিকট থেকে সাহায্য কামনা দূরে থাক, অবদানের স্বীকৃতিটুকুও তারা কখনও কামনা করেননি।'[২২]

জীবনীকার মিরযা হায়রাত দেহলভী বলেন, 'মাওলানা শহীদের আন্তরিক কামনা ছিল যে, মুসলমান যাবতীয় মাযহাবী গোঁড়ামী ভুলে নিরপেক্ষভাবে পূর্ণ উদ্দীপনায় কুরআন ও হাদীছের হুকুম অনুযায়ী জীবনযাপন করুক।.... মুসলমান নিজেকে হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী না বলে বরং রাসূলের দিকে সম্বন্ধ করে নিজেকে 'মুহাম্মাদী' বলুক। প্রিয় শহীদের অন্যতম কৃতিত্ব এই যে, তিনি লক্ষ লক্ষ মুমিনের মুখ দিয়ে একথা গর্বের সাথে বলাতে পেরেছিলেন যে, 'আমরা মুহাম্মাদী'।[২৩]

এস. বি. চৌধুরী বলেন, 'সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার ফলে ঢাকা হ'তে পেশোয়ার পর্যন্ত দেশের সকল প্রান্ত থেকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্যাদি প্রাপ্ত হ'য়ে ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলন তার শিকড় মযবুত করে নেয়। একথা মানতেই হবে যে, বৃটিশ সরকার এদেশে যতগুলি আন্দোলন জন্ম দিয়েছে, তন্মধ্যে ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনই সর্বাপেক্ষা কঠোর ও রূঢ় ইংরেজ বিরোধী ছিল। তাদের সকল

চেষ্টা-সাধনায় তারা এর স্বাক্ষর রেখেছে।'[২৪]

উপরের আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ আন্দোলনে প্রথম নেতৃত্ব ছিল শহীদায়েনের হাতে এবং পরবর্তী নেতৃত্ব ছিল পাটনার ছাদিকপুরী আহলেহাদীছ পরিবারের হাতে।

আল্লামা শাহ ইসমাঈল ও মাওলানা বেলায়েত আলীকে 'হানাফী' হিসাবে কেউ কেউ আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন।[২৫] কিন্তু আল্লামা ইসমাঈল-এর আমল ও লেখনীসমূহ এবং মাওলানা বেলায়েত আলীর বিশেষ করে 'আমল বিল-হাদীছ' পুস্তিকাটি পাঠ করলেই তাঁদের আকীদা ও আমল স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। দারুল উলূম দেউবন্দের শিক্ষক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী হানাফী বলেন, 'পাটনার মাওলানা বেলায়েত আলী বালাকোট যুদ্ধে হাযির ছিলেন না। তিনি আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর সেই জামা'আতের একজন স্তম্ভ ছিলেন, যে জামা'আতটি আল্লামা শহীদ (রহঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' পাঠ করার পর তার উপর বাস্তবে আমলকারী হিসাবে বানিয়েছিলেন। এই জামা'আতের লোকেরা ছালাতে রাফ্‌উল ইয়াদায়েন ও সরবে 'আমীন' বলতেন।"[২৬] মাওলানা সিন্ধীর উপরোক্ত বক্তব্যে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লামা শহীদ ও মাওলানা বেলায়েত আলী ছাদিকপুরী সেই জামা'আতের অনুসারী ছিলেন, যাঁরা সশব্দে আমীন ও রাফ্‌উল ইয়াদায়েনে অভ্যস্ত ছিলেন। স্বয়ং মাওলানা বেলায়েত আলী স্বীয় পুস্তিকা 'রিসালায়ে দা'ওয়াত'-এর মধ্যে নিজের জামা'আতকে 'মুহাম্মাদী' বলে উল্লেখ করেছেন।

মুহাম্মাদী, সালাফী প্রভৃতি লকবগুলি আহলেহাদীছদেরই বিভিন্ন নাম। কোন কোন বিদ্বান সাইয়িদ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈলের আন্দোলনকে শাহ অলিউল্লাহ প্রবর্তিত 'তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া' আন্দোলন বলতে চেয়েছেন[২৭] এবং আহলেহাদীছদেরকে সেই আন্দোলনেরই একটা বিচ্ছিন্ন উপদল হিসাবে গণ্য করেছেন।[২৮] অথচ বাস্তব কথা এই যে, শাহ অলিউল্লাহ বা সাইয়িদ আহমাদ শহীদ প্রচলিত অর্থে পৃথক কোন তরীকার প্রবর্তক ছিলেন না বা আহলেহাদীছ আন্দোলন ও তাঁদের আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসা কোন নতুন আন্দোলন নয়। বরং তাকলীদ-নির্ভর যে ইসলাম ভারতীয় মুসলিম সমাজে চালু ছিল, শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ ইসমাঈলের শিক্ষা ছিল তার বিপরীত। আমল বিল-হাদীছের

প্রতি মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা ও বিদ্বানদের উদ্ভাবিত তরীকার বদলে সরাসরি রাসূলের হাদীছের অনুসরণের আহ্বানই ছিল অলিউল্লাহ, শাহ ইসমাঈল, সাইয়িদ আহমদ ও বেলায়েত আলীর আন্দোলনের মূল সুর। তাঁদের এই দা'ওয়াত ছিল মূলতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনেরই প্রতিধ্বনি। এব্যাপারে নিজের তরীকা সম্পর্কে সাইয়িদ আহমদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'আমার তরীকা হ'ল তাই-ই, যা আমার ঊর্ধতন দাদা সাইয়িদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ (ছাঃ) এখতিয়ার করেছিলেন। একদিন শুক্‌না রুটি পেটভরে খেয়ে নিই ও আল্লাহ্‌র শুক্‌রিয়া আদায় করি। একদিন ভুখা থাকি ও ধৈর্য ধারণ করি।'[২৯]

অন্য একস্থানে সাইয়িদ ছাহেব বলেন "আমরা সকলে রাব্বুল আলামীনের নির্দেশসমূহের পায়রাবী এবং নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাতের পুনর্জীবন দানের উদ্দেশ্যে পরিবার-পরিজন ছেড়ে এসেছি, ভাই-বন্ধু ও দেশ ছেড়ে এখানে হিজরত করেছি।"[৩০]

উপরোক্ত দু'টি বক্তব্যে সাইয়িদ আহমাদের আন্দোলনের মূল বিষয়টি খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ তিনি রাসূলের তরীকাকেই নিজের তরীকা বলে দাবী করেছেন। তাঁর এই দাবী কেবল ক্ষুধা সহ্য করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সকল ব্যাপারেই তিনি এর নমুনা হতে সচেষ্ট ছিলেন। একদা তিনি দিল্লীর বিখ্যাত আলেম ও তাঁর হাতে বায়'আতকারী মাওলানা আবদুল হাইকে বলেন "আমার মধ্যে সুন্নাতবিরোধী কিছু দেখলে আমাকে সাবধান করে দিবেন। তখন মাওলানা তাকে বললেন, আপনার মধ্যে সুন্নাতবিরোধী কিছু দেখ্‌লে আবদুল হাই আপনার সাথে থাকবেই বা কতক্ষণ?"[৩১]

দ্বিতীয়তঃ তিনি সুন্নাতে নববীর পুনর্জীবন দানের জন্য প্রয়াসী ছিলেন এবং যে কোন ত্যাগ ও কুরবাণীর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আর সে কারণেই তিনি প্রচলিত তাকলীদী রেওয়াজকে অস্বীকার করে বলেন "নবুঅতের রাস্তা সন্ধানী ব্যক্তির জন্য প্রথম যে বিষয়টি যরূরী, তা হ'ল বিশ্বাস, কর্ম, নৈতিকতা, কথাবার্তা, ইবাদাত প্রভৃতি সকল বিষয়ে শরীয়তের নিষেধ-সমূহ মেনে চলবে এবং কিতাব ও সুন্নাহ থেকে যাচাই-বাছাই করে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যদি নিজে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলেম হন তাহ'লে ভাল। নইলে মুহাদ্দিছ বিদ্বানদের নিকট থেকে জেনে নিবে।"[৩২]

এখানে তাকলীদের নিয়ম অনুযায়ী হিন্দুস্থানে প্রচলিত হানাফী মাযহাবের তাকলীদ করার জন্য তিনি মুরীদকে নির্দেশ দিচ্ছেন না। বরং আলেম হ'লে তিনি নিজেই কুরআন-হাদীছ যাচাই-বাছাই করবেন। না হ'লে কোন তাকলীদপন্থী বিদ্বানকে জিজ্ঞেস না করে বরং হাদীছপন্থী আলিম বা মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের নিকট থেকে মাসআলা জেনে নেবার নির্দেশ দিচ্ছেন।

এই সকল কারণে যদি তাঁকে কেউ মুকাল্লিদ না বলে 'মুহাম্মাদী' বলেন এবং সাধারণ তরীকাসমূহের বাইরে তাঁর তরীকাকে 'তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া' বলেন, তবে আক্ষরিক অর্থে তা অবশ্যই বলা যাবে। কিন্তু তাঁকে ভারতে প্রচলিত কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্শবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া প্রভৃতি তরীকার ন্যায় নিয়মবদ্ধ কোন বিশেষ একটি তরীকা হিসাবে গণ্য করা চলে না। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, সাইয়িদ আহমাদ নিজে কখনো নিজের সংস্কার আন্দোলনকে 'মুহাম্মাদী' আন্দোলন বলেননি।[৩৩] তবু তাঁর অনুসারী আহলেহাদীছগণ নিজেদেরকে তখন 'মুহাম্মাদী' হিসাবেই পরিচয় দিতেন বা এখনও দিয়ে থাকেন এ অর্থে যে তাঁরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথ ব্যতীত অন্য কারু কোন মত-এর অনুসরণ করেন না।

জনৈক ইংরেজ লেখকের মত অনুযায়ী 'শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর অনুসারীগণ নিজেদেরকে 'মুহাম্মাদী' বলতেন।" তিনি বলেন যে, "মুজাহেদীন জামা'আত দু'টি পরস্পর বিরোধী গ্রুপে বিভক্ত ছিল। একটি গ্রুপের নেতা ছিলেন মাওলানা আবদুল হাই ও মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী, যারা আহলেসুন্নাত-এর তরীকা অনুসরণ করতেন। অন্য গ্রুপটির নেতা ছিলেন মৌলবী ইসমাঈল। যিনি চার ইমামের তাকলীদ হ'তে মুক্ত ছিলেন এবং সরাসরি হাদীছকে দলীলের উৎস গণ্য করতেন। স্বয়ং সৈয়দ আহমাদ আমলের দিক দিয়ে 'হানাফী' হ'লেও মৌলবী ইসমাঈলের উপর নেতৃত্ব করতেন, যিনি নিজেকে 'মুহাম্মাদী' বলতেন।'[৩৪] বাংগালী গবেষক আবদুল মওদূদ তাঁর 'ওহাবী আন্দোলনের রূপরেখা' নামক নিবন্ধে বেলায়েত আলী সম্পর্কে বলেন- '১৮২০ সালে সৈয়দ আহমদের চারজন খাস খলীফার অন্যতম মওলবী বেলায়েত আলী বাংলাদেশে হিজরত করেন এবং জিহাদ আন্দোলনের বিশেষ অনুশাসন ও শিক্ষাগুলি বাংলাদেশে প্রয়োগ করতে জোর দেন। নামাজে সূরা ফাতেহা

পাঠশেষে প্রত্যেকবার উপরদিকে হাত তোলার ও উচ্চকণ্ঠে 'আমীন' বলার বিধি তিনিই বাংলাদেশে প্রবর্তন করেন। তাঁর শিক্ষার সারমর্ম ছিল, কুরআনের পরেই হাদীস মুসলমানদের একমাত্র অনুসরণীয় ব্যবস্থাপত্র।'[৩৫]

ছাদেকপুরী পরিবারের উপরে বিশেষভাবে লিখিত প্রতিপাদ্য গ্রন্থ 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ'-তে লেখক মাওলানা আবদুর রহীম ছাদেকপুরী (১২৫২-১৩৪১/১৮৩৬-১৯২৩) স্বীয় মেজ চাচা ও পরবর্তী আমীরুল মুজাহেদীন মাওলানা এনায়েত আলী, যাকে মাওলানা বেলায়েত আলী বাংলাদেশ অঞ্চলে তাবলীগের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

"তিনি প্রথমবারে একটানা সাত বৎসর এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ ও ধৈর্যের সাথে ভ্রমণ করেছেন। তিনি লাখো মানুষকে অন্ধকার গহবর হতে টেনে এনে হেদায়াতের আলোক-বর্তিকার একনিষ্ঠ প্রেমিক বানিয়েছেন এবং তাদেরকে কুরআন ও হাদীছের অনুসরণের প্রতি আগ্রহী করেছেন। তাঁর মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও তাঁদের উত্তরাধিকারী সন্তান-সন্ততিগণ আজও বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে 'মুহাম্মাদী' নামে পরিচিত।"[৩৬]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮) ১৯১৩ সালে একবার বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন। তিনি পশ্চিম বাংলার দুমকা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি গ্রাম যেমন দিলালপুর, ইসলামপুর, জঙ্গীপুর ও বর্তমান বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলাধীন নারায়ণপুর প্রভৃতি গ্রাম সফর করেন। পাঞ্জাবে ফিরে গিয়ে তিনি স্বীয় 'আখবারে আহলেহাদীছ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর সংক্ষিপ্ত সফর বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। সেখানে একস্থানে তিনি বলেন ...... "আমি এই সফরে কেবলি চিন্তা করেছি বাংলাদেশে আহলেহাদীছের সংখ্যা এত বেশী কিভাবে হ'ল ও কার দ্বারা হ'ল। আমাকে বলা হ'ল যে, এসব মাওলানা এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর বরকতেই হয়েছে।"[৩৭]

বাংলাদেশে 'মুহাম্মাদী' বলতে সর্বদা আহলেহাদীছকেই বুঝানো হয়। যেমন 'আকীদায়ে মোহাম্মাদী বা মযহাবে আহলেহাদীছ' নামে বই প্রকাশ প্রভৃতি।[৩৮]

এক্ষণে মাওলানা বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী যদি হানাফী মাযহাবের অনুসারী হ'তেন, তাহ'লে তাঁদের তাবলীগে লোকেরা কিভাবে হানাফী মাযহাব

ছেড়ে মুহাম্মাদী বা আহলেহাদীছ হ'ল? একই জিহাদ আন্দোলনের শরীক মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর (১২১৫-১২৯০/১৮০০-১৮৭৩) তাবলীগে বাংলাদেশের লোকেরা কেন তাহ'লে হানাফী মাযহাব ছেড়ে আহলেহাদীছ হ'ল না?

প্রকৃত কথা এই যে, বালাকোট-পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসর শিখবিরোধী জিহাদে আমীর সাইয়িদ আহমাদ ও সেনাপতি শাহ ইসমাঈলের সঙ্গে আহলেহাদীছ হানাফী সকল দলের লোক যুক্ত ছিলেন। কিন্তু শাহ ইসমাঈলের বিরোধী আলিমদের প্ররোচনায় অনেকে জিহাদ থেকে সরে পড়েন। মৌলবী মাহবুব আলী দেহলভীর মত আলিম একদল মুজাহিদ নিয়ে দিল্লী থেকে সীমান্তের পাঞ্জতার মুজাহিদ ঘাঁটিতে পৌঁছে জিহাদে অংশগ্রহণ না করেই দলবল নিয়ে হিন্দুস্থানে ফিরে আসেন। শুধু তাই নয় যাতে হিন্দুস্থান থেকে কোন লোকজন ও রসদপত্র সীমান্তে আর যেতে না পারে, তারও ব্যবস্থা করেন। পরে মাওলানা ইসহাক দেহলভী ও মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূবের প্রচেষ্টায় পুনরায় লোক প্রেরণ শুরু হয়। মৌলবী মাহবূব ও তার দলবলের দ্বারা মুজাহিদ বাহিনীর যে ক্ষতি হয়, মৌলবী জাফর থানেশ্বরী ও জীবনীকার মিরযা হায়রাত দেহলভীর ভাষায় ঐ ধরণের মারাত্মক ক্ষতি শিখ ও পাঠান দূররাণী বিশ্বাসঘাতকরাও করেনি।[৩৯]

মৌলবী কারামত আলী জৌনপুরীকে সাইয়িদ আহমাদ জৌনপুর এলাকায় তাবলীগের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।[৪০] পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ অঞ্চলে চলে আসেন ও জিহাদ বিরোধী মত প্রকাশ করতে থাকেন। এক সময় তিনি ইংরেজদের পক্ষে ফৎওয়া দিয়ে বলেন যে, 'এখন জিহাদের প্রয়োজন নেই। বরং ওয়াহ্‌হাবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করা উচিত।' ১৮৭০ সালের ২৩শে নভেম্বর কলিকাতা মোহামেডান ল' সোসাইটিতে বৃটিশ ভারতকে 'দারুল ইসলাম' ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন-'২য় প্রশ্ন হচ্ছে "এদেশে জিহাদ করা আইনসঙ্গত কি-না" প্রশ্নটির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্নেরও সমাধান হ'য়ে গেছে। কারণ দারুল ইসলামে জিহাদ কখনো আইনসংগত হ'তে পারে না। এটা এত স্পষ্ট যে, এর সমর্থনে কোন যুক্তি-প্রমাণ বা প্রামাণ্য দলীল পেশ করার প্রয়োজন করে না। এখন কোন বিভ্রান্ত ব্যক্তি যদি হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বৃটিশ ভারতের শাসক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে সে যুদ্ধকে 'বিদ্রোহ' বলে

অভিহিত করাই সঙ্গত তবে। মুসলমানী আইনে বিদ্রোহকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং একই কারণে অনুরূপ যুদ্ধ বেআইনী হবে। অতএব কেউ যদি অনুরূপ যুদ্ধ শুরু করে, তবে মুসলমান প্রজারা তাদের শাসককে সাহায্য করতে এবং শাসকের সহযোগিতায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য থাকবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ফৎওয়া-ই-আলমগীরীতে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।'[৪১]

উইলিয়াম উইলসন হান্টার (W. W. Hunter) তাঁর বিখ্যাত রিপোর্টে কারামত আলীর উক্ত বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং এটাকে সংখ্যাগুরু সুন্নী মাযহাবের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হিসাবে ব্যক্ত করেছেন। শুধু তাই নয় মাওলানা জৌনপুরীর সমর্থনে প্রচারিত ফৎওয়াসমূহের সারাংশ "কলিকাতা মোহামেডান ল' সোসাইটি অধিবেশনের সারাংশ, ২৩শে নভেম্বর ১৮৭০" -এই শিরোনামে প্রকাশিত পুস্তিকাটি পড়ে দেখার জন্য সকল মুসলমানকে অনুরোধ করেছেন। শেষের দিকে খুশীতে গদগদ হ'য়ে তিনি বলে ফেলেছেন- 'এতে করে এটাও প্রমাণিত হয় যে, আইন ও শাস্ত্রকারদের যেমন রাজানুগত্য প্রদর্শনের কাজে তেমনি রাজদ্রোহের প্রয়োজনেও সমান ব্যবহার করা যায়।' এই সময়ে শী'আ নেতারাও একইভাবে জিহাদবিরোধী ফৎওয়া প্রচার করেন।[৪২]

শুধু হান্টার নন ভারতের ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলন সম্পর্কে অন্যতম বিজ্ঞ ইংরেজ প্রতিবেদক জেম্‌স উকেন্‌লি (James Ookenly) কারামত আলী সম্পর্কে মন্তব্য করেন 'তিনি বৃটিশ সরকারের সাহায্যকারী এবং ওয়াহ্‌হাবীদের কট্টর বিরোধী ছিলেন।' মাসউদ আলম নদভী (১৯১০-৫৪ খৃঃ) বলেন, 'আক্বীদা ও আমলের দিক হ'তে তিনি সাইয়িদ আহমদের প্রধান সহযোগীদের থেকে একেবারেই পৃথক ছিলেন।[৪৩] আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, 'সাইয়িদ ছাহেবের সাধারণ সাথীদের থেকে তাঁর রংয়ে (চালচলনে) কিছুটা পার্থক্য ছিল।'[৪৪]

অতঃপর মাওলানা আবদুল হাই (মৃঃ ১২৪৩/১৮২৮) সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়।[৪৫] তিনি কোন গ্রুপের নেতৃত্ব দেননি। বরং এক হিসাবে বলা চলে তিনি সক্রিয় জিহাদেই অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি। প্রথম জীবনে তিনি মীরাটের ইংরেজ আদালতের মুফতী ছিলেন। পরে সাইয়িদ আহমদের নিকটে

বায়'আত করেন। তিনিই প্রথমে বায়'আত নিয়ে পরে আল্লামা ইসমাঈলকে সৈয়দ আহমাদের নিকটে নিয়ে যান। মাওলানা আবদুল হাই শাহ আবদুল আযীযের জামাতা ছিলেন। তিনি সৈয়দ ছাহেবের সঙ্গে হজ্জের সফরে গিয়ে ইয়ামনে যান এবং খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বান কাযী মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী (১১৭২-১২৫০/১৭৫৮-১৮৩৫)-এর নিকট হতে হাদীছ-এর সনদ লাভ করেন। শাওকানীর 'মউযূ'আত' তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানে নিয়ে আসেন। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে শাহ ইসমাঈলের ন্যায় তিনিও সোচ্চার ছিলেন। হানাফী ফিক্হে খুবই পারদর্শী ছিলেন। হজ্জের সফরে তিনি 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর আরবী অনুবাদ করেন।[৪৬]

তিনি স্বল্পভাষী, লজ্জাশীল ও শান্ত মেযাজের মানুষ ছিলেন। জিহাদের উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদের সঙ্গে রায়বেরেলী হ'তে রওয়ানা দেন। পথিমধ্যে টোংকের ট্রেনিং কেন্দ্রে প্রশিক্ষক হিসাবে তাঁকে পাঁচমাস অবস্থান করতে হয়। এরপর সৈয়দ আহমদের চিঠি পেয়ে তিনি সীমান্তে রওয়ানা হন এবং ১২৪১ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের শেষদিকে মোতাবেক ১৮২৭ সালে মে মাসের শেষদিকে তিনি সীমান্তের পাঞ্জতার ঘাঁটিতে পৌঁছেন। কয়েকমাস ব্যাপী সফরের কষ্ট, রোগজীর্ণ শরীর ও বার্ধক্যভারে অবনমিত দেহ নিয়ে তিনি ঘাঁটিতে পৌঁছলেন বটে, কিন্তু পুরাতন অর্শরোগ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। যার ফলে ৮ই শা'বান ১২৪৩ হিজরী মোতাবেক ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮২৮ দিবাগত রাতে তিনি ঘাঁটিতেই মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা ইসমাঈল ও তাঁর সহযোগীরা তাঁর মরদেহ গোসল করান ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেন।[৪৭]

শায়খুল ইসলাম মাওলানা আব্দুল হাইয়ের উক্ত জীবনী সামনে রাখলে ইংরেজ প্রতিবেদকের রিপোর্ট একটি নিছক কল্পনা বলেই মনে হয়। প্রকৃত অর্থে মুজাহিদগণের মধ্যে গ্রুপিং ও দলাদলি ছিলনা। তাঁরা সকলেই ছিলেন জিহাদ ও শাহাদাতের জন্য পাগল, ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একদল নিঃস্বার্থ মুত্তাকী মুসলমান। তবে একথা সত্য যে, শহীদায়েনের শিক্ষার বদৌলতে মুজাহিদগণের মধ্যে তাক্বলীদের মায়াবন্ধন ছিন্ন হয়েছিল এবং তাঁরা কুরআন ও হাদীছের নির্দেশকে অন্য সবকিছুর উপরে স্থান দিতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। আর একারণেই জিহাদ আন্দোলনের সাথে সাথে সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনও ছড়িয়ে

পড়েছিল।

বালাকোটের পরে জিহাদের নেতৃত্ব পাটনার ছাদিকপুরী পরিবারের উপরে আসে, যাঁরা আহলেহাদীছ ছিলেন। আমীর বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলীর ইন্তেকালের পর তাঁদেরই অনুসারী আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে শতাধিক বর্ষব্যাপী জিহাদ চালু থাকে। মাওলানা আব্দুস সামী' আজও 'আমীরুল মুজাহেদীন' হিসাবে পাটনার 'দারুল ইমারত' সামলে আছেন।[৪৮] পাকিস্তানের পেশোয়ারকে কেন্দ্র করে মুজাহিদনেতা মাওলানা জামীলুর রহমানের নেতৃত্বে আহলেহাদীছ মুজাহিদগণ আজও রাশিয়ান ও আফগান সরকারী ফৌজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে লিপ্ত আছেন।[৪৯] আফগানিস্তানের স্বশাসিত 'নূরিস্তান' এলাকা আহলেহাদীছদের স্বাধীন রাজনৈতিক পরিচয় ঘোষণা করছে।[৫০] মাসঊদ আলম নাদভীর হিসাব মতে কেবল ১৮৩১ হ'তে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত নয়, বরং আজও পর্যন্ত আহলেহাদীছগণ ভারত উপমহাদেশের সকল প্রান্তে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে যেমন আপোষহীন জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, কথা কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বিদ'আতপন্থী ও স্বার্থপর আলিমদের বিরোধিতার সম্মুখীন যেমন ইতিপূর্বে ইসমাঈল শহীদকে হ'তে হয়েছে, তাদেরকেও তেমনি আজও ঐসব আলিমদের ও তাদের সহযোগীদের বিভিন্নমুখী অপতৎপরতার মুকাবিলা করতে হচ্ছে। ইংরেজ আমলের ন্যায় আজও আহলেহাদীছগণকে 'ওয়াহ্‌হাবী' বলে দুর্নাম করা হয়ে থাকে।[৫১]

বালাকোট পরবর্তী জিহাদ আন্দোলন মূলতঃ আহলেহাদীছদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে এবং 'ওয়াহ্‌হাবী' ও 'আহলেহাদীছ' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মাদ হোসায়েন বাটালভী (মৃঃ ১৩৩৮/১৯২০) নিজের প্রচেষ্টায় ওয়াহ্‌হাবী ও আহলেহাদীছ এক নয় সেকথা বৃটিশ সরকারকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর দ্বারা তিনি সাধারণ নিরীহ আহলেহাদীছদেরকে ইংরেজের জেল-যুলম হ'তে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর জন্য সমস্ত আহলেহাদীছকে ইংরেজের অনুগত প্রমাণ করার যে ব্যর্থ চেষ্টা কোন কোন মহল থেকে লক্ষ্য করা গেছে, তা কোনক্রমেই ঠিক নয়। মাওলানা বাটালভী ব্যতীত সমসাময়িক ও পরবর্তীযুগের কোন উল্লেখযোগ্য আহলেহাদীছ আলেম উক্ত ভূমিকা সমর্থন

করেননি। গযনবী, লাক্ষাবী ছাদিকপুরী, রহীমাবাদী বা ক্বাছূরী পরিবারের কোন আলেম বা বাংলাদেশী কোন মুজাহিদ ও নেতা কখনই মাওলানা বাটালভীর উক্ত আপোষমুখী ভূমিকা সমর্থন করেছিলেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আব্দুল মওদূদ বলেন, "কালক্রমে বাঙালী জিহাদীরা আহলেহাদীস, লা-মযহাবী, মওয়াহেদ, মুহম্মদী, গায়ের মুকাল্লিদ প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হয়েছিল। .... শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ লড়তে বাঙালী মুসলমানরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং অগণিত অর্থ ও সৈন্য পাঠিয়ে নিজেদের কর্তব্য পালনে তৎপর হয়েছে। সেকালীন বাংলাদেশের প্রত্যেক শহরে তাদের অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহের ঘাঁটি ছিল এবং কর্তৃপক্ষের নযর এড়িয়ে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে যুদ্ধের এ দু'টি অতি প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহকারীদের মধ্যে মালদহের রফিক মিয়াঁ ও তাঁর পুত্র আমীরুদ্দীনের নাম ইতিহাসের অন্তর্গত হয়েছে।[৫২]

তিনি আরও বলেন 'সমুদ্যত অস্ত্র ও আইনের শৃংখল পর্যাপ্ত না হওয়ায় দেশপ্রসিদ্ধ আলেমদের, এমনটি মক্কা শরীফের চার মাযহাবের প্রধান মুফতীদের ফতোয়া প্রচারেরও দরকার হয়েছিল ভারতীয় বিশেষতঃ বাঙালী মুসলমানদের ধর্মবুদ্ধিকে প্রভাবিত করবার জন্য। বিদেশী ও বিধর্মীদের শাসনাধিকারে চলে গেলেও এদেশটাকে 'দারুল ইসলাম' হিসাবে মেনে নিয়ে এখানে শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে বসবাস করতে ধর্মীয় অনুমোদনও এসব ফতোয়ার দ্বারা লাভ করা হয়েছিল।[৫৩]

তিনি বলেন, 'এ জিহাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এদেশের বিভিন্ন অংশের উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সব শ্রেণীর মুসলমান এবং একে সংগঠন ও পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছিল এযুগের ধিকৃত ধর্মশাস্ত্রবিদ মুসলিম আলেম সমাজ।'[৫৪]

বর্ণিত সেই আলেম সমাজ ছিলেন বাংলা, বিহার ও সীমান্তে যুদ্ধের ময়দানে বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী ও তাঁদের অনুসারী অধিকাংশ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম। খানক্বাহ, দরগাহ ও আস্তানার নিরুপদ্রব কক্ষগুলির আরাম-আয়েশ যাদেরকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। তীজাঁ, দাসওয়াঁ, কুলখানি, চেহলাম, ওরস ও সামা, মীলাদ, ইছালে ছওয়াব ও শবেবরাতের আলোকসজ্জা ও

হালুয়া-রুটির লোভনীয় আকর্ষণ যাদেরকে বেঁধে রাখতে পারেনি। সবকিছুর ঊর্ধে ইসলামের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখার জন্য নিরলস দা'ওয়াত ও তাবলীগ এবং লোক ও রসদ প্রেরণের সাথে সাথে অস্ত্র হাতে নিয়ে জীবনকে বাজি রেখে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মায়াবন্ধন ছিন্ন করে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশ সিংহকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাযার হাযার মাইল দূরে সীমান্তের পাঞ্জতার, সিত্তানা, মুল্‌কা, আসমাস্ত ও চামারকান্দের মুজাহিদ ঘাঁটিগুলিতে চলে গিয়েছিলেন যারা জনমের মত হিজরত, জিহাদ ও শাহাদাতের অমিয়সুধা পানের উদগ্র বাসনা নিয়ে। আল্লামা ইসমাঈল, মাওলানা বেলায়েত আলী ও ইনায়েত আলী প্রমুখ আহ্লেহাদীছ নেতৃবৃন্দ সে যুগেও যেমন একশ্রেণীর আলেম ও তাদের অনুসারীদের নিকট ধিকৃত ছিলেন। এযুগের আহলেহাদীছ উলামায়ে কেরাম ও তেমনি একশ্রেণীর উলামার নিকটে ধিকৃত হয়েই আছেন।

ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের উপরে গবেষক ডঃ কেয়ামুদ্দীন আহমদ বলেন, 'একদিকে সীমান্ত এলাকা, অন্যদিকে বিহার ও বাংলা এলাকা-এ দু'টি ছিল মূল কেন্দ্রবিন্দু (Two pivots), যাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে।'[৫৫] সীমান্ত ছিল যুদ্ধস্থল কিন্তু বিহার (পাটনা) ও বাংলা এলাকা ছিল মুজাহিদ ও রসদ প্রেরণের কেন্দ্রস্থল- যা হ'ল জিহাদের মূল হাতিয়ার। বর্তমানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে সীমান্ত এলাকা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে, সমগ্র বিহার ও বাংলা এলাকার পশ্চিমাংশ ভারতে এবং বাংলার পূর্বাংশ স্বাধীন বাংলাদেশ ভূখন্ডে অবস্থিত। অন্যান্য সকল অঞ্চলে আহলেহাদীছ-এর বসবাস থাকলেও বালাকোট পরবর্তী শতবর্ষব্যাপী জিহাদ আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি এলাকা হওয়ার কারণে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে আহ্লেহাদীছ জনগণের সংখ্যা উপমহাদেশের অন্য সকল এলাকার তুলনায় আজও বেশী। এটা যে জিহাদ আন্দোলনেরই বাস্তব ফল, তা বলা যেতে পারে।

قيل إن الإله ذو ولد + وقيل إن الرسول قد كهنا
ما نجى الله و رسوله معا + من لسان الورى فكيف أنا ؟

টীকাসমূহ-১১

❑ **শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ**

শাহ ইসমাঈল ৮বৎসর বয়সে কুরআন মাজীদ হেফ্য করেন। ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত আরবী ছরফ-নাহুর প্রাথমিক কিতাব সমূহ অধ্যয়ন করেন। ১০ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হ'লে চাচা শাহ আবদুল কাদের-এর নিকটে লালিত-পালিত হন। এরপর বড় চাচা শাহ আবদুল আযীয-এর নিকটে 'মা'কূলাত ও মানকূলাত'-এর উপরে দক্ষতা অর্জন করেন। তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ৩০,০০০ হাযার হাদীছের হাফেয ছিলেন। দাদা শাহ অলিউল্লাহ লিখিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্'-র বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে তিনি সক্রিয় জিহাদী জীবন বেছে নেন এবং অবশেষে বালাকোট প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন ও সেখানেই সমাহিত হন। জীবনীকার নওশাহরাভী বলেন, 'যদি আজ খোদ শাহ ছাহেব বেঁচে থাকতেন, তবে তাঁকেও শাহ ইসমাঈলের পতাকাতলে দেখা যেত।'

গ্রন্থাবলীঃ তাঁর লেখনী কম ছিল। কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত সারগর্ভ ও সংস্কারধর্মী। যেমন- (১) তাক্বভিয়াতুল ঈমান -উর্দূ (২) সাল্কে নূর, তওহীদী কবিতা -উর্দূ ও ফারসী (৩) এক রোযী -উর্দূ (৪) আবাক্বাত -আরবী (৫) ছিরাতে মুস্তাক্বীম (প্রথমার্ধ) -ফারসী (৬) ঈযাহুল হাক্বিক্বছ ছারীহ্ -ফারসী (৭) উছূলুল ফিক্হ -আরবী (৮) মানছাবে ইমামত -ফারসী (৯) তানভীরুল আইনাইন -আরবী (১০) মানতেক -এর উপরে একটি পুস্তিকা।-তারাজিম পৃঃ ৯২, ১০৮; জামা'আতে মুজাহিদীন পৃঃ ১১৭-২৯।

১. গোলাম রসূল মেহের, সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (লাহোরঃ ইছরা, জামেয়া আশরাফিয়া, সালবিহীন) পৃঃ ১১৭-১৮।

২. ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারী, 'সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর রাজনীতি' (ঢাকাঃ মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩০, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৬১; গৃহীতঃ The Morning news (Calcutta, 2nd number,1944) p. 77.

৩. প্রাগুক্ত ১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যা) পৃঃ ৭৩ (ঈষৎ সংক্ষেপায়িত)।

৪. আবুল হাসান আলী নদভী, 'সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ' (লাক্ষ্ণৌঃ নামী প্রেস, মার্চ ১৯৩৯) পৃঃ ৩৭৩।

৫. "India has hitherto produced only one Moulavi and that is Moulavi Mohammad Ismail." - মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, 'মুজাহিদ আন্দোলনের ইতিকথা' মাসিক তর্জুমানুল হাদীস (ঢাকাঃ ১৬ শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মে ১৯৭০) পৃঃ ১৬৮ ; গৃহীতঃ Aspects of Shah Ismail Shaheed, P. 44.

৬. জীবনীকার মিরযা হায়রাত দেহলভী, 'হায়াতে তাইয়িবা' (লাহোরঃ মাকতাবাতুস সালাম, ১৯৫৮) পৃঃ ১৯০; অন্য জীবনীকার গোলাম রাসূল মেহের এই সফরের ঘটনাকে 'নিছক কাহিনী' বলেছেন। -মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৮; শাহ ইসমাঈলকে 'কাফের' আখ্যায়িত করা হয় ও তাঁকে হত্যা করার জন্য চারজন গুন্ডা নিয়োগ করা হয়। দ্র. মিরযা, হায়াতে তাইয়িবা পৃঃ ১৪১,১৪৪।

৭. মাসঊদ আলম নাদভী, 'হিন্দুস্তান কি পহেলী ইসলামী তাহরীক' (দিল্লীঃ মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮১) পৃঃ ২৬।

৮. উস্তাদ শাহ আবদুল আযীয তাঁর প্রিয় ছাত্রদ্বয়কে এই লকবে ডাকতেন। -মেহের, 'সাইয়িদ আহমাদ শহীদ' পৃঃ ১১৮।

৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৫।
১০. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৬।
১১. 'পহেলী তাহরীক' পৃঃ ২৬; মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮৩, ২০৮, ২৩১।
১২. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩৪-৩৮।
১৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬৪-৬৭।
১৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬৮, ২৭০।
১৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩২।
১৬. আবু ইয়াহ্ইয়া ইমাম খান নওশাহরাবী, 'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ' (লায়ালপুর-পাকিস্তানঃ জামেয়া সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯১/১৯৮১) পৃঃ ১০৫।
১৭. **সংঘটিত যুদ্ধসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ-**

যুদ্ধের নাম	তারিখ	মুজাহিদ সংখ্যা	প্রতি পক্ষের সৈন্য সংখ্যা	ফলাফল	শহীদ সংখ্যা	প্রতি পক্ষের নিহত সংখ্যা	মন্তব্য
১. আকূড়াহ (নওশেরা, পেশোয়ার)	২১.১২. ১৮২৬ খৃঃ	১৫০০	১০,০০০ (৮টি কামান সহ)	মুজাহিদ-গণের বিজয়	৩৬	৭০০	মাওলানা বেলায়েত আলীর চাচাতো ভাই পাটনার মাওলানা বাকের আলী আযীমাবাদী প্রথম শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। -মেহের, 'সাইয়িদ আহমাদ শহীদ' পৃঃ ৩৩৭, ৩৮৫; নদভী, 'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ' পৃঃ ১৪৫
২. বাযার	আকূড়া যুদ্ধের অল্প দিন পরেই	-	-	বিজয়	-	-	এই যুদ্ধে বরকতুল্লাহ বাংগালী প্রথম শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪৯। গনীমতের মাল বন্টন নিয়ে স্থানীয় সর্দারগণের মধ্যে গোলমাল দেখা দেওয়ায় ১১.১.১৮২৭ খৃঃ বৃহস্পতিবারে 'হান্ড'-এর পুকুর পাড়ে সর্বসম্মত ভাবে সৈয়দ আহমদকে 'আমীরুল মুমিনীন' ঘোষণা করা হয় ও তাঁর হাতে 'ইমামতে জিহাদ'-এর বায়'আত করা হয়।- মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫৩।

৩. আবাসীন নদীর তীরে	২৫.৬. ১২৪২ হিঃ	৫০০	৩০০০ (১০টি কামান সহ)	বিজয়	-	-	স্থানীয় আফগান যোদ্ধারা মাঝপথে পালিয়ে গেলে শাহ ইসমাঈল মাত্র ৫০০ গাযী নিয়ে বিপুল বিক্রমে হামলা করেন। ফলে বুধ সিং তার সেনাদল নিয়ে সব ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।- মিরযা হায়রাত, হায়াতে ত্বাইয়িবা' পৃঃ ৩০৫-৭।
৪. সীদো	-	প্রতি পক্ষের চেয়ে অনেক বেশী	১৫,০০০	পরাজয়	৬,০০০	-	সৈয়দ আহমদকে বিষপ্রয়োগ করাহয়। তিনি বেহুঁশ অবস্থায় কাতরাতে থাকেন। অসুস্থ আমীরের জীবন বাঁচানোর জন্য এই যুদ্ধে শাহ ইসমাঈল একাকী যে দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তা ছিল এক বিরল দৃষ্টান্ত। বিশ্বাস ঘাতক শী'আ দুররানী সর্দার হান্ড-নেতা ইয়ার মুহাম্মাদ খান তার ২০,০০০ হাযার দেশীয় যোদ্ধা নিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকার ফলে মুজাহিদগণের সাক্ষাত বিজয় অবশেষে পরাজয়ে পর্যবসিত হয়।- মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৬৭-৭৭; মিরযা হায়রাত, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০৭-৯।
৫. ডুমগালা		হিন্দুস্থানী ১০০ + স্থানীয় ৩০০= ৪০০	৬,০০০	বিজয়	২	৩০০	মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪২৪-২৬।

৬. শাংগা রী গুহা	-	১২ জন	-	বিজয়	৬	২৫০	শিখদের হাতে বন্দী একজন মুজাহিদপুত্রকে উদ্ধারের জন্য শাহ ইসমাঈল রাতের অন্ধকারে এই অভিযান করেন। এতে তাঁর একটি আংগুল যখম হয়।-মিরযা, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩১৮, ৩২১; মেহের, পৃঃ ৪২৬-২৭। ০ এই সময় মৌলবী মাহবুব আলী দেহলভী প্ররোচনা দিয়ে কিছু গাযীকে জিহাদ হ'তে দিল্লী ফিরিয়ে নিয়ে যান।- মিরযা, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৪-২৭।
৭. উৎমা নযাঈ	-	১২০০	৪,০০০ (২টি কামান সহ)	বিজয়	-	-	বায়'আতকারী বিশ্বাসঘাতক ইয়ার মুহাম্মাদ খানের হামলার জওয়াবে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শাহ ইসমাইল তাঁর ভক্ত জনৈক রাজপুত হিন্দু রাজারামকে এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের নিকট থেকে নিজের দখল করা কামানের গোলাবর্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তিনি অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তা পালন করেন। দুররানী ফৌজ সবকিছু ফেলে পালিয়ে যায়। মুজাহিদ পক্ষে কেউ হতাহত হননি। এই বিজয়ের প্রভাব সারা পাঞ্জাবে পড়ে এবং অন্যূন ২০০০ সর্দার এসে কবর পূজা ও অন্যান্য শিরক-বিদ'আত হতে তওবা করেন। -মিরযা প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৮-৩১; মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৪৮-৫৬।
৮. পাঞ্জতার	যুল-কা'দাহ ১২৪৪ হিঃ জুন ১৮২৯	৯০০	শিখ ৭৫০০+ দুররানী ২৫০০ = ১০,০০০ (২টি কামান সহ	বিজয়	-	২	মূল মুজাহিদ ঘাঁটি পাঞ্জতারের বিরুদ্ধে রনজিৎ সিংয়ের প্রেরিত এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ফরাসী জেনারেল অন্টওয়ারা। সাথে ছিল হাস্ত-এর অপর বায়'আতকারী বিশ্বাসঘাতক নেতা খাদী খানের আড়াই হাযার মুসলিম দুররানী ফৌজ এই যুদ্ধে মুজাহিদগণ আমীরের হাতে

							নতুনভাবে 'মৃত্যুর বায়'আত' গ্রহণ করেন এবং প্রাণপণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ফরাসী সেনাপতি মুজাহিদগণের ব্যাপক প্রস্তুতি দেখে খাদী খানের উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে পলায়ন করেন। - মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৯৩-৫০০; মির্‌যা, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩২-৩৮।
৯. হান্ড	১০.২. ১২৪৫ হিঃ ৬.৮. ১৮২৯ খৃঃ	১৫০ শত	-	বিজয়	-	-	বিশ্বাসঘাতক খাদীখানের ঘাঁটিতে গাযীদের হামলা। খাদী খান নিহত হয়। -মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫০৫-৫১০; মির্‌যা মুজাহিদ সংখ্যা ৭০০ লিখেছেন।- পৃঃ ৩৩৮।
১০. যায়দাহ	০৫.০৩. ১২৪৫ হিঃ ৩১.৮. ১৮২৯ খৃঃ	হিন্দুস্থানী ৩০০ + স্থানীয় ৪০০ =৭০০	১০,০০০ (৬টি কামান সহ)	বিজয়	২	৩০০	বিশ্বাসঘাতক ইয়ার মুহাম্মাদ খান মুষ্টিমেয় গাযীদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য এই বিরাট বাহিনী নিয়ে আসে। কিন্তু অবশেষে সে নিহত হয়। - মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫২১- ২৭
১১. আম্ব	-	-	২,০০০	বিজয়	-	-	স্থানীয় পাঠান সর্দারদের বেঈমানী- তে অতিষ্ঠ হয়ে সৈয়দ আহমদ কাশ্মীরে যাওয়ার পথে আম্ব নেতা পায়েন্দা খানের সাথে সন্ধি করেন। তিনি বাহ্যিকভাবে খুব সমাদর করলেও গভীর রাতে গাযীদের উপরে হামলা করেন। শেষে আবাসীন নদী পার হয়ে পালিয়ে জান বাঁচান। ০ আম্ব-কে রাজধানী করে সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাঈলের নামে মোহরাংকিত হুকুমনামার মাধ্যমে নিয়ম মাফিক ইসলামী হুকুমত চালু করা হয়। যাকাত ও ওশর আদায় এবং ইসলামী বিধান মোতাবেক বিচার কার্য শুরু হয়।-মির্‌যা, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪৪-৪৬; মেহের, পৃঃ ৫৭৫-৬০৩।

১২. চাতারবাঈ	-	১,০০০	৫,০০০ (৪টি কামান সহ)	বিজয়			রনজিৎ সিং স্বয়ং এই যুদ্ধ পরিচালনা করে পরাজিত হয়ে লাহোর ফিরে যান। পরে পেশোয়ারের শাসক সুলতান মুহাম্মাদ খান বশ্যতা স্বীকার করলে সৈয়দ আহমদ সরল মনে তাকেই পেশোয়ারের ইসলামী হুকুমতের গবর্ণর নিয়োগ করেন। -মিরযা পৃঃ ৩৫৪। ধূর্ত সুলতান মুহাম্মাদ খান শাহ ইসমাঈলের নামে মাত্র তিন দিনের মধ্যে রাজ্যে সকল বিধবাকে বিবাহ দেবার এক ফরমান জারি করলে সর্বত্র দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়। এই সুযোগে সে নবনিযুক্ত প্রধান কাযীকে হত্যা করে (ঐ পৃঃ ৩৫৭-৩৫৯)। পেশোয়ারের সর্দারদের চক্রান্তে সীমাবাসীগণ গাযীদের দা'ওয়াত দিয়ে ইসমাঈলিয়াহ্ গ্রামের মসজিদে এশার ছালাতে সিজদারত অবস্থায় তাদেরকে হত্যা করে। ইমাম হাজী বাহাদুর শাহ খানকে প্রথম রাক'আতে সিজদারত অবস্থায় প্রথমে হত্যা করে দাওয়াতদাতা গ্রামের সর্দার ইসমাঈল খান। অতঃপর গ্রামবাসীগণ বাকী মুজাহিদগণকে হত্যা করে। জীবনীকার মেহের এই দুঃখময় স্থানটিকে 'মাশহাদে আকবর' শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৭৮-৭৯।

১৩. বালাকোট	২৪.১১. ১২৪৬ হিঃ ৬.৫. ১৮৩১ খৃঃ ২৭.১. ১২৩৭ বাং শুক্রবার পূর্বাহ্ণ	৯০০	২০,০০০	পরাজয়	প্রায় ৩০০	৭০০	পেশোয়ারের মর্মান্তিক ঘটনা শ্রবণ করে ভগ্ন মনোরথ হ'য়ে সৈয়দ আহমদ তাঁর দীর্ঘ চার বছরের পাঞ্জতার ঘাঁটি ছেড়ে ডিসেম্বরের বরফঢাকা শীতে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে বালাকোট এলাকায় রনজিৎ সিংয়ের সেনাপতি শের সিং কর্তৃক আক্রান্ত হন। কিন্তু জয়লাভে নিরাশ হ'য়ে শেরসিং যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন মুজাহিদ বাহিনীর জনৈক পাহারাদারের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে (নাদভী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৬; তবে মেহের বিষয়টি স্বীকার করতে চাননি। -পৃঃ ৭৫১ পাদটীকা) শিখ সেনাপতি শের সিং ও মুযাফ্ফরাবাদের মুসলিম সর্দার নাজাফ খান গোপনপথে রাতের অন্ধকারে গাযীদের উপরে হামলা করে। ফলে বালাকোটের মর্মান্তিক শাহাদাত ও পরাজয় সংঘটিত হয়। মেহের প্রদত্ত ১৩৭ জন শহীদের নামের তালিকায় আলীমুদ্দীন, ফয়যুদ্দীন, লুৎফুল্লাহ, শারফুদ্দীন ও মুযাফ্ফর হুসাইন বাংগালীর নাম উল্লেখ আছে। -মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮০০।

উপরোক্ত যুদ্ধগুলি ছাড়াও ছোটখাট কিছু সংঘর্ষ ঘটেছিল।

১৮. সাইয়িদ আহমাদ শহীদ, 'ছিরাতে মুস্তাকীম'- উর্দূ অনুবাদঃ (করাচী-কালাম কোম্পানী, তীর্থদাস রোড, সালবিহীন) পৃঃ ১১৩।

১৯. মাওলানা আলী নদভী একই ধরণের মন্তব্য করেন বিহারের বিখ্যাত দারভাঙ্গা দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসার বার্ষিক দিস্তারবন্দী অনুষ্ঠানে যথাক্রমে ১৯৬১ সালের ১৬ই জুলাইতে ও ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে। যা যথাক্রমে 'আল-হুদা' দারভাঙ্গা এবং নাদওয়াতুল ওলামা লাক্ষ্ণৌ-এর মুখপত্র পাক্ষিক 'তা'মীরে মিল্লাত' ২৫শে মে ১৯৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। -হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, 'তাহরীকে জিহাদ' (গুজরানওয়ালা-পাকিস্তানঃ নাদওয়াতুল মুহাদ্দেছীন, ১ম সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬) পৃঃ ৪৯-৫০।

২০. নওশাহরাবী, 'তারাজিম'- ভূমিকা, পৃঃ ৩১।

২১. ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, 'তাহরীকে জিহাদ' পৃঃ ৫০-৫১; কলিকাতা ও এলাহাবাদের চীফকোর্ট, হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিলে ওয়াহ্হাবীদের পক্ষে রায়প্রাপ্ত মামলা সমূহের বিবরণ সংকলিত হয়েছে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮) প্রণীত 'ফুতূহাতে আহলেহাদীছ' বইয়ের মধ্যে। প্রকাশকঃ মাকতাবা শু'আইব, হাদীছ মনযিল, করাচী-১, ১৯৬০ খৃঃ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা -৮০।

২২. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৩।

২৩. মিরযা, 'হায়াতে ত্বাইয়িবাহ' পৃঃ ৩৪৮-৪৯।

২৪. তাহরীক, পৃঃ ৫৩-৫৪।

২৫. নাযীর আহমাদ রহমানী, 'আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত' (বেনারসঃ জামেয়া সালাফিইয়াহ, ১৯৮৬) পৃঃ ৬৪, ২১০-২৩০।

২৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ২১৫।

২৭. Dr. Azizur Rahman Mallick, BRITISH POLICY AND THE MUSLIMS IN BENGAL (1757-1856) Dacca: Bangla Academy, 1977, P. 110.

২৮. Dr. Muin-ud-din Ahmad Khan,"HISTORY OF THE FARAIDI MOVEMENT." (Dhaka: Islamic Foundation, 1984.) p. 57, 67. [Although Tariqah-i-Muhammadiyah movement was started as a religious reform movement about A. D. 1818, it took a political turn within few years and spread throughout Indo-Pakistan sub-continent with Extra ordinary rapidity. In course of time, it also split up into three distinct groups, namely the Patna school, Ta'aiyuni (movement of Karamat Ali) and Ahl-i-Hadith. p. 57. The new school which came out of the Patna school, called itsellf 'Muhammadi' and `Ahl-i-Hadith'. Later on they came to be widely known as Ahl-i-Hadith and Rafi-yadayn' ..... In the present study they are refferred to as Ahl-i-Hadith. p. 67.]

২৯. طریقه من طریقه جد خود سید المرسلین است - یك روز نان خشك سیر می خورم و شکر خدا بجا می ارم ، و یك روز کرسنه می مانم و صبر می کنم - গোলাম রাসূল মেহের

'জামা'আতে মুজাহেদীন' (লাহোরঃ গোলাম আলী এণ্ড সন্স, সালবিহীন) পৃঃ ৬৯।

৩০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৮।

৩১. নাদবী, 'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ' পৃঃ ৩৬৭।

৩২. 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' (উর্দূ) পৃঃ ২১৪।

৩৩. Dr. Muin uddin Ahmad Khan, History of the FARAIDI MOVMENT. p. 41.

৩৪. 'তাহরীকে জিহাদ' পৃঃ ৩২।

৩৫. আবদুল মওদুদ, 'ওহাবী আন্দোলন' (ঢাকাঃ আহমাদ পাবলিশিং হাউস, ৩য় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫) পৃঃ ১১২।

৩৬. 'তাহরীকে জিহাদ' পৃঃ ৩৭।

৩৭. সাপ্তাহিক 'আখবারে আহলেহাদীছ' (অমৃতসরঃ ২৫শে এপ্রিল ১৯১৩)।

৩৮. (লেখকের পিতা) মাওলানা আহমাদ আলী (সাং বুলারাটি, পোঃ আলীপুর, যেলা-সাতক্ষীরা) রচিত উক্ত পুস্তিকার নাম থেকে উক্ত বিষয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাসের প্রফেসর ডঃ মঈনুদ্দীন আহমদ খান তাঁর পি,এইচ-ডি থিসিসে। নামঃ History of the Faraidi movement পৃঃ ৪১।

৩৯. মিরযা হায়রাত দেহলভী, 'হায়াতে তাইয়িবা' পৃঃ ৩২৬।

৪০. মেহের, জামা'আতে মুজাহেদীন' পৃঃ ২৮৬।

৪১. 'তাহরীকে জিহাদ' পৃঃ ৫৮, গৃহীতঃ মুযাকারায়ে ইল্‌মিয়াহ (নওকিশোর ছাপা, লাক্ষ্ণৌ ১৮৭০ সাল) পৃঃ ৯; হান্টার, 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স' অনুবাদঃ আনিসুজ্জামান, পরিশিষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য।

৪২. হান্টার, 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স' অনুবাদঃ এম আনিসুজ্জামান (ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাবমহল, ১৯৮২) পৃঃ ৯৯-১০৪।

৪৩. 'তাহরীকে জিহাদ' পৃঃ ৫৮।

৪৪. আবুল হাসান আলী নাদভী, 'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ' পৃঃ ৪৫৫।

৪৫. 'তাহরীকে জিহাদ' পৃঃ ৩২ গৃহীতঃ 'মুসলমানুঁ কা রওশন মুস্তাক্ববাল' পৃঃ ১০৪।

৪৬. আলী নাদবী, 'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ' পৃঃ ৩৭১।

৪৭. মেহের, 'জামা'আতে মুজাহেদীন' পৃঃ ১০৯-১১৬।

৪৮. আবদুস সামী বিন আবদুল খবীর বিন আবদুল হাকীম বিন আহমাদুল্লাহ (জন্মঃ ১২২৩/১৮০৮ খৃঃ, আন্দামানের ১ম মুজাহিদ কয়েদী ও ২য় শহীদ, ১২৯৮ হিঃ মোতাবেক ২২শে নভেম্বর ১৮৮১) ইবনে ইলাহী বখ্‌শ মুনীরী অতঃপর ছাদেকপুরী (রহঃ)। -কাইয়ূম খিযির, 'ছাদিকপুর-পাটনা, কুরবানগাহে আযাদীয়ে ওয়াতন' (পাটনাঃ বিহার লিথো প্রেস, ১৯৭৯) পৃঃ ৩৫-৩৬; আবদুর রহীম ছাদেকপুরী (১৮৩৬-১৯২৩), 'তাযকেরায়ে

ছাদেকাহ' (পাটনাঃ মাতবা'আ উছমানী ১৩১৯/১৯০১) পৃঃ ৪১-৪৩। ঠিকানাঃ 'ইমারতে আহলেহাদীছ ছাদিকপুর' পাটনা-৭, বিহার, ভারত।

৪৯. আফগানিস্তান হ'তে রাশিয়ান সৈন্য প্রত্যাহার করার পর কুনাঢ় প্রদেশ মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে সেখানে সকল আফগান মুজাহিদ গ্রুপের নির্বাচনে আহলেহাদীছ মুজাহিদগণের নেতা শায়খ মাওলানা জামীলুর রহমান প্রথম স্বাধীন কুনাঢ় ইসলামী হুকুমতের 'আমীর' নির্বাচিত হন। কিন্তু প্রায় দেড় বছর পরে 'হিযবে ইসলামী' হিকমতিয়ার গ্রুপের নেতৃত্বে বাকী ৭টি মুজাহিদ গ্রুপ একত্রিত হয়ে গত ২২শে আগষ্ট '৯১ ভোর রাতে অতর্কিতে 'দারুল ইমারত আস'আদাবাদে' হামলা ও বহু লোককে হতাহত করে। অতঃপর ৩০শে আগষ্ট '৯১ 'বাজোড়' নামক স্থানে আমীর মাওলানা জামীলুর রহমান আততায়ীর হস্তে শহীদ হন। -লাহোরঃ সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম ৪৩ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ১৫ নভেম্বর ১৯৯১।

৫০. আফগানিস্তানের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত কুনাড় ও লাগমান প্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে প্রায় ১২ হাযার বর্গমাইল আয়তন ও দেড় লক্ষ জনসংখ্যা নিয়ে এই এলাকা গঠিত। এখানকার মুসলমানেরা নিজেদেরকে 'কুরায়েশ' বংশীয় বলে দাবী করেন। প্রায় সকলেই আহলেহাদীছ। আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ আফযাল-এর নেতৃত্বে এখানে ১৯৭৮ সাল হতে স্বাধীন ইসলামী হুকুমত চালু আছে। -আবদুর রহমান কীলানী, 'সারগুযাস্তে নূরিস্তান' (লাহোরঃ সেভেন ব্রাদার্স প্রেস, ১৯৮৬) পৃঃ ৩৭-৪১।

৫১. H.A.R. Gibb & Others, ENCYCLOPEDIA OF ISLAM (London: Leiden, Brill 1960) VOL. 1. P. 259.

৫২. আব্দুল মওদুদ, 'ওহাবী আন্দোলন' পৃঃ ১০০।

৫৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ১০১।

৫৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ১০১।

৫৫. Qeyamuddin Ahmed, THE WAHABI MOVEMENT (Calcutta: Firma K. L. Mukhapadhya, 1st Ed.) P. P. 225-26.

عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله (ص) لن يبرح هذا الدين قائما يُقاتِلُ عليه عِصابَةٌ من المسلمين حتى تقوم الساعة رواه مسلم –

عن أنس قال قال رسول الله (ص) جاهدوا المشركين بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم رواه أبوداود و النسائي و الدارمي بإسناد صحيح –

আধুনিক যুগঃ ২য় পর্যায় (খ)

دور الجديد: المرحلة الثانية (ب)

জিহাদ আন্দোলন (২য় পর্যায়)

حركة الجهاد للأخوين الصادقفورى

আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও পরবর্তী যুগ (১২৪৬-১৩৭০/১৮৩১-১৯৫১) ১২০ বৎসর

১৮৩১ সালের ৬ই মে শুক্রবার বালাকোট বিপর্যয়ের পর বেঁচে যাওয়া প্রায় ৭০০ শো গাযী পার্শ্ববর্তী বান্সীর এলাকার সর্দার বাহরাম খানের বাড়ীতে সমবেত হয়ে শায়খ অলি মুহাম্মাদ ফল্তীকে ৮ই মে তারিখে নতুন 'আমীর' নির্বাচন করেন ও সকলে তাঁর হাতে বায়'আত করেন।[১] এই সময় মাওলানা বেলায়েত আলী (১২০৫-৬৯/১৭৯০-১৮৫২ খৃঃ) সৈয়দ আহমদের নির্দেশক্রমে দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদকে কেন্দ্র করে[২] এবং মাওলানা এনায়েত আলী (১২০৭-৭৮/১৭৯২-১৮৫৮ খৃঃ) বাংলাদেশের হাকিমপুরকে (বর্তমানে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত) কেন্দ্র করে জিহাদ সংগঠনে ব্যস্ত ছিলেন। তবে 'তাযকেরা'-র বর্ণনা মতে এটি ১২৪৮ হিঃ মোতাবেক ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ হ'তে পারে।[৩] অতঃপর ১৮৪৩ সালে মাওলানা এনায়েত আলী প্রথম 'আমীর' নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রে পর পর পাঁচজন 'আমীর' নিযুক্ত হন।[৪] এই সময় উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তবে সিত্তানা মূল মুজাহিদ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যা ১৮৪১ সালে সিন্ধু নদীর বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।[৫]

১-মাওলানা এনায়েত আলীর ১ম ইমারত (১২৫৯-৬২/১৮৪৩-৪৬ খৃঃ)

১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যুর পরে শিখদের গৃহদ্বন্দ্বের সুযোগে হাযারা ও কাগান এলাকার পাঠান সর্দারগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং মাওলানা বেলায়েত আলীকে 'ইমারত' গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।[৬] মাওলানা তাঁর খলীফা ও মেজভাই এনায়েত আলীকে বাংলাদেশ হ'তে সীমান্তে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এনায়েত আলী বাংলাদেশ হ'তে দু'হাযার মুজাহিদ নিয়ে প্রথমে পাটনা কেন্দ্রে ও পরে সীমান্তে রওয়ানা হন এবং ১৮৪৩ সালে কাগান (বালাকোট) পৌঁছে গেলে[৭] সকলে তাঁর নিকটে 'আমীরে জিহাদ' হিসাবে বায়'আত করেন।

আমীর হওয়ার পর ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে শিখদের উৎখাত করে তিনি

বালাকোট জয় করেন।[৮] অতঃপর ১৮৪৬ সালের মার্চ মাসে শিখদের মযবুত কেল্লা ফত্হগড় জয় করে তার নাম 'ইসলামগড়' রাখেন ও তাকে রাজধানী করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন,[৯] যার সীমানা নওশেরা হ'তে সিকান্দারপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।[১০]

২- মাওলানা বেলায়েত আলীর ইমারত (১২৬২-৬৯/১৮৪৬-৫২ খৃঃ)

ইসলামগড়ে স্বাধীন ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়ার পর বড় ভাই মাওলানা বেলায়েত আলী (১২০৫-১২৬৯/১৭৯০-১৮৫২ খৃঃ)-কে আমন্ত্রণ করে এনে ২৪শে শাওয়াল ১২৬২ হিঃ মোতাবেক ১৮৪৬ সালের ১৬ই অক্টোবর জুম'আর পূর্বে মেজভাই মাওলানা এনায়েত আলী স্বীয় ইমারতের গুরুদায়িত্ব বড়ভাইকে অর্পণ করেন।[১১]

বেলায়েত আলী আমীর হওয়ার তিন মাস পরেই কাশ্মীরের শাসক গোলাব সিং ডোগরা ও শিখদের এক বিরাট বাহিনীর সাথে 'দুর্রা দুব' নামক স্থানে প্রচন্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু পাঠান সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই যুদ্ধে মুজাহিদগণের সাক্ষাত বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়।[১২] এইভাবে নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমতের মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি ঘটে। মাওলানা আওলাদ আলী আযীমাবাদী কিছু সংখ্যক মুজাহিদকে নিয়ে সিত্তানা ঘাঁটিতে ফিরে যেতে সক্ষম হ'লেও বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী গ্রেফতার হয়ে ইংরেজের সরকারী ছত্রছায়ায় প্রথমে লাহোর ও পরে আযীমাবাদ প্রেরিত হন ও সেখানে মুচলেকার বিনিময়ে দু'ভাইকে নযরবন্দী রাখা হয়।[১৩] মেয়াদ শেষে পুনরায় দু'ভাই ৮ই রবীউছ ছানী ১২৬৭ হিঃ মোতাবেক ১৮৫১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী সিত্তানার ঘাঁটিতে পৌঁছে যান[১৪] ও সেখানেই মাত্র বিশ মাস পরে ২২শে মুহররম ১২৬৯ হিঃ মোতাবেক ১৮৫২ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখে ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ৬৪ বছর বয়সে বেলায়েত আলীর মৃত্যু হয় ও ঘাঁটির কবরস্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১৫]

মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী (রহঃ) (১২০৫-১২৬৯/১৭৯০-১৮৫২ খৃঃ)

বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশের রাজধানী পাটনা শহরের আযীমাবাদ ছাদিকপুর মহল্লায় মাওলানা বেলায়েত আলী জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতনামা ছাহাবী আব্দুল্লাহ

বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর বংশধর হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব মাওলানা বেলায়েত আলীর ৩৩ তম ঊর্ধতন পুরুষ ছিলেন। সেজন্য তাঁর বংশকে হাশেমী বা যুবায়রী বংশ বলা হয়ে থাকে। বিহারের খ্যাতনামা অলি ও মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্‌ইয়া মুনীরী (৬৬১-৭৮২/১২৬৫-১৩৮০) তাঁর ষোড়শতম দাদা ছিলেন।[১৬]

পিতা মৌলবী ফাত্‌হ আলীর ছয় ছেলের মধ্যে তিনিই ছিলেন বড়। দ্বিতীয়জন মাওলানা এনায়েত আলী, তৃতীয়জন মৌলবী তালেব আলী ও ষষ্ঠজন মাওলানা ফারহাত হুসাইন জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ৪র্থ ও ৫ম যথাক্রমে মাহদী হুসাইন ও ইবরাহীম হুসাইন শিশু অবস্থায় মারা যান। পিতার বড় ছেলে হওয়ার কারণে তাঁকে সবাই 'বড় হযরত' (بڑے حضرت) বলে ডাক্‌ত।[১৭]

মাওলানা বেলায়েত আলীর পারিবারিক জীবন ছিল প্রাচুর্যে ভরা। তাঁর নানা রফীউদ্দীন হুসায়েন খান মুর্শিদাবাদের নবাবের পক্ষ হ'তে বিহারের নাযেম সুবাদার ও মশহুর সর্দার ছিলেন।[১৮] নানার আদরে লালিত বেলায়েত আলী ছোটবেলায় নানার মতই দামী ও আড়ম্বরপূর্ণ পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে থাকতেন। লাক্ষ্ণৌয়ে পাঠাভ্যাসকালে তিনি স্বীয় উস্তাদ মৌলবী আশরাফসহ আমীরুল মুমিনীন সৈয়দ আহমাদ-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এই বায়'আত তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দেয়।[১৯] তিনি লেখাপড়া ত্যাগ করে মাত্র ২০ বছর বয়সে সৈয়দ আহমাদের সঙ্গে রায়বেরেলী চলে যান। তাঁকে আল্লামা শাহ ইসমাঈলের জামা'আতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। শাহ ইসমাঈলের নিকটে তিনি কিছু লেখাপড়াও শিখেন। ইতিপূর্বে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু ঘর ছেড়ে নিঃস্ব অবস্থায় জিহাদে বের হ'য়ে যেতে তাঁর একটুও বাঁধেনি। ইবাদত ও লেখাপড়ার সময়টুকু ছাড়া বাকী সমস্ত সময়টা তিনি সাথী মুজাহিদগণের খিদমতে কাটিয়ে দিতেন। জংগলে গিয়ে কাঠ কেটে আনতেন। নিজের হাতে রান্না করতেন। এমন কোন মামুলী কাজ ছিলনা যা তিনি করতেন না।[২০]

মাওলানা বেলায়েত আলীর পিতা যখন জানতে পারলেন যে, তিনি রায়বেরেলী চলে গিয়েছেন, তখন বাড়ীর একজন কর্মচারীর মাধ্যমে তিনি ছেলের জন্য কিছু নগদ টাকা ও কাপড়-চোপড় পাঠিয়ে দিলেন। ঐসময় সৈয়দ আহমদ

মেহমানদের জন্য মুজাহিদগণের সাহায্যে একটি ঘর তৈরী করছিলেন। সৈয়দ আহমাদ নিজেও কাজ করছিলেন এবং বিভিন্নজনকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ঘরের কাদামাটি তৈরীর দলে ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলী। কর্মচারীটি যখন সেখানে পৌঁছল, তখন কাদামাটি মেখে কালো তহবন্দ পরা মাওলানা ছাহেবকে সে চিন্‌তে পারলোনা। মাওলানা তাঁর আব্বার পাঠানো টাকা-পয়সা ও কাপড়-চোপড় তখনই গিয়ে আমীর সৈয়দ আহমাদের হাওয়ালা করেন। তিন চারদিন অপেক্ষা করেও যখন দেখা গেল যে তিনি সেইসব উত্তম পোষাক পরলেন না বরং একই ময়লা তহবন্দ পরে রইলেন তখন কর্মচারীটি হতবাক হয়ে দুঃখিত মনে পাটনা ফিরে গেল।[২১]

রায়বেরেলীতে প্রশিক্ষণ নিয়ে মাওলানা বেলায়েত আলী দেশে ফিরলেন। কিন্তু তখন তিনি সম্পূর্ণ নতুন মানুষে পরিণত হয়েছেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি দা'ওয়াত ও তাবলীগে ব্যয় করতে থাকলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় তাঁর পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্য জিহাদ আন্দোলনে যোগ দেন। পাটনায় অবস্থানকালে তিনি প্রতি মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নিজ বাড়ীর আংগিনায় ওয়ায করতেন। সেখানে একপাশে পাঁচ-ছয়শো মহিলা ও অন্যপাশে পাঁচ-ছয় হাযার পুরুষ জমা হ'তেন। তাঁর ওয়াযের এমন একটা প্রভাব ছিল যে, যেই শুনত সেই-ই মুগ্ধ হ'ত।[২২]

আযীমাবাদ অবস্থানকালে তিনি প্রতিদিন যোহর হ'তে আছর পর্যন্ত কুরআন ও হাদীছের দারস দিতেন। কুরআন মজীদ ও 'বুলূগুল মারাম' হাদীছ গ্রন্থের শাব্দিক তরজমা সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে নিরক্ষর ব্যক্তিও ছালাতে নিজের পঠিত সূরা ও দু'আ সমূহের অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারত। তিনি ঘরে বসেই তাবলীগী দায়িত্ব শেষ করেননি বরং স্বীয় উস্তাদ শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর ন্যায় বিভিন্ন মেলা ও অনুষ্ঠানসমূহে গিয়ে তিনি লোকদেরকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দিতেন। মাঠে গিয়ে রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে কৃষকদেরকে ওয়ায শুনাতেন। কোন স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হ'লে গ্রামে গ্রামে তাবলীগ করতে করতে সেখানে পৌঁছতে তাঁর কয়েকমাস সময় লেগে যেত।[২৩]

মাওলানা বেলায়েত আলী তাঁর চারপাশে সর্বদা সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন দেখতে চাইতেন এবং যাবতীয় বিদ'আত দূরীকরণের চেষ্টায় রত থাকতেন। তাঁর মুরীদান ও আশপাশের সমস্ত লোক কিতাব ও সুন্নাতের পাবন্দ হয়ে গিয়েছিল। বিধবা

বিবাহ যা সে সময়ে খুবই নিন্দনীয় ও লজ্জাস্কর কাজ বলে বিবেচিত হ'ত, তিনি তা নিজের পরিবার থেকেই শুরু করে দিয়েছিলেন। একজন স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা ভদ্র ঘরে খুবই নিন্দনীয় ছিল। তিনি এই রেওয়াজও ভেঙ্গে দেন। বিবাহে ধুম-ধাম করা একটি আবশ্যিক বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তিনি এই নিয়ম বাতিল করে দেন। নিজের দুই ছেলে আবদুল্লাহ ও হেদায়াতুল্লাহ্‌র বিয়ে ছোট ভাই ফারহাত হুসাইনের দুই মেয়ের সঙ্গে দেন তাদের পুরানো তালি দেওয়া পোষাক পরিয়ে। বর-কণেকে একজোড়া করে নতুন কাপড়ও তিনি কিনে দেননি। জনৈক মুরীদ আবদুল গণীকে এক বিধবার সঙ্গে বিবাহ দেন মোহর হিসাবে স্রেফ কুরআন শিখানোর বিনিময়ে। অথচ সেই যুগে উচ্চ মোহরাণা উচ্চ বংশের নমুনা হিসাবে গণ্য হ'ত। নিজের সমস্ত আয় তিনি বায়তুল মালে জমা করে সেখান থেকে প্রয়োজন মত নিতেন। বাকী সবই দ্বীনের পথে ব্যয় করে দিতেন।[২৪]

মৌখিক তাবলীগের সাথে সাথে তিনি শাহ ইসমাঈল-এর কিতাবসমূহ ছাপিয়ে বিলি করারও ব্যবস্থা নেন। লাক্ষ্ণৌতে ছাপাতে ব্যর্থ হয়ে তিনি বাংগালী শিষ্য ও খলীফা মৌলবী বদীউয্‌যামান বর্ধমানীকে এই কাজের দায়িত্ব দেন এবং তাঁকে কলিকাতা মিছরীগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করেন। তিনি দশহাযার টাকা ব্যয়ে একটি প্রেস খরিদ করেন এবং অধিকাংশ দ্বীনী কিতাব সেখান থেকে ছেপে বিলি করেন। যার মধ্যে শাহ আবদুল কাদের (১১৬৭-১২৫৩/১৭৫৫-১৮৩৮)-এর তরজমা কুরআন শরীফও ছিল।[২৫]

জিহাদে গমনের উদ্দেশ্যেই মাওলানা বেলায়েত আলী আমীর সৈয়দ আহমাদের সঙ্গে সীমান্তে হিজরত করেছিলেন। কিন্তু সৈয়দ ছাহেব তাঁকে দা'ওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে সোয়াত থেকে হিন্দুস্থান ফেরত পাঠান এবং বলেন যে, আমি আপনাকে বীজ হিসাবে হিন্দুস্থান পাঠাচ্ছি। অর্থাৎ আপনার মাধ্যমে হাযারো গাছের জন্ম হবে।[২৬] হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্য) দীর্ঘ চার বছর যাবত তিনি দা'ওয়াতী কাজে ব্যাপৃত থাকেন। বালাকোটের শাহাদাতের সময় তিনি হায়দরাবাদে ও মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রামপুরী মাদ্রাজে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই বিপর্যয়ের খবর কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি পুনরায় জিহাদ সংগঠনের উদ্দেশ্যে দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ পুরোদমে শুরু করে দেন।

একই সময়ে পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি দাক্ষিণাত্য হ'তে আযীমাবাদ রওয়ানা হন। দুই বছর পরে (১২৪৮ হিঃ) সপরিবারে দেশে ফিরে নতুনভাবে সকলের নিকট হ'তে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন এবং এই সময় তিনি মেজ ভাই এনায়েত আলী-কে বাংলাদেশ প্রেরণ করেন। দু'বছর পরে (১২৫০/১৮৩৫ খৃঃ) তিনি নিজে বাংলাদেশে গমন করেন ও সেখান থেকে সপরিবারে হজ্জে রওয়ানা হন। কয়েক বছর আরব দেশে কাটিয়ে কলিকাতা ফিরে এসে পুনরায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন। অতঃপর মাওলানা এনায়েত আলী-কে সাথে নিয়ে আযীমাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন। সুশৃংখলভাবে দা'ওয়াতী কাজ চালু করার জন্য তিনি কয়েকজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খলীফাকে বিশেষ বিশেষ এলাকার জন্য নিযুক্ত করেন যাঁদের প্রধান কাজ ছিল শিরক-বিদ'আত দূরীকরণ, আকীদা সংশোধন এবং জিহাদ-এর ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনার সাথে সাথে জিহাদ সংগঠন-এর জন্য লোক ও রসদ সংগ্রহ করা। মাওলানা বেলায়েত আলীর খলীফাগণ নিম্নোক্ত এলাকাসমূহে উক্ত দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন।[২৭]

১। শাহ মুহাম্মাদ হুসাইন	ছাপরা, মুযাফ্ফরপুর, তিরহাট ও পাটনার পার্শ্ববর্তী এলাকা।
২। মাওলানা এনায়েত আলী	বাংলাদেশ এলাকা।
৩। মওলবী যয়নুল আবেদীন হায়দরাবাদী	এলাহাবাদ এলাকা।
৪। মওলবী মুহাম্মাদ আব্বাস হায়দরাবাদী	উড়িষ্যা এলাকা।

এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকেও গ্রামে-গঞ্জে তাবলীগে প্রেরণ করেন।[২৮]

লেখনীঃ

সর্বদা দা'ওয়াত ও তাবলীগ এবং জিহাদ সংগঠনে ব্যস্ততার মধ্যেও মাওলানা বেলায়েত আলী উর্দূ, ফারসী ও আরবী ভাষায় সাতটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। যেমন- ১. রাদ্দু শিরক বা শিরকের প্রতিবাদ (ফারসী) ২. আমল বিল-হাদীছ বা হাদীছ অনুযায়ী আমল (ফারসী) ৩. 'আরবাঈন ফিল-মাহ্দিইঈন' মাহ্দী (আঃ) সম্পর্কে ৪০টি হাদীছ (আরবী) ৪. রিসালা-ই-দা'ওয়াত, তাবলীগী পুস্তিকা (উর্দূ) ৫. তায়সীরুছ ছালাত, সহজ ছালাত শিক্ষা (উর্দূ) ৬. 'শাজারাহ' স্বীয় বংশ তালিকা (উর্দূ) ৭. তিবৃইয়ানুশ্ শিরক, শিরকের বর্ণনা (উর্দূ)। জীবনীকার

ভাতিজা মাওলানা আবদুর রহীম 'রাসায়েলে তিস্'আর মধ্যে যুক্তভাবে এগুলি প্রকাশ করেন।[২৯]

আহ্লেহাদীছ আন্দোলনে বেলায়েত আলীর অবদান

মাওলানা বেলায়েত আলী জামা'আতে মুজাহেদীনের শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। সৈয়দ আহমাদের জীবদ্দশায় তিনি যেমন শাহ ইসমাঈলের জামা'আতে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হ'তেন। সাইয়িদ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈলের পরে বেলায়েত আলীই ছিলেন জামা'আতে মুজাহেদীনের সর্বসম্মত নেতা।[৩০] তিনি ও তাঁর পরিবারের প্রধান লক্ষ্য ছিল জিহাদ,-যার মাধ্যমে তাঁরা নাছারা অধিকৃত হিন্দুস্থানকে 'দারুল ইসলামে' পরিণত করতে চেয়েছিলেন। আর সেজন্যেই তাঁরা আল্লাহ্র পথে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত এরূপ লোক বাছাই করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কুরআন ও হাদীছের অনুসরণ করতে গিয়েই তাঁরা ইসলামের নামে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আতসমূহের বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছিলেন। এজন্য তাঁরা এদেশের প্রচলিত মাযহাবী অনুসরণ থেকে বিরত থেকে 'আহলেহাদীছ' আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

বাংলা ও বিহারের যেসব এলাকা তাঁদের প্রভাবাধীন ছিল, সেই সব এলাকার অধিকাংশ মুসলিম অধিবাসী আজও 'আহলেহাদীছ' হিসাবে বসবাস করছেন। ছাদিকপুরী পরিবারের জীবনী 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ'-তে তাঁদেরকে (حنفى مع القول بالترجيح) অর্থাৎ 'ইমামের কথার উপরে হাদীছের নির্দেশকে অগ্রাধিকার দানকারী হানাফী' বলে যে আখ্যা প্রদান করা হয়েছে,[৩১] তা মূলতঃ আহলেহাদীছ তরীকারই বক্তব্য। এক্ষণে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা করে দেখব।-

মাওলানা বেলায়েত আলীর মাসলাকঃ

মাওলানা ও ছাদিকপুরী পরিবারের জীবনীকার আবদুর রহীম যুবায়রী (১২৫২-১৩৪১ / ১৮৩৬-১৯২৩) বিন ফারহাত হুসাইন (মৃঃ ১২৭৪ হিঃ) স্বীয় চাচা মাওলানা বেলায়েত আলীর 'মাসলাক' সম্পর্কে বলেন, 'রায়বেরেলীতে অবস্থানকালে তিনি আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈলের জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বেলায়েত আলীকে হাদীছ পড়াতেন। শুধু তাই নয় আল্লামা ইসমাঈল তাঁকে তাঁর জামা'আতের নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত

করেছিলেন।"[৩২]

আল্লামা ইসমাঈল-এর শিক্ষা, সংসর্গ ও প্রশিক্ষণের ফলে তাঁর মধ্য থেকে তাকলীদী গোঁড়ামী দূর হয়ে যায় এবং সরাসরি সুন্নাতের উপরে আমলের জায্‌বা সৃষ্টি হয়। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং ওয়ায ও নছীহতের ফলে হিন্দুস্থানে 'আমল বিল-হাদীছ'-এর চর্চা শুরু হয়ে যায় এবং তাক্বলীদ ও গোঁড়ামীর ভিত্ কমজোর ও দুর্বল হ'য়ে যায়।'[৩৩]

মাওলানা মাসঊদ আলম নাদবী বলেন, "বিদ'আতের বিরুদ্ধে কয়েকটি কিতাব তিনি প্রকাশ করেন এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি স্বীয় পরিবারে 'আমল বিস্-সুন্নাহ'-এর প্রচলন ঘটান। বিহার ও বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন তিনি নিজ পরিবার থেকেই শুরু করেন।"[৩৪]

'আমল বিল-হাদীছ' বা 'আমল বিস্-সুন্নাহ' ইত্যাদি শব্দ সাধারণতঃ আহলেহাদীছদের শানেই ব্যবহৃত হয়। অতঃপর মাসঊদ আলম নাদবী মাওলানা বেলায়েত আলীর মাধ্যমে যেসব সুন্নাতের পুনর্জীবন ঘটেছে তার তালিকা দিয়েছেন যার মধ্যে একটি সুন্নাত হ'ল- "জনৈক মিসকীন আবদুল গণী নগরনাহ্‌সাভীকে তিনি একজন বিধবার সঙ্গে মোহর হিসাবে কেবলমাত্র কুরআন পড়ানোর (تعليم قران) বিনিময়ে বিবাহ দেন।"[৩৫]

মাওলানা বেলায়েত আলী নিজ বাড়ীতে থাকাকালীন সময়ে প্রতিদিন যোহর হ'তে আছর পর্যন্ত সকলকে কুরআন মজীদ ও বুলূগুল মারাম-এর তরজমা ও তাফসীর শুনাতেন। তাছাড়া নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭/ ১৮৩২-৯০) নিজ জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন যে, মাওলানা বেলায়েত আলী আমার কৈশোর কালে যখন কণৌজ আসেন ও আমাদের বাড়ীতে অবস্থান করেন তখন আমাকে তিনি 'বুলূগুল মারাম' পড়ার উপদেশ দিয়ে যান।[৩৬] অধিকন্তু তিনি শাহ ইসমাঈলের পুস্তিকাসমূহ দিল্লী থেকে আনিয়ে তা ছাপিয়ে বিলি করার ব্যবস্থা নেন।[৩৭] হজ্জের সফরে তিনি ইয়ামনে চলে যান এবং খ্যাতনামা আহলেহাদীছ মনীষী ইয়ামনের বিচারপতি কাযী মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানীর (১১৭২-১২৫০/১৭৫৮-১৮৩৫) নিকট হ'তে হাদীছের সনদ লাভ করেন ও তাঁর কিছু কিতাব সঙ্গে আনেন।[৩৮]

এখানে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ (ক) লোকদেরকে কুরআন শিখানোর পর পরই রেওয়াজ অনুযায়ী কোন ফিক্হের কিতাব না পড়িয়ে তিনি হাদীছের কিতাব 'বুলূগুল মারাম' পড়াতেন (খ) খাছ করে শাহ ইসমাঈল (রহঃ) -এর কিতাবগুলি ছাপিয়ে বিলি করায় অনুমিত হয় যে, বেলায়েত আলী তাঁর উস্তাদ শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর ন্যায় আহলেহাদীছ ছিলেন (গ) তৃতীয় আরেকটি বিষয় হ'ল মাওলানা বেলায়েত আলী সুদূর ইয়ামনে গিয়ে ক্বাযী মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানীর নিকটে হাদীছের সনদ নিলেন। যিনি নিজেই একজন স্বনামধন্য আহলেহাদীছ বিদ্বান হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিত। এতে ধারণা করা যায় যে, মাওলানা বেলায়েত আলী 'সালাফী' তরীকার অনুসারী ছিলেন।

দারুল উলূম দেউবন্দ-এর খ্যাতনামা শিক্ষক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী হানাফী বলেন, "পাটনার মাওলানা বেলায়েত আলী বালাকোট যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর সেই জামা'আতের একজন বিশেষ স্তম্ভবিশেষ (خاص رکن) ছিলেন, যা মাওলানা ইসমাঈল 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' পড়ার পর সেই অনুযায়ী গড়ে তুলেছিলেন। এঁরা (ছালাতে) 'রাফ্উল ইয়াদায়েন' করতেন ও সশব্দে 'আমীন' বলতেন।'[৩৯]

উপরোক্ত আলোচনার পর এবারে আমরা মাওলানা বেলায়েত আলীর নিজস্ব রচনাবলী থেকে তাঁকে যাচাই করব। তিনি মোট সাতটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। প্রথম পুস্তিকা 'রাদ্দু শিরক'-এর শেষে লিখিত ক্বাছীদায় তিনি বলেন[৪০] "শত আফসোস যে, এযুগের আলেমরা ধোকা দেওয়াকেই নিজেদের নিদর্শনে (شعار خود) পরিণত করেছেন। তারা কুরআন ও হাদীছকে গোপন রেখে তার আসল বক্তব্য পরিবর্তন করে ফেলেন। হে পাকদিল মুমিন মুসলমান! যদি তুমি তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ্র) রেযামন্দী চাও, তাহ'লে কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ো। অন্য কারু কথায় চলোনা।" এই ধরণের বক্তব্য একজন সালাফী প্রতিভার কলম হ'তেই সাধারণতঃ বের হ'য়ে থাকে।

তাঁর একটি অনন্য পুস্তিকা হ'ল 'আমল বিল-হাদীছ' যা হাদীছের অনুসরণ ও ইমামদের তাকলীদ বিষয়ক প্রশ্নসমূহের জওয়াবে ফারসী ভাষায় লিখিত। শুরুতে তিনি বলেন- "হাদীছের ও ফিক্হের অনুসরণ সম্পর্কে এই ফকীরের নিকট বহু

প্রশ্ন আসছে। এজন্য আমি ভাবলাম যে, এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা সংকলন করি, যা সকল জিজ্ঞাসু মনের খোরাক হবে। মানুষকে বারবার কষ্ট হ'তে রেহাই দেবে এবং বন্ধুদের কাছেও একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে।"[৪১]

লক্ষণীয় যে, এখানে মূল বিষয়বস্তু হিসাবে ধরা হয়েছে হাদীছের অনুসরণ বনাম প্রচলিত মাযহাবী ফিক্হের অনুসরণ। লোকেরা নিশ্চয়ই এ দু'টি বিষয়কে এক বস্তু ধরে নিয়েছিল। আর এই ভুল ধারণা দূর করাই ছিল মাওলানা বেলায়েত আলীর অত্র পুস্তিকা রচনার মূল উদ্দেশ্য। এই পুস্তিকায় তিনটি অধ্যায় রয়েছে। ১ম অধ্যায় দ্বীনের বুঝ ও তার ফযীলতের উপরে। ২য় অধ্যায় তাকলীদ জায়েয হওয়া না হওয়া সম্পর্কে এবং ৩য় অধ্যায় কুরআন ও হাদীছ সহজবোধ্য হওয়া সম্পর্কে। প্রথম অধ্যায়ে দ্বীনের বুঝ হাছিল করার ফযীলত ও তাৎপর্য বর্ণনা করার পর কুরআন ও হাদীছে চিন্তা ও গবেষণা করার বিষয়ে লোকদের কার্যপদ্ধতির সমালোচনা করে তিনি বলেন-

"কুরআন ও হাদীছকে দেখা ও গবেষণা করার বিষয়টি লোকেরা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে এবং কোন কথা কোন ফিক্হের কিতাবে দেখলেই তা কুরআন ও হাদীছের সপক্ষে না বিপক্ষে তার বাছবিচার না করেই বিশ্বাস করে নিচ্ছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক তো কুরআন-হাদীছের পাতা উল্টেও দেখেনা। কিছু লোক দেখলেও তা বুঝতে চেষ্টা করেনা। কিছু লোক বুঝলেও তা কেবল কিয়ামত, বরযখ, দুনিয়া ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ক নছীহতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। শরীয়তের হুকুম-আহকাম বিষয়ে তাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, আগেকার ফক্বীহগণ এসব বিষয়ে গবেষণা শেষ করেছেন। অতএব এদিকে মনোযোগ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তারা যদি কুরআন ও হাদীছে তাদের মাযহাবী কিতাবের খেলাফ কোন হুকুম দেখতে পান, তবে তাদের কেউ কেউ কুরআন-হাদীছের প্রকাশ্য অর্থকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেদের কিতাবের সপক্ষে করে নেন। কিন্তু এটা বুঝতে চান না যে, কুরআন ও হাদীছের তাবেদারী করাই হ'ল মূল উদ্দেশ্য। কেউ কেউ এসব ব্যাপার হ'তে পালাতে চান এবং চোখ বুঁজে থাকেন। এইসব জ্ঞানীদের সম্পর্কে খোদ রাসূলে করীম (ছাঃ) বলেন, (رب حامل فقه غير فقيه) 'অনেক ফকীহ আছেন যারা প্রকৃত অর্থে 'ফক্বীহ' বা জ্ঞানী নন।' আল্লাহ পাক আমাদেরকে এদের অনিষ্টকারিতা হ'তে রক্ষা

করুন।'[৪২]

দ্বিতীয় অধ্যায়ে **'তাকলীদ'** সম্পর্কে তিনি বলেন-

"যে ব্যক্তি নিরক্ষর লেখাপড়া জানেনা, আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করা ভিন্ন যার কোন উপায় নেই, তিনি হাদীছ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ (علماء محدثين) কোন আলেম যিনি দ্বীনদার, আল্লাহ-ভীরু, কুরআন ও হাদীছের জ্ঞানে প্রসিদ্ধ, তাঁর কাছে গিয়ে এভাবে মাসআলা জিজ্ঞেস করবেন যে, আমাকে এই মাসআলায় 'মুহাম্মাদী' তরীকা বাৎলিয়ে দিন।"[৪৩]

অর্থাৎ মাওলানা বেলায়েত আলীর নিকট কোন জাহিলের জন্যও তাকলীদ যরূরী নয়। মুকাল্লিদগণের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তিনি কাউকে তার মাযহাবী ফিক্বহ অনুযায়ী ফৎওয়া চাওয়ার বিরোধিতা করছেন এবং নির্দিষ্ট কোন ফকীহ নয় বরং যে কোন মুহাদ্দিছ আলেমের নিকট হ'তে মুহাম্মাদী তরীকা অনুযায়ী ফৎওয়া চাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। বেলায়েত আলীর সময়ে আহলেহাদীছগণ 'মুহাম্মাদী' নামেই পরিচিত ছিলেন। এরপরে তিনি বলেন- "মুজতাহিদগণের কিতাবে যদি খেলাফ কিছু বেরিয়ে আসে, তবে সেদিক থেকে দৃষ্টি উঠিয়ে নিয়ে কুরআন ও হাদীছকে আক্‌ড়িয়ে ধরা অবশ্য কর্তব্য। নইলে মুজতাহিদ ইমামগণের কথা দ্বারা কুরআন-হাদীছ 'মানসূখ' হওয়ার শামিল হবে।"[৪৪] এরপর তিনি বলেন-

"হাদীছসমূহের সনদ বা বর্ণনাসূত্র রয়েছে। কিন্তু মুজতাহিদগণের কথার কোন সনদ নেই। ..... ইমামদের নিকট হ'তে প্রথম কে শুনলেন, তারপর তাঁর কাছ থেকে কে শুনলেন, তাদের জীবনবৃত্তান্ত কেমন, এসব বিষয়ে বর্ণনাকারীদের পুরা অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত শর্তানুযায়ী ওয়াকিফহাল না হওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐসব কথারই বা কি মূল্য আছে? কে জানে যে এগুলি ইমামের কথা না অন্য কেউ নিজের পক্ষ হ'তে জুড়ে দিয়েছে? যেমন কতগুলি নাদান ধোকাবশতঃ কতগুলি ডাহা মিথ্যা কথা ইমাম আযমের দিকে সম্পর্কিত করে থাকে। দ্বিতীয় আরেকটি কারণ, সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপরে একমত যে 'মুজতাহিদের রায় কখনো ভুল হয়, কখনো সঠিক হয়।' অতএব বুঝা গেল হাদীছ-যা একজন মাছূম রাসূলের সনদযুক্ত বাণী, তার মুকাবিলায় এমন কথা যা বে-সনদ ও ত্রুটির আশংকাযুক্ত, তার কোনই মূল্য নেই।"[৪৫]

মুকাল্লিদগণ প্রকাশ্য হাদীছের বিরোধিতা করার পক্ষে সাধারণতঃ যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, আমাদের ইমাম ছাহেবও নিশ্চয়ই অন্য কোন একটি হাদীছের উপরে তাঁর মযহাবের ভিত্তি রেখেছেন। এবিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে মাওলানা বেলায়েত আলী বলেন- "মুজতাহিদগণের বহু কথা যে হাদীছের খেলাফ পাওয়া যায়, তার কারণ এই যে, তাঁদের সময়ে হাদীছসমূহ বিক্ষিপ্ত ছিল। যে সবের নিয়মমাফিক সংকলন তখনও পর্যন্ত হয়নি। সেকারণে তাঁদের সম্মুখে সমস্ত হাদীছ মওজুদ ছিলনা। আর এজন্যে তাঁরা ইজতিহাদ ও কিয়াসের ব্যাপারে বাধ্য ছিলেন।"[৪৬] তাঁর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি তাকলীদী সংকীর্ণতার উর্ধে থেকে আমল বিল-হাদীছের প্রতি লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যা আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের বক্তব্যের সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

এরপরে আমরা মাওলানা বেলায়েত আলী রচিত 'তায়সীরুছ ছালাত' (تيسير الصلوة) বা সহজ ছালাত শিক্ষা পুস্তিকার প্রতি নযর দেব। সেখানে তিনি বিভিন্ন হাদীছের বরাতে আহ্‌লেহাদীছদের গৃহীত মাসআলা সমূহের প্রচার করে গিয়েছেন। যেমন ওযু ও ছালাতের শুরুতে মুখে প্রচলিত আরবী নিয়ত পাঠ বিদ'আত হওয়া, দুইটি বড় মশকভরা (قليتين) পানি রং, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত পাক থাকা, দুধপানকারী ছেলের পেশাব কাপড়ে লাগলে পানির ছিটা ও মেয়ের পেশাব লাগলে কাপড় ধুয়ে ফেলা, সফরের হালতে দুই অক্তের ছালাত প্রথম ছালাতের আউয়াল ওয়াক্তে বা শেষ ওয়াক্তে জমা করে পড়া, ছালাতে জানাযায় সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা, গায়েবানা জানাযা আদায় করা ইত্যাদি।

মাওলানা বেলায়েত আলীর অন্যতম পুস্তিকা হ'ল 'রিসালা-ই-দাওয়াত' (رساله دعوت)। উর্দূ ভাষায় লিখিত এই পুস্তিকায় তিনি নিজেদের জামা'আতকে 'মুহাম্মাদী' (محمدى) হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং সকল মুসলমানকে উক্ত জামা'আতে শামিল হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

উক্ত বইতে কতকগুলি বিষয় লক্ষণীয়- (১) তিনি নিজের দলকে 'মুহাম্মাদী দল' (گروه محمدى) বলেছেন। যেকোন বিদ্বান জানেন যে, মুহাম্মাদী, সালাফী, আহলেহাদীছ সব একই দলকে বলা হয়ে থাকে। মুকাল্লিদগণ উক্ত নামে

অভিহিত হন না। (২) শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে ছিল এ দলের আপোষহীন সংগ্রাম। আহলেহাদীছগণ এব্যাপারে আজও অনুরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকেন। (৩) পীর-মুরীদী ও ধর্মব্যবসার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে কুরআন-হাদীছ পরিত্যাগ করার জাহেলী রীতির বিরোধিতা। আজও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আহলেহাদীছগণ এ ব্যাপারে সোচ্চার।

মাওলানা বেলায়েত আলীর উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ তাঁর মুকাল্লিদ হওয়ার প্রমাণ বহন করেনা।

মাওলানা বেলায়েত আলীকে 'হানাফী' প্রমাণ করার জন্য সচরাচর তাঁর একটি উক্তিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে, যেখানে তিনি নিজেকে حنفى المذهب বা 'হানাফী' বলেছেন। কিন্তু যে অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি নিজেকে হানাফী বলেছেন, সেটা যদি পুরা সামনে রাখা যায়, তাহ'লে আসল সত্যটি খুব সহজে বেরিয়ে আসবে। আমরা এখানে 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ্' থেকে পুরা উদ্বৃতিটাই নকল করব। মাওলানা বেলায়েত আলীর জীবনীকার ভাতিজা মাওলানা আবদুর রহীম ছাদেকপুরী বলেন-

'এই সত্যদলের সনৈঃ সনৈঃ তারাক্কী ও কুরআন-হাদীছের প্রচার দেখে সংকীর্ণ দৃষ্টির লোকেরা মৌলবী মুহাম্মাদ ফছীহ গাযীপুরীকে দু'হাযার টাকা পুরস্কার দেওয়ার ওয়াদা করে হকপন্থী ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে বিতর্ক ও মুনাযারার জন্য দা'ওয়াত করে। মুনাযারার দিন মাওলানা এনায়েত আলী মৌলবী মুহাম্মাদ ফছীহ ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিমন্ত্রণ করেন। বহু আলেম-ফাযেল ও গণ্যমান্য লোক জমায়েত হন। মাওলানা বেলায়েত আলী মৌলবী মুহাম্মাদ ফছীহকে পৃথক একটি কামরায় ডেকে নিয়ে কয়েকজন লোকের উপস্থিতিতে বলেন, "আমি হানাফী (میں حنفی المذهب هوں) এবং এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, যদি কোন হানাফী কোন গায়র মানসূখ প্রকাশ্য হাদীছ দেখে কোন ফেক্‌হী মাসআলার খেলাফ আমল করে, তবে সে ব্যক্তি হানাফী মাযহাব হ'তে খারিজ হয় না।" যেমন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন "রাসূলের হাদীছের মুকাবিলায় আমার কথা পরিত্যাগ কর (أتركوا قولى بخبر الرسول)।"

মাওলানা বেলায়েত আলীর উক্ত বক্তব্যে মৌলবী মুহাম্মাদ ফাছীহ নিশ্চিন্ত হন এবং বেরিয়ে এসে জোরেশোরে ঘোষণা দেন যে, এই জামা'আত হক-এর উপরে আছে। হাদীছের উপরে আমল করার কারণে কেউ হানাফিয়াত থেকে খারিজ হয়ে যায় না।' এতে মৌলবী ছাহেবের দা'ওয়াতকারী মুকাল্লিদ শিষ্যগণ মোটেই খুশী হননি বরং মৌলবী ছাহেব ফিরে এলে তাঁকে দারুণভাবে অপমানিত ও লজ্জিত করা হয়।[৪৭]

উপরোক্ত আলোচনার প্রতি দৃষ্টি দিলে একথা প্রতীয়মান হয়ে যে, মাওলানা বেলায়েত আলী এখানে নিজেকে হানাফী এজন্য বলেছেন যে, তিনি ইমাম আবু হানীফার নির্দেশ অনুযায়ী হাদীছবিরোধী মাসআলাগুলি ত্যাগ করে হাদীছ অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রকৃত হানাফী তিনিই যিনি হাদীছ অনুযায়ী আমল করেন। এটা নয় যে, সাধারণ হানাফীদের মত ফিক্‌হের কিতাব সমূহে লিখিত ভুল-শুদ্ধ সবকিছুর তিনি অন্ধ তাকলীদ করতেন। এটা বরং ইমাম আবু হানীফার উপরোক্ত নির্দেশের স্পষ্ট বিরোধিতার শামিল। এখানে মাওলানা বেলায়েত আলীর উক্ত বক্তব্যটি তর্কের খাতিরে সাময়িক স্বীকৃতি বৈ কিছুই নয়। যেমন সাধারণতঃ তর্কস্থলে বলা হয়ে থাকে।

মাওলানা বেলায়েত আলী স্বীয় উস্তায আল্লামা ইসমাঈল (রহঃ)-এর ন্যায় আহলেহাদীছ ছিলেন এবং তাঁর ও তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতা মাওলানা এনায়েত আলীর দা'ওয়াত ও তাবলীগের ফলে বিশেষ করে হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), বিহার ও বাঙলায় ব্যাপক হারে আহলেহাদীছ মাসলাক ছড়িয়ে পড়ে। মাওলানা আবদুর রহীম ছাদিকপুরী মাওলানা এনায়েত আলী সম্পর্কে বলেন-

"তিনি প্রথমবারে একটানা সাত বৎসর বাংলাদেশ এলাকার গ্রামে গ্রামে অবর্ণনীয় কষ্ট ও ধৈর্য সহকারে সফর করেন ও লাখো মানুষের অন্ধকার হৃদয়ে আলোর চেরাগ জ্বালিয়ে দেন। সকলকে কুরআন ও হাদীছের ইত্তেবার প্রতি আকৃষ্ট করেন। তাঁর অনুসারীগণ আজও বাংলা অঞ্চলে 'মুহাম্মাদী' লকবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত রয়েছেন।"[৪৮]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮) ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে একবার বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। সেই সময় তিনি দুমকা ও মুর্শিদাবাদ যেলার

বিভিন্ন এলাকা যেমন দিলালপুর, ইসলামপুর, জঙ্গীপুর, নারায়ণপুর ইত্যাদি গ্রাম সফর করেছিলেন। ফিরে গিয়ে তিনি স্বীয় পত্রিকা 'আখবারে আহ্‌লেহাদীছ'-য়ে নিজের সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনার এক পর্যায়ে বলেন-

"আমি এই সফরে একটি কথাই কেবল চিন্তা করেছি যে, বাংলাদেশে আহলেহাদীছের এত সংখ্যাধিক্য কিভাবে হ'ল? জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, এসবই মাওলানা এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর আন্দোলনেরই বরকত।"[৪৯]

কোন হানাফী মুকাল্লিদের তাবলীগের ফলে লোকেরা তাকলীদ ছেড়ে আহলেহাদীছ না হওয়াটাই স্বাভাবিক। অতএব মাওলানা বেলায়েত আলী, ছাদেকপুরী পরিবার ও তাঁদের অনুসারী মুজাহিদগণের অধিকাংশই জিহাদ আন্দোলনের সাথে সাথে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনেও যে অবদান রেখেছিলেন, তা বলা যেতে পারে।

৩- মাওলানা এনায়েত আলীর ২য় ইমারত (১২৬৯-৭৪/১৮৫২-১৮৫৮ খৃঃ)ঃ

বালাকোট বিপর্যয়ের পর বড়ভাই বেলায়েত আলীর নির্দেশে মাওলানা এনায়েত আলী দীর্ঘ সাত বছর বা তার বেশী সময় যাবত বাংলাদেশের যশোর বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা হতে বৃহত্তর খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, মালদহ, নদীয়া প্রভৃতি এলাকায় দা'ওয়াত ও তাবলীগে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময় উত্তর ২৪ পরগনার হাকিমপুর কেন্দ্রে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন হাজী মুফীযুদ্দীন খাঁ ও মদন খাঁ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল মসজিদ নির্মাণ ও সেখানে ইমাম নিয়োগ করা। ইমামদেরকে নিয়মিত ছালাতের ইমামতি ছাড়াও এলাকার গন্ডগোল মীমাংসার দায়িত্ব দেওয়া হ'ত। যাতে কোন মুসলমান ইংরেজের আদালতে বিচার না নিয়ে যায়। এইভাবে তাঁরা দু'ভাই একপ্রকার অঘোষিত সরকার পরিচালনা করেছিলেন।[৫০] ১৮৪৭ হ'তে দু'বছর নযরবন্দী থাকাকালীন সময়েও তিনি বাংলাদেশে তাবলীগী সফরে থাকতেন। ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারীতে সিত্তানার ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে ছিলেন বলে ধারণা করা যায়।[৫১]

বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পরে সিত্তানা ঘাঁটিতে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি দ্বিতীয়বার আমীর

নির্বাচিত হন। অতঃপর এই ঘাঁটি রেখে দিয়েই তিনি পার্শ্ববর্তী মঙ্গলথানায় 'দারুল ইমারত' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মাওলানার এই ২য় ইমারতকাল ১ম ইমারতকাল (১২৫৯-৬২/১৮৪৩-৪৬ খৃঃ) -এর ন্যায় গৌরবময় ছিলনা। একদিকে বাইরের চাপ অন্যদিকে তাঁর সুহৃদ মঙ্গলথানার দুই সর্দারের মধ্যে আপোষ দ্বন্দ্ব, আযাদীপাগল সুহৃদ সিত্তানার সর্দার সাইয়িদ আকবর শাহের মৃত্যু এবং অন্য সর্দারদের চিরাচরিত সুবিধাবাদী নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতায় অতিষ্ঠ হয়ে অধিকাংশ মুজাহিদ এমনকি নিজের ভাই ও পরিবারবর্গ মাওলানাকে ছেড়ে হিন্দুস্থানে ফিরে এসেছিলেন।[৫২] এরই মধ্যে ১৮৫৭ সালের ২৯ শে মার্চ কলিকাতার নিকটে বহরমপুর ও ব্যারাকপুরে বিপ্লবের মাধ্যমে যে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয় এবং পরে ১০ই মে তারিখে মীরাটে কয়েদীমুক্তি ও ইংরেজ অফিসার হত্যার মাধ্যমে যা সর্বভারতীয় রূপ লাভ করে, ঐ সময় ২০শে জুলাই তারিখে মাওলানা নারেঞ্জী নামক স্থানে ইংরেজদের উপরে প্রচন্ড হামলা পরিচালনা করেন। অতঃপর শেখজানা ও শীওয়া নামক স্থানে তাদের উপরে হামলা করেন।[৫৩] ইংরেজরা প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ইংরেজরা তখন এই সহায়-সম্বলহীন মুষ্টিমেয় গাযীদেরকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হয়। ঘুষ ও কুটনীতির মাধ্যমে সর্দারদেরকে হাত করা হয়। ছাদিকপুর কেন্দ্রের উপরে এবং রসদ আনার সম্ভাব্য সকল পথে কড়া পাহারা বসানো হয়।[৫৪] ফলে একপ্রকার নিঃস্ব অবস্থায় মুজাহিদগণ একটি প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যেতে থাকেন। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে মাওলানার অনুমতি নিয়ে একসময় মাত্র চারজন বাদে সকল গাযী মাওলানাকে ছেড়ে যায়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৮ হ'তে অনাহার শুরু হয়। গাছের ছাল-পাতা সম্বল হয়।[৫৫] অতঃপর প্রচন্ড জ্বর ও অনাহারক্লিষ্ট অবস্থায় মঙ্গলথানা হতে চানাই যাওয়ার পথে ৭ই শা'বান ১২৭৪ মোতাবেক ২৩শে মার্চ ১৮৫৮-তে চানাই পাহাড়ের চড়াইয়ে ৬৭ বৎসর বয়সে মাওলানা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৫৬] ইন্নালিল্লাহে ....রাজি'উন। তাঁর মৃত্যুর পরপরই ব্যাপক ও লাগাতার ইংরেজ হামলায় পাঞ্জতার, চাংগালাই, মঙ্গলথানা ও সিত্তানার ঘাঁটিসমূহ একে একে ধ্বংস হয়ে যায়।[৫৭]

মাওলানা এনায়েত আলীর ব্যক্তিত্বঃ মাওলানার কর্মোদ্দীপনা ছিল কিংবদন্তীর

মত। যেকাজেই তাঁকে লাগানো হ'ত, সেকাজেই তিনি সেরা প্রমাণিত হ'তেন। যখন থেকেই তিনি আমীর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও আল্লামা ইসমাঈল (রহঃ)-এর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তখন থেকেই এই জমিদারপুত্র সকল আরামকে হারাম করে আমীরের নির্দেশ মোতাবেক দা'ওয়াত ও জিহাদের পথে জানমাল ওয়াক্ফ করে দেন। তাঁর দা'ওয়াতী তৎপরতার প্রায় সবটুকু সময় কেটেছিল বাংলাদেশ অঞ্চলে। দুইবারে প্রায় একযুগ বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে শিরক ও বিদ'আতে নিমজ্জিত মুসলিম সমাজে তিনি যে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন, তার তুলনা হয় না। ফলে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত সীমান্তের সশস্ত্র জিহাদে বাংগালী মুসলমানেরাই অধিক সংখ্যায় যোগদান করে, যা তাঁর মৃত্যুর পরেও জারি থাকে। বাংলাদেশে সর্বাধিক সংখ্যক আহলেহাদীছ থাকার মূলে তাঁরই অবদান ছিল সবচাইতে বেশী। তাঁর সংস্কার কার্যক্রমের মধ্যে একটি ঘটনা নিম্নরূপঃ

একদা পাবনা শহরে তাবলীগে এসে তিনি 'চাপা মসজিদে' ওঠেন। সেদিন ছিল মাদার পীরের বাঁশ উঠানো উৎসব। ঢাকঢোল পিটিয়ে বিরাট আকারে উৎসব চলছিল। মাওলানা সোজা উৎসবমঞ্চে উঠে গিয়ে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে এক দরদমাখা জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। উৎসবের হোতা গাদল খাঁ সহ উপস্থিত শত শত লোক তওবা করে মাওলানার হাতে বায়'আত করেন। পাবনার রাধাকান্তপুরের উক্ত গাদল খাঁ ও তার পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ আলী খাঁ আজীবন জিহাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন।[৫৮]

জীবনের শেষ ধাপে এসে মাওলানা এনায়েত আলী একথা প্রমাণ করে গিয়েছেন যে, জিহাদের পথ ফুলশয্যার পথ নয়, এ পথ দারুণভাবে কাঁটাবিছানো পথ। জিহাদের খুনরাঙা পথ বেয়েই আসে মানবতার মুক্তি, আসে জান্নাতের সুবাতাস। মূলতঃ এই গাযীদের রক্ত পিচ্ছিল পথ বেয়েই এসেছিল ১৯৪৭-এর রক্তিম স্বাধীনতা।

৪- আমীর আবদুল্লাহ্ বিন বেলায়েত আলী (১২৭৮-১৩২০/১৮৬২-১৯০২)ঃ

১৮৫৮ সালের ২৩শে মার্চ আমীর মাওলানা এনায়েত আলীর মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া ইমারত বোর্ডের প্রধান মাওলানা নূরুল্লাহ কাবুল যাওয়ার পথে

মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী সদস্য মাওলানা শাহ ইকরামুল্লাহ ইংরেজ ও স্থানীয় গাদ্দার পাঠান মুসলিম বাহিনীর সম্মিলিত হামলায় ত্রিশজন সাথীসহ ৪ঠা মে তারিখে সিত্তানা ঘাঁটিতে শহীদ হন।[৫৯] এই সময় মাওলানা মাকছূদ আলী আযীমাবাদী সীমান্তে এসে পৌঁছলে বেঁচে যাওয়া মুজাহিদগণ তাঁকে আমীর হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৮৬২ সালে তিনি অর্শরোগে মারা যান। ঘাঁটির দুর্দশার খবর পেয়ে মাওলানা বেলায়েত আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আবদুল্লাহ (১২৪৬-১৩২০/১৮৩১-১৯০২) সপরিবারে সীমান্তে পৌঁছে যান এবং সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে 'আমীর' হিসাবে বরণ করে নেন। তিনি দীর্ঘ ৪০ বৎসর আমীর ছিলেন এবং এটাই ছিল পরবর্তী জিহাদ আন্দোলনের স্বর্ণযুগ।[৬০]

তাঁর ইমারতকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল আম্বেলা যুদ্ধ।[৬১] ১৮৬৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর সংঘটিত এই স্মরণীয় যুদ্ধে মুল্‌কা মুজাহিদ ঘাঁটির পতন ঘটে। ইংরেজ সেনাপতি চেম্বারলীনের নেতৃত্বে ইংরেজ ও গাদ্দার স্থানীয় বাহিনী আম্বেলার পথ ধরে এগিয়ে আসে। এই যুদ্ধে ১০,০০০ হাযার ইংরেজ বাহিনী ছাড়াও হান্টার-এর মতে স্থানীয় গোত্রীয় বাহিনী ছিল ৫৩,৫০০ শত। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী সাইয়িদ আবদুল জাব্বার সিত্তানবীর সঠিক হিসাব মতে ছ'টি স্থানীয় মুসলিম গোত্রের মোট যোদ্ধাসংখ্যা ছিল ৬৪,২৫০। পক্ষান্তরে মুজাহিদবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র বার থেকে চৌদ্দশোর মধ্যে।[৬২] মুজাহিদগণের দশটি জামা'আতের ৯টি ছিল হিন্দুস্থানী ও ১টি ছিল স্থানীয়। কিন্তু হিন্দুস্থানীদের অধিকাংশই ছিলেন বাংগালী মুজাহিদ। খোদ আমীর আবদুল্লাহ যে 'জামা'আতে আবদুল গফূর'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাকে 'সরকারী জমঈয়ত' বলা হ'ত, তার সকলেই ছিলেন বাংগালী।[৬৩] গোলাবারুদ ও আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত প্রায় পৌনে এক লক্ষ শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ অস্ত্রের অধিকারী কিঞ্চিদধিক হাযার খানেক মুজাহিদের এই অসমযুদ্ধে ২৩৮ জন ইংরেজ অফিসারসহ মোট ৩০০০ হাযার শত্রু সৈন্য নিহত ও ৪০০ শত মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।[৬৪] এই লড়াইয়ে আমীর আব্দুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী যে অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন, তা জিহাদের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। স্থানীয় পাঠান সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকতা ও লোভী চরিত্রই ছিল এই যুদ্ধে মুজাহিদগণের পরাজয়ের মূল কারণ।

মুল্কার পতনের পর আশ্রয়হারা ৭/৮ শত মুজাহিদ বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু সর্বত্র স্থানীয় খান ও আফগানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা একে একে আটবার ঘাঁটি পরিবর্তনে বাধ্য হন। ১৮৯১ সালের মার্চ মাসে 'গাযীকোট' যুদ্ধের পর আমীর আব্দুল্লাহ স্বয়ং বিভিন্ন গোত্রের নিকটে সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হ'য়ে অবশেষে ব্যাকুল মনে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেন। 'মুবারক খেল'-এর 'টিলওয়ারী' নামক যে টীলার উপরে বসে তিনি এই কাতর প্রার্থনা করছিলেন, হঠাৎ করে তা ভূমিকম্পের ন্যায় দুলে ওঠে। স্থানীয়রা এতে ভীত হ'য়ে তাঁর নিকটে দৌড়ে এসে ক্ষমা চায় ও আজীবন সেখানে থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করে।[৬৫] আমীর আবদুল্লাহ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করে জিহাদ পরিচালনা করেন। এখানে ১৩২০ হিজরীর ২৭শে শা'বান মোতাবেক ১৯০২ সালে ২৯শে নভেম্বর ৭৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৬৬]

৫- আমীর আবদুল করীম বিন বেলায়েত আলী (১৩২০-৩৩/১৯০২-১৫)ঃ

আমীরুল মুজাহিদীন আমীর আব্দুল্লাহ্র ইন্তেকালের পর তাঁর ছোট ভাই মাওলানা আবদুল করীম বিন বেলায়েত আলী (১২৫৫-১৩৩৩/১৮৩৮-১৯১৫) মুজাহিদগণের আমীর নির্বাচিত হন। তিনি 'টিলওয়ারী' ছেড়ে 'আসমাস্ত' গিয়ে ১৯০২ সালে নতুন ঘাঁটি নির্মাণ করেন।[৬৭] তিনপাশ দিয়ে প্রবাহিত বরেন্দু নদী ও পাহাড় ঘেরা সমতল এই নির্জন স্থানটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। এখানকার মাটিও ছিল বেশ উর্বর। ফলে মুজাহিদদের চাষ-বাসের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এখানে মুজাহিদগণের প্রায় সবাই ছিলেন বাংগালী ও বিহারী।[৬৮]

আমীর আবদুল করীম-এর সময়ে (১৯০২-১৯১৫) ছোটখাট যুদ্ধ সংঘটিত হ'লেও তার কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সেই সময় হিন্দুস্থানের অভ্যন্তরে যথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছিল। সাইয়িদ আহমাদ ও আল্লামা ইসমাঈল গোলামীর শৃংখল ভাঙার যে তূর্যধ্বনি করে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, তা ক্রমে জনমনে স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে এবং হিন্দুস্থানের সর্বত্র বৃটিশ বিতাড়ন ও স্বাধীনতা অর্জনের ঢেউ ওঠে। মুজাহিদনেতা হিসাবে আমীর আবদুল করীম সকল হিন্দুস্থানী মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। বিশেষ করে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ

ও ঘনিষ্টতা ছিল সুনিবিড়। একবার মুজাহিদগণের জন্য একজন বিশ্বস্ত ডাক্তারের প্রয়োজন-একথা জানিয়ে আমীর আব্দুল করীম সংবাদবাহক পাঠালে মাওলানা আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) একজন মেডিকেল ছাত্র যে তখনও শেষ ডিগ্রী হাছিল করেনি, তাকে আসমাস্ত পাঠিয়ে দেন।[৬৯]

মাওলানা আবদুল করীম ১৩৩৩ হিজরীর ২৫শে রবীউল আউয়াল মোতাবেক ১৯১৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ফজরের ওয়াক্তে 'আসমাস্ত'-এ মারা যান ও ঘাঁটির কবরস্থানে সমাহিত হন। তিনি মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী ও আমীর আবদুল্লাহ পরিচালিত জিহাদী কাফেলার সর্বশেষ নেতা ছিলেন, যাঁর মৃত্যুর ফলে ইমারতের সেই পবিত্র ভাবমূর্তি ও যুগ শেষ হয়ে যায়, যার গোড়াপত্তন হয়েছিল সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহঃ)-এর হাতে।

পরবর্তীতে যে যুগ শুরু হয় তা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক হ'তে উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নতর ছিল। কারণ প্রথমতঃ আমীর আবদুল করীম যে পরিবেশে লালিত হয়েছিলেন, পরবর্তীগণ সে পরিবেশ পাননি। ২য়তঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল- যা পূর্বে ছিল না। আমীর আব্দুল করীম হাফেযে কুরআন ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় তেলাওয়াত ও ছালাতে নিমগ্ন থাকতেন। সুদক্ষ ও শক্তিশালী এই নেতা সারাটি জীবন ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ ও লড়াইয়ে ব্যয় করেছেন। প্রথম জীবনে চাচা এনায়েত আলীর ঝান্ডাতলে ও পরে বড় ভাই আমীর আবদুল্লাহ্র নেতৃত্বে এবং জীবনের শেষ বারো বছর নিজেই মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তাঁর দিন কাটতো দ্বীনে হক-এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় এবং রাতগুলি অতিবাহিত হ'ত স্বীয় প্রভুর হুযুরে রুকু-সিজদা ও তেলাওয়াতের মধ্যে।[৭০]

৬-আমীর নে'মাতুল্লাহ বিন মুতীউল্লাহ বিন আমীর আব্দুল্লাহ (১৩৩৩-৩৯/১৯১৫-২১)ঃ

আমীর নেয়ামাতুল্লাহ্র সময়ে মুজাহিদ আন্দোলনের শতবর্ষব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গিতে এক দুর্ভাগ্যজনক পরিবর্তনের সূচনা হয়। যার পরিণতিতে স্বয়ং আমীর নেয়ামাতুল্লাহ্কে স্বদলীয়দের হাতে জীবন দিতে হয়। তিনটি প্রধান কারণে আমীর নেয়ামাতুল্লাহ (১২৯৪-১৩৩৯/১৮৭৭-১৯২১) ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি

করেছিলেন বলে জানা যায়। তার মধ্যে দু'টি ছিল ইংরেজ রেভিনিউ কমিশনারের কুঠি লুট করা ও পরবর্তীতে দু'জন ইংরেজ সেনা-অফিসারকে গুলি করে হত্যা করা। এ দু'টি বিষয় জিহাদের দৃষ্টিকোণ হ'তে সঠিক হ'লেও ইংরেজ তোষণকারী আম্ব-এর সর্দার ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং লুট করা অর্থসহ হত্যাকারী দু'জন মুজাহিদকে ইংরেজের হাতে সোপর্দ করে দেন। তৃতীয় কারণটি ছিল ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে দু'জন বাংগালী মুজাহিদ যারা ঘাঁটিতে আসার পথে দশ হাযার টাকাসহ ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন।[৭১]

উপরের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে আমীর নেয়ামাতুল্লাহ হয়তবা সন্ধির চিন্তা করে থাকবেন। জিহাদের ঘটনাবলীর সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত লেখক সাইয়িদ আবদুল জাব্বার সিত্তানবী বলেন, আমি নিজে এবং আরও অনেকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত দু'জন মুজাহিদ ও দশহাযার টাকা ফেরতদানের জন্য চিঠি লিখি। আমাদের এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ উক্ত টাকা ফেরত দানের সাথে সাথে সম্ভবতঃ বার্ষিক দশ হাযার টাকা অনুদান হিসাবে আমীর ছাহেবের হাতে অর্পণ করে থাকবে।[৭২]

এই ব্যবস্থার ফলে মুজাহিদগণের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এলেও তাদের উদ্যমে ভাটা পড়ে। কারাকোরাম হ'তে রাসকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড় ও জংগলবেষ্টিত এই বিরাট স্বাধীন ভূমিতে কোটি কোটি জনগণের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু মুজাহিদ, যাদের সংখ্যা কখনোই ১২/১৪ শো'র বেশী ছিল না, তাদের সংগঠিত এই জিহাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজশক্তি সর্বদা ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। শুধু একটি কারণে যে, তারা কোন অবস্থাতেই কুফরী ও বাতিল শক্তির সঙ্গে আপোষ করবেনা। যদি আপোষ করাই তাদের উদ্দেশ্য থাকৃত, তবে হিন্দুস্থানে বসেই তারা অন্যান্যদের মত সুবিধা ভোগ করতে পারত। জানমাল বিসর্জন দিয়ে সুদূর আফগান সীমান্ত এলাকায় এসে পাহাড়ে-জংগলে বেঘোরে প্রাণ দিত না। মাত্র ১২/১৪ শত মুজাহিদ কখনোই একটা প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকে পরাস্ত করতে পারে না- একথা যথার্থ হ'লেও ইসলাম যে কখনোই কুফরের সঙ্গে সন্ধি করতে পারেনা একথা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য মুজাহিদগণের এই আত্মত্যাগ ইসলামী মর্যাদাবোধের প্রতীক ছিল। আর সেজন্যেই সারা হিন্দুস্থানের আপামর মুসলিম জনসাধারণ মুজাহিদগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। যদিও ইংরেজ

তোষণকারী ও মুজাহিদগণের বিরোধী লোকের সংখ্যা কখনই কম ছিল না।

যাইহোক আমীর নেয়ামাতুল্লাহ্‌র এই পদক্ষেপ মুজাহিদগণের আত্মমর্যাদাবোধে ভীষণ আঘাত হানে। সাথে সাথে হিন্দুস্থানের অনেক সাহায্যকারী ও হাত গুটিয়ে নেন। পরিণামে ১৩৩৯ হিজরীর ২৬শে শা'বান মোতাবেক ১৯২১ সালের ৪ঠা মে রবিবার সকালে ঘাঁটির একটি ঘরের ছাদের নির্মাণকাজ তদারকির সময় নিজের বিশ্বস্ত সাথী আব্দুর রশীদ ওরফে মুহাম্মাদ ইউসুফের গুলিতে তিনি নিহত হন।[৭৩] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৫ বছর।

আমীর নেয়ামাতুল্লাহ্‌র সময়ে ছোটবড় অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে ইংরেজ ক্যাম্প রুস্তম-এর যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই যুদ্ধে মুজাহিদগণ এককভাবে ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। ইংরেজ পক্ষে ৬০০ শত সৈন্য হতাহত হয় এবং মুজাহিদপক্ষে মাত্র দশজন শহীদ ও ছয়জন আহত হন।[৭৪]

৭-আমীর রহমাতুল্লাহ (১৩৩৯-১৩৬৮/১৯২১-১৯৪৯ খৃঃ)ঃ

আমীর নে'মাতুল্লাহ্‌র শাহাদাতের পর তদীয় শ্যালক মৌলবী রহমাতুল্লাহ বিন আমানুল্লাহ বিন আমীর আবদুল্লাহ সর্বসম্মতিক্রমে আসমাস্ত কেন্দ্রে আমীর নির্বাচিত হন।[৭৫] ইনি আমীর আব্দুল করীম (১৩২০-৩৩/১৯০২-১৫)-এর নিকট লেখাপড়া শিখেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাক্‌ওয়া-পরহেযগারী, ত্যাগ ও কুরবাণীতে অতুলনীয় ছিলেন। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন। নিরিবিলি ও সাধাসিধা জীবন পসন্দ করতেন। কাশ্মীরের স্বাধীনতাযুদ্ধে মুজাহেদীন জামা'আত নিয়ে তিনি নিজে শরীক হন।[৭৬] তাঁর সময়ে মৌলবী বরকতুল্লাহ বিন আমীর নে'মাতুল্লাহ 'সালারে জামা'আত' বা প্রধান সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[৭৭]

আমীর রহমাতুল্লাহ্‌র সময়ে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় ছিল পত্রিকা প্রকাশ করা। যুগের পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী তাবলীগের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে জামা'আতের নিজস্ব প্রেস হ'তে দু'টি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। 'আল-মুহার্‌রিয' (المحرض) পত্রিকাটি ১৯৩৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর ১ম সংখ্যা বের হয়। যার শিরোনামে লেখা ছিল يا ايها النبى حرض المؤمنين على القتال 'হে নবী আপনি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করুন'-আনফাল ৬৫। দ্বিতীয়টি 'আল-মুজাহিদ'

(المجاهد) নামে ১৯৪০ সালের জানুয়ারীতে বের হয়। যার শিরোনামে লেখা ছিল و لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم و الصابرين و نبلو أخباركم 'আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব, যতদিন না জানতে পারব কারা তোমাদের মধ্যে (সত্যিকারের) মুজাহিদ ও ধৈর্যশীল এবং যাচাই করব তোমাদের সার্বিক অবস্থাসমূহ'- মুহাম্মাদ ৩১। শেষোক্তটি মৌলবী মুহাম্মাদ বশীর শহীদ (রহঃ)-এর স্মরণে বের হ'ত। দু'টি পত্রিকাই সাধারণতঃ ফারসী, উর্দূ এবং কখনো কখনো পশতু ভাষায় নিবন্ধ প্রকাশ করত।[৭৮]

চামারকান্দ কেন্দ্র

আফগানিস্তানের জালালাবাদ শহরের উত্তর-পূর্বে কুনাড় নদীর তীরবর্তী হিন্দুকুশ পর্বতমালার পাদদেশে সুরক্ষিত চামারকান্দ এলাকায় ১৯১৫-১৬ সালে এই মুজাহিদ ঘাঁটি স্থাপিত হয়। জামা'আতে মুজাহেদীনের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব মৌলবী আব্দুল করীম কান্নৌজী (মৃত্যু সম্ভবতঃ ১৯২২ খৃঃ) আমীর নে'মাতুল্লাহ্‌র (১৯১৫-১৯২১ খৃঃ) উপরে নাখোশ হ'য়ে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।[৭৯] পাঁচ-সাতটি ছোট ও কাঁচা ঘরের এই কেন্দ্রটি উপমহাদেশে জিহাদ আন্দোলনের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে। আমীর নেয়ামাতুল্লাহ ও আমীর রহমাতুল্লাহ্‌র (১৯২১-১৯৪৯) সময়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল এই কেন্দ্রের এবং এর পরিচালক মৌলবী মুহাম্মাদ বশীর (রহঃ)-এর ।

(ক) মৌলবী মুহাম্মাদ বাশীর (১৩০৩-১৩৫২/১৮৮৫-১৯৩৪ খৃঃ)

স্ত্রী, নাবালক চার সন্তান ও সংসারধর্ম ছেড়ে কাউকে কিছু না বলে ১৯১৫ সালের এক শুভ্রসকালে ৩০ বছরের যুবক মৌলবী আবদুর রহীম ওরফে মুহাম্মাদ বশীর জন্মভূমি লাহোর হতে একসময় সীমান্তের স্বাধীন মুজাহিদ এলাকায় পৌঁছে যান।[৮০] ইতিপূর্বে তিনি জিহাদের রসদ ও লোক সংগ্রহ করতেন। এবার তিনি নিজেই সশরীরে অংশগ্রহণ করেন শাহাদতের অমিয়সুধা পানের নিমিত্তে। এই সময় ইউরোপে ১ম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। মাওলানা বশীর ইংরেজদেরকে সীমান্তযুদ্ধে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে সীমান্তের স্বাধীন সর্দারদের সঙ্গে এবং ইংরেজমিত্র আফগানশাসক আমীর হাবীবুল্লাহ খানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন ও

তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে সক্ষম হন। আফগান আমীর তাঁর জন্য বার্ষিক বার হাযার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। কিন্তু তিনি মাসিক মাত্র পাঁচ টাকা রেখে বাকী সব জিহাদ ফান্ডে দান করে দিতেন।[৮১] আসমাস্ত মূল কেন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তিনি ও তাঁর পরবর্তীগণ নিজেদেরকে 'আমীর' না বলে 'ছদর' বলতেন।[৮২] তাঁর আমলেই চামারকান্দের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কমবেশী চৌদ্দ বছর এই কেন্দ্র হ'তে জিহাদ পরিচালনার পর হিংসুকদের চক্রান্তে ১লা রামাযানের রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় ঘাঁটিতে নিজ বিছানায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৮৩]

(খ) মৌলবী ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদী (১৩০৪-৬৯/১৮৮৬-১৯৫১)

মুহাম্মাদ বশীর শহীদ (রহঃ)-এর পরে ১৯৩৪ সালে মৌলবী ফযলে এলাহী দ্বিতীয়বার চামারকান্দ মুজাহিদ ঘাঁটির দায়িত্বে আসেন। মৌলবী ফযলে এলাহী ১৮ বছর বয়সে ১৯০৪ সালে আসমাস্ত কেন্দ্রে এসে আমীর আব্দুল করীম (১২৫৫-১৩৩৩/১৮৩৮-১৯১৫ খৃঃ) -এর হাতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন।[৮৪] অতঃপর আমীরের নির্দেশক্রমে তিনি হিন্দুস্থানে মুজাহিদ ও রসদ সংগ্রহের কাজে প্রেরিত হন। ১৯০৬ সালে সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নিজেকে পুরাপুরি জিহাদের কাজে ওয়াক্ফ করে দেন। তিনি চুপচাপ হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়ান এবং দেশের স্বাধীনতাকামী প্রায় সকল শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কংগ্রেস নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদের (১৮৮৮-১৯৫৮) সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সেই সুবাদে তিনি প্রথম দিকে কংগ্রেসী ছিলেন।[৮৫] কিন্তু পরে পাকিস্তান অর্জনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁরই ইশারায় অধিকাংশ আহ্‌লেহাদীছ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। তাঁরই হাতে বায়'আতকারী সরদার আবদুল কাইয়ুম আযাদ কাশ্মীরের নেতা নির্বাচিত হন।[৮৬] ১৯৪১ সালে একবার ছদ্মবেশে পুরা এক বৎসর যাবত তিনি বিহার ও বাংলা অঞ্চল ভ্রমণ করেন। আল্লামা রাগেব আহসানকে তিনি বাংলা অঞ্চলের আমীর নিয়োগ করেন।[৮৭]

জিহাদ আন্দোলনে তৎপরতার কারণে তিনি ইংরেজের গুপ্ত পুলিশের নযরে পড়েন ও ১৯১৫ সালে জলন্ধর জেলে নিক্ষিপ্ত হন। ১৯১৮ সালে পিতার মৃত্যুর পরে সংসার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে 'ওয়াযীরাবাদ-এর বাইরে যাবেন না' এই মুচলেকায় এবং এক বছরের জন্য তিন হাযার টাকা যামানত আদায়ের শর্তে

১৯১৮ সালে মুক্তিলাভ করেন। ১৯২০ সালের জুনের দিকে তিনি গোপনে ইয়াগিস্তান চলে যান ও আসমাস্ত মুজাহিদ কেন্দ্রে উপস্থিত হন। পরে পরিবারের সকলকে সেখানে ডাকিয়ে নেন। কিছুদিন আসমাস্ত অবস্থানের পর তিনি চামারকান্দ চলে যান। সেখানে মৌলবী আবদুল করীম-এর ইন্তিকালের পরে তিনি সাময়িকভাবে চামারকান্দের 'রঈস' বা প্রধান নির্বাচিত হন। পরে আসমাস্ত কেন্দ্রের হেদায়াত মোতাবেক মৌলবী মুহাম্মাদ বশীর স্থায়ী ভাবে 'রঈস' নিযুক্ত হন। সম্ভবতঃ এই ঘটনার পর থেকে উভয়ের মধ্যে মনকষাকষির সূচনা হয়- যা শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। জীবনীকার মেহের-এর মতে এই মতবিরোধ অবশ্যই নেতৃত্বের কোন্দল ছিল না বরং দু'জনের মধ্যে কর্মপদ্ধতিগত গরমিল ছিল।[৮৮]

মাওলানা ফযলে এলাহীর জন্য ১৯২০ সাল থেকেই কমবেশী ৩০ বৎসর যাবত হিন্দুস্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।[৮৯] যদিও গোপনে ছদ্মবেশে তিনি বিহার ও বাংলা এলাকায় সফর করে যান। ভারত বিভক্ত হওয়ার পরে ১৯৪৮ সালের জুলাইয়ের দিকে তিনি হিন্দুস্থানে প্রবেশ করলে গ্রেফতার হন। কিন্তু সত্বর মুক্তিলাভ করেন। এই সময়ে তিনি কাশ্মীর জিহাদে শরীক হন এবং 'জিহাদে কাশ্মীর' নামে একটি বই লেখেন।[৯০] এইভাবে তিনি জন্মভূমি ছেড়ে কমবেশী ২৮ বৎসর সীমান্তের ইয়াগিস্তান এলাকায় জিহাদী জীবন যাপন করেন। আমীর নেয়ামাতুল্লাহ্র (১৩৩৩-৩৯/১৯১৫-১৯২১ খৃঃ) পরে 'আসমাস্ত' কেন্দ্র কার্যতঃ ঠান্ডা হ'য়ে গেলেও মৌলবী মুহাম্মাদ বশীর ও মাওলানা ফযলে এলাহীর নেতৃত্বে 'চামারকান্দ' কেন্দ্রে জিহাদের আগুন তপ্ত ছিল। ১৯৫১ সালের ৫ই মে তারিখে মুজাহিদ আন্দোলনের এই শেষ দেউটি নিভে যায় এবং তাঁরই অছিয়ত অনুযায়ী বালাকোটে সৈয়দ আহমাদ শহীদের কথিত গোরস্থানের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৯১]

১৯৪৮ সালে কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্র (১৮৭৬-১৯৪৮ খৃঃ) মৃত্যুর পরে আয়োজিত লাহোরের শোকসভায় সেনাপতি বরকতুল্লাহ মুজাহিদ নেতা হিসাবে যোগদান করেন। তখনও পর্যন্ত মাওলানা রাহমাতুল্লাহ 'আমীর' হিসাবে আসমাস্ত ও চামারকান্দ উভয় কেন্দ্রের উপরে খবরদারী করতেন বলে জানা যায়।[৯২] রহমাতুল্লাহ্র মৃত্যুর সময় বরকতুল্লাহ জেলে থাকার কারণে ছোট ভাই ছিবগাতুল্লাহ 'আমীর' হন। জেল থেকে ফিরে এলে বরকতুল্লাহকে 'আমীর' নির্বাচন করা হয়। এর পর থেকে সীমান্তের কোন তৎপরতার খবর জানা যায় না।

ছাদিকপুরী পরিবার

১৮৩১ সালে বালাকোট বিপর্যয়ের পর জিহাদ আন্দোলনের সার্বিক নেতৃত্ব পাটনা আযীমাবাদের ছাদিকপুরী পরিবারের উপরে পড়ে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের যোগ্যতম নেতৃত্বে বাংলাদেশ হ'তে সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশ জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর পরে তাঁদের উত্তরসুরীগণ জিহাদের আগুন তাজা রাখেন, সীমান্তে যা বৃটিশ রাজত্বের জন্য একটা স্থায়ী ভীতি হিসাবে বিরাজ করে। পাঁচ/সাতশো মুজাহিদকে দমন করার জন্য বৃটিশ সরকারকে ১৮৫০ হ'তে ১৮৬৩ পর্যন্ত ১৩ বৎসর সময়কালে সর্বমোট ২০টি অভিযান প্রেরণ করতে হয়, যাতে অংশ নেয় ৬০,০০০ হাযার নিয়মিত বাহিনী। তাছাড়া ছিল বহুসংখ্যক অনিয়মিত ও অতিরিক্ত সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী।[৯৩] হান্টার স্বীকার করেছেন যে, 'ভারতে আমাদের শাসন কায়েম রাখার ব্যাপারে এরা ছিল স্থায়ী বিপদের উৎস।'[৯৪] তৎকালীন পাঞ্জাব সরকার মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে প্রেরিত তাদের অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে সরকারী রিপোর্টে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'এই অভিযানের মাধ্যমে হিন্দুস্থানী ধর্মান্ধদের বিতাড়িত করতেও পারিনি কিংবা আত্মসমর্পণ করে হিন্দুস্থানে তাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করতেও পারিনি।[৯৫] মুজাহিদগণের সংকল্পের দৃঢ়তা এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সারা ভারতব্যাপী মুসলমানদের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের দিকে ইংগিত দিয়ে হান্টার বলেন- 'আমাদের অধিকারে রয়েছে একটি চিরস্থায়ী ষড়যন্ত্র এবং সীমান্তে রয়েছে একটি স্থায়ী বিদ্রোহী শিবির।'[৯৬] মুজাহিদগণের সর্বত্যাগী জিহাদী তৎপরতার স্বীকৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন-

'আরব দেশের ওয়াহ্হাবীদের সঙ্গে ভারতবর্ষের (জিহাদ) আন্দোলনের কোন সম্বন্ধ ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। কারণ সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী (১২০১-৪৬/১৭৮৬-১৮৩১) যখন ভারতে এ আন্দোলনের সূচনা করেন, তখন তিনি আরব দেশে যাননি। তাঁর দল অনেকটা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হওয়ার পর তিনি মক্কায় যান। ভারতে তিনি এক বিরাট সংঘ গড়ে তোলেন এবং তা প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেজের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম করে, যা এই আন্দোলনের প্রধান কীর্তি। এর সাথে ওয়াহ্হাবী মতের কোন সম্বন্ধ নেই। ধর্মীয় হ'লেও এর সাথে বিনষ্ট মুসলিম রাজশক্তি পুনরুদ্ধারের আকাংখা ছিল না, তা বলা যায় না। বরং এ আন্দোলনকে এক হিসাবে ব্রিটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলে গ্রহণ করা

যেতে পারে।[৯৭]

উপরে বর্ণিত বিষয়টি ছিল ছাদিকপুরী পরিবারের নেতৃত্বে পরিচালিত সীমান্তে জিহাদ আন্দোলনের একটি দিক। অন্যদিকে পাটনার ছাদিকপুর কেন্দ্র ১৮১৮ হ'তে ১৮৮৩ পর্যন্ত জিহাদে লোক ও রসদ প্রেরণের ঘাঁটি হিসাবে গোপন তৎপরতা বজায় রাখে। যদিও ১৮৬৪ সালে আম্বেলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে ছাদিকপুরী পরিবারের মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া আলী, মাওলানা আহমাদুল্লাহ, মাওলানা আবদুর রহীম প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে আন্দামানে নির্বাসন দেওয়া হয়। মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া আলী আন্দামানের 'রস' (Ross island) দ্বীপে ১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী এবং তাঁর বড় ভাই মাওলানা আহমাদুল্লাহ 'ভাইপার' (Viper island) দ্বীপে ১৮৮১ সালের ২১শে নভেম্বর তারিখে অবর্ণনীয় কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেলায়েত আলীর ভাতীজা মাওলানা আবদুর রহীম বিন ফারহাত হুসাইন দীর্ঘ প্রায় বিশ বছর পরে মুক্তি পেয়ে ১৮৮৩ সালের মার্চে পাটনায় ফিরে আসেন। কিন্তু সেখানে তখন তাঁর ঐতিহাসিক জমিদার পরিবারের বাস্তুভিটার চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার মত অবস্থা পর্যন্ত ছিল না। তাঁর পরিবার তখন 'নান্‌মুহিয়া' (ننموهيه) মহল্লাতে থাকেন। তিনি সেখানে শেষ জীবনের দুঃখময় দিনগুলি কাটান এবং ছাদিকপুরী পরিবারের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলীল 'আদ-দুররুল মানছূর' ওরফে 'তায্‌কেরায়ে ছাদেক্বাহ' রচনা করেন। ১৩৪১/১৯২৩ সালের ২৫শে জুলাই ৯২ বছর বয়সে তিনি সেখানে ইন্তেকাল করেন।[৯৮]

১৮৬৪ সালে বৃটিশ সরকার ছাদিকপুরী পরিবারের উপরে এক আকস্মিক অভিযান চালিয়ে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার, তাদের সম্পত্তি বাযেয়াফ্‌ত করা ছাড়াও সমস্ত ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ভিটা উচ্ছেদ করে সেখানে লাঙল চালানো হয়। মাওলানা ফারহাত হুসাইনসহ ছাদিকপুরী পরিবারের বুযর্গ ব্যক্তিদের কবরস্থান সমান করে সেখানে হিন্দু হরিজনদের শুকর পোষার আখড়া এবং শহরের পায়খানা ফেলার গাড়ী রাখার জায়গা বানানো হয়। কিছু অংশে মহিলাদের মীনাবাজার বসানো হয়। বাকী অংশে মিউনিসিপ্যালিটির বিল্ডিংসমূহ নির্মিত হয়েছে।[৯৯] অথচ এখানেই একদিন সারা ভারতের মুক্তির জন্য জিহাদের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ হ'ত। জান্নাতের মজলিস সমূহ সদা গুলজার থাক্‌ত। যাদের রেখে যাওয়া জিহাদের খুনরাঙা পথ ধরে আসে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ ও ১৯৪৭-এর ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন।

কিন্তু এত বড় ধ্বংসযজ্ঞ সত্ত্বেও ছাদিকপুর কেন্দ্রে জিহাদের আগুন নিভেনি। মাওলানা আবদুর রহীম যখন ১৮৬৪ সালে গ্রেফতার হন তখন তাঁর ১৭ বৎসর বয়স্ক চাচাতো ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান যাবীহ (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ) বিন মাওলানা বেলায়েত আলী ইমারতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি পরিবর্তিত অবস্থা বিবেচনা করে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি এই ঐতিহাসিক জিহাদ কেন্দ্রকে শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করেন। ১৮৮৪ সালে তিনি সেখানে 'মোহামেডান এ্যাংলো এরাবিক স্কুল' খোলেন এবং 'ইনষ্টিটিউট' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন।[১০০]

পরবর্তীতে মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র পৌত্র মাওলানা আবদুল খবীর বিন মাওলানা আবদুল হাকীম ১৯৭৩ সালের ৩রা নভেম্বর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত জামা'আতে আহলেহাদীছের 'আমীর' ছিলেন। তিনি উঁচুদরের আলিম ও মুত্তাক্বী ছিলেন। তিনি এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে, জানাযায় উপস্থিত লোকসংখ্যা স্মরণকালে অতুলনীয় ছিল।[১০১] মাওলানা আবদুল খাবীর -এর পুত্র মাওলানা আবদুস সামী' বর্তমানে 'আমীরে জামা'আত' হিসাবে পাটনার এই ঐতিহাসিক জিহাদী পরিবারের ঐতিহ্য আগ্লে আছেন (ঠিকানাঃ দারুল ইমারত আহ্লেহাদীছ, পাটনা-৭, বিহার, ভারত)।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, পাক-ভারত উপমহাদেশকে গোলামীর শৃংখল হ'তে মুক্ত করার জন্য এবং একই সাথে কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দিল্লীর অলিউল্লাহ পরিবার ও তার পরে পাটনার ছাদিকপুরী পরিবারের যে অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে, ভারতবর্ষে তার কোন তুলনা নেই। জিহাদ আন্দোলন ও আহলেহাদীছ আন্দোলন একই সাথে চালাতে গিয়ে একদিকে বৃটিশ শাসনশক্তির নিষ্ঠুরতম আচরণ, জেল-যুল্ম, ফাঁসি, সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আন্দামান ও কালাপানির লোমহর্ষক নির্যাতন, অপরদিকে প্রতিবেশী ঈর্ষাকাতর আলিমদের ও তাদের অন্ধ অনুসারীদের প্রদত্ত অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও ভূমিকম্পসদৃশ মুছীবতসমূহ হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে ছাদিকপুরী পরিবার যে অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছে, তা ভবিষ্যতের যে কোন আদর্শবাদী মুজাহিদের জন্য স্থায়ী প্রেরণার উৎস হ'য়ে থাকবে।

টীকাসমূহ-১২

❑ **মাওলানা বেলায়েত আলী (রহঃ)-এর বংশ তালিকাঃ**

বেলায়েত আলী বিন (২) ফতহ আলী বিন (৩) ওয়ারেছ আলী বিন (৪) মোল্লা মুহাম্মাদ সাঈদ ওরফে মোল্লা বখ্‌শ বিন (৫) ক্বাযী আহমাদুল্লাহ বিন (৬) মোল্লা হাফীযুল্লাহ অথবা শুক্‌রুল্লাহ বিন (৭) মাওলানা মুহাম্মাদ আরিফ বিন (৮) মোল্লা মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন (৯) মোল্লা মুহাম্মাদ মানছূর বিন (১০) আবুল হাসান বিন (১১) আবদুল্লাহ ওরফে 'হাজিউল হারামাইন' বিন (১২) খাজা আলী বিন (১৩) হামীদুদ্দীন বিন (১৪) মাখ্‌দূম আযীযুদ্দীন শহীদ বিন (১৫) মাখ্‌দূম খলীলুদ্দীন বিন (১৬) মাখ্‌দূম ইয়াহ্‌ইয়া মুনীরী বিহারী বিন (১৭) সুলতান মুহাম্মাদ ইসরাঈল বিন (১৮) মুহাম্মাদ ওরফে 'ইমাম তাজ ফক্বীহ' বিন (১৯) আবু বকর বিন (২০) আবু মুহাম্মাদ ওরফে 'ইমাম আবুল ফতহ' বিন (২১) আবুল ক্বাসেম বিন (২২) আবদুছ ছায়েম বিন (২৩) আবু সাঈদ ওরফে 'মাওলানা আবুদ্‌ দাহ্‌র' বিন (২৪) আবুল ফতহ বিন (২৫) ইমাম আবুল লাইছ বিন (২৬) আবুল লাইল বিন (২৭) আবুদ্‌ দাহ্‌র বিন (২৮) আবু সাহ্‌মাহ্‌ বিন (২৯) আবুদ্‌ দীন 'ইমামে আলম' বিন (৩০) আবু মাসউদ (তাবেঈ) বিন (৩১) হযরত আবদুল্লাহ (ছাহাবী) বিন (৩২) যুবায়ের (ছাহাবী, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা (রাঃ) বিন (৩৩) আবদুল মুত্ত্বালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ। -তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ পৃঃ ৮-৯।

১. গোলাম রসূল মেহের, 'সারগুযাস্তে মুজাহেদীন' (লাহোরঃ গোলাম আলী এন্ড সন্স, সালবিহীন) পৃঃ ২৬-২৭।

২. প্রাগুক্ত পৃঃ ২১৫।

৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ২১৮; মাসঊদ আলম নাদবী, 'হিন্দুস্তান কি পহেলী ইসলামী তাহরীক' (দিল্লীঃ মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ২য় প্রকাশঃ নভেম্বর ১৯৮১) পৃঃ ৪৯-৫০; নাদবী বলেন, এই সময় তিনি দিল্লীর আশপাশে ছিলেন।-ঐ; মৌলবী আবদুর রহীম যুবায়রী, 'তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ' (কলিকাতাঃ মাতবা'আ উছমানী, ১ম প্রকাশ ১৩১৯/১৯০১ খৃঃ) পৃঃ৯৭-৯৮।

৪. অলি মুহাম্মাদ ফল্‌তী (২) নাছীরুদ্দীন মঙ্গলোরী (৩) আওলাদ আলী আযীমাবাদী (৪) সৈয়দ নাছীরুদ্দীন দেহলভী (৫) সৈয়দ আবদুর রহীম সূরতী আফগানী। -'সারগুযাস্ত' পৃঃ ২৬, ১১৬, ১২১, ১৯৪-৯৬, ১৯৯।

৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৬।

৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ২২২।

৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ২২২-২২৩।

৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ২২৪।

৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩৬।

১০. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩৪।

১১. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪২।

১২. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৭, ২৪৪, ২৪৩।

১৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৬, ২৫২।

১৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৮।

১৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬৩।

১৬. মৌলবী আবদুর রহীম যুবায়রী, 'তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ' পৃঃ ৮-৯।

১৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯১। ১৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৪।

১৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯২-৯৩। ২০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৪।

২১. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৪-৯৫। ২২. প্রাগুক্ত পৃঃ ১০২।

২৩. মেহের, 'সারগুযাস্তে মুজাহেদীন' পৃঃ ২১৬; আলী নদভী, 'সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ' (লাক্ষ্ণৌঃ নামী প্রেস, মার্চ ১৯৩৯) পৃঃ ৪১৭।

২৪. নদবী, 'সীরাতে সাইয়িদ আহমদ' পৃঃ ৪১৮; 'তায্‌কেরায়ে ছাদেকাহ' পৃঃ ১০১-১০২।

২৫. 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ২১৭।

২৬. আলী নদবী, 'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ' পৃঃ ৪১৬।

২৭. 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ' পৃঃ ৯৮।

২৮. নাদবী, 'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ' পৃঃ ৪১৭; 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ২১৬।

২৯. মৌলবী আবদুর রহীম হাশেমী যুবায়রী, 'মাজমূ'আ রাসায়েলে তিস্‌আ' (দিল্লীঃ মাতবা'আ ফারূকী, সালবিহীন)। বাকী দু'টি বইয়ের একটি হ'ল- মাওলানা এনায়েত আলী রচিত 'বুত্ শিকন'-উর্দূ এবং অন্যটি হ'ল মাওলানা ফাইয়ায আলী বিন এলাহী বখ্‌শ রচিত 'ফায়যুল ফুয়ূয' -ফারসী।

৩০. 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ২১৩; আলী নদবী, 'সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ' পৃঃ ৪১৫।

৩১. মাসঊদ আলম নদভী, 'ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী আওর উন্‌কে আফকার পর এক নযর' (লাহোরঃ দার সালাফিইয়াহ, ১৪০৬/১৯৮৫) পৃঃ ৯৮ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩২. 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ' পৃঃ ৯৪।

৩৩. হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, 'তাহরীকে জিহাদ' (গুজরানওয়ালা, পাকিস্তানঃ নাদ্‌ওয়াতুল মুহাদ্দেছীন, ১ম সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬) পৃঃ ২২ ; 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ' পৃঃ ৯৪।

৩৪. 'পহেলী ইসলামী তাহরীক' পৃঃ ৪২।

৩৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৩।

৩৬. ছিদ্দীক হাসান খান-আত্মজীবনী 'ইবক্বাউল মিনান' (লাহোরঃ দারুদ দাওয়াতিস সালাফিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৯৮৬) পৃঃ ৪৪-৪৫; 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ' পৃঃ ১০৬।

৩৭. 'পহেলী ইসলামী তাহরীক' পৃঃ ৪৪।

৩৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৫।

৩৯. 'তাহরীকে জিহাদ' পৃঃ ২৫ ; গৃহীতঃ 'শাহ অলিউল্লাহ আওর উন্‌কি সিয়াসী তাহরীক' পৃঃ ১৩০।

৪০. রাদ্দু শিরক-

صد حیف کہ عالمان ایں دھر + کردند شعار خود دغا را

قرآن و حدیث را بہ پوشند + تبدیل کنند مدّعا را

ایےمومن پاك واے مسلمان + گرمی خواهی رَه رضا را
قرآن و حدیث را بسر نه + بگزار کلام ما سوا را

গৃহীতঃ 'রাসায়েলে তিস'আ' পৃঃ২৮।

৪১. বেলায়েত আলী, আমল বিল-হাদীছ; গৃহীতঃ 'রাসায়েলে তিস'আ' পৃঃ ৩০।

৪২. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২-৩৩।

৪৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩।

৪৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪।

৪৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫।

৪৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫-৩৬।

৪৭. 'তাহরীকে জিহাদ' পৃঃ ৩৫ ; গৃহীতঃ তাযকেরায়ে ছাদেকাহ পৃঃ ১১৯।

৪৮. 'তাহরীকে জিহাদ' পৃঃ ৩৭ ; গৃহীতঃ তাযকেরায়ে ছাদেকাহ পৃঃ ১২৩।

৪৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৭ ; গৃহীতঃ সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' অমৃতসর-পূর্ব পাঞ্জাবঃ ১০ম বর্ষ, ২৬ সংখ্যা ২৫শে এপ্রিল ১৯১৩।

৫০. 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ২১৮-২১৯।

৫১. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৪; মাসঊদ আলম নাদবী এই দ্বিতীয় মেয়াদকে তিনবছর বলেছেন।- 'ইসলামী তাহরীক' পৃঃ ৫০।

৫২. 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ২৬৬, ২৭৩।

৫৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮০; সিপাহী বিদ্রোহের তারিখ দ্র. ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান,ভারতবর্ষের ইতিহাস (ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৮৪) পৃঃ ৫৬১

৫৪. 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ২৮৩।

৫৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৪-২৮৫।

৫৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৬।

৫৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৯, ২৯০, ২৯১।

৫৮. সূত্রঃ অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল মাজেদ সালাফী (৫৫), তাঁর পিতা গাযী মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ সালাফী হ'তে। সাং হেমায়েতপুর, পাবনা। সাক্ষাৎকারঃ মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, জেলা গাইবান্ধা।- তাং ১৪.১০.৮৯ ইং।

৫৯. মেহের, 'সারগুযাস্তে মুজাহিদীন' পৃঃ ২৯৬।

৬০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০২-৩০৩।

৬১. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩১।

৬২. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪৯।

৬৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩১৪-৩১৫।

৬৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪৮।

৬৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬৪।

৬৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬৮।

৬৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৭১।

৬৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৭৩।

৬৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৭৬।

৭০. আবাদ শাহপুরী, 'সাইয়িদ বাদশাহ কা কাফেলা' (লাহোরঃ আল-বদর পাবলিকেশন্‌স, জুন ১৯৮১) পৃঃ ৪১৮-১৯।

৭১. 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ৪৭৯; আবদুল মওদূদ ৮,০০০ হাযার টাকা লিখেছেন। -ওহাবী আন্দোলন পৃঃ ১০৩।

৭২. 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ৪৮১।

৭৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৮৪।

৭৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৮৩।

৭৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫১৪।

৭৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫১৭-১৮।

৭৭. 'শাহ্‌যাদা বরকতুল্লাহ্‌র বক্তৃতা সংকলন' পুস্তিকা (এম. এম. শরীফ আর্টিষ্ট, পেশোয়ার, তাবি। বক্তৃতাঃ ১৯৪৮ইং) পৃঃ ১০।

৭৮. 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ৫১৬-১৭।

৭৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫১৫, ৫৪৭-৪৮।

৮০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৪২-৪৩, ৫৬১।

৮১. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৬১, ৫৪৫, ৫৪৪।

৮২. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৫১।

৮৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৫৪।

৮৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৬৮।

৮৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৭২।

৮৬. 'সাইয়িদ বাদশাহ' পৃঃ ৪৪০।

৮৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৩২।

৮৮. 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ৫৬৯-৭০।

৮৯. ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদী, 'জিহাদে কাশ্মীর' (করাচীঃ জামেয়া আবুবকর আল-ইসলামিয়াহ, ব্লক-৬, গুলশান ইকবাল, ২য় প্রকাশ ১৪০৮/১৯৮৮) পৃঃ ১৮,২৮।

৯০. 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ৫৭২।

৯১. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৭২ 'সাইয়িদ বাদশাহ' পৃঃ ৪৪৮।

৯২. 'শাহজাদা বরকতুল্লাহ্‌র বক্তৃতা সংকলন' পৃঃ ১০।

৯৩. হান্টার প্রণীত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স' অনুবাদঃ এম. আনিসুজ্জামান (ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাবমহল, ১৯৮২) পৃঃ ১৪-১৫।

৯৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯; HISTORY OF THE FREEDOM MOVEMENT (Karachi: Pakistan historical society. 1960) Vol. II, Ch. VII p. 165.

৯৫. হান্টার, পৃঃ ৩১।

৯৬. আবদুল মওদূদ, 'ওহাবী আন্দোলন' (ঢাকাঃ আহমাদ পাবলিশিং হাউস, ৩য় সংস্করণ, বাং ১৩৯২/১৯৮৫ খৃঃ) পৃঃ ১০২।

৯৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৭। মন্টগোমারী ওয়াট '১৮২৩ সালে হজ্জের সফরে সাইয়িদ আহমাদ ওয়াহ্‌হাবী সংস্পর্শে আসেন' বলে যে মন্তব্য করেছেন তা ঠিক নয়। -ISLAMIC PHILOSOPHY AND THEOLOGY (Edinburgh University Press, 1962) p. 165.

৯৮. কাইয়ূম খিযির প্রণীত 'ছাদিকপুর-পাটনা, কুরবানগাহে আযাদীয়ে ওয়াত্বন' (পাটনা, বিহার লিথো প্রেস, ১৯৭৯ ইং) পৃঃ ৩৭, ৩৮, ৩৯; জা'ফর থানেশ্বরী, 'তাওয়ারীখে আজীব' (দিল্লীঃ মুস্তানছির প্রেস, ১৩৪৪/১৯২৫) পৃঃ ৪৪-৪৫, ৬৬, ৮১।

৯৯. 'কুরবানগাহ' পৃঃ ৩৬।

১০০. প্রাগুক্ত পৃঃ ২২-২৩।

১০১. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৬।

জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে যিন্দেগানী

আধুনিক যুগঃ ৩য় পর্যায় (ক)

دور الجديد: المرحلة الثالثة (الف)

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (السيد نذير حسين الدهلوى)ঃ

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২)-এর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শহীদায়েন (রহঃ) ও তাঁদের অনুসারী পাটনা ছাদিকপুরী পরিবারের নেতৃত্বে পরিচালিত কিঞ্চিদধিক সোয়াশো বছর (১৮১৬-১৯৫১ খৃঃ) ব্যাপী জিহাদ আন্দোলন সমগ্র উপমহাদেশে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির সাথে সাথে আমল বিল-হাদীছের প্রতি মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করে। এর ফলে আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

অন্যদিকে শহীদায়েনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিহারের মৌলবী নযীর হুসাইন (১২২০-১৩২০ / ১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) ও কন্নৌজের মৌলবী ছিদ্দীক হাসান খান (১২৪৮-১৩০৭ / ১৮৩২-৯০খৃঃ) দীর্ঘ শিক্ষকতা এবং গ্রন্থ রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে চিন্তার জগতে পরিবর্তন সাধনের দ্বারা সর্বত্র যে নীবর বিপ্লবের সূচনা করেন, তা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ করে দেয়। মিয়াঁ নযীর হুসাইনের প্রায় পৌণে এক শতাব্দীকাল ব্যাপী (১২৪৬-১৩২০ হিঃ) শিক্ষকতার জীবনে প্রাপ্ত প্রায় সোয়া লক্ষ ছাত্রের[১] অধিকাংশ শহীদায়েন ও তাঁদের অনুসারীদের ন্যায় যুদ্ধের ময়দানে সশস্ত্র মুজাহিদ না হ'লেও ইল্মের ময়দানে তারা কুরআন-হাদীছের অস্ত্রে সমৃদ্ধ ইল্মী মুজাহিদ ছিলেন। যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আহলেহাদীছ আন্দোলন দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম হুসাইন (৪-৬১ হিঃ)-এর বংশধর সাইয়িদ নযীর হুসাইন বিন জাওয়াদ আলীর বংশধারা ৩৫তম উর্ধতন স্তরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মিলে যায়।[২] এই বংশে দশজন ইমাম ও দশজন কাযী জন্মগ্রহণ করেন।[৩] নযীর হুসাইনের ১৮তম উর্ধতন পুরুষ সাইয়িদ আহমাদ শাহ জাজনীরী দিল্লীর প্রথম মুসলিম সুলতান কুতুবুদ্দীন আয়বকের (৬০২-৬০৬/১২০৬-১০ খৃঃ) অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে বিহারে প্রেরিত হলে সেই থেকে তিনি ও তাঁর বংশ বিহারের

অধিবাসী হন। বিহারের মুংগের যেলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্তী সূর্যগড়ের অনতিদূরে বাল্থোয়া নামক গ্রামে নযীর হুসাইনের জন্মস্থানে তাঁর পিতা জাওয়াদ আলী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ভাইয়েরা সূর্যগড়ে উঠে আসেন।[৪] পিতার জীবদ্দশাতেই নযীর হুসাইন শিক্ষার উদ্দেশ্যে দিল্লী গমন করেন ও সারা জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন।

১৭ বছর বয়স পর্যন্ত নযীর হুসাইন লেখাপড়ার প্রতি নযর দেননি। একদিন তাদের পরিবারের সুহৃদ জনৈক ব্রাহ্মণ তাকে বলেন 'হে নযীর! তোমাদের বংশের সকলেই মৌলবী। অথচ তুমি জাহিল হ'য়ে রইলে?[৫] ব্রাহ্মণের উক্ত বাক্য তরুণ নযীর হুসাইনের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। প্রথমে পিতার নিকটে কিছু লেখাপড়া শিখেন। পরে ১২৩৭ হিঃ মোতাবেক ১৮২১ খৃষ্টাব্দের এক রাতে গোপনে পাটনা আযীমাবাদ চলে যান। সেখানে গিয়ে হজ্জের কাফেলা নিয়ে যাত্রাকারী শহীদায়েনের পক্ষকালব্যাপী ওয়ায শুনে তাঁর মধ্যে হাদীছ শিক্ষার উদগ্র বাসনা জেগে ওঠে।[৬] ফলে ১২৪৩ হিজরীর ১৩ই রজব মোতাবেক ১৮২৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী তিনি দিল্লীতে পৌঁছেন এবং পাঞ্জাবী কাট্রার আওরঙ্গাবাদী জামে মসজিদে অবস্থান করেন। সেখানে মুতাওয়াল্লী মাওলানা আবদুল খালেক-এর নিকটে তিনি প্রায় সাড়ে তিনবছর লেখাপড়া করে যোগ্যতা হাছিল করেন। অতঃপর ১২৪৬ হিজরীর শেষদিকে স্বনামধন্য উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক (১১৯২-১২৬২/১৭৭৮-১৮৪৬)-এর দরসে যোগ দেন।[৭] শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক বিন আফযাল ফারূকী শাহ আবদুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৭-১৮২৪)-এর দৌহিত্র ও তাঁর মৃত্যুর পরে মাদরাসা রহীমিয়ায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দীর্ঘ তের বছর তাঁর নিকটে মা'কূলাত ও মান্কূলাতের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা লাভ করেন[৮] অতঃপর ১২৫৮ হিঃ মোতাবেক ১৮৪৩ সালে উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক স্থায়ীভাবে মক্কায় হিজরত করার সময় তাঁকে লিখিতভাবে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে যান[৯] এবং অলিউল্লাহ পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী 'শায়খুল হাদীছ' হিসাবে তাঁকে 'মিয়াঁ ছাহেব' উপাধি প্রদান করেন। পরবর্তীতে হজ্জের সফরে গেলে আরবরা তাঁকে 'শায়খুল কুল ফিল কুল' (সর্বকালের সকলের সেরা বিদ্বান) ও ভারত সরকার তাঁকে 'শামসুল উলামা' (বিদ্বানগণের সূর্য) খেতাব দিলেও তিনি সর্বদা

উস্তাদের দেওয়া 'মিয়াঁ ছাহেব' লকবই পসন্দ করতেন ও সেই নামেই তিনি পরিচিত হয়েছেন।

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনে মিয়াঁ ছাহেবের অবদান

বিহারের এক মুকাল্লিদ পরিবারে জন্মগ্রহণকারী সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দিল্লীতে এসে নিরপেক্ষ ও খোলামনে হাদীছ অধ্যয়নের ফলে তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। আমল বিল-হাদীছের জায্বা প্রচলিত তাকলীদী ধারার বাধ্যবাধকতা থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। কুরআন, হাদীছ, ফিক্‌হ সহ প্রচলিত প্রায় সকল ইল্‌মে গভীর পারদর্শী নযীর হুসাইন পাঠদানের সময় তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের সামনে হাদীছের সহজ-সরল পথ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে ফিক্‌হী বিতর্ক হ'তে বেরিয়ে ছাত্ররা সরাসরি কুরআন-হাদীছ অনুসরণে অধিক স্বস্তি লাভ করতেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে দক্ষিণ এশিয়া ও বহির্বিশ্ব থেকে জ্ঞানপিপাসু বহু ছাত্র প্রচলিত তাকলীদ ছেড়ে দিয়ে 'আহ্‌লেহাদীছ' হয়ে যান। প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে তাঁর শিক্ষা প্রচার করতেন ও তাদের মাধ্যমে অনেকে আহ্‌লেহাদীছ হ'তেন। পঁচাত্তর বছরের এই ইল্‌মী মহীরুহের ছায়াতলে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাযার ছাত্র দ্বীনী ইল্‌ম লাভে ধন্য হন,[১০] যাদের অধিকাংশই আহ্‌লেহাদীছ ছিলেন বা হয়েছিলেন বলে অনুমান করা চলে।[১১] এক্ষণে আমরা তাঁর ছাত্রমণ্ডলী সম্পর্কে আলোকপাত করব।

ছাত্রমণ্ডলীঃ পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের প্রায় সকল দেশেই মিয়াঁ ছাহেবের ছাত্র-মণ্ডলী বিস্তৃত ছিল। সিরিয়া (শাম), মিসর, হেজায, নাজ্‌দ, ইয়ামন, আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া), বোখারা, বল্‌খ, সমরকন্দ, ইয়াগিস্তান, এশিয়া মাইনর (إيشيا كوچك) ইরান, খোরাসান, মাশহাদ, তিব্বত, চীন, জাপান, বার্মা, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ ও এলাকা হ'তে ছাত্ররা হাদীছ শিক্ষার উদগ্র বাসনায় মিয়াঁ ছাহেবের দরসে যোগদান করতেন।

শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে মোটামুটি তিন স্তরের ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাঁর স্বনামধন্য পুত্র মৌলবী শরীফ হুসাইন (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ), মাওলানা আব্দুল্লাহ

গযনবী (১২৩০-৯৮/১৮১৪-৩০ খৃঃ) ঐ পুত্র মৌলবী মুহাম্মাদ, মৌলবী আবদুল জাব্বার, আবদুর রহীম, আব্দুল ওয়াহেদ ও তাঁর পাঁচ পুত্র। মৌলবী বশীর সাহসোয়ানী (১২৫০-১৩২৬/১৮৩৪-১৯০৮), মৌলবী আমীর হাসান (মৃঃ ১২৯১/১৮৭৪) ও তাঁর পুত্র আমীর আহমাদ সাহসোয়ানী (১২৬২-১৩০৬/১৮৪৬-১৮৮৮), মৌলবী আবদুল্লাহ ওরফে গোলাম রসূল

পাঞ্জাবী, হাফেয মুহাম্মাদ বারাকাল্লাহ লাক্ষাবী পাঞ্জাবী, শামসুল উলামা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী লাহোরী (মৃঃ ১৩৩৮/১৯২০), হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরী (১২৬০-১৩৩৭/১৮৪৪-১৯১৮), সা'আদাত হুসাইন বিহারী (মৃঃ ১২৯৬ হিঃ), হাফেয ইবরাহীম আরাভী (১২৬৪-১৩১৯/১৮৪৯-১৯০১), হাফেয আবদুল মান্নান ওয়াযীরাবাদী (১২৬৭-১৩৩৪/১৮৫১-১৯১৫), রফীউদ্দীন শুক্রানওয়ারী বিহারী, মৌলবী তালাত্তুফ হুসাইন আযীমাবাদী (১২৬৪-১৩৩৪/১৮৪৮-১৯১৫), নূর আহমাদ ডিয়ানবী আযীমাবাদী, বদীউয্যামান লাক্ষাবী (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ), মৌলবী অছিয়ত আলী, মৌলবী আসাদ আলী ইসলামাবাদী, ক্বাযী মাহফূযুল্লাহ পানিপথী, শায়খ আহমাদ দেহলভী, বখশিষ আহমাদ কাযীপুরী, সালামাতুল্লাহ আযমগড়ী, মৌলবী আবু আবদুর রহমান মুহাম্মাদ পাঞ্জাবী, আব্দুল গণী লা'আল্‌পুরী বিহারী, ইলাহীবখ্‌শ বারাকুরী, নাযীর হুসাইন আরাভী, আমীর আলী মালীহাবাদী লাক্ষাবী, নূর আহমাদ মুলতানী, আহমাদ হাসান ইস্তান্‌ভী বিহারী, আবদুল আযীয রহীমাবাদী (১২৭০-১৩৩৬/১৮৫৫-১৯১৮) ও তাঁর ভাই হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াসীন, মৌলবী আব্দুল্লাহ পাঞ্জাবী গীলানী, মৌলবী মুহাম্মাদ তাহের সিলহেটী (বাংলাদেশ), আব্দুল জাব্বার ওমরপুরী, সাইয়িদ মুহাম্মাদ ইরফান টোংকী, মৌলবী মুহাম্মাদ হুসাইন বিন আব্দুস সাত্তার হাযারভী, মৌলবী আলী নে'মত ফলওয়ারী (মৃঃ ১৩৩১/১৯১২), মৌলবী মুহাম্মাদ আহ্‌সান ভূপালী, শায়খ আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস হুসাইনী সানূসী মাগরেবী (মরক্কো), মুহাম্মাদ বিন নাছির বিন মুবারক, সা'আদ বিন হামাদ বিন আতীক, শায়খ ইসহাক বিন আব্দুর রহমান আলে শায়খ (নাজ্‌দ), মুহাদ্দিছ শামসুল হক ডিয়ান্‌বী আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯/১৮৫৭-১৯১১)- আওনুল মা'বূদ, গায়াতুল মাকছূদ, মুগ্‌নী শারহু দারাকুত্‌নী প্রভৃতির খ্যাতনামা রচয়িতা), শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩/১৮৬৫-১৯৩৫) -তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী, আব্‌কারুল

মিনান প্রভৃতির রচয়িতা) প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বিদ্বানমন্ডলী।[১২] এছাড়াও রয়েছেন দেশে দেশে শত শত ইল্মী প্রতিভা, মিয়াঁ ছাহেবের দার্স থেকে আলো নিয়ে যাঁরা স্ব স্ব এলাকা আমল বিল-হাদীছ-এর আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন এবং এর মাধ্যমে আহ্লেহাদীছ আন্দোলনে অবদান রেখেছেন, যাদের সংখ্যা নিরূপণ করা একপ্রকার অসম্ভব। আল্লাহ্র সেনাবাহিনীর খবর তিনি ছাড়া আর কে রাখেন? তবে জীবনীকার ফযল হুসাইন বিহারী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হ'তে মিয়াঁ ছাহেবের পাঁচশত ছাত্রের একটি তালিকা দিয়েছেন। আমরা এখানে সংক্ষেপে তার কিছু তুলে ধরব।

এলাকাভিত্তিক উল্লেখযোগ্য ছাত্র মন্ডলী

বিহারঃ জেলা আরাহঃ ১। মাওলানা ইব্রাহীম আরাভী (১২৬৪-১৩১৯/১৮৪৯-১৯০১)। মক্কায় তৃতীয়বার হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আরাহ্-র 'মাদরাসা আহমাদিয়াহ্' তাঁর অমর স্মৃতি। জীবনের শেষদিকে তিনি তাছাউওফের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি খুবই হকপন্থী ছিলেন এবং কোন অবস্থাতেই হক পরিত্যাগ করে বাতিলের সঙ্গে আপোষ করতেন না।[১৩] ২। তাঁর ভাই মৌলবী মুহাম্মাদ ইদ্রীস আরাভী। ৩। মৌলবী মোহাম্মাদ কাসেম (মাদরাসা আলিয়া কলিকাতা-এর তত্ত্বাবধায়ক) ৪। মৌলবী শাহ নেয়ামাতুলাহ ৫। মৌলবী হাফেয নাযীর হাসান ওরফে যয়নুল আবেদীন সহ মোট ১১ জন।

জেলা পাটনাঃ ১। মৌলবী হাকীম আলীমুদ্দীন হুসাইন নগরনাহ্সাভী (১২৬১-১৩০৬/১৮৪৫-১৮৮৮)। ইনি একজন উঁচুদরের আলিম, শিক্ষক, গ্রন্থকার ও বাগ্মী ছিলেন ২। মৌলবী লুৎফে আলী বিহারী (বড় আলিম ও শিক্ষক ছিলেন)। ৩। মৌলবী আমীর হাসান বিহারী ৪। মৌলবী আবুল হাসানাত আবদুল গফুর দানাপুরী ৫। মৌলবী ফযল হুসাইন মোযাফ্ফরপুরী বিহারী। মিয়াঁ ছাহেবের প্রথম উর্দূ জীবনী 'আল-হায়াত বা'দাল মামাত'-এর রচয়িতা। ৬। মৌলবী তালাত্তুফ হুসাইন আযীমাবাদী (১২৬৪-১৩৩৪/১৮৪৮-১৯১৬)। ইনি প্রায় ২৬ বৎসর যাবত মিয়াঁ ছাহেবের খাদেম ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে মিয়াঁ ছাহেবের মৃত্যু পর্যন্ত ইনি মিয়াঁ ছাহেবের মুখলিছ সাথী ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁর নিকট রক্ষিত ছাত্রদের নামের তালিকা থেকেই জীবনীকার ফযল

হোসাইন মিয়াঁ ছাহেবের ছাত্রদের সংখ্যা ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন ৭। মাওলানা আবুত্ ত্বাইয়িব মুহাম্মাদ শামসুল হক ডিয়ানবী আযীমাবাদী (১৮৫৭-১৯১১) ৮। মৌলবী মোহাম্মাদ ইদরীস বিন মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী ৯। মৌলবী সা'আদাত হুসাইন (সাবেক শিক্ষক মাদরাসা আহমাদিয়া আরাহ্ ও মাদরাসা আলিয়া কলিকাতা) ১০। মৌলবী শাহ মোহাম্মাদ আয়নুল হক ফলওয়ারী (১২৮৭-১৩৩৩/১৮৬৯-১৯১৫)। ইনি পাটনা যেলার অন্তর্গত ফলওয়ারী খান্‌ক্বাহের সাজ্জাদানশীন ছিলেন। ইনি সুন্নাতের পাবন্দী করার নিয়তে পায়ে হেটে হজ্জে গমন করেন এবং হজ্জ থেকে ফিরে এসে খান্‌ক্বাহ ছেড়ে দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন ১১। মৌলবী আলী নেয়ামত ফলওয়ারী। ইনি মৌলবী শাহ মুহাম্মাদ আয়নুল হক-এর উস্তাদ ছিলেন। ১২। মৌলবী শুহুদুল হক (ইনি মিয়াঁ ছাহেবের বিরুদ্ধে লিখিত 'ইনতিছারুল হক'-এর প্রতিবাদে 'বাহ্‌রে যাখার'-এর লেখক) ১৩। মৌলবী আবুল হাসান বিহারী (ইনি সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ ছিলেন)। এতদসহ মোট ৭৩ জন।

জেলা সারেনঃ ১। মৌলবী আবু নছর আবদুল গাফ্‌ফার মেহদানওয়াঁ (মৃঃ ১৩১৫ হিঃ)। ইনি জীবনীকার ফযল হুসাইনের আপন চাচাতো ভাই ছিলেন। সারেন জেলার আহলেহাদীছের নেতা ছিলেন। ২। মৌলবী ইহসানুল্লাহ (ইনি সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ ছিলেন)। এতদসহ মোট আট জন।

জেলা দারভাঙ্গাঃ ১। হাফেয মাওলানা আবদুল আযীয রহীমাবাদী (১২৭০-১৩৩৬/১৮৫৫-১৯১৮)। 'হুসনুল বায়ান'-এর খ্যাতনামা লেখক ও মুর্শিদাবাদ জেলার মাড়ড়া বাহাছের স্বনামধন্য মুনাযির ছিলেন। মোযাফ্‌ফরপুর, দারভাঙ্গা, দিনাজপুর ও বাংলাদেশ এলাকার বহু জনপদের শ্রদ্ধেয় আহলেহাদীছ নেতা, বাহাছ ও মুনাযারায় দক্ষ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী আলিম ছিলেন। ২। তাঁর ভাই মাওলানা আবদুর রহীম রহীমাবাদী। ৩। মৌলবী আলতাফ হুসাইন ফাযিলপুরীসহ মোট ১০ জন।

জেলা ছাহেবগঞ্জঃ ১। মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক ২। মৌলবী তাবারক হুসাইন ৩। মৌলবী শের মুহাম্মাদ ৪। মৌলবী মুহাম্মাদ যাকির ৫। মৌলবী আবদুস সাত্তার।

এতদ্ব্যতীত বিহার প্রদেশের মুযাফ্ফরপুর, মোতীহারী, মুংগের প্রভৃতি যেলায় যথাক্রমে ৩, ১ ও ৩ জন ছাত্রের নামসহ সর্বমোট ১১৪ জন বিহারী ছাত্রের নাম আছে।

বঙ্গদেশ (বাংলাদেশ ৩২ ও পঃ বঙ্গ ১৬=৪৮ জন)ঃ

জেলা চট্টগ্রামঃ ১। মৌলবী বখশী আলী ২। মৌলবী হায়দার আলী ইসলামাবাদী ৩। মৌলবী আসাদ আলী ৪। মৌলবী হাসানুয্যামান ৫। মৌলবী আবদুল ফাত্তাহ ৬। মৌলবী বখশিষ আলী ৭। মৌলবী মুণীরুদ্দীন বিন মৌলবী হাসান আলী ইসলামাবাদী।

জেলা সিলেটঃ ১। মৌলবী মুহাম্মাদ তাহের ২। মৌলবী হাসান আলী ৩। মৌলবী আব্দুল বারী ৪। মৌলবী মুহাম্মাদ ইয়াকূব।

জেলা ঢাকাঃ ১। মৌলবী নাছীরুদ্দীন ২। মৌলবী আবদুল্লাহ ৩। মৌলবী আব্দুল গফুর ৪। মৌলবী ইবরাহীম ৫। মৌলবী হায়দার আলী।

জেলা রংপুরঃ ১। মৌলবী আবদুল হালীম ২। মৌলবী আবদুল হাদী (মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী-এর পিতা) ৩। মৌলবী যহীরুদ্দীন ৪। মৌলবী আতাউল্লাহ।

জেলা দিনাজপুরঃ ১। মৌলবী আবদুল বাসেত ২। মৌলবী আব্দুল হামীদ ৩। মৌলবী আমানাতুল্লাহ ৪। মৌলবী মুহাম্মাদ হুসাইন ৫। মৌলবী ঈসা ৬। মৌলবী আব্দুল মালেক ৭। মৌলবী আব্দুস সাঈদ।

জেলা নাছীরাবাদ (মোমেনশাহী)ঃ মৌলবী খাজা আহমাদ।

জেলা রাজশাহীঃ ১। মৌলবী মুহাম্মাদ (জামিরা) ২। মৌলবী রহীম বখ্‌শ ৩। মৌলবী আছগার আলী ৪। মৌলবী মাওলা।

জেলা বর্ধমানঃ ১। মৌলবী মুহাম্মাদ বিন যিল্লুর রহীম ২। আব্দুর রহমান বিন যিল্লুর রহীম ৩। মৌলবী নেয়ামাতুল্লাহ ৪। ফযল করীম ৫। আব্দুর রহীম ৬। ইহসান করীম ৭। মৌলবী ইসহাক্ব।

জেলা মুর্শিদাবাদঃ ১। মৌলবী সলীমুদ্দীন ২। মৌলবী আব্দুল আযীয ৩। মৌলবী নাজমুদ্দীন ৪। মৌলবী ইয়াকূব আলী ৫। মৌলবী আবু মুহাম্মাদ

হেফাযাতুল্লাহ ৬। মৌলবী ইব্রাহীম দেবকুন্ডী (বেলডাঙ্গা, মাওলানা মাওলাবখ্শ নদভীর পিতা)।

কলিকাতাঃ মৌলবী আয়নুদ্দীন (১২৯৭ - ১৩৪০ বাং) মেটিয়াবুরুজ, হাফেয মাওলানা আয়নুল বারীর দাদা।

জেলা নদীয়াঃ মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক বিন মৌলবী খাজা আহমাদ ২। মৌলবী তোরাব আলী ওরফে খাকী শাহ্।

০ **আসামঃ** মৌলবী সা'আদুল্লাহ (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ)।

০ **ব্রহ্মদেশ ঃ** মৌলবী মুহাম্মাদ ওমর ২। মৌলবী আমীরুদ্দীন।

০ **সিন্ধু ঃ** মৌলবী মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী (খ্যাতনামা লেখক) ২। মৌলবী কুদরাতুল্লাহ ৩। মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ ৪। মৌলবী আবু তোরাব রুশ্দুল্লাহ।

০ **পাঞ্জাব ঃ** মৌলবী শামসুদ্দীন (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ) ২। মৌলবী ওবায়দুল্লাহ (তুহ্ফাতুল হিন্দ ও তুহ্ফাতুল ইখ্ওয়ান-এর লেখক) ৩। মৌলবী আব্দুল ওয়াহ্হাব (১২৮১-১৩৫১/১৮৬৩-১৯৩২) 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহ্লেহাদীছ'-এর প্রতিষ্ঠাতা। দিল্লীর ছদরবাযারে 'দারুল কিতাবে ওয়াস্ সুন্নাহ' নামে একটি মাদরাসা কায়েম করেন। তাঁর বহু ছাত্র ও অনুসারী রয়েছে) ৪। মৌলবী অলি মুহাম্মাদ ৫। মৌলবী আবদুল্লাহ গযনভী (১২৩০-৯৮ হিঃ/১৮১৪-৮০ খৃঃ) খ্যাতনামা আফগান আহলেহাদীছ নেতা ও ছূফী মুহাদ্দিছ ছিলেন ৬। তাঁর পুত্র মৌলবী মুহাম্মাদ গযনভী, তাফসীরে জামেউল বায়ান-এর মধ্যে তাঁর লিখিত টীকা রয়েছে। ৭ অন্যতম পুত্র মৌলবী আব্দুল জাব্বার গযনভী অমৃতসরী (ইনি পিতা আবদুল্লাহ গযনভীর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন)। ৮। মৌলবী আবুল ওফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮) খ্যাতনামা আহলেহাদীছ নেতা, 'অল ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কন্ফারেন্স'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, উর্দূ সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকার সম্পাদক, তাফসীরে ছানাঈসহ বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও পুস্তিকার লেখক, ভারতবিখ্যাত মুনাযির ও কাদিয়ানী বিজয়ী, 'শেরে পাঞ্জাব' বলে খ্যাত স্বনামধন্য আলিম)। ৯। ক্বাযী মাহফূযুল্লাহ (ইনি তাফসীরে মাযহারী প্রণেতা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী-এর নাতি) ১০। মৌলবী

মুহাম্মাদ শাহ পাকপটনী পাঞ্জাবী ('তানভীরুল হক'-এর লেখক। এ বইয়ের প্রতিবাদেই মিয়াঁ ছাহেব 'মি'য়ারুল হক' লেখেন) ১১। মৌলবী তেলা মুহাম্মাদ খান, মক্কায় মৃত্যু ১৩১০ হিজরী; ইনি উঁচুদরের আলিম ও মুহাদ্দিছ ছিলেন (পরে ঢাকার বাশিন্দা হন)। ১৩। মোল্লা ছিদ্দীক পেশাওয়ারী (খ্যাতনামা ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছ হওয়ার সাথে সাথে উঁচুদরের উছূলী ছিলেন। মুসাল্লামুছ ছুবূত, মুগতানামুল হুছূল প্রভৃতির তিনি হাফেয ছিলেন বলা চলে। এতদ্ব্যতীত নূরুল আনওয়ার, তাওযীহ্, আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, মুছাফ্ফা, মাহছূল, হুসামী প্রভৃতি উছূলের কিতাবসমূহ তাঁর নখদর্পনে ছিল)। এতদসহ সারা পাঞ্জাবে, পেশাওয়ারে ও ঝিলামে মোট ৬৩ জন ছাত্রের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত সূরতে ১ জন, গুজরাটে ২ জন এবং মাদ্রাজে ২ জন ছাত্রের নাম আছে।

জেলা দিল্লীঃ মাওলানা সাইয়িদ শরীফ হুসাইন (মিয়াঁ ছাহেবের পুত্র, মৃঃ ১৩০৪ হিঃ) ২। মৌলবী সাইয়িদ আহমাদ হাসান (ইনি (تلخيص الإنظار فيما بنى عليه الإنتصار) নামক বিখ্যাত পুস্তিকার লেখক। পুস্তিকাটি মিয়াঁ ছাহেব প্রণীত 'মি'য়ারুল হক' (معيار الحق)-এর প্রতিবাদে লেখা 'ইন্তিছারুল হক' (إنتصار الحق)-এর বিরুদ্ধে মাত্র দশ দিনের মধ্যে লিখে ও ছেপে প্রকাশ করা হয় এবং ১২৯০ হিজরীর ২৫শে জমাদিউছ ছানীতে লেখকের নামে প্রেরণ করা হয়। ৩। মৌলবী আব্দুল হক (তাফসীরে হাক্বক্বানী-এর প্রণেতা) ৪। শামসুল ওলামা মৌলবী ডেপুটি নাযীর আহমাদ এল.এল.ডি বিজনৌরী দেহলভী (ইনি কুরআন মজীদের অনুবাদক এবং نبات النعش ، توبة النصوح ইত্যাদি বইসমূহের লেখক) ৫। মৌলবী মীর মুহাম্মাদ (দিল্লী জামে মসজিদের ইমাম) ৬। মৌলবী রহীম বখ্শ (দিল্লীর ফতেহপুরী জামে মসজিদের ইমাম) ৭। হাফেয মৌলবী আবদুল ওয়াহ্হাব নাবীনা (হাদীছের অন্ধ হাফেয ও খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম) ৮। মৌলবী আবদুল কাদের (ইমাম মসজিদে কেলাঁ ওরফে কালী মসজিদ)। এতদসহ মোট ২২ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

জেলা ডেরা ইসমাঈল খাঁঃ মৌলবী ওবায়দুল্লাহ।

জেলা রাওয়ালপিন্ডিঃ মৌলবী আবদুল্লাহ ফতেহজংগী ২। মৌলবী আবদুছ ছামাদ বুরহানবী ৩। মৌলবী হেদায়াতুল্লাহ।

জেলা শিয়ালকোটঃ মৌলবী মুহাম্মাদ শিয়ালকোটী ২। মৌলবী মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী (মৃঃ ১৩৭৬/১৯৫৬, উর্দূ 'তারীখে আহলেহাদীছ' -এর লেখক) ৩। মৌলবী খোদাবখ্‌শ ৪। মৌলবী আবুল হাসান ৫। মৌলবী ইবরাহীম হামীদপুরী।

জেলা গুরুদাসপুরঃ মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী (পাঞ্জাবের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ নেতা, মাসিক ইশা'আতুস সুন্নাহ্-এর মালিক ও সম্পাদক, منح البارى فى ترجيح صحيح البخارى -এর স্বনামধন্য রচয়িতা, মিয়াঁ ছাহেবের খ্যাতিমান ছাত্র ও নিজে অগণিত ছাত্রের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক) ২। মৌলবী মীর হাসান শাহ ৩।মৌলবী মুহাম্মাদ ওছমান বিন মৌলবী নিযামুদ্দীন ফতেহগড়ী ৪ ও ৫। তাঁর পুত্র ও পৌত্র যথাক্রমে মৌলবী মুহাম্মাদ আযম ও মৌলবী মুহাম্মাদ ফাযিল।

জেলা গুজরানওয়ালাঃ মৌলবী আবদুল হামীদ বিন আবদুল্লাহ সোহদারী ২।মৌলবী গোলাম নবী সোহদারী ৩। মৌলবী আহমাদ আলী ৪। মৌলবী মুহাম্মাদ (কেল্লা মিয়াঁ শংকর)। এতদসহ মোট ৮ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

জেলা লাহোরঃ মৌলবী ফযলে হক ২। মৌলবী রহীম বখ্‌শ ৩। মৌলবী আহমাদ (শিক্ষক, মাদরাসা নু'মানিয়া) ৪। মৌলবী আবদুল হাকীম ৫। মৌলবী ইসমাঈল ৬। মৌলবী কাযী যাফরুদ্দীন (শিক্ষক, দারুল উলূম লাহোর) এতদসহ মোট ১১ জনের নাম রয়েছে।

জেলা লুধিয়ানাঃ মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক ২। মোসাম্মাৎ ফযীলত যওজে মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক ৩। মোসাম্মাৎ উম্মে সালামাহ বিনতে মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক ৪। মৌলবী হাফেয মুহাম্মাদ দাঊদ সহ মোট ৬ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

জেলা মুলতানঃ মৌলবী শায়খ মুহাম্মাদ (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ) ২। মৌলবী আবদুল ওয়াহ্‌হাব ৩। মৌলবী আবদুত্ তাওয়াব সহ মোট ৭ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

জেলা ওয়াযীরাবাদঃ মৌলবী হায়দার আলী ২। মৌলবী আবদুল কাদের ৩। হাফেয আবদুল মান্নান (১২৬৭-১৩৩৪/১৮৫১-১৯১৫) খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ও মুদাররিস।

জেলা হাযারাঃ মোল্লা মুহাম্মাদ হুসাইন বিন আবদুস সাত্তার (শারহে নুখবাহ্-এর ভাষ্যকার) ২। মৌলবী ইউসুফ হুসাইন খানপুরী (খ্যাতনামা আলিম ও সাহিত্যিক) ৩। মৌলবী মুহাম্মাদ ইয়াসীন হাযারভীসহ মোট ৯ জনের নাম আছে।

এতদ্ব্যতীত মোযাফ্ফরাবাদে ১ জন, শাহপুরে ২ জন, ফিরোজপুরে ৪ জন, হুশিয়ারপুরে ২ জন, ফুরুকাহ্-তে ১ জন এবং কাশ্মীরের মৌলবী আবদুল আযীম (জম্মু)-এর নাম উল্লেখিত হয়েছে।

আগ্রা ও অযোধ্যাঃ

জেলা আযমগড় (ইউপি)ঃ মৌলবী আবদুস সালাম মুবারকপুরী (১২৮৯-১৩৪২/১৮৭১-১৯২৪) ২। মৌলবী আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩/১৮৬৫-১৯৩৫), তিরমিযীর প্রসিদ্ধ ভাষ্যগ্রন্থ 'তুহ্ফাতুল আহওয়াযীর' লেখক ও বিখ্যাত আলেম ৩। মৌলবী আবদুর রহমান বিন হাকীম বাবুল্লাহ বেনারসী ৪। মৌলবী সা'আদুল্লাহ বিন হাকীম রুকনুদ্দীন (মউ) ৫। হাফেয মুহাম্মাদ আবদুল কাদের (মউ) ৬। মৌলবী সালামাতুল্লাহ জয়রাজপুরী ৭। মৌলবী আবদুল্লাহ জয়রাজপুরীসহ মোট ৪০ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে, যাদের অধিকাংশ 'মউ' এলাকার।

এতদ্ব্যতীত আকবরাবাদে ৩ জন, আজমীরে ১ জন, এলাহাবাদে ১ জন, আমরূহাতে মৌলবী আলে হাসান ('নুখ্বাতুত তাওয়ারীখ-এর লেখক), বিজনৌরে ৩ জন, বাদায়ূনে ১ জন, বুলন্দশহরে ১ জন ও বালিয়াতে ১ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

বেনারস (ইউপি)ঃ মৌলবী সাইয়িদ নাযীরুদ্দীন আহমাদ (মুদাররিস ও অনুবাদক কাযী আয়ায (মৃঃ ৫৫৪ হিঃ)-এর 'শিফা' এবং 'তাওয়ারীখে তায়মূর' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী) ২। মৌলবী মুহাম্মাদ সাঈদ (মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ

বেনারসীর পিতা) ৩। হাফেয আবদুল মজীদ সহ মোট ৬ জনের নাম আছে।

টোংক (রাজপুতনা)ঃ মৌলবী সাইয়িদ মুহাম্মাদ **ইরফান** (আমীর সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী (রহঃ)-এর দৌহিত্র। খুবই সৎ ও সাহিত্যিক মানুষ ছিলেন)। ২। মৌলবী সাইয়িদ মুছতফা (মুহাদ্দিছ ও মানতেকী ছিলেন)। ৩। হাফেয আব্দুল্লাহ (উঁচুদরের সাহিত্যিক ছিলেন)। এতদসহ মোট ৫ জনের নাম আছে।

জৌনপুরঃ মৌলবী শিবলী বিন আল্লামা সাখাওয়াত আলী (রহঃ) ২। মৌলবী আলতাফ হুসাইনসহ মোট ৫ জন।

সাহসোয়ানঃ মাওলানা আমীর হাসান। ইনি মিয়াঁ ছাহেবের নিকটতম সেরা ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পিতা-পুত্রের ন্যায় মধুর সম্পর্ক ছিল। শেষ বয়সেও তিনি মিয়াঁ ছাহেবের কথা দুঃখ ও আফসোসের সঙ্গে স্মরণ করতেন। 'মি'য়ারুল হক'-এর সমর্থনে একদিনেই তিনি براهين إثنا عشر নামক ১২টি দলীলসমৃদ্ধ বিখ্যাত পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করেন ২। শামসুল ওলামা মাওলানা আমীর আহমাদ। ইনি মাওলানা আমীর হাসানের পুত্র ছিলেন। মিয়াঁ ছাহেবকে 'দাদাজী' বলে ডাকতেন। মিয়াঁ ছাহেবের তিনি খুবই আদরের ছিলেন। আগ্রাতে একটি মাদরাসার মুদাররিস ছিলেন। কিন্তু মিয়াঁ ছাহেবকে দেখতে প্রায়ই দিল্লী আসতেন। তিনি তীক্ষ্ণধী ও মেধাবী ছিলেন, যার তুলনা বিরল ছিল। ছিহাহ সিত্তাহ্ বিশেষ করে ছহীহায়েন-এর অধিকাংশ তিনি সনদসহ মুখস্ত বলতেন। একই সাথে মান্‌তেক ও ফাল্‌সাফার প্রতিও আকর্ষণ ছিল। লেবাস-পোষাক খাছ দিল্লীওয়ালাদের মতই ছিল ৩। মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর (১২৫০-১৩২৬/১৮৩৪-১৯০৮)। এই খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম ইল্‌মে হাদীছে পারদর্শী হওয়ার সাথে সাথে আরবী সাহিত্যে খুবই দক্ষ ছিলেন। মিয়াঁ ছাহেবের সেরা ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। মিয়াঁ ছাহেবের মৃত্যুর পরে তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দরস জারি রাখেন। ইতিপূর্বে তিনি ভূপালে ছিলেন। মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪/১৮৪৮-১৮৮৬) -এর সঙ্গে তাঁর লেখনীযুদ্ধ চলতো। মিয়াঁ ছাহেবের পরামর্শক্রমে তিনি আরবদেশ হ'তে আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ হাম্বলী (মৃঃ ৭৪৪ হিঃ) রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ الصارم المنكى فى الرد على السبكى বইটি আনিয়ে নেন এবং তার সাহায্যে মাওলানা

আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবীকে পরাভূত করেন। শিরকের বিরুদ্ধে صيانة الأناس নামে তিনি আরবী ভাষায় বৃহৎ কলেবরের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যাও ছিল অনেক ৪। মৌলবী হাকীম বাদরুল হাসান ও তাঁর পুত্র আখতার হাসান সহ মোট ৭ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

গাযীপুরঃ হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরী (১২৬০-১৩৩৭/১৮৪৪-১৯১৮)। ইনি 'উস্তাযুল আসাতিযাহ' বা শিক্ষককুলের শিক্ষক উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ উস্তাযগণের একটি বিরাট অংশ তাঁর সরাসরি ছাত্র ছিলেন। ডাক্তারী তাঁর পেশা ছিল। ফলে বহু ডাক্তার তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি নিজে তো খ্যাতনামা আলেম ছিলেন, তাঁর মেয়েরাও যোগ্য আলেমা ছিলেন। তাঁর দুই ভাগ্নে হাফেয আবদুর রহমান বাক্বা ও হাফেয আবদুল মান্নান অফা প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। এতদ্ব্যতীত মৌলবী আবদুল আযীয হুজরীআবাদী গাযীপুরের অন্যতম প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন।

শাহজাহানপুরঃ মৌলবী আবু ইয়াহ্‌ইয়া মুহাম্মাদ শাহজাহানপুরী (মৃঃ ১৩৩৮/১৯২০)। তাকলীদ ও ইজতিহাদ বিষয়ে তাঁর লিখিত 'আল-ইরশাদ' নামক উর্দূ বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম জীবনে কঠোর মুকাল্লিদ ছিলেন। পরে আহলেহাদীছ আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখেন। এতদসহ মোট ৫ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

লাক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যাঃ মৌলবী আবদুল হালীম শারার (১২৭৮-১৩৪৫/১৮৬০-১৯২৬) (খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক) ২। মৌলবী বদীউয্‌যামান বিন মসীহুয্‌যামান (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ)। ইনি মুওয়াত্ত্বা ও তিরমিযী শরীফের অনুবাদক এবং কুরআন শরীফের বিষয়বস্তু সমূহের তালিকা প্রস্তুতকারক ছিলেন। ৩। মৌলবী অহীদুয্‌যামান বিন মসীহুয্‌যামান (ইনি ছিহাহ সিত্তাহ্‌র স্বনামধন্য উর্দূ অনুবাদক। এর পূর্বে তিনি হানাফী ফিক্‌হ 'শরহে বেকায়াহ্'র তরজমা করেন) ৪। মৌলবী হাকীম মুহাম্মাদ ইয়াহ্‌ইয়া (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ) ৫। মৌলবী সাইয়িদ আমীর আলী মালীহাবাদী (বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা)। এতদসহ মোট ৭ জনের নাম আছে।

মুরাদাবাদঃ মাওলানা জান আলী (উঁচুদরের মুহাদ্দিছ ও মুদাররিস ছিলেন) ২।

কাযী ইহ্‌তিশামুদ্দীন ('ইস্তিছারুল হক'-এর প্রতিবাদে 'ইখ্‌তিছারুল হক'-এর লেখক)। এতদসহ মোট ৪ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

মীরাটঃ মৌলবী আবদুল জাব্বার ওমরপুরী ২। মৌলবী যিয়াউর রহমান ওমরপুরী।

এতদ্ব্যতীত পীলীভেত-এ ১ জন, জলেশ্বরে ৩ জন, খুরজাহতে ২ জন, সাহারানপুরে ১ জন, ফতেহ্‌পুরে ১জন, ফারখাবাদে ৩ জন, কানপুরে ১ জন, গোরক্ষপুরে ১ জন, মছলীশহরে ১ জন, মোযাফ্‌ফর নগরে ১ জন, রামপুরে ৩ জন ও হায়দরাবাদের মৌলবী আবদুল হাই-য়ের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

তিব্বতঃ মৌলবী আবু ইমরান আতাউল হক-এর লেখা হ'তে বুঝা যায় যে, তাঁর ছাত্রজীবনে তিব্বতের একজন ছাত্র মিয়াঁ ছাহেবের নিকট পড়তে আসেন। কিন্তু তার নাম জানা যায়নি। এমনিভাবে মৌলবী শামসুল হক বলেন যে, মিয়াঁ ছাহেবের দু'জন তিব্বতী ছাত্রের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হয়েছে। তাদের কয়েকটি চিঠি ও আমাদের কাছে এসেছে।

কাবুলঃ মৌলবী আবদুল হামীদ ২। মৌলবী ইখওয়ান ৩। মৌলবী শিহাবুদ্দীন ৪। মৌলবী আবদুর রহীম।

গযনী ঃ মোল্লা শিহাবুদ্দীন গযনবী।

কান্দাহারঃ মোল্লা আবদুর রহমান।

কাশগড় ঃ মোল্লা নূরুদ্দীন কাহাস্তানী (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ) ২। মোল্লা আবদুন নূর (ঐ) ৩। মোল্লা মীর আলম।

হিরাটঃ মোল্লা আযীযুদ্দীন ২। মোল্লা সাইয়িদ মুহাম্মাদ।

এতদ্ব্যতীত আফগানিস্তানের বাজোড়-য়ে ১ জন, ইয়াগিস্তানে ১ জন, সামরূদে ২ জন, কোকান্দ-য়ে ১ জন, হাবশাঁ দ্বীপে ১ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

হেজাযঃ আবদুর রহমান মুহাম্মাদ বিন আওন নু'মানী।

সনৌসঃ আবদুল্লাহ্ বিন ইদরীস আল-হুসাইনী আল-মাগরেবী (মরক্কোর খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। মক্কা মু'আয্‌যামাতে বহুদিন যাবত হাদীছের দরস

দিয়েছেন)।

নাজদঃ ইসহাক বিন আবদুর রহমান (বড় আলেম ও নেক্কার ব্যক্তি ছিলেন)। ২। আলী বিন মাযী ৩। সাইয়িদ আবদুল্লাহ বিন সা'আদ আবদুল আযীয ৪। কাযী মুহাম্মাদ বিন নাছির বিন মুবারক ৫। কাযী সা'আদ বিন হামাদ বিন আতীক।[১৪]

এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার প্রসিদ্ধ ৫০০শত ছাত্রের নাম উল্লেখ করে জীবনীকার ফযল হুসাইন বিহারী বলেন, 'মূলতঃ এগুলি বিরাট সমুদ্রের এক চুল্লু পানির মত।' তিনি বলেন "শুধু হিন্দুস্থান ও কাবুল নয় বরং আরব, ইয়ামন, নাজ্দ, হিজায, সনৌস (তিউনিসিয়া), হাবশান, আফ্রিকা, চীন, কোচিন, তিব্বত প্রভৃতি দেশও তাঁর ছাত্র হ'তে খালি নয়।[১৫]

প্রাসংগিকভাবে আমরা বলতে পারি যে, আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) সশস্ত্র জিহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে তথা দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনের যে জোয়ার সৃষ্টি করেন, পরবর্তীতে আল্লামা সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) পরিচালিত তাদরিসী জিহাদ সেই জোয়ারকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। মুসলমান সমাজ থেকে শিরক ও বিদ'আতের শিকড় উৎপাটনের কার্যকর ভূমিকা তিনি পালন করেন। বিভিন্ন এলাকা হ'তে আগত মিয়াঁ ছাহেবের অসংখ্য ছাত্র ও অনুসারীবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যেমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।

লেখনী

সারাক্ষণ দারস-তাদরীস, ফৎওয়া প্রদান ও ওয়ায-নছীহতে ব্যস্ত থাকার কারণে মিয়াঁ ছাহেব গ্রন্থ রচনার দিকে বিশেষ মনোনিবেশ করতে পারেননি। তবুও শতাব্দীর এই ইল্মী মহীরুহ সারাজীবনে যত লিখিত ফৎওয়া দিয়েছেন, তা একত্রিত করা হ'লে বড় বড় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। মৃত্যুর ২৭ বৎসর পূর্বে একবার তিনি বলেছিলেন 'যদি আমার সমস্ত ফৎওয়ার নকল রাখা হ'ত, তাহ'লে 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী'র চারগুণ হ'ত।[১৬] জীবনীকার ফযল হুসাইন বিহারী বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত ছোট বড় ৫৬টি ফৎওয়া

পুস্তিকার তালিকা দিয়েছেন। মিয়াঁ ছাহেবের মৃত্যুর পরে তদীয় খ্যাতিমান ছাত্র মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯/১৮৫৭-১৯১১) ও মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩/১৮৬৫-১৯৩৫)-এর সংশোধনী ও মাওলানা শারফুদ্দীন দেহলভী (মৃঃ ১৩৮১/১৯৬১) কর্তৃক সংক্ষিপ্ত সংযোজনীসহ ১৩৩৩/১৯১৫ সালে 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' নামে বৃহদাকার দু'খন্ডে মিয়াঁ ছাহেবের ফৎওয়া সংকলন সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[১৭]

মিয়াঁ ছাহেবের রচিত 'মি'য়ারুল হক' (معيار الحق) বা 'সত্যের মানদন্ড' বইটি ছিল সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ। বইটি মোট দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ১ম অধ্যায়ে ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ)-এর ফাযায়েল ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এবং এব্যাপারে হানাফী ফিক্বহের গ্রন্থসমূহে যেসব বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, যুক্তিপূর্ণভাবে সে সবের প্রতিবাদ করা হয়েছে।[১৮]

২য় অধ্যায়ে তাকলীদ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে।[১৯] কুরআন, হাদীছ, ইজমা, কিয়াস-এর দলীল দ্বারা এবং চার ইমামসহ উম্মতের অন্যান্য জ্ঞানী মনীষীবৃন্দের উক্তিসমূহের মাধ্যমে তিনি 'তাকলীদে শাখছী'-কে বাতিল প্রমাণ করেছেন। তাকলীদপন্থীদের তরফ থেকে যেসব জওয়াব দেওয়া হয়ে থাকে, সেগুলিকে উদ্ধৃত করে তার দলীলভিত্তিক জওয়াব দিয়েছেন। মুসলমানকে প্রচলিত চার মাযহাবের যেকোন একটির অনুসারী হওয়া ওয়াজিব-এই দাবীর অসারতায় তিনি চার মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের ৩৫টি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।[২০]

'এযুগে হাদীছের উপর আমল করা কঠিন সেজন্য যেকোন একটি মাযহাবী ফিক্বহের অনুসরণ করা ওয়াজিব'-এ দাবীরও তিনি যথাযথ জওয়াব দিয়েছেন[২১] এবং প্রমাণ করেছেন যে, হাদীছে বর্ণিত নাজী ফের্কা বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল কেবলমাত্র চার মাযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।[২২]

তিনি একথাও প্রমাণ করেছেন যে, ইজতিহাদ চার ইমামের পরেও চালু আছে। যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াবে শরীয়ত-গবেষণা তথা ইজতিহাদের মাধ্যমে তার সমাধান পেশ করা ইসলামের চিরন্তন মৌলিক দাবী। ইজতিহাদের এই খাছ রহমত আল্লাহপাক কোন একটি বিশেষ যুগ পর্যন্ত সীমায়িত করেননি। কিয়ামত

পর্যন্ত ইজতিহাদের দুয়ার প্রত্যেক যোগ্য আলিমের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।[২৩] অতঃপর মিয়াঁ ছাহেব তাঁর দাবীর সপক্ষে চার ইমামের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদগণের পরিচয় বর্ণনা করেছেন।[২৪] তিনি 'ইজমা' সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন[২৫] এবং প্রমাণ করেছেন যে, 'ইজমায়ে সুকূতী' দলীল নয়।[২৬] সবশেষে কতকগুলি বিতর্কিত মাসায়েল উদ্ধৃত করে ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে সেগুলির সমাধান পেশ করেছেন।

মিয়াঁ ছাহেবের লিখিত উক্ত বইয়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, সকল প্রকারের কুটতর্ক পরিহার করে দলীল দ্বারা প্রতিপক্ষের উদ্ধৃত দলীলের খন্ডন করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীছের দলীল ছাড়াও নিজের সপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হানাফী বিদ্বানদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। বইটি মূলতঃ বিতর্কমূলক। আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) ছালাতে রাফ্‌উল ইয়াদায়েন-এর সপক্ষে 'তানভীরুল আইনাইন' নামে যে বই লিখেন, মিয়াঁ ছাহেবের দীর্ঘ চার বছরের শাগরিদ মৌলবী মুহাম্মাদ শাহ্ পাঞ্জাবী তার জওয়াবে 'তানভীরুল হক' নামে একটি বই লিখে নওয়াব কুতুবুদ্দীন খানের নামে প্রচার করেন। তারই জওয়াবে মিয়াঁ ছাহেব অত্র 'মি'য়ারুল হক' রচনা করেন।[২৭] বক্তব্যের ঋজুতা, সাবলীলতা, রুচিশীলতা এবং অকাট্য দলীলসমূহের সুন্দর উপস্থাপনায় বইটি মিয়াঁ ছাহেবের জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে সুধী মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বইটির শেষদিকে এর প্রশংসায় উপমহাদেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ১৮ জন আলিমের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।

'মি'য়ারুল হক'-এর প্রতিবাদে সর্বপ্রথম মৌলবী এরশাদ হুসাইন রামপুরী 'ইন্তিছারুল হক' নামে একটি পুস্তিকা লিখেন। তার বিরুদ্ধে মিয়াঁ ছাহেবের শিষ্যগণ মোট ৪টি প্রতিবাদ পুস্তক লিখেন।[২৮] প্রথমটি লিখেন মৌলবী সাইয়িদ আমীর হাসান সাহসোয়ানী, যা 'ইন্তিছার' প্রকাশের মাত্র একদিন পরেই 'বারাহীনে ইছনা আশারা' নামে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটিতে ১২টি মযবুত দলীলের অবতারণা করে বলা হয়েছে, যে কেউ উক্ত বারোটি দলীলের জওয়াব দিতে পারবেন ধরে নেওয়া হবে যে, তিনি পুরা বইটির প্রতিবাদ করেছেন। বইটি পড়ে ভারতের খ্যাতনামা হানাফী আলেম আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪/১৮৪৮-১৮৮৬) লেখকের নিকট প্রেরিত একটি চিঠিতে বলেন-

'ইন্তিছার' বইয়ে উদ্ধৃত কিতাবসমূহ ও সে সবের প্রণেতাদের নামের ভুলের সংখ্যা অগণিত। সংক্ষেপে কয়েকটির প্রতি দৃকপাত করাই যথেষ্ট মনে করি।[২৯] মিয়াঁ ছাহেবের শিষ্যদের লিখিত বাকী তিনটি বই হ'ল- (১) 'তালখীছুল ইনযার ফী মা বুনিয়া আলাইহিল ইন্তিছার'। লেখক মৌলবী সাইয়িদ আহমাদ হাসান দেহলভী 'ইন্তিছার' বই প্রকাশের মাত্র দশদিনের মধ্যেই তার প্রতিবাদে উক্ত বই প্রকাশ করে লেখকের নিকট কপি পাঠিয়ে দেন। অথচ 'ইন্তিছার' বইটি 'মি'য়ারুল হক' প্রকাশের দীর্ঘ ৮ বৎসর পরে ১২৯০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছিল (২) 'ইখ্‌তিয়ারুল হক'। লেখকঃ কাযী ইহতিশামুল হক মুরাদাবাদী (৩) 'বাহ্‌রে যাখার'। লেখকঃ মৌলবী শুহূদুল হক পাটনাবী।

সংক্ষেপে 'মি'য়ারুল হক' বইটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল মুসলিম উম্মাহ্‌কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগের ন্যায় কুরআন ও হাদীছভিত্তিক জীবন যাপনের দিকে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষপাদে এসে তাকলীদে শাখ্‌ছীর বিদ'আত মাথা চাড়া দেওয়ার পর হ'তে যা ক্ষুণ্ন হয় ও যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন বিদ্বানের ভক্তগণ পরবর্তীতে তাদের স্ব স্ব ইমামের নামে এক একটি মাযহাব রচনা করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হ'য়ে যায়। অথচ কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে বিচারের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে নিলে শারঈ বিষয়ে উম্মতের মধ্যে কোন দলাদলি সৃষ্টি হ'তে পারেনা। বইটিতে মিয়াঁ ছাহেব মুসলিম উম্মাহ্‌কে তাকলীদে শাখ্‌ছীর শৃংখল ছিন্ন করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে 'মি'য়ারুল হক' বা 'সত্যের মানদন্ড' হিসাবে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্যের আহবান জানিয়েছেন। বলা যেতে পারে যে, 'মি'য়ারুল হক' বইটি মিয়াঁ ছাহেবের লৈখিক জিহাদের জীবন্ত স্মৃতি। ২৪৭ পৃষ্ঠার এই বইটি 'তাক্বলীদ' সম্পর্কে প্রচলিত বদ্ধমূল ধারণা নিরসন ক'রে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উন্নত ব্যক্তিগত আমল, শিক্ষকতা, ওয়ায-নছীহত এবং লেখনী যুদ্ধের ময়দানে অতুলনীয় মুজাহিদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী জীবনে কখনো সশস্ত্র জিহাদে লিপ্ত হননি বা তেমন কোন সুযোগ তাঁর জীবনে সৃষ্টি হয়নি। তবে সশস্ত্র

আততায়ীর সম্মুখীন হয়ে শাহাদাতের দ্বারদেশ হ'তে ফিরে এসেছেন।[৩০] বিরোধী পক্ষের নোংরা ষড়যন্ত্রের শিকার হ'য়ে গীবত-তোহমত,[৩১] জেল-যুল্‌ম ভোগ করেছেন।[৩২] এমনকি হজ্জের মওসুমে মক্কার পবিত্র ভূমিতে তাঁকে গ্রেফতার হ'তে হয়েছে কুচক্রী আলেমদের ষড়যন্ত্রের ফলে।[৩৩] সেই সময়কার চরম বিরোধী পরিবেশে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের এই অকুতোভয় সিপাহ্‌সালার যে আপোষহীন জিহাদী মনোভাব নিয়ে দা'ওয়াত ও তাদরীসের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং বিরোধীদের সকল চক্রান্তজাল উপেক্ষা করে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তা যেকোন মুজাহিদের জন্য ঈর্ষার বিষয় বৈ-কি!

শিক্ষকতার মাধ্যমেই তাঁর আন্দোলন পরিব্যপ্ত হয়। তাঁর বিরাট ছাত্রবাহিনী মূলতঃ আন্দোলনের কর্মীবাহিনী হিসাবে কাজ করেন এবং বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন পরিচালনা করেন।

শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে তিনি বলতেন-'আমি ঐ দু'জন দাদা ও পৌত্রের সঙ্গে একমত, যাঁরা কেবলমাত্র কুরআন ও হাদীছ থেকে মাসআলা চয়ন করতেন ও নিজেদের সিদ্ধান্তের উপরে দৃঢ় থাকতেন। যায়েদ, আমর বা কোন লেখকের ও আলিমের পায়রবী করতেন না। তাঁদের লেখা পড়লে মনে হয় যেন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের দরিয়ায় ঢেউ খেলছে।[৩৪]

হাদীছ থেকে প্রমাণিত কোন মাসআলার ব্যাপারে কেউ হঠকারিতা দেখালে মিয়াঁ ছাহেব সাথে সাথে মুবাহালার আহবান জানাতেন। তাঁর চরিত্রের এই দৃঢ়তা ও সরলতা শিষ্যদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেল্‌ত- যা আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে।

মিয়াঁ ছাহেবের আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের ফলাফল' (تحريك أهلحديث كا فائده) শিরোনামে আল্লামা সুলায়মান নাদ্‌ভী (১৩০২-১৩৭২ / ১৮৮৪-১৯৫৩) বলেন, সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী ও তাঁর ছাত্র মন্ডলীর মাধ্যমে হিন্দুস্থানে আহ্‌লেহাদীছ -এর নামে যে আন্দোলন চলে, তার একটি ফল এই হয়েছে যে, তবীয়তের জড়তা ও গোঁড়ামি দূর হয়েছে। যখন একটি বন্ধন ছুটেছে, তখন ইজতিহাদের অন্যান্য বাধার বদ্ধ দুয়ার ও খুলে যায়।'[৩৫]

টীকাসমূহ-১৩

১. আশরাফ লাহোরী, 'আল-বুশরা'-আরবী (লাহোরঃ বেষ্ট পাঞ্জাব প্রিন্টিং প্রেস ১৩৭১/১৯৫০) পৃঃ ৫৩; ১২৪৬ হিজরী সনে শাহ মুহাম্মাদ ইসহাকের দরসে যোগদান করলেও একই সময়ে তিনি স্বীয় অবস্থানস্থল দিল্লীর পাঞ্জাবী কাট্‌রার আওরঙ্গাবাদী মসজিদে হাদীছের দরস দিতেন ('আল-হায়াত' পৃঃ ৫৯)।

২. মিয়াঁ ছাহেবের ছাত্র ও প্রথম জীবনীকার ফযল হুসাইন বিহারী, 'আল-হায়াত বা'দাল মামাত' (করাচীঃ মাকতাবা শু'আইব, ১৩৭৯/১৯৫৯) পৃঃ ১০-১২।

মিয়াঁ ছাহেবের বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ

সাইয়িদ নাযীর হুসাইন বিন (২) জাওয়াদ আলী বিন (৩) আযমাতুল্লাহ বিন (৪) এলাহ বখ্‌শ বিন (৫) মুহাম্মাদ বিন (৬) মাহ্‌রূ বিন (৭) মাহবূব বিন (৮) কুতুবুদ্দীন বিন (৯) হাশেম বিন (১০) চান্দ বিন (১১) মা'রূফ বিন (১২) বুধন বিন (১৩) ইউনুস বিন (১৪) বুযর্গ বিন (১৫) যায়রাক বিন (১৬) রুকনুদ্দীন বিন (১৭) জামালুদ্দীন বিন (১৮) আহমাদ জাজনীরী বিন (১৯) মুহাম্মাদ বিন (২০) মাহমূদ বিন (২১) দাঊদ বিন (২২) আফযাল বিন (২৩) ফুযাইল বিন (২৪) আবুল ফারাহ বিন (২৫) ইমাম হাসান আসকারী বিন (২৬) ইমাম নকী বিন (২৭) ইমাম তাকী বিন (২৮) মূসা রিযা বিন (২৯) মূসা কাযিম বিন (৩০) ইমাম জা'ফর ছাদিক বিন (৩১) ইমাম বাকির বিন (৩২) ইমাম আলী 'যায়নুল আবেদীন' বিন (৩৩) ইমাম হুসাইন বিন (৩৪) আলী ওয়া ফাতিমা বিনতে (৩৫) মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। -আল হায়াত পৃঃ ১০-১২।

৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩-১৪; নওশাহরাবী, 'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ' (লাহোরঃ নিযামী প্রিন্টিং প্রেস, ১৩৯১/১৯৮১) পৃঃ ১৩৭।

৪. 'আল-হায়াত' পৃঃ ৫; 'তারাজিম' পৃঃ ১৩৬।

৫. 'তারাজিম' পৃঃ ১৩৭ (تمہارے خاندان میں سب مولوی ہیں مگر تم جاہل ہو؟); 'আল-হায়াত' পৃঃ ২১।

৬. 'আল-হায়াত' পৃঃ ২৫।

৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪, ৩৬, ৪২। এই সময়ে উস্তায মাওলানা আবদুল খালেক স্বীয় কন্যার সাথে তাঁকে বিবাহ দেন। উস্তাদ শাহ্ মুহাম্মাদ ইসহাক স্বয়ং উক্ত বিবাহে সৈয়দ ছাহেবের 'অলি' ছিলেন (পৃঃ ৪৪)।

৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৩।

৯. শাহ ইসহাকের নিকট হ'তে প্রাপ্ত মিয়াঁ ছাহেবের শিষ্যত্বের সনদ ছিল নিম্নরূপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم – الحمدلله رب العالمين و الصلوة والسلام على سيد المرسلين محمدٍ و آله أصحابه أجمعين – أمابعد فيقولُ العبدُ الضعيفُ محمد إسحاق أنَّ السيدَ النجيبَ المولوى نذير حسين قد قرأ عليَّ أطرافا من الصحاحِ الستةِ البخارى و مسلم و

أبی داؤد و الجامع الترمذی والنسائی و ابن ماجة و شيئا من كنز العمال و الجامع الصغير و غيرها ، و سمع منى الأحاديثَ الكثيرةَ ، فعليه أنْ يَشْتَغِلَ بقراءة هذه الكُتُب و يَتَدَرَّسُ بها ، لأنه أهلُها بالشروط المعتبرَة عند أهلِ الحديث و إنى حَصَّلْتُ القراءةَ و السماعةَ و الإجازةَ لهذه الكُتُبِ من الشيخِ الأجل الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوى و هو حَصَّلَ القراءةَ والإجازةَ عن الشيخ ولى الله المحدث الدهلوى رحمة الله عليهما و باقى سنده مكتوبٌ عنده - حُرِّرَ فی ثانی شهر شوال سنة ١٢٥٨ الهجرية - الحمد لله أولا و آخراً -

محمد ١٢٥٢ اسحاق

'আল-হায়াত' পৃঃ ৬১। এখানে সনদে লেখা হিজরী সন ও মোহরের মধ্যে লেখা হিজরী সনে পার্থক্য আছে। সম্ভবতঃ স্বাক্ষরের সনে ভুল আছে। কেননা সকল জীবনীকারের মতে শাহ্ মুহাম্মাদ ইসহাক ১২৫৮ হিজরীতে স্থায়ীভাবে মক্কায় হিজরত করার প্রাক্কালে উক্ত সনদ লিখে দিয়ে যান। জীবনীকার আশরাফ লাহোরীর ভাষায় বিদায়কালে উস্তাদ তাঁকে বলেছিলেন- 'হাদীছ শিক্ষাদান ও সুন্নাতে নববীর পূণর্জাগরণের জন্য হিন্দুস্থানে তুমি আমার প্রতিনিধি।'- - أنتَ خَلِيفتى فى الهند لتعليمِ الحديث و إحياء السنة النبوىِّ (ص) البشرى ٣٨ '-আল-বুশরা' পৃঃ ৩৮। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিরোধী আলেমাগণ তাঁকে 'ছাত্র নন' বলে রটিয়ে দিয়ে সরকারকে প্ররোচিত করেন। ফলে সরকার 'ওয়াহ্হাবী' ভেবে রাওয়ালপিণ্ডির জেলে তাঁকে এক বছর যাবৎ বন্দী করে রাখে। -'আল-হায়াত' পৃঃ ১৩৫; মুহাম্মাদ মুবারক, 'হায়াতুশ্ শায়খ নাযীর হুসাইন দেহলভী' -উর্দূ (করাচীঃ আহ্লেহাদীছ ট্রাস্ট, কোর্ট রোড, করাচী-১) পৃঃ ৯-১৭।

১০. 'আল-বুশরা' পৃঃ ৫৩।

১১. জীবনীকার আশরাফ লাহোরী এই সংখ্যাকে ৮০,০০,০০০ আশি লাখ বলেছেন- و كملت بسعيه فى حياته جماعة العاملين بالحديث فى الهند على تعداد ثمانين مائة الف (৮........) -'আল-বুশরা' পৃঃ ৫২। তবে সংখ্যাটি 'আশি হাযার' হবে বলেই মনে হয়। - লেখক।

১২. জীবনীগ্রন্থ 'আল-হায়াত' পৃঃ ৬৬২-৭০৪ এবং 'আল-বুশ্রা' পৃঃ ৫৫-৫৭ হ'তে গৃহীত।

১৩. 'আল-হায়াত' পৃঃ ৬৬৪-৬৬৫।

১৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৬২-৭০৪।

১৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৬২।

১৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৫৭।

১৭. ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ৩য় সংস্করণ (দিল্লীঃ নূরুল ঈমান প্রকাশনী, ১৪০৯/১৯৮৮)-এর ভূমিকা, পৃঃ ৫; তিনখণ্ডে সমাপ্ত উক্ত সংকলনের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭২৪+৬০০+৪৮০=১৮০৪। ১৩৯০/১৯৭১ সালে লাহোর হ'তে 'আহ্লেহাদীছ

একাডেমী' কর্তৃক ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মিয়াঁ ছাহেবের নামে প্রকাশিত উক্ত সংকলনে তাঁর শিষ্যদের প্রদত্ত ফৎওয়া সমূহ তাদের নামসহ সংকলিত হয়েছে। জীবনের শেষ অংশে এসে মিয়াঁ ছাহেবের সিদ্ধান্তে অনেক দুর্বলতা এসে গিয়েছিল। যেটা শতায়ু মানুষের জন্য অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেকসময় মসজিদে রক্ষিত তাঁর সীলমোহর তাঁর বিনা অনুমতিতেই ব্যবহৃত হ'ত। সেকারণে জীবনীকার ছাত্র মাওলানা ফযল হুসাইন বিহারী বলেন- 'মিয়াঁ ছাহেবের জীবনের শেষ সিকি অংশের যেসব ফৎওয়া ইতিপূর্বেকার খেলাফ প্রমাণিত হয়, সেগুলি তাঁর নিজস্ব ফৎওয়া গণ্য করা ঠিক নয়। বরং পূর্বের ফৎওয়াগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।'- আল-হায়াত, পৃঃ ৬১৩-৬১৪।

১৮. 'মি'য়ারুল হক' পৃঃ ৫-১৯।

১৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯-২৪৭।

২০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৪-৮৫।

২১. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯।

২২. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩।

২৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫।

২৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬-৩০।

২৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০-৩১, ১২৬।

২৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৭।

২৭' আল-হায়াত' পৃঃ ৫৮৬-৮৭।

২৮ প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৯১।

২৯. (أغلاط آسامی کتب و مؤلفین در إنتصار لا تعد هستند، شاید بنظر إختصار هر چند کفایت شده) প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৯২।

৩০. দিল্লীর ফাটক হাবাশ খাঁ মসজিদ থেকে এশার ছালাত শেষে বাসায় ফেরার পথে সশস্ত্র আততায়ী তাঁকে হামলা করতে গেলে তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন, 'আমি যদি ফাতিমার বংশধর হই, তাহ'লে তুমি কখনই কামিয়াব হবেনা।' (میں اگر بنی فاطمہ ہوں تو تو اپنے ارادے میں کبھی کامیاب نہوگا) একথা শোনার সাথে সাথে নিষ্ঠুর ঘাতকের বুক কেঁপে ওঠে ও তরবারি হাত থেকে পড়ে যায়। পরে প্রচন্ড পেট ব্যথায় সে সেই রাতেই বাড়িতে মারা যায়। মৃত্যুর সময় সে বলে যায় 'আমি আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়েছি'।-'আল-হায়াত' পৃঃ ২৩৩।

৩১. একবার এক দুশমন ছাত্র তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসাভরা কবিতা ছাপিয়ে বিলি করে। সেখানে তাঁকে 'ইঁদুর খেকো বিড়াল' বলে টিটকারী করা হয়- (جب کی خراب اس نے ساری دلی + چوھے خاکر چلی حج کو بلی) তিনি হাসতে হাসতে সেটা পড়ে ক্ষুব্ধ শিষ্যদেরকে

বললেন-'সে আমাকে কিছু দিয়েছে, নেয়নিতো কিছু' آرے میاں .. اس نے ھمیں کچھ دیا ھے ، لیا تو نھیں - 'আল-হায়াত' পৃঃ ৩০৫।

৩২. বিরোধীদের প্ররোচনায় বৃটিশ সরকার তাঁকে এক বছর রাওয়ালপিন্ডি জেলে বন্দী করে রাখেন। -'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ' পৃঃ ১৪৮।

৩৩. ১৩০০ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৩ সালে হজ্জ করার জন্য মক্কায় গেলে তাঁকে চক্রান্তের মাধ্যমে গ্রেফতার করা হয়। - নযীর আহমাদ রহমানী, 'আহ্‌লেহাদীছ আওর সিয়াসাত' (বেনারসঃ জামেয়া সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৬) পৃঃ ৩৬৯। পরে মক্কার শাসক সৈয়দ ওছমান নূরী পাশা সসম্মানে তাঁকে মুক্তি দেন। তার আগে 'মিনা' প্রান্তরে পরপর তিনদিন তাঁর বক্তৃতা শুনে বিরোধী আলিমগণ তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। সাথী মৌলবী তালাত্তুফ হুসাইন আযীমাবাদী ও অন্যান্য শিষ্যগণ উক্ত ষড়যন্ত্র অবহিত হয়ে মিয়াঁ ছাহেবকে ওয়ায বন্ধ করতে পরামর্শ দিলে তিনি জওয়াবে বলেন,এই পুণ্যভূমিতে ইমাম নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হিঃ) শহীদ হয়েছিলেন। আমিও শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমি দা'ওয়াত ও তাবলীগ থেকে কখনোই বিরত হব না'- (سنو صاحب بهت جی چکا اب زندگی کی تمنا نهیں، امام نسائی بهی اسی حرم میں شهید هوئے جهاں میرے قتل کے منصوبے هو رهے هیں- میں هر وقت اپنے قتل کیلئے آماده هوں مگر اس تبلیغ سے باز نه آونگا -) -'তারাজিম' পৃঃ ১৪৮।

৩৪. میں ان دادا پوتوں کا قائل هوں جو صرف قران و حدیث سے استنباط مسائل کرتے اور اپنی رائے پر اعتماد رکھتے هیں - زید و عمرو کسی مصنف یا عالم کی پیروی نهیں کرتے - ان کی تحریر سے معلوم هوتا هے که دریائے فیضان إلهی جوش مار رها هے-

'আল-হায়াত' পৃঃ ৩০৪।

মৃত্যুঃ ১৩২০ হিজরীর ১০ই রজব মোতাবেক ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর সোমবার বাদ মাগরিব দিল্লীতে একমাত্র মেয়ের বাসায় তাঁর মৃত্যু হয় এবং পরদিন শীদীপুরা গোরস্থানে স্বীয় একমাত্র পুত্র মৌলবী শরীফ হুসাইন (৫৬)-এর কবরের পার্শ্বে সমাহিত হন। খ্যাতনামা পৌত্র হাফেয মৌলবী আবুদস সালাম (৫৫) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ের পিতা মৌলবী আবুদস সালামের পরে এই বংশের আর কেউ মিয়াঁ ছাহেবের স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারেননি। -তারাজিম পৃঃ ১৫২, ১৬১।

* **মিয়াঁ ছাহেবের জীবনের কিছু ছিটেফোঁটাঃ** (১) জীবনের ৮০টি বছর তিনি দিল্লীতে অতিবাহিত করেন। কিন্তু নিজের ও নিজের পরিবারের জন্য কোন নিজস্ব বাসস্থান তাঁর ছিল না। একটি সাধারণ ভাড়া বাসায় তিনি জীবন কাটিয়েছেন। শীত ও গ্রীষ্মের মওসুমে সেখানে থাকাই দুষ্কর ছিল। সেখানে বসেই তিনি ফৎওয়া লিখতেন ও পড়াশুনা করতেন। মাঝে মধ্যে ছাত্রদের ঠাট্টা করে বলতেন-اگر میں جس سائبان میں رهتا هوں تم ایك گهنٹه

وہاں جاکر سو رہو تو دو روپے دیتا ہوں– 'আমি যেখানে থাকি, সেখানে তোমরা গিয়ে যদি এক ঘন্টা শুয়ে থাকতে পার, তবে দু'টাকা দেব।' (২) একদা মুহাম্মাদ দীন পাঞ্জাবী কয়েকদিন তাঁর মেহমান ছিলেন। ফলে সে কয়দিন মিয়াঁ ছাহেবকে প্রায় না খেয়েই থাকতে হয়। বসার ক্ষমতা হারিয়ে ফেল্‌লে অবশেষে শুয়ে শুয়ে ছাত্রদের পড়াতেন। কিন্তু কোনদিন মুখ ফুটে কাউকে কিছু জানাননি। (৩) সওদাগর আতাউল্লাহ্ পাঞ্জাবী নামক জনৈক শিষ্য একবার তাঁকে তুলার গদি বানিয়ে দিতে চাইলে তিনি তাঁর চিরাচরিত চাটাই ছাড়তে রাযী না হয়ে বললেন, پرانی قبر پر کیا گچ کروگے 'পুরানো কবরের উপরে কি প্লাষ্টার করবে?' অথচ তাঁর ছাত্ররা সতরঞ্চিতে বস্‌ত।(৪) একবার ভূপালের রাণী সিকান্দার বেগম দিল্লী এসে তাঁকে ভূপালের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের অনুরোধ করলে তিনি বলেন, 'তাহ'লে এই গরীব চাটাইয়ের ছাত্রদের উপায় কি হবে?' (৫) ৫০ বছরের মধ্যে তাঁর কখনো তাহাজ্জুদের ছালাত ক্বাযা হয়নি। কঠিন জ্বরে মাত্র একবার ক্বাযা হয়েছিল। সুস্থ হ'লে তা আদায় করে দেন। (৬) বদরুল হাসান সাহসোয়ানী বলেন যে, একবার আমি মিয়াঁ ছাহেবকে দাওয়াত করি। কিন্তু খাওয়া শুরু করার আগেই তাঁর বমি শুরু হ'য়ে যায়। ফলে তিনি না খেয়ে চলে যান। পরে আমার পাচকের পেটে ভীষণ বেদনা শুরু হয়। পাচক আবদুল গণী ছিল রামপুরের বাশিন্দা ও মিয়াঁ ছাহেবের প্রতি দারুণ বিদ্বেষী। অবস্থা সংগীন হ'য়ে উঠ্‌লে সে এক পর্যায়ে মিনতিভরা কণ্ঠে স্বীকার করে যে, সে মিয়াঁ ছাহেবের জন্য খাসির বদলে শূকরের গোস্ত পাকিয়েছিল। এই পেটের বেদনা তার উপরে আল্লাহ্‌র গযব ছাড়া কিছুই নয়।' অতঃপর তাকে মিয়াঁ ছাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে সব কথা খুলে ব'লে ক্ষমা ভিক্ষা করে। মিয়াঁ ছাহেব তার জন্য দো'আ করার সাথে সাথে পেটের তীব্র বেদনা প্রশমিত হয়। তখন সে মিয়াঁ ছাহেবের হাতে হাত রেখে তওবা ও বায়'আত করল। তার নতুন নাম রাখা হ'ল 'আবদুল্লাহ'। এরপর সে মক্কায় হিজরত করল ও সেখানেই বাকী জীবন অতিবাহিত করল। আল্লাহ পাক এভাবেই মিয়াঁ ছাহেবকে হারাম খাদ্য থেকে হেফাযত করলেন। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। (৬) তিনি শিষ্যদের নিকট থেকে আনুগত্যের 'বায়'আত' গ্রহণ করতেন। একবার বাংলাদেশ সফরে মুর্শিদাবাদের দেবকুন্ডে এলে হাযার হাযার লোকের সমাগম হয়। তারা সকলে উক্ত মাহফিলে তাঁর হাতে 'বায়'আত' -এর সৌভাগ্য লাভ করে। অমনিভাবে পাঞ্জাবের সফরেও বহু লোক তাঁর হাতে 'বায়'আত গ্রহণ করে। -'আল-হায়াত' পৃঃ যথাক্রমে ২৪০, ২৩৩, ২৩৮ ও ২৪১, ২৩৮, ২৬৮, ২৬৬ ও ২৬৭।

৩৫. আশরাফ সিন্ধু,নাতায়েজুত্ তাক্বলীদ পৃঃ ৫৮ ; গৃহীতঃ হায়াতে শিবলী ১ম খন্ড পৃঃ ৩০৮-টীকা।

আধুনিক যুগ ৩য় পর্যায় (খ)

دور الجديد: المرحلة الثالثة (ب)

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (النواب صديق حسن خان بوفالى)

প্রায় পৌনে এক শতাব্দীকাল ব্যাপী শিক্ষকতা ও লক্ষাধিক ছাত্রের মাধ্যমে আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২) আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রসারে যে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন আমরা তা আলোচনা করে এসেছি। এক্ষণে সমসাময়িক আরেকজন অসাধারণ ধর্মীয় প্রতিভা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভূপালের স্বনামধন্য নওয়াব আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-৯০) ও তাঁর অবদান সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করব, যিনি নিজস্ব লেখনীসম্ভার ছাড়াও কুরআন-হাদীছ ও বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য ধর্মীয় গ্রন্থাদি নিজ খরচে ছাপিয়ে উপমহাদেশের বিদ্বান মহলে বিতরণ করেছিলেন। যার ফলে ইল্‌মে হাদীছ জনগণের নাগালের মধ্যে এসে যায় এবং অগণিত মানুষ সরাসরি হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার সুযোগ পেয়ে আহলেহাদীছ হয়ে যান। মিয়াঁ নযীর হুসাইন দেহলভী - এর ন্যায় সাইয়িদ ছিদ্দীক হাসান বিন সাইয়িদ আওলাদ হাসান কান্নৌজী হুসাইন বংশীয় ছিলেন এবং পিতৃ ও মাতৃ উভয়কুলে খালেছ 'কুরায়শী' ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন তাঁর ৩৩তম ঊর্ধতন পুরুষ।[১] ১২৪৮ হিজরীর ১৯শে জুমাদাল উলা কন্নৌজে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৫৩ হিজরীতে পাঁচ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘট্‌লে মায়ের তত্ত্বাবধানে কনৌজে পিতৃগৃহে লালিত পালিত হন।[২] তাঁর ১৮ বছর বয়সে মাওলানা বেলায়েত আলী (১২০৫-৬৯/১৭৯০-১৮৫২) ও এনায়েত আলী (১২০৭-১২৭৪/১৭৯২-১৮৫৮) সপরিবারে কনৌজ আগমন করেন ও কয়েক জুম'আ সেখানে ওয়ায করেন। বিদায়ের সময় বেলায়েত আলী তাঁকে 'বুলূগুল মারাম' অধ্যয়ন করার উপদেশ দিয়ে যান।[৩] এরপরেই ১৯ বছর বয়সে ছিদ্দীক হাসান দিল্লী চলে যান এবং মুফতী ছদরুদ্দীন খানের নিকটে হাদীছ, তাফসীর, ফিক্‌হ ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন।[৪] দু'বছর পরে কনৌজ ফিরে শায়খ যয়নুল আবেদীন, শায়খ হুসাইন আরব ইয়ামানী, মাওলানা আব্দুল হক বেনারসী প্রমুখ উস্তাদের নিকটে হাদীছে অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শাহ আব্দুল আযীযের দৌহিত্র মাওলানা ইয়াকূব

'মুহাজিরে মাক্কী' (১২০০-১২৮৩/১৭৮৫-১৮৬৭) -এর নিকটে চিঠি লিখে খান্‌দানে অলিউল্লাহ্ থেকেও ইল্‌মী সনদ লাভ করেন।[৫]

নানা মুফতী মুহাম্মাদ এওয়ায বাঁসবেরেলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান গণী (রাঃ)-এর বংশধর ছিলেন। দাদা সাইয়িদ আওলাদ আলী খান শী'আ ছিলেন।[৬] হায়দরাবাদের নওয়াবের পক্ষ হ'তে তিনি সম্মানসূচক 'নওয়াব আনোয়ার জঙ্গ বাহাদুর' খেতাবসহ বার্ষিক পাঁচ লাখ টাকা এবং একহাযার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী লাভ করেন।[৭] পিতা সাইয়িদ আওলাদ হাসান খান (১২১০-১২৫৩/১৭৯৫-১৮৩৭) দিল্লীতে শাহ্ আব্দুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৬-১৮২৪) ও শাহ্ রফীউদ্দীনের (১১৬২-১২৩৩/১৭৪৯-১৮১৭) নিকটে ইল্‌মে হাদীছ শিক্ষার পর পিতৃ মাযহাব ত্যাগ করে সরাসরি হাদীছের অনুসারী হন। পরে তিনি আমীর সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর (১২০১-১২৪৬/১৭৮৬-১৮৩১) নিকটে বায়'আত করেন। তিনি খ্যাতিমান আলিম বা-আমল ছিলেন। তাঁর ওয়াযের খুবই প্রভাব ছিল। কলিকাতা হ'তে লাহোর পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর পরিচিতি ছিল। দশ হাযারের বেশী অমুসলিম তাঁর হাতে বায়'আত করে ইসলাম কবুল করেন।[৮]

কিন্তু এই স্বনামধন্য দাদা ও পিতার মৃত্যুর পরে পাঁচ বছরের ইয়াতীম শিশু ছিদ্দীক হাসান কপর্দকশূন্য অবস্থায় মায়ের কাছে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে মানুষ হন। বড় ভাই তাঁকে পিতৃ সম্পত্তির অংশ দেননি।[৯] ফলে লেখাপড়াও মা-ভাইবোনদের রূযির তালাশ একই সাথে চালাতে গিয়ে ছিদ্দীক হাসানের জীবনে নেমে আসে ক্ষুৎপিপাসা ও দারিদ্রের এক নিদারুন কষাঘাত। ইতিমধ্যে তাঁর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। জনৈক আতর বিক্রেতার সাথে তিনি একসময় ভূপালে চলে আসেন এবং রাণীর নিকট থেকে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনের একটি চাকুরী লাভ করেন। কিন্তু জনৈক দরবারী আলেমের চক্রান্তে কিছুদিনের মধ্যে সে চাকুরীও চলে যায়।[১০] ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হ'লে কনৌজে তাঁর পৈত্রিক ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।[১১] ফলে চরম দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় তিনি দিশাহারার মত ঘুরতে থাকেন। দারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর দিন কাটতে থাকে। এই সময় আট মাস তিনি পিতার শিষ্য টোংকের নওয়াবের

এষ্টেটে ৫০ টাকা বেতনে চাকুরী নেন। তারপর রাণীর আমন্ত্রণে ভূপালের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে ছফর ১২৭৬/১৮৬০ থেকে মাসিক ৭৫ টাকা বেতনে পুনরায় ভূপালে ফিরে আসেন।[১২] ১২৮৫ হিজরীর ২৭শে রজব রাণী সিকান্দার বেগম মৃত্যু বরণ করেন ও তাঁর কন্যা ২য় রাণী শাহজাহান বেগম হঠাৎ বিধবা হ'লে রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্র পরিচালনার বিশ্বস্ত সহযোগী হিসাবে তিনি আল্লামা ছিদ্দীক হাসানকে ১২৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৭১ সালে বিবাহ করেন।[১৩] এটি ছিল উভয়ের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ। ছিদ্দীক হাসান ১০ই শা'বান ১২৮৯ হিঃ মোতাবেক ১৮৭২ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে রাজ্যের সর্বোচ্চ সরকারী খেতাব 'নওয়াব ওয়ালাজাহ আমীরুল মুল্ক' উপাধি প্রাপ্ত হন।[১৪] এই ভাবে এককালের ইয়াতীম ও সর্বস্বহারা মাওলানা ছিদ্দীক হাসান সর্বোচ্চ সরকারী সম্মান ও বস্তুগত উন্নতির শীর্ষে আরোহন করেন। অবশ্য মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৪ই যুলকা'দা ১৩০২ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৫ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখে তিনি উক্ত খেতাব পরিত্যাগ করেন ও নওয়াবের দায়-দায়িত্ব হ'তে অবসর গ্রহণ করেন।[১৫]

নিজের 'মাযহাব' সম্পর্কে নওয়াব ছাহেব মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে ১৩০৪ হিজরীতে শেষ করা স্বীয় আত্মজীবনীতে 'মেরা মাযহাব' শিরোনামে বলেন যে, আমার নিকট ঐ মাযহাব পসন্দনীয় যা দলীলের দিক দিয়ে সর্বাধিক ছহীহ, শক্তিশালী ও নিরাপদ। আমি বিদ্বানদের রায়ের মুকাবিলায় কিতাব ও সুন্নাতের দলীল সমূহকে পরিত্যাগ করা কখনোই পসন্দ করিনা'[১৬] 'আমি জানি যে প্রচলিত চার মাযহাবের মধ্যে 'হক' বিদ্যমান আছে কিন্তু সীমায়িত নয়' حق ان مذاهب اربعه مين دائر هے منحصر نهيں-।[১৭] তিনি বলেন, 'ফকীহদের ফৎওয়া সমূহের মধ্যে বহু ইখতেলাফ রয়েছে। পক্ষান্তরে কিতাব ও সুন্নাতের প্রকাশ্য ও স্পষ্ট হুকুম সমূহের মধ্যে কোন ইখতিলাফ নেই, কোন সন্দেহ-সংশয় নেই।'

পূর্বেকার বহু বিদ্বান সামাজিক অনুদারতা ও রাজনৈতিক সংকীর্ণতার কারণে বিভিন্ন ফিক্হী মাযহাবের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে পরিচিত ছিলেন। একারণে আয়েম্মায়ে মুহাদ্দেছীনকে অনেকে 'শাফেঈ' বলেন। অথচ তাঁরা মুজতাহিদ ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কারু মুকাল্লিদ ছিলেন না। তাঁদের

মাযহাব ছিল 'আমল বিল-হাদীছ'। মোদ্দা কথা এই যে, দ্বীনের মধ্যে যেসব ফিৎনা এসেছে তা সবই মূর্খ মুকাল্লিদগণের পক্ষ থেকেই এসেছে।'[১৮] তিনি বলেন- 'গোর পূজারী ও পীরপূজারীগণ তাওহীদপন্থীদের জানী দুশমন হয় এবং মুকাল্লিদ ব্যক্তি সুন্নাতের অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে থাকে।'[১৯] তিনি বলেন, 'আমি বিভিন্ন রায় ও মাযহাব সমূহকে কিতাব ও সুন্নাতের মানদন্ডে যাচাই করি। যেটা তার মুতাবিক পাই সেটা গ্রহণ করি, যেটা দূরবর্তী 'তাবীল' বা দুর্বল কারণ প্রদর্শনের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয় সেটা পসন্দ করিনা। যদিও তার সমর্থক বড় কোন আলিম বা শায়খ হৌন না কেন। কেননা হক-ই সবচাইতে বড় বিষয় এবং আমাদের তরীকা হ'ল কিতাব ও সুন্নাতের অনুসারী হওয়া।'[২০]

তিনি বলেন, "আমার আক্বীদা মোতাবেক আমি কোন ব্যক্তির মু'তাক্বিদ নই। বিশেষ করে ঐসব পীর ফকীর ও মাশায়েখদের তো মোটেই নই, যারা মূর্খতার এই যুগে দোকানদারী করে চলেছে। ঐসব আহমকরা এতটুকু ও খেয়াল করেনি যে আমি তো একজন 'মশহুর আহ্‌লেহাদীছ' (میں تو مشهور أهل حديث هوں) এবং 'তাক্বভিয়াতুল ঈমান' ও 'রাসায়েলে তাওহীদ'-এর অনুসারী।[২১] শী'আ হুকুমতের সময়ে দুনিয়ার লোভে বহু সম্ভ্রান্ত লোক শী'আ হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা আমার বাপকে খালেছ সন্নী ও মুহাম্মাদী বানিয়েছেন। এই দেশে 'আহলেহাদীছ' খুব কম হয়েছেন। কিছুসংখ্যক আলিম ও সুক্ষতত্ত্ববিদ যাঁরা সুন্নাতের পাবন্দ (عامل بالسنة) ছিলেন, তাঁরা যুগের সাথে তাল রেখে ফিক্বহের আড়াল (متستر بالفقه) হয়েছেন।[২২] সঠিক ও সাচ্চা মুকাল্লিদ তো তারাই যারা ইমামদের হক নির্দেশের পায়রবী করে। তারা নয় যারা এর বিরোধিতা করে।'[২৩]

তিনি বলেন যে, আমি তাকলীদকে নয় বরং দলীলকে মাযহাব বলে থাকি। কিন্তু লোকেরা তাকলীদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাকে দোষারোপ করে থাকে।[২৪]

আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খানের স্বরচিত 'আত্মজীবনী' হ'তে উদ্ধৃত উপরোক্ত বক্তব্য গুলি পর্যালোচনা করলে একথা পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে যে, তিনি প্রচলিত চার মাযহাবের কোন একটির নির্দিষ্টভাবে 'মুকাল্লিদ' ছিলেন না। বরং নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসারী ছিলেন। একস্থানে কয়েকটি ছহীহ হাদীছ বিরাজমান থাকলে তিনি তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধতম (أصح الصحيح)

হাদীছের অনুসরণ করতেন। এক পর্যায়ে তিনি নিজেকে 'মশহুর আহ্লেহাদীছ' বলেও আখ্যায়িত করেছেন। এজন্য তাঁকে সমকালীন আলিমগণ "ওয়াহ্হাবী" বলে অভিহিত করেছিলেন।[২৫]

নওয়াব ছাহেবের 'মাসলাক' সম্পর্কে কিছু কথাঃ

নওয়াব ছাহেব নিজ যবানীতেই নিজেকে 'মশহুর আহ্লেহাদীছ' বলা সত্ত্বেও হিংসুকেরা তাঁর প্রসিদ্ধিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে মোটেই চেষ্টার ত্রুটি করেনি। দুর্ভাগ্যজনক সত্য এই যে, একাজে স্বয়ং তাঁর ছেলে নওয়াব আলী হাসান খানকে ব্যবহার করা হয়েছে। নিজ নওয়াবী স্বার্থে হৌক বা সভাসদ ও প্রজাদের মনরক্ষার জন্যই হৌক তিনি তাঁর পিতার জীবনীতে বহু বে-দলীল ও অসংলগ্ন কথার অবতারণা করেছেন বলে কথিত আছে- যা পরীক্ষায় ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। যেমন তিনি স্বীয় পিতা সম্পর্কে একস্থানে বলছেন-

"তিনি খালেছ সুন্নী, মুহাম্মাদী, মুওয়াহ্হিদ, কিতাব ও সুন্নাতের অনুসারী, হানাফী ও নক্শবন্দী ছিলেন। সর্বদা হানাফী মাযহাবের দিকে নিজেকে সম্পর্কিত করতেন। কিন্তু আমল ও আক্বীদায় সর্বদা ইত্তেবায়ে সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দিতেন।"[২৬]

অন্যত্র তিনি বলেন- "মাননীয় ওয়ালাজাহ মরহুম পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত সর্বদা হানাফী তরীকায় আদায় করতেন। অবশ্য ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ এবং আউয়াল ওয়াক্তের প্রতি তিনি সর্বদা নযর রাখতেন।"[২৭]

উপরোক্ত অভিযোগ দু'টির মধ্যে প্রথমটির জওয়াব ইতিপূর্বে নওয়াব ছাহেবের আত্মজীবনীতে আমরা দেখে এসেছি। যেখানে তিনি নিজেকে একজন 'মশহুর আহলেহাদীছ' বলে অভিহিত করেছেন।[২৮] দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াবের জন্য নওয়াব ছাহেব লিখিত 'ছালাত শিক্ষা' (تعليم الصلوة) বইটিই যথেষ্ট। ২০ পৃষ্ঠার এই ছোট্ট পুস্তিকাটি তিনি মৃত্যুর মাত্র দু'বছর পূর্বে ১৩০৫ হিজরীর ৪ঠা জমাদিউছ ছানী তারিখে কয়েক ঘন্টায় লেখেন। নওয়াব ছাহেবের প্রণীত বইয়ের তালিকার মধ্যে পুত্র ও জীবনীকার নওয়াব আলী হাসান খান উক্ত বইটির নাম ও উল্লেখ করেছেন। উক্ত পুস্তিকায় 'ছালাতের পদ্ধতি' (نماز كى تركيب) শীর্ষক আলোচনায় নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান বলেন-[২৯]

'নিয়ত ছাড়া ছালাত শুদ্ধ হয়না। ছালাতের সকল হুকুম ফরয। কিন্তু মধ্যখানের তাশাহ্হুদ, জালসায়ে ইস্তিরাহাত এবং ছালাতের মধ্যকার যিক্র ও দু'আ সমূহের কোনটাই ওয়াজিব নয়। অবশ্য তাকবীরে তাহ্রীমা, মুক্তাদী হলেও সকল রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ, শেষের তাশাহ্হুদ ও সালাম ফিরানো- এই চারটি যিক্র ফরয। এতদ্ব্যতীত আর যা কিছু আছে, সবই সুন্নাত। যেমন তাকবীরে তাহ্রীমার সময়ে, রুকুতে যাওয়াকালীন, রুকু হ'তে উঠাকালীন ও তৃতীয় রাক'আতে দণ্ডায়মান হওয়াকালীন সময়ে মোট চার জায়গায় হস্ত উত্তোলন (রাফ্উল ইয়াদায়েন) করা, ছালাতে দাঁড়াবার সময়ে হাত বাঁধা, তাকবীরে তাহ্রীমার পরে ছানা পড়া ইত্যাদি। ছানার জন্য সর্বাপেক্ষা ছহীহ ও মুত্তাফাক আলাইহ দু'আ হল- 'আল্লাহুম্মা বাইদ বায়নী ....'। এতদ্ব্যতীত আ'উযুবিল্লাহ, তারপর বিস্মিল্লাহ তারপর সূরায়ে ফাতিহা এবং শেষে সশব্দে 'আমীন' বলা সুন্নাত। 'আমীন' ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েরই বলা চাই। সশব্দে 'আমীন' বলার রেওয়ায়াত নিঃশব্দে 'আমীন' বলার রেওয়ায়াতের মুকাবিলায় অধিকতর ছহীহ ও শক্তিশালী। অমনিভাবে সুন্নাত হ'ল সূরায়ে ফাতিহার সংগে অন্য একটি সূরা পাঠ করা, ... মধ্যবর্তী তাশাহ্হুদ ..... এবং ঐসকল দু'আ যা প্রত্যেক রুকন-এর মধ্যে রয়েছে। যেমন রুকু, সিজদা, ক্বওমা ও বৈঠকের দু'আসমূহ। অতঃপর শেষ তাশাহ্হুদের পরে দু'আয়ে মাছূরাহ্ বা তার বাইরের যে কোন দু'আর মাধ্যমে প্রার্থনা করবে।" উক্ত বর্ণনার পরে 'ফায়েদা' শিরোনামে নওয়াব ছাহেব ঐ সকল হাদীছের তরজমা উদ্ধৃত করেছেন, যে সকল হাদীছে তা'দীলে আরকান অর্থাৎ ছালাতের প্রতিটি রুকন ধীরে ধীরে আদায় করা, তাওয়াররুক অর্থাৎ শেষ বৈঠকে বাম পা ডান পায়ের নীচে দিয়ে বের করে নিতম্বের উপরে ভর দিয়ে বসা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন- 'এখন উচিত যে কোন ছালাত আদায়কারী যেন উপরোক্ত পদ্ধতি অতিক্রম না করে। তা করলে তার ছালাতে ত্রুটি থেকে যাবে।'[৩০]

উপরের বক্তব্য থেকে নওয়াব ছাহেবের মুকাল্লিদ হওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি দাঁড় করানো যায় না, বরং তিনি একজন খাঁটি আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রমাণিত হন।

আল্লামা সৈয়দ ছিদ্দীক হাসান খান প্রথমদিকে আশ'আরী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট

ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত তাফসীর 'ফাৎহুল বায়ান'-কে এ ব্যাপারে প্রমান হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু ১২৮৫/১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হজ্জ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলে সেখানকার খ্যাতনামা আলিমদের সঙ্গে তাঁর মতবিনিময় হয়। বিশেষ করে আল্লামা হামাদ বিন আতীক্ব (মৃঃ ১৩০১/১৮৮৩ খৃঃ) তাঁকে নছীহত করে মূল্যবান একটি পত্র লিখেন। যেখানে তিনি তাঁকে ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮/১২৬২-১৩২৮) ও হাফেয ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ/১২৮৯-১৩৫০ খৃঃ)-এর আকীদা সংক্রান্ত কিতাবসমূহ অধ্যয়নের অনুরোধ করেন। দেখা গেল চার বছর পরে ১২৮৯/১৮৭২ সালে আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান তাঁর পূর্বের আকীদা পরিবর্তন করে এতদ সংক্রান্ত তাঁর জীবনের শেষ রচনা 'ক্বাৎফুছ ছামার' (قطف الثمر فى عقيدة أهل الأثر) নামক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশ করেন।[৩১] আহ্‌লেহাদীছের আকীদার উপরে গ্রন্থটিকে একটি প্রামাণ্য দলীল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অবদান

আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান যখন তাঁর ইল্‌মের জ্যোতি বিকীরণ শুরু করেন, তখন তাঁর সময়কার ভারতবর্ষে মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "হিন্দুস্থানে দুই মাযহাবের মুসলমান ছিল- শী'আ ও হানাফী। শী'আদের রাজত্বকালে দুনিয়ার লোভে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শী'আ হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আমার পিতাকে খালেছ সুন্নী ও মুহাম্মাদী বানিয়েছেন। এই দেশে আহ্‌লেহাদীছ খুব কম হয়েছেন। কিছু সংখ্যক বিদ্বান যারা সুন্নাতের পাবন্দ ছিলেন... তাঁরা অবস্থার প্রেক্ষিতে ফিক্‌হের আড়ালে (متستر بالفقه) মুখ লুকিয়েছেন। শায়খ আবদুল হক দেহলভী (৯৫৮-১০৫২/১৫৫১-১৬৪২) মুহাদ্দিছ হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু হানাফী মাযহাবের সমর্থনে লিখেছেন (محرر مذهب أبى حنيفه)।...শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) স্বীয় কিতাবসমূহে রায় ও তাকলীদ হ'তে নিষেধ করেন এবং ইত্তেবায়ে সুন্নাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। .... তাঁর পরে শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর সময়ে লোকদের মধ্যে তাকলীদের ঝগড়া শুরু হয়। ঝগড়া শেষ না হ'তেই শাহ শহীদের সৌভাগ্যমণ্ডিত যামানা অতিক্রান্ত হ'য়ে যায়। এই সময়ের পরে এখন আর কোন যোগ্য আলিম

নেই, যারা ফিক্হের উপরে পূর্ণ আয়ত্ত রাখেন।"[৩২]

নওয়াব ছিদ্দীক হাসানের সময়ে (১৮৩২-৯০ খৃঃ) ভারতবর্ষে হাদীছের রেওয়াজ ছিল খুব কম। রায়, কিয়াস ও মাযহাবী ফিক্হের রেওয়াজ ছিল বেশী। রাজ দরবার হ'তে পর্ণ কুটীর পর্যন্ত সর্বত্র ছিল একই অবস্থা। এমনকি ভারতগুরু শাহ আবদুল আযীযের (১১৫৯-১২৩৯ হিঃ/ ১৭৪৬-১৮২৪ খৃঃ) দরসগাহে মাত্র দু'খানা বুখারী শরীফ ছিল। যার বিভিন্ন পারা খণ্ড খণ্ড করে ছাত্রদের মধ্যে বিলি করা হ'ত এবং পাঠশেষে ফিরিয়ে নেওয়া হ'ত।[৩৩] তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্রের অবস্থা যদি এই হয়, তাহ'লে ভারতের অন্যান্য স্থানের অবস্থা সহজেই অনুমান করা চলে।

সর্বত্র মাযহাবী ফিক্হের রেওয়াজ থাকার কারণে মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের অনুসারী মুকাল্লিদ হিসাবে পরিগণিত হন। ফলে মাযহাববিরোধী কোন বক্তব্য তা যতই ছহীহ দলীলভিত্তিক হৌক না কেন, তা মেনে নিতে সমাজ প্রস্তুত ছিল না। তাই সেই সময়কার মুসলিম সমাজকে এক কথায় 'তাকলীদী সমাজ' বলা চলে।

মাযহাবী ফিক্হভিত্তিক ইসলাম যা ছিল তা-ও ছিল বিকৃত। ফিক্হগ্রন্থে নেই এমন বহু কিছু বিষয় মাযহাবের নামে চালু হয় এবং শিরক ও বিদ'আত ব্যাপকভাবে মুসলিম সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নওয়াব ছাহেবের ভাষায় "হিন্দুস্থানী মুসলমানদের মধ্যে শিরক ও বিদ'আতের প্রচলন ছিল। আর যারা সুন্নী ছিল তারা ছিল গোরপূজারী ও পীরপূজারী।'[৩৪]

শী'আ দাদা ও মুহাম্মাদী পিতার ঘরে লালিত পালিত হ'য়ে আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান কর্মজীবনে চরম বিদ'আত অধ্যুষিত ভূপাল শহরে দীর্ঘ ৩৭ বৎসরের জীবনে অত্যন্ত কঠিন বিরোধী ও শত্রুতামূলক পরিবেশ অতিক্রম করেন। প্রচলিত মাযহাবী ইসলামের তিনি বিরোধিতা করেন। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তাকলীদের বন্ধনমুক্ত হ'য়ে নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসরণে ব্রতী হন ও লেখনী ধারণ করেন। সকল অবস্থাতেই তিনি নিজস্ব ইল্মের আলোকে স্বাধীনভাবে পথ চলেছেন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণের পথে সকল বাধাকে তিনি হাসিমুখে বরণ করেছেন। কোন বাধাই তাঁকে পবিত্র কুরআন

ও সুন্নাহ্র মানদন্ড হ'তে বিচ্যুত করতে পারেনি।

যেহেতু সমাজ ছিল তাঁর সম্পূর্ণ বিরোধী, তাই তিনি শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২) -এর মত লেখনীর মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের পথ বেছে নেন। যদিও এপথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অতঃপর এভাবেই ভারতবর্ষে 'ফিক্হুল মাযহাব'-এর বদলে 'ফিক্হুল হাদীছ'-এর প্রচলন হয়, যদিও শাহ অলিউল্লাহ্ ও শাহ ইসমাঈল শহীদের হাতে আগেই এর প্রবর্তন ঘটেছিল। আল্লামা ছিদ্দীক হাসান স্বীয় আত্মজীবনীতে বলেন, আমার হাতে 'ফিক্হে সুন্নাত'-এর কিতাবসমূহের রেওয়াজ ঘটে এবং আরবী, ফারসী ও উর্দূ তিন ভাষায় আরব-আজমের সর্বত্র পৌঁছে যায়।"[৩৫]

স্বীয় লেখনীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলেন "আমার অধিকাংশ লেখনী তাহকীক বা সুক্ষ্ম গবেষণার ভিত্তিতে লিখিত।" এতদসত্ত্বেও তিনি সকল বিদ্বানমন্ডলীকে আহবান জানিয়ে বলেন, "দ্বীনদার বিদ্বানগণের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, আমার কিতাবের যেসব মাসআলা কিতাব ও সুন্নাতের ছহীহ দলীলের বিরোধী প্রমাণিত হবে, তা যেন উঠিয়ে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারা হয় এবং যেসব মাসআলা কুরআন ও হাদীছের অনুকূলে হবে, তা যেন কবুল করা হয়। আমি ইনশাআল্লাহ আমার প্রতিবাদে খুশী হব। .... বরং ভুল ও শুদ্ধির সমালোচনাই সকলের নিকটে আমার একান্ত দাবী। আমি প্রত্যেকের ঐ সকল উত্তম কথা যা শরীয়ত ও জ্ঞানের অনুকূলে, তা কবুল করি। যদিও ঐ ব্যক্তি আমার সমান বা আমার ছোট হৌক না কেন। পক্ষান্তরে যে কথা দলীলের খেলাফ হবে তা কবুল করিনা, যদিও তার সমর্থক কোন বড় আলিম, ফাযিল ও যোগ্য ব্যক্তি হৌন না কেন।"[৩৬]

তিনি বলেন, "মূলতঃ কিতাবগুলি আমি আমার নিজের ফায়েদা হাছিলের জন্য লিখেছিলাম। কাউকে ফায়েদা পৌঁছাবার জন্য নয়। তবু কিতাবগুলি অন্যের উপকারে এসে গেছে। লেখনীর ব্যাপারে আমার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ নিজের উপকার সাধন করা যে, প্রত্যেক হুকুম ও মাসআলার ব্যাপারে হক-কে বাতিল হ'তে এবং বিশুদ্ধতম ও বিশুদ্ধ (أصح و صحيح)- কে দুর্বলতম ও দুর্বল (أضعف و ضعيف) হ'তে বাছাই করা। একই সাথে দলীল থেকে প্রমাণিত বিষয়গুলি রায়-এর ভিত্তিতে লিখিত বিষয়গুলি হ'তে পৃথক করা। এর দ্বারা

আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ঐসব মুসলমানকে ফায়েদা পৌঁছানো, যারা কোন প্রকারের গোঁড়ামি (تعصب) ছাড়াই কেবল হক-এর সন্ধানী এবং ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর উপরে চলতে আগ্রহী।[৩৭]

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনে আল্লামা ছিদ্দীক হাসানের সবচেয়ে বড় আবদান ছিল হাদীছ ও ফিক্বহুল হাদীছের দুর্লভ কিতাবসমুহের প্রকাশনা ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ। জীবনের প্রথম তিন চতুর্থাংশ চরম দারিদ্রের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হ'লেও ১২৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভূপালের বিধবা রাণী শাহজাহান বেগমের সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহের পর হ'তে তিনি অঢেল সম্পদের মালিক হন। এই সম্পদকে তিনি দ্বীনের তাবলীগের কাজে ব্যয় করেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দ্বীনী কিতাবসমূহ মিসর ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ছাপাখানা হ'তে ছাপিয়ে এনে হিন্দুস্থান ও অন্যত্র বিলি করেন। তিনি বলেন যে, আমার অধিকাংশ সম্পদ কিতাব ও সুন্নাতের ইল্‌মসমূহ প্রচারের পিছনে ব্যয় হয়ে যায়। আমি প্রতিটি গ্রন্থ একহাযার কপি ছেপে এনে নিকট ও দূরের সকল দেশে বিলি করেছি। কারু কাছ থেকে কখনও কিতাবের মূল্য নেইনি। আমার সন্তানেরা বহু গ্রন্থ রচনা করেছে।'[৩৮] অতঃপর রাণী শাহজাহান বেগম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "রাণীর গর্ভে আমার কোন সন্তান জন্মেনি। তবে গ্রন্থ প্রকাশনা ও প্রচারণার মাধ্যমে- যা সৌভাগ্যের দিক দিয়ে রক্তের সন্তানের চেয়েও অধিক, সেই সব ভাবগত সন্তানের (أولاد معنوى) সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। যা কেবলমাত্র উচ্চ মর্যাদা ও অবসর পাওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছিল। যদি রাণীর সঙ্গে আমার বিবাহ না হ'ত, তাহ'লে বাস্তবিকপক্ষে ঐসব দ্বীনী কিতাবসমূহের প্রকাশনা ও প্রচারের কোন সুযোগ আমার হ'ত না।"[৩৯]

গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনা ছাড়াও আরব দেশ থেকে হাদীছের বহু কিতাব খরিদ করে এনে তিনি হিন্দুস্থানে বিলি করেন। বহু দুর্লভ গ্রন্থ তিনি মিসর, বৈরুত ও হিন্দুস্থানের বিভিন্ন ছাপাখানা হ'তে ছাপিয়ে এনে বিপুলহারে বিভিন্ন দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও লাইব্রেরীসমূহে অনুদান হিসাবে দেন। ফলে আরব-আজমের এমন কোন কুতুবখানা ছিলনা যেখানে নওয়াব ছাহেবের রচিত বা প্রকাশিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যেতনা।[৪০]

বিগত ওলামায়ে দ্বীনের যে সমস্ত কিতাব বহু অর্থব্যয়ে ছাপিয়ে তিনি ফ্রি বিলি করেন, তন্মধ্যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হ'লঃ ১। ছহীহ বুখারীর ভাষ্য 'ফাৎহুল বারী' ২। তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩। ইমাম শাওকানীর 'নায়লুল আওত্বার' প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত তাঁর নিজস্ব রচনার সংখ্যা ছিল বিপুল। মাওলানা আবু ইয়াহ্‌ইয়া ইমাম খান নওশাহ্‌রাবী স্বীয় বইয়ে নওয়াব ছাহেবের রচিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২২২ খানা কিতাবের তালিকা দিয়েছেন যা সত্যিই বিস্ময়কর।[৪১]

গ্রন্থপ্রণয়ন, প্রকাশনা ও সুষ্ঠু বন্টনের ব্যবস্থা ছাড়াও তিনি ইয়াতীম ও ছিন্নমূল ছেলেমেয়েদের জন্য মাদরাসা সুলাইমানিয়া ও মাদরাসা বিলক্বিসিয়াহ, মাদরাসা জাহাংগীরী ও মাদরাসা ছিদ্দীক্বী প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে মৌলবী, আলেম, ফাযেল, মুফতী, মুন্‌শী ও কাবেল-মোট ছয়টি স্তরের ডিগ্রী দেওয়া হ'ত। তাদেরকে যোগ্যতানুসারে মাসোহারাও দেওয়া হ'ত।

মাদরাসা ছাড়াও তিনি কয়েকটি কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন কুতুবখানা ফায়যে আম, কুতুবখানা মাদরাসা জাহাংগীরী, কুতুবখানা সরকারী, কুতুবখানা ওয়ালাজাহী। শেষোক্ত কুতুবখানাটি মৃত্যুর পূর্বে তিনি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। সেখান থেকে তাঁর পুত্র নওয়াব আলী হাসান খান নিজের অংশের গ্রন্থসমূহ 'নাদ্‌ওয়াতুল উলামা' লাক্ষ্ণৌ-এর জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন।[৪২] কিছু কিতাব ভূপালের 'নূরমহল'-এ ব্যক্তিগত কুতুবখানায় আছে।[৪৩]

এতদ্ব্যতীত হাদীছ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি কুরআনের ন্যায় হাদীছ হেফ্‌য করার জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কারসমূহ ঘোষণা করেন। যেমন- ১। ছহীহ বুখারী শরীফ হেফ্‌য করার জন্য এক হাযার টাকা ২। বুলূগুল মারাম-এর জন্য একশত টাকা। শুধু তাই নয় যারা উক্ত মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন তাদেরকে হেফ্‌য শেষ হওয়া অবধি মাসিক ত্রিশ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হবে। যারা এই ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে দু'জনের নাম পাওয়া যায়। একজন হাফেয মৌলবী হাকীম আবদুল ওয়াহ্‌হাব নাবীনা দেহলভী (অন্ধ হাফেয) এবং অন্যজন হ'লেন মৌলবী আবদুত্‌ তাওয়াব গযনবী আলীগড়ী।[৪৪]

নওয়াব ছাহেবের এই ব্যাপক প্রচার ব্যবস্থাপনায় বিরোধী আলিমদের মধ্যে

বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা চক্রান্ত শুরু করে এবং জনগণকে নওয়াবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে গোপন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। নওয়াব ছিদ্দীক হাসান সবকিছু জেনেও কোন প্রতিকার করেননি। বরং নওয়াবী ছেড়ে দেওয়াই নিরাপদ মনে করেন।

দুশমনদের চক্রান্তের কোন জওয়াব তিনি দিতেন না। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি বলেন, "দুনিয়ার ব্যাপারে আমার দুশমন ছিল। যখন কোন দিক দিয়েই তারা আমার উপর প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম না হয়, তখন চক্রান্তের মাধ্যমে কখনও আমাকে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করে। কখনও গোপনে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কখনও জাদুকরদের সাহায্য নিয়ে আমার উপরে জাদু করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের কোন কৌশল যখন সফল হ'ল না, তখন তারা আমার উপরে মাযহাবী তোহমত ও রাজ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগ এনে হাংগামা শুরু করে দেয়। .... এর পরে আমার পারিবারিক ব্যাপারেও তারা ভিত্তিহীন আজগুবি সব প্রচারণা শুরু করে এবং প্রেস ও পত্রিকাসমূহের মাধ্যমে তা শহরে-গ্রামে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়।"[৪৫]

".... এই বৎসর ১৩০৫ হিজরীতে এই শহরে (ভূপালে) আমার অবস্থানের মেয়াদ ৩৫ বছর হ'তে চল্ল। কিন্তু ভাল-মন্দ সকলেই যেন আমাকে এড়িয়ে চল্তে চায়। কাউকেই আমি বন্ধু হিসাবে পেলাম না। যদিও আমি কারু প্রতি খারাব ধারণা রাখিনা বা বিদ্বেষ পোষণ করিনা। আমি যেন এখানে কবির কথায়- خلوت در أنجمن و سفر در وطن 'মজলিসের মধ্যেও একা এবং ঘরের মধ্যেও মুসাফির' অবস্থায় আছি।'[৪৬] ...... 'হিংসুক ও বিরোধীরা বহুদিন থেকে উর্দূ ও ইংরেজী পত্রিকাসমূহের মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে শত শত গীবত ও তোহমত রটনা করেছে। কিন্তু আমি কোন জওয়াব দেইনি। .....ঐসব শত্রুরা মূলতঃ আমার বন্ধু। তাদের গীবত-তোহমত, গালি-গালাজ ও মিথ্যা প্রচারণা ইন্শাআল্লাহ আমার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হতে মাগফিরাতের কারণ হবে।'[৪৭]

জীবনের তিন চতুর্থাংশ সময় চরম দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান ছিলেন চরম ত্যাগ ও ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক। পিতার মৃত্যুর পরে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে পৈতৃক সম্পত্তির অংশ হ'তে মাহরূম হয়ে ও একইসাথে

বিধবা মা ও ছোট বোনদের যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মাত্র ২৪ বছরের এই বেকার মুত্তাক্বী আলিমের অবস্থা কি হ'তে পারে সহজেই অনুমান করা চলে। পরবর্তীতে বৈবাহিক জীবনে প্রথমা স্ত্রী ও তার পক্ষের সন্তানদের কাছ থেকে আমৃত্যু নিষ্ঠুর ব্যবহারে অতিষ্ঠ আল্লামা ছিদ্দীক হাসান 'আহলেহাদীছ' হওয়ার অপরাধে (?) সামাজিক জীবনেও ছিলেন বিরোধীদের চরম হিংসা ও বিদ্বেষের শিকার। বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ এই মানুষটি তাঁর ৫৮ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভূপালে ৩৭ বছর চরম বিরোধী পরিবেশে কালাতিপাত করেন। তার মধ্যে ১৪ বছর নওয়াবীর গুরুদায়িত্ব বহনের মত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যস্ততার মধ্যেও প্রায় সোয়া দু'শো ছোট বড় মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা হওয়া সত্যিই অলৌকিক ব্যাপার বৈ-কি। তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, অপরিমেয় মেধা, গভীর ধৈর্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সর্বোপরি আল্লাহ্র বিশেষ রহমত একত্রিত হ'লেই কেবল এটা সম্ভব হ'তে পারে।

লেখক ও রাজনীতিক হওয়ার সাথে সাথে কুরআন ও হাদীছে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য সমসাময়িক আলিম সমাজের ঈর্ষার কারণ ছিল। পাণ্ডিত্য অর্জনের চাইতে ইল্মে হাদীছের প্রচার ও প্রসারেই তাঁর অধিক মনোযোগ ছিল। যার কারণে আলিমদের খান্কাহ থেকে বের হয়ে কুরআনের তাফসীর ও হাদীছ জনসাধারণের নাগালের মধ্যে এসে যায়। বলা চলে যে, এটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। তিনি সাথে সাথে উঁচুদরের কবিও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় তাঁর লিখিত 'আল-ক্বাছীদাতুল আম্বারিয়াহ' (القصيدة العنبرية) এব্যাপারে উল্লেখের দাবী রাখে।[৪৮]

জিহাদ আন্দোলন ও নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান

নওয়াব ছাহেবের পিতা সাইয়িদ আওলাদ হাসান কান্নৌজী (১২১০-৫৩/১৭৯৫-১৮৩৭) সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর (১২০১-৪৬/১৭৮৬-১৮৩১) হাতে জিহাদের বায়'আত করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে নওয়াব ছাহেবের বাড়ীঘর ধূলিস্যাৎ করা হয়। তাছাড়া মা-বোন সকলের দায়-দায়িত্ব তাঁর উপরে ছিল। বাস্তুহারা নিঃস্ব এই বেকার যুবকের পক্ষে ঐ সময় এককভাবে সশস্ত্র জিহাদের চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল।

সর্বোপরি ছিল ব্যাপক ওয়াহ্হাবী ধরপাকড়। সে কারণ তিনি লেখনী যুদ্ধের পথ বেছে নেন। তাঁর অধিকাংশ লেখনীতে জিহাদের প্রেরণা থাক্ত। তাঁর রচিত 'তারজুমানে ওয়াহ্হাবিইয়াহ্' 'ইক্বতিরাবুস্ সা'আহ' 'হেদায়াতুস্ সায়েল' 'মাজমূ'আ খুত্বাব' প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল জিহাদী অনুপ্রেরণায় ভরা। শেষোক্ত বইয়ে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর জ্বালাময়ী জিহাদী ভাষণ সংযোজিত হয়েছে। উক্ত কেতাবগুলি তিনি সারা ভারতে ফ্রি বিলি করেন। এইভাবে সমগ্র ভারতে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব ও ইসলামী জোশ সৃষ্টি করার ব্যাপারে আল্লামা ছিদ্দীক হাসান-এর এই গোপন প্রচেষ্টার কথা পরবর্তী রাণী সুলতান জাহান বেগম স্বীকার করেছেন এবং জীবনীকার পুত্র নওয়াব আলী হাসান খান একটি পৃথক অধ্যায় রচনার মাধ্যমে নওয়াব ছাহেবকে রাজদ্রোহের অপরাধ হ'তে বাঁচানোর চেষ্টা করেও প্রকৃত কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

নওয়াব ছাহেবের শত্রুরা কোনদিকে পেরে না উঠে অবশেষে তাঁকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করে ইংরেজের হাত দিয়ে খতম করানোর পরিকল্পনা আঁটে এবং তাঁর সমস্ত জিহাদী বই সমূহ ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করে। বিশেষ করে আল্লামা ইসমাঈল শহীদের খুৎবাটি ফ্রি বিলি করার বিষয়টিকে খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলে সরকারের কানভারি করা হয়। যেখানে বলা আছে 'যে ব্যক্তি বাতিল-এর বিরুদ্ধে জিহাদ করল না কিংবা জিহাদের সংকল্প করল না, সে ব্যক্তি মুনাফিকদের মধ্যে গণ্য হবে।'

পরিনাম যা হবার তাই হ'ল। বিরোধীদের ষড়যন্ত্র কার্যকর হ'ল। জীবনীকার নওয়াব আলী হাসান খানের ভাষায়, 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিশোধের তরবারি সঞ্চালিত হ'ল। দেহ হ'তে মস্তক ছিন্ন হ'তে আর বেশী দেরী ছিল না। কিন্তু মন্দ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বিবেচনার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাদেরকে এই কঠিন পদক্ষেপ হ'তে বিরত করেন।' রাণীর খাতিরে নওয়াব ছাহেবকে হত্যা না করে ক্ষমতাহীন করাকেই তারা যুক্তিযুক্ত মনে করল এবং তাঁকে বরখাস্ত করে কর্ণেল ওয়ার্ডকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হ'ল।[৪৯]

তিনি ব্যাপক সামাজিক বিরোধিতার মধ্যে ১৯টি বে-শরা রসম-রেওয়াজ উচ্ছেদ করেন এবং আরও ২৬টি অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কাল তাঁকে সময় দেয়নি। এতদ্ব্যতীত ১১টি কল্যাণপ্রথা তিনি চালু

করেছিলেন।[৫০] সাথে সাথে কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা, ভাষ্য, পুস্তক-পুস্তিকার ব্যাপক প্রকাশনার মাধ্যমে শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা ইসলামী বিশ্বে সংস্কার ও জাগরণের এক নবযুগের সৃষ্টি হয়। একারণেই আল্লামা শামসুল হক ডিয়ানবী (১২৭৩-১৩২৯/১৮৫৭-১৯১১), মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী (মৃঃ ১৩৩৮/১৯২০ খৃঃ) প্রমুখ অনেক বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম যথার্থভাবেই তাঁকে 'চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর অন্যতম মুজাদ্দিদ' বা যুগসংস্কারক বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৫১] তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, বিপুল লেখনী ও ব্যাপক প্রচারণার ফলে উপমহাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন ব্যাপকরূপ লাভ করে।

টীকাসমূহ-১৪

১. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, 'ইব্ক্বাউল মিনান বি-ইলক্বাইল মিহান' (আত্মজীবনী) লাহোরঃ দারুল দা'ওয়াতিস সালাফিইয়াহ, শীশমহল রোড, ১ম সংস্করণ ১৯৮৬) পৃঃ ২৮-২৯।

তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ

ছিদ্দীক হাসান বিন (২) হাসান বিন (৩) আলী বিন (৪) লুৎফুল্লাহ বিন (৫) আযীযুল্লাহ বিন (৬) লুৎফে আলী বিন (৭) আলী আছগর বিন (৮) সাইয়িদ কাবীর বিন (৯) তাজুদ্দীন বিন (১০) জালাল রাবে' বিন (১১) সাইয়িদ রাজু শহীদ বিন (১২) সাইয়িদ জালাল ছালিছ বিন (১৩) হামেদ কাবীর বিন (১৪) নাছিরুদ্দীন মাহমূদ বিন (১৫) জালালুদ্দীন বুখারী ওরফে 'মাখদূম জাহানিয়াঁ জাহাঁগাশ্ত' বিন (১৬) আহমাদ কাবীর বিন (১৭) জালাল আযম গুলসুর্খ বিন (১৮) আলী মুওয়াইয়িদ বিন (১৯) জা'ফর বিন (২০) আহমাদ বিন (২১) মুহাম্মাদ বিন (২২) আবদুল্লাহ বিন (২৩) আলী আশক্বার বিন (২৪) জা'ফর যাকী বিন (২৫) আলী নকী বিন (২৬) আলী রিযা বিন (২৭) মূসা কাযিম বিন (২৮) ইমাম জা'ফর ছাদিক বিন (২৯) মুহাম্মাদ বাকির বিন (৩০) ইমাম আলী 'যায়নুল আবেদীন' বিন (৩১) ইমাম হুসাইন বিন (৩২) আলী ওয়া ফাতিমা বিনতে (৩৩) মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)।- ঐ, আত্মজীবনী 'ইবক্বাউল মিনান' পৃঃ ২৮।

২. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০।

৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৪-৪৫।

৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬-৫৬।

৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৭।

৬. ইমাম খান নওশাহরবী, 'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ' (ফায়ছালাবাদঃ জামে'আ

সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৩৯১/১৯৮১) পৃঃ ২৩৭; 'ইবকাউল মিনান' পৃঃ ২৯।

৭. 'মিনান' পৃঃ ২৯।

৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯-৩০; 'তারাজিম' পৃঃ ২৩৭।

৯. 'মিনান' পৃঃ ১৫৭।

১০. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১২-১১৪; দরবারের সেরা আলিম মাওলানা আলী আব্বাস চিড়িয়াকোটীর সাথে 'হুক্কা পান' সম্পর্কিত এক মাসআলায় মতবিরোধ হ'লে এক বছরের মাথায় তাঁকে চাকুরী হারাতে হয়। -'তারাজিম' পৃঃ ২৩৯-৪০।

১১. 'তারাজিম' পৃঃ ২৪০-৪১; 'মিনান' পৃঃ ১০২।

১২. মিনান পৃঃ ১১৩।

১৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৭, ২২৩; 'তারাজিম' পৃঃ ২৪৩; আল্লামার প্রথম বিবাহ ভূপালের মুখ্যমন্ত্রীর বিধবা কন্যা ১ম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বংশধর যাকিয়া বেগমের সাথে ১২৭৭ হিজরীর ২৫শে শা'বান তারিখে রাজধানী ভূপালে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব স্বামীর কয়েকটি সন্তান ছাড়াও এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। তবে আফগান বংশোদ্ভূত রাণী দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান হয়নি। -মিনান' পৃঃ ১১২-২৪, ১৬২, ২৩৮।

১৪. 'তারাজিম' পৃঃ ২৪৭।

১৫. 'মিনান' পৃঃ ২২৩, ২৪৭।

১৬. প্রগুক্ত পৃঃ ৮৪, ৮৮।

১৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৭।

১৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৪-৮৫।

১৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮১।

২০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯১।

২১. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৯-২৯০।

২২. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫২।

২৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৩।

২৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৮।

২৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৯, তারাজিম পৃঃ ২৪৫ ; গৃহীতঃ মা'ছিরে ওয়ালাজাহ ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩০।

২৬. মাওলানা নাযীর আহমাদ আমলুবী রহমানী, 'আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত' (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিইয়াহ ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬খৃঃ) পৃঃ ১৬৮; গৃহীতঃ সীরাতে ওয়ালাজাহী ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১।

২৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৯ ; গৃহীতঃ পূর্বোক্ত ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৬৩।

২৮. 'ইব্‌কাউল মিনান' পৃঃ ২৯০; 'আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত' পৃঃ ১৮২।

২৯. 'আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত' পৃঃ ১৭৯-১৮১; গৃহীতঃ তা'লীমুছ ছালাত পৃঃ ৯-১১।

৩০. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮১ ; গৃহীতঃ তা'লীমুছ ছালাত পৃঃ ১১।

৩১. ডঃ আছেম বিন আবদুল্লাহ, 'ক্বাৎফুছ ছামার'-এর ভূমিকা (মদীনাঃ জামে'আ ইসলামিয়াহ্ ১ম সংস্করণ, ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ১২, ২৬, ৮।

৩২. 'মিনান' পৃঃ ১৫২।

৩৩. 'তারাজিম' পৃঃ ২৪৩-৪৪।

৩৪. 'মিনান' পৃঃ ২০১।

৩৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৯।

৩৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৫।

৩৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৩।

৩৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৫।

৩৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬২-৬৩।

৪০. 'তারাজিম' পৃঃ ২৪৩।

৪১. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫১-৬১।

৪২. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৬-৪৭।

৪৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬১।

৪৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৭।

৪৫. 'মিনান' পৃঃ ১১৫-১৬।

৪৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩৮।

৪৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭২-১৭৩, ২৩৯।

৪৮. 'তারাজিম' পৃঃ ২৪১।

৪৯. انہوں نے نہایت ہوشیاری سے ہندوستان کے وسیع و عریض علاقوں میں مخفی طور پر جہاد کی تبلیغ شروع کر دی - اپنی کتاب ہدایۃ السائل مطبوعہ ۱۲۹۲ھ میں ص ۹۰ تا ۱۰۳ پر ضرورت جہاد پر نہایت شدومد سے ترغیب دی گئی- مجموعہ خطب میں انہوں نے حضرت شاہ إسماعیل کا وہ خطبہ شامل کیا جس میں شاہ صاحب نے انگریزوں کے خلاف عربی میں جہاد کی ترغیب دی ہے (ص۱۹۲)..... نواب صاحب کا باغیانہ لٹریچر برٹش گورنمنٹ کے نوٹس میں آیا اور محکمہ خفیہ کی رپورٹ نواب صاحب کے خلاف حکام بالا تک پہونچی (۱۹۳)...نواب صاحب کے مخالفوں نے گورنمنٹ کے کان بھرے .. سب سے پہلے کتاب مجموعہ خطب کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کیا گیا جو پورے ملک میں مفت

تقسیم کیا گیا تھا -(١٩٤)...نواب صاحب کا لڑکا نواب علی حسن خان کے بیان کے مطابق " فرنگی سامراج کی تیغ انتقام حرکت میں آگئی تھی اور سر کے جدا ہونے میں زیادہ دیر نہ تھی - لیکن مشیت ایزدی نے سیاسی مصالح کی بنا پر اس سخت اقدام سے روك دیا- (١٩٨) .. نواب صاحب کو بیگم صاحبہ کی خاطر بے دست و پا بنا دینے کو کافی سمجھا گیا اور تھوڑے ھی عرصہ میں وزارت کا عہدہ یا ریاست کا نظام کرنل وارڈ کے حالات پر قابو پا لیا اور نواب صاحب کو خانہ نشین ہونے پر مجبور کر سپرد کرکے تمام دیا -(١٩٨) সাইয়িদ আবিদ আলী হুসাইনী (ভূপালের বিচারপতি), 'ভূপালঃ তাহ্রীকাতে আযাদী কে আয়েনা মেঁ' অধ্যায়ঃ 'তাহরীকে জিহাদ আওর নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, হিন্দুস্তানী রিয়াসাতুঁ কে বারে মেঁ ইংরেজী ডিপ্লোমাসী' (বুধওয়ারা, ভূপালঃ ভূপাল বুক হাউস, তাবি) পৃঃ ১৯১-৯৮।

৫০. 'মিনান' পৃঃ ৩৮৫-৮৭।

৫১. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫৪, ৩৫৬। ১৮৯০ খৃঃ মোতাবেক ১৩০৭ হিজরীর ২৯শে জমাদিউছ ছানী বুধবার দিবাগত রাত ১-৩৫ মিনিটে ৫৮ বছর বয়সে এই মহান যুগ সংস্কারক-এর জীবনাবসান ঘটে। - প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫১-৫২।

মৃত্যুর ঘটনাঃ অন্যতম শিষ্য মাওলানা যুলফিক্বার আহমাদ ভূপালী (মৃঃ ১৯২১ খৃঃ) বলেন, নওয়াব ছাহেবের জীবনের শেষ রচনা ছিল সাইয়িদ আবদুল কাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১ হিঃ)-এর বিখ্যাত বই 'ফুতূহুল গায়েব'-এর অনুবাদ গ্রন্থ 'মাক্বালাতুল ইহসান।' বইটির মুদ্রণ সংশোধনীর সময়ে নওয়াব ছাহেব মৃত্যুরোগে শয্যাশায়ী হন। লেখার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ফলে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক যোহর হ'তে আছর পর্যন্ত এবং এশার পর থেকে রাতভর তাঁর শয্যার সম্মুখে চেরাগ জ্বালিয়ে লেখনীর কাজ করতাম। সারারাত তিনি ঘুমাতেন না। তাঁর কষ্ট দেখে আমি চলে আসতে চাইলে বলতেন 'মানুষ দু'প্রকারঃ একপ্রকার ঔষধের ন্যায় যা প্রয়োজনের সময় লাগে। আর এক প্রকার খাদ্যের ন্যায় যা সবসময় প্রয়োজন হয়। তুমি আমার নিকটে ২য় প্রকারের মানুষ।' অতঃপর যেদিন তাঁর বই ছাপা হ'য়ে গেল, সেদিন আমি দ্রুত এশার পরপরই এসে তাঁকে খবর দিলাম। তিনি খুবই খুশী হ'লেন। আর ঔষধ মুখে দিলেন না। হঠাৎ টুপীটা মাথা থেকে পড়ে গেল। পা দু'খানা বিছিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় আমার চোখের সামনেই এই ইল্মী মহীরুহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন! -প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫০-৫২।

ليس على الله بمستنكر + أن يجمع العالم في واحد

আধুনিক যুগ ঃ ৪র্থ পর্যায় (সাংগঠনিক)

دور الجديد: المرحلة الرابعة (التنظيمى)

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দী হ'তে চতুর্দশ শতাব্দী মোতাবেক খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে যথাক্রমে শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-৭৬/১৭০৩-৬২) ও তাঁর ইল্মী পরিবার, শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১), মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২) ও নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-৯০) কর্তৃক সূচিত ও সর্বত্র বিস্তৃত 'কিতাব ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাওয়ার' আন্দোলন- যা ইতিহাসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নামে পরিচিত, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে চলে আসা তাকলীদী জড়তা, ইজতিহাদ বিমুখতা ও বে-দলীল রসমপ্রিয়তার বিরুদ্ধে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষ করে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ইল্মী মহীরুহের ছায়াতলে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে এমন বহু আলিম জন্মলাভ করেন, যারা বুদ্ধিপ্রসূত কুটতর্ক পরিহার করে সরাসরি কুরআন ও হাদীছের আলোকে জীবন গড়ায় উদ্বুদ্ধ হন। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তাঁর বিপুল ছাত্রবাহিনী পরবর্তীতে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সাংগঠনিকভাবে সমন্বিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। মিয়াঁ ছাহেবের জীবনের শেষপ্রান্তে দিল্লীতেই এধরনের আহলেহাদীছ সংগঠন কায়েম হয়।

১ - জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ
(প্রতিষ্ঠাকালঃ দিল্লী ১৩১৩ হিঃ/১৮৯৫ খৃঃ)

মিয়াঁ ছাহেবের অন্যতম ছাত্র হাফেয মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী (১২৮১-১৩৫১/১৮৬৬-১৯৩৩ খৃঃ) কর্তৃক মিয়াঁ ছাহেবের মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্বে ১৩১৩ হিজরীতে দিল্লীতে উপস্থিত কিঞ্চিদধিক ১২ জন নেতৃস্থানীয় আহলেহাদীছ আলিম ও সরদার কর্তৃক তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে এই জামা'আত প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব ইতিপূর্বে তাঁর উস্তাদ মাওলানা আবদুল্লাহ গযনবীর (১২৩০-৯৮/১৮১৪-৮০) হাতে অমৃতসরে

বায়'আত হওয়ার কারণে নিজে অন্যদের বায়'আত গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভক্তদের চাপে অবশেষে বায়'আত নিতে সম্মত হন। পরবর্তীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকার আহলেহাদীছ ওলামা ও নেতৃবৃন্দ তাঁর 'ইমামত' কবুল করে নেন।[১] ফলে নবপ্রতিষ্ঠিত এই নেতৃত্ব ব্যাপক রূপ লাভ করে।

একজন আলিম বা-আমল মুত্তাক্বী নেতার ইমারতের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে জামা'আতী জীবন যাপনের বিষয়টি মুসলিম উম্মাহ্ ভুলতে বসেছিল। এই বিলুপ্তপ্রায় সুন্নাত পুনর্জীবিত করতে গিয়ে মাওলানাকে স্বগোত্রীয়দের নিকট থেকে বেশী বাধাপ্রাপ্ত হ'তে হয়েছে।[২] ইমারতের অপরিহার্যতা বিষয়ক ছহীহ হাদীছগুলিকে বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল দেখে মাওলানা ব্যথিত হন। তিনি সাধ্যমত সকলকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। পরিশেষে ১৩১৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' নামে কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে দিল্লীতে একটি জামা'আত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই জামা'আতের 'ইমাম' নিযুক্ত হন। আকীদা ও আমলের দিক দিয়ে এই জামা'আত আহলেহাদীছের মধ্যে নতুন কোন জামা'আত ছিল না।

১৯২০/১৩৩৮ হিজরীর শা'বান মাসে তিনি দিল্লী থেকে মাসিক 'ছহীফায়ে আহলেহাদীছ' বের করেন, যা বর্তমানে করাচীর কেন্দ্রীয় অফিস থেকে পাক্ষিক হিসাবে বের হচ্ছে।

সর্বদা দা'ওয়াত ও তাদরীসে ব্যস্ত থাকার কারণে মাওলানার পক্ষে লেখনীর দিকে বেশী মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়নি। তবুও তিনি ৫/৬টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ছালাতের নিয়ম-কানুন বিষয়ক 'মুকাম্মাল নামায', মিশকাত শরীফের আরবী হাশিয়া, যা দিল্লীর ফারূকী প্রেস প্রকাশ করেছে; বর্তমান যুগের প্রচলিত নিয়মকানুন সম্বলিত কুরআন মজীদের বিপরীতে প্রাথমিক যুগের ন্যায় নুক্‌তা-হরকত বিহীন 'মু'আররা' (معرى) কুরআন মজীদ সংকলন প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে।[৩]

তাঁর মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র হাফেয মাওলানা আবদুস সাত্তার জামা'আতের 'ইমাম' নিযুক্ত হন। দেশবিভাগের পরে জামা'আতের কেন্দ্রীয় 'দারুল ইমারত' দিল্লী হ'তে ১নং বান্‌স রোড করাচীতে স্থানান্তরিত হয় এবং 'মাদরাসা দারুস

সালাম' নামে তার সংলগ্ন কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কায়েম হয়। মাওলানা আবদুর রহমান সালাফী বর্তমানে উক্ত জামা'আতের কেন্দ্রীয় আমীর। রংপুর হারাগাছের মাওলানা আবদুল হামীদ এই জামা'আতের বাংলাদেশ অঞ্চলের 'আমীর' বলে পরিচিত।

১৯৬৩ সালে গৃহীত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই জামা'আতের একটি কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল রয়েছে, যেখানে যাকাত, ফিৎরা, কুরবানী, ওয়াক্‌ফ, হেবা, অছিয়াত, সাধারণ ছাদাকা, শারঈ ও সাংগঠনিক জরিমানা, জামা'আতী সম্পত্তি, জামা'আতী প্রকাশনার মুনাফা প্রভৃতি জমা হয়। এর অধীনে তাবলীগ ও তাছনীফ শাখা ছাড়াও 'দারুল ক্বাযা' নামে একটি কেন্দ্রীয় বিচারবিভাগ রয়েছে, 'ইমামে জামা'আত' সেখানে জামা'আতী মোকাদ্দামা সমূহের শারঈ ফায়ছালা দিয়ে থাকেন।[৪]

এই জামা'আতের দাবী অনুযায়ী হিন্দুস্থানে সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর পরে এটাই প্রথম জামা'আত যা পূর্ণ ইসলামী নিয়মানুসারে পরিচালিত।[৫]

পাকিস্তানে বর্তমানে এই জামা'আতের অধীনে ৩০টি দ্বীনী মাদরাসা পরিচালিত হচ্ছে। করাচীর গুলশান ইকবাল ব্লক-৬ অবস্থিত 'জামে'আ সাত্তারিয়া' এই জামা'আতের কেন্দ্রীয় মাদরাসা। পাকিস্তানে এই জামা'আতের একশোর মত শাখা সংগঠন রয়েছে। আমেরিকার হিউষ্টন (টেক্‌সাস) শহরেও এই জামা'আতের একটি শাখা ও মসজিদ রয়েছে। পাক্ষিক 'ছহীফায়ে আহলেহাদীছ' বর্তমানে এই জামা'আতের একমাত্র মুখপত্র।[৬]

এই জামা'আত শরীয়তবিরোধী কোন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেনা। অবশ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি যা সরাসরি মুসলিম উম্মাহ্‌র সহিত সাধারণভাবে এবং জামা'আতের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, সে সকল বিষয়ে এই জামা'আত মতামত ব্যক্ত করে। এই জামা'আতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র সমর্থন করেন না।[৭]

বর্তমানে জামা'আত নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সংগঠিত না থাক্‌লেও ভারত ও বাংলাদেশে এই জামা'আতের অনুসারীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়।

ইমামত ও ইমারত-এর মাসআলা (مسئلة الإمارة)

মুসলিম উম্মাহ ইসলামী হুকুমতের অধীনে অথবা অনৈসলামী হুকুমতের অধীনে শাসিত অবস্থায় তারা কুরআন-হাদীছে পারদর্শী একজন আমীরের অধীনে জামা'আতবদ্ধ থাকবে কি থাকবে না, এ বিষয়ে ভারতের আহ্লেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমামতপন্থী আহ্লেহাদীছগণ ইমামের বায়'আতসহ জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপন করা ফরয বলেন। যদি তা না হয় তাহলে তাঁদের মতে জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করার অবস্থা আরোপিত হবে। তাঁদের মতে ইসলামী হুকুমতের চলমান অবস্থায় 'হদ' জারি করার দায়িত্ব হুকুমতের 'আমীর'-এর উপরে পুরোপুরি ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু তার অবর্তমানে আমীরে জামা'আতের উপরে শারঈ অনুশাসনমূলক শাস্তি দানের ক্ষমতা থাকবে। তাঁরা বলেন আমীরে জামা'আতের জন্য 'হদ' জারি করা, যুদ্ধ করা, প্রভৃতির জন্য 'হুররিয়াত' বা স্বাধীন হওয়া শর্ত নয়। আমীর 'সিয়াসাতে শারঈ'র মালিক। 'সিয়াসাতে মুল্কী'-র ক্ষেত্রে অপরিহার্য কোন বিধি তার জন্য প্রযোজ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাক্কী জীবনে 'সিয়াসাতে শারঈ'-র মালিক ছিলেন। কিন্তু 'সিয়াসাতে মুল্কী'-র মালিক হন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পরে। দাঊদ ও সুলায়মান ব্যতিত কোন নবীই 'সিয়াসাতে মূল্কী'-র অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু সকল নবীই 'সিয়াসাতে শারঈ'র মালিক ছিলেন। তাঁরা বলেন, এমনকি তিনজন একস্থানে থাকলেও মুসলিম উম্মাহ্কে একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক জীবনযাপন করতে হবে। এজন্য ইমামকে কুরায়শী হওয়া শর্ত নয়, তবে উত্তম। ইমামবিহীন কোন দলকে তাঁরা 'জামা'আত' হিসাবে গণ্য করেন না। তাঁরা বলেন, একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যাও ইমামবিহীন জীবন যাপন করা শরীয়তে বৈধ নয়। তাঁদের দলীলসমূহ প্রধানতঃ নিম্নরূপঃ-৮

'যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে বায়'আত করল না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল' (মুসলিম) (খ) বিভিন্ন বিষয়ে বায়'আত গ্রহণ সম্পর্কিত বুখারী, নাসাঈসহ ছিহাহ্ সিত্তাহ্র বিভিন্ন হাদীছসমূহ (গ) 'তিনজন ব্যক্তির জন্যও হালাল নয় কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা তাদের মধ্যে একজনকে 'আমীর' না মানা পর্যন্ত (আহমাদ), 'তিনজন ব্যক্তি সফরে বের হলে তাদের একজনকে আমীর নিযুক্ত

করতে হবে' (আবুদাউদ)- এই মর্মের অন্যান্য হাদীছ (ঘ) জামা'আত গঠন ও আমীর নিয়োগের ব্যাপারে আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), আলী (রাঃ)-এর বর্ণিত আছারসমূহ (ঙ) 'ইমাম' বা 'আমীর' হিসাবে কাউকে গ্রহণ করা ব্যতীত তোমাদের কেউ যেন রাতে না ঘুমায় বা সকাল না করে'- হাদীছ (ইবনু আসাকির)।

বিরোধী পক্ষের বক্তব্য

গোরাবা ও মুজাহিদীন-এর বাইরে ইমামতবিরোধী আলিমগণ উপরোক্ত হাদীছ ও আছারসমূহের পাল্টা কোন হাদীছ বা আছার উপস্থাপন করতে পারেননি, তবে কিছু যুক্তি ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তাঁরা হাদীছে বর্ণিত ইমাম বা আমীরকে জিহাদকারী, শারঈ হুদূদ বা শাস্তি প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী হওয়া পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করেন। বায়'আত গ্রহণের বিষয়টিকে তাঁরা আবশ্যিক ধর্মীয় বিষয় বলে গণ্য করেন না- যা পরিত্যাগ করলে গোনাহগার হ'তে হবে। অবশ্য সাংগঠনিক শৃংখলা বিধানের জন্য তাঁরা আর পাঁচটি সামাজিক সংগঠনের ন্যায় 'ছদর' 'রঈস' বা সভাপতি এমনকি 'আমীর' নির্বাচনও সমর্থন করে থাকেন।[৯]

বর্তমান সময়ের জনৈক কুয়েতী আহ্‌লেহাদীছ আলিম উপরোক্ত হাদীছগুলিকে দু'টি পৃথক ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। প্রথমোক্ত হাদীছে যেখানে আনুগত্যের বায়'আত ব্যতীত জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণের কথা বলা হয়েছে, সে হাদীছগুলিকে 'জামা'আতে আম্মাহ' বা সাধারণ মুসলমানের সম্মিলিত সমাজ ও রাষ্ট্রনেতার আনুগত্য বুঝানো হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ধর্মীয় উন্নতি ও অগ্রগতির সকল কাজে যোগ্য আমীরের অধীনে বিশেষ বিশেষ জামা'আত গঠন করে ইসলামী বা অনৈসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ইসলামী দা'ওয়াত পরিচালনার অপরিহার্যতা বুঝানো হয়েছে বাকী হাদীছগুলিতে। এই সকল জামা'আতকে তিনি 'জামা'আতে খাছ্‌ছাহ' বা বিশেষ জামা'আত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, বর্তমানের সর্বব্যাপী জাহেলিয়াতের যুগে যখন কোন মুসলিম রাষ্ট্রেই যথাযথ ভাবে ইসলামী আইন ও শাসনব্যবস্থা চালু নেই, সে অবস্থায় পৃথিবীর সকল স্থানে খাছ খাছ জামা'আত গঠনের মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত ও প্রচার কার্য চালিয়ে যাওয়া এবং ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী জীবনযাপন করা প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানের জন্য ফরয। 'জামা'আতে খাছ্‌ছাহ'গুলি পরস্পর ন্যায়ের

কাজে সহযোগিতা করবে এবং সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে 'জামা'আতে আম্মাহ' গঠনের চেষ্টা করবে।[১০]

ইমামত বা ইমারতবিরোধী আলিমগণ ইমারত প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল শর্তারোপ করেছেন সেগুলি কল্পনাপ্রসূত, যার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- 'শত শর্তারোপ করা হৌক না কেন, যে শর্ত আল্লাহ্র কিতাবে উল্লেখ নেই, তা বাতিল' (বুঃ মুঃ।[১১] ইসলাম তার অনুসারীদেরকে তাগূতের নিকটে বিচার-ফায়ছালা নিয়ে যেতে নিষেধ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম থাকা না থাকার সঙ্গে শর্তযুক্ত নয়। তাই যে পরিবেশেই থাকুক না কেন মুসলমানকে সর্বদা ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক তার দ্বীনী ও দুনিয়াবী জীবন পরিচালনা করতে হবে এবং সংখ্যায় কম থাক বা বেশী থাক সর্বদা তাকে জামা'আতবদ্ধ ভাবে ইসলামী নেতৃত্বের অধীনে জীবনযাপন করতে হবে। সেই জামা'আতের যিনি নেতৃত্ব দিবেন তিনিই হবেন 'আমীর'। সকল মা'রূফ বা শরীয়ত অনুমোদিত ন্যায়কার্যে আমীরের নির্দেশ পালন করা মামূরের জন্য ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ... যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল, যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল (বুঃ মুঃ)।[১২]

২ - অল-ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কন্ফারেন্স
(প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৩২৪/১৯০৬ খৃঃ)

ইমামত-এর বিষয়ে মতবিরোধ থাক্লেও জামা'আতবদ্ধভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে যাবার ব্যাপারে কারুর আপত্তি ছিলনা। এতদুদ্দেশ্যে ১৩২৪ হিজরীর ৬ই যুলকা'দা মোতাবেক ১৯০৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরী (১২৬০-১৩৩৭/১৮৪৪-১৯১৯), হাফেয আবদুল আযীয রহীমাবাদী (১২৭০-১৩৩৬/১৮৫৫-১৯১৮), শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯/১৮৫৭-১৯১১), আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩/১৮৬৫-১৯৩৫), আয়নুল হক ফলওয়ারী (১২৮৭-১৩৩৩/১৮৬৯-১৯১৫), ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮) প্রমুখ মিয়াঁ ছাহেবের সেরা ছাত্রবৃন্দ বিহারের

'আরাহ্' জেলার খ্যাতনামা আহ্‌লেহাদীছ আলিম ও রাজনীতিক আল্লামা ইবরাহীম আরাভী (১২৬৪-১৩১৯/১৮৪৯-১৯০১) প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসা আহ্‌মাদিয়াহ্'-র (প্রতিষ্ঠাকালঃ ১২৯৭ / ১৮৭৯ খৃঃ) বার্ষিক ইল্‌মী সেমিনারে (مذاكره علميه) একত্রিত হন এবং সেখানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে 'অল ইন্ডিয়া আহ্‌লেহাদীছ কন্‌ফারেন্স' নামে একটি সর্বভারতীয় আহ্‌লেহাদীছ সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৩] যার প্রথম ছদর বা সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও শামসুল হক আযীমাবাদী (রাহেমাহুমুল্লাহ)। আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী আমৃত্যু কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।[১৪] ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি পর্যন্ত মাওলানা ছানাউল্লাহ একটানা সম্পাদক থাক্‌লেও বিভিন্ন কারণে সভাপতির পরিবর্তন ঘটে।

কন্‌ফারেন্স-এর তৎপরতা

১৯০৬ হতে ১৯৪৭ পর্যন্ত ৪০ বৎসরে উক্ত সংগঠন ৮০,০০০ হাযার টাকার কিতাব ফ্রি বিলি করে। যার মধ্যে কুরআন শরীফ, অনুদিত কুরআন শরীফ, তাফসীর জামেউল বায়ান, তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কিতাবসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া উক্ত সংগঠনের মাধ্যমে ১২৩টি দ্বীনী মাদরাসা, ৩০টি মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালিত হয়। ২০/২২ জন নিয়মিত মুবাল্লিগ দ্বারা সারা ভারতে কুরআন ও হাদীছের প্রচার চালানো হয়। ১৯২৪ সালে সঊদী সরকার সেদেশের মাযারগুলি ভেঙ্গে ফেল্‌লে ভারতের মাযারপূজারীরা যখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলে, তখন উক্ত সংগঠনের পক্ষ হ'তে সম্পাদক মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮) তার জওয়াবে কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে কবরপূজার অসারতা প্রমাণ করে مسئلہ حجاز پر ایك نظر নামে বই লিখে ফ্রি বিলি করেন। এছাড়া كشف النقاب عن المشاهد والقباب নামক বই লিখে সঊদী সরকারের উক্ত পদক্ষেপের প্রশংসা ও বিরোধীদের মূল দূরভিসন্ধি ফাঁস করে দেন। ১৯৪৭-এর পরে পাক্ষিক 'তারজুমান' এই সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত ছোট-বড় অনেক পুস্তক-পুস্তিকা বের হয় এবং বিভিন্ন

সমাজকল্যাণ মূলক কাজেও সংগঠন অংশ গ্রহণ করে।[১৫]

৩ - জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ

১৯৭০ সালের পর এই কন্ফারেন্স-এর নাম পরিবর্তন করে 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ' (مرکزی جمعیت أهلحدیث هند) রাখা হয়।[১৬] বর্তমানে দিল্লীতে ৪১১৬ উর্দূ বাজার 'আহলেহাদীছ মনযিল'-এ জমঈয়তের নিজস্ব ভবনে কেন্দ্রীয় অফিস অবস্থিত। উর্দূ পাক্ষিক 'তারজুমান' এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে মাওলানা মোখতার আহমাদ নদ্ভী ও মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব খাল্জী যথাক্রমে এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় 'আমীর' ও 'নায়েমে আ'লা' হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সালের ২রা মে, বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ বৈঠকে কেন্দ্রীয় সভাপতিকে প্রচলিত 'ছদর' বা সভাপতি-এর বদলে 'আমীর' হিসাবে অভিহিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৭]

ভারতে আহলেহাদীছ এক নযরে

১। জনসংখ্যাঃ এক কোটির উপরে (আনুমানিক)।

২। বিশেষ আহলেহাদীছ অঞ্চলঃ

পশ্চিম বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা, হরিয়ানা, কাশ্মীর, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, কর্নাটক, তামিলনাড়ু। এতদ্ব্যতীত ভারতের বাকী সকল প্রদেশেই অল্পবিস্তর আহলেহাদীছ আছেন।

৩। বড় বড় শহরগুলির প্রায় সবগুলিতেই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ আছে। কিন্তু সঠিক গণনা এখনও হয়নি।

৪। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অগণিত আহলেহাদীছ মাদরাসা রয়েছে, তন্মধ্যে

নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য। যেমন-

১-জামে'আ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী, ফাটক হাবাশ খান	ছদর বাজার	দিল্লী
২-মাদরাসা দারুল কিতাবে ওয়াস্ সুন্নাহ্	ছদরবাজার	দিল্লী
৩-মাদরাসা রিয়াযুল উলূম ইসলামিয়াহ	৪০৮৫ উর্দূবাজার, জামে মসজিদ	দিল্লী
৪-মা'হাদুত্ তা'লীমিল ইসলামী	৪ জোগাবাঈ, জামে'আ নগর	নয়াদিল্লী-২৫
৫-জামে'আ সালাফিইয়াহ	রেওরী তালাব, বেনারস	ইউ, পি
৬- " রহমানিয়া	মদনপুরা, বেনারস	ইউ, পি,
৭- " ফায়যে আম ইসলামিয়াহ	মউনাথভঞ্জন	ইউ, পি
৮- " আছারিয়া দারুল হাদীছ	মউনাথভঞ্জন	ইউ, পি
৯- " আলিয়া আরাবিয়াহ	মউনাথভঞ্জন	ইউ, পি
১০-মাদরাসা দারুল হুদা ইউসুফপুর	জেলা -বস্তী	ইউ, পি
১১-দারুল উলূম শাশনিয়াঁ, পোঃ আল-হুদাপুর	জেলা- বস্তী	ইউ, পি
১২-জামে'আ সিরাজুল উলূম আস-সালাফিইয়াহ, বুন্দেহার	জেলা - গোন্ডা	ইউ, পি,
১৩-মা'হাদুল ইসলামী আস-সালাফী, বাছা	জেলা -বেরেলী	ইউ,পি
১৪-দারুল উলূম সালাফিইয়াহ	শুকরাওয়াহ, পুনাহনাহ	হরিয়ানা
১৫-দারুল উলূম মুহাম্মাদিয়া পোঃ বক্স ১৪৪, মানছূরাহ	মালেগাঁও (বোম্বাই)	মহারাষ্ট্র
১৬-দারুল উলূম দারুস্ সালাম এরাবিক কলেজ	ওমরাবাদ	তামিলনাড়ু
১৭-দারুল উলূম মুহাম্মাদিয়া এরাবিক কলেজ	রাঈদারগ	কর্ণাটক
১৮-দারুল উলূম আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ	লহরিয়া সারায়ে, দারভাঙ্গা	বিহার
১৯-মাদরাসা আহমাদিয়া, বীরাগনিয়াঁ	জেলা- সীশামুঢ়ী	বিহার
২০-মাদরাসা ইসলামিয়া, রাঘুনগর, ভুয়ারা	জেলা- মধুবা	বিহার

২১-জামে'আ ইসলাহিয়া সালাফিইয়াহ (মাদরাসা ইছলাহুল মুসলিমীন) পাথরের মসজিদ	পাটনা-৬	বিহার
২২-মাদরাসা দারুত্ তাকমীল, কুরবান রোড, ছান্দওয়াড়া	মুযাফফরপুর	বিহার
২৩-জামে'আ মুহাম্মাদিয়া, ডাভাকানপদ, জেলা- মধুপুর,	পাটনা - ৬	বিহার
২৪-জামে'আ শামসুল হুদা, দিলালপুর	জেলা- ছাহেবগঞ্জ,	বিহার
২৫-মা'হাদুল উলূমিল ইসলামিয়াহ, খাগড়া	কিষাণগঞ্জ (১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত)	বিহার

৫। ভারতের আহলেহাদীছ পত্রিকাসমূহ - যা বর্তমানে চালু আছেঃ

১-মাসিক	আত্-তাও'ইয়াহ (উর্দূ)	৪, জোগাবাঈ	নয়াদিল্লী-২৫
২- ”	নওয়ায়ে ইসলাম (উর্দূ)		দিল্লী
৩- ”	আর-রাইীদ্ব (উর্দূ)		দিল্লী
৪- ”	হক প্রকাশ (হিন্দী ভাষায় কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অন্যতম মুখপত্র (উর্দূ) হিসাবে দিল্লী থেকে বের হ'তে যাচ্ছে)		দিল্লী
৫- ”	আল-ইসলাম (উর্দূ)		দিল্লী
৬- ”	দাওয়াতে সালাফিইয়াহ (উর্দূ),	আলীগড়	ইউ,পি
৭- ”	ছওতুল ইসলাম (উর্দূ)	বোম্বাই	মহারাষ্ট্র
৮- ”	ছওতুল হাদীছ (উর্দূ)	বোম্বাই	মহারাষ্ট্র
৯- ”	ছওতুল উম্মাহ (আরবী)	জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস	ইউ,পি
১০- ”	মুহাদ্দিছ (উর্দূ)	ঐ	ইউ,পি
১১- ”	আহলেহাদীস (বাংলা) ১নং মারকুইস লেন	কলিকাতা-১৬	পশ্চিমবঙ্গ
১২- ”	আল-মানার (মালইয়ালম)	কালিকট	কেরালা
১৩- ”	ইক্রা (মালইয়ালম)	কালিকট	কেরালা

১৪- "	আছারে জাদীদ (উর্দূ)	জামে'আ আছারিয়া, মউ	ইউ. পি
১৫- "	আল-বালাগ (উর্দূ, ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত)	বোম্বাই	মহারাষ্ট্র
১৬-পাক্ষিক	মাজাল্লা আহলেহাদীছ (উর্দূ)	শুকরাওয়াহ	হরিয়ানা
১৭- "	আত-তাওহীদ (উর্দূ)	শ্রীনগর	কাশ্মীর
১৮- "	ছওতুল হক (উর্দূ) জামে'আ মুহাম্মাদিয়া	মালেগাঁও, বোম্বাই	মহারাষ্ট্র
১৯- "	আল-হুদা (উর্দূ)	দারভাঙ্গা	বিহার
২০-সাপ্তাহিক	তারজুমান (উর্দূ), (কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মুখপত্র)	৪১১৬ উর্দূ বাজার	দিল্লী
২১- "	মুসলিম (উর্দূ)	শ্রীনগর	কাশ্মীর
২২- "	আশ-শাবাব (মালইয়ালম)	কালিকট	কেরালা
২২- "	হালাতে জাদীদ (উর্দূ)	মউ	ইউ,পি
২৪-দ্বিমাসিক	ই'তিদাল (উর্দূ)	ডুরপাগঞ্জ, বস্তী	ইউ,পি
২৫- ত্রৈমাসিক	দা'ওয়াতে ছাদিক (উর্দূ)	পাটনা-৬	বিহার

৬। উল্লেখযোগ্য আহলেহাদীছ প্রেস ও লাইব্রেরী সমূহঃ

১- সালাফিইয়াহ প্রেস, জামে'আ সালাফিইয়াহ	বেনারস	ইউ, পি
২- হামীদিয়া বারকী প্রেস, আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ	দারভাঙ্গা	বিহার
৩- আছারিয়া ফটো অফসেট প্রেস,জামে'আ আছারিয়া	মউ	ইউ, পি
৪- আফযাল নঈমী প্রেস, জামে'আ আছারিয়া	মউ	ইউ, পি
৫- আদ-দারুস সালাফিইয়াহ অফসেট প্রেস,	বোম্বাই	মহারাষ্ট্র
৬- মুহাম্মাদিয়া প্রিন্টিং প্রেস,	মালিরকোটেলাহ	পূর্ব পাঞ্জাব
৭- কওমী প্রেস, হালদারপাড়া, মেটিয়াবুরুজ	কলিকাতা-১৮	পশ্চিমবঙ্গ

লাইব্রেরীঃ ১- মাকতাবা ছওতুল ইসলাম ও ২- মাকতাবা তারজুমান (কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মালিকানাধীন) ৩- ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ (কুতুবখানা মাসউদিয়াহ) ৪- মাকতাবা আত-তাও'ইয়াহ ৫- দারুল কিতাব ৬- মাকতাবা

নূরুল ঈমান ৭- মাকতাবা মাওলানা ছানাউল্লাহ একাডেমী ৮- এস. এন পাবলিশার্স ৯- আলহাম্‌দু পাবলিকেশন্‌স ১০- ফেরদৌস পাবলিকেশন্‌স ১১- মাকতাবা আত-তাওহীদ ১২- আদ-দারুল ইল্‌মিয়াহ (১ নং হতে ১২নং পর্যন্ত সব দিল্লীতে অবস্থিত) ১৩- মাকতাবা সালাফিইয়াহ, বেনারস, ইউ,পি ১৪- মাকতাবা সালাফিইয়াহ, দারভাঙ্গা, বিহার ১৫- কুতুবখানা নাঈমিয়াহ, মউ, ইউ,পি ১৬-মাকতাবা আছার, মউ, ইউ,পি ১৭- মাকতাবা মুসলিম, শ্রীনগর, কাশ্মীর ১৮- আদ-দারুস সালাফিইয়াহ, বোম্বাই ১৯-ইদারা দা'ওয়াতুল ইসলাম, বোম্বাই ২০-ইদারা দা'ওয়াতুল কুরআন, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র।[১৮]

৪-জমঈয়াতুল ইত্তিহাদিল ইসলামী (কেরালা, ভারত)
(প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯২২ খৃষ্টাব্দ)

দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলীয় রাজ্য কেরালাতে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন বর্তমানে খুবই জোরদার। ১৯২২ সাল থেকে সেখানে সাংগঠনিকভাবে আন্দোলন চলছে। প্রথম শতাব্দী হিজরীতে ইসলামের আগমনকাল থেকেই এখানে মুসলিম-অমুসলিম স্ব স্ব ধর্মীয় স্বাধীনতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নিয়েই বসবাস করে আসছিল। কিন্তু বৃটিশ আমলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ও খৃষ্টানী তৎপরতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এদের প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সমূহ এবং রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এদের প্রচারকেন্দ্র হয়ে ওঠে। অফিস-আদালত সব কিছু এদেরই সক্রিয় পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। এই সময় শিরক ও বিদ'আতপন্থী মুসলমানেরাও তাদের প্রচারণা বৃদ্ধি করে। ফলে মুসলিম জনগণ কুরআন-হাদীছের প্রকৃত ইল্‌ম থেকে দূরে চলে যায়। হাদীছপন্থী মুসলমানগণ জীবনের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে পড়ে। এই অবস্থায় অনেকদিন অতিবাহিত হয়।

আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে এই সময় সাইয়িদ ছানাউল্লাহ মাক্বদা ছাক্বাফাহ (১৮৪৬-১৯১২ খৃঃ) নামক জনৈক সংস্কারকের জন্ম হয়। তিনি খৃষ্টানী তৎপরতার বিরুদ্ধে উন্মুক্ত তরবারির ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি এদের গোপন ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করতে থাকেন। এমনিভাবে মৌলবী

আবদুল কাদের ওয়াক্কামী (১৮৭৩-১৯৩২), আল্লামা গঞ্জ আহমাদ জালিয়াতী (মৃঃ ১৯১৯), শায়খ মুহাম্মাদ মাহীন হামাদানী (মৃঃ ১৯২২), শায়খ গঞ্জী বকর মাসলিয়ার, শায়খ আবদুর রহমান হীদরূস, কবি সাঈদ আলী মাষ্টার, মৌলবী আবদুল করীম প্রমুখ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম তাঁর সাথী হয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। আল্লামা গঞ্জ আহমাদ জালিয়াতী 'ওয়াযকাদ' (وازكاد) নামক স্থানে মাদরাসা দারুল উলূম কায়েম করেন ও সেখান থেকে আন্দোলন শুরু করেন।

উপরোক্ত আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের আন্দোলনের ফলে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'জমঈয়তুল ইত্তিহাদিল ইসলামী' বা 'ইসলামী ঐক্য সংস্থা' নামে কেরালাতে সর্বপ্রথম আহলেহাদীছদের সংগঠন কায়েম হয়। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পারস্পরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং আদালত ও প্রশাসনের নিকটে না গিয়ে নিজেদের সমস্যাবলী শরীয়তের বিধান মোতাবেক নিজেরাই সমাধান করা।[১৯] এজন্য তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ও গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে সভা, সম্মেলন ও সেমিনারের মাধ্যমে গনজাগরণ সৃষ্টি করেন এবং সর্বত্র কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী বিশুদ্ধ আকীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসার ঘটান।

৫-জমঈয়াতুল ওলামা (কেরালা, ভারত)
(প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৩২ খৃঃ)

জমঈয়তে ইত্তেহাদের ব্যাপক প্রচারণার ফলে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ সূচিত হয়। শিরক ও বিদ'আত দূরীকরণ ও সালাফে ছালেহীনের আদর্শকে পুনরায় সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা এগিয়ে আসেন এবং আলেমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনকে সমন্বিত করার জন্য 'জমঈয়তুল ওলামা' নামে একটি পৃথক ওলামা সংগঠন কায়েম করেন। 'আল-মুরশিদ' নামে তাঁরা একটি মুখপত্র প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা খৃষ্টানী, কাদিয়ানী ও অন্যান্য বিদ'আতী ফিৎনাসমূহের রদ করতে থাকেন। এছাড়া অন্যান্য প্রচার কৌশল অবলম্বন করেন। এই জমঈয়ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেনি-যাতে নিজেদের মধ্যে অহেতুক মতবিরোধ ও ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি না

হয়। জমঈয়তে ওলামার প্রচেষ্টায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়, বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন মাহ্‌ফিল-মজলিসে ওয়ায-নছীহতের মাধ্যমে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। মৌলবী যায়েদ ও মৌলবী মুহাম্মাদ ইবরাহীম বর্তমানে এই সংগঠনের যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক।[২০]

৬-নাদ্‌ওয়াতুল মুজাহেদীন (কেরালা, ভারত)
(প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৫০ খৃঃ)

মাওলানা মুহিউদ্দীন আল-কাতেব (মৃঃ ১৯৭১ খৃঃ)-এর নেতৃত্বে কেরালায় যখন আহলেহাদীছ আন্দোলন তুঙ্গে, তখন তিনি এ আন্দোলনে সকল স্তরের আহলেহাদীছ জনগণকে যাঁরা দ্বীনের পথে জানমাল দিয়ে জিহাদ করতে আগ্রহী, তাদেরকে শামিল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন ও প্রধানতঃ তাঁরই পরামর্শক্রমে ১৯৫০ সালে 'নাদওয়াতুল মুজাহেদীন' নামে এক ব্যাপকভিত্তিক আহলেহাদীছ সংগঠন কায়েম হয় এবং ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত সকল সংগঠন নবপ্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের সদস্য হন। মাওলানা মুহিউদ্দীন ও মাওলানা আবদুস সালাম এর প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক হন। বর্তমানে ডঃ ওছমান বিন মুহাম্মাদ মুরকান ও কে, বি, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ উক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।[২১]

'নাদ্‌ওয়াতুল মুজাহেদীন' কায়েম হওয়ার পর তাঁরা যুবক, ছাত্র ও মহিলাদেরকে পৃথকভাবে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সংগঠিত করার প্রয়োজন বোধ করেন। এতদুদ্দেশ্যে নাদ্‌ওয়াতুল মুজাহেদীনের যুব, ছাত্র ও মহিলা বিভাগের অধীনে বিভিন্ন সময়ে 'ইত্তেহাদুশ শুব্বানিল মুজাহেদীন' (১৯৬৭ সাল), 'হারাকাতুত্ তালাবাতিল মুজাহেদীন' (১৯৭১ সাল) ও 'হারাকাতুন্ নেসাইল মুসলিমাত' (১৯৮৭ সাল) কায়েম হয়। বর্তমানে প্রথমোক্তটির সভাপতি ও সম্পাদক হলেন হুসাইন বিন আবুবকর ও সালাহুদ্দীন মাদানী, দ্বিতীয়টির মোস্তফা ফারূকী ও মুহাম্মাদ আলী এবং তৃতীয়টির সভানেত্রী ও সম্পাদিকা হ'লেন আমীনা আম্বারিয়াহ ও খাদীজা নার্গিস।[২২] সকল শাখা সংগঠনের যোগাযোগের ঠিকানা হ'ল- মুজাহিদ সেন্টার, কালিকট-২, কেরালা, ভারত। নিম্নে 'নাদ্‌ওয়াতুল মুজাহেদীন'-এর বর্তমান তৎপরতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রদত্ত হ'ল।

১। মুজাহেদীনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জামে মসজিদের সংখ্যা ৪০০ শত।

২। দ্বীনী মাদরাসার সংখ্যা প্রায় অনুরূপ।

৩। কলেজের সংখ্যা ১৯টি (কলেজগুলির সমবায়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য কালিকট বিমানবন্দরের পাঁচ কিলোমিটার দূরে ২৫ বিঘা জমি খরিদ করা হয়েছে)।

৪। সংগঠন ৪টিঃ (ক) ওলামা (খ) যুব (গ) ছাত্র (ঘ) মহিলা।

৫। পত্রিকা ৩টি।

ক) আল-মানার (মাসিক) নাদ্‌ওয়াতুল মুজাহেদীনের মুখপত্র।

খ) আশ-শাবাব (সাপ্তাহিক) যুবসংগঠনের মুখপত্র।

গ) ইক্‌রা (মাসিক) ছাত্রসংগঠনের মুখপত্র।

সবগুলি পত্রিকা কেরালার আঞ্চলিক 'মালয়ালম' ভাষায় প্রকাশিত হয়।'মাতবা'আতুল মুজাহেদীন' ও 'মাতবা'আতুশ শাবাব' নামে দু'টি পৃথক প্রেস রয়েছে।

৬। 'সালাফী সমাজ কল্যাণ সংস্থা' (الجمعية السلفية الخيرية) নামে একটি স্ব-শাসিত সমাজকল্যাণ সংস্থা আছে। যার অধীনে একটি আরবী কলেজ, ১টি ইয়াতীমখানা, ১টি দ্বীনী মাদরাসা ও মসজিদ পরিচালিত হয়। কেরালার পালঘাট জেলার অন্তর্গত করিংগানাদ (পোঃ ভিলাইয়ূর) নামক স্থানে এটি অবস্থিত। আবদুল হক সুল্লামী বর্তমানে এই সংস্থার সেক্রেটারী।[২৩]

অন্যান্য তথ্যঃ

ক- কেরালায় আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন ও সংগঠনের মূলে যাঁদের অবদান সর্বাধিক তাঁরা হলেন-

১। মৌলবী ছানাউল্লাহ মাক্বদা ছাক্বাফাহ (مقدى ثقافة) (১৮৪২-১৯১২ খৃঃ)

২। শায়খ মুহাম্মাদ মাহীন হামাদানী (মৃঃ ১৯২২ খৃঃ)

৩। মৌলবী আবদুল করীম

৪। গঞ্জী বকর মাসলিয়ার

৫। কবি সাঈদ আলী কান্তী মাষ্টার

৬। গঞ্জী আহমাদ আল-জালিয়াতী (মৃঃ ১৯১৯ খৃঃ)

৭। মৌলবী আবদুল কাদের ওয়াক্কামী (১৮৭৩-১৯৩২)

৮। মৌলবী মুহাম্মাদ আল-কাতেব (মৃঃ ১৯৬৭)

৯। শায়খ মুহাম্মাদ (মৃঃ ১৯৭০)

১০। মৌলবী মুহিউদ্দীন (মৃঃ ১৯৭১)

১১। মৌলবী আবদুর রহমান (মৃঃ ১৯৬৪)

১২। এন, এম মৌলবী (মৃঃ ১৯৩৪)

১৩। আনীস মাওলা মানগাদী (মৃঃ ১৯৫৩)

১৪। ওমর আহমাদ মালাবারী

১৫। বী যায়েদ আল-মৌলবী

১৬। মৌলবী আবদুস সালাম

১৭। মৌলবী এ. কে. আবদুল লতীফ

১৮। মৌলবী সাইয়িদ আবদুল ওয়াহ্হাব বুখারী (মৃঃ ১৯৪৫)।

খ- লেখকবৃন্দঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে কেরালার মত একটি ছোট্ট রাজ্যে আমরা এযাবত (২৩-১-৮৯ ইং পর্যন্ত) ৯৭ জন লেখকের নাম ও তাঁদের প্রকাশিত ৩৮২-এর অধিক কিছু বইয়ের তালিকা সংগ্রহ করতে পেরেছি। যাঁদের মধ্যে ১টি হ'তে সর্বোচ্চ ৩৩টি প্রকাশিত বইয়ের লেখকের নাম রয়েছে। আমরা তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলাম।[২৪]

১। মৌলবী ছানাউল্লাহ মাক্বদা ছাক্বাফাহ (১৮৪২-১৯১২) ৩৩ খানা

২। কোয়া কুতী তাংগাল আল-বাদুরী ৩৩ খানা

৩। মৌলবী এম, সি, সি, আহমাদ ৮ খানা

৪। মৌলবী আবদুল কাদের ওয়াক্কামী ৫ খানা

৫। তৎপুত্র আবদুল কাদের ছানী ৭ খানা

৬। মৌলবী মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন ১৫ খানা

৭। মৌলবী মুহাম্মাদ আমানী ১২ খানা

৮। মৌলবী আবদুল কাদের ৮ খানা

৯। মৌলবী ওমর ৭ খানা

১০। আবদুল হক সুল্লামী ৬ খানা

১১। গঞ্জী মুহাম্মাদ ১২ খানা

১২। কে. এম. মৌলবী ১১ খানা

১৩। মাহিন কোতী আলবেযী ৯ খানা

১৪। সি. ভি. এম. হীদরূস ৬ খানা

১৫। কে. কে. মুহাম্মাদ আবদুল করীম ১০ খানা

গ- গত ১৯৮৭ সালের ১- ৪ঠা জানুয়ারী কেরালার কুটিপুরাম শহরে জমঈয়তুল ওলামা, নাদওয়াতুল মুজাহেদীন, ইত্তেহাদুশ শুব্বান ও হারাকাতুত্ তালাবার সম্মিলিত উদ্যোগে চারদিন ব্যাপী ৩য় আন্তর্জাতিক 'সালাফী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে দেশবিদেশের ৪০,০০০ ডেলিগেট ও ৫ লক্ষ লোকের মহাসমাবেশ হয় বলে অনুমান করা হয়।[২৫]

ঘ-'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সঙ্গে এখানকার যৎসামান্য সাংগঠনিক সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। কেননা কেরালা জমঈয়তে ওলামার সেক্রেটারী মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ আল-কাতিব ১৯৮৭ সালে মারকাযী জমঈয়তের নায়েবে আমীর ছিলেন।[২৬]

বর্তমান ভারতে কেরালা আহলেহাদীছ আন্দোলনের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, যা বিগতযুগে ৮ম ও ৯ম শতাব্দী হিজরীতে বাহমনী (৭৮০-৮৮৬হিঃ/১৩৭৮-১৪৭২খৃঃ) ও মুযাফ্ফরশাহী (৮৬৩-৯৮০/১৪৫৮-১৫৭২) যুগে দক্ষিণ ভারতে জোরদার আহলেহাদীছ আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৭ - মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান (প্রতিষ্ঠাকালঃ ২৪শে জুলাই ১৯৪৮)

ভারত বিভাগের পর লাহোরে সর্বপ্রথম পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের গোড়াপত্তন হয়। লাহোর সরকারী কলেজের আরবী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবদুল কাইয়ূমের উদ্যোগে আয়োজিত প্রায় দুইশত আলেম ও নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত উক্ত জমঈয়তের প্রথম ছদর বা সভাপতি নির্বাচিত হন খ্যাতনামা আলিম ও রাজনীতিক মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ গযনবী (১৩১২-৮৩/১৮৯৫-১৯৬৩) বিন আব্দুল জাব্বার বিন আব্দুল্লাহ গযনবী (১২৩০-৯৮ হিঃ) ও সম্পাদক হন অধ্যাপক আবদুল কাইয়ূম। মাওলানা গযনবীর বাড়ী সংলগ্ন মাদরাসা 'দারুল উলূম তাক্বভিয়াতুল ইসলাম'-এর দু'টি কামরা জমঈয়ত অফিসের জন্য বরাদ্দ করা হয়।[২৭] তাঁর পরে 'আমীর' হন বিখ্যাত আলিম মাওলানা ইসমাঈল সালাফী (গুজরানওয়ালা)। ১৯৬৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে 'আমীর' হন শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ গোন্দলবী। ১৯৮৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে বর্তমান আমীর হলেন মিয়াঁ ফযলে হক। কেন্দ্রীয় অফিস ১০৬, রাভী রোড, লাহোর।

১৯৪৮ সালে ব্যাপকভিত্তিক মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ কায়েম হবার পূর্বে ১৯১৩ সালে এডভোকেট মৌলবী আযীমুল্লাহ ও মৌলবী সুলতান আহমদের উদ্যোগে সর্বপ্রথম 'আনজুমানে আহলেহাদীছ লাহোর' কায়েম হয়। প্রথমজন ছিলেন 'ছদর' ও দ্বিতীয়জন 'নাযেম'। যিনি অধ্যাপক আবদুল কাইয়ূমের নানা ছিলেন। পরে ১৯৩৪ সালে ইনি সভাপতি ও আবদুল কাইয়ূম ছাহেব সম্পাদক হন[২৮] যিনি উক্ত পদেই সম্ভবতঃ আমৃত্যু বহাল ছিলেন। সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ লাহোর' এই জমঈয়তের মুখপত্র।

৮ - জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান (প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৮১)

রাজনৈতিক বিষয়ে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের নীরব ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে আল্লামা ইহসান ইলাহী যাহীর (১৯৪০-১৯৮৭ খৃঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ ১৯৮১ সালে গুজরানওয়ালাতে এক বিরাট সম্মেলনের মাধ্যমে পৃথক 'জমঈয়তে

Contents

আহলেহাদীছ' গঠন করেন।[২৯] প্রথম 'আমীর' হন শায়খুল হাদীছ মাওলানা আবদুলাহ ও নাযেম হন শায়খ মুহাম্মাদ হুসাইন। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে আল্লামা ইহসান ইলাহী সম্পাদক পদ গ্রহণে বাধ্য হন। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে আহলেহাদীছ আন্দোলনে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়। বহু প্রতিশ্রুতিশীল আলেম ও তরুণ তাঁর প্রতি আস্থাবান ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি নিজে পাকিস্তানের সমকালীন সময়ের সেরা বাগ্মী ছিলেন। পনরো/ষোলখানা মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা ও খ্যাতনামা আলিম ও রাজনীতিক ছিলেন। তাঁর স্পষ্টবাদিতা ও ক্ষুরধার লেখনীর কারণে বিশেষ করে শী'আ, কাদিয়ানী ও ব্রেলভীগণ সন্ত্রস্ত ছিল। বিরোধী রাজনৈতিক মহল আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের এই নওজোয়ান সিপাহসালারকে ভীতির চোখে দেখতেন। ফলে হিংসুকদের চক্রান্তে ১৯৮৭ সালের ২৩শে মার্চ সোমবার লাহোরের কেল্লা লছমনসিং ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল ইসলামী জালসায় বক্তৃতারত অবস্থায় দূরনিয়ন্ত্রিত বোমার সাহায্যে তাঁকে হত্যা করা হয়। সাথে সাথে নিহত হন আরও আটজন সেরা আহ্লেহাদীছ আলিম ও নেতৃবৃন্দ। যখম হন শতাধিক ব্যক্তি।[৩০]

তাঁর ইন্তেকালের পরে প্রফেসর সাজেদ মীর সম্পাদক হন। ৫০, লোয়ারমাল রোডে প্রশস্ত জমির উপরে এই জমঈয়তের সর্বাধুনিক ব্যবস্থাপনা সজ্জিত বিরাট অফিস অবস্থিত। মাসিক তরজমানুল হাদীছ, সাপ্তাহিক আল-ইসলাম, 'মুমতায ডাইজেষ্ট' সাময়িকী এই জমঈয়তের নিয়মিত পত্রিকা হিসাবে চালু আছে।

৯-জামা'আতে আহলেহাদীছ পাকিস্তান
(প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৩১ খৃঃ)

খ্যাতনামা আলিম মাওলানা আবদুল্লাহ রৌপড়ী (১৩০৩-১৩৮৪/১৮৮৪-১৯৬৪) 'জামা'আতে আহলেহাদীছ পাঞ্জাব' নামে ১৯৩১ সালে প্রথম এই সংগঠন কায়েম করেন। বর্তমানে লাহোরের চকদালগেরা 'মসজিদে কুদ্সে' এই জামা'আতের কেন্দ্রীয় দফতর অবস্থিত। সাপ্তাহিক 'তানযীমে আহলেহাদীছ' এই জামা'আতের মুখপত্র। মাওলানা আবদুল কাদের রৌপড়ী বর্তমানে 'আমীর'।

১০ - জামা'আতে মুজাহেদীন পাকিস্তান

আমীরুল মুজাহিদীন সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী (১২০১-১২৪৬/১৭৮৬-১৮৩১)

ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) -এর জিহাদী আদর্শের অনুসারী হওয়ার দাবীদার এই জামা'আতের পাকিস্তান শাখার বর্তমান আমীর গাযী আবদুল করীম এবং নায়েবে আমীর করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ যাফরুল্লাহ। করাচী ব্লক-৬ গুলশান ইকবালে এই জামা'আতের কেন্দ্রীয় অফিস, কেন্দ্রীয় মাদরাসা জামে'আ আবুবকর আল-ইসলামিয়াহ এবং কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী অবস্থিত- যা আধুনিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত। দা'ওয়াত ও তাবলীগের আধুনিক ব্যবস্থাপনাসহ কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি খুবই সুন্দর ও উন্নতমানের। গ্রন্থপ্রকাশ, মুবাল্লিগ-প্রশিক্ষণ ও তাবলীগের মাধ্যমেই এঁরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করে থাকেন। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তাঁরা সমর্থন করেন না। এই জামা'আতের নিজস্ব মুখপত্র নেই।[৩১] ভারতের পাটনা ছাদিকপুরের মূল কেন্দ্রে কিংবা বাংলাদেশে এই জামা'আতের কোন তৎপরতা নযরে না পড়লেও করাচীতে এই জামা'আতের দৃষ্টান্তমূলক তৎপরতা রয়েছে।

এক নযরে পাকিস্তানে আহলেহাদীছ

১। জনসংখ্যাঃ আনুমানিক এক কোটি।

২। জনসংখ্যার ঘনত্বের হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহঃ

(ক) পাঞ্জাব প্রদেশঃ ১। ফায়ছালাবাদ ২। গুজরানওয়ালা (শহর ও জেলা) ৩। লাহোর (শহর ও জেলা) ৪। মুলতান ৫। শিয়ালকোট ৬। ক্বাছূর (জেলা) ৭। শেখুপুরা ৮। খানেওয়াল ৯। মুযাফ্ফরগড় ১০। উকাড়া ১১। সাহিওয়াল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল জেলাতেই অল্পবিস্তর আহলেহাদীছ জনগণ মওজুদ আছেন।

(খ) সীমান্ত প্রদেশঃ ১। এবোটাবাদ জেলার 'গালিয়াত' (گلیات) এলাকার ৯০ শতাংশ বাশিন্দা আহলেহাদীছ ২। পেশাওয়ার শহরের 'সফেদ ঢেরী' (سفید ڈھیری)-তে আহলেহাদীছ যথেষ্ট রয়েছেন। ৩। হরিপুর জেলার তেলিয়াঁওয়ালা মহল্লা ৪। কোহাট জেলার জংগলখেল ও লিয়াকতপুর এলাকা।

(গ) সিন্ধু প্রদেশঃ ১। জেলা রহীম ইয়ারখান ২। হায়দরাবাদ (এই জেলার নিউ সাঈদাবাদে খ্যাতনামা আলেম মাওলানা বদীউদ্দীন শাহ রাশেদীর বাসস্থান) ৩। জেলা নওয়াবশাহ ৪। মোরো জেলা ৫। বাদীন জেলা।

(ঘ) বেলুচিস্থানঃ ১। বাল্তিস্থান (গিলগিট) এলাকার গাওয়াড়ী ও সাকারদু অঞ্চল।

৩। মসজিদ ও মাদরাসাঃ

পাকিস্তানে বর্তমানে আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সংখ্যা প্রায় ৫০০০ হাযার ও দ্বীনী মাদরাসার সংখ্যা অন্যূন ২৬৭টি। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত মহানগরী ও প্রধান শহরগুলিতে মসজিদ ও মাদরাসার সংখ্যা প্রদত্ত হ'ল।-

	শহর	মসজিদ	মাদরাসা
১।	ফায়ছালাবাদ	১৩৫	২০
২।	লাহোর	১৩০	৪
৩।	করাচী	১২০	১২
৪।	মুলতান	৮০	৪
৫।	সারগোধা	৬০	৩
৬।	রাওয়ালপিন্ডি	৫০	২
৭।	পেশাওয়ার	১৫	৫
৮।	কোয়েটা	৬	২
৯।	হায়দরাবাদ	৫	১
১০।	ইসলামাবাদ	৫	১
	মোট-	৬০৬	৫৪

উল্লেখযোগ্য (ক) জামে মসজিদসমূহ নিম্নরূপঃ

১। লাহোরঃ (ক) চীনাওয়ালী মসজিদ, বাজার সিরিয়ানওয়ালা, রংমহল। এটিই লাহোরের প্রাচীন ও প্রথম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বলে কথিত। এ মসজিদের খ্যাতনামা খতীবগণের মধ্যে মাওলানা আবদুল্লাহ চকড়ালবী (ইনি 'মুনকিরে হাদীছ' প্রমাণিত হ'লে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়)। মাওলানা আবদুল

জাব্বার গযনবী, আবদুল ওয়াহেদ গযনবী, দাউদ গযনবী, ইহসান এলাহী যাহীর শহীদ প্রমুখ পাকিস্তানের সেরা আহলেহাদীছ ওলামা ও বাগ্মীবৃন্দ। (খ) মসজিদে কুদ্‌স, ব্রান্ডর্থ রোড, চক দালগেরাঁ (মাওলানা আবদুলাহ রৌপড়ী এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন)। (গ) মারকাযী জামে মসজিদ আহলেহাদীছ, আমীনপুর বাজার (ঘ) জামে মসজিদ রহমানিয়া, মুহাম্মাদী পার্ক, রাজগড় (ঙ) মসজিদে মুবারক (ইসলামিয়া কলেজের নিকটে) রেলওয়ে রোড, লাহোর।

২। করাচীঃ মারকাযী জামে মসজিদ আহলেহাদীছ, কোর্ট রোড।

৩। ফায়ছালাবাদঃ জামে মসজিদ রহমানিয়া, সুন্দরগলি।

৪। গুজরানওয়ালাঃ জামে মসজিদ মুকাররম, মডেল টাউন।

৫। কোয়েটাঃ জামে মসজিদ আহলেহাদীছ, মোসলেমাবাদ, চমন রোড।

৬। পেশাওয়ারঃ জামে মসজিদ আহলেহাদীছ, পেশোয়ার সদর (শহর নয়)।

৭। রাওয়ালপিন্ডিঃ জামে মসজিদ আহলেহাদীছ, নিউ মারহান স্কীম।

৮। ইসলামাবাদঃ জামে মসজিদ আহলেহাদীছ, আবপারা মার্কেটের নিকটে।

(খ) প্রসিদ্ধ মাদরাসাসমূহঃ

১। দারুল হাদীছ রহমানিয়া, সোলজার বাজার, করাচী-৩
(প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৪৮ খৃঃ)

২। জামে'আ সাত্তারিয়া ইসলামিয়া, গুলশান ইকবাল ব্লক-৬, করাচী (১৯৭৮)

৩। জামে'আ আবুবকর ইসলামিয়া, গুলশান ইকবাল-ব্লক-৬, করাচী (১৯৭৮)

৪। জামে'আ সালাফিইয়াহ, হাজী আবাদ, ফায়ছালাবাদ (১৯৫৬)

৫। জামে'আ তা'লীমুল ইসলাম, মামুঁকান্‌জন, ফায়ছালাবাদ (১৯২১-৩২) 'তরজমায়ে কুরআন' ক্লাস, ১৯৩২ থেকে নিয়মিত মাদরাসার ক্লাস ও ১৯৬৩ হ'তে 'জামে'আ' শুরু।- 'মাজাল্লা তা'লীমুল ইসলাম' মামুঁকান্‌জন, ফায়ছালাবাদ। ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৫।

৪। পত্রিকাসমূহঃ

(ক) দৈনিকঃ

বেফাক (وفاق) সম্পাদকঃ বেকার মুছতফা, ৬-এ, ওয়ারেছ রোড, লাহোর।

(খ) মাসিকঃ

১। মুহাদ্দিছ	৯৯, জে, মডেল টাউন	লাহোর-১৪
সম্পাদকঃ হাফেয আবদুর রহমান মাদানী		
২। তারজুমানুল হাদীছ	৫০ লোয়ার মাল	লাহোর
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকঃ ইহসান ইলাহী যাহীর		
৩। হিযবুল্লাহ		পেশোয়ার
৪। মুমতাজ ডাইজেষ্ট	১৯, উর্দূ বাজার,	লাহোর
সম্পাদকঃ আবদুল আলা রহমানী		
৫। আল-মা'আরিফ	২ ক্লাব রোড	লাহোর
সম্পাদক ঃ ইসহাক ভাট্টি		
৬। মাজাল্লা তা'লীমুল ইসলাম	মামূঁকানজন	ফায়ছালাবাদ
সম্পাদক, মুহাম্মাদ আসলাম সায়েফ		
(গ) পাক্ষিকঃ ছহীফা আহ্লেহাদীছ	গুলশান ইকবাল	করাচী
(ঘ) সাপ্তাহিকঃ		
(১) আল-ই'তিছাম	শীশমহল রোড	লাহোর
(২) আখবারে আহ্লেহাদীছ	১০৬, রাভী রোড	লাহোর
(৩) আল-ইসলাম	৫০, লোয়ার মাল	লাহোর
(৪) তানযীমে আহ্লেহাদীছ	চক্ দালগেরাঁ	লাহোর
(৫) আল-মিম্বর		ফায়ছালাবাদ
৫। ছাপাখানাঃ		
(১) মাতবা'আ আরাবিয়াহ,	পুরানো আনারকলি,	লাহোর
(২) আশরাফ প্রিন্টিং প্রেস,	নতুন আনারকলি,	লাহোর
৬। প্রকাশনা সংস্থা ও লাইব্রেরীঃ		
(১) মাকতাবা সালাফিইয়াহ,	শীশমহল রোড,	লাহোর
(২) মাকতাবা নু'মানিয়া,	উর্দূ বাজার	লাহোর

(৩) সুবহানী একাডেমী, উর্দূ বাজার লাহোর
(৪) ইসলামিক পাবলিশিং হাউস, শীশমহল রোড, লাহোর

৭। রাজনীতিঃ

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ লাহোর-এর রাজনৈতিক সম্পাদক মাওলানা আবদুর রহমান আযাদ বলেন যে, আমরা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে সমর্থন করিনা। জমঈয়তে আহলেহাদীছ সাংগঠনিকভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেনা। তবে আল্লামা ইহসান ইলাহী যাহীর (রহঃ)-এর অনুসারী 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' সাংগঠনিকভাবেই নির্বাচনে অংশ নিয়ে থাকে।[৩২]

১১ - আঞ্জুমানে আহলেহাদিস বাঙ্গালা ও আসাম

(প্রতিষ্ঠাকালঃ বাংলা ১৩২১, হিজরী ১৩৩২, খৃষ্টাব্দ ১৯১৪)

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২)-এর বাংগালী ও আসামী ছাত্ররা মিলে কলিকাতার ১নং মারকুইস লেন, মিছরীগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ১৯১৪ সালে উক্ত সংগঠন কায়েম করেন। সভাপতি নির্বাচিত হন বর্ধমান জেলার কুলসোনার স্বনামধন্য আলেম মাওলানা নে'মাতুল্লাহ (বাং ১২৬৬-১৩৫০) এবং সেক্রেটারী হন হুগলী জেলার বড়স্বার মাওলানা আবদুল লতীফ (১৮৭৮-১৯৪৯ ইং)।[৩৩] সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে মাসিক 'আহলেহাদিস' মোহাম্মাদ আবদুল হাকীম (হানাফী)[৩৪] ও মোহাম্মাদ বাবর আলী (আহলেহাদীছ)-এর যৌথ সম্পাদনায় ১৯১৫ মোতাবেক বাংলা ১৩২২ সালের আশ্বিন হ'তে পৌষ পর্যন্ত চলে। অতঃপর মোহাম্মাদ বাবর আলীর একক সম্পাদনায় ১৩২২ সালের মাঘ হ'তে নিয়মিত প্রকাশিত হ'তে থাকে। ১২ বৎসর মাসিক রূপে চলার পর ১৯২৭ সালে 'সাপ্তাহিকে' রূপান্তরিত হয়। ১৯৩০ সালে দিনাজপুরের মাওলানা মুণীরুদ্দীন আনোয়ারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এঁর সম্পাদনায় ১০ বছর চলার পর ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বন্ধ হ'য়ে যায়। কিছুদিন পরে মালদহের শাহযামান ছাহেবের সম্পাদনায় মাসিক আকারে এর কয়েকটি সংখ্যা বের হয়। কিন্তু পরে বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় বিভিন্ন কারণে আঞ্জুমানের তৎপরতা স্তিমিত হ'য়ে পড়ে।[৩৫] তবুও আঞ্জুমান এই সময় মূল্যবান কিছু বই প্রকাশ করে। সর্বোপরি 'আহলেহাদিস' পত্রিকার মাধ্যমে

আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সম্পাদক মাওলানা বাবর আলী (১৮৭৩-১৯৪৬ খৃঃ) খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। তিনি, মাওলানা এফাজুদ্দীন, মাওলানা রহীমবখ্‌শ, মাওলানা আবদুল লতীফ, মাওলানা আবদুন্ নূর প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ও আঞ্জুমান নেতৃবৃন্দ এই সময় বাংলার বিভিন্ন এলাকায় সফর করে আহলেহাদীছ আন্দোলন জোরদার করেন এবং বহু লোক শিরক ও বিদ'আত ছেড়ে দিয়ে এঁদের হাতে আহলেহাদীছ হয়ে যান।[৩৬]

আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠার ৩য় বর্ষে ১৩২৩ সালের ফাল্গুন মাস মোতাবেক ১৯১৬ সালের ৯, ১০, ১১ই মার্চ 'অল-ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্স'-এর কলিকাতা অধিবেশনে মাওলানা হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরী, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা আবদুল আযীয রহীমাবাদী, মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী (১৩০৭-৬৯/১৮৮৮-১৯৪৯) প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে 'আঞ্জুমানে আহলেহাদিস'-কে অল-ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্সের শাখা হিসাবে গণ্য করা হয়।[৩৭]

১২ - নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছ
(প্রতিষ্ঠাকালঃ ২০শে এপ্রিল ১৯৪৬ সাল, ৭ই বৈশাখ ১৩৫৩)

পূর্ববাংলার রংপুর জেলা শহরের অনতিদূরে তিস্তা নদীর তীরবর্তী হারাগাছ বন্দরে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শীর (১৯০০-১৯৬০) নেতৃত্বে তিনদিনব্যাপী বাংলা ও আসাম আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার বাহির হ'তে এই মহতী কন্‌ফারেন্সে যে সকল ওলামায়ে কেরাম যোগদান করেন, তাঁদের মধ্যে পাকিস্তানের মাওলানা ইসমাঈল গুজরানওয়ালা, বিহারের মাওলানা আবদুল্লাহ আরাভী, মাওলানা আবুল কাসেম বেনারসী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এই কনফারেন্সে মাওলানা কাফী ছাহেবকে সভাপতি করে 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছ' গঠিত হয়। কলিকাতা মিছরীগঞ্জ মসজিদে এর সদর দফতর স্থাপিত হয়।[৩৮]

১৩ - আনজুমান আহলেহাদিস পশ্চিম বঙ্গ
(প্রতিষ্ঠাকালঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ ইং)

১৯৪৬ সালে 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছ' গঠিত হ'লেও

পরের বছর ভারত বিভক্ত হওয়ায় জমঈয়তের সদর দফতর কলিকাতা হ'তে পূর্ব পাকিস্তানের পাবনায় স্থানান্তরিত হয়। ফলে পরিবর্তিত প্রয়োজনের তাকীদে ১৯৫১ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতার মিছরীগঞ্জ মসজিদে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে পৃথকভাবে 'আনজুমান আহ্‌লেহাদিস পশ্চিম বঙ্গ' গঠিত হয়। সভাপতি হন কলুটোলার মাওলানা হাফেয ইসমাঈল দেহলভী ও সম্পাদক হন মেটিয়াবুরুজের আলহাজ্জ হারূনুর রশীদ মন্ডল। ঐ সালেই মেটিয়াবুরুজের এস. এম. ফজলুল হক-এর সম্পাদনায় আঞ্জুমানের মুখপত্ররূপে বের হয় মাসিক 'তবলীগ'। কিন্তু এক মামলায় পড়ে পত্রিকাটি ১৯৫৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

অতঃপর ১৯৬৪ সালে মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানীর সম্পাদনায় আঞ্জুমানের মুখপত্ররূপে বের হয় মাসিক 'তওহীদ'। কিছুদিনের মধ্যে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত করায় বীরভূমের মাওলানা মোবারক করীম জওহর সম্পাদক হন। কিন্তু দু'বছরের মধ্যে পত্রিকাটি বন্ধ হ'য়ে যায়।

১৯৭১ সালে হাকিমপুরের আবদুল কাইয়ূম খানের সভাপতিত্বে 'পশ্চিম বঙ্গ আনজুমানে আহ্‌লেহাদিস' পূনর্গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে উক্ত আনজুমানের মুখপত্র হিসাবে 'আল-ইসলাম' নামে একটি বিশেষ সংখ্যা বের হয়। এরপর হাফেয শেখ আয়নুল বারী আলিয়াবীর সম্পাদনায় 'মাসিক আহ্‌লেহাদীস' ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাস থেকে এযাবত নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৭৫ সালে 'আনজুমানের' স্থলে 'পশ্চিম বঙ্গ জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস' নামকরণ করা হয়।[৩৯] বর্তমানে এই জমঈয়ত কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস হিন্দ-এর প্রাদেশিক শাখা হিসাবে পরিগণিত।

তাবলীগ, তাছনীফ ও সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক জমঈয়ত বর্তমানে বেশ তৎপর। এবিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করছি।-

১- জনসংখ্যাঃ

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে আহ্‌লেহাদীছ জনসংখ্যা ৩৬ লাখের মত। তন্মধ্যে জনসংখ্যার দিক দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় সবচেয়ে বেশী অন্যূন বারো লাখ। শতকরা হিসাবে সবচেয়ে বেশী মালদহে- ৭০% এবং ঘনবসতি হিসাবে সবচেয়ে

বেশী কলিকাতার মেটিয়াবুরূজে প্রতি বর্গমাইল এলাকায় গড়ে ২৬,০০০ হাযার।

জেলাওয়ারী হিসাব

	জেলা	আহ্‌লেহাদীছ জনসংখ্যা	মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা হার
১।	মুর্শিদাবাদ	১২,০০,০০০ লাখ	৬০%
২।	মালদহ	৭,০০,০০০ লাখ	৭০%
৩।	বীরভূম	৩,৫০,০০০ লাখ	৪০%
৪।	নদীয়া	৩,০০,০০০ লাখ	৩৮%
৫।	পশ্চিম দিনাজপুর	৩,২৫,০০০ লাখ	৩৭%
৬।	বর্ধমান	২,৭৫,০০০ লাখ	৩৫%
৭।	২৪ পরগনা	২,৫০,০০০ লাখ	৩০%
৮।	মেটিয়াবুরূজসহ কলিকাতা	২৭,০০০ হাযার	১২%
৯।	হুগলী	১,৫০,০০০ লাখ	১৮%
১০।	হাওড়া	১,০০০ হাযার	৫%
১১।	কুচবিহার	১০,০০০ হাযার	৫%
১২।	জলপাইগুড়ি	২০০ শত	১%
১৩।	দার্জিলিং	৫০০ শত	২%
১৪।	মেদিনীপুর	১০০ শত	০.০৩%
১৫।	বাঁকুড়া	২৫ জন	০.০১%
১৬।	পুরুলিয়া	৫০ জন	০.০৫%
	মোট-	৩৫,৮৮,৮৭৫ জন	

২- মোট আহ্‌লেহাদীছ জামে মসজিদের সংখ্যা আড়াই হাযারের মত। তন্মধ্যে

কলিকাতা মহানগরীতে মিছরীগঞ্জ, কলুটোলা ও তাঁতীবাগানে মোট তিনটি এবং মেটিয়াবুরূজ উপশহরে বারোটি। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে ২টি, বীরভূমের ইলমবাজারে ১টি এবং নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরী, দেবগ্রাম ও পলাশী শহরে একটি করে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ রয়েছে।

৩। **পশ্চিম বঙ্গে আহলেহাদীছ পরিচালিত** 'মিশকাত' পর্যন্ত বেসরকারী মাদরাসার সংখ্যা অন্যূন ৬০টি। ছহীহায়েন পর্যন্ত পড়ানো হয় এমন উল্লেখযোগ্য মাদরাসাসমূহ নিম্নরূপঃ

ক-মুর্শিদাবাদ জেলাঃ (১) লালগোলা (২) সালেহডাঙ্গা (৩) ডাঙ্গাপাড়া (৪) বলরামপুর (৫) আমতলা (৬) লোহরপুর (৭) তফিপুর।

খ- মালদহ জেলাঃ (১) বাট্না (২) ভাদো (৩) কাতলামারী (৪) খানপুর (৫) হযরতপুর-জালালপুর

গ- বীরভূম জেলাঃ (১) মাঠপলশা (২) মহিষাডহরী (৩) লোহাপুর (৪) ভাগলদীঘি।

৪। **আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রসমূহঃ**

(১) মিছরীগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ১নং মারকুইস লেন, কলিকাতা-১৬। এখানেই প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীছের সদর দফতর অবস্থিত। (২) হাওলদারপাড়া জামে মসজিদ, মেটিয়াবুরূজ, কলিকাতা-১৮, মসজিদটি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। (৩) বেলডাঙ্গা 'দারুত তাবলীগ' মুর্শিদাবাদ (৪) জামে'আ রহমানিয়া, ধূলিয়ান, মুর্শিদাবাদ (৫) ইলমবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও মাদরাসা, বীরভূম (৬) সাদলীচক, ঐ।

৫। **জমঈয়ত প্রকাশনা (১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ পর্যন্ত)ঃ**

(১) জমঈয়ত-মুখপত্র 'মাসিক আহলেহাদীস'। ১৯৭২ - এর অক্টোবর হ'তে অদ্যাবধি চালু আছে। সম্পাদক, হাফেয শেখ আয়নুল বারী আলিয়াবী।

(২) তাফসীরে আয়নী (আমপারা প্রথমার্ধ)।

(৩) আহলেহাদীসের প্রকৃত পরিচয়।

(৪) কোরবাণী ও আয়নী বিবরণী।

(৫) বিশ্বনবীর বিশ্ববাণী।

(৬) কোরআন পড়িয়ে সওয়াব বখশানো সুন্নাত না বিদ'আত।

(৭) কাদিয়ানী কাহিনী।

৬। **খিদমতে খাল্‌কঃ** প্রকাশনা ছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিশেষ করে বন্যার সময় জমঈয়তের পক্ষ হ'তে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে উপদ্রুত অঞ্চলে গিয়ে বিতরণ করা হয়।

৭। **সভা-সম্মেলনঃ** পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র সভা-সমিতি ও তাবলীগী জালসা ছাড়াও বছরে একবার কলিকাতা বা বাইরে বড় আকারে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। সেখানে সর্বসাধারণের নিকট আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের নীতি ও কর্মধারা ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

৮। রাজনৈতিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের ন্যায় প্রাদেশিক জমঈয়তও নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে।[৪০]

১৪ - বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট ভারত বিভাগের পর **১৯৪৮ সালের** ৭ই মার্চ তারিখে 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদিছ'-এর সদর দফতর কলিকাতা হ'তে পূর্বপাকিস্তানের পাবনা জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র বাঁশবাজার আহ্‌লেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন দফতরে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর **১৯৫৩ সালের** ১০ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জেনারেল কমিটির এক সভায় উপরোক্ত নাম পরিবর্তন করে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ' গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় দফতর পাবনা হ'তে ঢাকায় ৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোডে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬০ সালের ৪ঠা জুন তারিখে জমঈয়ত-সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শীর ইন্তেকালের পর **১৫ই** জুন তারিখে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রখ্যাত বাগ্মী ও ইসলামী চিন্তাবিদ ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুল বারী পরবর্তী সভাপতি নিযুক্ত হন।[৪১] যিনি এখনও উক্ত পদে সমাসীন আছেন। **১৯৭১ সালের** ১৬ই ডিসেম্বরে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর বর্তমানে উহা 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস' নামে পরিচিত। ৯৮, নওয়াবপুর রোড,

ঢাকা-১-এ সদর দফতর অবস্থিত।

জমঈয়ত-সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলিম ও নিবেদিতপ্রাণ নিরলস কর্মীপুরুষ। একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, তাঁর উদ্যমই ছিল জমঈয়তের চালিকাশক্তি। তাবলীগ ও তাছনীফের ক্ষেত্রে তাঁর আমলে জমঈয়ত বিপুল অগ্রগতি সাধন করে। বিচ্ছিন্ন আহলেহাদীছ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ সমাজশক্তিতে পরিণত করাই ছিল মাওলানার পরম কামনা। এতে তিনি অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের ৬ই জানুয়ারী তাঁর নেতৃত্বে পাবনা ঈদগাহ ময়দানে বিভিন্ন ইসলামপন্থী দলগুলির 'এছলামী ফ্রন্ট' সম্মেলন[৪২] অনুষ্ঠান ছিল জমঈয়তের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। মাসিক 'তর্জুমানুল হাদীছ' ছিল জমঈয়তের এক অনন্যসাধারণ মুখপত্র, যা ১৯৪৯ হ'তে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চালু থাকে। সদর দফতর ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর ১৯৫৭ সালের ৭ই অক্টোবর থেকে মাওলানার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'আরাফাত' প্রকাশিত হয়, যা আজও চালু আছে।

জমঈয়ত ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত মাওলানা কাফী ছাহেবের অন্যূন ২২ খানা বই[৪৩] প্রকাশ করেছে। পরবর্তীতে তাঁর ফাতাওয়া সংকলন এবং অন্য লেখকদেরও কিছু বই ও অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। তন্মধ্যে 'বুলূগুল মারাম'-এর বঙ্গানুবাদ উল্লেখযোগ্য। জমঈয়তের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা-সম্মেলন ও কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শির্ক, বিদ'আত ও অনৈসলামী আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের চেষ্টা করা হয়। জমঈয়তের উদ্যোগে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ একটি 'জামেয়া' প্রতিষ্ঠার জন্য সাভারের বাইপাইলে ১৫ একর জমি খরিদ করা আছে।[৪৪] যেখানে বর্তমানে একটি ইয়াতীমখানা চল্‌ছে। এছাড়াও খিদমতে খাল্‌কের ব্যাপারে বিভিন্ন দৈব-দুর্বিপাকে জমঈয়ত উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, নলকূপ স্থাপন, গৃহনির্মাণ, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে জমঈয়ত সমাজসেবা করে থাকে।

১৫ - জামা'আতে মুজাহেদীন বাংলাদেশ

জমঈয়তে আহলেহাদীস ছাড়াও বাংলাদেশে আহলেহাদীছদের প্রাচীন ও নূতন দু'একটি সংগঠন রয়েছে। যেমন 'জামা'আতে মুজাহেদীন'। এই জামা'আত

সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর যুগ হ'তেই চলে আসছে। পাটনা ছাদিকপুরী জিহাদী পরিবারের সঙ্গে এই জামা'আতের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। এই জামা'আতের প্রচেষ্টায় বহু বাংলাদেশী মুজাহিদ এবং রসদপত্র, টাকা-পয়সা সীমান্তের আসমাস্ত, চামারকান্দ প্রভৃতি মুজাহিদ কেন্দ্রে এক সময় পাঠানো হ'ত। দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দরের মাওলানা যিল্লুর রহমান সালাফী বাংলাদেশ অঞ্চলের 'আমীর' ছিলেন। পাটনার আমীর মাওলানা আবদুল খবীর ছাদেকপুরী (মৃঃ ৩রা নভেম্বর ১৯৭৩)-এর নির্দেশক্রমে মাওলানা যিল্লুর রহমান সালাফী ও তাঁর সেক্রেটারী মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (জন্মঃ বাং ১৩৩৬ সালের ১লা চৈত্র) সম্ভবতঃ ১৯৫৪ সালে আমীর ছিবগাতুল্লাহ ও বরকতুল্লাহ্‌র মধ্যকার বিবাদ মিটানোর জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আসমাস্ত মুজাহিদ কেন্দ্রে গমন করেন।[৪৫] বর্তমানে পাটনার আমীর মাওলানা আবদুস সামী'-এর সঙ্গে এই জামা'আতের কোন সাংগঠনিক যোগাযোগ নেই। তবে পরস্পরের মধ্যে ঐতিহ্যগত সম্পর্ক রয়েছে বলা চলে।।

চিরিরবন্দরের নান্দেড়াই দারুলহুদা আলিয়া মাদরাসা হ'ল এই জামা'আতের কেন্দ্রীয় মাদরাসা। মাসিক 'আল-মুজাহিদ' এই জামা'আতের মুখপত্র। মাওলানা যিল্লুর রহমান সালাফীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র মাওলানা নাজমুল হক সালাফী বর্তমানে এই জামা'আতের আমীর। ইনি নান্দেড়াই মাদরাসার অধ্যক্ষ ও 'আল-মুজাহিদ' পত্রিকার সম্পাদক। তবে পত্রিকাটি বর্তমানে বন্ধ।

দিনাজপুরের নান্দেড়াই কেন্দ্রীয় এলাকা ছাড়াও (১) দক্ষিণ পলাশবাড়ী (২) রংপুরের গোলমুন্ডা (৩) নীলফামারীর ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ ও ডোমার এলাকা, (৪) বগুড়ার সোন্দাবাড়ী এবং (৫) সারিয়াকান্দি হ'তে ভরতখালি (ফুলছড়িঘাট) পর্যন্ত এলাকা (৬) গাইবান্ধার খোলাহাটি (৭) শিমুলবাড়ী ও (৮) সাঘাটা এলাকা (৯) পাবনার হেমায়েতপুর, বাজিতপুর ও চর এলাকার কাবুলীপাড়া, (১০) কুষ্টিয়ার কুমারখালি এলাকা (১১) টাংগাইলের দেলদুয়ার এলাকা (১২) ঢাকার বংশাল, দোলেশ্বর ও অন্যান্য এলাকা (১৩) সিরাজগঞ্জের হালুয়াকান্দিসহ সমস্ত কামারখন্দ এলাকা (১৪) রাজশাহীর সপুরা, দুয়ারী, জামিরা, পাঁচগাছিয়া এলাকা (১৫) এনায়েত আলীর মূল প্রচারকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের হাকিমপুরের সন্নিহিত এলাকা (১৬) সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা ও ফরিদপুর

যেলার বিভিন্ন এলাকা, মুজাহেদীন প্রভাবিত অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। যদিও এসবের মধ্যে নীলফামারীর জলঢাকা এলাকা ছাড়া বলতে গেলে আর কোন এলাকার সাথে নান্দেড়াই মুজাহিদ কেন্দ্রের বর্তমানে কোন সাংগঠনিক যোগাযোগ নেই।[৪৬]

১৬ - জামা'আতে গোরাবায়ে আহ্লেহাদীছ বাংলাদেশ

হিজরী ১৩১৩ মোতাবেক ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব দেহলভী (১২৮১-১৩৫১ হিঃ/১৮৬৬-১৯৩৩ খৃঃ) -এর ইমামতে সর্বপ্রথম এই সংগঠন কায়েম হয়। প্রতিষ্ঠার পরপরই উহার সমর্থনে স্বাক্ষরকারী উপমহাদেশের ৮৩ জন ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ৪২ জনই ছিলেন বাংগালী। তন্মধ্যে নদীয়া, মালদহ ও মুর্শিদাবাদের কয়েকজন বাদে বাকী ২৮ জনই ছিলেন পূর্ববঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহের আলিমগণ। তাঁদের অনেকেই মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব দেহলভীর ছাত্র বা তস্য ছাত্র ছিলেন। এঁদের মাধ্যমেই বাংলাদেশ অঞ্চলে সর্বপ্রথম জামা'আতের শাখা কায়েম হয়। ১৩৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৮ সালে তৎকালীন 'ইমামে জামা'আত' মাওলানা আবদুল গাফ্ফার সালাফী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া জানবায ও মাওলানা মকবুল আহমাদ মুজাহিদকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের জামা'আত সমূহ সফরে প্রেরণ করেন। ২২শে এপ্রিল হ'তে ১০ই জুন পর্যন্ত ৫৪ দিনের সফর শেষে তাঁরা ইমামে জামা'আতের নিকটে লিখিত রিপোর্ট পেশ করেন। তাতে দেখা যায় যে, তখনকার সময়ে ময়মনসিংহে (বর্তমান টাংগাইলে) ৭টি, রংপুরে (বর্তমান রংপুর ও লালমনিরহাটে) ১২টি, দিনাজপুরে ২টি ও বগুড়ায় ১টিসহ মোট ২২টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের অধীনে ৩৭টি মোকামী (শাখা) জামা'আত পরিচালিত হ'ত। প্রতিটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের একজন করে 'আমীর' কেন্দ্রীয় 'ইমামের' পক্ষ হ'তে 'সনদে ইমারত' পেতেন। শাখা জামা'আতের দায়িত্বশীলকে 'নাযেম' বলা হ'ত। জামা'আতের পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের দায়িত্বশীলকে 'ওয়ালী' বলা হ'ত। রংপুরের হারাগাছ-এর দর্জিপাড়ার অধিবাসী মাওলানা আবদুল হামীদ এই দায়িত্বে ছিলেন। তিনি এখনও ঐ পদে আছেন (১৯৯৪ সালে মৃত্যু)। এইসব জামা'আতের অধীনে তখন বায়'আতকারীদের মোট সংখ্যা ছিল ৬৩৫৫ জন নারীপুরুষ।[৪৭] এছাড়াও জামা'আতবিহীনভাবে

সমর্থক অনেকেই ছিলেন- যাদের সংখ্যা রিপোর্টে উল্লেখিত হয়নি। বর্তমানে লালমনিরহাটের মহিষখোচা অঞ্চল, গাইবান্ধার শিমুলবাড়ী ও ফুলবাড়ী অঞ্চলে এই জামা'আতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইমারত বিরোধী হওয়ার কারণে এই জামা'আতের আহলেহাদীছগণ 'জমঈয়তে আহলেহাদীস'কে সমর্থন করেন না।

১৭ - আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম (প্রতিষ্ঠাকাল ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৩)

সাংগঠনিক মতানৈক্যের কারণে জমঈয়তে আহলেহাদীসের কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটির ঢাকাস্থ কিছু সদস্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য খ্যাতনামা আলেম ঢাকার বংশাল জামে মসজিদের খতীব মাওলানা মুন্তাছির আহমাদ রহমানী (১৯২৩-১৯৮৯ খৃঃ)-কে 'আমীর' নির্বাচন করে স্বতন্ত্রভাবে এই সংগঠনটি কায়েম করেন। পরবর্তীতে বেশ কিছু বিখ্যাত আলেম এই সংগঠনে যোগ দেন। ১৯৮৯ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখে মাওলানা মুন্তাছির আহমাদ রহমানীর ইন্তেকালের পরে বর্তমানে মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী (জন্মঃ বাংলা ১৩২০ সাল) এই সংগঠনের 'আমীর' হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ঢাকা শহরের বংশাল মালিবাগ মহল্লার ১৯৮, হাবীব মার্কেট দোতলায় কেন্দ্রীয় অফিস অবস্থিত। প্রধানতঃ ঢাকার আহলেহাদীছ মহল্লাগুলিতেই এর প্রভাব সীমিত। 'তাবলীগে ইসলাম প্রেস' নামে সংগঠনের নিজস্ব প্রেস ও 'দাওয়াতে ইসলাম' নামে নিজস্ব একটি অনিয়মিত মুখপত্র রয়েছে। সংগঠনের পক্ষ হ'তে ইতিমধ্যেই সিরিজ আকারে প্রায় দেড় ডজন পুস্তিকা প্রকাশ ও ফ্রি বিতরণ করা হয়েছে। অন্যান্য লেখকের কিছু বই-পুস্তিকাও এঁরা প্রকাশের উদ্যোগ নিচ্ছেন বল জানা গেছে।

১৮ - বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ (প্রতিষ্ঠাকালঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮)

তরুণ ছাত্র ও যুবসমাজের নিকটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে নিজ আদর্শমূলে সংগঠিত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত কিছু চিন্তাশীল ছাত্র ও অন্যান্য যুবকেরা মিলে প্রথমে ঢাকায় উক্ত সংগঠন গড়ে তোলে- যা বর্তমানে খুবই তৎপরতার সাথে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ দেশের সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।[৪৮]

১৯ - বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা (প্রতিষ্ঠাকালঃ ৭ই জুন ১৯৮১)

আহলেহাদীছ মহিলাদের এই সংগঠন মহিলাদের মধ্যে আন্দোলনের দা'ওয়াত

পৌঁছে দিচ্ছে। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'-র বর্তমান কেন্দ্রীয় অফিস মাদরাসা মার্কেট (৩য় তলা) রাণীবাজার,পোঃ ঘোড়ামারা, রাজশাহীতে অবস্থিত।[৪৯]

২০ - আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
(প্রতিষ্ঠাকালঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪)

মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক তথা সার্বিক জীবনকে আল্লাহ্ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'ইমারত' ও বায়'আত-এর ভিত্তিতে অত্র সংগঠন জন্মলাভ করে। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'-র উপদেষ্টা, সুধী ও সমর্থকদের সমবায়ে মূলতঃ এই মুরব্বী সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জাতীয় ভিত্তিক রূপলাভ করে।[৫০]

টীকাসমূহ-১৫

১. আবদুস সাত্তার দেহলভী, খুৎবায়ে ছাদারত (১৩৫১/১৯৩২-এর পরে ও ১৩৫৬/১৯৩৭-এর পূর্বে প্রকশিত) পৃঃ ১৪-১৫; ৮৩ জন আলেমের নাম প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে দিল্লীর ২ জন বাদে রংপুরের ২১ জন, ময়মনসিংহের ৬ জন, দিনাজপুরের ১ জন, মুর্শিদাবাদের ৬ জন ও মালদহের ৮ জন (মাওলানা ইবরাহীম শেরশাহী যার মধ্যে অন্যতম)- মোট ৪২ জন বাংগালীসহ বাকী ভারতের বিভিন্ন এলাকার ওলামায়ে আহলেহাদীছ।- আবদুর রহমান ঝাংগুরী সংকলিত 'ফাতাওয়া উলামায়ে কেরাম দর বারায়ে তাক্বার্রুরে ইমাম' (দিল্লীঃ আর্মী প্রেস, সালবিহীন) পৃঃ ৮১-৮৩; উক্ত সংকলনে ইমামত -এর পক্ষে হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরীর ফৎওয়া এবং তার সপক্ষে মাওলানা আবদুন্ নূর দারভাঙ্গাবী, মাওলানা আবদুল জলীল সামরূদীসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরামের ফৎওয়া সংকলিত হয়েছে। সাথে সাথে মাওলানা এনায়াতুল্লাহ ও মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ীর মধ্যে ইমামত-এর পক্ষে ও বিপক্ষে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রসিদ্ধ 'মুনাযারা' সংকলিত হয়েছে।-ঐ, পৃঃ ১৮-৮১।

২. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব, 'মুকাম্মাল নামায' (করাচীঃ মাকতাবা ইশা'আতুল কিতাবে ওয়াস্ সুন্নাহ, ভূমিকা (লেখকঃ আবু মুহাম্মাদ মিয়াঁওয়ালী, ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ২৭।

০ মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাবঃ আবদুল ওয়াহ্হাব বিন মুহাম্মাদ বিন খোশহাল বিন ফাৎহ বিন ক্বায়েম ১২৮০ অথবা ১২৮১ হিজরীতে পাঞ্জাবের ঝং যেলার 'ওয়াসুআস্তানা'

(واسوآستانه) শহরে এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মুলতান যেলার মুবারকাবাদ শহরে হিজরত করেন ও সেখানেই স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করেন। প্রথমে নিকটস্থ মসজিদে কুরআন মজীদ পড়া শেখেন ও পরে হেফ্য সমাপ্ত করেন। ৬ হ'তে ২০ বছর বয়সের মধ্যে তিনি সে যুগের সেরা চারজন উস্তাদ- হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী, আবদুল্লাহ গযনবী, মানছূরুর রহমান (পরে ঢাকাভী) ও শায়খুল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ)-এর নিকটে ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। পরে ১৮৮২ খৃঃ মোতাবেক ১৩০০ হিজরীর প্রথম দিকে তিনি দিল্লীতে 'দারুল কিতাবে ওয়াস্ সুন্নাহ' নামে একটি মাদরাসা কায়েম করেন- যা আজও আছে।

মোর্দা সুন্নাত যেন্দা করার দিকে তাঁর বিশেষ নযর ছিল। যেমন- (১) তিনিই দিল্লীতে প্রথম প্রকাশ্য ময়দানে ১২ তাকবীরে ঈদের জামা'আত কায়েম করেন (২) তিনিই প্রথম নিজের স্ত্রী-কন্যাদের সাথে নিয়ে পুরুষদের সাথে পর্দার মধ্যে মহিলাদের ঈদের জামা'আত চালু করেন (৩) তিনিই দিল্লীতে প্রথম মুছল্লীদের মাতৃভাষায় জুম'আর খুৎবা চালু করেন (৪) তিনিই প্রথম 'ছালাতে জানাযা'র কিরাআত সশব্দে পাঠ করা শুরু করেন (৫) তিনিই প্রথম দুষ্ট স্বামীদের অত্যাচারে অতিষ্ট মযলূম স্ত্রীদেরকে স্বেচ্ছায় বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিয়ে মযবুত দলীল সহকারে ফৎওয়া প্রকাশ করেন (৬) খতীব মিম্বরে বসার পরে জুম'আর জন্য একটি মাত্র আযান দেওয়ার সুন্নাতে নববী তিনিই দিল্লীতে পুনঃপ্রবর্তন করেন (৭) লোকেরা কালেমায়ে ত্বাইয়িবার দুই অংশকে একত্রে 'কালেমায়ে তাওহীদ' বা 'একত্ববাদের ঘোষণা' মনে করত। তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন যে, কালেমায়ে ত্বাইয়িবার প্রথম অংশটিই মাত্র 'কালেমায়ে তাওহীদ' এবং দ্বিতীয় অংশটি হ'ল 'কালেমায়ে রিসালাত' (৮) জীবনমরণ সমস্যা দেখা দিলে হৃদয়ে ঈমান ঠিক রেখে মুখে 'কুফরী কলেমা' উচ্চারণ করার পক্ষে সূরায়ে নাহ্ল ১০৬ আয়াতের আলোকে তিনি ফৎওয়া প্রদান করেন- যা ছিল সে যুগের হিসাবে বড়ই ঝুঁকিপূর্ণ ফৎওয়া (৯) হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অজুহাতে মাওলানার সময়ে দিল্লীতে মুসলমানেরা গরু কুরবানী এবং সাধারণ ভাবে গরু যবাই করত না। গরুর গোস্তের ত্রুটি বর্ণনায় মুসলমানেরা বাড়াবাড়ি করতে থাকে। কোন কোন মৌলবী ছাহেব তো গরুর গোস্ত খাওয়াকে শুকরের গোস্ত খাওয়ার মত হারাম ফৎওয়া দেওয়া শুরু করেন। মুসলমানদের এই হীনমন্যতা দেখে মাওলানা দারুণ ক্ষুব্ধ হন এবং প্রবল হিম্মত নিয়ে কুরবানীর জন্য গরু খরিদ করেন। কিন্তু প্রথম গরুটি বিরোধীরা ছিনিয়ে নেয়। পুনরায় খরিদ করলে মুসলমান কসাইরা তা যবহ করতে অস্বীকার করলে তিনি নিজে যবহ করেন। পরে গরুর গাড়ীতে করে গোস্ত আনার সময় বিরোধীরা রাস্তায় গাড়ী আটকিয়ে গরু দু'টি ছেড়ে দেয় ও গাড়ীর চাকা খুলে নেয়। অবশেষে ছাত্ররা গোস্ত মাথায় করে বাড়ীতে আনে।

পরবর্তীতে সুধী ওলামায়ে কেরাম একবাক্যে স্বীকার করেন যে, যদি মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব ঐ সময় ঐ দুঃসাহসিক পদক্ষেপ না নিতেন, তাহ'লে ভারতের বুক থেকে সম্ভবতঃ গরু কুরবানীর সুন্নাত উঠে যেত। কারণ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হ'য়ে যখন

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের নেতারা গরু কুরবানী সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করার দাবী নিয়ে ইংরেজ ভাইসরয়ের নিকটে দরখাস্ত পেশ করেন, তখন ইংরেজ সরকার এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করেন যে, 'কোথাও গরু কুরবানী না হওয়ার শর্তে এই বৎসর থেকে গরু কুরবানী আইনতঃ দণ্ডণীয় ঘোষণা করার জন্য আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করেছিলাম। কিন্তু কসাইখানার রেজিষ্টারে দেখা গেল যে, মৌলবী আবদুল ওয়াহ্হাব নামক দিল্লীর জনৈক মুসলমান এবছর গরু কুরবানী করেছেন। অতএব মুসলমানদের মধ্যে ভিন্নমত থাকায় আমরা গরু কুরবানীকে আইনতঃ দণ্ডণীয় ঘোষণা করতে পারিনা।' (১০) শারঈ ইমারতের ভিত্তিতে জামা'আত গঠনের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনার চিরন্তন সুন্নাত মুসলিম সমাজ ভুলতে বসেছিল। তারা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে শেরেকী, বিদ'আতী ও অনৈসলামী সামাজিক নেতৃত্বের অধীনে তাদের ঈমান-আমল সব প্রায় খুইয়ে বসেছিল। এই অবস্থা দর্শনে মাওলানা খুবই ব্যথিত হ'লেন এবং রেওয়াজপন্থী আলিম সমাজও শরীয়ত অনভিজ্ঞ সমাজনেতাদের সকল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে প্রথমে কিঞ্চিদধিক ১২ জন ভক্ত সাথীকে নিয়ে ১৮৯৫/১৩১৩ হিজরী সনে 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' কায়েম করেন। অথচ তখনও তাঁর উস্তাদ মিয়াঁ ছাহেব (১২২০-১৩২০ হিঃ) বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। আল্লাহ পাক তাঁর কোন একজন বান্দাকে সকল প্রকারের তাওফীক প্রদান করেন না। বলা বাহুল্য এটাই ছিল আল্লামা ইসমাঈল শহীদ ও সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী প্রতিষ্ঠিত জামা'আতে মুজাহেদীনের পরে ভারতের প্রথম ইমারত ভিত্তিক ইসলামী জামা'আত। এর ফলে তাঁকে অমানুষিক নির্যাতনের সম্মুখীন হ'তে হয়। যেমন খাবার দাওয়াত দিয়ে খাদ্যে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা, দাড়ি চেঁছে দেওয়া, বিভিন্ন তোহমত ও কুৎসা রটনা করা, হত্যার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করা ও রাস্তায় ওঁৎ পেতে থাকা, সমাজনেতাদের ইংগিতে আলিমদের পক্ষ হ'তে তাকে 'কাফের' ইত্যাদি ফৎওয়া দেওয়া প্রভৃতি।

মাওলানা জীবনে সাতবার হজ্জ করেন। বিভিন্ন সময়ে ১০ জন স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করেন। ৯ জন পুত্র ও ৬ জন কন্যা রেখে ১৯৩৩ খৃঃ মোতাবেক ১৩৫১ হিজরীর ৮ই রজব সোমবার দিবাগত রাত ১১টায় ৭০ বছর বয়সে দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং স্বীয় উস্তাদ শায়খুল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কবরের পূর্বপার্শ্বে সমাহিত হন। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে ঘোর বিরোধী স্বগোত্রীয় ও হানাফী আলিমগণ ছাত্রদেরকে এই বলে পড়ানো থেকে বিরত থাকেন যে, 'আজ হিন্দুস্থান থেকে হাদীছের প্রদীপ নিভে গেল' (آج هند ميں حديث كا چراغ بجھ گيا هے) -দ্রঃ মুকাম্মাল নামায- ভূমিকা, লেখকঃ ঐ, পৃঃ ১৯-২৮, ৩১-৩৩।

৩. প্রাগুক্ত ভূমিকা, পৃঃ ২৮-৩০।

৪. ৪ঠা নভেম্বর ১৯৬৩-তে জামা'আতের ৮ম বার্ষিক সম্মেলনে গৃহীত 'দাস্তূর' (প্রকাশকঃ আবদুল গাফ্ফার সালাফী-নাযেমে আ'লা; উক্ত গঠনতন্ত্র ৫০টি শিরোনাম ও ফুলস্কেপ সাইজের হস্তলিখিত ১৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত) পৃঃ ১৩।

৫. 'মুকাম্মাল নামায' ভূমিকা, পৃঃ ২৮।

৬. ২১-১২-১৯৮৮ ইং তারিখে করাচীর 'দারুল ইমারত' থেকে স্বয়ং আমীর আব্দুর রহমান সালাফী এবং জামে'আ সাত্তারিয়ার পরিচালক (মুদীর) মাওলানা মুহাম্মাদ সালাফী প্রদত্ত লিখিত হিসাব অনুযায়ী অত্র তথ্য পরিবেশিত হ'ল।

৭. প্রাগুক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী।

৮. (ক) (الف) وعن عبد الله بن عمر قال سمعتُ رسولَ اللّه (ص) يقولُ.. و مَنْ ماتَ وليس فى عُنُقِه بَيْعَةٌ ماتَ مِيْتَةً جاهلِيَّةً رواه مسلم فى كتاب الإمارة ح١٨٥١، و فى مشكوة ، ط/ بيروت ح٣٦٧٤-

(খ) নাসাঈ শরীফে বিভিন্ন প্রকার বায়'আতের ১৭টি অধ্যায় রচনা করা হয়েছে যেমনঃ-

(ب) = ١- باب البيعة على السمع و الطاعة ٢- البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله ٣- البيعة على القول بالحق ٤- البيعة على القول بالعدل ٥- البيعة على الأثرة ٦- البيعة على النصح لكل مسلم ٧- البيعة على أن لا نفر ٨- البيعة على الموت ٩-البيعة على الجهاد ١٠- البيعة على الهجرة ١١- البيعة فيما أحب و أكره ١٢- البيعة على فراق المشرك ١٣- بيعة النساء ١٤- بيعة من به عاهة ١٥- بيعة الغلام ١٦- بيعة المماليك ١٧- البيعة فيما يستطيع الإنسان - (نسائى ج٢ كتاب البيعة) -

و كذلك روى البخارى و مسلم عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت (رض) قال بايَعْنَا رسولَ اللّه (ص) على السمعِ والطاعة فى العُسْرِ و اليُسْرِ والمَنْشَطِ و المَكْرَه و على أثَرَةٍ علينا و على أنْ لا نُنَازِعَ الأمرَ أهلَه و على أن نقولَ بالحقِّ أينما كُنَّا و لا نَخَافُ فى اللّهِ لَوْمَةَ لائمٍ ، و فى رواية و على أن لا نُنَازِعَ الأمرَ أهلَه إلا أن تَرَوا كُفْرًا بَوَاحًا عندكم من اللّه فيه بُرْهَان مشكوة ، بيروت ١٩٨٥، ح٣٦٦٦، ج٢ ص١٠٨٦) - و روى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعى قال كنا عند رسول اللّه (ص) تسعةً أو ثمانيةً أو سبعةً فقال : ألا تُبَايِعُوْنَ رسولَ اللّه (ص) و كُنَّا حَدِيثِى عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ فقلنا : قد بايَعْنَاك يا رسولَ اللّه ثم قال : ألا تُبَايِعُوْنَ رسولَ اللّه ؟ فبَسَطْنَا أيدينا و قلنا : قد بايَعْنَاكَ يا رسولَ اللّه ، فعَلامَ نُبَايِعُكَ ؟ قال : على أن تعبدوا اللّهَ و لا تُشركوا به شيئا و الصلوات الخَمْسِ و تُطيعوا ، وأسَرَّ كلمة خَفِيَّةً : و لا تسألوا الناسَ شيئًا ، فلقد رأيتُ بعضَ أولئك النَفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أحدهم فما يَسْأَلُ أحداً يُنَاوِلُه إياه - (رياض الصالحين للنووى ، بيروت ١٩٨٩، ص ٢٦٧، باب القناعة و العفاف و الإقتصاد)-

(গ) (ج) و عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه (ص) إذا خرج ثلاثةٌ فى سفرٍ فليُؤَمِّرُوا أحدَهم ، رواه أبو داؤد .. و قد أخرجه الإمام أحمد بلفظ : لا يَحِلُّ لثلاثة نَفَرٍ يَكُونونَ بأرضِ فَلاةٍ إلا

أمِّرُوا عليهم أحَدَهم) - صحيح الجا مع رقم ٥٠٠، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم ١٣٢٢ -

(د) عن أبي بكر (رض) قال .. لابد للناسِ من إمارةٍ ، رواه الطبراني في الكبير - و عن (ঘ) عمر بن الخطاب (رض) أنه قال .. لا إسلامَ إلا بجماعةٍ و لا جماعةَ إلا بأمارةٍ و لا إمارةَ إلا بطاعةٍ - رواه الدارمي ، نقله إبن عبد البر في جامع بيان العلم و فضله ج ١ ص ٦٢ - وعن علي (رض) أنه قال .. لا يَصْلَحُ للناسِ إلا أميرٌ، رواه البيهقي في شعب الإيمان) -

(ه) عن حذيفة مرفوعا قال قال رسول الله (ص) مَنِ اسْتطاعَ منكم أن لا يَنامَ نومًا و لا (ঙ) يُصْبِحَ صبحًا إلا و عليه إمامٌ فليفعَلْ ، نقله إبن عساكر- فتاوى علماء كرام در باره تقرر إمام ،كراچی ، ص٠١. ٤٣ -

৯. (ক) মাওলানা ছানাউল্লাহ (১৮৬৮-১৯৪৮ খৃঃ) সম্পাদিত ও অমৃতসর হ'তে প্রকাশিত উর্দূ সাপ্তাহিক 'আখবারে আহ্‌লেহাদীছ' ৩৪ বর্ষ ২৪, ৩৫ ও ৪১ সংখ্যা মোতাবেক ১৯৩৭ সালের ২৩শে এপ্রিল, ৯ই জুলাই ও ১৩৫৬ হিজরীর ১২ই জমাদিউছ ছানী যথাক্রমে ৩-৫, ৪-৫ ও ৬ষ্ঠ পৃঃ (খ) পাকিস্তানের সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' ১৯শ বর্ষ ৫০ সংখ্যা ও ২০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মোতাবেক ১৯৬৮ সালের ১২ই জুলাই ও ১৬ই আগষ্ট তারিখে 'ফৎওয়া' অধ্যায়ে প্রকাশিত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের আমীর হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী প্রদত্ত ফৎওয়া এবং (গ) দিল্লী হ'তে ইমামতপন্থীদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'ফাতাওয়া উলামায়ে কেরাম দর বারায়ে তাক্বার্রুরে ইমাম' মুনাযারা অধ্যায় পৃঃ ৩৮-৫৩ অবলম্বনে।

১০. নিবন্ধকারঃ আবদুর রহমান আবদুল খালেক, নিবন্ধঃ উছূলুল 'আমালিল জিমা'ঈ (জামা'আত সংগঠনের মূলনীতি সমূহ) মাসিক 'আল-ফুরক্বান' (ছাফাত-কুয়েতঃ ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যা ১৯৯০ খৃঃ) দ্রষ্টব্য।

১১. عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (ص) .. مَنْ شَرَطَ ليس في كتابِ اللّه فهو باطلٌ ، و إن كان مائةُ شرطٍ .. ، متفق عليه ، مشكوة كتاب البيوع ح٢٨٧٧ - মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত (বৈরুতঃ ১৯৮৫) 'বুয়ূ' অধ্যায়, হা-২৮৭৭ ২য় খন্ড পৃঃ ৮৭০-৭১।

১২. عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) من أطاعَني فقد أطاعَ اللّهَ و من عَصَاني فقد عَصَى اللّهَ ، و من يُطعِ الأميرَ فقد أطاعَني و من يَعْصِ الأميرَ فقد عَصَاني ، وإنَّمَا الإمامُ جُنَّةٌ يُقَاتلُ مِنْ وَرَائِه ويَتَّقي به ، فإن أمَرَ بتَقْوَى اللّه و عَدَلَ فإنَّ له بذلك أجْرًا و إن قال بغيره فإنَّ عليه منه ، متفق عليه، مشكوة ، كتاب الإمارة و القضاء ، ح٣٦٦١ - মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত (বৈরুত ছাপা ১৯৮৫) 'ইমারত' অধ্যায়, হা-৩৬৬১, ২য় খন্ড পৃঃ ১০৮৫।

১৩. মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী, 'হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক' (বেনারসঃ জামে'আ

সালাফিইয়াহ ১ম সংস্করণ ১৯৭৯) পৃঃ ২৮১; কেন্দ্রীয় 'জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ হিন্দ' কর্তৃক প্রচারিত লিফলেট, পৃঃ ১।

১৪. 'হায়াতুল মুহাদ্দিছ' পৃঃ ৩১৬।

১৫. ইবনে আহমাদ সালাফী, 'আহ্‌লেহাদীসের প্রকৃত পরিচয়' (কলিকাতাঃ সালাফী প্রকাশনী, ১নং মারকুইস লেন, ১ম সংস্করণ ১৯৮০) পৃঃ ১০৫-১০৮।

১৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৬।

১৭. কেন্দ্রীয় জমঈয়ত কর্তৃক প্রচারিত লিফলেট, পৃঃ ২।

১৮. তথ্যঃ আবদুল ওয়াহ্‌হাব খাল্‌জী, কেন্দ্রীয় নাযেমে আ'লা জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ হিন্দ, ৪১১৬ উর্দূবাজার, দিল্লী। -তাং ৫-৭-৮৯ ইং।

১৯. কে. বি. মুহাম্মাদ বিন আহমাদ, 'আল-হারাকাতুস সালাফিইয়াহ বে-কেরালা' (তিরূর-কেরালাঃ ইন্দো-আরব প্রেস, ১৯৮২) পৃঃ ১৩; ঐ, 'নাদ্‌ওয়াতুল মুজাহিদীন ওয়া আহদাফুহা' (প্রেস ও সালবিহীন) পৃঃ ৩-৪।

২০. তথ্যঃ আব্দুল হক সুল্লামী, সেক্রেটারী 'সালাফী সমাজকল্যাণ সংস্থা' (الجمعية السلفية الخيرية) কারিংগানাদ পোঃ ভিলাইয়ুর, জেলা-পালঘাট, কেরালা, ভারত। -তাং ১৪. ৫. ১৯৮৯ খৃঃ।

২১. তথ্যঃ প্রাগুক্ত।

২২. তথ্যঃ প্রাগুক্ত।

২৩. তথ্যঃ প্রাগুক্ত, তাং ২৩. ১. ১৯৮৯ খৃঃ।

২৪. তথ্যঃ প্রাগুক্ত।

২৫. তথ্যঃ সম্মেলনের প্রচারপত্র হ'তে প্রাপ্ত।

২৬. তথ্যঃ প্রাগুক্ত।

২৭. সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' (লাহোরঃ শীশমহল রোড, 'মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদ্‌ভী' স্মরণে বিশেষ সংখ্যা) ৪০ বর্ষ ৫২ সংখ্যা, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃঃ ১০১।

২৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৭।

২৯. মাসিক 'তারজুমানুল হাদীছ' ২১ বর্ষ ৩-৪র্থ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৮, পৃঃ ৩১৮।

৩০. প্রাগুক্ত পত্রিকা পৃঃ ১৬-২৪।

৩১. তথ্যঃ ইয়াহ্‌ইয়া আযীয, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, জামা'আতে মুজাহিদীন পাকিস্তান।-তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮৮।

৩২. তথ্যঃ ছাবের নিযামী, সহ-দফতর সম্পাদক, মারকাযী জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ পাকিস্তান, ১০৬ রাভী রোড, লাহোর।- তাং ৩১-১২-৮৮ ইং; মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি, সম্পাদকঃ আল-মা'আরিফ, ইদারা ছাক্বাফাতে ইসলামিয়া, ২ ক্লাব রোড, লাহোর।- তাং

২৭-১২-৮৮; প্রফেসর সাজেদ মীর, সম্পাদক, 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান' ৫০, লোয়ার মাল, লাহোর ১.১.৮৯ ইং।

৩৩. ইবনে আহমাদ সালাফী, 'আহলেহাদীসের প্রকৃত পরিচয়' পৃঃ ১০৮।

৩৪. মাসিক 'আহলেহাদিস' (কলিকাতাঃ মোহাম্মাদী প্রেস, ১নং মারকুইস লেন) ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩২২, পৃঃ ৩১৯।

৩৫. 'আহলেহাদীসের প্রকৃত পরিচয়' পৃঃ ১০৯।

৩৬ মাসিক 'আহলেহাদিস' ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৩, পৃঃ ৩৩৩-৩৩৯; ঐ ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২৩, পৃঃ ১৩২-১৩৭ ও ৪র্থ সংখ্যা পৌষ ১৩২৩, পৃঃ ১৭৩-১৭৯।

৩৭. প্রাগুক্ত ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩২৩, পৃঃ ২৭২।

৩৮. জমঈয়ত স্মরণিকা, ঢাকা ১৯৮৫, পৃঃ ২১; মাওলানা কাফী স্মরণে সাপ্তাহিক আরাফাত বিশেষ সংখ্যা (ঢাকাঃ ২রা জুলাই ১৯৬২) পৃঃ ১৭; নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছ-এর গঠনতন্ত্র (প্রকাশকালঃ পাবনা, ২৭শে জিলকদ ১৩৬৭হিঃ মোতাবেক ১লা অক্টোবর ১৯৪৮খৃঃ) অবলম্বনে এবং নিজস্ব সংগ্রহ থেকে লিখিত। উক্ত গঠনতন্ত্রের ৩নং দফায় 'আহলেহাদিছ আন্দোলনের কার্য্যক্রম' অধ্যায়ে বলা হয়েছে- '(ক) আভ্যন্তরীণ সংগঠন ও সংশোধনের সাহায্যে 'মোহাম্মদী জামাআৎ' প্রতিষ্ঠা করা।' ৫নং দফায় 'প্রতিষ্ঠান ' অধ্যায়ে বলা হয়েছে- 'আহলেহাদিছ আন্দোলনের আকিদা, লক্ষ্য ও কার্য্যক্রমকে সফল করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা ভাষাভাষী অঞ্চল সমূহ লইয়া একটি সঙ্ঘ (জম্‌ঈয়ৎ) পরিচালিত হইবে।' অতঃপর ৬নং দফায় 'সঙ্ঘের নাম' অধ্যায়ে বলা হয়েছে - 'পঞ্চম দফায় বর্ণিত সঙ্ঘটি 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদিছ' নামে পরিচিত হইবে।' -ঐ, পৃঃ ১-৪।

৩৯. 'আহলেহাদীসের প্রকৃত পরিচয়' পৃঃ ১১০-১১৪।

৪০. তথ্যঃ হাফেয মাওলানা আয়নুল বারী আলিয়াবী। সম্পাদক, পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীস। -তাং ১. ২. ১৯৮৯ খৃঃ ; মাসিক 'তবলীগ' জিলক্বাদ সংখ্যা ১৩৭২ হিজরী।

৪১. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস 'স্মরণিকা' ১৯৮৫, পৃঃ ২২-২৩।

৪২. ঢাকাঃ দৈনিক আজাদ ৮ই জানুয়ারী ১৯৫৬, ১ম পৃঃ ৩য় কলাম।

৪৩. মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, 'আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী' (ঢাকাঃ আল-হাদীছ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৩) পৃঃ ১৬-১৮।

৪৪. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস 'স্মরণিকা' ১৯৮৫, পৃঃ ২৭।

৪৫. তথ্যঃ মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী তাং ১৩ই জানুয়ারী ১৯৯১।

৪৬. তথ্য সমূহঃ (ক) মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (৬১) আগলা, পোঃ জামিরা, রাজশাহী ২৮.১১.৮৯ ইং ও ১৩.১.৯১ ইং (খ) মোযাম্মেল হোসায়েন (৬৬), মৌজা ষোলমারি পোঃ কৈমারী, জলঢাকা, নীলফামারী ৮.২.৯০ ইং (গ) আনছারুর রহমান সরকার (৮০) সাং সোন্দাবাড়ী পোঃ গাবতলী, বগুড়া ২৬.১১.৮৯ ইং; সৈয়দ আলী প্রামাণিক ওরফে দরবেশ ছাহেব (১২০) সাং কালুডাংগাপাড়া, পোঃ বাইগুনি, বগুড়া ২৬.১১.৮৯; মুন্সী মুহাম্মাদ

খলীলুর রহমান (৮২) সাং ও পোঃ বাইগুনি, উপজেলা গাবতলী, বগুড়া ২৬.১১.৮৯ ইং (ঘ) মাওলানা আবদুর রহমান (৬০) মুহতামিম, শিমুলবাড়ী ইছলাহুল মুসলেমীন মাদরাসা পোঃ বারকোনা, সাঘাটা, গাইবান্ধা; আবদুস সোবহান আখন্দ (৫৮), সেকান্দার আলী আখন্দ (৬২), রফিকুর রহমান খান (৬০), ইমদাদুল হক বি, এসসি (৫০), সর্ব সাকিন ঐ, তাং ১৩.১০.৮৯ ইং (ঙ) শেখ ঈসা হাক্কানী (৩৯) সাং খোলাহাটি পোঃ ও জেলা গাইবান্ধা, শেখ মূসা হাক্কানী (৫৬), মুহাম্মাদ আবদুন্ নূর হাক্কানী (৪০), সর্বসাকিন ঐ, ২৪.১১.৮৯ ইং (চ) ঘ-দ্রষ্টব্য (ছ) আবদুস সালাম আখন্দ (৫৫) সাং চিনিরপটল পোঃ সাঘাটা, গাইবান্ধা, কাজী আযীযার রহমান (৬০), কাজী আফসারুদ্দীন (৭৪) ও অন্যান্য। সাং ঝাড়াবর্ষা পোঃ ডাকবাংলা বাজার, সাঘাটা; আবদুল হামীদ সরকার (৮০) ও অন্যান্য সাং ধনারুহা পোঃ খামার ধনারুহা; ইমাযুদ্দীন আখন্দ ফারাযী (৮০) সাং-ভরতখালী (সগুনা) পোঃ ভরতখালী উপজেলা-সাঘাটা, গাইবান্ধা ১৩.১০.৮৯ ইং (জ) মাওলানা আবদুল মাজেদ সালাফী (৫৫), অধ্যক্ষ মহিমাগঞ্জ টাইটেল মাদরাসা, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা ১৪.১০.৮৯ ইং, আবদুল ওয়াজেদ সালাফী (৪৯) আটুয়া পশ্চিমপাড়া, পাবনা ২৭.১০.৮৮ ইং; মৌলবী ফযলুর রহমান আল-আইয়ূবী (৫৬) সাং খয়েরসূতি পোঃ দোগাছি, পাবনা ১.১২.৮৯ ইং (ঝ) প্রাগুক্ত তাং ১.১২.৮৯ ইং ও মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (রাজশাহী) ১৩.১.৯১ ইং (ঞ) মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (রাজশাহী) ১৩.১.৯১; (ট) আবদুল মান্নান আনছারী (৫৬) ইবনে মাওলানা আবদুল হাকীম আনছারী ইবনে আল্লামা মানছূরুর রহমান, ৮৯ আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা-১, ১৭.১০.৮৮ ইং (ঠ) মুহাম্মাদ দীন ইসলাম (৫৬) ও অন্যান্যরা, দোলেশ্বর পূর্বপাড়া পোঃ দোলেশ্বর, উপজেলা-কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা ১৮.১১.৮৮ ইং (ড) মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (রাজশাহী) ১৩.১১.৯১ ইং (ঢ) আবদুল লতীফ মিঞা (৬৭) পিতা হাজী ইউসুফ আলী, সপুরা মিয়াঁপাড়া, রাজশাহী ৬.৩.৮৯ ইং; আহমাদ আলী খান (৯৪) দুয়ারীর পীর ছাহেব, পিতা মাওলানা আকরাম আলী খান সাং-দুয়ারী, পোঃ ললিতগঞ্জ, উপজেলা-পবা, রাজশাহী ১১.১২.৮৭ ইং; মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া (৫৮) জামিরার পীর ছাহেব, পিতা মৌঃ যাকারিয়া বিন মুহাম্মাদ বিন কারামাতুল্লাহ, সাং ও পোঃ জামিরা, উপজেলা-পুঠিয়া, রাজশাহী ১৪.১২.৮৭ ইং, মাওঃ আবদুল মতীন কাসেমী, আগলা, জামিরা, রাজশাহী ১৩.১.৯১ ইং (ণ) মাসিক আহলেহাদিস ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩২৩ সাল পৃঃ ৩৩৩-৩৯; আবদুল কাইয়ূম খান (৭৬), সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীস। মূল নিবাস-হাকিমপুর, বর্তমান ঠিকানাঃ ৫২, নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলিকাতা-১১, ৩১.১.৮৯ ইং।

৪৭. তাবলীগী ও তানযীমী রিপোর্ট, প্রকাশকঃ মারকাযী দারুল ইমারত, করাচী-বান্‌স রোড ১৩৮৮/১৯৬৮ খৃঃ)।

৪৮. জাতীয় সম্মেলন স্মরণিকা' ৯১ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পৃঃ ১।

৪৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ১২।

৫০. তথ্যঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, গঠনতন্ত্র ১৯৯৫ ; 'দারুল ইমারত আহলেহাদীছ' নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

অধ্যায়-১০

الفصل العاشر

বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন

حركة أهل الحديث فى بنغلاديش

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ইসলাম এসেছিল আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে।[১] বাংলাদেশের 'রাহ্মী' (رهمى) বংশীয় রাজা ইসলামের নবী (ছাঃ)-কে এক কলস আদা (زنجبيل) উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন বলে একটি হাদীছ থেকে জানা যায়।[২] চট্টগ্রাম বন্দরের সাথেই তাদের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাদের প্রচারের ফলে স্থানীয় বহুলোক ইসলাম গ্রহণ করেন। আধুনিক গবেষণা মতে অনুমান করা হয় যে, এইসব আরব ও স্থানীয় মুসলিমরা খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দী হ'তে চট্টগ্রাম উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে নির্বাচিত আমীরের অধীনে শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত হ'তেন এবং এদেশীয়দের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতেন।[৩]

৬০১/১২০৪ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলার অংশবিশেষ লাখ্নৌতি রাজ্য জয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ইসলামের ব্যাপক প্রচার না থাকলেও বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রগুলিতে ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল বলে অনুমান করা চলে। জয়পুরহাটের পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে খলীফা হারূনুর রশীদের আমলের (১৭০-১৯৩ হিঃ/ ৭৮৬-৮০৯ খৃঃ) ১৭২ হিজরীতে মুদ্রিত প্রাচীন আরবী মুদ্রার প্রাপ্তি এ মতকে সমর্থন করে। রাজা পরশুরামের সময়ে সৈয়দ সুলতান মাহমূদ মাহীসওয়ার বল্খী ৪৩৯/১০৪৭ খৃষ্টাব্দে বগুড়ার মহাস্থানে আগমন করেন। তবে এই তারিখ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পরে হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কোচ রাজার আমলে ৪৪৫/১০৫৩ খৃষ্টাব্দে শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রূমী ময়মনসিংহ নেত্রকোণা জেলার মদনপুরে আগমন করেন ও রাজাসহ স্থানীয় সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। ১১১৯ খৃষ্টাব্দের দিকে রাজা বল্লাল সেনের আমলে ঢাকার বিক্রমপুর এলাকায় 'বাবা

আদম' নামে একজন ধর্মপ্রচারক আসেন এবং অনুচরবৃন্দসহ বল্লাল সেনের হাতে নিহত হন। মূর্তিনাশক শাহ নেয়ামাতুল্লাহ 'বুত্‌শিকন' এই সময়ে ঢাকার দিলকুশাকে কেন্দ্র করে ইসলাম প্রচার করেন। লক্ষণ সেনের রাজত্বের (১১৮০-১২০৫ খৃঃ) শেষদিকে তুর্কী বিজয়ের প্রাক্কালে জালালুদ্দীন তাবরেযী বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন।[৪] খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাকীউদ্দীন আল-আরাবীর নেতৃত্বে রাজশাহীর Mahisun বা সম্ভবতঃ মাহিসন্তোষে (ধামুইরহাট, নওগাঁ) ইসলামী শিক্ষার যে কেন্দ্র গড়ে ওঠে, তার খ্যাতি এতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, বিহারের খ্যাতনামা ছূফী মুহাদ্দিছ মাখদূম আহমাদ বিন ইয়াহ্‌ইয়া মুনীরীর পিতা ইয়াহ্‌ইয়া মুনীরী (মৃঃ ১২৯১ খৃঃ) এখানে এসে ইল্‌ম হাছিল করেন।[৪] এঁদের মাধ্যমে বাংলার অভ্যন্তরে ইসলাম প্রচারিত হলেও তাঁদেরকে ইল্‌মে হাদীছের শিক্ষাদাতা হিসাবে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা চলে না।

তুর্কী বিজয়ের ফলে মধ্য এশিয়া থেকে ভাগ্যান্বেষী বহু মুসলমান ও মরমী সাধকের এদেশে আগমন ঘটে। এই সব সাধকগণ সকলেই যে কুরআন-হাদীছে পারদর্শী ছিলেন, একথা বলার উপায় নেই। বরং এটাই ঠিক যে, রাজানুকূল্য লাভের জন্য কিংবা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার হতে বাঁচার জন্য ও সাথে সাথে এইসব দরবেশদের কেরামত ও উন্নত চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে এদেশীয় বৌদ্ধ ও হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলামের এই ব্যাপক বিস্তৃতির সাথে মিশ্রিত হয় তুর্কী, আফগান, পাঠান, মোঙ্গল ও স্থানীয় বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতি, যা মুসলিম সমাজকে কুরআন-হাদীছের মূল শাস্ত্রীয় ইসলাম থেকে লৌকিক (Popular) ইসলামে অভ্যস্ত করে তোলে। তাই বলা চলে যে, মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর ভারত হয়ে তুর্কী-ঈরানী সাধক-দরবেশদের মাধ্যমে ও রাজশক্তির ছত্রছায়ায় পরবর্তীতে বাংলাদেশে যে ইসলাম প্রচারিত হয়, তা মূল আরবীয় ইসলাম হ'তে বহুলাংশে পৃথক ছিল।[৫] প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, সরাসরি আরব বণিক ও মুহাদ্দিছগণের প্রচারিত ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত দক্ষিণ ভারত ও ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান পরবর্তীতে 'শাফেঈ' বা আহলেহাদীছ হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। পক্ষান্তরে তুর্কী বিজেতা হানাফী শাসক সম্প্রদায় ও ছূফী দরবেশদের প্রভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী ও পীরপন্থী

হয়ে যায়।[৬] এই সময় শিরক ও বিদ'আতের আধিক্য দেখা দেয়। ইসলামের নামে অসংখ্য বিজাতীয় বিশ্বাস ও প্রথায় মুসলমান অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘোড়াপীর, তেনাপীর, মানিকপীর, সত্যপীর, ঢেলাপীর, পাঁচপীর প্রভৃতি অসংখ্য অনৈতিহাসিক পীর বাংলার মুসলমানের পূজা পায়। ফলে বাংলাদেশে শরীয়তী ইসলাম ধীরে ধীরে শিরক-বিদ'আতে ভরা 'লৌকিক' ইসলামের দ্বারা অপসারিত হয়। ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত এখানে লৌকিক ইসলামেরই প্রাধান্য দেখা যায়। তবে তারা যে এক সময় বিশ্বের অন্যান্য নব বিজিত ইসলামী এলাকার ন্যায় আরব প্রভাবে সরাসরি কুরআন-হাদীছের অনুসারী ছিল একথা অনুমান করা চলে। কারণ বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকাসমূহ শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীর (১১১৪-৭৬/১৭০৩-৬২) সাক্ষ্যমতে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তীকালে স্থিতি লাভ করে, যা ৬৫৬ হিজরী মোতাবেক ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে আরব খেলাফত শেষ হওয়ার পরে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অতএব ইসলামের প্রথম যুগে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলে আরবদের মাধ্যমে যে ইসলাম এসেছিল, তা ছহীহ ও নির্ভেজল ইসলাম ছিল, একথা অনুমান করা যায়। এঁদের মাধ্যমে এদেশীয় যারা ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিলেন তারা যে বাংলার অভ্যন্তর ভাগে তাঁদের নতুন ধর্মবিশ্বাস মোটেই প্রচার করেননি, একথা জোর করে বলা যায় না। জনৈক গবেষকের মতে- "বাংলায় চলতি কথায় কোন কিছুর তত্ত্ব বা সন্ধান না পাওয়া গেলে বলা হয়-'বিষয়টার হদিস মিলছে না।' এ থেকে সম্ভবতঃ অনুমান করা চলে, এদেশের সমাজ জীবনে এক সময় ছিল হাদীসের প্রভাব।"[৭]

ত্রয়োদশ শতক হতে ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ অবক্ষয়যুগে বাংলাদেশে কুরআন-হাদীছের প্রচার ও প্রসার একেবারে থেমে থাকেনি। যে সকল মুহাদ্দিছ ও নরপতি এইযুগে ইল্মে হাদীছের প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখেন, তাঁদের মধ্যে সোনারগাঁও হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারীর (মৃঃ ৭০০/১৩০০ খৃঃ) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবী রাখে। ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম শরীফ তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর (৬৬৭-৭০০/১২৬৮-১৩০০) যাবত ছহীহায়েনের দরস

দানের ফলে এদেশের ও বিদেশের অগণিত জ্ঞানপিপাসু ছাত্র হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ায় উদ্বুদ্ধ হন।[৮] এদিক দিয়ে বিচার করলে বর্তমান বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সর্বাধিক ভাগ্যবান দেশ বলা চলে।

দিল্লীর স্বনামখ্যাত ছূফী মুহাদ্দিছ শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (৬৩৪-৭২৫/১২৩৬-১৩২৫ খৃঃ) নির্দেশক্রমে তাঁর শিষ্য শায়খ সিরাজুদ্দীন ওরফে 'আঁখি সিরাজ' গৌড়ে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। তাঁর যোগ্য শিষ্য আলাউদ্দীন আলাউল হক (মৃঃ ১৩৯৮ খৃঃ) গৌড়, পাণ্ডুয়া ও সোনারগাঁয়ে ইসলাম প্রচার করেন। অতঃপর তাঁর স্বনামধন্য পুত্র নূর কুৎবে আলম (মৃঃ ১৪১৬ খৃঃ) মুসলিমবিদ্বেষী রাজা গণেশের (১৪১৪-১৮ খৃঃ) বিরুদ্ধে জৌনপুরের ইবরাহীম শারকী (১৪০২-৩৬ খৃঃ)- কে আমন্ত্রণ জানিয়ে মুসলমানদের জানমাল রক্ষায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, তা সত্যিই প্রশংসার্হ। তিনি এই সময় মুসলিম বঙ্গের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন।[৯] শারকী আমলে জৌনপুরে ইল্‌মে হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতা করা হ'ত।[১০]

শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া যে আহলেহাদীছ ছিলেন, তা আমরা অবক্ষয় যুগে দিল্লী কেন্দ্রের আলোচনায় দেখে এসেছি। তাঁর প্রেরিত শিষ্য ও তস্য শিষ্যগণ যে একই আদর্শের অনুসারী হবেন, তা ধারণা করা চলে। অতঃপর ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে শাহ্ মু'আয্যম দানিশমন্দ বাগদাদী ওরফে শাহ্দৌলা রাজশাহীর 'বাঘা' নামক স্থানে আগমন করেন।[১১] তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের সময়ে বাঘা ইসলামী শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঢাকার ছূফী মুহাম্মাদ দায়েম (মৃঃ ১৭৯৯ খৃঃ) আযীমপুর মহল্লায় খান্‌ক্বাহ কায়েম করেন। তিনি শরীয়তের কঠোর পাবন্দ ছিলেন। ক্বালাল্লাহ ও ক্বালার রসূল-এর গুঞ্জনে খান্‌ক্বাহ সর্বদা গুলযার থাক্‌ত।[১২]

বাংলার সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ (৯০০-৯২৪/১৪৯৪-১৫১৯ খৃঃ) ইল্‌মে হাদীছের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মুহাদ্দিছ বাংলাদেশে আগমন করেন। ৯০৭/১৫০২ খৃষ্টাব্দে মালদহের গৌড়ে এবং নূর কুৎবে আলমের স্মৃতিতে পাণ্ডুয়াতে বিরাট মাদরাসা কায়েম করেন। যেখানে প্রচলিত রেওয়াজের বাইরে তিনি ইল্‌মে হাদীছ ও তাফসীরকে অবশ্যপাঠ্য করে দেন। রাজধানী একডালাতে হাদীছ লিখনের ব্যবস্থা করেন ও ছহীহ বুখারীর লিপিকরণ সমাপ্ত করেন। এই সব কারণে তাঁকে সমসাময়িক

গুজরাটের মুযাফ্ফরশাহী সুলতানদের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে।[১৩] একইভাবে বারভূঁইয়াদের সময়ে (৯০০-৯৪৫/১৪৯৪-১৫৩৮) ঢাকার সোনারগাঁ কেবল পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল না বরং এতদঞ্চলের ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবেও প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে ইল্‌মে হাদীছ ও মুহাদ্দিছগণের কদর ছিল।[১৪]

মুহাদ্দিছ আল্লামা শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃঃ ৭০০/১৩০০ খৃঃ), নূর কুৎবে আলম (মৃঃ ১৪১৬ খৃঃ), আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ (৯০০-৯২৪/১৪৯৪-১৫১৮) ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আগত মুহাদ্দিছগণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইল্‌মে হাদীছের চর্চা ও সাথে সাথে হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার প্রবাহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তা পুনরায় স্তিমিত হয়ে যায়। নানাবিধ শিরক ও বিদ'আতে মুসলিম সমাজ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে শহীদায়েনের নেতৃত্বে ব্যাপক সংস্কারের তূর্যধ্বনি বেজে ওঠে। আমীর সৈয়দ আহমাদ শহীদ (১২০১-৪৬/১৭৮৬-১৮৩১) ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদের (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) নেতৃত্বে সূচিত জিহাদ আন্দোলনের সাথে সাথে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনেও প্রাণ সঞ্চার হয়। আল্লামা ইসমাঈল ও তাঁর অধিকাংশ অনুসারী এবং পরবর্তীতে পাটনার ছাদিকপুরী আহ্‌লেহাদীছ পরিবারের নেতৃত্বে পরিচালিত শতবর্ষব্যাপী জিহাদ আন্দোলনের সাথীগণ কেবলমাত্র শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধেই লড়াই করেননি বরং প্রচলিত লৌকিক (Popular) ইসলামকে পরিশুদ্ধ করে কুরআন ও হাদীছের মূল ইসলামের প্রচলন ঘটানোর জন্য আপোষহীন জিহাদ করেছিলেন, যা তাঁদেরকে বিরোধীদের কাছে ওয়াহ্হাবী, লা-মাযহাবী, গায়ের মুকাল্লিদ, রাফাদানী ইত্যাদি লকবে চিহ্নিত করে। এই আন্দোলন থেকেই প্রেরণা নিয়ে পশ্চিম বঙ্গের নারিকেলবাড়িয়ার মাওলানা সৈয়দ নিছার আলী ওরফে তীতুমীরের (১১৯৭-১২৪৬/১৭৮২-১৮৩১) মুহাম্মাদী আন্দোলন, বাংলাদেশের ফরিদপুরের হাজী শরীয়াতুল্লাহ্‌র (১১৯৬-১২৫৬হিঃ/১৭৮১-১৮৪০খৃঃ) ফারায়েযী আন্দোলনসহ পরবর্তীতে অন্যান্য সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। প্রথমোক্তজন সাইয়িদ আহমাদ শহীদের মুরীদ ও খলীফা ছিলেন।[১৫]

জিহাদ আন্দোলনের জোয়ারের সাথে সাথে দিল্লীর অলিউল্লাহ পরিবারের রেখে যাওয়া ইল্‌মী মসনদে আসীন শায়খুল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন বিহারী দেহলভী

(১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২) -এর দীর্ঘ প্রায় পৌনে এক শতাব্দীকাল ব্যাপী ইল্‌মে কুরআন ও ইল্‌মে হাদীছের নিরপেক্ষ দারস ও তাদরীসের প্রভাবে বিশ্বের অন্যান্য এলাকার ন্যায় বাংলাদেশী বহু ছাত্রের মধ্যে প্রচলিত মাযহাবী তাকলীদের মোহ দ্রবীভূত হয় এবং তাঁরা নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও হাদীছের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হন। বরং বলা চলে মিয়াঁ ছাহেবের এক একজন বাংগালী ছাত্র ঐ সময় এক একজন বিজ্ঞ মুবাল্লিগ হিসাবে স্বদেশে আগমন করেন। ফলে সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি হয়।

এ যুগে বাংলাদেশে যে আহলেহাদীছ আন্দোলন চলছে, তা মূলতঃ জিহাদ আন্দোলন ও মিয়াঁ ছাহেবের ছাত্রদের আন্দোলনের ফসল। বর্তমান সাংগঠনিক যুগে সেই ফসলগুলির সমন্বিত প্রয়াস ও ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে মাত্র। তবে দেশের বিভিন্ন এলাকার বয়স্ক লোকদের সঙ্গে আলাপ করে দেখা গেছে যে, তাঁদের অনেকেই মূলতঃ বাঙ্গালী নন। বরং তাদের পূর্ব পুরুষদের কোন একজন আরবদেশ থেকে আহলেহাদীছ হিসাবেই এদেশে আগমন করেন এবং সেই থেকে তাঁরা পুরুষানুক্রমে আহলেহাদীছ হিসাবেই এদেশে বসবাস করছেন।[১৬] প্রাচীন বাংলার পূর্ব অংশ তথা বর্তমান বাংলাদেশে আনুমানিক দেড় কোটি আহলেহাদীছ বসবাস করছেন। অমনিভাবে ভারতের পশ্চিম বঙ্গে বর্তমানে আহলেহাদীছ জনসংখ্যা প্রায় অর্ধকোটি। যদিও আহলেহাদীছের প্রকৃত আকীদা ও আমল অধিকাংশের মধ্যেই নেই। তবে সংশোধনের প্রয়াস অব্যাহত আছে।

আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

ছফর ১২৩৭ মোতাবেক নভেম্বর ১৮২১ সালে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (১২০১-১২৪৬/১৭৮৬-১৮৩১) ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) হজ্জের সফরে কলিকাতা আসেন ও এখানে তিন মাস অবস্থান করেন।[১৭] এই সময় বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে এমনকি সুদূর নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও সিলেট হ'তেও বহু লোক এসে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।[১৮] আল্লামা ইসমাঈলের ওয়ায এসময় তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে।[১৯] এরপর সমগ্র বাংলাদেশে জিহাদ আন্দোলন ও আহলেহাদীছের প্রচার নিয়মিতভাবে শুরু হয় বালাকোট যুদ্ধের পর বেলায়েত আলী (১২০৫-১২৬৯/১৭৯০-১৮৫২) কর্তৃক স্বীয় মেজভাই এনায়েত আলী (১২০৭-১২৭৪/১৭৯৩-১৮৫৮)-কে

১২৪৮ হিঃ মোতাবেক ১৮৩৩ সালের দিকে[২০] বাংলাদেশ অঞ্চলের খলীফা হিসাবে প্রেরণের পর হ'তে। বেলায়েত আলীর ভাতিজা মাওলানা আবদুর রহীম বিন ফারহাত হুসাইন (১২৫২-১৩৪১/১৮৩৬-১৯২৩)-এর বর্ণনানুযায়ী তিনি প্রথমবারে বাংলাদেশে এসে সাত বৎসর অবস্থান করেন।[২১] কিন্তু এই সময়কাল সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ ১৮৩৩-এর দিকে তাঁকে বাংলাদেশে পাঠানোর পর হ'তে ১৮৪৩ সালে সীমান্তে রওয়ানা[২২] হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কাল তিনি সম্ভবতঃ বাংলাদেশেই অবস্থান করেন। এরপর ১৮৪৭ সালে নযরবন্দী হিসাবে দু'ভাই পাটনা ফিরে এলে[২৩] কয়েক মাসের মধ্যে তিনি গোপনে পুনরায় বাংলাদেশে চলে যান।[২৪] দু'বছর মুচলেকার মেয়াদ শেষে ১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে মাওলানা বেলায়েত আলী স্থায়ীভাবে সীমান্তে হিজরত করার সময় বাংলায় অবস্থানরত মাওলানা এনায়েত আলীকেও সীমান্তে চলে আসার নির্দেশ পাঠান।[২৫] অতঃপর ১৮৫০ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় দু'ভাইয়ের মুলাকাত হয় ও ১৮৫১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী দু'ভাই একত্রে সিত্তানা মুজাহিদ ঘাঁটিতে পৌঁছে যান।[২৬] ১৮৫০-এর গোড়ার দিকে রাজশাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট যখন মাওলানা এনায়েত আলীকে জেলা হ'তে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন,[২৭] তখন তিনি পাটনা চলে যান। এরপরে ১৮৫৮ সালে সীমান্তে যুদ্ধরত অবস্থায় চিনাই পাহাড়ের চড়াইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত এনায়েত আলী আর বাংলাদেশে ফেরেননি।[২৮] এ হিসাবে দেখা যায় ১৮৩৩-১৮৪৩ এবং ১৮৪৭-১৮৪৯ দু'বারে মোট বারো বছরের মত সময় তিনি বাংলাদেশ অঞ্চলে অতিবাহিত করেন। অবশ্য হজ্জে যাওয়া (সম্ভবতঃ ১৮৩৬ সালের দিকে) ও আসার পথে (কয়েক বৎসর পর) মাওলানা বেলায়েত আলী বাংলাদেশে কিছুদিন অবস্থান করে যান।[২৯] হান্টারের বর্ণনামতে তার রিপোর্ট তৈরীকাল হ'তে ত্রিশ বছর পূর্বে বেলায়েত আলীর প্রতিনিধি আবদুর রহমান লাক্ষ্ণৌবী মালদহ এলাকায় আসেন ও সেখানে বিয়েশাদী করে স্কুল শিক্ষক হিসাবে গোপনে জিহাদ প্রচার শুরু করেন। রফিক মণ্ডলকে তিনিই খেলাফত দিয়ে যান।[৩০] হান্টারের রিপোর্ট ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়েছে। সে হিসাবে রফী মন্ডলের খেলাফত প্রদানের ঘটনা ১৮৪২ -এর কিছু আগেপিছে হ'তে পারে। বেলায়েত আলীর প্রতিনিধি হিসাবে হান্টার যার নাম করেছেন, তা ঠিক নয়। তায্কেরায়ে ছাদেকাহ্-এর

বর্ণনায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে কেবল এনায়েত আলীর নামই পাওয়া যায়।[৩১] তিনি মালদহে এসে বিয়েশাদী বা স্কুল শিক্ষকের চাকুরী কোনটাই করেননি।

রফী মন্ডলের একমাত্র জীবিত পৌত্র মাওলানা আহমাদ হোসায়েন শ্রীমন্তপুরী (৭৯) বলেন যে, হজ্জের সফরে কলিকাতা অবস্থানের পর যাত্রাপথে মুর্শিদাবাদ জেলাধীন লালগোলার অদূরে নদীতীরবর্তী নূরপুর গ্রামে সাইয়িদ আহমদ ব্রেলভী জাহায রেখে ডেরা ফেলেন ও পার্শ্ববর্তী লোকদের হেদায়াত করেন। এই সময় তিনি নদীর অপর পারে নারায়ণপুরের রফী মন্ডলকে ১৮২২ সালের প্রথমদিকে খিলাফত দিয়ে যান।[৩২] নারায়ণপুর বর্তমান বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা চাপাই নবাবগঞ্জ-এর অন্তর্ভুক্ত। পিতার মুখে শোনা মাওলানা শ্রীমন্তপুরীর এই বর্ণনা কতদূর বাস্তব নির্ভর তা জানিনা, তবে মাওলানা এনায়েত আলীর আগমনের পূর্বে এদেশে নিয়মিতভাবে জিহাদ প্রচার শুরু হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর সেটা ১৮৩৩-এর পরে বলে এক প্রকার নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, তার পূর্বে এদেশে আহলেহাদীছ ছিল না। মাওলানা এনায়েত আলী যখন রাজশাহী এলাকায় তাবলীগে আসেন, তখন তিনি অথবা মাওলানা বেলায়েত আলী সম্ভবতঃ রফী মন্ডলকে খেলাফত দিয়ে থাকবেন- সাইয়িদ আহমাদ নন। কারণ সাইয়িদ আহমদের কলিকাতা অবস্থানের সময় রফী মন্ডলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটেছে বলে জানা যায় না। তেমনি যাত্রাপথে কোন গ্রামে ডেরা ফেলেছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে রফী মন্ডল যে রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ এলাকায় জিহাদ প্রচারে ও সাথে সাথে সমাজ সংস্কারে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এতে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়।

সে সময় এইসব অঞ্চলের মুসলমানেরা চরম কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। তারা হিন্দুদের মত মাথায় টিকি রাখত। মেয়েরা নদীর তীরে কাপড় খুলে রেখে গোসল করতে নামত। দরগাহ ও পীরপূজায় সকলে অভ্যস্ত ছিল। রফী মণ্ডল দা'ওয়াতী কাজ শুরু করলেন। হুক্কা বন্ধ করলেন, দরগাহ ও পীরপূজার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুললেন। মাথার টিকি কাটা আরম্ভ করলেন। নদীর কিনারা থেকে নগ্ন মেয়েদের কাপড় বাড়ী এনে পরে তাদের স্বামীদের ডাকিয়ে নছীহত করে কাপড়

ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এইভাবে সর্বত্র আলোড়ন শুরু হ'ল। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী মহল এতে ক্ষেপে গেল। বিদ'আতপন্থী আলেমরা ওয়ায-মাহফিলের নামে নারায়ণপুরীয়াদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করল। বিভিন্ন উস্কানীমূলক কবিতা রচিত হল।[৩৩] শাসন কর্তৃপক্ষকে প্ররোচিত করল। ফলে রফী মন্ডল গ্রেফতার হয়ে জংগীপুর জেলে নিক্ষিপ্ত হলেন।[৩৪] অতঃপর তাঁর পাঁচজন খলীফা উভয় বাংলার বিভিন্ন এলাকায় জিহাদ প্রচার করেন। ১. পুত্র মৌলবী আমীরুদ্দীন, মালদহ জেলা ২. মৌলবী আমীরুদ্দীন, নারায়ণপুর কেন্দ্রের মাদরাসা ও মসজিদ পরিচালনাসহ তৎসন্নিহিত এলাকা ৩. মৌলবী আবদুল করীম বাসুদেবপুরী, রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ জেলা ৪. মৌলবী আবদুল কুদ্দূস মোল্লাটুলী, দিনাজপুরের ছালেককুড় এলাকা ৫. মৌলবী ইবরাহীম মন্ডলজী, দিলালপুর (বিহার) ও তৎসন্নিহিত এলাকা।[৩৫] তবে মূল নেতৃত্বে ছিলেন মৌলবী আমীরুদ্দীন। ১৮৬৮ সালে তাঁর কার্যসীমা মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলার কিছু অংশ বলে হান্টার তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন।[৩৬] শুধু তাই নয় গঙ্গা নদী দিয়ে নৌকাপথে পার্শ্ববর্তী যতগুলো গ্রাম ও দ্বীপ অতিক্রম করতে হয় সবগুলোতে বসবাসকারী মুসলমান কৃষকরা তাঁর নিয়ন্ত্রণে এসে যায় এবং এসব এলাকা থেকে তাঁর রিক্রুট করা মুজাহিদ সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৩৭] তিনি এসব এলাকা থেকে যাকাত, ফিৎরা, মুষ্টিচাউল ও স্বেচ্ছাধীন নিয়মিত চাঁদা আদায়ের সুষ্ঠু অর্থসংগ্রহ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। হান্টার বলেন, সারা বাংলা জুড়ে এইভাবে কর আদায় ও লোক সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত বহু নিবেদিতপ্রাণ লোক ছিলেন।[৩৮] তখন এইসব চাঁদা ও লোকজন বিভিন্ন জেলাকেন্দ্র এমনকি পাটনাকেন্দ্র হতে আগত নেতৃবৃন্দ নারায়ণপুর কেন্দ্রে অবস্থান করতেন বলেও হান্টার তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। পরে কেন্দ্রটি নদী-ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে পার্শ্ববর্তী ওয়াহ্‌হাবী গ্রামগুলোর লোকেরা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে নতুন বসতি গড়ে তোলেন যা নতুন নতুন ওয়াহ্‌হাবী কেন্দ্রে পরিণত হয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।[৩৯] হান্টারের এই রিপোর্টের সাথে মাওলানা শ্রীমন্তপুরীর বক্তব্যের মিল আছে।

আমীর আবদুল্লাহ বিন বেলায়েত আলীর সময়ে (১৮৬০-১৯০২ খৃঃ) ১৮৬৩ সালে আম্বেলা যুদ্ধের পরিণামে ১৮৬৪ সালে ঐতিহাসিক 'আম্বেলা ষড়যন্ত্র'

মামলার বিচার আরম্ভ হয় এবং সারা দেশব্যাপী ওয়াহ্‌হাবী ধরপাকড় ও কালাপানিতে নির্বাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৮৬৫ সালে পাটনার ষড়যন্ত্র মামলায় মুজাহিদ নেতা মাওলানা আহমাদুল্লাহ্‌র প্রাণদন্ড ও পরে দ্বীপান্তর হয়। তিনিই প্রথম মুজাহিদ কয়েদী হিসাবে ১৮৬৫ সালের জুন মাসে আন্দামানে নীত হন।[৪০] উক্ত মামলায় এ তথ্য প্রকাশিত হয় যে, ইংরেজবিরোধী ষড়যন্ত্রের সাথে মালদহ জেলা কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল।[৪১] ১৮৬৮ সালে জনসাধারণের মধ্যে নিরুৎসাহের ভাব দেখতে পেয়ে আমীরুদ্দীন পাটনা কেন্দ্র থেকে নেতাদের কাউকে এনেছিলেন- সেটাও হান্টার উল্লেখ করেছেন।[৪২] অতএব ইংরেজ সরকারের রোষানলে পড়াই স্বাভাবিক। এব্যাপারে আমীরুদ্দীনের ভাতিজা মাওলানা আহমাদ হোসায়েন (৭৯) বলেন- "পার্শ্ববর্তী তেররশিয়া-দূর্লভপুর গ্রামে তিনি তাবলীগী সফরে গিয়েছিলেন। মেযবান বাড়ীওয়ালা প্রথানুযায়ী প্রথম সন্তানসম্ভবা পুত্রবধুর জন্য তার বাপের পক্ষ হ'তে প্রেরিত বিশেষভাবে তৈরী বিরাট আকারের বাতাসা ওনাকে খেতে দেন। তিনি এটাকে কুসংস্কার বলে ফিরিয়ে দেন ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এতে বাড়ীওয়ালা ক্ষুব্ধ হন ও পরে গ্রামের দুই মুসলিম ফকীর ও স্থানীয় জনৈক মুসলিম দারোগার ষড়যন্ত্রে তিনি গ্রেফতার হন ও কোর্টে নীত হ'লে সত্য কথা বলেন। বিচারে ফাঁসি হলে তিনি 'আল-হাম্‌দুলিল্লাহ' বলেন। ফলে ফাঁসির আদেশ পরিবর্তন করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও কালাপানিতে নির্বাসন দন্ড প্রদান করা হয়। সেখানে গিয়েও তিনি গোপনে নিয়মিত তাবলীগ করতেন। তিনি সেখানে স্কুল শিক্ষকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। একদিন তিনি ইংরেজ কর্মকর্তার ছেলেকে বললেন, তোমার আব্বা যে উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে আটকে রেখেছেন, সে কাজ এখনও চলছে না বন্ধ হয়েছে? ছেলের মুখে একথা শুনে উক্ত অফিসারের সুফারিশক্রমে ১১ বছর পরে তিনি মুক্তি পান। তাঁর আনীত ঝিনুক, শামুক, কড়ি ও বাক্‌স এখনও মওজুদ আছে।[৪৩] তবে হান্টার বলেন, মুজাহিদগণকে শাহাদাতের অমৃতসুধা হতে বঞ্চিত করার জন্য কারাদণ্ড ও দ্বীপান্তর ছিল ইংরেজ বিচারকদের একটি সূক্ষ্ম পলিসি। যাতে তারা জিহাদে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। -(ঐ, অনুবাদ পৃঃ ৮৩)। জাফর থানেশ্বরীর মতে লর্ড রিপনের সুফারিশক্রমে ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী হ'তে সাধারণ ক্ষমতার আওতায় মৌলবী আমীরুদ্দীনসহ অবশিষ্ট ছয়জন কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হয় (তাওয়ারীখ পৃঃ ৮২)।

উপরের ঘটনায় দু'টি বিষয় প্রতিভাত হয়। ১-বিদ'আতী মুসলমানেরাই আহলেহাদীছ ওয়াহ্হাবীদের গৃহশত্রু ছিল ২-জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাঁরা কুসংস্কার ও বিদ'আতের প্রতিবাদ করতে পিছপা হতেন না। অন্যায়ের সাথে আপোষহীনতা এবং সত্যপ্রিয়তার কারণে তাঁরা লোকদের ঘৃণা ও ভালোবাসা উভয়ই কুড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৪৪] এমনকি হান্টার পর্যন্ত তাঁর রিপোর্টে বহুস্থানে ওয়াহ্হাবীদের উন্নত চরিত্রের প্রশংসা করেছেন।[৪৫]

মাওলানা এনায়েত আলী ও পরবর্তীতে রফী মন্ডল ও তার খলীফাদের প্রধান কর্মস্থল হিসাবে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ হ'তে অধিকহারে লোক জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। হান্টার তার রিপোর্টে বলেন, ১৮৫৮ সালের সীমান্ত সংঘর্ষে নিহতদের অনেকের চেহারায় দক্ষিণবঙ্গের জলাভূমি অধ্যুষিত এলাকার কাল বা শ্যামল বর্ণের সৌসাদৃশ্য রয়েছে।[৪৬] দিনাজপুর হ'তে রাজশাহী, মুর্শিবাবাদ, নদীয়া, মালদহসহ বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গ এলাকা এবং বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনাসহ দক্ষিণবঙ্গ এলাকায় আজও অন্যান্য এলাকার তুলনায় আহলেহাদীছ জনসংখ্যা সর্বাধিক। ১৮৪৩ সালের দিকে বাংলায় জিহাদীদের সংখ্যা কেমন হারে বেড়েছিল হান্টারের প্রদত্ত রিপোর্ট এব্যাপারে খুবই চমকপ্রদ। ১৮৪৩ সালের ১৩ই মে তারিখে বাংলার পুলিশ কমিশনারের রিপোর্টে বলা হয় যে, 'মাত্র একজন প্রচারক প্রায় আশি হাজার অনুগামীর এক বিরাট দল গড়ে তুলেছে এবং তারা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থকে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলে বিবেচনা করে।[৪৭] এসময় ফারায়েযীরাও জিহাদীদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে হান্টার বলেন- পরবর্তী খলীফারা বিশেষতঃ ইয়াহ্ইয়া আলী পূর্ববঙ্গে ফারায়েযীদের উত্তর ভারতীয় ওয়াহ্হাবীদের সাথে একীভূত করেন। গত তের বছর ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ও বন্দীদের মধ্যে উভয় সংস্থার লোকদেরকে পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা গেছে।[৪৮] ওয়াহ্হাবী কর্মীদের সম্পর্কে হান্টার বলেন- 'এর কর্মীরা তাদের নেতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার চাইতে মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় মনে করে।'[৪৯]

১৮৪৩ সালের প্রতিভাসম্পন্ন বাংগালী প্রচারক ব্যক্তিটি কে হতে পারেন, হান্টারের বক্তব্যে তার উল্লেখ না থাক্লেও ইনি যে রফী মন্ডল হবেন হান্টারের পূর্বাপর বক্তব্যে তাই-ই মনে হয়। রফী মন্ডল গ্রেফতার হয়ে অল্প কয়দিন

কারাবাসের পর ফিরে এসে চাঁদা সংগ্রহের দায়িত্ব তার ছেলে আমীরুদ্দীনকে অর্পণ করেন।[৫০] কিন্তু এই ধরনের হাল্‌কা শাস্তিতে হান্টার মোটেও খুশী না হয়ে ইংরেজ সরকারের দুর্বল শাসন-নীতির ক্ষুব্ধ সমালোচনা করেছেন রিপোর্টের প্রায় সর্বত্র। ওয়াহ্‌হাবীদের বিরাট সংখ্যা দেখে আমরা আশান্বিত হ'লেও সেখানে হতাশারও বেশ কিছু দিক আছে। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এই প্রথম জিহাদের বিরোধী হিসাবে হান্টার হিন্দুদেরকে এবং বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে সুন্নী ও শী'আদেরকে চিহ্নিত করেছেন।[৫১]

মাওলানা এনায়েত আলীর কর্মপদ্ধতিঃ

জিহাদ আন্দোলনের আমীর মাওলানা এনায়েত আলী তৎকালীন যশোর জেলার হাকিমপুরকে কেন্দ্র[৫২] করে বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা, সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, বগুড়া অঞ্চলে ব্যাপক তাবলীগী তৎপরতা চালাতে থাকেন। তিনি কোন এলাকায় গেলে প্রথমে নছীহতের মাধ্যমে তাদেরকে শিরক ও বিদআতমুক্ত হবার আহবান জানাতেন। অতঃপর মসজিদ না থাক্‌লে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতেন ও ইমাম নিয়োগ করতেন। ইমাম নিয়োগের পর তাঁর নেতৃত্বে জামা'আত কায়েম করতেন ও স্থানীয় যাবতীয় বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব উক্ত ইমামের উপরে ন্যস্ত করতেন। তিনি বলতেন কোন মুসলমানের জন্য কুরআন-হাদীছ বাদ দিয়ে অন্যের কাছে ফায়ছালা নিয়ে যাওয়া ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। এর দ্বারা তিনি ইংরেজদের কোর্টে মুসলমানদের কোন বিচার নিয়ে যেতে নিষেধ করতেন।[৫৩] এইভাবে বিশেষ করে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে এই জামা'আত অধিকহারে কায়েম হয়। সীমান্তের জিহাদ আন্দোলনেও এসব অঞ্চল থেকে বেশী সংখ্যায় লোক ও রসদ প্রেরিত হয়।

আমীর মাওলানা এনায়েত আলী ও তাঁর শিষ্যদের দা'ওয়াত ও জিহাদ প্রচারের সাথে যুক্ত হয় মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২) বিপুলসংখ্যক ছাত্রের ব্যাপক তাবলীগ ও সংস্কার আন্দোলন। এইসব ছাত্রগণ কেউ শিক্ষক হিসাবে, কেউ বক্তা হিসাবে, কেউ মুফতী ও মুনাযির হিসাবে নিজ নিজ এলাকায় শিরক ও বিদ'আত দূরীকরণে সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন। রেওয়াজপন্থী আলিম ও তাদের অনুসারীদের পক্ষ হ'তে তাঁরা সর্বদা বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু পথের সন্ধানী বহু মুমিনের হৃদয়ে তাঁরা আলো জ্বালাতে

সক্ষম হন। ফলে জিহাদ আন্দোলনের বাইরে থেকেও বহু লোক আহ্‌লেহাদীছ হন। অবশ্য আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা বেলায়েত আলীর ভাষায় এঁরা তখন 'মুহাম্মাদী' নামেই কথিত হ'তেন। এই সময় মাযহাবপন্থী আলিমদের সঙ্গে আহ্‌লেহাদীছ আলিমদের বাহাছ ও মুনাযারার মাধ্যমে অধিকহারে লোক আহ্‌লেহাদীছ হ'ত। মুর্শিদাবাদের মাড়ডার বাহাছ,[৫৪] হুগলীর বাক্যেশ্বর বাহাছ, ২৪পরগনার মাজমপুর বাহাছ, দিনাজপুরের শারামপুর বাহাছ, সাতক্ষীরার কালিগঞ্জের বাহাছ, পাবনা টাউন হলের বাহাছ [৫৫] এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সাংগঠনিক যুগে সংগঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে। যদিও আজও পূর্বের ন্যায় ব্যক্তি উদ্যোগই অধিক ফলপ্রসূ দেখা যাচ্ছে।

এক্ষণে জিহাদ আন্দোলনে বাংলাদেশ হ'তে বিভিন্ন সময়ে যারা শরীক হয়েছিলেন, সেইসব গাযী ও শহীদদের মধ্যে এযাবত যাদের নাম আমরা পেয়েছি, তাঁদের সংক্ষিপ্ত একটা তালিকা দিতে চেষ্টা পাব। প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইসমাঈল শহীদের সঙ্গে সীমান্তে শিখদের সাথে ১৮২৬ সালে অনুষ্ঠিত ২য় (বাযার) যুদ্ধে মুজাহিদপক্ষে প্রথম যিনি শহীদ হন তিনি ছিলেন বরকতুল্লাহ বাংগালী।[৫৬] অমনিভাবে ১৮৪৩ সালে মাওলানা এনায়েত আলী বড়ভাই আমীর মাওলানা বেলায়েত আলীর হুকুমে সীমান্তে যাত্রার উদ্দেশ্যে বাংলা অঞ্চল থেকে ২০০০ হাযার মুজাহিদ নিয়ে পাটনা উপস্থিত হন ও পরে সীমান্তের উদ্দেশ্যে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যাত্রা করেন।[৫৭] ১৮৬৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর সংঘটিত ঐতিহাসিক 'আম্বেলা' যুদ্ধে প্রায় ৭৫,০০০ হাযার শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে[৫৮] মাত্র বারো/চৌদ্দশো মুজাহিদ বাহিনীর ১০টি প্লাটুনের মধ্যে ৯টি প্লাটুনই ছিল হিন্দুস্থানী- যার অধিকাংশ ছিল বাংগালী। স্বয়ং আমীর আবদুল্লাহ (ইমারতঃ ১৮৬০-১৯০২ খৃঃ) বাংগালী প্লাটুন 'জমঈয়তে আবদুল গফুর'-এর সাথে ছিলেন।[৫৯] আমীর আবদুল করীমের সময়ও (১৯০২-১৯১৫) বাংগালী ও বিহারী মুজাহিদের সংখ্যা বেশী ছিল।[৬০] বগুড়ার কাটাবাড়িয়ার বেলাল গাযী আমীর নেয়ামাতুল্লাহ্‌র (১৯১৫-১৯২১) দেহরক্ষী ছিলেন।[৬১] রাজশাহীর বাঘমারার গাযী তাহেরুদ্দীন শাহযাদা বরকতুল্লাহ বিন আমীর নেয়ামতুল্লাহ-কে শৈশবে দেখাশুনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।[৬২] তাই সম্ভবতঃ বলা চলে যে, জিহাদ

আন্দোলনে বাংগালী মুসলমানের কুরবানী ও অবদান ছিল অন্য সকলের চেয়ে বেশী।

উপরোক্ত মুজাহিদ বৃন্দ ছাড়াও মিয়াঁ ছাহেবের অগণিত ছাত্র বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিলেন, যাদের মধ্যে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের (৩২+১৬) মোট ৪৮ জন ছাত্রের নাম মিয়াঁ ছাহেবের জীবনীকার ছাত্র মাওলানা ফযল হুসাইন বিহারী তাঁর প্রদত্ত ছাত্র তালিকায় উল্লেখ করেছেন।[৬৩] কিছু নাম মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (১৯০০-১৯৬০) তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন।[৬৪] তথ্যসূত্র বা ঠিকানা না থাকায় যা যাচাই করা মুশকিল। দীর্ঘদিন পরে এই তালিকা নির্ণয় করা বর্তমানে একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার বৈ কি? তবুও একথা বলা যায় যে, জিহাদ আন্দোলনে যেমন বাংলা ও বিহার হ'তে অধিকসংখ্যক লোক যোগদান করেছিলেন, মিয়াঁ ছাহেবের দারসেও তেমনি তাদের অংশগ্রহণ দক্ষিণ এশিয়ার অন্য কোন এলাকার চাইতে যে কম ছিল না, ফযল হুসাইন বিহারীর দেওয়া ৫০০ ছাত্রের তালিকার গড় অনুপাত হ'তে তা অনুমান করা চলে। যাঁরা তাদের শিক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। শিক্ষকতার মাধ্যমে, নিরলস দা'ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে, লেখনী ও মুনাযারার মাধ্যমে যাঁরা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এদেশে স্থিতিলাভে অধিকতর অবদান রেখেছেন।

জিহাদ আন্দোলনে বাংগালী কয়েদী, শহীদ ও গাযীদের কয়েকজন

প্রকাশ থাকে যে জিহাদ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সীমান্তে শিখ, ইংরেজ ও বিশ্বাসঘাতক স্থানীয় মুসলিম সর্দারদের বিরুদ্ধে ছোটবড় কিঞ্চিদধিক যে ১৩টি যুদ্ধ সংঘটিত হয় (তালিকা দ্র. পৃঃ ২৭৯ টীকা-১৭) তার মেয়াদকাল ছিল ২১শে জুমাদাল উলা ১২৪২ হিঃ হ'তে ২৪শে যুলকা'দা ১২৪৬ হিঃ মোতাবেক ২১.১২.১৮২৬ খৃঃ হ'তে ৬.৫.১৮৩১ খৃঃ পর্যন্ত সর্বমোট ৪ বছর ৪ মাস ১৫ দিন। শহীদায়েনের পরে আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও ছাদিকপুরী আহলেহাদীছ পরিবারের নেতৃত্বে জিহাদ জারি থাকে। সংঘটিত হয় ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বরে আম্বেলার স্মরণীয় অসম যুদ্ধ। শুরু হয় দেশব্যাপী ওয়াহ্হাবী ধরপাকড়। একে একে দায়ের করা হয় 'আম্বালা ষড়যন্ত্র মামলা' ১২৮০/১৮৬৪খৃঃ, 'পাটনা ষড়যন্ত্র মামলা' ১২৮১/১৮৬৫, 'মালদহ ষড়যন্ত্র মামলা' ১২৮৫/১৮৭০খৃঃ, 'রাজমহল ষড়যন্ত্র

মামলা' ১২৮৬/১৮৭০খৃঃ), 'পাটনা ষড়যন্ত্র মামলা' ১২৮৭/১৮৭১ প্রভৃতি। বাংলা ও বিহারের আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরাম ছিলেন ইংরেজ সন্ত্রাসের প্রধান শিকার। এই সময় 'ওয়াহ্‌হাবী' ও 'আহলেহাদীছ'-কে এক গণ্য করা হ'ত। (মেহের, সারগুযাস্ত পৃঃ ৩৮২) ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত এই গণ নির্যাতন অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন বই ও পত্রিকা থেকে এবং গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বিশ্বস্ত ও বয়স্ক ব্যক্তিদের সাক্ষ্য মতে আমরা বাংলার কিছু বীর সন্তানের নাম সংগ্রহ করেছি। যারা জিহাদে শাহাদাত বরণ করেছেন, গাযী হয়ে ফিরে এসেছেন, কয়েদী হয়েছেন বা কয়েদখানায় জীবন দিয়েছেন, সম্পত্তি বাযেয়াফ্‌ত বা সর্বস্ব হারিয়েছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হ'ল। প্রকৃত সংখ্যা ও তথ্য আল্লাহ অবগত আছেন।

১-বরকতুল্লাহ বাংগালী (১৮২৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর শাহ ইসমাঈলের সাথে সীমান্তের 'বাযার' যুদ্ধের প্রথম শহীদ) ২- যহুরুল্লাহ ৩- তালেবুল্লাহ ৪- কাযী মাদানী ৫- মৌলবী মুহাম্মদী আনছারী বর্ধমানী (সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর মীর মুনশী বা একান্ত সচিব। ১৮২৮ সালে 'সীদো' যুদ্ধের গাযী)। - মেহের, 'সাইয়িদ আহমাদ শহীদ' পৃঃ ৩৮৮, ৫৪৪। ৬- মৌলবী ইমামুদ্দীন বাংগালী ৭- ছূফী নূর মুহাম্মাদ বাংগালী ৮- মৌলবী ওয়ারেছ আলী বাংগালী (১৮২৯ সালে 'আম্ব' যুদ্ধের গাযী। - মেহের, ঐ, পৃঃ ৫৪৩, ৫৫০) ৯- ফয়যুদ্দীন বাংগালী (১৮৩০ সালে 'ফুলেড়া' যুদ্ধে শহীদ। -মেহের, পৃঃ ৫৭০) ১০- মৌলবী ফয়যুদ্দীন বাংগালী ১১-আলীমুদ্দীন বাংগালী ১২- লুৎফুল্লাহ বাংগালী ১৩-শারফুদ্দীন বাংগালী ১৪- সাইয়িদ মোযাফফর হুসাইন বাংগালী (সকলেই ১৮৩১ সালের ৬ই মে শুক্রবার পূর্বাহ্নে বালাকোটের শহীদ) ১৫- মাওলানা সৈয়দ নিছার আলী ওরফে তীতুমীর। জমিদার কৃষ্ণ রায়ের চক্রান্তে জেল খাটার পরে হজ্জ করতে মক্কায় যান। সেখানে সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। ১৮২৭ সালে দেশে ফিরে কবরপূজা, পীরপূজা ও নযর-নেয়ায, হিন্দুয়ানী পোষাক পরিধান, দাড়ি মুন্ডন ও অন্যান্য অনৈসলামী রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করেন, যা 'মুহাম্মাদী আন্দোলন' নামে খ্যাত। তিনি গ্রামে জুম'আ চালু করেন, যা ইতিপূর্বে ছিলনা। এতে তিনি জমিদারের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। জমিদারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে জমিদার ও ইংরেজ বাহিনীর মুকাবিলায় ৬০০ সাথী নিয়ে

নারিকেলবাড়িয়ার ঐতিহাসিক 'বাঁশের কেল্লা'-র যুদ্ধে ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে সঙ্গীসাথীসহ ছালাতরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন। সেনাপতি গোলাম মা'ছূমসহ বাকী সাড়ে তিনশত সাথী গ্রেফতার বরণ করেন। -মেহের, 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ২০৪-৮। ১৬- আবদুল হালীম বর্ধমানী। বালাকোট বিপর্যয়ের পরে ১ম 'আমীর' শায়খ অলি মুহাম্মাদ ফলতীর বিশ্বস্ত সাথীদের অন্যতম ছিলেন। -ঐ, পৃঃ ৩০। ১৭- সৈয়দ আবদুর রহীম বাংগালী ১৮- শায়খ আমজাদ আলী বাংগালী ১৯- মুহাম্মাদ বাংগালী। এঁরা সিত্তানা কেন্দ্রের পরবর্তী 'আমীর' সৈয়দ নাছীরুদ্দীন দেহলভীর (মৃঃ ১৮৪০ খৃঃ, সিত্তানা ঘাঁটি) সাথী ছিলেন। -ঐ, পৃঃ ১৩৪-৩৫, ১৯৪-৯৬। তাঁর অধিকাংশ সাথী বাংলাদেশ, বিহার ও ইউ,পি থেকে ছিলেন -ঐ, পৃঃ ১৬৩। ২০- মৌলবী মুহাম্মাদ আলী ২১- মৌলবী মুরাদ ২২- কাযী আবদুল বারী ২৩- মুনশী গোলাম রহমান ২৪- মৌলবী হেরাসাতুল্লাহ ২৫- মৌলবী আবদুল্লাহ ২৬- মিস্ত্রী রজব আলী ও অন্যান্য। মুজাহিদ নেতা সৈয়দ নাছীরুদ্দীন দেহলভী জিহাদে সহযোগিতার জন্য সিন্ধু থেকে ভারতবর্ষের যে ১০৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকটে চিঠি প্রেরণ করেন, তাঁদের মধ্যে এঁরা ছিলেন কলিকাতা ও তার আশপাশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। -ঐ, পৃঃ ১৬৬; ২৭- হাজী শমশের খান ছাহেবগঞ্জী ২৮- বাহাদুর খান ছাহেবগঞ্জী ২৯- ছূফী মুইয্‌যুদ্দীন ফরিদপুরী ৩০- নাযেম ফরিদপুরী। ২৭-৩০ পর্যন্ত ৪ জন ১৮৪৬ সালের মার্চে বালাকোট এলাকায় ফতহগড় (ইসলামগড়)-কে রাজধানী করে মাওলানা এনায়েত আলী প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমতে যথাক্রমে 'বিশেষ বাহিনী'-র জমাদার, রাজস্ব কর্মকর্তা, ভান্ডার ও মুদিখানা কর্মকর্তা ছিলেন। -ঐ, পৃঃ ২৩৫-৩৬। ৩১- মুয়ায্‌যম সরদার বাংগালী (১৮৬৪ সালে আম্বেলা ষড়যন্ত্র মামলার কয়েদী) ৩২- মাসঊদ খান বাংগালী (বগুড়া)। ১৮৬০ সালে গ্রেফতার হয়ে ১৮৮৩ সালের জানুয়ারীতে সাধারন ক্ষমার আওতায় মৌলবী আমীরুদ্দীন সহ মুক্তিপ্রাপ্ত সর্বশেষ ছয়জন আন্দামানের কয়েদীর অন্যতম।[৬৫] ৩৩-রফী মন্ডল বিন বরকতুল্লাহ (সম্ভবতঃ মাওলানা এনায়েত আলী (১২০৭-৭৪/১৭৯২-১৮৫৮) তাঁকে ১৮৪৩ সালের কিছু পূর্বে খলীফা নিয়োগ করেন। ১৮৫৩ সালে গ্রেফতার হয়ে মুর্শিদাবাদের জংগীপুর জেলে বন্দী থাকেন। কিছু দিন পরে মুক্তি পান ও জন্মস্থান বর্তমান বাংলাদেশের

চাপাই নবাবগঞ্জ জেলাধীন নারায়ণপুরে ইন্তেকাল করেন। ৩৪-মৌলবী আমীরুদ্দীন (-ঐ পুত্র ও খলীফা। ফাঁসির আদেশ পেয়ে খুশী হ'লে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাযেয়াফ্‌ত করা হয় ও ১৮৭২ সালের মার্চে আন্দামানে নির্বাসন দেওয়া হয়। ১১ বৎসর পরে ১৮৮৩ সালের জানুয়ারীতে মুক্তি পেয়ে দেশে ফেরেন। তাঁর স্মৃতিবাহী আন্দামানের ঝিনুক, শামুক, কড়ি ও কাঠের বাক্‌স এখনও মওজুদ আছে) বিহারের ছাহেবগঞ্জের আগলই নারায়ণপুরে মৃত্যুবরণ করেন। ৩৫-শুকরুদ্দীন গাযী বিন রফী মন্ডল (-ঐ পুত্র। বাংলাদেশের নারায়ণপুরে ইন্তেকাল করেন।[৬৬] ৩৬- গাযী গওহর আলী খাঁ (হাকিমপুর কেন্দ্র, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত) ৩৭-আঃ করীম খাঁ (ঐ) ৩৮-আহমাদ খাঁ (ঐ)[৬৭] ৩৯- ইবরাহীম মন্ডলজী (সরদার দিলালপুর কেন্দ্র, বিহার, জন্মস্থানঃ ঝাউডাঙ্গা, থানা-লালগোলা, যেলা-মুর্শিদাবাদ, পঃ বঙ্গ। ১৮৭২ সালে কালাপানিতে দ্বীপান্তর হয়। ১৮৭৬ সালে ফিরে এসে পুনরায় 'মন্ডল' হন)[৬৮] ৪০- আমীর খান (কলিকাতার বিখ্যাত চামড়া ব্যবসায়ী)। ১৮৭২-এর মার্চে কালাপানিতে পৌঁছানো হয় এবং চার বছর পরে কয়েক কোটি টাকার সম্পদের বিনিময়ে তাঁকে ও ইবরাহীম মন্ডলজীকে একত্রে মুক্তি দেয়া হয়। ১৩ই যুলকা'দা ১২৯৫ মোতাবেক ১৯৭৮ সালে ৮ই নভেম্বর শনিবার ৮৫ বছর বয়সে কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।- 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ৪০৪; থানেশ্বরী, 'তাওয়ারীখে আজীব' পৃঃ ৭৭ ।
৪১- ১৮৬৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক আম্বেলা যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীর যে ১০টি প্লাটুন ছিল, তন্মধ্যে 'জমঈয়তে আবদুল গফুর'-এর ১৩০ জন মুজাহিদের সকলেই বাংগালী ছিলেন। এই প্লাটুনকে 'সরকারী প্লাটুন' বলা হ'ত। কেননা খোদ আমীর আব্দুল্লাহ এই প্লাটুনে থাকতেন। এছাড়া 'জমঈয়তে নাজাফ খান' প্লাটুনের ১৩০ জনের অর্ধেক হিন্দুস্থানী ও অর্ধেক বাংগালী এবং 'জমঈয়তে নাঈমুদ্দীন যশোরী' প্লাটুনের ১২৫ জন মুজাহিদের অধিকাংশ বাংগালী ছিলেন। -ঐ, পৃঃ ৩১৫। এতদ্ব্যতীত 'জমঈয়তে মিয়াঁ উছমান' প্লাটুনের জমাদার (কমান্ডার) স্বয়ং বাংগালী ছিলেন। -ঐ, পৃঃ ৩১৬। ৪২- মুন্সী রায়হানুদ্দীন (যশোর) ৪৩- মৌলবী মীযানুর রহমান (ঢাকা) ৪৪- মুন্‌শী সৈয়দ আবদুল গণী ৪৫- সৈয়দ আবদুল হক ৪৬- মৌলবী ইবরাহীম বিন হাজী নাছীরুদ্দীন (পলাশপুর, চাঁদপুর থেকে ৪ ক্রোশ দুরে) ৪৭- মুঈনুদ্দীন ৪৮- কাযী গিয়াছুদ্দীন ৪৯- কাদের বখ্‌শ ৫০- উযীর মুহাম্মাদ ৫১- তোফায়েল আলী ৫২- খোদা বখ্‌শ ৫৩- নাজীবুল্লাহ

(ঢাকা) ৫৪- বাছীরুদ্দীন ৫৫- হাজী মুহাম্মাদ ৫৬- আব্দুল আলী দর্জি (মালদহ)। -ঐ, পৃঃ ৩৭১-৭২। ৫৭-হায়দার আলী (ইটাহার, পশ্চিম দিনাজপুর), খোরাসানে গিয়ে আর ফেরেননি। ৫৮-উযীর মোহাম্মদ (কান্টারাম, শামসী, মালদহ) খোরাসানে গিয়ে আর ফেরেননি।[৬৯] ৫৯- গাযী আবদুর রঊফ (ধনিকুি -মালদহ)।[৭০] ৬০-সোমরুদ্দীন (কারবোনা, মালদহ)। ৬১-বেলায়েত আলী (ঐ) ৬২-আইয়ূব আলী[৭১] (ঐ-নায়েবে আমীর, চামারকান্দ মুজাহিদ কেন্দ্র)[৭২] ৬৩-গাযী মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব সালাফী ওরফে 'মূসা কমান্ডার' (কুরআনের উপরে পা রেখে বক্তৃতাকারী পাঞ্জাবের অমৃতসর মন্দিরের পুরোহিত ঈশ্বর সিংয়ের মাথা কেটে আনেন বলে শ্রুতি আছে। মালদহের কারবোনার এই 'গাযী' বাংলাদেশের বর্তমান ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল থানাধীন দিহোট গ্রামে (ভরনিয়া মৌজা) ১৯৮৯ সালে ইন্তেকাল করেন।[৭৩] ৬৪-তফীরুল্লাহ গাযী (বাট্না, মালদহ)[৭৪] ৬৫-গাযী ওছমান (শিমুলতলা, মালদহ)[৭৫] ৬৬-ফরযন্দ আলী (ঐ)[৭৬] ৬৭-দাঊদ গাযী (বিষণপুর, মালদহ) ৬৮-সিরাজুদ্দীন গাযী (ঐ)[৭৭] ৬৯- গাযী আকরাম আলী খান (দুয়ারী কেন্দ্র, রাজশাহী, জন্মস্থানঃ পারুয়ারা, কুমিল্লা)[৭৮] ৭০- গাযী মাওলানা নাযীরুদ্দীন (কুলসোনা-বর্ধমান, জন্মস্থানঃ চাপড়া, বাঘমারা, রাজশাহী)।[৭৯] ৭১-কারামাতুল্লাহ (সম্ভবতঃ মালদহ) ৭২-তাহেরুদ্দীন (সেনুপাড়া, বাঘমারা, রাজশাহী) ইনি শাহযাদা বরকতুল্লাহকে বাল্যকালে দেখাশুনা করতেন)[৮০] ৭৩-মতীউল্লাহ (ময়মনসিংহ) ৭৪-আবুল কাসেম (সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদ, আসমাস্ত কেন্দ্রে মৃত) ৭৫-দ্বীন মুহাম্মাদ (ঢাকা, আসমাস্ত কেন্দ্রে মৃত) ৭৬-মেহের আলী (ঢাকা) ৭৭-জসীমুদ্দীন (রাজশাহী, আসমাস্ত হ'তে ফেরেননি) ৭৮-আবদুর রশীদ (দারোসা, রাজশাহী, আসমাস্ত হ'তে ফেরেননি) ৭৯-ফয়েযুদ্দীন (রাজশাহী, আসমাস্তে মৃত) ৮০-আইয়ূব আলী 'ছগীর' আদমদীঘি, বগুড়া; আসমাস্তে মৃত) ৮১- হাফেয আবদুর রহীম (ময়মনসিংহ, চামারকান্দ হ'তে ফেরেননি) ৮২-সিরাজুদ্দীন (ঢাকা, চামারকান্দ হ'তে ফেরেননি) ৮৩-গাযী আনোয়ারুদ্দীন ওরফে মাওলানা আবদুল হাই আনোয়ারী (শেরকোল, বাঘমারা, রাজশাহী। মৃঃ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৯০) ৮৪-আলীমুদ্দীন (বাঘমারা, রাজশাহী) ৮৫-ছিদ্দীক হাসান (বাঘমারা, রাজশাহী) ৮৬-মেহের আলী (ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহী) ৮৭-আসীরুদ্দীন (আরোইল, দুর্গাপুর, রাজশাহী) ৮৮-অলি মুহাম্মাদ (সম্ভবতঃ বগুড়া) ৮৯-সলীমুদ্দীন (রাজশাহী)

৯০-সলীমুদ্দীন (ঢাকা) ৯১-গাযী ইসহাক (সোন্দাবাড়ী, বগুড়া; অমৃতসরে মারা যান)[৮১] ৯২- গাযী ইসহাক (সপুরা কেন্দ্র, রাজশাহী) ৯৩-মুফীযুদ্দীন (ঐ) ৯৪-গাযী মুণীরুদ্দীন (ঐ)[৮২] ৯৫-মৌলবী আবদুল করীম দুমকাবী ছাহেবগঞ্জী (সোন্দাবাড়ী কেন্দ্র, বগুড়া) ৯৬-গাযী ওবায়দুল্লাহ (মোস্তাইল, বগুড়া) ৯৭-শরীয়াতুল্লাহ (মুরিয়া, গাবতলী, বগুড়া) ৯৮-শামসুর রহমান সরকার (সোন্দাবাড়ী) ৯৯-এনায়াতুল্লাহ (ঐ) ১০০-হাজী ইসমাঈল হোসাইন (ঐ) ১০১-আযীযুর রহমান (ঐ) ১০২-আলে মামূদ (ঐ) ১০৩-সিরাজ সরকার (ঐ)। ৯৫ হ'তে ১০৩ পর্যন্ত সকলে সোন্দাবাড়ী 'মুজাহিদ কবরস্থানে' সমাহিত আছেন। ১০৪-ফকীর মামূদ-শহীদ (সোন্দাবাড়ী) ১০৫-বেলাল গাযী (কাটাবাড়িয়া)। ইনি আমীর নেয়ামাতুল্লাহ্ (১৯১৫-১৯২১) শহীদ-এর দেহরক্ষী ছিলেন।[৮৩]

১০৬-আইয়ূব গাযী (পাল্লার পাড়, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া) ১০৭-কসীমুদ্দীন (দুর্গাহাটা, গাবতলী, বগুড়া)[৮৪] ১০৮-মরহুম ইবরাহীম আখুন্দের পিতা (কুপতলা, বর্তমানে ঘাঘোয়া মন্ডলপাড়া, গাইবান্ধা। ইনি তীতুমীরের বাঁশের কেল্লার লড়াইয়ে (১৯শে নভেম্বর ১৮৩১) যোগদান করেন। যুদ্ধে পরিহিত জুতা তথ্যদাতা দেখেছেন।[৮৫] ১০৯-গাযী মাওলানা মানছূরুর রহমান ঢাকাভী (বংশাল, ঢাকা)[৮৬] ১১০-আবদুল হামীদ (দোলেশ্বর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা) ১১১-আবদুল লতীফ (ঐ) ১১২-ছাদেক গাযী (ঐ)[৮৭] ১১৩-গাযী মাখদূম হোসায়েন ওরফে 'মার্জ্জুম হোসেন' (ভালুকা চাঁদপুর পোঃ ঐ, সাতক্ষীরা। তিনবার ফাঁসির দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে শিয়ালকোট জেল থেকে মুক্তি দেন। শেষ সম্বল বড় তামার বদনাটি নিয়ে দিশাহীন যাত্রাপথে একসময় তিনি সাতক্ষীরায় এসে উপনীত হন (বদনাটি লেখকের তত্ত্বাবধানে 'জিহাদ গ্যালারী'তে মওজুদ আছে)। তাঁর তাবলীগ ও কেরামতে মুগ্ধ হ'য়ে গুনাকরকাটি ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বহু লোক আহলেহাদীছ হয়ে যায়) ১১৪-ইদু সরদার (শ্রীউলা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা)[৮৮] ১১৫-নামদার বিশ্বাস (বাট্‌রা, সাতক্ষীরা)[৮৯] ১১৬-গাযী মাওলানা আশেকুল্লাহ (ধানীখোলা কেন্দ্র, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। বালাকোট যুদ্ধে (৬ই মে ১৮৩১) যোগদান করেন ও যখমী হন। প্রায় ত্রিশ বছর পরে বাড়ী ফিরলেও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নযরবন্দী থাকতে হয়েছে ও সপ্তাহে একদিন থানায় হাযিরা দিতে হয়েছে। ইনি খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদের

আপন পিতামহের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন)[৯০] ১১৭-তুফানু আখন্দ (ছাবিলাপুর, মেলান্দহ, জামালপুর) ১১৮- আলহাজ্জ গাযী আবদুল খালেক (ইকবালপুর, জামালপুর)[৯১] ১১৯-মোজাহেদ মৌলবী (কচুয়া, জলঢাকা, নীলফামারী) ১২০-নূর মৌলবী (ঐ পুত্র, মামুদখালী, নওহাটা, রাজশাহী) ১২১-সুলায়মান গাযী (মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী)[৯২] ১২২-আইয়ূব গাযী (ঐ) ১২৩-তাহেরুদ্দীন (কৈমারী, জলঢাকা, নীলফামারী)[৯৩] ১২৪-মঈনুদ্দীন (পচাপুকুর ঐ) ১২৫-কেরামত আলী (ঐ) ১২৬-মাওলানা হাসান আলী (ঐ) ১২৭-শুকরুল্লাহ গাযী (সোনাতলা, বগুড়া) ১২৮-আব্দুল হালীম (বাগদাফরম, গাইবান্ধা) ১২৯-যহীরুদ্দীন (বোনারপাড়া, গাইবান্ধা)[৯৪]

১৩০- মিয়াঁজান কাযী (কুমারখালী, কুষ্টিয়া। ব্যাপক ওয়াহ্হাবী ধরপাকড়ের সময় যে পাঁচজন সেরা মুজাহিদ আমৃত্যু সকল নির্যাতনের মুখে কঠোর হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল ছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন কাযী মিয়াঁজান। তৎকালীন পাবনা ও বর্তমান কুষ্টিয়া যেলাধীন কুমারখালী শহরের দুর্গাপুর কাযীপাড়ার বীর সন্তান কাযী মিয়াঁজান, যিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন, নিজ ভাই মুরাদ আলী কাযীর সাক্ষ্য অনুযায়ী ধৃত হন। তাঁর সকল সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করা হয়। ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের বক্তব্য অনুযায়ী বৃটিশ বিরোধী অধিকাংশ কাগজপত্র ও চিঠিপত্রাদি এই বিখ্যাত ওয়াহ্হাবী বন্দীর গৃহ তল্লাশী থেকে উদ্ধার করা হয়। একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে, তাঁর পূর্বপুরুষ নাকি ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় (১৭৭২-৮৫) সরকারী সেনানিবাসে ঠিকাদারী ব্যবসা করতেন। ১২৮১হিঃ মোতাবেক ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে পাঞ্জাবের আম্বেলা জেলখানায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উক্ত পাঁচজন মুজাহিদ নেতা হলেন ১. মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ছাদেকপুরী (১২৩৭-৮৪/১৮২২-৬৮) ২. মাওলানা আবদুর রহীম ছাদেকপুরী (১২৫২-১৩৪১/১৮৩৬-১৯২৩) ৩. জাফর থানেশ্বরী (মৃঃ ১৯০৫ খৃঃ) ৪. মিয়াঁ আবদুল গাফ্ফার ছাদেকপুরী (মৃঃ ১৩৩৩/১৯১৫) ৫. ক্বাযী মিয়াঁজান (কুমারখালী, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ)[৯৫] ১৩১-মাওলানা আবদুল আলী (বোয়ালকান্দি চর, পাবনা) ১৩২-মাওলানা আবদুল কাদের (স্থলচর, পাবনা)[৯৬] ১৩৩-মাওলানা আবদুস সাত্তার (হালুয়াকান্দি, সিরাজগঞ্জ) ১৩৪-গাযী আবদুল লতীফ (গোলপুকুর পাড়, ময়মনসিংহ) ১৩৫-গাযী নূর মুহাম্মাদ (দক্ষিণ

পলাশবাড়ী, দিনাজপুর, আসমাস্তে মৃত) ১৩৬-গাযী আবদুল হাকীম (ঐ)[৯৭] ১৩৭-গাযী আবদুল জাব্বার (পাঁচগাছিয়া, কাকনহাট, রাজশাহী। ইনি ৬০,০০০ হাযার টাকা নিয়ে আসমাস্তে যান। যার বেশীর ভাগই ছিল নিজের টাকা। আসমাস্তেই মারা যান। তথ্যদাতা আসমাস্ত কেন্দ্রে তাঁর কবর যেযারত করে এসেছেন। ১৩৮-কারামাতুল্লাহ (পচাপুকুর,জলঢাকা, নীলফামারী) ১৩৯-গাযী মাওলানা হাসান আলী (শাহজাহানপুর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। জাফর থানেশ্বরী রচিত 'তাওয়ারীখে আজীব'-এর বঙ্গানুবাদ 'কালাপানি বন্দীদের ইতিহাস' লেখক (১৯৭৯ সালে মারা যান)। কামারখন্দ এলাকার চরদশশিকা, চর বর্ধুল ও হালুয়াকান্দিকে কেন্দ্র করে এখানে ১৯ (ঊনিশ) জন গাযী বাস করতেন। হালুয়াকান্দির শাহবাজপুর পাড়ার ঝাবু গাযী তাদের নেতা ছিলেন (এই খবর গাযী মাওলানা হাসান আলী অত্র তথ্যদাতাকে দিয়েছিলেন) ১৪০-গাযী আবদুস সুবহান (খাজিরাগাতি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী) ১৪১-আবদুর রশীদ-শহীদ (যশোর)। ইনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিদ্রুপকারী হিন্দুনেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে (১৮৫৫-১৯২৬) দিল্লীতে হত্যা করেন ও পরে অকপটে সত্য বলায় ফাঁসিতে শাহাদত বরণ করেন বলে শ্রুতি আছে।)[৯৮] ১৪২-আলীমুদ্দীন-শহীদ (ঢাকা)। ইনি 'রংগীলা রসূল' (লেখকের নামবিহীন) ব্যঙ্গ পুস্তকের প্রকাশক ও কোর্টে খালাসপ্রাপ্ত জনৈক রাজপালকে হত্যা করেন বলে শ্রুতি আছে।।[৯৯] পরে কলিকাতায় ফাঁসিতে শাহাদাত বরণ করেন।[১০০]

১৪৩-গাযী মাওলানা আশেকুল্লাহ (সাং-চানপুর, দেবীদ্বার, কুমিল্লা) ১৪৪-আবদুর রহমান (সাং কুরুইন, ঐ) ১৪৫-মুহাম্মাদ ইয়াসীন (সাং জিরুইন, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা)[১০১] ১৪৬-গাযী মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ সালাফী ওরফে 'রাহাতুল্লাহ' (হেমায়েতপুর, পাবনা। মৃঃ ৬ই জানুয়ারী, ১৯৭২) ১৪৭-মাওলানা কফীলুদ্দীন-শহীদ। এঁর মেয়ের বংশধর এখনও আসমাস্ত এলাকায় বসবাস করছেন। সাং- চর চাঁদপুর, পাবনা) ১৪৮-ইফাতুল্লাহ (চরভবানীপুর, পাবনা) ১৪৯ -কেফায়াতুল্লাহ (ঐ ভাই) ১৫০-ছিরাতুল্লাহ-শহীদ (ঐ ভাই) ১৫১-বাহাদুর গাযী (ঐ) ১৫২-কুরবান মন্ডল-শহীদ (ঐ ভাই) ১৫৩-ঈমান আলী মালীথা (চর শানির দিয়ার, পাবনা) ১৫৪-মাওলানা ইবরাহীম-শহীদ (ব্রজনাথপুর, পাবনা) ১৫৫-গাযী মাওলানা সুলায়মান (ঐ ভাই, দু'জনেই যোগ্য আলেম ছিলেন)

১৫৬-ইসমাঈল কাবুলী (চর ভবানীপুর, পাবনা) ১৫৭-আবদুর রশীদ ওরফে মধু মৌলবী (চর প্রতাপপুর। এখানে চর এলাকার আহলেহাদীছদেরকে অন্যেরা 'কাবুলী' ও 'ফারাযী' বলে। এখনও 'কাবুলীপাড়া' নাম চালু আছে।[১০২] ১৫৮-গাযী মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন (পশ্চিম গোলমুণ্ডা,, জলঢাকা, নীলফামারী। সাতক্ষীরা জেলা শহরের মরহুম ডাঃ কামরুল আনাম ছিদ্দীকীর পিতা)[১০৩] ১৫৯-মাওলানা আতাউল্লাহ (ময়মনসিংহ।) বালাকোট যুদ্ধে (৬ই মে ১৮৩১) অংশ গ্রহণ করেন। চিনিরপটল, সাঘাটা, গাইবান্ধায় মৃত্যু। দেহে ২১টি যখমের চিহ্ন ছিল। সর্বদা পুলিশী হুমকির মুখে থাকতে হ'ত।[১০৪] ১৬০-লাল মুহাম্মাদ- সম্ভবতঃ শহীদ (শিমুলবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা)[১০৫] ১৬১-মাওলানা ওয়াসেউর রহমান- সম্ভবতঃ শহীদ। মাত্র সাত দিনের একমাত্র পুত্র ইব্রাহীম সরকারকে রেখে ৪৫ বৎসর বয়সে জিহাদে গমন করেন। (বারকোনা, ঐ)[১০৬] ১৬২-মৌঃ শাফা'আতুল্লাহ আখন্দ-শহীদ (কালাইপাড়া, ঐ)[১০৭]

১৬৩-সমীরুদ্দীন-শহীদ (ঝাড়াবর্ষা ঐ) ১৬৪-যমীরুদ্দীন-শহীদ (ঐ ভাই) ১৬৫-জামা'আতুল্লাহ-শহীদ (ঐ ভাই; উক্ত তিন শহীদের জীবদ্দশায় ৮০ বিঘা জমির ৪২ বিঘা ক্রমে ক্রমে বিক্রি করে জিহাদ ফান্ডে দান করা হয় (পরে তাঁদের স্মরণে ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল বারী কাযী পুঁথি আকারে যে শোকগাথা রচনা করেন, তা এখনও লেখকের তত্ত্বাবধানে 'জিহাদ গ্যালারী'তে মওজুদ আছে) ১৬৬- গোলাম কাদের-এর পিতা (ঐ)[১০৮] ১৬৭- আবদুল হালীম ওরফে শারফুল্লাহ (ধনারুহা পোঃ খামার ধনারুহা, সাঘাটা, গাইবান্ধা) ১৬৮-মৌঃ আবদুল হাকীম (ঐ ভাই) ১৬৯-ফাহীমুদ্দীন মন্ডল (ঐ) ১৭০- ছিদ্দীক হোসেনের পিতা (দাতিয়া ঐ) ১৭১-রঈসুদ্দীন মন্ডল (আম্বারী, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।এই এলাকার আহলেহাদীছদেরকে 'গাড়া ফারাযী' 'মুহাম্মাদী', 'কাবুলী' ইত্যাদি বলা হ'ত)।[১০৯] ১৭২-সিরাজুদ্দীন-শহীদ (ঐ) ১৭৩-তমীরুদ্দীন-শহীদ (ঐ) ১৭৪-মোকাররম হোসেন-শহীদ (কর্ণপুর, বগুড়া) ১৭৫-সমীরুদ্দীন (বাইগুণী, ঐ) ১৭৬-যমীরুদ্দীন (পদ্মপাড়া, ঐ) ১৭৭-জেহার্দ্দন গাযী (তরফভাই, ঐ) ১৭৮-নাছিরুদ্দীন-শহীদ (ঐ)।[১১০] ১৭৯-গাযী আবদুল জলীল (রামনগর, মুর্শিদাবাদ) ১৮০-আবদুল বাকী সরকার (সিচারপাড়া, বগুড়া)[১১১] ১৮১-গাযী মাওলানা আবদুছ ছামাদ (চর ভবানীপুর, পাবনা) ১৮২-আহমাদ আলী মন্ডল-শহীদ (ঐ) ১৮৩-মালু গাযী (আটুয়া, পাবনা) ১৮৪-নঈমুদ্দীন (কৃষ্ণপুর, ঐ) ১৮৫-মাওলানা আনীসুর রহমান (কাবুলীপাড়া, ঐ)।[১১২] ১৮৬- আলহাজ্জ

Contents

এফাযুদ্দীন হাক্কানী (১৩৩) খোলাহাটি, গাইবান্ধা। ইনি সীমান্ত এলাকা হ'তে এখানে হিজরত করেন। তাঁর ব্যবহৃত তরবারি ও জিহাদের ব্যাজ লেখকের তত্ত্বাবধানে 'জিহাদ গ্যালারী'তে সংরক্ষিত আছে। সুঠামদেহী এই শতায়ু মুজাহীদ (১৮৫০-১৯৮৩) বিগত ১৯৮৩ সালের ১২ই নভেম্বর শনিবার সকাল ৭-৪৫ মিনিটে স্বগৃহে ইন্তেকাল করেন।[১১৩] ১৮৭-ফকীর মাহমূদ (কাবুলীপাড়া, পাবনা) ১৮৮-বিরাম মালিথা শহীদ ও তার ১১ জন সাথী (ঐ)।[১১৪]

أولئك آبائى فجِئنِى بمِثْلِهم + إذا جَمَعَتْنَا يا جَرِيرُ المَجَامعُ

টীকাসমূহ-১৬

১. কাযী আতহার মুবারকপুরী (জন্মঃ ৭ই মে ১৯১৬), 'আল-ইকদুছ ছামীন' (কায়রোঃ দারুল আনছার, ২য় সংস্করণ ১৩৯৯/১৯৭৯) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭।

২. (ক) عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال أهدى ملك الهند إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم جرّةً فيها زنجبيل فأطعَمَ أصحابَه قطعةً قطعةً و أطعَمَني منها قطعةً ، رواه الحاكم في مستدركه - হাকেম, 'আল-মুস্তাদরাক' ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৩৫।

(খ) আল-ইকদুছ ছামীন পৃঃ ২৪।

৩. ডঃ এনামুল হক, 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' (ঢাকাঃ আদিল ব্রাদার্স, ১৯৪৮; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ Dr. A.K.M. Yaqub Ali, ASPECTS OF SOCIETY AND CULTURE OF THE BARIND, 1200-1576. A.D. (Unpublished Ph.D. thesis) pp. 186-187.

৪. Dr. A.K.M Yaqub Ali, "MAHISANTOSH: A SITE OF HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL INTEREST IN BANGLADESH", ISLAMIC CULTURE (Hydrabad 1984) p. 140; Maktubat-i-Sadi. P. 339.

৫. সুলায়মান নাদবী, 'আরব ও হিন্দ কে তা'আল্লুক্বাত' (এলাহাবাদঃ হিন্দুস্থান প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৯৩০) পৃঃ ১৮৭-১৯০।

৬. ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ, 'বাংলাদেশে ইসলাম' (ঢাকাঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৭) পৃঃ ১৩, ৪২)।

৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪০, টীকা নং-৩।

৮. ডঃ মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান, 'শাওক নীমবীঃ হায়াত ও খিদমাত' (পাটনা, ১৯৮৭) পৃঃ ১৫।

৯. ডঃ এনামুল হক, 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' পৃঃ ৭২-৭৩, ৮৭-৮৯।

১০. Dr. Mohammad Ishaq, INDIA's CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE (Dacca University, 2nd. Ed. 1976) p.p. 113-114.

১১. ডঃ শায়খ মুহাম্মাদ ইকরাম, 'রূদে কাওছার' (লাহোরঃ ফীরোয সন্স লিমিটেড, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬৮) পৃঃ ৫১২-৫১৩।

১২. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫১২।

১৩. Dr. Muhammad Ishaq, INDIA'S CONTRIBUTION TO THE HADITH LITERATURE p. 115-116.

১৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৫; 'ইলমে হাদীছ' পৃঃ ১৩৬।

১৫. গোলাম রসূল মেহের, 'সারগুযাস্তে মুজাহেদীন' পৃঃ ২০২।

১৬. খুলনা-সাতক্ষীরা (সাং বুলারাটি পোঃ আলীপুর, জেলা- সাতক্ষীরা) এলাকায় আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় প্রবীণ আলিম মাওলানা আহ্‌মাদ আলীর (১৩০১-৯৬হিঃ/১৮৮৩-১৯৭৬ খৃঃ) ৭ম ঊর্ধ্বতন পুরুষ মাওলানা সৈয়দ শাহ নযীর আলী আল-মাগরেবী দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে আরবদেশ হ'তে এদেশে আসেন বলে জানা যায় (তাঁরা বংশ পরম্পরায় 'আহ্‌লেহাদীছ' হিসাবে পরিচিত)।-শেখ আখতার হোসেন. 'সাহিত্যিক মাওলানা আহ্‌মাদ আলী' (দৌলতপুর-খুলনাঃ হোসেন প্রকাশনী, ১৯৮৬) পৃঃ ৫-৬; অমনিভাবে কলিকাতার মাসিক 'আহ্‌লেহাদীস' পত্রিকার সম্পাদক হাফেয মাওলানা শেখ আয়নুল বারীর ৮ম ঊর্ধতন পুরুষ ইয়ামন হ'তে এদেশে আসেন এবং তাঁরাও বংশ পরম্পরায় 'আহ্‌লেহাদীছ' হিসাবে পরিচিত। -ঐ লিখিত তথ্য ৩০শে জানুয়ারী ১৯৮৯।

১৭. গোলাম রসূল মেহের, 'সাইয়িদ আহমদ শহীদ' পৃঃ ২০৮।

১৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ২১১।

১৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ২০৬

২০. আবদুর রহীম যুবায়রী, 'তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ' (কলিকাতা মাতবা'আ উছমানী, ১৩১৯/১৯০১) পৃঃ ৯৭-৯৮।

২১. মাসঊদ আলম নাদবী, 'পহেলী তাহ্‌রীক' পৃঃ ৪৯।

২২. মেহের, 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ২২৩।

২৩. 'পহেলী তাহ্‌রীক' পৃঃ ৫৩ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪. 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ২৫৩।

২৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫২, ২৫৪।

২৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৮।

২৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৪।

২৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮৬।

২৯. 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ' পৃঃ ৯৮।

৩০. দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স (অনুবাদ) পৃঃ ৬৬। দিলালপুর ও আশাপাশ এলাকার বর্ষিয়ান লোকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই আবদুর রহমান মুলতঃ মালীহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ-এর লোক ছিলেন। পাটনা কেন্দ্রের নির্দেশক্রমে তাঁকে দিলালপুর কেন্দ্রের মুজাহিদ নেতা মাওলানা আহমাদুল্লাহ আযীমাবাদীর কন্যার সাথে বিবাহ এবং অত্রাঞ্চলে দাওয়াত ও জিহাদের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য পাঠানো হয়। তিনি দিলালপুর মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন এবং গোপনে মুজাহিদ প্রশিক্ষণ দিতেন। ছোলা ভেজে নিয়ে ফকীরের বেশে বিভিন্ন অঞ্চলে তাবলীগে যেতেন। খ্যাতনামা আলেম গাযী মাওলানা আবদুল মান্নান ও মাওলানা আবদুল হান্নান দিলালপুরী (মৃঃ ২৫শে নভেম্বর ১৯৮২) উক্ত মাওলানা আবদুর রহমান লাক্ষ্ণৌবীর পুত্র ছিলেন।

তথ্যঃ মাওলানা হুমায়ূন রেযা (৫৭)। সাং- হাযারপুর, পোঃ- কুলী, থানা-ধুলিয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ। প্রধান শিক্ষক, জামে'আ রহমানিয়া ধুলিয়ান।-তাং ২৪.১.৮৯ ইং (খ) মাওলানা শওকত আলী (ফাযেল, বিহার মাদরাসা বোর্ড) সাং-দিলালপুর পোঃ-বিনোদপুর, জেলা- ছাহেবগঞ্জ, বিহার। (গ) মাওলানা ইসহাক মাদানী (৩৬) সাং-ইছাখালি পোঃ- কুলগাছি জেলা- মুর্শিদাবাদ তাং-১৩-১১-৮৯ ইং।

৩১. 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ' পৃঃ ৯৮; 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ২১৬।

৩২. মাওলানা আহমাদ হোসায়েন শ্রীমন্তপুরী (৭৯) বিন হাজী সাখাওয়াতুল্লাহ বিন রফী মণ্ডল-এর বক্তব্য। তাং- ২৮-১-৮৯ ইং, জন্মস্থানঃ নারায়ণপুর, হালসাকিনঃ শ্রীমন্তপুর, পোঃ- হাটগাছি, থানা-ইটাহার, জেলা- পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

৩৩. যেমন,

নারায়ণপুরিয়ারা মৌলবী হয়েছে
বাপদাদাকে বানিয়ে গাধা
দরগাহ নিন্দিছে।
এরা হ'তে দোশাদ ভাল
তারা কেহ মরদ হ'য়ে
মাগীর কাপড় খাচে না।
রফী মোল্লার ফৎওয়া
নাছীর মোল্লার হুমকুড়ি (হুমকী)
হ'তে দেবে না দরগাপূজা
খেতে দেবেনা ক্ষীর-খিঁচুড়ি।।

(বর্তমান সর্দারজী মাওলানা আহমাদ হোসায়েন শ্রীমন্তপুরীর বর্ণনা হতে উদ্ধৃত। - তাং-২৮. ১. ৮৯ ইং।)

৩৪. মাওলানার এই বক্তব্য হান্টারের সঙ্গে মিলে যায়। তবে হান্টার জেলখানার নাম বলেননি-'ইন্ডিয়ান মুসলমান্স' পৃঃ ৬৭।

৩৫. ইবরাহীম মন্ডল ছিলেন মূলতঃ নারায়ণপুরের নিকটবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলাধীন লালগোলা

১৫৬-ইসমাঈল কাবুলী (চর ভবানীপুর, পাবনা) ১৫৭-আবদুর রশীদ ওরফে মধু মৌলবী (চর প্রতাপপুর। এখানে চর এলাকার আহলেহাদীছদেরকে অন্যেরা 'কাবুলী' ও 'ফারাযী' বলে। এখনও 'কাবুলীপাড়া' নাম চালু আছে।[১০২] ১৫৮-গাযী মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন (পশ্চিম গোলমুণ্ডা,, জলঢাকা, নীলফামারী। সাতক্ষীরা জেলা শহরের মরহুম ডাঃ কামরুল আনাম ছিদ্দীকীর পিতা)[১০৩] ১৫৯-মাওলানা আতাউল্লাহ (ময়মনসিংহ।) বালাকোট যুদ্ধে (৬ই মে ১৮৩১) অংশ গ্রহণ করেন। চিনিরপটল, সাঘাটা, গাইবান্ধায় মৃত্যু। দেহে ২১টি যখমের চিহ্ন ছিল। সর্বদা পুলিশী হুমকির মুখে থাকতে হ'ত।[১০৪] ১৬০-লাল মুহাম্মাদ- সম্ভবতঃ শহীদ (শিমুলবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা)[১০৫] ১৬১-মাওলানা ওয়াসেউর রহমান- সম্ভবতঃ শহীদ। মাত্র সাত দিনের একমাত্র পুত্র ইব্রাহীম সরকারকে রেখে ৪৫ বৎসর বয়সে জিহাদে গমন করেন। (বারকোনা, ঐ)[১০৬] ১৬২-মৌঃ শাফা'আতুল্লাহ আখন্দ-শহীদ (কালাইপাড়া, ঐ)[১০৭]

১৬৩-সমীরুদ্দীন-শহীদ (ঝাড়াবর্ষা ঐ) ১৬৪-যমীরুদ্দীন-শহীদ (ঐ ভাই) ১৬৫-জামা'আতুল্লাহ-শহীদ (ঐ ভাই; উক্ত তিন শহীদের জীবদ্দশায় ৮০ বিঘা জমির ৪২ বিঘা ক্রমে ক্রমে বিক্রি করে জিহাদ ফান্ডে দান করা হয় (পরে তাঁদের স্মরণে ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল বারী কাযী পুঁথি আকারে যে শোকগাথা রচনা করেন, তা এখনও লেখকের তত্ত্বাবধানে 'জিহাদ গ্যালারী'তে মওজুদ আছে) ১৬৬- গোলাম কাদের-এর পিতা (ঐ)[১০৮] ১৬৭- আবদুল হালীম ওরফে শারফুল্লাহ (ধনারূহা পোঃ খামার ধনারূহা, সাঘাটা, গাইবান্ধা) ১৬৮-মৌঃ আবদুল হাকীম (ঐ ভাই) ১৬৯-ফাহীমুদ্দীন মন্ডল (ঐ) ১৭০- ছিদ্দীক হোসেনের পিতা (দাতিয়া ঐ) ১৭১-রঈসুদ্দীন মন্ডল (আম্বারী, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।এই এলাকার আহলেহাদীছদেরকে 'গাড়া ফারাযী' 'মুহাম্মাদী', 'কাবুলী' ইত্যাদি বলা হ'ত)।[১০৯] ১৭২-সিরাজুদ্দীন-শহীদ (ঐ) ১৭৩-তমীরুদ্দীন-শহীদ (ঐ) ১৭৪-মোকাররম হোসেন-শহীদ (কর্ণপুর, বগুড়া) ১৭৫-সমীরুদ্দীন (বাইগুণী, ঐ) ১৭৬-যমীরুদ্দীন (পদ্মপাড়া, ঐ) ১৭৭-জেহার্দ্দন গাযী (তরফভাই, ঐ) ১৭৮-নাছিরুদ্দীন-শহীদ (ঐ)।[১১০] ১৭৯-গাযী আবদুল জলীল (রামনগর, মুর্শিদাবাদ) ১৮০-আবদুল বাকী সরকার (সিচারপাড়া, বগুড়া)[১১১] ১৮১-গাযী মাওলানা আবদুছ ছামাদ (চর ভবানীপুর, পাবনা) ১৮২-আহমাদ আলী মন্ডল-শহীদ (ঐ) ১৮৩-মালু গাযী (আটুয়া, পাবনা) ১৮৪-নঈমুদ্দীন (কৃষ্ণপুর, ঐ) ১৮৫-মাওলানা আনীসুর রহমান (কাবুলীপাড়া, ঐ)।[১১২] ১৮৬- আলহাজ্জ

৪৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৫।

৪৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৫।

৪৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৫।

৫০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৭; রফিক মন্ডল ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গ্রেফতার হয়ে কিছুদিন পরেই মুক্তি পান।-মাসঊদ আলম নদভী (১৯১০-৫৪), হিন্দুস্তান কি পহেলী ইসলামী তাহরীক (দিল্লীঃ ইশা'আতে ইসলাম ট্রাষ্ট (রেজিঃ) দিল্লী-৬, ২য় সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮১) পৃঃ ১১৭।

৫১. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৬।

৫২. 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ১২৮।

৫৩. 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ২১৯।

৫৪. মুর্শিবাবাদ জেলার দেবকুণ্ড ও বেনাদহ গ্রামের মধ্যবর্তী মাড়ড়ার আমবাগানে ১৩০৫ হিজরীর ২৬ ও ২৭শে রবীউছ ছানী মোতাবেক বাংলা ১২৬৯ সালের ২৪ ও ২৫শে বৈশাখ মঙ্গল ও বুধবারে এই বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে আহলেহাদীছ পক্ষে মাওলানা সাঈদ বেনারসী, মাওলানা আবদুল আযীয রহীমাবাদী, হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরী, ইবরাহীম আরাভী, আবদুল্লাহ ঝাউ এলাহাবাদী. ইবরাহীম দেবকুন্ডী, মৌলবী মুহাম্মাদ মঙ্গলকোটি (বর্ধমান), মৌলবী মুহাম্মাদ (জামিরা, রাজশাহী) প্রমুখ হাযির হন। হানাফী পক্ষে ছিলেন- তাফসীরে হাক্কানী-র স্বনামধন্য লেখক মাওলানা আবদুল হক দেহলভী ও অন্যান্য ওলামা। -তথ্যঃ মুন্শী ফছীহুদ্দীন (সাং- বড় চাঁদঘর, পোঃ-ঐ, যেলা -নদীয়া) প্রণীত মাড়ড়ার বাহাছনামা 'ছায়ফল মোমেনিন' (কলিকাতাঃ ২য় সংস্করণ বাংলা ১৩৩১ সাল) পৃঃ ৫; মাওলানা সাঈদ বেনারসী (সম্পাদকঃ নুছরাতুস্ সুন্নাহ), 'কায়ফিয়াতে মুনাযারায়ে মুর্শিদাবাদ' (বেনারসঃ সাঈদুল মাতাবে প্রেস, তাবি) পৃঃ ৩।

৫৫. কালিগঞ্জের বাহাছ মূলতঃ সাতক্ষীরার মাওলানা আহমাদ আলী (১৩০১-৯৬ হিঃ/১৮৮৩-১৯৭৬)-কে দেওয়া এক চ্যালেঞ্জের জওয়াবে ১৯২৫ সালের ১২-১৩ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। এতে হানাফী পক্ষে মাওলানা রূহুল আমীন ও আহলেহাদীছ পক্ষে মাওলানা আহমাদ আলী, কলিকাতার মাওলানা বাবর আলী, মাওলানা এফাজুদ্দীন প্রমুখ হাযির হন। স্থানীয় হিন্দু জমিদার শ্রীযুক্ত শ্রীশবাবু এতে শালিশ থাকেন। এখানে তাঁর লিখিত শালিশনামায় আহলেহাদীছকে 'মোহাম্মাদী' বলে উল্লেখ করেছেন ও হানাফী পক্ষকে অভিযুক্ত করেছেন।-মাসিক আহলেহাদিস, কলিকাতা, ১১শ বর্ষ অগ্রহায়ণ সংখ্যা ১৩৩২ সাল। হুগলী যেলার দাদপুর থানাধীন বাক্যেশ্বর গ্রামে বিরাট আকারের এক বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে আহ্লেহাদীছ পক্ষে মাওলানা আব্বাস আলী, এফাজুদ্দীন, বাবর আলী ও মাওলানা মুসলিম দানাপুরী সহ বাংলা ভাষায় বাহাছের জন্য তরুণ আলিম ও উদীয়মান বাগ্মী সাতক্ষীরার মাওলানা আহ্মাদ আলী যোগদান করেন। -মাসিক আহলে হাদিস, শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা ১৩২৫; মাজমপুরের বাহাছ -ঐ, ৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৬; দিনাজপুরের বাহাছ -ঐ, ৯ম ভাগ ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩০। উক্ত পত্রিকার

কভার পেজ-এ লেখা থাক্ত -'আহলে হাদিস মোরা দাগাদারী জানিনা। ফকীহ্দের বে-দলীল রচা কথা মানিনা।' -ঐ ; দিনাজপুরের শারামপুরের বাহাছ ১৩৩০ সালের ২৪শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার এবং পাবনার টাউন হলের বাহাছ ১৩২৩ সালের ১২ই কার্তিক রবিবারে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় বাহাছে 'মোহাম্মদী' পক্ষে কলিকাতা হ'তে মাওলানা বাবর আলীও মাওলানা এফাজুদ্দীন হাযির ছিলেন। বাহাছে মোহাম্মাদী পক্ষের জয় হয়। পাবনার বাহাছের শালিশ ছিলেন উকিল কালীচরণ সেন ও দীননাথ সেন। বাহাছ শেষে টাউন হলে সর্বসমকেষ অনেক হানাফী শ্রোতা মৌলবী এফাজুদ্দীনের হাতে বায়'আত করে মোহাম্মাদী হয়ে যান। -মাসিক আহ্লেহাদিস ২য় বর্ষ ১৩২৩ সাল অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ১৩২-৩৭ ও ১৭৩-৭৯।

৫৬. মেহের, 'সাইয়িদ আহমাদ শহীদ' পৃঃ ৩৪৯।

৫৭. মেহের, 'সারগুযাস্তে মুজাহেদীন' পৃঃ ২২২-২২৩।

৫৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪৯।

৫৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩১৪-১৫।

৬০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৭৩।

৬১. তথ্যঃ মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (৬১), সাং আগলা পোঃ জামিরা, রাজশাহী। তাং ১৩-১-৯১ইং।

৬২. প্রাগুক্ত।

৬৩. ফযল হুসাইন বিহারী, 'আল-হায়াত বা'দাল মামাত' (উর্দু) (করাচীঃ মাকতাবা শু'আইব, ১৯৫৯) পৃঃ ৬৬২-৭০৫।

৬৪. মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী, 'আহ্লেহাদীস পরিচিতি' (ঢাকাঃ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লেহাদীস, ৯৮ নওয়াবপুর রোড ঢাকা-১, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩) পৃঃ ৮৯-৯১।

৬৫. গোলাম রসূল মেহের, 'সাইয়িদ আহমাদ শহীদ পৃঃ ৩৪৯, ৮০০; তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ পৃঃ ৬৪, ৬৭, ১৪৩; পহেলী তাহরীক ১৩১; উক্ত ছয়জন ছিলেন। ১. মৌলবী আবদুর রহীম যুবায়রী ছাদেকপুরী (১২৫২-১৩৪১/১৮৩৬-১৯২৩)। 'তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ'র লেখক। বিশ বছর বন্দী জীবন কাটিয়ে ১৩০০/১৮৮৩ সালে সাধারণ ক্ষমার আওতায় আন্দামান হ'তে মুক্তি পান। ২. মিয়াঁ আবদুল গাফ্ফার ছাদেকপুরী (মৃঃ সম্ভবতঃ ১৩৩৩ হিঃ/ ১৯১৫)। ৩. মিয়াঁ তাবারক আলী বিন মুবারক আলী মুযাফ্ফরপুরী পরে পাটনাবী (মৃঃ ১৩১৭/১৯০০ ইং)। ৪. মুন্শী জাফর থানেশ্বরী (মৃঃ ১৯০৫ খৃঃ) কালাপানির ইতিহাস 'তাওয়ারীখে আজীব'-এর স্বনামধন্য লেখক। ৫. মৌলবী আমীরুদ্দীন (মালদহ ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী, নারায়ণপুর, বাংলাদেশ) । ৬. মাসঊদ খান বাংগালী (বগুড়া, বাংলাদেশ)। ১৮৬০ সালে গ্রেফতার হন ও ১৮৮৩ সালে আন্দামানের সর্বশেষ কয়েদীদের সাথে মুক্তি পান।

৬৬. তথ্যঃ মাওলানা আহমাদ হুসাইন শ্রীমন্তপুরী (৭৯) জন্মস্থানঃ নারায়ণপুর, বর্তমান ঠিকানা- শ্রীমন্তপুর পোঃ হাটগাছি, থানা-ইটাহার, যেলা- পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। তারিখ- ২৮.১.৮৯ ইং। -আমীরুদ্দীন ১৮৭২ সালের মার্চ মাসে আন্দামানে নীত হন এবং ১৮৮৩ সালের ২১শে জানুয়ারী সোমবারে প্রাপ্ত সাধারণ ক্ষমার আওতায় সর্বশেষে ছয় জন কয়েদীর সাথে ৩রা মার্চ তারিখে স্বদেশ রওয়ানা হন।- জাফর থানেশ্বরী, তাওয়ারীখে আজীব (দিল্লীঃ মুস্তান্ছির প্রেস, তাবি, রচনাকালঃ ১২৯৬/১৮৭৯ খৃঃ) পৃঃ ৭৭, ৮২।

৬৭. তথ্যঃ আবদুল কাইয়ূম খান (৭৬)। সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীস। জন্মস্থানঃ হাকিমপুর, বর্তমান ঠিকানাঃ ৫২, নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলিকাতা-১১, তাং ৩১-১-৮৯ ইং।

৬৮. তথ্যঃ মোঃ শওকত আলী, সাং দিলালপুর, পোঃ বিনোদপুর, যেলা- ছাহেবগঞ্জ, বিহার; সংগ্রহেঃ মাওলানা ইসহাক মাদানী- সঊদী মাবঊছ, সাং ইছাখালি, পোঃ কুলগাছি, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, তাং ১৩-১১-৮৯ইং; জাফর থানেশ্বরী, তাওয়ারীখে আজীব পৃঃ ৭৬-৭৭।

৬৯. মাওলানা শ্রীমন্তপুরী ২৭.১.৮৯ ইং।

৭০. মাওলানা হাবীবুর রহমান (৫৮), মুদার্রিস ভাদো মাদরাসা পোঃ ভাদো, মালদহ। তাং ২৬-১-৮৯ ইং।

৭১. মাওলানা মোসলেম রহমানী (৭১) সাং-কারবোনা, মুহতামিম জামে'আ মাযহারুল উলূম, বাটনা পোঃ বাটনা, মালদহ এবং শাহ মোহাম্মাদ (৬০) নাযেম, ঐ মাদরাসা। তাং ২৬-১-৮৯ইং।

৭২. মাওলানা আবদুল হাই আনোয়ারী (৬৯) সাং-শেরকোল, পোঃ নাছীরগঞ্জ, থানা বাঘমারা, রাজশাহী। তাং ১৪-১২-৮৭ইং।

৭৩. মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (৬১), রাজশাহী মহানগরীর আহমাদপুর সালাফিইয়াহ মাদরাসায় একত্রে চাকুরীকালে গাযী ছাহেবের নিকট থেকে অনেকবার উক্ত ঘটনা শুনেছেন বলে জানান। সাং আগলা, পোঃ জামিরা, রাজশাহী, তাং ১৩-১-৯১ ইং; ওসমান গণী (৩৯) প্রভাষক ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজ, তাং ৪.১২.৯৫ ইং।

৭৪. মাওলানা আবদুল হক, মুদার্রিস, বাটনা সিনিয়ার মাদরাসাা, পোঃ বাটনা, মালদহ। তাং ১-২-৮৯ ইং।

৭৫. ঐ ভাতীজা আলহাজ্জ আযীযুর রহমান (৬৯) সাং-শিমুলতলা, পোঃ ভাদো, মালদহ। তাং ২৬-১-৮৯ ইং।

৭৬. ঐ সহোদর ভাই জমিদার সরদার (৭২), ঠিকানা-পূর্বোক্ত। তাং ২৬-১-৮৯ ইং।

৭৭. মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন সালাফী (৫৯) সাং- বিষণপুর, সহ-সুপার, ভাদো মাদরাসা, পোঃ ভাদো, মালদহ।

৭৮. ঐ পুত্র ও বর্তমান পীর আহমাদ আলী খান (৯৪), সাং-দুয়ারী, পোঃ ললিতগঞ্জ, থানা-পবা, রাজশাহী।-তাং ১১-১২-৮৭ইং।

৭৯. মৌঃ মোযাম্মেল হক (৬০), তাবলীগ সম্পাদক, বর্ধমান জেলা জমঈয়তে আহলেহাদীস, পঃ বঙ্গ। সাং-কুলসোনা পোঃ ভালগ্রাম, বর্ধমান। তাং ১৭-১-৮৯ইং।

৮০. মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (৬১), আগলা, পোঃ জামিরা, রাজশাহী, তাং ১৩-১-৯১ইং।

৮১. ক্রমিক সংখ্যা ৭৩ হ'তে ৯১ পর্যন্ত তথ্যঃ গাযী আনোয়ারুদ্দীন ওরফে মাওলানা আবদুল হাই আনোয়ারী (৬৯) সাং -শেরকোল, পোঃ- নাছীরগঞ্জ, থানা- বাঘমারা, রাজশাহী। তাং ১৪-১২-৮৭ইং। ইনি আসমাস্ত কেন্দ্রে 'বড়ী জামা'আতের যিম্মাদার' বা কমান্ডার ছিলেন। 'আবদুল হাই' ছিল তাঁর ছদ্মনাম। ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের সময় অমৃতসর হ'তে পাকিস্তান যাওয়ার পথে এক আখের ক্ষেতে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় হিন্দুরা তাকে কুপিয়ে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যায় এবং তিনি অলৌকিক ভাবে বেঁচে যান। আমৃত্যু তাঁর দেহে ঐ যখমের চিহ্ন ছিল। ১৯৯০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর নিজ গ্রামে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৮২. মুহাম্মাদ আবদুল লতীফ (৬৭), আবুল কালাম আযাদ (৪৮), সর্দারজী আনীসুর রহমানের বিধবা স্ত্রী মোসাম্মাৎ জাহানারা বেগম (৬০); সর্বসাকিন- সপুরা মিয়াঁপাড়া, পোঃ- সপুরা, রাজশাহী। তাং- ৬.৩.৮৯ ইং।

৮৩. মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (৬১) আগলা, জামিয়া, রাজশাহী তাং ১৩-১-৯১ ইং; মুনশী খলীলুর রহমান (৮২) বাইগুনী, গাবতলী, বগুড়া। তাং ২৬-১১-৮৮ ইং। শেষোক্ত জনের মতে ইনি আমীর রহমাতুল্লাহ (১৯২১-৪৯) ও বরকতুল্লাহ্‌র দেহরক্ষী ছিলেন।

৮৪. ৯৫ হ'তে ১০৭ পর্যন্ত তথ্যঃ আনছারুর রহমান সরকার (৮০), সর্দার জামা'আতে মুজাহেদীন, বগুড়া। সাং-সোন্দাবাড়ী,ে পাঃ গাবতলী, বগুড়া। তাং ২৬-১১-৮৯ ইং।

৮৫. মাওলানা আবদুর রহমান (৮২) সাং ও পোঃ কুপতলা, গাইবান্ধা। তাং ২৪-১১-৮৯ ইং।

৮৬. মাওলানা মানছূরুর রহমানের পৌত্র আবদুল মান্নান আনছারী (৫৬) ৮৯, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১।

৮৭. মুহাম্মাদ দ্বীন ইসলাম (৫৬), বযলুল করীম (৭৫), হেদায়াতুল্লাহ চৌধুরী (৫৫), সর্বসাকিনঃ দোলেশ্বর, থানা- কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। তাং ১৮-১১-৮৮ ইং।

৮৮. গাযী মার্জ্জুম হোসেনের প্রপৌত্র মুহাম্মাদ আবুল হুসাইন (৬০) বিন সৈয়দুদ্দীন বিন মৌলবী আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনে গাযী মাখদূম হুসাইন সাং-ভালুকা চাঁদপুর পোঃ ঐ, জেলা -সাতক্ষীরা। -তাং ২২.১২.৮৯ ইং। তথ্যদাতার বক্তব্য মতে বালাকোট জিহাদ থেকে ফেরার পথে শিয়ালকোটের এক জুমা মসজিদে আহলেহাদীছ তরীকায় ছালাত আদায় করতে গিয়ে মার্জ্জুম হোসেন ইংরেজের গুপ্ত পুলিশের নযরে পড়েন ও পরে সত্যকথা বলায় ফাঁসির আদেশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁর পার্শ্ববর্তী শ্রীউলা গ্রামের ইদু বিশ্বাস ধরা পড়ার ভয়ে হানাফী তরীকায় ছালাত আদায় করে বেঁচে যান। বর্তমানে মার্জ্জুম হোসেনের বংশ

সকলে আহ্‌লেহাদীছ। কিন্তু ইদু বিশ্বাসের বংশধর সবাই হানাফী। মার্জ্জুম হোসেন বহুদিন পরে সাতক্ষীরায় ফিরে এসে পার্শ্ববর্তী গুনাকরকাটি গ্রামে ওয়ায মাহফিলে বক্তৃতা করেন। তাঁর জন্য রান্না করা বাড়ীওয়ালার সামান্য ভাত-তরকারি তিনি নিজহাতে উপস্থিত শত শত শ্রোতাকে খাইয়ে তৃপ্ত করেন। তাঁর এই কেরামতে মুগ্ধ হয়ে উক্ত গ্রামসহ আশপাশের গ্রামসমূহের বহু লোক 'আহ্‌লেহাদীছ' হয়ে যায়। এখনও এই এলাকায় ৮/১০টি গ্রাম আহ্‌লেহাদীছ। গুনাকরকাটি গ্রামে একটি আহ্‌লেহাদীছ জামে মসজিদ ও লোকসংখ্যা থাকলেও পার্শ্ববর্তী চাপড়া গ্রামের মুন্‌শী আব্দুল আযীয নামক জনৈক 'পীর' এসে গ্রামের অনেককে পুনরায় হানাফী ও বিদ'আতী করে ফেলেন। সেখানে এখন প্রতিবছর ওরসের নামে শিরক ও বিদ'আতের মেলা বসে। তথ্যদাতার চাচাতো বোন সাতক্ষীরা সদর থানাধীন আইচপাড়া গ্রামের মরহুম ছানাউল্লাহ সরদার ইবনে ইবরাহীম সরদারের বিধবা স্ত্রী হাফীযা খাতুন (৭১)-এর নিকট থেকে ২৩.১২.৮৯ ইং তারিখে লেখক তার বাড়ীতে গিয়ে 'মার্জ্জুম হোসেন'-এর নাম খোদাইকৃত ১২০০ গ্রাম ওজনের উক্ত তামার বদনাটি সংগ্রহ করেন ও লেখকের তত্ত্বাবধানে রাজশাহীর 'জিহাদ গ্যালারীতে' সংরক্ষণ করেন।

৮৯. নামদার বিশ্বাসের পৌত্র মুহাম্মাদ আলী বিশ্বাস (৭৭), বাটরা দক্ষিণপাড়া পোঃ ধানদিয়া, সাতক্ষীরা, তাং ২৩-১২-৮৯ইং।

৯০. আবুল মনসুর আহমদ, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার ১ম মুদ্রণ জুলাই ১৯৬৮) পৃঃ ৩।

৯১. মাওলানা আবদুল মজীদ ছাবিলাপুরী (৭৬) সাং ছাবিলাপুর,পোঃ বেলতৈল বাজার, থানা-মেলান্দহ, জেলা-জামালপুর। তাং ৩১-১২-৯০ইং।

৯২. সুলায়মান গাযীর পুত্র মৌঃ রহমতুল্লাহ শেখ (৭৮), সাং-সরনজাই কাযীপাড়া, পোঃ সরনজাই, থানা- তানোর, রাজশাহী। তাং ১৩-৫-৯০ইং; মুহাম্মাদ মোযাম্মেল হোসেন (৬৬) সাং-মৌজা ষোলমারি পোঃ কৈমারী, থানা-জলঢাকা, নীলফামারী। -তাং ৮-২-৯০ ইং।

৯৩. প্রাগুক্ত, শেষোক্তজন।

৯৪. মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী, সাং-আগলা, জামিরা, রাজশাহী। তাং ২৮-১১-৮৯ ইং।

৯৫. নাদভী, পহেলী তাহরীক পৃঃ ১০৩, ১০৬; মেহের, 'সারগুযাস্ত' পৃঃ ৩৭১, ৩৭৪ এবং স্থানীয় তথ্যাবলী।

৯৬. মৌঃ ফযলুর রহমান আল-আইয়ূবী (৫৬), সাং-খয়েরসূতি পোঃ দোগাছি, পাবনা। ১.১২.১৯৮৯ ইং।

৯৭. ৯৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য তাং- ১৩-১-৯১ ইং।

৯৮. ৯৪-৯৮ তথ্যঃ মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (৬১), রাজশাহী, তাং ১৩-১-৯১ইং (নিহত ব্যক্তির নাম সঠিক কি-না যাচাইসাপেক্ষ-লেখক)।

৯৯. আল-ই'তিছাম (উর্দূ সাপ্তাহিক) লাহোরঃ ৪০ বর্ষ ৩০ ও ৩১ সংখ্যা, ২২ ও ২৯শে জুলাই ১৯৮৮।

১০০. মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী, রাজশাহী তাং ১৩-১-৯১ ইং। তথ্যদাতা 'ধরমপাল'

বলেছেন।

১০১. মাওলানা আবদুস সামাদ (৫৫) ও হাফেয মাওলানা আবদুল মতীন সালাফী (৪৯), সাং কোরপাই পোঃ নিমসার জেলা-কুমিল্লা। যথাক্রমে অধ্যক্ষ ও প্রভাষক কোরপাই আলিয়া মাদরাসা, পোঃ- নিমসার, কুমিল্লা। তাং ৬-১২-৮৯ ইং।

১০২. মাওলানা আবদুল মাজেদ সালাফী (৫৫) সাং আটুয়া পশ্চিমপাড়া, পাবনা। অধ্যক্ষ, মহিমাগঞ্জ টাইটেল মাদরাসা, গাইবান্ধা। তাং ১৩-১০-৮৯ইং; মধু মৌলবী দীর্ঘ ২৮ বছর সীমান্তে ছিলেন। ৯৭ বছর বয়সে বাংলা ১৩৯৯ সালের ২৭শে আষাঢ় (১১.৭.১৯৯২) সোমবার আশূরার দিনে চরপ্রতাপপুর নিজ বাড়ীতে একপ্রকার সুস্থ অবস্থায় আছরের সময় ইন্তেকাল করেন। তথ্যঃ ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ মাসউদ (৪৭) তাং- ৫.১১. ৯৪ ইং।

১০৩. মাওলানা আবদুল গফ্‌ফার (৫৫) ও মৌঃ খায়রুল আযাদ (৫৬), জলঢাকা, নীলফামারী এবং খাসবাগ, রংপুর।- তাং ২.১.৯৬ ইং।

১০৪. আবদুস সালাম আখন্দ (৫৫) সাং চিনিরপটল পোঃ ডাকবাংলা, থানা- সাঘাটা, গাইবান্ধা ও অন্যান্য মোট চারজন। তাং ১৩-১০-৮৯ইং।

১০৫. ইনি ইমদাদুল হক বি.এস-সি (৪৮)-এর প্রপিতামহের ভাই। প্রদর্শক, বোনারপাড়া মহাবিদ্যালয়, সাঘাটা, গাইবান্ধা ও অন্যান্য মোট পাঁচজন। তাং ১৩-১০-৮৯ইং।

১০৬. মুহাম্মাদ রেযাউল করীম (৩৫) মোংলারপাড়া পোঃ বারকোনা, গাইবান্ধা; প্রভাষক, সরকারী এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা। তাং ২২-১০-৮৯ ইং।

১০৭. ১০৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৮. কাযী মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন (৭৪) পিতা মৃত আবদুল বারী কাযী, কাযী আজীবার রহমান (৬০), কাযী আমজাদ হোসায়েন (৩৪), সর্বসাকিন-ঝাড়াবর্ষা পোঃ ডাকবাংলা, থানা- সাঘাটা, গাইবান্ধা। তাং ১৩-১০-৮৯ ইং।

১০৯. আবদুল হামীদ সরকার (৮০), নাযীর হোসায়েন (৫৭), লুৎফর রহমান আখন্দ ফারায়েযী (৫৮), সর্বসাকিনঃ ধনারুহা পোঃ খামার ধনারুহা, সাঘাটা, গাইবান্ধা। তাং ১৩-১০-৮৯ ইং।

১১০. মুনশী খলীলুর রহমান (৮২) সাং ও পোঃ বাইগুণী, থানা-গাবতলী, বগুড়া। তাঁর স্বলিখিত ডায়েরী হ'তে।-তাং ২৬-১১-৮৮ ইং।

১১১. মাওলানা আবদুস সোবহান (৪৮) সাং সিচারপাড়া পোঃ ভেলুরপাড়া, বগুড়া। -তাং ২-৮-৯১ ইং।

১১২. মৌলবী ফযলুর রহমান আল-আইয়ূবী (৫৬), খয়েরসূতী, পোঃ দোগাছি, পাবনা।

১১৩. পুত্র শেষ মূসা হাক্কানী (৫৬), পৌত্র শেষ আবদুন্ নূর হাক্কানী (৪০), ব্রীজ রোড, গাইবান্ধা।- তাং ২৪.১১.৮৯ ইং।

১১৪. আবদুস সুবহান (৬৫) পিতা- কালু মুহাম্মাদ জোয়ার্দার, ওয়াককাছ আলী মালিথা (৬২) পিতা-হোসেন আলী মালিথা ইবনে আশরাফ ইবনে ইকরাম ইবনে বিরাম মালিথা। সর্বসাকিন- চরপ্রতাপপুর পোঃ- বি.পি. নাজিরপুর, থানা ও জেলা-পাবনা। তাং- ৫.১১. ৯৪ ইং।

বাংলা ও বিহারে জিহাদ

ও

আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্র সমূহ

مراكز الجهاد و تحريك أهل الحديث فى البنغال والبهار

১. হাকিমপুর কেন্দ্র (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

(প্রতিষ্ঠাকালঃ সম্ভবতঃ ১৮৩৩ খৃঃ)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে সাতক্ষীরা যেলার সীমান্ত ঘেঁষে সুবর্ণরেখা বা সোনাই নদীর পশ্চিমপাড়ে বাংলাদেশের উত্তর ভাদিয়ালী গ্রামের বিপরীতে অবস্থিত বর্তমানে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা যেলার স্বরূপদহ থানার অধীন হাকিমপুর কেন্দ্রটি বাংলাদেশে জিহাদ আন্দোলনে একদা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বালাকোট পরবর্তী জিহাদ আন্দোলনের নেতা পাটনার মাওলানা বেলায়েত আলীর (১২০৫-৬৯/১৭৯০-১৮৫২ খৃঃ) নির্দেশক্রমে তাঁর মেজভাই মাওলানা এনায়েত আলী (১২০৭-৭৪/১৭৯২-১৮৫৮) ১ম পর্বে (১৮৩৩-৪৩ খৃঃ) ও ২য় পর্বে (১৮৪৭-৪৯) মোট বারো বছর বাংলাদেশ অঞ্চলে জিহাদের প্রচার ও সংগঠনে সময় অতিবাহিত করেন। পাটনা ছাদিকপুরের মূল কেন্দ্র হ'তে বাংলাদেশে এসে তিনি সম্ভবতঃ ১৮৩৩ সালের দিকে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

হাকিমপুর গ্রামটিকে জিহাদ আন্দোলনের 'মারকায' হিসাবে বেছে নেওয়ার পিছনে কয়েকটি কারণ ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। যেমন- (১) এই স্থানটির ভৌগলিক অবস্থান ছিল ইছামতি ও সুবর্ণ রেখা নদীর মধ্যবর্তী সামরিক কৌশলপূর্ণ এলাকায় (২) সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী হওয়ায় নৌ-যোগাযোগের সুন্দর সুবিধা (৩) এই গ্রামের অধিবাসীগণ বহুপূর্ব থেকেই ছিলেন একচেটিয়া মুসলমান ও আহলেহাদীছ এবং সেকারণেই তারা ছিলেন স্বভাবতঃই শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সর্বদা জিহাদী মনোভাবাপন্ন[১] (৪) সর্বোপরি এখানকার কিছু ব্যক্তির বালাকোট-পূর্ব যুগ থেকে জিহাদ আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকা মোটেও বিচিত্র ছিলনা। সম্ভবতঃ সেই সূত্র ধরেই মাওলানা এনায়েত আলী সরাসরি

এখানে চলে আসেন এবং মদন খাঁ ও মুফীযুদ্দীন খাঁ-এর সহযোগিতায় হাকিমপুরে জিহাদের মারকায গড়ে তোলেন।[২] এখানে রীতিমত জিহাদের ট্রেনিং হ'ত এবং এই কেন্দ্র দিয়েই পাটনা হয়ে আফগান সীমান্তের সিত্তানা, মুল্‌কা প্রভৃতি জিহাদের মূল ঘাঁটিতে টাকা-পয়সা, রসদপত্র ও মুজাহিদ প্রেরিত হ'ত।[৩]

তৎকালীন যশোর যেলার অধীন এই মারকাযের মাধ্যমেই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, যশোর সহ বৃহত্তর খুলনা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, রাজশাহী, মালদহ প্রভৃতি পদ্মা-যমুনা বিধৌত এলাকা এবং তিস্তা-করতোয়া বিধৌত বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর এলাকায় মাওলানা এনায়েত আলী ও তাঁর সাথীদের জিহাদী পদচারণা পরিব্যপ্ত ছিল। এই কেন্দ্রের পাশ দিয়ে বয়ে চলা বর্তমানে প্রায় মরা সোনাই নদীর উভয় তীরের গ্রামগুলি আজও আহ্‌লেহাদীছ গ্রাম হিসাবে তাদের প্রাচীন জিহাদী ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করছে।[৪]

২. নারায়ণপুর কেন্দ্র (বাংলাদেশ)

(প্রতিষ্ঠাকালঃ সম্ভবতঃ ১৮৪০ খৃঃ)

বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সীমান্ত যেলা চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন খ্যাতনামা জিহাদ সংগঠক রফীক মন্ডল ওরফে রফী মোল্লা ইবনে বরকতুল্লাহ বিন খায়রুল্লাহ বিন সাহাস মন্ডল। বালাকোট পরবর্তী জিহাদ আন্দোলনের নেতা মাওলানা এনায়েত আলীর (১২০৭-৭৪/১৭৯২-১৮৫৮) বাংলাদেশ আগমনের প্রথম পর্বে (১৮৩৩-৪৩) মালদহ-রাজশাহী অঞ্চলে তাবলীগী সফরের কোন এক পর্যায়ে রফীক মন্ডল মাওলানার হাতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন ও উত্তরবঙ্গে জিহাদ আন্দোলনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।'[৫] এটা যে ১৮৪০-এর কিছু আগে পিছে ছিল, তা এক প্রকার নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।[৬]

নারায়ণপুরকে কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেওয়ার পিছনে রফী মোল্লার মত নিবেদিত প্রাণ ও প্রতিভাবান নেতার অবস্থানস্থল হওয়া ছাড়াও পদ্মা তীরবর্তী এবং উন্নত নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য করা চলে। সমস্ত

উত্তরাঞ্চলে সংগৃহীত লোক ও রসদপত্র এই কেন্দ্রের মাধ্যমে নৌকাযোগে পাটনা প্রেরিত হ'ত। সেখান থেকে সুযোগমত সীমান্তের মূল ঘাঁটিতে পাঠানো হ'ত।

রফী মোল্লা একজন সাধারণ ব্যক্তি হ'লেও তাঁর মধ্যে ছিল অতুলনীয় সাংগঠনিক প্রতিভা।[৭] জিহাদ আন্দোলনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এই বীর মুজাহিদ ঊনবিংশ শতকের শিরক ও বিদ'আত অধ্যুষিত বাংলার বিস্তীর্ণ উত্তরাঞ্চলের জনপদে যে কঠিন বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জিহাদ ও আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তা ভাবতেও অবাক লাগে।

রফী মোল্লার সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বিস্তৃত তথ্য জানা সম্ভব হয়নি। তাঁর জীবিত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যারা এখনও বর্তমান চাপাই নবাবগঞ্জ যেলার পাকা-নারায়ণপুর, কানসাট, রহনপুর ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বসবাস করছেন,[৮] তাঁদের কাছ থেকে এবং ইংরেজ প্রতিবেদক ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টার -এর দেওয়া তথ্য থেকে যা জানা গেছে, তাকে মোটেই বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ রিপোর্ট বলা যায় না। ইতিপূর্বে আমরা রফী মোল্লা ও তৎপুত্র আমীরুদ্দীনের আন্দোলনের কিছু তথ্য উল্লেখ করে এসেছি।[৯] রফী মোল্লার পৌত্র স্বনামধন্য আলিম মাওলানা আহমাদ হোসায়েন শ্রীমন্তপুরী (৭৯) বলেন যে, ভারতের বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া সদর, কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়া যেলার বাইশী, ধরমগঞ্জ, দীঘলবাঁক, ছাহেবগঞ্জ যেলার বার হারোয়া থানা, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সূতী থানাধীন নূরপুর, সুজনীপাড়া, শেরপুর, বাহাদুরপুর প্রভৃতি এলাকা এবং পশ্চিম দিনাজপুর যেলার ইটাহার, রায়গঞ্জ, করণদীঘি, গোয়ালপুকুর, চোপড়-ইসলামপুর, গঙ্গারামপুর, তপন প্রভৃতি থানা সমূহের নদী তীরবর্তী এলাকা এমনকি পশ্চিমবঙ্গের গল্‌গলিয়া রেলষ্টেশনের বিপরীতে নেপালের ঝাপ্‌পা ও ভদ্রপুর থানার বহুলোক তাঁদের তাবলীগে আহ্‌লেহাদীছ হয়েছেন এবং সেখানে নারায়ণপুর এলাকার বহুলোক নদীভাঙ্গনের কারণে হিজরত করে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছেন। রফী মোল্লার পুত্র মৌলবী আমীরুদ্দীনের অনেক মুরীদ চাপাই নবাবগঞ্জের ভোলাহাট থেকে হিজরত করে মালদহ জেলার বাট্‌না, কারবোনা প্রভৃতি এলাকায় বসবাস করছেন- যারা সকলেই আহ্‌লেহাদীছ।[১০]

১৮৫৩ সালের দিকে রফী মোল্লা ইংরেজ সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন এবং

গ্রেফতার হয়ে মুর্শিদাবাদ-এর জংগীপুর জেলে নীত হন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি পান।[১১]

১৮৪৩ সালে মাত্র দু'তিন বছর সময়ের মধ্যে রফী মোল্লার আন্দোলন কিভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল হান্টার প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে তার কিছুটা অনুমান করা চলে। হান্টার উল্লেখ করেন যে, 'মাত্র একজন প্রচারক প্রায় আশি হাযার অনুগামীর এক বিরাট দল গড়ে তুলেছে এবং তারা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থকে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলে বিবেচনা করে।'[১২]

জেল থেকে ফিরে এসে রফী মোল্লা নিজ দায়িত্ব স্বীয় পুত্র আমীরুদ্দীনের উপরে ন্যস্ত করেন।[১৩] আমীরুদ্দীন স্বীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন এবং মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বৃহত্তর রাজশাহীসহ সমস্ত উত্তরবঙ্গে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৬৮ সালের দিকে আমীরুদ্দীনের আন্দোলন কেমন সুসংগঠিত ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, তার কিছুটা স্বীকৃতি হান্টার-এর রিপোর্টে পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেন, 'বর্তমানে একটি মাত্র প্রদেশের (বঙ্গদেশের) ওয়াহ্‌হাবীদের উপরে নযর রাখা এবং তাদের তৎপরতাকে সীমার মধ্যে রাখতে গিয়ে ইংরেজ সরকারকে যে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে, তার পরিমাণ স্কটল্যান্ডের এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি বৃটিশ জেলায় বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও ফৌজদারী অপরাধ দমনের কাজে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় তার সমান। ষড়যন্ত্র (অর্থাৎ আন্দোলন) এত ব্যাপক এলাকা জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে যে, এর কোথায় শুরু, তা বুঝা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। প্রতিটি জেলা কেন্দ্রে হাযার হাযার পরিবারের মাঝে অসন্তোষের বিষ ছড়াচ্ছে। কিন্তু এই তৎপরতার একমাত্র সম্ভাব্য সাক্ষী হচ্ছে এর কর্মীরা, যারা তাদের নেতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার চাইতে মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় বলে মনে করে।'[১৪]

রফী মোল্লা ও আমীরুদ্দীনের সূচিত আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সংগ্রহ করা সম্ভব না হ'লেও তার বাস্তব ফসল হিসাবে যা আমরা এখন প্রত্যক্ষ করি, তা এই যে, উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ বরেন্দ্র অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক নাগরিক শিরক ও বিদ'আত হ'তে তওবা করে মুসলিম ও 'আহলেহাদীছ' হয়েছেন এবং অদ্যাবধি বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ অঞ্চল সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবেই পরিচিত। তাদের মধ্যে এখনও শিরক ও বিদ'আত

বিরোধী মনোভাব বজায় আছে। ইতিপূর্বে তারা হেদায়েতী, মুহাম্মাদী, পাহাড়ী, ফারাযী, কাবুলী ইত্যাদি নামে পরিচিত হ'লেও বর্তমানে তারা সবাই সাধারণভাবে 'আহলেহাদীছ' নামেই পরিচিত।

১৮৭০ সালে রাজদ্রোহ আন্দোলনের নেতা হিসাবে আমীরুদ্দীন গ্রেফতার হন[১৫] ও মুর্শিদাবাদ জেলে নীত হন। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে যাবতীয় সম্পত্তি বাযেয়াফ্‌ত এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের কঠোর সাজাপ্রাপ্ত হন।[১৬] ১৮৭২ সালের মার্চ মাসে তিনি আন্দামানে নীত হন। সস্ত্রীক সহবন্দী ও জীবনীকার জাফর থানেশ্বরীর বিবরণ মোতাবেক সেখানে তাঁকে অবর্ণনীয় কষ্ট ও নির্যাতনের শিকার হ'তে হয়। পরে তিনি সেখানে একটি মাদরাসার শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন।[১৭] মৌলবী আমীরুদ্দীন কোন্ পর্যায়ের আসামী ছিলেন, তা এতেই আঁচ করা চলে যে, ১৮৮৩ সালের ২২শে জানুয়ারীতে যখন লর্ড রিপনের সুফারিশক্রমে বৃটিশ মহারাণী সকল ওয়াহ্‌হাবী রাজবন্দীকে মুক্তি ও তাদের পুনর্বাসনের সাধারণ নির্দেশ জারি করেন, তখন আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীর সংখ্যা মৌলবী আমীরুদ্দীন, মৌলবী জাফর থানেশ্বরী (মৃঃ ১৯০৫ খৃঃ), মৌলবী আবদুর রহীম ছাদেকপুরী (১২৫২-১৩৪১/১৮৩৬-১৯২৩), মিয়াঁ আবদুল গাফফার (মৃঃ সম্ভবতঃ ১৩৩৩/১৯১৫), মৌলবী তাবারক আলী (সম্ভবতঃ ১৩১৭/১৯০০ খৃঃ) ও মিয়াঁ মাসঊদ খান বাংগালী (বগুড়া)সহ মাত্র ছয়জন কয়েদী অবশিষ্ট ছিলেন।[১৮] ১৮৮৩ সালের ৩রা মার্চ তারিখে তাঁরা কালাপানির পোর্ট ব্লেয়ার ত্যাগ করে হিন্দুস্থান অভিমুখে রওয়ানা হন এবং যথাসময়ে স্ব স্ব বাড়ীতে পৌছেন। মৌলবী আমীরুদ্দীনের বিরুদ্ধে রুজু করা এই রাজদ্রোহের মামলাটিই 'মালদহ ষড়যন্ত্র মামলা ১৮৭০' নামে খ্যাত।[১৯]

মাওলানা আহমাদ হুসাইন শ্রীমন্তপুরীর (৭৯) বক্তব্য মতে রফী মোল্লার হাতে বায়'আত গ্রহণকারী মুর্শিদাবাদ জেলার ঝাউডাঙ্গা গ্রামের ইবরাহীম মন্ডল যিনি ইতিপূর্বে দিলালপুরের তিন মাইল উত্তরে ইসলামপুরে হিজরত করেছিলেন, তাঁর আবেদন ক্রমে ও সার্বিক প্রচেষ্টার ফলে রফী মোল্লা তাঁর জীবদ্দশায় দিলালপুরে হিজরত করেন এবং দিলালপুরের তিনমাইল পশ্চিমে ডোমপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন, যা পরবর্তীতে 'নারায়ণপুর' নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে যাকে 'আগলই-নারায়ণপুর' বলা হচ্ছে। সম্ভবতঃ চাপাই নবাবগঞ্জ জেলাধীন

নারায়ণপুরের মূল ঘাঁটির নামেই এই নামকরণ করা হয়। রফী মোল্লার জীবদ্দশায় তাঁর ১ম পক্ষের ছেলেরা অর্থাৎ কামীরুদ্দীন, আমীরুদ্দীন ও শামসুদ্দীন এখানে চলে আসেন। এই সময় তাঁদেরকে 'পাহাড়িয়া জামা'আত' বলা হ'ত। ২য় পক্ষের ছেলে শুকরুদ্দীন গাযী, সাখাওয়াতুল্লাহ ও মুহাম্মাদ আলী মন্ডলের বংশধরগণের অনেকে প্রায় ত্রিশ বছর পর রফী মোল্লার ইন্তেকালের পরে নদী ভাঙ্গণের ফলে নারায়ণপুর ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং আগলই- নারায়ণপুরে তাদের অংশের প্রাপ্য ২২ বিঘা জমি বিক্রি করে বর্তমানে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানাধীন শ্রীমন্তপুর গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন।

কালাপানি থেকে ফিরে এসে মৌলবী আমীরুদ্দীন তাঁদের নতুন নিবাস আগলই-নারায়ণপুরে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাঁদের তিন ভাইয়ের কবর আছে বলে মাওলানা শ্রীমন্তপুরী মত প্রকাশ করেন। তবে তিনি এ বিষয়েও নিশ্চিত যে, রফী মোল্লার মৃত্যু মূল ঘাঁটি বর্তমান বাংলাদেশের শিবগঞ্জের নারায়ণপুরেই হয়েছিল এবং তিনি সেখানেই কবরস্থ হন- যা পরে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। রফী মোল্লা তার ২য় পক্ষের ছেলে শুকরুদ্দীনকে সিত্তানা মুজাহিদ ঘাঁটিতে পাঠিয়েছিলেন জিহাদের উদ্দেশ্যে। শুকরুদ্দীন কিছুদিন পরে বাড়ী ফিরে এলে মোল্লাজী তার উপরে রুষ্ট হয়ে কথাবার্তা বন্ধ করে দেন ও সেই বেদনায় মর্মাহত হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই নারায়ণপুরে ইন্তেকাল করেন।[২০]

৩-দিলালপুর কেন্দ্র (বিহার, ভারত)

(প্রতিষ্ঠাকালঃ সম্ভবতঃ ১৮৫০ খৃঃ)

বর্তমান ভারতের বিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছাহেবগঞ্জ (দুম্‌কা) জেলার কোটালপুকুর থানাধীন দিলালপুর মুজাহিদ কেন্দ্রটি ছিল পূর্বের রাজমহল পরগনার ভাগলপুর কমিশনারীর অন্তর্ভুক্ত। স্থানটি মূলতঃ একটি পাহাড়িয়া এলাকা। গঙ্গা নদীর এপারে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা এবং ওপারে রাজমহল সাঁওতাল পরগনা পরস্পরে মিশে আছে। সাঁওতাল পরগনারই একটি গ্রামের নাম ইসলামপুর। এখানেই হিজরত করেছিলেন রফী মোল্লার হাতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণকারী নারায়ণপুর কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী মুর্শিদাবাদের ঝাউডাঙ্গা গ্রামের ইবরাহীম মন্ডল।[২১] হিজরতের এ ঘটনা সম্ভবতঃ ১৮৪০ হ'তে ১৮৫৩ সালে রফী

মোল্লা গ্রেফতার হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে হবে।

জিহাদের বায়'আত গ্রহণকারী ইবরাহীম মন্ডল ইসলামপুরে এসে চুপ থাকতে পারেননি। তিনি পাহাড়িয়া অঞ্চলের লোকদেরকে জিহাদের উদ্দেশ্যে সংগঠিত করতে থাকেন। তাঁর নিরলস দাওয়াত ও জিহাদের তৎপরতার ফলে স্থানটি কালক্রমে মুজাহিদ কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাছাড়া একদিকে প্রশস্ত নদী ও অপরদিকে দুর্গম পাহাড়িয়া অঞ্চল হওয়ার কারণে স্থানটি মুজাহিদগণের ট্রেনিং ও আশ্রয় কেন্দ্র হওয়ার উপযুক্ত ছিল। পরবর্তীতে পাটনা কেন্দ্র থেকে প্রেরিত মাওলানা আহমাদুল্লাহ এখানে আসেন এবং ইবরাহীম মন্ডলজীর পরামর্শক্রমে দুই মাইল দক্ষিণে 'দিলালপুর' নামক স্থানটিকে কেন্দ্র হিসাবে বাছাই করেন ও সেখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসার নীচে ভূগর্ভ কেন্দ্র যাকে 'তেহ্‌খানা' বলা হ'ত, সেখানে গোপন অস্ত্রাগার ছিল বলে জনশ্রুতি আছে।[২১]

মাদরাসাটি একই সাথে দ্বীনী ইল্‌ম ও জিহাদের ট্রেনিং কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। মাদরাসা পরিচালনা, জিহাদের ফান্ড সংগ্রহ এবং আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় 'সরদার' নিয়োগ করেন। যাদেরকে সাধারণতঃ 'সরদারজী' বলা হ'ত। 'সরদার'কে 'আমীর' -এর হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করতে হ'ত। এইভাবে চারিদিকে 'সরদার' নিয়োগের ফলে জিহাদের জন্য সর্বত্র লোক ও রসদ সংগ্রহ ব্যবস্থা সুষ্ঠুতর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৩] সুদূর রাজশাহীর দুয়ারী ও বগুড়ার সোন্দাবাড়ীতে মাদরাসা ও মারকায কায়েম হয়। সেখান থেকে লোক ও রসদ পত্র দিলালপুর কেন্দ্র হ'য়ে পাটনা দিয়ে সীমান্তের মূল ঘাঁটিতে চলে যেত।[২৪] রাজশাহীর সরদহ ও চারঘাট এলাকার কিছু গ্রাম দিলালপুর কেন্দ্রের মুবাল্লিগদের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ' হয় বলে জানা যায়।[২৫] পাবনার চর এলাকার 'কাবুলীপাড়া' বলে খ্যাত মুজাহিদ আহলেহাদীছ জামা'আতগুলি এবং কুলনিয়া, শালগাড়িয়া, শিবরামপুর প্রভৃতি এলাকার আহলেহাদীছগণ দুয়ারী হ'য়ে দিলালপুর কেন্দ্রের সাথে যুক্ত ছিলেন।[২৬]

নারায়ণপুর কেন্দ্রের পরিচালক মৌলবী আমীরুদ্দীনের বিরুদ্ধে 'মালদহ ষড়যন্ত্র মামলা ১৮৭০'-এর পরপরই দিলালপুর কেন্দ্রের পরিচালক ইবরাহীম মন্ডলের বিরুদ্ধে 'রাজমহল ষড়যন্ত্র মামলা অক্টোবর ১৮৭০' দায়ের করা হয়।[২৭]

ইবরাহীম মন্ডলের গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে যে কথা এলাকায় জনশ্রুতি আছে তা এই যে, অন্যূন ২৫ কিলোমিটার দূরের 'পাকুড়' গ্রামের বিদ'আতীরা তাদের প্রেরিত একজন ছাত্রের মাধ্যমে দিলালপুরের গোপন তথ্য জানতে পারে এবং ইংরেজ সরকারের কাছে তা ফাঁস করে দেয়। যার পরিণতিতে 'মন্ডলজী'কে গ্রেফতার বরণ করতে হয়। তিনি কালাপানিতে থাকাকালে দীনু মণ্ডল ভারপ্রাপ্ত 'সরদারজী' হন। ফিরে আসার পর ইবরাহীম মন্ডল পুনরায় সরদারজী হন। তাঁর মৃত্যুর পরে পুত্র রহীম বখ্শ মন্ডল 'সরদারজী' নিযুক্ত হন। সরদারীর প্রস্তাব জানতে পেরে তিনি বাড়ী থেকে ভয়ে পালিয়ে যান। দু'দিন পরে দু'মাইল দূরে যখন তাঁকে এক গুহার মধ্যে সন্ধান পাওয়া গেল, তখন তিনি সেখান থেকে পুনরায় পালিয়ে যান। পরে সোনাকৈড় গ্রামে আশ্রয় নিলে ভক্তরা ধরে এনে তাঁর হাতে ইমারতের বায়'আত গ্রহণ করে। এই সময় তিনি দায়িত্বের ভয়ে কেঁদে দাড়ি ভিজিয়ে ফেলেন। দিলালপুরের আমীরগণের মধ্যে রহীমবখ্শ মন্ডল ছিলেন সবচেয়ে কীর্তিমান ও দক্ষ সংগঠক।[২৮]

রহীম বখ্শ মন্ডলের মৃত্যুর পরে পুত্র মুহিব্বুল হক, তাঁর মৃত্যুর পরে পুত্র আলহাজ্জ মুঈনুল হক ও তাঁর মৃত্যুর পরে বর্তমানে পুত্র মাওলানা যামীরুল হক সালাফী এডভোকেট (ফারেগ, দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ দারভাঙ্গা) সরদারীর দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ডল বা সরদার নিযুক্ত হ'লে এলাকার সমস্ত লোক তাঁর হাতে আনুগত্যের বায়'আত করে থাকেন। দিলালপুরী জামা'আত সাধারণ্যে 'পাহাড়িয়া জামা'আত' বলে পরিচিত।[২৯]

দিলালপুর কেন্দ্র থেকে যারা রসদ-পত্র ও টাকা-পয়সা নিয়ে পাটনা (ছোট গুদাম) বা সীমান্ত ওরফে খোরাসান (বড় গুদাম)- এ যাতায়াত করতেন, তাদের মধ্যে অত্রাঞ্চলে তিন জনের নাম আজও প্রসিদ্ধ আছে। -১. তাহেরুদ্দীন (উত্তর প্রদেশ) ২. সিরাজুদ্দীন (উত্তর প্রদেশ) ৩. বরকতুল্লাহ।

কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ইবরাহীম মন্ডলজী (কালাপানির বন্দী) এবং মাওলানা গাযী আবদুল মান্নান বিন মাওলানা আবদুর রহমান মালীহাবাদী লাক্ষ্ণৌবীর নাম এতদঞ্চলে সমধিক প্রসিদ্ধ। শেষোক্তজন খ্যাতনামা আলিম মাওলানা আবদুল হান্নান দিলালপুরীর (১৮৯৫-১৯৮২ খৃঃ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।[৩০]

দিলালপুর কেন্দ্রের সংস্কার কার্যাবলীঃ

দিলালপুর মাদরাসা শামসুল হুদা-র মাধ্যমে নিয়মিত শিক্ষাদান ছাড়াও মাদরাসার শিক্ষক ছাত্র ও অন্যান্য মুজাহিদ সাথীগণ আমীরের তথা মন্ডলজীর নির্দেশক্রমে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে তাবলীগী কাফেলা নিয়ে যেতেন। বিশেষ করে মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আহমাদুল্লাহ ও তাঁর জামাতা মাওলানা আবদুর রহমান মালীহাবাদী লাক্ষ্ণৌবী মুসলিম সমাজ হ'তে শিরক ও বিদ'আত উৎখাতে জোরালো ও আপোষহীন ভূমিকা পালন করেন। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ও শেষার্ধের এই সময় বাংলাদেশের বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির গাঢ় অন্ধকারে কি পরিমাণ নিমজ্জিত ছিল নিম্নোক্ত সমাজচিত্র সামনে রাখ্‌লে কিছুটা আঁচ করা সম্ভব হবে।

যেমন উদাহরণ স্বরূপঃ (১) মুসলমানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে খাৎনা করত। অনেকের খাৎনাই হ'ত না (২) হিন্দুদের মত তারাও মাথায় টিকি রাখ্‌ত (৩) হাতে ও গলায় গোদানা করত (৪) মুসলমান মেয়েরা নদীর পাড়ে কাপড় খুলে রেখে নিঃসংকোচে উলংগ হ'য়ে পানিতে নেমে গোসল করত (৫) কেউ শুকরের পূজা করত (৬) খাৎনা উপলক্ষে বিরাট আয়োজন ও ঢাক-ঢোল পিটানো হ'ত (৭) ব্রাহ্মণ-যজমানদের দেখাদেখি মুসলিম সমাজেও পীর-মুরীদীর প্রথা ছড়িয়ে পড়েছিল (৮) আল্লাহ্‌র বদলে পীরের নামে পীরের দরগাহে খাসি-গরু-মোরগ ইত্যাদি মানত করা, হাজত দেওয়া, পীরের ধ্যানে মগ্ন থাকা, পীরের যিক্‌র করা ইত্যাদি চালু হয়েছিল (৯) মোরগ-মুরগী যবহ করার জন্য মোল্লা-মৌলবীগণ ছুরিতে ফুঁক দিয়ে দিতেন। ফিস্‌-এর পরিমাণ মোতাবেক দুই বা ছয় মাসের মেয়াদে ফুঁক দেওয়া ছুরি দিয়ে যবহ করাই যথেষ্ট ছিল, পৃথকভাবে কোন দো'আ পড়তে হ'ত না। মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে পুনরায় ফিস্‌ দিয়ে ফুঁক দিয়ে আনতে হ'ত। নইলে ঐ ছুরিতে যবহ করা পশুর গোস্ত খাওয়া হারাম হ'ত। (১০) শী'আদের 'তাযিয়া' প্রথা সুন্নীদের মধ্যেও প্রবেশ করেছিল। প্রত্যেক গ্রামে 'তাযিয়া' বানিয়ে রাখা হ'ত। বিয়ের পর সেখানে গিয়ে জামাই-মেয়ে তাযিয়াকে সিজদা করত। কারো সন্তান না হ'লে কিংবা কেউ দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হ'লে তাকে তাযিয়ার মধ্য দিয়ে পার হ'তে হ'ত। (১১) মুসলমান মেয়েরা হিন্দু

মেয়েদের মত বিয়ের সময় মাথায় সিদুঁর দিত। কপালে লাল টিপ লাগাত (১২) কারো পর পর দু'টি সন্তান মারা গেলে তৃতীয় সন্তানের নাম কুবাক্যে রাখা হ'ত, যাতে 'মালাকুল মউত' ঘৃণায় তার কাছে না আসে (১৩) পরপর দু'টি বা তিনটি সন্তান মারা গেলে পরবর্তী সন্তানের মাথায় চুলের টিকি রেখে দিত। মৃত্যু সন্দেহ দূর হ'লে পরে টিকি কেটে ফেল্ত (১৪) হিন্দুদের 'মনসা' পূজার সময় মুসলমানের ঘরে কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তার নাম রাখা হ'ত 'মনসা'। অমনিভাবে তাদের 'হোলি'র সময় মুসলমানের ঘরে কোন সন্তান এলে তার নাম রাখা হ'ত 'ফগ্ওয়া' (১৫) হিন্দুদের সাথে মিল রেখে মুসলমানেরাও তাদের ছেলেমেয়েদের নাম রাখ্ত দুখে, পচা, কালাচান, সোনাভান, রূপভান ইত্যাদি (১৬) অধিকাংশ মুসলমানের ঘর থেকে 'ছালাত' বিদায় নিয়েছিল। তরুণ ও যুবকেরা বাজে খেলাধূলা ও বয়স্করা পীর ছাহেবদের শিখানো বিভিন্ন তরীকার যিক্র ও সাধনায় মশগুল থাক্ত। 'ছালাত বুড়া বয়সে আদায় করতে হয়' এমন একটা কথা সর্বত্র চালু হয়েছিল (১৭) মসজিদগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এমনও দেখা যেত যে, একজন মুওয়ায্যিন স্বল্প বেতনের বিনিময়ে একই ওয়াক্তে কয়েকটি মসজিদে গিয়ে 'আযান' দিত। অথচ মসজিদগুলির অধিকাংশ মুছল্লীশূন্য থাক্ত।এমনিতরো আরও বহু রেওয়াজ চালু ছিল।

মজার ব্যাপার এই যে, এই সব বিদ'আত সৃষ্টি ও টিকিয়ে রাখার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দায়ী ছিলেন এই সময়কার বিদ'আতী মোল্লা-মৌলবীরা। এরাই ছিলেন শিরক ও বিদ'আতের হোতা এবং পাহারাদার। দিলালপুরের মুবাল্লিগগণ বিশেষ করে মাওলানা আহমাদুল্লাহ ও মাওলানা আবদুর রহমান এসবের বিরুদ্ধে সর্বদা জোরালো ভূমিকা রাখতেন। ফলে তাঁদেরকে প্রায়ই বিদ'আতী আলেমদের মুকাবিলায় বাহাছ -মুনাযারায় যোগদান করতে হ'ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ'আতীরা হয় অনুপস্থিত থাক্ত, নয় পালাত, নয় পরাজিত হ'ত। ফলে দলে দলে লোক 'আহলেহাদীছ' হয়ে যেত। দিলালপুরের আশপাশে বহুদূর পর্যন্ত কোন মসজিদ ছিল না। ফলে দূর-দরায থেকে মুসলমানেরা এখানে জুম'আ পড়তে আসত। এখানকার ওয়ায শুনে ও আমল-আখলাক দেখে অনেকে 'আহলেহাদীছ' হয়ে যেতেন ও শিরক-বিদ'আত থেকে তওবা করে নবজীবন লাভে ধন্য হ'তেন। নিম্নে কয়েকটি বিশেষ 'মুনাযারার' সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত

হ'ল-

(১) ঝানাগাড়িয়ার বাহাছ (পোঃ হিরনপুর, জেলা- ছাহেবগঞ্জ, বিহার)ঃ জনৈক মারেফতী পীরের সাথে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামে বড় ধরনের একটি বাহাছ হয়। আহলেহাদীছ পক্ষে ছিলেন দিলালপুরের খ্যাতনামা শিক্ষক মাওলানা আবদুল হান্নান দিলালপুরী (১৮৯৫-১৯৮২ খৃঃ), মাওলানা মুছলেহুদ্দীন আবদুল্লাহপুরী (১৯২১-৮১ খৃঃ), মাওলানা আফ্ফান, মাওলানা শামসুল হক দারভাঙ্গাবী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। পীর ছাহেব মুনাযারায় ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে যান। ফলে উক্ত গ্রামসহ আশপাশের এলাকা সব আহলেহাদীছ হ'য়ে যায়।

(২) বাঁশখুদরী বাহাছ (পোঃ সিটিপাড়া, জেলা- ছাহেবগঞ্জ, বিহার)ঃ প্রথমে এই গ্রামের এক পীরের সাথে বাহাছের দিন ধার্য হয়। কিন্তু তিনি নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই পালিয়ে গেলে জনৈক দেউবন্দী হানাফী আলেম এসে লোকদেরকে তার মতে দীক্ষা দিতে চেষ্টা করেন। এতে গ্রামবাসীরা আহলেহাদীছ আলেমদেরকে আহবান জানায় দেউবন্দীদের সাথে মুনাযারা করার জন্য। মুনাযারার বিষয়বস্তু ছিল (১) তাক্বলীদ (২) তাযিয়া (৩) মীলাদ ও (৪) কিয়াম। আহলেহাদীছ পক্ষে ছিলেন মাওলানা নিযামুদ্দীন, মাওলানা আবদুল আযীয হাক্কানী, মাওলানা আলী হোসায়েন প্রমুখ এবং দেউবন্দী পক্ষে ছিলেন মাওলানা শামসুদ্দীন ও মাওলানা সিরাজুদ্দীন প্রমুখ। বিস্তারিত আলোচনা শ্রবণ করে অর্ধেক গ্রামবাসী সঙ্গে সঙ্গে 'আহলেহাদীছ' হ'য়ে যায়।

(৩) ইটাপুকুর বাহাছ (পোঃ বিষনপুর, জেলা- ছাহেবগঞ্জ, বিহার)ঃ ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত এই মুনাযারার বিষয়বস্তু ছিল (১) ওরস (২) কবরপূজা (৩) কাওয়ালী ও বয়াতী গান (৪) ধ্যানের মাধ্যমে ছালাত আদায়। বিষয়গুলির পক্ষে জনৈক ভোয়ালুদ্দীন পীর ও তার সহযোগীরা ছিলেন। বিপক্ষে ছিলেন মাওলানা আবদুল হান্নান দিলালপুরী, মাওলানা শামসুয্যোহা, মাওলানা আহমাদুল্লাহ রহমানী (সাং- ভবানীপুর, পোঃ ও জেলা- ছাহেবগঞ্জ, বিহার)। স্বয়ং আমীর জনাব মঈনুল হক মণ্ডলজীও উপস্থিত ছিলেন। বাহাছের পরে দু'একজন বাদে গ্রামের সবাই আহলেহাদীছ হ'য়ে যান।

(৪) কাশিলা বাহাছ (পোঃ রাজগাঁও জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ)ঃ এই মুনাযারায়

ব্রেলভী হানাফীদের পক্ষে (১) কবরপূজা (২) অসীলাপূজা (৩) কবরে গেলাফ চড়ানো (৪) পীরের নামে খাসি মানত করা (৫) মীলাদ-কেয়াম ইত্যাদি বিষয়ে বাহাছ করার জন্য যথাসময়ে কোন ব্রেলভী আলেম হাযির হননি। আহলেহাদীছ পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আবদুল হক (সাং- সংগ্রামপুর, জেলা- ছাহেবগঞ্জ, বিহার), মাওলানা ইসমাঈল, মাওলানা আবদুল আযীয হক্কানী, মাওলানা নিযামুদ্দীন প্রমুখ। গ্রামবাসী প্রায় সকলেই আহলেহাদীছ হয়ে যান ও সেখানে একটি মাদরাসা কায়েম হয়।

(৫) কনকপুর বাহাছ (পোঃ ঐ, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ)ঃ ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত এই বাহাছে আহলেহাদীছ ও দেউবন্দী উভয়পক্ষের আলেমগণ সমবেত হন এবং মুক্তাদীদের সূরায়ে ফাতিহা পাঠ, নিয়াত পাঠ, কাতার সোজা করণ, মীলাদ প্রথা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। গ্রামবাসী অর্ধেক আহলেহাদীছ হয়ে যান।

দিলালপুর কেন্দ্রের বিশেষ করে মাওলানা আহমাদুল্লাহ ও মাওলানা আবদুর রহমানের নিরলস দাওয়াত ও তাবলীগে তাঁদের প্রভাবিত লোকদের মধ্য হ'তে শিরক ও বিদ'আত সমূহ বিদূরিত হয়। পরবর্তীতে মাওলানা আবদুল হান্নান দিলালপুরী ও তাঁর সহযোগী আলেমদের মাধ্যমে এই সংস্কার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

দিলালপুর মারকাযের মাধ্যমে যে সকল মুবাল্লিগ আলিম বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত হ'তেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাম আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। যেমন-

১- গাযী মাওলানা আবদুল মান্নান (সাং দিলালপুর, পোঃ বিনোদপুর, জেলা- ছাহেবগঞ্জ, বিহার)। ইনি আসমাস্ত কেন্দ্রে জিহাদের উদ্দেশ্যে গমন করেন ও 'গাযী' হিসাবে ফিরে আসেন। ২- মাওলানা আবদুস সাত্তার (সাং দিলালপুর) ৩- মাওলানা শামসুদ্দীন (ঐ) ৪- মাওলানা নাযীরুদ্দীন (ঐ) ৫- সাফীরুদ্দীন (ঐ) ৬- মাওলানা যয়নুল আবেদীন (সাং ও পোঃ- বারহেট, জেলা- ঐ) ৭- মাওলানা সাজ্জাদ আলী (সাং- মেহদীডাঙ্গা পোঃ রিষোড়, জেলা-ঐ) ৮- মাওলানা সাফীরুদ্দীন (ঐ) ৯- মাওলানা ইহসানুল্লাহ (সাং ছোট চাঁদপুর পোঃ আগলই,

জেলা- ঐ) ১০- মাওলানা রিয়াযুদ্দীন (ঐ) ১১- মাওলানা রুস্তম (ঐ) ১২- মাওলানা আবদুল লতীফ (সাং- বড় চাঁদপুর, ঐ) ১৩- মাওলানা ইমামুদ্দীন মন্ডল (সাং- ডোমপাড়া, ঐ) ১৪- মাওলানা সিকান্দার আলী (ঐ) ১৫- মাওলানা আবদুল কাদের (সাং- কাঁকজোল, ঐ) ১৬- মাওলানা আবদুস সাত্তার (সাং ও পোঃ- ইসলামপুর, ঐ) ১৭- মাওলানা রায়হান (ঐ) ১৮- মাওলানা কালীমুদ্দীন সালাফী (সাং হরিহরা, পোঃ শ্রীকুন্ড, ঐ) ১৯- মাওলানা বেলায়েত আলী (সাং আঁধার কোটা, ঐ) ২০- মাওলানা আবদুল হান্নান (সাং-আবদুল্লাহপুর পোঃ- আগলই, ঐ) ২১- মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (সাং- বাউরিশুনা, পোঃ- দোগাছি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ) ২২- মাওলানা আফফান সালাফী (সাং ও পোঃ- আমতলা, ঐ) ২৩- মাওলানা নিয়াযুদ্দীন (ঐ) ২৪- মাওলানা যয়নুল আবেদীন (সাং- গোহালবাড়ী, পোঃ- ঐ) ২৫- মাওলানা নিযামুদ্দীন (সাং সীতারামপুর পোঃ- দোগাছি, ঐ) ২৬- মাওলানা শামসুয্‌যোহা (সাং- সোহরপুর পোঃ- চাচন্ড, ঐ) ২৭- মাওলানা মুসলিম (ঐ) ২৮- মাওলানা আনোয়ারুল ইসলাম (সাং- জোড় পুকুরিয়া পোঃ- জাফরগঞ্জ, ঐ) ২৯- মাওলানা খোশ মুহাম্মাদ (সাং- সমেসপুর, ঐ) ৩০- মাওলানা সোহরাব আলী (সাং- শিবতলা, পোঃ- ধুলিয়ান, ঐ) ৩১- মাওলানা ক্বারী এরফান (সাং- ঘোলাকান্দী, পোঃ- জাফরগঞ্জ, ঐ)।[৩১]

৪- আবদুল্লাহপুর কেন্দ্র (ছাহেবগঞ্জ, বিহার, ভারত)

(প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৪০ খৃঃ)

আলহাজ্জ কিস্‌মাতুল্লাহ্‌র উদ্যোগে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে দিলালপুরের অনতিদূরে 'আবদুল্লাহপুর ইসলামিয়া মাদরাসা' (পোঃ- আগলই, জেলা- ছাহেবগঞ্জ, বিহার) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার সাথে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সংযোগ সাধন এবং সাথে সাথে তাবলীগে দ্বীনের মূল দায়িত্ব পালনের ফলে এই মাদরাসা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং জিহাদের কেন্দ্র না হ'লেও আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হয়। উত্তর প্রদেশের আযমগড়ে জন্মগ্রহণকারী খ্যাতনামা আলিম হাফেয মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (১৯২১-৮১ খৃঃ) দীর্ঘ ১৫ বছর তাঁর শিক্ষাগ্রহণ কেন্দ্র বিহারের দারভাঙ্গা দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ্‌তে শিক্ষকতা শেষে ১৯৪৮ সালে এসে আবদুল্লাহপুর মাদরাসার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। অতঃপর সুদীর্ঘ ২২ বৎসর শিক্ষকতা করার পর ১৯৮০

সালে বেনারস জামে'আ সালাফিইয়াহ্‌তে চলে যান ও সেখানেই ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৮১-তে ইন্তেকাল করেন। মূলতঃ তাঁর সময়কালই ছিল আবদুল্লাহপুরের স্বর্ণযুগ। তিনি ব্যাপকভাবে সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু করায় তাঁর অনুসারীদেরকে 'ইছলাহী জামা'আত' বলা হ'ত। যেমন বিদ'আতী কেউ আহলেহাদীছ হ'লে তাকে সেই যুগে 'হেদায়েতী' বলা হ'ত। মাদরাসার মুখপত্র হিসাবে এই সময় বার্ষিক 'আল-মুছলেহ' পত্রিকা চালু হয়। মাওলানার সময়ে বিহারের পাহাড়ী অঞ্চলে ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভন্ডপীরের ব্যাপক উপদ্রব ছিল। তাদের মধ্যে পীর আবদুল জাব্বারের উপদ্রব ছিল মারাত্মক। মাওলানা মুছলেহুদ্দীন স্বীয় ক্ষুরধার লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে এসবের যথাযোগ্য মোকাবিলা করেন। তাবলীগী কাফেলা পাঠানোর সময়ে ছাত্রদেরকে বলতেন, 'তাবলীগ করনে কো ওহাঁ যা-ও, যাঁহা ডান্ডা খানেকো মেলেগা। যাহাঁ মোরগা আওর আন্ডা খানেকো মেলেগা, ওহাঁ জানে কি কেয়া যরূরাত হ্যায়?'

মাওলানার লেখনীঃ তিনি কাদিয়ানী ভন্ড নবী ও খৃষ্টানদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচারপত্র লিখে ব্যাপকভাবে বিতরণের মাধ্যমে জনগণকে হুঁশিয়ার করেন। তাঁর লিখিত পুস্তক-পুস্তিকাসমূহের তালিকা নিম্নরূপঃ

১- বিদ'আত কা শারঈ অপারেশন ২- তুহ্‌ফায়ে শরীয়াত ৩- ব্রেলভিয়াত কা শারঈ এক্সরে ৪- দাজ্জালে মাও'উদ ৫- মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী আপ্‌নে আক্বায়েদ আওর তাছনীফাত কে আয়েনে মেঁ ৬- হামিদ কাওছার কাদিয়ানী কে কিতাব্‌চাহ কা মুদাল্লাল জওয়াব ৭- মির্যা বাশীর আহমাদ কাদিয়ানী কি কেতাব ইল্‌মে নবুঅত পর ৮- কাদিয়ানী আপ্‌নে আয়েনে মেঁ ৯- ঈসা মাসীহ কুরআন কি রওশনী মেঁ ১০- মুক্বাদ্দাস বাইবেল আওর উস্‌কী তা'লীমাৎ ১১- মওজূদাহ ঈসাইয়াত ১২- কম্যুনিজম ও কুরআনিজম আক্‌ল কি কেসোটী পর ১৩- বাবা গুরু নানক কি ক্বীমতী আওর রওশন তা'লীমাৎ ১৪- খোদা কি ধরম এক হো সাক্‌তা হ্যায় ১৫- ধরম কা ছুপানা মহাপাপ হ্যায় ১৬- ইখ্‌তিলাফে উম্মাত আওর উস্‌কা ছহীহ হাল্ ১৭- ইলিয়াসী তাবলীগ জামা'আত গওর করেঁ। এতদ্ব্যতীত তাঁর অনেক লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৩২]

মাওলানা আবদুল হান্নান দিলালপুরীর (১৮৯৫-১৯৮২) মৃত্যুর পরে দিলালপুর

কেন্দ্র এবং মাওলানা মুছলেহুদ্দীনের (১৯২১-৮১ খৃঃ) মৃত্যুর পরে আবদুল্লাহপুর প্রচারকেন্দ্র যোগ্য আলিম- নেতৃত্বের অভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

৫- কুলসোনা কেন্দ্র (বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ)

(প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে)

সম্ভবতঃ ১৮৫৮ সালে সিত্তানা মুজাহিদ কেন্দ্র হ'তে আমীর মাওলানা এনায়েত আলীর (১২০৭-৭৪/১৭৯২-১৮৫৮) নির্দেশক্রমে মাত্র চারজন বাদে অন্যান্য সকল মুজাহিদের দেশে ফেরার পথে রাজশাহীর বাঘমারা থানার চাপড়া গ্রামের বাশিন্দা মাওলানা গাযী নাযীরুদ্দীন এখানে আসেন। এই গ্রামের নাম ছিল তখন গরবতলা। গ্রামের লোক 'গরব' নাম্নী জনৈকা হিন্দু দেবীর পূজা করত। গ্রামে অল্পসংখ্যক মুসলমান ছিল। কিন্তু তারা ও ছিল পথভ্রষ্ট। গাযী মাওলানা নাযীরুদ্দীন তাদেরকে শিরক-বিদ'আতমুক্ত করে তওবা করান। লোকদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১২৭৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৬০ সালে সেখানে একটি মাদরাসা গড়ে তোলেন। গ্রামের নাম রাখলেন 'কুলসোনা' (সকলেই সোনা)। পরে তাঁর ভাতিজা ও জামাতা দিল্লীর মিয়াঁ ছাহেবের ছাত্র খ্যাতনামা আলিম মাওলানা নেয়ামাতুল্লাহ (১২৬৬-১৩৫০বাং/১৮৫৯-১৯৪৩ইং) এই মাদরাসার শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। অবিভক্ত বাংলার বহু ছাত্র এখানে পড়তে আসতেন। মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) একসময় বছর খানেকের জন্য এখানকার ছাত্র ছিলেন। কুলসোনা কোন জিহাদ কেন্দ্র ছিলনা, বরং এটি ছিল আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার কেন্দ্র। বর্ধমান, বীরভূম ও হুগলী জেলায় এই কেন্দ্রের তাবলীগে অধিক সংখ্যক লোক আহলেহাদীছ হন।[৩৩]

৬- সপুরা কেন্দ্র (রাজশাহী, বাংলাদেশ)

(প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে)

মাওলানা এনায়েত আলী (১২০৭-১২৭৪/১৭৯২-১৮৫৮) তাবলীগ ব্যপদেশে এখানে এলে এলাকার প্রভাবশালী সরদার হাজী ঝাবু সরদার ও ঝাগু সরদার তাঁর হাতে বায়'আত হন। ঝাবু সরদারকে তিনি অত্র এলাকায় তাঁর খলীফা নিয়োগ করেন। এই সময় মুসলমানেরা হিন্দুদের মত চাল-চলনে অভ্যস্ত ছিল।

পুরুষেরা হাতে বেড়ী, কানে বালা ও মেয়েদের মত মাথায় লম্বা চুল রাখ্‌ত। ঝাবু সরদার একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন- যা বর্তমানে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। এরপর ৩৬ জাতির হিন্দুরা মুসলমান হয় এবং দ্বিতীয় মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতি সম্প্রতি সেটা ভেঙ্গে ফেলে সেস্থলে তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ) ঢাকা- এর সৌজন্যে ও স্থানীয় মুছল্লীদের সহযোগিতায় বড় নতুন মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। এই মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালস্থিত মেহরাব গাত্র হ'তে যে শিলালিপিটি ১৯৫৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে উদ্ধার করে বর্তমানে রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে,[৩৪] তাতে সাল লেখা আছে ১২১৮ হিজরী। সম্ভবতঃ ঝাবু সরদারের অত্র মসজিদ প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্বে ঐ স্থানে প্রথম মসজিদ শিলালিপি অনুযায়ী জনৈক 'সরদার হাজী' কর্তৃক ১২১৮ হিঃ মোতাবেক ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৩৫]

ঝাবু সরদারের পর তাঁর পুত্র হাজী মুনীরুদ্দীন সর্দারজী হন। তাঁর সময়ে এখানে একটি মাদরাসা কায়েম হয়। ছয় বিঘার একটি পুকুরসহ মোট ২৪ বিঘা জমি বেষ্টিত এই মাদরাসাটি তখন মূলতঃ জিহাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। বর্তমানে পুরাটাই সপুরা সরকারী হাউজিং এষ্টেটের দখলীভুক্ত। রাজশাহী, আত্রাই, জামালগঞ্জ (জয়পুরহাট) প্রভৃতি এলাকার বহু জামা'আত এই কেন্দ্রের প্রভাবাধীন ছিল। এখানে সরাসরি সীমান্তের মূল ঘাঁটি হতে লোক আসতেন। এখানকার বেশ কিছু সংখ্যক গাযীর নাম আমাদের প্রদত্ত তালিকায় উল্লেখিত হয়েছে।[৩৬]

৭- দুয়ারী কেন্দ্র (রাজশাহী, বাংলাদেশ)

(প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯০০ খৃষ্টাব্দ)

রাজশাহী শহর হ'তে সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই কেন্দ্রটি অবস্থিত। বর্তমান কুমিল্লা জেলাধীন বুড়িচং উপজেলার অন্তর্ভুক্ত পারুয়ারা গ্রামের গাযী মাওলানা আকরাম আলী খান (১৮৫৫-১৯৩৭ খৃঃ) আমীর আবদুল্লাহ (১৮৬২-১৯০২)-এর নির্দেশক্রমে অত্রাঞ্চলে তাবলীগে এসে দুয়ারীতে বাংলা ১৩০৭ মোতাবেক ১৯০০ খৃষ্টাব্দে একটি মাদরাসা বনাম 'মুজাহিদ সংগ্রহ কেন্দ্র' স্থাপন করেন। তিনি এখানে লোক ও রসদ জমা করে দিলালপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে

সীমান্তে প্রেরণ করতেন। বাংলা ১৩২৪ সালে তিনি গ্রেফতার হয়ে জেলে যান ও ১১ মাস আটক থাকার পর মুক্তি পান। বাংলা ১৩৪৪ সালের ৮ই কার্তিক সোমবার দিবাগত রাত ১০টায় আমীর রহমাতুল্লাহর সময়ে (১৯২১-১৯৪৯ খৃঃ) ৮২ বছর বয়সে তিনি দুয়ারীতে স্বগৃহে ইন্তেকাল করেন। পাটনার আমীর মাওলানা আবদুল খবীর ছাদিকপুরী (মৃঃ ১৯৭৩ খৃঃ) এখানে একবার সফর করেছিলেন বলে জানা যায়। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে বহু মুজাহিদ সীমান্তে প্রেরিত হয়েছে। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মাওলানা আনোয়ারুদ্দীন ওরফে আব্দুল হাই আনোয়ারী (বাং ১৩২৫-১৩৯৭, সাং- শেরকোল, থানা-বাঘমারা, রাজশাহী) ৭২ বৎসর বয়সে গত ১৯৯০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর রবিবার নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেছেন। বর্তমানে এখানকার মাদরাসাটি আলিয়া নেছাবের দাখেলী মাদরাসা হিসাবে চালু আছে। লাইব্রেরীতে অনেক পুরাতন ও মূল্যবান কেতাবাদি মওজুদ আছে।[৩৭] রাজশাহী, নওহাটা ও বাঘমারার কিছু এলাকা এবং পাবনার শালগাড়িয়া, কুলনিয়া প্রভৃতি এলাকা এই কেন্দ্রের প্রভাবাধীন ছিল।

৮- বিলবাড়ি কেন্দ্র (মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

(প্রতিষ্ঠাকালঃ সম্ভবতঃ ১৮৮০খৃঃ- এর দিকে)

খোশবাগে নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার (১৭৫৬-৫৭খৃঃ)[৩৮] কবরের দেড় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এতদঞ্চলের প্রথম এই 'আহলেহাদীছ' গ্রামটি ক্রমে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। শরীয়তী অনুশাসনের জন্য এই কেন্দ্রের সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কেন্দ্রের আহলেহাদীছদের যাবতীয় সামাজিক ও ধর্মীয় বিচার-ফায়ছালা নিজেদের আলিমদের মাধ্যমেই শরীয়ত অনুযায়ী সমাধা করা হ'ত। বিদ'আতী মুসলমানদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখা হ'ত না। গ্রামের গরীব আহলেহাদীছগণ হিন্দু অথবা বিদ'আতী মুসলমানদের বাড়ীতে মজুর খাটতে গেলে নিজেরা বাড়ি থেকে চিড়া-গুড়-মুড়ি সাথে নিয়ে যেতেন। কিন্তু সেখানে খেতেন না। এই গ্রামে কোন বে-নামাযী ছিলনা। ফরয ছালাতের শেষে হাত উঠিয়ে মুনাজাতের প্রথা ছিলনা। গ্রামে গান-বাজনা, বে-পর্দা, শিরক-বিদ'আত বা কোন অন্যায়-অপকর্ম ছিল না। ২০/২৫ কিঃমিঃ দূরের দীঘা, কেলাই, বাগিড়াপাড়া প্রভৃতি গ্রাম থেকে লোকেরা এই গ্রামে জুম'আ পড়তে আসত।

আলহাজ্জ নূর মুহাম্মাদ ওরফে 'লুদ্দী হাজী', শুক্রুল্লাহ হাজী প্রমুখ ছিলেন এই গ্রামের প্রথম সারির নেতা।[৩৯] ঐতিহাসিক মাড্ডার বাহাছের (১৩০৫হিঃ/১৮৮৭খৃঃ) মূলে ছিলেন এঁরাই।[৪০] পরবর্তীতে নেতৃত্ব দেন হাজী আবুবকর, হাজী আফসার আলী, হাজী দানেশ আলী প্রমুখ। স্থানীয় হিন্দু জমিদার জয়নারায়ণ বিন সূর্যনারায়ণ বিন কালী নারায়ণ একদা গরু কুরবানীর উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে লঙ্কর পাঠালে লুদ্দী হাজী মাত্র ১৫ জন আহলেহাদীছকে নিয়ে অতীব বুদ্ধিমত্তা ও দুঃসাহসের সাথে তাদের মুকাবিলা করেন ও এক প্রকার বিনাযুদ্ধে জমিদার বাহিনীকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করেন।[৪১] সেই থেকে পার্শ্ববর্তী সকল মুসলিম এলাকায় গরু কুরবানী জারি থাকে। এই সময় এই কেন্দ্রকে 'দারুল ইসলাম' এবং এর বহির্ভূত এলাকাকে 'দারুল হরব' বা যুদ্ধ এলাকা বলা হ'ত।

যে সকল বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম এখানে আগমন করেন এবং ইসলামী বিধান মতে জনগণকে পরিচালিত করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন (১) মাওলানা আবদুল্লাহ এলাহাবাদী ওরফে 'আবদুল্লাহ ঝাউ' (মৃঃ সম্ভবতঃ ১৩১৮হিঃ/১৯০০খৃঃ)। মাড্ডার বাহাছের জন্যই তাঁকে আনা হয়। কিন্তু তিনি আর ফিরে যাননি। ১২/১৩ বছর অবস্থানের পর এখানেই মৃত্যু বরণ করেন। বিলবাড়িকে কেন্দ্র করে তিনি সারা মুর্শিদাবাদে ও তৎসন্নিহিত এলাকায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত দিতেন (২) মাওলানা আবদুল্লাহ ডান্ডামার। বোম্বাই হ'তে আগত এই যবরদস্ত আলিম কারুর মধ্যে ইসলাম বিরোধী কিছু দেখ্লে কঠোরভাবে তা দমন করতেন। প্রয়োজনে হাতের লাঠি ব্যবহার করতেন। এজন্য তিনি জনসাধারণের মাঝে 'ডান্ডামার' বলে পরিচিত হন (৩) মাওলানা গুলযার হোসায়েন দেহলভী। ইনি দিল্লী থেকে আসেন ও পার্শ্ববর্তী দোগাছি গ্রামে বসবাস করেন (৪) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন বাঁকিপুরী। মুর্শিদাবাদের বাঁকিপুর থেকে এখানে আসেন। (৫) মাওলানা সুলতান আহমাদ মালদহী (মৃঃ ১৭ই ফাল্গুন ১৩৭৩বাং)। ইনি চাপাই নবাবগঞ্জের রাধাকান্তপুর থেকে এখানে আসেন (৬) এতদ্ব্যতীত রাজশাহীর গোদাগাড়ীর মাওলানা আনীসুর রহমান টিক্রামপুরী এখানে এসে দু'বছর কাটিয়েছেন।[৪২]

বড় বড় আলিম ছাড়াও বহু সাধারণ মুসলমান শারঈ বিধান অনুযায়ী জীবন

পরিচালনার জন্য এখানে হিজরত করে আসতেন। যাদের অনেকেই এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছেন। ঊনবিংশ শতকের শেষদিক হ'তে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা ও তৎসন্নিহিত এলাকায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রসারে বিলবাড়ি কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল বলা চলে। বর্তমানে সেখানে একটি ছোটখাট ইসলামিয়া মাদরাসা চল্‌ছে এবং পৃথক একটি শিশু মাদরাসা সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৪৩]

৯- জামিরা কেন্দ্র (রাজশাহী, বাংলাদেশ)

(প্রতিষ্ঠাকালঃ সম্ভবতঃ ১৮৯০ খৃঃ)

মুর্শিদাবাদের বিলবাড়ি কেন্দ্রের মাওলানা আব্দুল্লাহ এলাহাবাদী ওরফে আব্দুল্লাহ ঝাউ (মৃঃ সম্ভবতঃ ১৩১৮হিঃ/১৯০০খৃঃ) একবার এখানে আগমন করেন ও মাওলানা মুহাম্মাদ বিন কারামাতুল্লাহকে 'খেলাফত' দিয়ে যান। ইনি মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক মাড়ডার বাহাছের (২৪ ও ২৫শে বৈশাখ ১২৬৯ মঙ্গল ও বুধবার মোতাবেক ২৬ ও ২৭শে রবীউছ ছানী ১৩০৫ হিঃ/১৮৮৭ খৃঃ) খ্যাতনামা আহলেহাদীছ মুনাযির ছিলেন।[৪৪] পার্শ্ববর্তী বিলবাড়ি (পোঃ ভট্টবাটি, জেলা-মুর্শিদাবাদ) গ্রামে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সম্ভবতঃ রাজশাহীতে এই কেন্দ্রের খলীফা হিসাবে তিনি জামিরার মাওলানা মুহাম্মাদকে বেছে নেন। মাওলানা মুহাম্মাদ বিন কারামাতুল্লাহ মিয়াঁ ছাহেবের ছাত্র ছিলেন এবং মাড়ডার বাহাছে আহলেহাদীছ পক্ষের অন্যতম মুনাযির হিসাবে যোগদান করেন।[৪৫] অন্যান্য কেন্দ্রের ন্যায় জামিরা কেন্দ্র থেকে ও জিহাদের জন্য লোক ও রসদ প্রেরণ করা হ'ত। এখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় যা এখনও চালু আছে। মাদরাসার লাইব্রেরীতে বহু মূল্যবান কিতাবাদি রয়েছে।[৪৬] কড়া শারঈ অনুশাসনের জন্য জামিরা জামা'আতের খুবই সুখ্যাতি ছিল। পুঠিয়া, তাহেরপুর, মান্দা থানার চককানু প্রভৃতি এলাকা এই জামা'আতের প্রভাবাধীন ছিল।[৪৭]

১০- সোন্দাবাড়ী কেন্দ্র (বগুড়া, বাংলাদেশ)

(প্রতিষ্ঠাকালঃ সম্ভবতঃ ১৮৭০খৃঃ-এর পূর্বে)

বগুড়া শহর হ'তে পূর্বদিকে অন্যূন সাত কিলোমিটার দূরে এই কেন্দ্র অবস্থিত। গাযী আবদুল করীম দুম্‌কাবী নামক জনৈক মুজাহিদ আলিম দিলালপুর কেন্দ্র হ'তে এখানে আগমন করেন ও পার্শ্ববর্তী মেঘাগাছা সরকার বাড়ী জামে মসজিদে 'মারকায' কায়েম করেন। এখানে জিহাদের ট্রেনিং হ'ত না বটে। তবে আশপাশের দশ-বারো গ্রামের ওয়াহ্‌হাবী নেতারা এখানে এসে জুম'আ পড়তেন ও আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা বৈঠক করতেন। কিছুদিন পরে এখান থেকে অর্ধ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে বর্তমান স্থানে সম্ভবতঃ ১৩০৪ হিজরীতে (১৮৮৬ খৃঃ) একটি মাদরাসা কায়েম হয়, যা এখনও আছে। মাদরাসার পাশেই 'মুজাহিদ কবরস্থান' আছে। যেখানে ৯ জন গাযীর নাম (তালিকা ক্রমিক সংখ্যা ৯৫-১০৩ দ্র.) জানা গেছে। এখান থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে দিলালপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে সীমান্তে পাঠানো হ'ত। কখনো সরাসরি সীমান্ত হ'তে লোক এসে নিয়ে যেতেন। শাহ্‌যাদা বরকতুল্লাহ্ এখানে কয়েকবার এসেছেন বলে জানা যায়। বগুড়া জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন ত্বরান্বিত করার জন্য এই কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। স্থানীয় মুজাহিদ নেতা আলে মামূদ তালুকদার হ'তেই এখানে আন্দোলনের সূত্রপাত বলে অনেকে বলেন।[৪৮]

১১- শিমুলবাড়ী (গাইবান্ধা, বাংলাদেশ)

(প্রতিষ্ঠাকালঃ সম্ভবতঃ ১৮৫০খৃঃ-এর পরে)

সিরাজগঞ্জ যেলা শহরের আনুমানিক পাঁচমাইল উত্তর-পশ্চিমে আমীনপুর গ্রামের অধিবাসী জনৈক 'হজ' ছাহেব ও তদীয় পুত্র হাজী আব্দুস সুবহান এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যবসায়িক কারণে তাঁরা এখানে এলেও ধর্মপ্রচারে তাঁরা অধিক সময় ব্যয় করতেন। শিমুলবাড়ী, পাকুল্লা, হুয়াকুয়া প্রভৃতি গ্রামগুলি তাঁদের প্রধান তাবলীগী এলাকা ছিল। তাঁদের ধর্মপ্রচারে মুগ্ধ হ'য়ে গ্রামবাসী বর্তমান মাদরাসার স্থানে তাঁদের জন্য জমি দান করে ও ঘর-বাড়ি করে দেয়। তবে পাকিস্তান আমলের শেষদিকে এই বংশের শেষ ব্যক্তি মৌলবী আব্দুল হামীদ (পীর ছাহেব) আমীনপুর স্বগ্রামে ফিরে গেলে বর্তমানে এখানে তাঁদের আর কেউ নেই। তবে শিমুলবাড়ী মাদারাসা 'ইছলাহুল মুসলেমীন' 'মা'হাদ ওমর বিনুল খাত্ত্বাব' নামে তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ) ঢাকা-এর সৌজন্যে মসজিদ, মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা

সহ একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী কেন্দ্র হিসাবে বর্তমানে উন্নতির দিকে।

শ্রুতি আছে যে, অন্যূন ৪০টি গ্রামের ছাদাকার অর্থ এখানে জমা করে সীমান্তে জিহাদ ঘাঁটিতে পাঠানো হ'ত। কখনো সেখানে কেন্দ্র থেকে লোক এসে নিয়ে যেত। বগুড়ার সারিয়াকান্দি হ'তে গাইবান্ধার ভরতখালি-ফুলছড়িঘাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ আহলেহাদীছ গ্রামগুলিতে বহু 'গাযী' ছিলেন। এখানকার আহ্লেহাদীছদেরকে 'মুহাম্মাদী' বলা হ'ত। 'হজ' ছাহেবকে জমি দানকারীদের একজন বংশধর 'লাল মুহাম্মাদ' জিহাদে গিয়ে আর ফিরে আসেননি।[৪৯]

এই কেন্দ্রের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে জিহাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রসার ঘটে বলে অনুমান করা হয়। শিমুলবাড়ী থেকে এক মাইল দূরে বারকোনা গ্রামের মাওলানা ওয়াসে'উর রহমান ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁর একমাত্র পুত্র সাত দিন বয়সের ইব্রাহীম সরকারকে রেখে জিহাদে গিয়ে আর ফেরেননি।[৫০] পার্শ্ববর্তী কালাইপাড়ার শাফা'আতুল্লাহ আখন্দ স্বীয় গর্ভবর্তী স্ত্রীকে রেখে জিহাদে গিয়ে শহীদ হন।[৫১]

তবে এই কেন্দ্র ছাড়াও এতদঞ্চলে বহু যুদ্ধফেরতা মুজাহিদ-এর আগমন ঘটে। যাঁদের মধ্যে ময়মনসিংহের গাযী মাওলানা আতাউল্লাহ্র নাম সর্বাগ্রে নেওয়া চলে। যিনি জিহাদ হ'তে ফিরে নিজ গ্রামে না গিয়ে শিমুলবাড়ী হ'তে কয়েক মাইল দূরে সাঘাটা থানার অন্তর্গত চিনিরপটল গ্রামে এসে আশ্রয় নেন। ৪৫ বৎসরের এই মুজাহিদের দেহে তখন ২১টি যখমের চিহ্ন ছিল। তিনি এখানে এসে তাঁর চিকিৎসক রহীমুল্লাহ আখন্দের মেয়ে বিবাহ করেন। যার গর্ভে মাওলানা আবদুল বারীর জন্ম হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে পুলিশের নযরে থাকতে হয়। অবশেষে শ্বশুরবাড়ী পার্শ্ববর্তী হলদিয়া গ্রামে তাঁর মৃত্যু হয়।

পুত্র মাওলানা আবদুল বারী ভারতের বিখ্যাত আহলেহাদীছ আলিম মওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী (১৩০৭-৬৯/১৮৮৮-১৯৪৯)-এর ছাত্র ছিলেন। দেশে ফিরে তিনি নিয়মিত ছিহাহ সিত্তাহ্র দরস দিতেন। উর্দূ, ফার্সী, আরবী ভাষায় তিনি সুপন্ডিত ছিলেন। তাঁর সেরা ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা আবদুল কুদ্দূস (নাকাই, গোবিন্দগঞ্জ), মাওলানা ইসহাক্ব (বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া), মাওলানা ইসহাক্ব আলী (হলদিয়া, সাঘাটা), মাওলানা আবদুর রহমান (শিমুলবাড়ী, জুমারবাড়ী)

প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৫২] এতদঞ্চলে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অবদান ছিল অনন্য।

টীকাসমূহ-১৮

১. এই গ্রামে জন্ম গ্রহণকারী ও পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের সভাপতি জনাব আবদুল কাইয়ূম খাঁ (৭৬) ইবনে আবদুছ ছামাদ খাঁ ইবনে গওহর গাযী ইবনে কাযেম খাঁ বলেন 'আমাদের বংশের প্রথম মুসলমান ছিলেন প্রথম আহ্‌লেহাদীছ এবং তা ছিল মাওলানা এনায়েত আলীর আগমনের বহু পূর্বের ঘটনা।'- সাক্ষাৎকার ৩১.১.১৯৮৯ ইং, ঠিকানাঃ ৫২, নারিকেল ডাঙ্গা নর্থ রোড, কলিকাতা-১১ [মৃত্যুঃ ২৮.৮.১৯৯৪ ইং]।

২. মেহের, 'সারগুযাস্তে মুজাহেদীন' পৃঃ ২১৮; (ক) মুফীযুদ্দীন খাঁ (১০৫) জীবনে সাতবার হজ্জ করেন। যার অনেকগুলিই বৃটিশ সরকারের রোষানল থেকে আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। ১০৫ বছর বয়সে তিনি স্বগৃহে ইন্তেকাল করেন। বাংলা ভাষায় 'মুসলিম সাংবাদিকতার জনক' বলে খ্যাত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অকুতোভয় নেতা এই হাকিমপুরেরই অন্যতম কৃতি সন্তান মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খৃঃ) ছিলেন উক্ত মুফীযুদ্দীন খাঁর আপন দৌহিত্র এবং অন্যতম জিহাদ সংগঠক একই গ্রামের মাওলানা আব্দুল বারী খাঁ-র পুত্র (খ) মদন খাঁ সম্পর্কে বিস্তারিত তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে তিনি যে নিঃসন্দেহে একজন দুঃসাহসী যোদ্ধা ছিলেন তার প্রমাণ মেলে হাকিমপুরের নিষ্কর জমিতে জমিদার প্রাণনাথ বাবুর কর বসানোর বিরুদ্ধে তার নেতৃত্বে সশস্ত্র যুদ্ধে জয়লাভের ঘটনা থেকে। উক্ত ঘটনা উপলক্ষে 'মদন খাঁর লড়াই' নামে পুঁথি রচনা করেন যশোরের কবি ছাবেরুদ্দীন দালাল। -তথ্যঃ আখতার খাঁ ইবনে আবদুল জলীল খাঁ (বর্তমান ঠিকানাঃ সাং ও পোঃ কাটিয়াহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।- তাং ১৭.১১.৯৪ ইং।

৩. এই সময় আফগান সীমান্তের মুল্‌কা-সিত্তানা মূল ঘাঁটিকে 'বড় গুদাম' ও পাটনা-কে 'ছোট গুদাম' বলা হ'ত। বৃটিশের গুপ্তচরদের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে মুজাহিদদেরও প্রকৃত নাম পাল্টিয়ে নতুন নাম দেওয়া হ'ত। -নাদবী, হিন্দুস্তান কি পহেলী ইসলামী তাহরীক পৃঃ ৯৬-৯৭। তবে বাংলাদেশে উক্ত মূল ঘাঁটি সর্বদা 'খোরাসান' নামে পরিচিত ছিল (যা মূলতঃ ইরানে অবস্থিত)।

৪. যেমন- সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলাধীন গরালী, রাজাপুর, কলিমাখালি প্রভৃতি গ্রামের 'মোহাম্মদী আহ্‌লেহাদিস'গণ মাওলানা এনায়েত আলীর মুরীদ ছিলেন।'-মাসিক আহ্‌লেহাদিস (কলিকাতাঃ মিসরীগঞ্জ, ১নং মারকুইস লেন), ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৩/১৯১৬ খৃঃ, পৃঃ ৩৩৩, ৩৩৯; ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলাধীন ধানীখোলা গ্রামে মাওলানা এনায়েত আলীর পদার্পণ ঘটে বলে জনশ্রুতি আছে। এখানে তাঁর খলীফা

ছিলেন মাওলানা চেরাগ আলী ও মাওলানা মাহমূদ আলী। এটি ছোটখাট একটি মুজাহিদ কেন্দ্র ছিল। -আবুল মনসূর আহমদ, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (ঢাকাঃ নওরোজ কেতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ১ম মুদ্রণ ১৯৬৮) পৃঃ ৩।

৫. রফীক মন্ডল ওরফে রফী মোল্লার বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ

সাহাস মন্ডল
|
খায়রুল্লাহ

মোহেব্বুল্লাহ — হবুল্লাহ (হাবীবুল্লাহ) — বাদুল্লাহ (ওবায়দুল্লাহ) — বরকতুল্লাহ

(১) রফীক মন্ডল ইবনে বরকতুলাহ

১ম পক্ষঃ (১) কামীরুদ্দীন
(২) আমীরুদ্দীন
(৩) শামসুদ্দীন

(২) তকী মন্ডল ইবনে বরকতুল্লাহ

২য় পক্ষঃ (১) শুকরুদ্দীন
(২) সাখাওয়াতুল্লাহ
(৩) মুহাম্মাদ আলী

(ক) মৌলবী আমীরুদ্দীন ইবনে রফীক মন্ডল

তিন পুত্রঃ-
(১) আব্দুস সুবহান
(২) আব্দুল জলীল
(৩) আব্দুল করীম

(খ) শুকরুদ্দীন গাযী ইবনে রফীক মন্ডল

সাত পুত্রঃ-
১ম পক্ষ ঃ (১) বাছীরুদ্দীন
(২) ইয়াকূব মুন্‌শী
২য় পক্ষঃ (১) আব্দুল গণী
(২) হাসীমুদ্দীন
(৩) নঈমুদ্দীন
(৪) ওছমান আলী
(৫) যিল্লুর রহমান

(গ) আলহাজ্জ সাখাওয়াতুল্লাহ বিন রফীক মন্ডল

পাঁচ পুত্রঃ (১) আনীস মুহাম্মাদ
(২) মাওলানা আব্দুল কাদের
(৩) আলহাজ্জ আব্দুর রঊফ মুন্‌শী
(৪) আলহাজ্জ মোযাফ্‌ফর হোসাইন
(৫) মাওলানা আহমাদ হোসাইন শ্রীমন্তপুরী

(ঘ) মুহাম্মাদ আলী বিন রফীক মন্ডল

চার পুত্রঃ (১) আব্দুল আযীয মন্ডল
(২) মাওলানা আব্দুল হক
(৩) আব্দুছ ছামাদ মন্ডল
(৪) আইয়ূব আলী পন্ডিত

তথ্যদাতাঃ একমাত্র জীবিত পৌত্র মাওলানা আহমাদ হোসাইন শ্রীমন্তপুরী (৭৯)। - হাল সাকিনঃ শ্রীমন্তপুর, তাং ২৮.১.১৯৮৯ ইং।

০ আহমাদ হোসাইন ইবনে সাখাওয়াতুল্লাহ মুনশী ইবনে রফীক মন্ডল ১৩১৭ বাংলা সনে বর্তমান বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ জেলাধীন নারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর

বর্তমান ঠিকানা সাং- শ্রীমন্তপুর, পোঃ- হাটগাছি, থানা- ইটাহার, যেলা- পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

শিক্ষাজীবনঃ জন্মের একবছর পর পিতার মৃত্যু হ'লে বড় ভাই মাওলানা আব্দুল কাদের (১২৮৬-১৩৩৬ বাং)-এর তত্ত্বাবধানে মানুষ হন। প্রথমে গ্রামের মুন্‌শী খবীরুদ্দীনের নিকটে আরবী পড়া শেখেন। তারপর পশ্চিম দিনাজপুরের বংশীহারী থানাধীন বোগলাহার গ্রামে মৌলবী শাহ মুহাম্মাদের নিকটে তিনবছর লেখাপড়া করেন। অতঃপর চাচাতো ভাই মাওলানা আব্দুল হক-এর নিকটে মালদহের খানপুর-গোয়ালপাড়া গ্রামে ৪/৫ বছরে মিশকাত পর্যন্ত পড়েন। ১৩৩২ সালে তিনি বিহারের বিখ্যাত আহ্‌লেহাদীছ প্রতিষ্ঠান 'দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ' দারভাঙ্গা-তে ভর্তি হন। একবছর পর সেখান থেকে দিল্লীর দারুল হাদীছ রহমানিয়াতে চলে যান। সেখানে মিশকাতসহ তিনবছর পড়ার পর ভাইয়ের হুকুমে দারুল উলূম দেউবন্দে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে পাঁচবছর পরে ফারেগ হন।

কর্মজীবনঃ দেশে ফেরার পর ভাইয়ের পক্ষ হ'তে 'সরদারজী'র দায়িত্ব তাঁর উপরে ন্যস্ত হয়। ফৎওয়া-ফারায়েয, ওয়ায-নছীহত, বিবাদ মীমাংসা ইত্যাদি জামা'আতী কাজেই তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। বর্তমানে বৃদ্ধ বয়সে ও তিনি সর্বদা জামা'আতী কাজে ছুটাছুটি করে থাকেন। আরবী ভাষায় তাঁর প্রচুর দখল রয়েছে। ভাল বক্তা হিসাবে সর্বত্র নাম রয়েছে। হাল্‌কা দোহারা গড়নের প্রখর ধীশক্তি সম্পন্ন এই কর্মী পুরুষ বলেন, আমার আমল পর্যন্ত আমরা নিয়মিত ভাবে বায়তুল মালের সিকি অংশ মুজাহিদ ফান্ডে জমা দিয়ে পাটনা প্রেরণ করেছি। ১৯৪৭-এর পরে তা বন্ধ হয়েছে। এখন সেটা আমরা স্থানীয়ভাবে ব্যয় করি। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, বিহারের ছাহেবগঞ্জ, পূর্ণিয়া এমনকি নেপালের ঝাপ্‌পা, ভদ্রপুর থানা পর্যন্ত তাঁর তাবলীগী ও সাংগঠনিক এলাকা বলে তিনি জানান।

১৩২২ বাংলা সনে নদীভাঙ্গনের কারণে তাঁর ভাইয়েরা বাংলাদেশের নারায়ণপুর হ'তে বর্তমান ঠিকানায় হিজরত করেন।-তথ্যঃ ২৮.১.৮৯ ইং শ্রীমন্তপুর বাসস্থান থেকে।

৬. হান্টার-এর বই প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে। তার প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে নারায়ণপুর কেন্দ্রে তৎপরতা শুরু হয় এবং ১৮৪৩ সালে এই কেন্দ্রের অনুগামী সংখ্যা আশি হাযারে উন্নীত হয় বলে তিনি রিপোর্টে উল্লেখ করেন (ঐ পৃঃ ৬৬, ৮৪-৮৫)। সে হিসাবে এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৪০-এর কিছু আগে পিছে হবে বলে অনুমিত হয়।

৭. হান্টার রফী মোল্লাকে বেলায়েত আলী প্রেরিত খলীফা আবদুর রহমান লাক্ষ্ণৌবীর চাঁদা আদায়কারী ও সিকি অংশ পারিশ্রমিক ভোগী নিম্নশ্রেণীর চাষী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। -দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স (অনুবাদ) পৃঃ ৬৬। অথচ বেলায়েত আলীর ভাতিজা ও কালাপানির বন্দী আব্দুর রহীম ছাদেকপুরী লিখিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বাংলাদেশে বেলায়েত আলীর খলীফা হিসাবে একমাত্র মাওলানা এনায়েত আলীর নাম পাওয়া যায়। -তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ পৃঃ ৯৮।

৮. (ক) মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (৬৩) ইবনে নূরুল হক ইবনে ইয়াকূব মুন্শী ইবনে শুকরুদ্দীন গাযী ইবনে রফী মোল্লা। হাল সাকিনঃ পাকা বাবলাবোনা পোঃ- রাধাকান্তপুর, থানা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাপাই নবাবগঞ্জ।-তাং ২৮-১১-৮৭ ইং (খ) দোস্ত মুহাম্মাদ (৭০) বিন বাছীরুদ্দীন মোল্লা বিন শুকরুদ্দীন গাযী বিন রফী মোল্লা। সাং ও পোঃ কানসাট, থানা- শিবগঞ্জ, চাপাই নবাবগঞ্জ।-তাং ১৬-১২-৮৭ ইং। দোস্ত মুহাম্মাদ ছাহেবের পুত্র জনাব মুযযাম্মিল হক বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক। (গ) মাওলানা আহমাদ হোসায়েন শ্রীমন্তপুরী (৭৯) ইবনে হাজী সাখাওয়াতুল্লাহ বিন রফী মোল্লা। হাল সাকিনঃ শ্রীমন্তপুর, পোঃ- হাটগাছি, থানা- ইটাহার, জেলা- পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। তাং ২৮-১-৮৯ ইং। (ঘ) মাওলানা জামালুদ্দীন (৪২) বিন গিয়াছুদ্দীন মাষ্টার বিন রহমাতুল্লাহ বিন আব্দুস সুবহান বিন মৌলবী আমীরুদ্দীন বিন রফী মোল্লা। হাল সাকিনঃ নারায়ণপুর পোঃ আগলই যেলা- ছাহেবগঞ্জ, বিহার। -তাং ১০.২.৮৯ইং। মৌলবী আমীরুদ্দীনের ৩য় পুত্র আব্দুল করীমের বংশধরও বর্তমানে উক্ত এলাকায় বসবাস করেন। (ঙ) বাহার আলী মোল্লা (৬৮) ইবনে মাহ্তাবুদ্দীন বিন আব্দুল জলীল বিন মৌলবী আমীরুদ্দীন বিন রফী মোল্লা। সাং-পশ্চিম আনারপুর পোঃ বাঙ্গাবাড়ী, যেলা- চাপাই নবাবগঞ্জ। -তাং ২৫-৩-৯৪ ইং।

৯. ৪১০-১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১০. মাওলানা শ্রীমন্তপুরী, তাং ২৮.১.৮৯ ইং।

১১. হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স (অনুবাদ) পৃঃ ৬৬-৬৭; শ্রীমন্তপুরীর বক্তব্য, তাং ২৮.১.৮৯ ইং।

১২. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৪-৮৫।

১৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৭; খ্যাতনামা লেখক মাসঊদ আলম নাদবী (১৯১০-৫৪ খৃঃ) হান্টার-এর বরাতে আমীরুদ্দীনকে পাটনা থেকে প্রেরিত মুবাল্লিগ আবদুর রহমান-এর পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। -ঐ, 'হিন্দুস্তান কি পহেলী ইসলামী তাহরীক' পৃঃ ১১৮। অথচ হান্টার তার রিপোর্টে আমীরুদ্দীনকে রফীক মন্ডলের ছেলে বলেই উল্লেখ করেছেন। -ঐ, দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স (অনুবাদ) পৃঃ ৬৬-৬৭।

১৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৫।

১৫. কালাপানির ইতিহাস-এর খ্যাতনামা লেখক মৌলবী জাফর থানেশ্বরীর (মৃঃ ১৯০৫ খৃঃ) মতে আমীরুদ্দীন পাবনায় স্বীয় বাড়ীতে গ্রেফতার হন। ঐ, 'তাওয়ারীখে আজীব' (দিল্লীঃ মুস্তানছির প্রেস, তাবি। লেখনীকাল ১২৯৬ হিঃ/১৮৭৯ খৃঃ) পৃঃ ৪৯,৭৬। তবে আমীরুদ্দীনের ভাতিজা আহমাদ হোসায়েন শ্রীমন্তপুরীর মতে তিনি নারায়ণপুর মারকাযের নিকটবর্তী শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত তেররশিয়া-দুর্লভপুর অঞ্চলে তাবলীগের জামা'আত নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে গ্রামের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বাড়ীতে দাওয়াত হয়। খানাপিনার সময় বাড়ীওয়ালা প্রথানুযায়ী তার প্রথম সন্তানসম্ভবা পুত্রবধুর জন্য তার বাপের

বাড়ী হ'তে প্রেরিত বিশেষভাবে তৈরী বিরাট আকারের গুড়ের 'বাতাসা' ওনাকে খেতে দেন। তিনি ওটাকে বিদ'আত বলে পরিত্যাগ করেন। এতে বাড়ীওয়ালা ক্ষুব্ধ হন এবং স্থানীয় থানার মুসলমান দারোগা মুর্তযা এবং জনৈক নুরু ফকীরের বাপ ওমর ফকীর-এর মাধ্যমে গোপনে স্থানীয় ইংরেজ প্রতিনিধিকে জানিয়ে দেন যে, এই ব্যক্তি রাজদ্রোহ প্রচার করেন এবং 'খোরাসানে' টাকা পাঠান। ফলে তিনি সেখানেই গ্রেফতার হন এবং জিজ্ঞাসাবাদে সবকিছু অকপটে স্বীকার করেন। তাঁর সরলতায় মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট উকিলের মাধ্যমে তাঁকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাজদ্রোহের বিষয়টি অস্বীকার করতে ইংগিত করেন, যাতে তাঁকে 'পাগল' বলে ছেড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তিনি রাযী হননি। তাঁর বিচার কলিকাতা হাইকোর্টে প্রেরিত হ'লে সেখানে তাকে ফাঁসির আদেশ শুনানো হয়। এতে খুশী হ'য়ে জোরে 'আল-হাম্‌দুলিল্লাহ' বলে উঠ্‌লে উক্ত আদেশ রদ করে কালাপানিতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হয়।' -ঐ, তাং ২৮.১.১৯৮৯ ইং। এটা পরিষ্কার যে, তাঁর বাড়ী কখনোই পাবনায় ছিলনা এবং পাবনায় তিনি গ্রেফতার ও হননি। তাছাড়া নারায়ণপুর মারকায ও তৎসন্নিহিত এলাকতখন মালদহ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৬. মাসঊদ আলম নাদবী, 'হিন্দুস্তান কি পহেলা ইসলামী তাহ্‌রীক' পৃঃ ১১৯।

১৭. জাফর থানেশ্বরী, 'তাওয়ারীখে আজীব' পৃঃ ৭৭।

১৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮২; নাদবী, 'পহেলী তাহ্‌রীক' পৃঃ ১৩১ পাদটীকা।

১৯. নাদবী, 'পহেলী তাহ্‌রীক' পৃঃ ১১৭।

২০. মাওলানা শ্রীমন্তপুরীর বক্তব্য থেকে। তাং ২৮-১-১৯৮৯ ইং; হান্টার- এর পূর্বসূরী রাভেন্‌শা-এর বরাতে মাসঊদ আলম নাদবী রফীক মন্ডলের আলোচনায় উল্লেখ করেন যে, 'তার পুত্র শুকুর মুহাম্মাদ আজকাল সিত্তানা কেন্দ্রে অবস্থান করছে। আরেকজন পুত্র যার নাম জানা নেই বর্তমানে নিজ এলাকায় তাবলীগ ও চাঁদা আদায়ের কাজে লিপ্ত আছে।' -'পহেলী তাহ্‌রীক' পৃঃ ১১৮। সম্ভবতঃ উক্ত শুকরুদ্দীনকেই 'শুকুর মুহাম্মাদ' বলা হয়েছে। কারণ ঐ সময় সকল মুজাহিদ একাধিক ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।

২১. রফী মোল্লার পৌত্র মাওলানা আহমাদ হোসাইন শ্রীমন্তপুরীর (৭৯) বক্তব্য অনুযায়ী রফী মোল্লা নিজহাতে ইবরাহীম মন্ডলের মাথার টিকির চুল কেটে 'আহলেহাদীছ' করেন এবং তাঁকে ঐ এলাকার দায়িত্বশীল হিসাবে বায়'আত নেন। এর ফলে ইবরাহীম মন্ডলের দুই মেয়ের বিবাহ সংকট দেখা দিলে রফী মোল্লা নিজের দুই ছেলে কামীরুদ্দীন ও শামসুদ্দীনের সাথে তাদের বিয়ে দেন। -তাং ২৮.১.৮৯ ইং।

২২. মাওলানা শ্রীমন্তপুরীর বক্তব্য; মাওলানা আবদুল হান্নান দিলালপুরীর (১৮৯৫-১৯৮২) বরাতে মাওলানা মুহাম্মাদ হুমায়ূন রেযা (৫৭) ছদর মুদার্রিস, জামে'আ রহমানিয়া ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ; সাং হাযারপুর, পোঃ কুলী, মুর্শিদাবাদ তাং ২৪-১-৮৯ ইং। মাদরাসার প্রতিষ্ঠাকাল ১২৯৪ হিঃ মোতাবেক ২৫শে এপ্রিল ১৮৭৫ বলা হয়ে থাকে (মাসিক আহলেহাদীস ৩য় বর্ষ ১০/১১ সংখ্যা আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৫; ১নং মারকুইস

লেন, কলিকাতা-১৬)। ১৮৭০ সালের অক্টোবর মাসে 'রাজমহল মোকাদ্দামা' শুরু হয় ও ইবরাহীম মন্ডল অতিবৃদ্ধ বয়সে গ্রেফতার হয়ে মৌলবী তাবারক আলী প্রমুখসহ ১৮৭২ সালের মার্চে কালাপানিতে নীত হন (থানেশ্বরী, তাওয়ারীখে আজীব পৃঃ ৭৬-৭৭) এবং থানেশ্বরীর মতে চার বছর পরে ও নাদ্‌বীর বর্ণনামতে ১৮৭৮ সালে কলিকাতার আমীর খান চামড়া ব্যবসায়ীর সাথে তিনি একত্রে মুক্তি পান (নাদবী, পহেলী তাহরীক পৃঃ ১২০)। লেখকের মতে থানেশ্বরীর বক্তব্যই সঠিক। সে হিসাবে মাদরাসার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭০-এর পূর্বে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

২৩. এই সময় আয়ের প্রধান উৎস ছিল 'মুষ্টিচাউল'। ১৯৪৭ সাল থেকে দিলালপুরে জিহাদী তৎপরতা বন্ধ হ'য়ে গেলেও উক্ত মুষ্টিচাউলের সিলসিলা আজও কিছু কিছু চালু আছে- যা মাদরাসা পরিচালনা, দ্বীনী প্রচার ও প্রকাশনা প্রভৃতি খাতে ব্যয় করা হয়। এছাড়াও মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফ জমি আছে ২৫০ বিঘা। -তথ্যঃ মাওলানা হুমায়ূন রেযা, তাং- ২৪-১-৮৯ ইং।

২৪. তথ্যঃ দুয়ারী কেন্দ্রের পীর আহমাদ আলী খান (৯৪) পোঃ-ললিতগঞ্জ, থানা- পবা, রাজশাহী তাং ১১-১২-৮৭ ইং ; আনছারুর রহমান সরকার (৮০) সর্দার, জামা'আতে মুজাহেদীন বগুড়া, সাং- সোন্দাবাড়ী, পোঃ ও থানা- গাবতলী, বগুড়া তাং- ২৬-১১-৮৯ ইং।

২৫. আলহাজ্জ মাওলানা মানছুরুল হক (সাং- চাঁদপুর পোঃ- আগলই যেলা- ছাহেবগঞ্জ, বিহার) ১৯৫১ সালে সরদহ সফরে এলে স্থানীয় খাসমহল গ্রামের সরদার তাঁকে জানান যে, দিলালপুরের রহীম বখ্‌শ মন্ডলজী ও মাওলানা আহমাদুল্লাহ আমাদের এখানে এসে আমাদেরকে শিরক ও বিদ'আত থেকে তওবা করিয়ে 'আহলেহাদীছ' করে গেছেন। এতদঞ্চলে দিলালপুর থেকে অন্যান্য মুবাল্লিগরাও এসেছেন।-তথ্যঃ মাওলানা ইসহাক মাদানী (৩৬) সাং ইছাখালী পোঃ কুলগাছি, মুর্শিদাবাদ। তাং ১৩-১১-৮৯ ইং।

২৬. (ক) মৌলবী ফযলুর রহমান আইয়ূবী (৫৬) পিতা-মুন্‌শী মুহাম্মাদ আইয়ূব আলী মালীথা সাং- খয়েরসূতি পোঃ- দোগাছি থানা- সুজানগর জেলা- পাবনা। (খ) মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম (৪৮) সাং শালগাড়িয়া, পাবনা শহর, পাবনা। তাং ১.১২.৮৯ ইং। (খ) হেকীম মৌলবী আবুল বাশার ওরফে মানিক মাওলানা (৯৮), শালগাড়িয়া, পাবনা -তাং ৩০-১০-৮৮ ইং।

২৭. নাদবী, পহেলী তাহরীক পৃঃ ১১৭, ১১৯।

২৮. মাওলানা হুমায়ূন রেযা (৫৭), ছদর মুদার্রিস জামে'আ রহমানিয়া, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ। তাং ২৪.১.৮৯ ইং।

২৯. প্রাগুক্ত ও মাওলানা ইসহাক মাদানী।-তাং ২৪. ১. ৮৯ইং।

৩০. মাওলানা ইসহাক মাদানী।-তাং ১৩.১১.৮৯ ইং।

৩১. তথ্যঃ মাওলানা হযরত আলী, সাং হরিহরা পোঃ- শ্রীকুন্ড জেলা- ছাহেবগঞ্জ। মারফতঃ

মাওলানা ইসহাক মাদানী (মুর্শিদাবাদ) তাং- ১৩.১১.৮৯ ইং।

৩২. মাদরাসার বার্ষিক মুখপত্র 'আল-মুসলেহ' ১৯৮৭ খৃঃ হ'তে সংগৃহীত। দিলালপুরের অধিকাংশ তথ্য বিভিন্ন সূত্রের মৌখিক ও লিখিত বরাতে মাওলানা ইসহাক মাদানী (৩৬) সাং- ইছাখালি পোঃ কুলগাছি জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।-তাং ১০.২.৮৯ ও ১৩.১১.৮৯ ইং। -তথ্যদাতা মাওলানার মোট বয়স ৬০ বৎসর ও চাকুরীকাল (১৫+৩২+১) মোট ৪৮ বৎসর লিখেছেন। সে হিসাবে মাত্র ১২ বৎসর বয়সে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। হিসাবটি ভুল মনে হওয়ায় মধ্যবর্তী চাকুরীকাল ২২ বৎসর লেখা হ'ল। সঠিক খবর আল্লাহ জানেন।-লেখক।

৩৩. মোহাম্মদ নেয়ামাতুল্লাহ, 'ধোকাভঞ্জন' (বর্ধমানঃ ঐ জেলা জমঈয়তে আহ্লেহাদীস, ২য় সংস্করণ ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ খৃঃ) পৃঃ অ, আ ; মৌলবী মোযাম্মেল হক (৬০) সাং- কুলসোনা পোঃ-ভালগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, পঃ বঙ্গ, ভারত, তাং ১৭.১.৮৯ ইং,; মৌলবী ইউনুস সাং- মনমোহনপুর পোঃ- বিনুড়িয়া জেলা- বীরভূম। তাং- ১৮.১.৮৯ ইং।

৩৪. ক্রমিক সংখ্যা ১৮৮৭, বরেন্দ্র জাদুঘর রাজশাহী, সংগ্রহঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯।

৩৫. ঝাবু সরদারের মসজিদের ছবি, পরিশিষ্ট ৬নং ছবি দ্রষ্টব্য।

৩৬. মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ মিঞা (৬৭), আবুল কালাম আযাদ (৪৮) ও অন্যান্য। সর্বসাকিনঃ সপুরা মিয়াঁপাড়া পোঃ সপুরা, রাজশাহী। তাং -৬.৩.৮৯ ইং ; তালিকা ক্রমিক সংখ্যা ৯২-৯৪ পৃঃ ৪০৩।

৩৭. তথ্যঃ গাযী আকরাম আলী খানের পুত্র ও বর্তমান পীর মৌলবী আহমাদ আলী খান (৯৪), পৌত্র যিল্লুর রহমান (৬১) ও অন্যান্য। সাং দুয়ারী পোঃ- ললিতগঞ্জ, উপজেলা-পবা, রাজশাহী।-তাং ১১.১২.৮৭ ইং।

৩৮. বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন নওয়াব তুর্কী বংশোদ্ভূত মির্যা মুহাম্মাদ আলী ওরফে নওয়াব আলীবর্দী খাঁর (১৭৪০-৫৬খৃঃ) মৃত্যুর পরে তদীয় দৌহিত্র মির্যা মুহাম্মাদ আলী ওরফে নওয়াব সিরাজুদ্দৌলা (১৭৩৩-৫৭) মাত্র এক বছর দেশ শাসন করার পর ক্ষমতালোভী নিকটাত্মীয় বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রে রাজধানী মুর্শিদাবাদ হ'তে ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর তীরে পলাশীর আম্রকাননে এক প্রকার বিনাযুদ্ধে পরাজিত হন (২৩শে জুন সকাল সাড়ে ১০টা হ'তে ১১টা)। নৌকায় সপরিবারে পলায়নপর নিঃস্ব ক্ষুধার্ত নওয়াবকে রাজমহল হ'তে গ্রেফতার করে মুর্শিদাবাদ এনে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর মুহাম্মাদী বেগকে দিয়ে হত্যা করা হয় (২৫শে জুন ১৭৫৭)। অতঃপর পার্শ্ববর্তী খোশবাগে সমাহিত করা হয়। -ডঃ সৈয়দ মাহমূদুল হাসান, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' পৃঃ ৪৭৯, ৮০, ৮৭, ৯০।

৩৯. একটি ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে লুদ্দী হাজী বিন বক্তার মন্ডল প্রথম 'আহলেহাদীছ' হন বলে জনশ্রুতি আছে। গ্রামের সমস্ত হানাফী মুসলমান মিলিতভাবে কোন এক উপলক্ষ্যে গ্রামে একটি ভোজ উৎসবের আয়োজন করে। কিন্তু হাজী ছাহেবের ৮টি পুত্র সন্তান থাক্লেও কোন কন্যা সন্তান না থাকায় তাঁকে উৎসব হ'তে বাদ দেওয়া হয়। কারণ হিসাবে বলা হয়

যে, হাজী ছাহেব সকলের মেয়ে নিবে অথচ আমরা তার মেয়ে পাব না'। এতে ক্ষোভে দুঃখে তিনি হানাফী সমাজ ত্যাগ করেন ও 'আহ্‌লেহাদীছ' হন। তবে কার হাতে বায়'আত করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তার পরপরই শুক্‌রুল্লাহ হাজী 'আহলেহাদীছ' হন। লুদ্দী হাজীর বংশে মৌলবী আবদুর রহমান (৪৫) বিন মুন্সী হারূনুর রশীদ বিন ইয়াকূব বিন জামালুদ্দীন বিন লুদ্দী হাজী এখনো বেঁচে আছেন। শুক্‌রুল্লাহ হাজীর বংশে তার দৌহিত্র 'হারকেল সাহেব' (৭২) বেঁচে আছেন।- মাওলানা আবদুল্লাহ বিন ইসমাঈল (৩২) শিক্ষক, ভাবতা ইসলামিয়া মাদরাসা পোঃ ভাবতা, জেলা- মুর্শিদাবাদ (সাং হল্‌দী পোঃ সাগরদীঘি জেলা-মুর্শিদাবাদ)।- তাং ২৩.৩.৮৯ইং।

৪০. ৯ম অধ্যায়ে ৫৪নং টীকা দ্রষ্টব্য। মুনশী ফছিহুদ্দীন, 'ছায়ফল মোমেনিন' পৃঃ ৬-৭।

৪১. জমিদার জয়নারায়ণ লুদ্দী হাজীর বাড়ীতে হামলা করার ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও যথাসময়ে না আসায় কয়েকদিন অপেক্ষার পর সবাই যার যার বাড়ী চলে যায়। এরি মধ্যে হঠাৎ করে জমিদার বাহিনী এসে পড়ে। তখন অবশিষ্ট মাত্র ১৫ জন আহ্‌লেহাদীছকে লুদ্দী হাজী নতুন নতুন পোষাক পরিয়ে কয়েকবার বাড়ীর বাহির দরজা দিয়ে যাতায়াত করান। এতে লুদ্দী হাজীর ব্যাপক লোক-লস্কর কল্পনা করে ভীত হ'য়ে জমিদার বাহিনী পিছপা হয়। তখন লুদ্দী হাজীর নির্দেশে পিছন থেকে কয়েকজনকে ধরে যখম করে দিলে বাকীরা সব দৌড়ে পালিয়ে যায়।- মাওলানা মুহাম্মাদ আলী (৭০), শিক্ষক, লালগোলা ইসলামিয়া মাদরাসা।- তাং ২৩.১.৮৯ ইং।

৪২. বিলবাড়ি জামে মসজিদের বাউন্ডারি পাচিলের পূর্বপ্রান্তে মাওলানা আবদুল্লাহ ঝাউ-এর কবর আছে। মাথায় ঝাক্‌ড়া বাবরী চুল থাকার কারণে লোকেরা তাঁকে 'ঝাউ' বল্‌ত। একবার এলাহাবাদ হ'তে তাঁর ছেলে তাঁকে নিতে এলে 'আহ্‌লেহাদীছ' না হওয়ার কারণে ফিরে যাননি। এমনকি বিদ'আতী হওয়ার কারণে ছেলেকে পুকুরে যেয়ে পানি পান করতে বলেন। মাওলানা 'ডান্ডামার' ও মাওলানা সুলতান মালদহীর কবর উপরড্যাহাতে এবং মাওলানা ইয়াসীন বাঁকিপুরীর কবর ফুলবাড়িতে আছে।- প্রাগুক্ত।

৪৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আলী (৭০), শিক্ষক, লালগোলা ইসলামিয়া মাদরাসা; মাওলানা মুমতাযুদ্দীন (৭০) 'বুলূগুল মারাম'- এর অনুবাদক ও অনেকগুলি ধর্মীয় বইয়ের লেখক। লালগোলা বাজার, জেলা- মুর্শিদাবাদ; মৌলবী মেছবাহুদ্দীন (৫০) ঐ পুত্র। -তাং ২৩.১.১৯৮৯ইং।

৪৪. মুন্‌শী ফছিহুদ্দীন (মৃঃ সম্ভবতঃ ১৩০৭ বাংলা মোতাবেক ১৯০০ খৃঃ) সাং বড় চাঁদঘর পোঃ- ঐ, যেলা-নদীয়া প্রণীত মাড়্‌ডার বাহাছনামা 'ছায়ফল মোমেনিন' (কলিকাতাঃ ২য় সংস্করণ বাংলা ১৩৩১ সাল) পৃঃ ৫।

৪৫. মাওলানা সাঈদ বেনারসী (সম্পাদকঃ নুছরাতুস সুন্নাহ), 'কায়ফিয়াতে মুনাযারায়ে মুর্শিদাবাদ' (বেনারসঃ সাঈদুল মাতাবে প্রেস, সালবিহীন) পৃঃ ৩।

৪৬. তথ্যঃবর্তমান 'উপর সর্দার' মৌঃ ইয়াহ্‌ইয়া (৫৮) বিন যাকারিয়া বিন মুহাম্মাদ বিন

কারামাতুল্লাহ সাং ও পোঃ- জামিরা, উপজেলা- পুঠিয়া, রাজশাহী। তাং- ১৪.১২.৮৭ ইং।

৪৭. তথ্যঃ মুণীরুদ্দীন মণ্ডল (৭৮) সাং- ভরট্ট, পোঃ- নাছীরগঞ্জ, থানা- বাঘমারা, রাজশাহী। তাং- ১.২.৯১ ইং।

৪৮. মুন্‌শী খলীলুর রহমান (৮২) সাং ও পোঃ বাইগুণী, উপজেলা- গাবতলী, বগুড়া- এর লিখিত ডায়েরী হ'তে। পৃঃ ১৯৩; মুনশী ছাহেব স্বীয় ডায়েরীতে 'আবদুল করীম দুমকাবী' লিখেছেন এবং মাদরাসার প্রতিষ্ঠাকাল ১২০৪ হিঃ লিখেছেন। (আমরা মনে করি নেতা ও কর্মী হিসাবে মাওলানা আবদুল করীম দুমকাবী ও আলে মামূদ তালুকদার দু'টি নামই ঠিক আছে। তবে ১২০৪ হিজরীর স্থলে সম্ভবতঃ ১৩০৪ হিঃ মোতাবেক ১৮৮৬ খৃঃ হতে পারে।-লেখক)।-তাং ২৬.১১.৮৮ ইং; ঐ পৌত্র আনছারুর রহমান সরকার (৮০), বর্তমান সর্দার জামা'আতে মুজাহেদীন, বগুড়া। সাং- সোন্দাবাড়ী পোঃ- গাবতলী, বগুড়া। -তাং ২৬.১১.৮৯ ইং; মাহবূবুর রহমান সরকার (৮০) সাং মেঘাগাছা সরকারবাড়ী পোঃ সাবগ্রাম, সদর উপজেলা, বগুড়া। তাং ২৬.১০.৯১ ইং।

৪৯. তথ্যঃ (ক) মাওলানা আবদুর রহমান (৬২), মুহতামিম শিমুলবাড়ী মাদরাসা ইছলাহুল মুসলেমীন, পোঃ- বারকোনা, গাইবান্ধা (খ) আবদুস সুবহান আখন্দ (গ) এমদাদুল হক বি.এস.সি, প্রদর্শক বোনারপাড়া মহাবিদ্যালয় (ঘ) সেকান্দার আলী আখন্দ (ঙ) রফীকুর রহমান। সর্বসাকিনঃ শিমুলবাড়ী। তাং- ১৩.১০.৮৯ ইং (চ) ইমাযুদ্দীন আখন্দ ফারাযী (৮০), সাং- ভরতখালি (সগুনা), পোঃ ভরতখালি, থানা- সাঘাটা, জেলা- গাইবান্ধা। তাং- ১৩.১০.৮৯ ইং।

৫০. মুহাম্মাদ রেযাউল করীম, প্রভাষক সরকারী এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।- তাং- ২২.১০.৮৯ইং।

৫১. আবদুস সালাম আখন্দ (৫৫), সাং- চিনিরপটল, সাঘাটা। তাং- ১৩.১০.৮৯ইং।

৫২. তথ্যঃ মাওলানা আবদুর রহমান (৬২), মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (৫৫) মুহ্‌তামিম, ফুলবাড়ি এশা'আতুল ইসলাম মাদরাসা (গোবিন্দগঞ্জ), মাওলানা আব্দুর রশীদ বিন মাওলানা আবদুল কুদ্দূস (গোবিন্দগঞ্জ), আবদুস সালাম আখন্দ (চিনিরপটল) এবং রহীমুল্লাহ আখন্দ-এর পৌত্র (হলদিয়া, পোঃ- ডাকবাংলা, থানা- সাঘাটা, গাইবান্ধা)। তাং- ১৩.১০.৮৯ ইং।

বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় উলামা

قادة علماء التحريك فى بنغلاديش

১- মাওলানা নেয়ামাতুল্লাহ (১২৬৬-১৩৫০বাং/১৮৫৯-১৯৪৩খৃঃ)ঃ

মাওলানা নেয়ামাতুল্লাহ বিন যয়নুদ্দীন আনুমানিক বাংলা ১২৬৬ সালে বাংলাদেশের রাজশাহী যেলার বাঘমারা উপযেলাধীন চাপড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃহারা হ'য়ে তিনি ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান যেলার কুলসোনাতে বসতি স্থাপনকারী চাচা মাওলানা গাযী নাযীরুদ্দীন-এর নিকটে চলে আসেন ও ১২৭২ সনে চাচার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় পড়াশুনা শুরু করেন। এরপর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন শেষে দিল্লীতে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২)-এর মাদরাসায় ভর্তি হন। অতঃপর ভূপালে গিয়ে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-১৮৯০)-এর বিরাট পাঠাগারে দীর্ঘ দু'বছর নীরব গবেষণায় রত থাকেন। বাংলা ১৩১৪ সনে দেশে ফিরে কুলসোনা মাদরাসা ইসলামিয়ার 'শায়খুল হাদীছ' রূপে শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। ইতিপূর্বে তিনি তাঁর চাচার জামাতা হিসাবে বরিত হন। শিক্ষকতা গ্রহণের সাথে সাথে চারিদিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। দূর-দূরান্ত হ'তে বহু জ্ঞানপিপাসু ছাত্র তাঁর দরসগাহে হাযির হ'তে থাকে। এর মাধ্যমে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। উভয় বাংলায় তাঁর অসংখ্য ছাত্র বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলনের দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করেন। মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খৃঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম।[১] ১৩৫০ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে মাদরাসার নাম রাখা হয় 'ফায়যে নেয়ামত'। পরে মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে 'কল্যাণঘর' নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়েছে। এখানেই মাওলানা ছাহেব-এর মূল্যবান লাইব্রেরী ছিল ও এখানেই তিনি অধিকাংশ সময় কাটাতেন। বর্তমান পাকা ঘরবিশিষ্ট মাদরাসাটি তাঁর জামাতা মাওলানা সা'দ ঈমানী কর্তৃক সম্ভবতঃ বাংলা ১৩৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার আধুনিক রূপ। ১৩২১ সালে 'বাংলা-আসাম আঞ্জুমানে আহলেহাদিস' গঠিত হ'লে তিনিই এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। রাফ্উল ইয়াদায়েন সম্পর্কিত 'ধোকাভঞ্জন' বইটি তাঁর একমাত্র প্রকাশিত বই।[২]

২- মাওলানা আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২ খৃঃ)ঃ

পশ্চিম বঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার চন্ডিপুর গ্রামে মাওলানা আব্বাস আলী বিন তামীযুদ্দীন বাংলা ১২৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতনামা আলিম ও বাগ্মী চাচা মাওলানা মুনীরুদ্দীনের নিকটে আরবী, ফার্সী শিক্ষা করেন। অতঃপর বিভিন্ন মাদরাসায় পাঠ শেষে টাংগাইলের করটিয়া (নাকি দেলদুয়ার- লেখক) জমিদার বাড়ীর মাদরাসায় মাওলানা আবদুর রহমান কান্দাহারীর নিকটে দীর্ঘ ১৫ বৎসর যাবত শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষাশেষে ঐ মাদরাসাতে ১৫ বৎসর শিক্ষকতা করেন। তারপর স্বগ্রামে ফিরে দেশবাসীকে হেদায়াত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

মাওলানা আব্বাস আলীর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল লেখনীর ক্ষেত্রে। তাঁর রচিত 'মাসায়েলে যরূরিয়া' বা দৈনন্দিন যরূরী মাসআলাসমূহ বইটি আহলেহাদীছদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি শিরকের বিরুদ্ধে ও তাওহীদের পক্ষে 'বারকুল মুওয়াহ্‌হেদীন' লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। পাটনার দানশীল হাজী আবদুল্লাহ্ (১৮৪০-১৯২০খৃঃ) যখন কলিকাতার নূর আলী লেনে 'আলতাফী প্রেস' স্থাপন করেন, তখন তিনি নিজের উক্ত দু'টি বই ছাড়াও চাচাজী লিখিত অত্যন্ত জনপ্রিয় 'মনীরুল হোদা'নামক পয়ার ছন্দের কাব্যপুস্তকটি উক্ত প্রেস হ'তে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। মুসলমানদের মধ্যে জিহাদী জোশ আনয়নের জন্য তিনি সিরিয়া, ইরাক ও মিসর বিজয়ের উপরে তিনখানি পুস্তক ও জুম'আর খুৎবা পুস্তক প্রণয়ন করেন। এসময় সারা বাংলায় মুসলমানদের জন্য 'মোসলেম হিতৈষী' ও 'মিহির সুধাকর' নামে মাত্র দু'টি পত্রিকা (মাসিক) ছিল। সম্ভবতঃ হাজী আবদুল্লাহ্‌র সহযোগিতায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি 'মোহাম্মাদী' নামে দু'পাতার একটি পত্রিকা প্রথমে মাসিক ও পরে সাপ্তাহিক আকারে বের করেন। অতঃপর মাওলানা আকরম খাঁকে উক্ত পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। এরপর মাওলানা আব্বাস আলী পবিত্র কুরআনের টীকাসহ পূর্ণাঙ্গ তরজমা সমাপ্ত করেন। বাংলাভাষায় মুসলমানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদক। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি নিজ গ্রামে একটি মাদরাসা কায়েম করেন। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি বহু জনহিতকর কাজ সম্পাদন করেন।[৩] এজন্য তাঁকে জনৈক হিন্দু জমিদারপুত্রের বন্দুকের গুলীর সম্মুখীন হ'তে হয়। এইভাবে শিক্ষকতা, লেখনী, পত্রিকা প্রকাশনা, কুরআনের তরজমা প্রকাশ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, তাবলীগী জালসা

প্রভৃতি বিভিন্নভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তিনি বাংলা অঞ্চলের আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

৩- মাওলানা মোহাম্মাদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খৃঃ)ঃ

আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা এনায়েত আলী ছাদেকপুরী (১২০৭-১২৭৪হিঃ/১৭৯৩-১৮৫৮খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত হাকিমপুর কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান সহযোগী হাজী মুফীযুদ্দীন খাঁর (১২০৫-১৩১০হিঃ) দৌহিত্র এবং মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০হিঃ/১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) কৃতি ছাত্র মাওলানা আবদুল বারী খাঁর পুত্র মাওলানা আকরম খাঁ বাংলা ১২৭৫ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক ১৮৬৮ সালের ৭ই জুন স্বগ্রাম হাকিমপুরে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] এগারো বৎসর বয়সে একই দিনে মাতাপিতাকে হারিয়ে তিনি স্বীয় নানার কাছে মানুষ হন। জিহাদী রক্তের উত্তরাধিকারী মাওলানা আকরম খাঁ কলিকাতা মাদরাসা আলিয়ায় লেখাপড়া শেষে মুসলমানদের জাতীয় অগ্রগতি ও পুনর্জাগরণের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এইসময় তিনি কলিকাতা তাঁতীবাগের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও 'মোহাম্মাদী' পত্রিকার মালিক হাজী আবদুল্লাহ্‌র (জন্ম -পাটনাঃ ১৮৪০ খৃঃ, মৃত্যু- কলিকাতাঃ ১৯২০) নযরে পড়েন ও আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন প্রচারের জন্য তাঁর হাতেই তিনি পত্রিকার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন।[৫] মাওলানা আকরম খাঁর জন্য এটা ছিল একটি অমূল্য সুযোগ। তিনি এই পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে স্বীয় প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পান ও অচিরেই সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। যদিও তাঁর সম্পাদনার প্রথম তিন বছর 'মোহাম্মদী' সত্যিকার অর্থেই মোহাম্মাদী জামা'আতের ও তাদের আদর্শের যথার্থ নকীব ছিল। কিন্তু পরে 'মোহাম্মদী' তার নামটুকু ছাড়া আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি।[৬] এইভাবে সাংবাদিকতার মাধ্যমে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের শুভ সূচনা থেকেই মাওলানা আকরম খাঁর শতবর্ষব্যাপী দীর্ঘ জীবনের পথপরিক্রমা শুরু হয় এবং একে একে মাসিক ও সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' (সম্ভবতঃ ১৯০৩ সাল হ'তে মৃত্যু পর্যন্ত) ২- মাসিক 'আল-এসলাম' (প্রকাশক ও যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে ১৯১৪-১৯ খৃঃ) ৩-উর্দূ দৈনিক 'যামানা' (১৯২০-২৪) ৪-বাংলা দৈনিক 'সেবক' (১৯২১-২২) ৫-দৈনিক 'আজাদ' (১৯৩৬ হ'তে অদ্যাবধি) ৬-ইংরেজী 'দি কমরেড' (১৯৪৬) প্রকাশ ও সম্পাদনার মাধ্যমে পরবর্তীতে অসংখ্য মুসলিম সাংবাদিক প্রতিভার আশ্রয়স্থল ও মুরব্বী হিসাবে যথার্থভাবেই তিনি বাংলায় 'মুসলিম সাংবাদিকতার জনক'রূপে আখ্যায়িত হবার

গৌরব অর্জন করেন। তাঁর 'মোহাম্মদী' ও 'আজাদ' মুসলিম পুনর্জাগরণে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে দিশারীর ভূমিকা পালন করে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলন হ'তে ১৯৬২ সালের ২৯শে অক্টোবর পর্যন্ত দীর্ঘ ৫৬ বৎসরের রাজনৈতিক জীবনে তিনি সর্বদা কর্ণধারের ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু কোনদিন কোন সরকারী পদ গ্রহণ করেননি।

সাংবাদিকতা, রাজনীতি ও জেল-যুলমের মধ্যেও মাওলানা অনেকগুলি গবেষণাধর্মী ও পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাফসীরুল কুরআন, মোস্তফা চরিত, মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, উম্মুল কোরআন, কাব্যে আমপারার তাফসীর, সমস্যা ও সমাধান, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি বইগুলি তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও গভীর পান্ডিত্যের উৎকৃষ্ট দলীল।

আহলেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অবদান বিচার করলে প্রথম জীবনে তিনি এ আন্দোলনের জন্য যে 'মোহাম্মদী'র মাধ্যমে মসীযুদ্ধ ও বিভিন্ন বাহাছ-মুনাযারায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তর্কযুদ্ধ চালিয়েছেন, তাকে অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। বাংলা ১৩১৯ সালে তিনি এমনি এক বাহাছে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার ঝাউডাঙ্গায় আসেন ও প্রতিপক্ষের হানাফী আলিম মাওলানা রূহুল আমীনকে পরাজিত করেন।[৭]

পরবর্তীতে আন্দোলনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও আহলেহাদীছ রক্তের উত্তরাধিকার তাঁকে যোগ্য মুহাক্কিক বানিয়েছিল, যা তাঁর লেখনীর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। অন্ধ রেওয়াজপূজা, পীরপূজা, গোরপূজা, মাযহাবী ফের্কাবন্দী, যাবতীয় খৃষ্টানী ও হিন্দুয়ানী রসম-রেওয়াজ, যা মুসলমানদের মধ্যে চালু হয়ে গিয়েছিল, সেসবের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ও আপোষহীন বাকযুদ্ধ ছিল ক্ষমাহীন ও দুর্বার। বাংলাদেশের খ্যাতিমান (হানাফী) পন্ডিত ও দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন- 'কেবল অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেই নয়- তথাকথিত শিক্ষিত মানুষেরা ধর্মের অনুশাসনের ক্ষেত্রে চার ইমামের মাযহাবকে শেষ ব্যাখ্যা মনে করে ইজতিহাদের দ্বার চিরতরে অবরুদ্ধ ভেবে এক্ষেত্রে টুঁ শব্দটি করার স্বাধীনতা খুঁজে পাচ্ছিলনা। তাই প্রথমে গোড়ার দিকে সংস্কার করার বাসনায় তিনি (আকরম খাঁ) হাদীছ শাস্ত্র ঘেটে মাল-মসলা সংগ্রহ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, কোরআন ও হাদীছের সূত্রগুলো ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা সকল মুসলমানের রয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন

মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী। এদেরই চেষ্টায় এ অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলন বিশেষভাবে ফলে ওঠে।[৮]

১৯৬৮ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখে মাওলানা ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে সরকারী জাতীয় কবরস্থান বাদ দিয়ে তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী বংশাল মালিবাগ আহলেহাদীছ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

৪- মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (১৩১৮-১৩৮০ হিঃ/১৯০০-১৯৬০ খৃঃ)ঃ

বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলাধীন পার্বতীপুর সদর উপজেলার খোলাহাটি রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী 'বস্তীর আড়া' বা (পরবর্তী নাম) 'নূরুল হুদা' গ্রামে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাওলানা আবদুল হাদী মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২) -এর ছাত্র ছিলেন এবং সেই সূত্রে তিনি 'আহলেহাদীছ' হন। মায়ের দিক দিয়ে প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত হওয়ার ধারণা থেকেই সম্ভবতঃ মাওলানা কাফী নিজের নামের শেষে 'আল-কোরায়শী' লিখতেন। পিতৃকুলে তিনি চট্টগ্রাম যেলার রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামের সৈয়দ খোশহাল মুহাম্মাদ-এর সহিত এবং মাতৃকুলে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান যেলাধীন রসূলপুর পরগণার টুব গ্রাম নিবাসী পীর শাহ দিরাসাতুল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কিত। এই পীর হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর বংশধর বলে পরিচিত। মাওলানার মা উম্মে সালমা ছিলেন তাঁর পৌত্রী। ফুরফুরার পীর আবুবকর ছিদ্দীকও একই বংশোদ্ভূত।

মাত্র ৬ বছর বয়সে পিতৃহারা আব্দুল্লাহেল কাফী স্বগ্রামে ও রংপুরের হাই স্কুলে লেখাপড়া শেষে কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স মিশনারী কলেজে বি.এ. পাঠরত অবস্থায় বৃটিশবিরোধী 'অসহযোগ আন্দোলনে' যোগ দেন ও ছাত্রজীবনের সমাপ্তি টানেন।

কর্মজীবনের শুরুতে তিনি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের (১৮৮৮-১৯৫৮খৃঃ) 'আল-হেলাল' (১৯১২-১৪) ও পরে 'আল-বালাগ' (১৯১৫-১৬) পত্রিকায় যোগ দেন। অতঃপর ১৯২১ সালে মাওলানা আকরম খাঁ-র উর্দূ দৈনিক 'যামানা'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। ১৯২৪ সালের ২৯শে নভেম্বর মোতাবেক ১লা জুমাদাল উলা ১৩৪৩হিঃ/১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৩১ সালে নিজ সম্পাদনায় কলিকাতা

হ'তে বাংলা সাপ্তাহিক 'সত্যাগ্রহী' বের করেন, যা প্রায় তিন বছর চলে। ১৯৪৯ সালের ২৭শে মে মোতাবেক মোহাররম ১৩৬৯ হিজরী পাবনা হ'তে উচ্চাংগের মাসিক 'তর্জুমানুল হাদিছ' প্রকাশ করেন, যা তাঁর মৃত্যুর পরেও ১৯৭০ সাল পর্যন্ত জারি ছিল। ১৯৫৭ সালের ৭ই অক্টোবর ঢাকা হ'তে নিজ সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'আরাফাত' প্রকাশ করেন, যা বর্তমানে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস' -এর একমাত্র মুখপত্র হিসাবে চালু আছে। রাজনৈতিক জীবনে মাওলানা কাফী ১৯১৯ সালে 'খেলাফত আন্দোলনে' যোগ দেন। ১৯২২ সালে 'জমঈয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালার' সহ-সম্পাদক হন। ১৯২৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর (১৮৯২-১৯৬৩) 'ইন্ডেপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি'র সেক্রেটারী হন। ১৯৩০ সালে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের 'মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট পার্টি' এবং ১৯৩৫ সালে এ.কে. ফযলুল হকের 'কৃষক-প্রজা পার্টিতে' সক্রিয় কর্মী হিসাবে যোগদান করেন। সুভাষচন্দ্র বোস-এর সাথেও তিনি কাজ করেছেন বলে জানা যায়। ১৯২৮-২৯ সালে একবছর ও ১৯৩১-৩২ সালে ছয়মাস তিনি কলিকাতায় কারাবন্দী জীবন অতিবাহিত করেন। দু'বারই তিনি দিনাজপুরে গ্রেফতার হন।

১৯৪২ সালে হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সক্রিয় রাজনীতি হ'তে অবসর গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁর দুরারোগ্য পিত্তশূল ব্যাধি দায়ী ছিল কি-না বলা মুশকিল। তবে রাজনীতি চিন্তা হ'তে তিনি কখনোই দূরে ছিলেন না। এমনকি ১৯৬০ সালের ১লা জুন মৃত্যুর ৩ দিন পূর্বে হাত থেকে কলম খসে না পড়া পর্যন্ত তিনি পাক-প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত শাসনতন্ত্র কমিশনের ৪০টি প্রশ্নের ৩৮টির জওয়াব লিখে শেষ করেন।

জীবনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সময় সক্রিয় রাজনীতির ডামাডোলে ব্যস্ত থাকলেও রাজনীতি তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। তিনি সকল ইসলামী দলকে একটি শক্তিশালী 'এছলামী ফ্রন্টে' ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে ইসলাম বিরোধীদের সঙ্গে 'জেহাদে' অবতীর্ণ হওয়ার আহবান জানিয়েছিলেন।

বাংলা ও আসামের আহলেহাদীছ অধ্যুষিত বিরাট জনপদকে একটি ঐক্যবদ্ধ সামাজিক শক্তিতে পরিণত করার জন্য তিনি চেষ্টিত হন। এতদুদ্দেশ্যে রংপুরের হারাগাছে ১৯৪৬ সালে তাঁর উদ্যোগে বিরাট আহলেহাদীছ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে তাঁকে সভাপতি করে 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্লেহাদিছ' গঠিত হয়। দেশবিভাগের পর 'পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ'

এবং বর্তমানে তা 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস' নামে পরিচিত। তিনি আমৃত্যু এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ডক্টর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল বারী সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মাওলানা কাফী সর্বদা আহলেলহাদীছ জামা'আতকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করতেন। সর্বত্র জামা'আতী দ্বন্দ্বের নিরসনে আন্তরিকভাবে চেষ্টা নিতেন। কোথাও কয়েকটি মসজিদকে একটি মসজিদে[৯] পরিণত করতেন, কোথাও ঈদগাহের গন্ডগোল মিটাতেন।[১০] কোথাও দ্বীনী মাদরাসা কায়েম করতেন,[১১] কোথাও গ্রাম্য কোন্দল মিটাতেন।[১২] এইভাবে তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে আহলেহাদীছ আন্দোলন গতিলাভ করে। বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দলকে তিনি ১৯৫৬ সালের ৬ই জানুয়ারী পাবনায় আহবান করেনও জমঈয়তের উদ্যোগে সফলভাবে 'এছলামী ফ্রন্ট সম্মেলন[১৩] অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনগুলির পাশাপাশি একটি সর্বস্বীকৃত চলমান আন্দোলন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিরাটসংখ্যক আহলেহাদীছ জনগোষ্ঠীকে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর মাধ্যমে একটি জাতীয়ভিত্তিক প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করাই আহলেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অন্যতম প্রধান অবদান হিসাবে চিহ্নিত করা চলে।

অপূর্ব বাগ্মীতা ও পান্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর মাধ্যমে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৪৯ হ'তে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত যুগটি ছিল মাওলানার সাহিত্য সাধনার স্বর্ণযুগ। পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও ১৯১৫ সাল হ'তে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলা, ইংরেজী ও উর্দূ ভাষায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ বের হয়। এজন্য মৃত্যুর পূর্বে ১৯৫৯ সালে তিনি ঢাকার বাংলা একাডেমী কর্তৃক সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত হন। এযাবত তাঁর প্রকাশিত বই ও পুস্তিকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩ খানা এবং অপ্রকাশিত পান্ডুলিপির সংখ্যা ৩১। তন্মধ্যে আরবী ভাষায় ১২ খানা, উর্দূ ভাষায় ১২ খানা, বাংলায় ৬ খানা ও ইংরেজীতে ১ খানা। দীর্ঘ আট বছরের সাধনালব্ধ ৫১৪ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ 'সূরায়ে ফাতেহার তাফসীর'-কে তাঁর জীবনের সেরা কীর্তি হিসাবে আখ্যায়িত করা চলে, যা এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

দ্বীন ও জাতির খিদমতে নিবেদিত প্রাণ চিরকুমার মাওলানা কাফী ১৯৬০ সালের ৪ঠা জুন ভোর সোয়া ৪টার সময় ঢাকায় ৮৬, কাজী আলাউদ্দীন রোডে অবস্থিত

জমঈয়ত অফিসে স্বীয় কর্মস্থলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১৫] ইন্নালিল্লাহে........। জন্মস্থান নূরুল হুদায় স্বীয় পিতা ও ভ্রাতার পার্শ্বে তিনি সমাহিত হন।

উপরোক্ত আলিমগণ ব্যতিত লেখনী, বাগ্মিতা, শিক্ষকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিগত ও বর্তমানের অসংখ্য উলামায়ে কেরাম-এর নাম অনুল্লেখিত রইল, যাঁদের অবদানে বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন বর্তমান অবস্থায় বিকাশ লাভ করেছে।

বাংলাদেশে আহলেহাদীছ এক নযরেঃ

১. **জনসংখ্যা** ঃ অন্যূন দেড়কোটি। সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকা উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চল।

২. **মসজিদসমূহঃ**

ঢাকা মহানগরী ঃ ১৬টি- বংশাল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, বংশাল-মালিবাগ, নাযিরাবাজার, বাংলাদুয়ার, পুরানো মোগলটুলি, সুরীটোলা, ৭৮ উঃ যাত্রাবাড়ী, খিলগাঁও, বারিধারা, ভাষাণটেক, মীরপুর সাড়ে ১১নং, মুহাম্মাদপুর শাহজাহান রোড, ধামালকোট, উত্তর খান, বাড্ডা, আমীনবাজার (গাবতলী)।

চট্টগ্রাম মহানগরীঃ ১টি- ঝাউতলা (পাহাড়তলী)।

খুলনা মহানগরীঃ ১০টি- ৬৯, আপার খানজাহান আলী রোড- এ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ অবস্থিত।

রাজশাহী মহানগরীঃ ৩০টি-(রাণীবাজার ও হাতেম খাঁ সবচেয়ে বড় মসজিদ)। এতদ্ব্যতীত **দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, যশোর, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, নারায়ণগঞ্জ, ঠাকুরগাঁ, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ** প্রভৃতি জেলা শহরে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত ঢাকা ও রাজশাহী মহানগরীতে কিছু প্রাচীন আহলেহাদীছ মসজিদ ছিল, যা বর্তমানে অন্যদের হাতে চলে গিয়েছে।[১৫]

৩. **মাদরাসাঃ** ১-আহলেহাদীছ পরিচালিত সরকারী নেছাব অনুসরণকারী আলিয়া কামিল মাদরাসার সংখ্যা-৪টি। ১- মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা ২- আরামনগর, জামালপুর ৩- কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ৪-হেফযুল উলুম, চাপাই নবাবগঞ্জ।

২ - নিজস্ব সিলেবাস অনুসরণকারী ইসলামিয়া মাদরাসার সর্বাধিক সংখ্যা (অন্যূন ৪০) হ'ল বৃহত্তর রাজশাহী এলাকায়। সবচেয়ে বড় মাদরাসা হ'ল ঢাকার ৭৮নং উত্তর যাত্রাবাড়ীতে 'জামে'আ মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া' ও রাজশাহীর নওদাপাড়ায় **'আল-মারকাযুল** ইসলামী আস্-সালাফী'। এতদ্ব্যতীত ঢাকার নাযিরা বাজারের মাদরাসাতুল হাদীছ, রাজশাহী রাণীবাজারের 'মাদরাসা এশা'আতুল ইসলাম এবং সাতক্ষীরা, খুলনা, রংপুর ও পাবনা জেলা শহরগুলিতে ইসলামিয়া মাদরাসা রয়েছে।

৪. পত্রিকা

সাপ্তাহিকঃ আরাফাত (৯৮ নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১০০০) বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের মুখপত্র।

মাসিকঃ সালাফী (২০, বংশাল রোড, ঢাকা) সম্প্রতি ব্যক্তি উদ্যোগে অনয়িমিতভাবে প্রকাশিত।

অনিয়মিতঃ দাওয়াতে ইসলাম (১৯৮ হাবীব মার্কেট দোতলা। আহ্‌লেহাদীস তাবলীগে ইসলামের মুখপত্র।

অনিয়মিতঃ তাওহীদের ডাক (মাদরাসা মার্কেট, ৩য় তলা, রাণীবাজার, রাজশাহী। বাংলাদেশ আহ্‌লেহাদীছ যুবসংঘের মুখপত্র।

৫. প্রেসঃ ১- আল-হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, ৯৮ নওয়াবপুর রোড, ঢাকা। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের নিজস্ব প্রেস।

২- **তাবলীগে** ইসলাম প্রেস, ১৭৯ বংশাল রোড, ঢাকা, আহ্‌লেহাদীস **তাবলীগে** ইসলামের নিজস্ব প্রেস।

৬. সমাজকল্যাণ সংস্থাঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ), ১৪৪ আরামবাগ ২য় তলা, ঢাকা-১০০০।

৭. প্রকাশনা সংস্থাঃ ১- যুবসংঘ প্রকাশনী, বাংলাদেশ আহ্‌লেহাদীছ যুবসংঘ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক পরিচালিত। রাণীবাজার, রাজশাহী।

২- হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। মুহাদ্দেছীন ও সালাফে ছালেহীনের মাসলাক অনুযায়ী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী সাহিত্য ও প্রকাশনার একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। প্রধান কার্যালয়- কাজলা, পোঃ -ঐ, রাজশাহী।

৮. **উল্লেখযোগ্য এলাকা ও ব্যক্তিত্বঃ** পূর্বে বর্ণিত কেন্দ্রসমূহ ব্যতিত দেশের যে সব এলাকা জিহাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাহায্যকারী হিসাবে পরিচিত ছিল এমন উল্লেখযোগ্য এলাকা ও ব্যক্তিবর্গ যেমনঃ ১- গাযী মাওলানা মান্ছূরুর রহমান, হাজী বদরুদ্দীন, বংশাল, ঢাকা। ২-দোলেশ্বর, ঢাকা। ৩- ওয়াহেদ আলী মুনশী, বেরাইদ, ঢাকা। ৪- রাণীপুরা, বেলদী, ঢাকা। ৫- ফারাজীকান্দা, নারায়ণগঞ্জ। ৬-পাচরুখী এলাকা, নরসিংদী। ৭- মাওলানা মুহিউদ্দীন, দেলদুয়ার, টাংগাইল। ৮-গোলপুকুর পাড়, ময়মনসিংহ। ৯-গাযী আশেকুল্লাহ, ধানীখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। ১০- মাওলানা এলাহী বখ্‌শ ও মিয়াঁ ছাহেবের পাঁচজন ছাত্র। সম্ভবতঃ প্রায় সমগ্র জামালাপুর জেলা। ১১-মাওলানা তাহের সিলেটী, মাওলানা মীযানুর রহমান-লাখাই, সিলেট। ১২- মাওলানা জসীমুদ্দীন-ভাদুরীর চর, গোপালপুর, টাংগাইল। ১৩-মাওলানা আবদুল হাদী-বস্তির আড়া ওরফে নূরুল হুদা, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। ১৪-মাওলানা আবদুল গফুর (হলাইজনা), ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর। ১৫- মাওলানা আবদুল্লাহ ছালেককুড়ী, দিনাজপুর। ১৬- যিল্লুর রহমান সালাফী, নান্দেড়াই, চিরির বন্দর, দিনাজপুর। ১৭- মাওলানা খিযিরুদ্দীন, খোলাহাটি, গাইবান্ধা। ১৮- গাযী এফাযুদ্দীন হাক্কানী, ব্রীজ রোড, গাইবান্ধা। ১৯- মাওলানা নূর বখ্‌শ (নবীয়াবাদ, দেবীদ্বার) ও তাঁর দুই ছাত্র 'মিঞা ছাহেব' মুনশী নাছীরুদ্দীন ও গাযী মাওলানা আশেকুল্লাহ (চানপুর, দেবীদ্বার) কুমিল্লা। ২০- মাওলানা ইবরাহীম (বদরগঞ্জ), হাজী যেয়ারাতুল্লাহ, হারাগাছ, রংপুর। ২১-মাওলানা কামাল শেখ ইয়ামানী ও তৎপুত্র মাওলানা জামাল শেখ, পাবনা। ২২- গাযী মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ সালাফী (আটুয়া পশ্চিমপাড়া), পাবনা। ২৩- মিয়াঁজান কাযী (দুর্গাপুর, কুমারখালি, কুষ্টিয়া)। ২৪-মাওলানা ইসহাক বিন খাজা আহমাদ- (দৌলতখালি, কুষ্টিয়া) ২৫-মাওলানা ছাবেরুদ্দীন (পাংশা, রাজবাড়ী)। ২৬-মাওলানা মাগফূর হোসাইন খোরাসানী ও সাথী ২ জন (পাদুরী-ঘাটুরী গ্রাম) ময়মনসিংহ। এঁরা গারো পাহাড় এলাকায় বহু লোককে আহলেহাদীছ করেন। ২৭- মাওলানা সরফরাজ প্রধান (সাং-জগদল) ও মাওলানা রুস্তম আলী ভোজনপুরী (পঞ্চগড়, দিনাজপুর। ২৮। গাযী আবদুস সাত্তার (হালুয়াকান্দী) সিরাজগঞ্জ। ২৯- মাওলানা তাসলীমুদ্দীন সালাফী ও তাঁর শ্বশুর মাওলানা আবদুল কুদ্দূস (পচাপুকুর, জলঢাকা), নীলফামারী। ৩০- মাওলানা আহমাদ আলী (১৮৮৩-১৯৭৬) সাং- বুলারাটি, সাতক্ষীরা। ৩১-গোদাগাড়ী এলাকা, রাজশাহী।

৩২- মাওলানা আবদুল ওয়াজেদ জামালী ও তাঁর পিতা- সাং- নখৈর, চিরিরবন্দর। বর্তমানে লালবাগ-দিনাজপুর ৩৩- মাওলানা শরীয়াতুল্লাহ মৌভাষা, রংপুর ৩৪- বামুনকরা- এনায়েত আলীর মসজিদ ও মাদ্‌রাসা, আত্রাই, নওগাঁ ৩৫- মাওলানা আবদুর রহমান কান্দাহারী, দেলদুয়ার, টাংগাইল ৩৬- বেগম করীমুন্নেসা (বেগম রোকেয়ার বড় বোন) ইনি দেলদুয়ারের আহলেহাদীছ জমিদার পরিবারে বিবাহিতা হন। করটিয়ার জমিদারদের সাথে বাহাছে তিনি আহলেহাদীছ পক্ষে দিল্লী থেকে হাজার হাজার টাকা খরচ করে আলেম আনাতেন। (৩২-৩৬-এর তথ্যঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (৪৫) সাং ও পোঃ আকরগ্রাম, থানা-বিরল, দিনাজপুর। সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস। -তাং- ৮.৫.৮৮ ইং।

এতদ্ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের যে সকল আলিম ও ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে অবদান রেখেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ১- মাওলানা আবদুল্লাহ ঝাউ এলাহাবাদী (বিলবাড়ি, মুর্শিদাবাদ) ২- মাওলানা আবদুল ওয়াহ্‌হাব শেখালীপুরী (বাং ১২৮৬-১৩৪৯) লালগোলা, মুর্শিদাবাদ ৩- মাওলানা মাওলাবখ্‌শ নদভী বিন ইবরাহীম দেবকুন্ডী (মুর্শিদাবাদ) ৪- মাওলানা মাযহারুল হান্নান বিন খাজা আহমাদ (রহমতপুর, নদীয়া) ৫- মাওলানা বাবর আলী (১৮৭৩-১৯৪৬খৃঃ) খোদারবাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ৬-মাওলানা এফাজুদ্দীন (কলিকাতা) ৭- মাওলানা আবদুল লতীফ (১৮৭৮-১৯৪৯খৃঃ) বড়ম্বা, হুগলী ৮- মাওলানা রহীম বখ্‌শ (কলিকাতা) ৯- হাজী আবদুল্লাহ (১৮৪০-১৯২০খৃঃ) তাঁতীবাগ, কলিকাতা ১০- মাওলানা আয়নুদ্দীন মেটিয়াবুরুজী (১২৯৭-১৩৪০ বাং/১৮৯০-১৯৩৩খৃঃ) কলিকাতা, বাংলাদেশের দিনাজপুর-লালবাগে কবর (মৃত্যুঃ ৪ঠা ফাল্‌গুন শুক্রবার সন্ধ্যা ৬-৫৪ মিঃ) ১১- হাজী শেখ আবদুল আজীজ (ভাবতা, মুর্শিদাবাদ) ১২- মাওলানা মুনীরুদ্দীন (চন্ডিপুর, উত্তর ২৪ পরগনা) ১৩- মাওলানা মোন্তাছির আহমাদ রহমানী (জন্মঃ কাছাড়, আসাম ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৩)। ১৯৮৯ সালে ১২ই নভেম্বর ঢাকার দক্ষিণ কমলাপুরে নিজ বাসভবনে ৬৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন ও বংশাল মালিবাগ আহলেহাদীছ কবরস্থানে স্বীয় কর্মজীবনের গুরু মাওলানা আকরম খাঁর পাশে সমাধিস্থ হন) প্রমুখ।

টীকাসমূহ-১৭

১. মোঃ মুনযির আলী, 'নদীয়া জেলায় আহলেহাদীস আন্দোলন' মাসিক আহলেহাদীস (কলিকাতাঃ ১নং মারকুইস লেন, ১১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৯), পৃঃ ৭৬; মাওলানা আবদুর রঊফ শামীম 'বীরভূম জেলায় আহলেহাদীস আন্দোলন' ঐ ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৮৭, পৃঃ ৩৬৩; আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, 'সুধীবৃন্দের তুলিতে মাওলানা মুহাম্মাদ আকরম খাঁ' (ঢাকাঃ সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৭১) পৃঃ ২১১।

২. মাওলানা প্রণীত 'ধোকাভঞ্জন' বইয়ের ভূমিকা। প্রকাশকঃ বর্ধমান জেলা জমঈয়তে আহলেহাদীস, ২য় সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪; মৌলবী মোযাম্মেল হক (৬০) সাং কুলসোনা পোঃ ভালগ্রাম, জেলা-বর্ধমান, পঃ বঙ্গ, ভারত। -তাং ১৭-১-৮৯ইং।

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৬)১ম খণ্ড পৃঃ ৬৩০-৩১; হাজী আবদুল্লাহ লাইব্রেরী স্মরণিকা (১৮৮২-১৯৮২), ২৬-এ নূর আলী লেন, তাঁতীবাগ, কলিকাতা-৭০০০১৪ অবলম্বনে।

৪. আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, 'সুধীবৃন্দের তুলিতে মাওলানা মোহাম্মাদ আকরাম খাঁ' পৃঃ ১৩, ২১০।

৫. ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, 'আকরম খাঁ, মোহাম্মাদ' ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬) ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৫; উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, কুষ্টিয়াবাসী আবদুল্লাহ নামক জনৈক বিদ্যোৎসাহী কলিকাতায় 'মোহাম্মদী' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিছুকাল পর তাহা বন্ধ হইয়া যায়। আকরম খাঁর চেষ্টায় পত্রিকাটি ১৯১০ সালে (বাংলা ১৩১৭) পুনঃপ্রকাশিত হয়।' একই বিশ্বকোষে 'আব্বাস আলী মাওলানা' প্রবন্ধে স.ই.বি. বলেন, 'মুসলিম সমাজের এই বিরাট অভাব দূরীকরণার্থে (তিনি আব্বাস আলী) 'মোহাম্মদী' নামক দুইপাতা বিশিষ্ট একটি মাসিক পত্রিকা উক্ত প্রেস (আলতাফী প্রেস) হইতে প্রকাশ করিতে থাকেন। কিছুদিন পর উহাকে সাপ্তাহিকে পরিণত করেন এবং ..... মাওলানা মোহাম্মাদ আকরম খাঁকে উহার সম্পাদক নিযুক্ত করেন।' -ঐ, পৃঃ ৬৩০। ওদিকে হাজী আবদুল্লাহ লাইব্রেরীর (২৬-এ, নূর আলী লেন, কলিকাতা ৭০০০১৪) শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় (১৮৮২-১৯৮২) বলা হচ্ছে, হাজী ছাহেব (জন্মঃ পাটনা শহরে ১৮৪০) উক্ত প্রেস ও সাপ্তাহিক মোহাম্মদী মাওলানা আকরম খাঁর হাওয়ালা করে দেন। হাজী ছাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র আবদুর রহমান (৬০) বলেন, তাঁর আব্বা প্রেস ও পত্রিকা মাওলানা আকরম খাঁকে 'হাদিয়া' স্বরূপ প্রদান করেন (তথ্যঃ ১৫-১-৮৯ ইং)। বিশ্বকোষ নিবন্ধকার বলছেন, ঘটনাটি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের, তর্জমানুল হাদীছ (ঢাকা, ১৫শ বর্ষ ১ম সংখ্যা)-এর নিবন্ধকার মোহাম্মাদ আবদুছ ছামাদ বলছেন ১৯০১ সালের (ঐ, পৃঃ ৪৩); মাসিক আহলেহাদিস (কলিকাতাঃ ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩২৩/১৯১৬ খৃঃ)-এর বক্তব্যে (ঐ, পৃঃ ৪৭) বুঝা যায় যে, আকরম খাঁর

সম্পাদনা শুরু হয়েছিল বাংলা ১৩১০ বা ইং ১৯০৩ সালে। এখানে 'হাজী আবদুল্লাহ স্মরণিকা' ও কলিকাতার মাসিক 'আহলেহাদিস' পত্রিকার বক্তব্যই সঠিক বলে অনুমিত হয়। অর্থাৎ মাসিক মোহাম্মদী-র আত্মপ্রকাশ সর্বপ্রথম ১৯০১ সলে মাওলানা আব্বাস আলীর হাতে ঘটে হাজী আবদুল্লাহ্‌র সহযোগিতায়। অতঃপর ১৯০৩ সালে তা মাওলানা আকরম খাঁ-র উপরে ন্যস্ত হয়।

৬. মাসিক আহলে হাদিস (কলিকাতাঃ ১নং মারকুইস লেন, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২৩/১৯১৬ খৃঃ) পৃঃ ২৩০।

৭. মোহাম্মাদ মতিউর রহমান, তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া (প্রকাশকঃ এম আব্দুল্লাহ সাং ও পোঃ ঘোনা, সাতক্ষীরা, ২য় সংস্করণ ১৯৮৭) ১ম খন্ড পৃঃ ৫৮।

৮. দৈনিক আজাদ, বিশেষ সংখ্যা ১৮ই আগষ্ট ১৯৬৯ নিবন্ধঃ 'বাঙ্গালী মুসলমানের রাজনৈতিক জনক'।

৯. জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিজুড়ী এলাকায় তারতাপাড়া প্রাচীন জামে মসজিদ সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা করেন। যার ফলে প্রায় ১৫ বৎসর পরে তিনটি মসজিদ একটি জামে মসজিদে পরিণত হয় (তাং ১১ই জানুয়ারী ১৯৩২; মাওলানার নিজ হাতে লেখা ও নিজ স্বাক্ষরিত 'সিদ্ধান্তসমূহ' ও 'জামাত পরিচালন ব্যবস্থা' (ফটোকপি লেখকের নিকটে মওজুদ আছে)। এমনিভাবে একই এলাকার চারি আনি পাড়ার ৩টি মসজিদ, জোড়খালির ৩টি মসজিদ, শুক্‌নাগাড়ীর ২টি মসজিদ ও তারতাপাড়ার ২টি মসজিদ একত্র করে দেন। -সাপ্তাহিক 'আরাফাত' বিশেষ সংখ্যা, পৃঃ ১৭; লেখকঃ মতিয়ুর রহমান খাঁ।

১০. মুর্শিদাবাদ জেলার জংগীপুরে ঈদের মাঠ নিয়ে অনুরূপ একটি ঝগড়া হয়। তিনি সেখানে গিয়ে গরুর গাড়ি উল্টে গিয়ে দারুণ আঘাত পান।

১১. যেমন জামালপুর জেলার বালিজুড়ী এস.এম. সিনিয়ার মাদরাসা এবং সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কামারখন্দ টাইটেল মাদরাসা। (দুইটিই সম্ভবতঃ ১৯২৮ সালে) এবং ঢাকায় ৯৪ কাজী আলাউদ্দীন রোডে ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসাতুল হাদীছ'। তিনটি মাদরাসাই অদ্যাবধি চালু আছে।

১২. মাদারগঞ্জ মোহাম্মাদী জামা'আতের সর্দারী নিয়ে গোলযোগ দেখা দিলে বাংলা ১৩৩২ মোতাবেক ১৯২৫ সালে (স্বাক্ষরে তারিখ নেই) সেখানে গিয়ে তিনি গন্ডগোল মীমাংসা করেন ও 'মাদারগঞ্জ মোহাম্মদী জামাতের পরিচালন ব্যবস্থা' নামে ১৫ দফা সম্বলিত স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরিত শালিশনামা প্রণয়ন করেন (ফটোকপি লেখকের নিকটে মওজুদ আছে)।

১৩. দৈনিক আজাদ, ৮ই জানুয়ারী ১৯৫৬, ১ম পৃঃ ৩য় কলাম। উক্ত সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলবী তমীযুদ্দীন খাঁ। অংশগ্রহণ করেছিল মুসলিম লীগ, নেযামে এছলাম, জমঈয়তে ওলামা, হিযবুল্লাহ, জামাতে ইসলামী, আঞ্জুমানে মুহাজেরীন ও জমঈয়তে আহলেহাদীছ। - মোহাম্মাদ আবদুর রহমান, ঐ জীবনী, পৃঃ ৩০।

১৪. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬) ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৯৯-৬০০; মুহাম্মদ আবদুর রহমান, আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (ঢাকাঃ ১৯৮৩); মাওলানা কাফী স্মরণে সাপ্তাহিক 'আরাফাত' বিশেষ সংখ্যা ২রা জুলাই ১৯৬২; জমঈয়ত স্মরণিকা ১৯৮৫ অবলম্বনে এবং নিজস্ব সংগ্রহ থেকে।

১৫. যেমন- **ঢাকার সাবেক আহ্লেহাদীছ মসজিদ সমূহঃ**

১. ছোট কাটারা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ। হেকিম হাবীবুর রহমান লেন। পাঁচরুখীর মাওলানা নূরুল হক-এর নির্দেশক্রমে মাওলানা সুলতান এখানে ১২ বৎসর যাবত ইমামতি করেন। পরে তিনি চলে গেলে সম্ভবতঃ বাংলা ১৩৫০ সালে মসজিদটি বেহাত হয়ে যায়। মুতাওয়াল্লী ছিলেন জনাব আতীকুল্লাহ পেশকার। ২. বেগম বাজার জামে মসজিদঃ মূলতঃ বংশালের হাজী বদরুদ্দীন ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় এ মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলিম ও গাযী মাওলানা মানছুরুর রহমান ঢাকাভী এখানে দরস দিতেন। নারায়ণগঞ্জের মৌলবী রঈসুদ্দীন এখানে কয়েক বৎসর ইমাম ছিলেন। আলহাজ্জ আব্দুল ওয়াহ্হাবের (মৃঃ ১৯৯৩খৃঃ) পিতা এখানে মুতাওয়াল্লী ছিলেন। ৩. শূলসুধা জামে মসজিদ (হাজী নূর হোসায়েনের বাড়ীর বিপরীতে)ঃ অন্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তবে আলহাজ্জ নূর হোসায়েন একবার মুতাওয়াল্লী ছিলেন এবং পাঁচরুখীর মাওলানা নূরুল হক কয়েক বৎসর ইমাম ছিলেন। ৪. ফুলবাড়িয়া বাস ষ্ট্যান্ড মসজিদঃ মুতাওয়াল্লী ছিলেন সুরিটোলার লাল মিঞা। পরে তাঁর পুত্র হাফেয মুহিউদ্দীন এখনও মুতাওয়াল্লী আছেন। ৫. সদরঘাটের বিপরীতে বুড়িগঙ্গার ওপারে কালিগঞ্জ বাজার মসজিদঃ বংশালের হাজী বদরুদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে তাঁর বংশের একজন বাদে বাকী সবাই এখানে হানাফী হয়ে গেছেন। -তথ্যঃ ২৪.৬.১৯৮১খৃঃ ; মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিম (৫৩) (খতীব, নাযিরাবাজার আহ্লে হাদীছ জামে মসজিদ), আলহাজ্জ সিরাজুল হক (৬০) (আগা সাদেক লেন), হাফেয মুহিউদ্দীন (৬২) সুরিটোলা, আলহাজ্জ আবদুর রহমান (৬২) ফ্রেঞ্চ রোড, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল আযীয (৫৮) বংশাল, আলহাজ্জ ইসমাঈল হোসাইন নওয়াব (৪৬) বংশাল, আলহাজ্জ বেলায়েত আলী (৫০) নাযিরাবাজার, আলহাজ্জ সরদার আবদুল আযীয (৫০) বংশাল, অধ্যাপক সহীফুল ইসলাম (৫৮) খতীব, সুরিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, অধ্যাপক মোজাম্মেল হক (৫৫) বংশাল, শরীফ হোসাইন (৫৯) নাযিরা বাজার , ঢাকা।-তাং ১৫.১২.৯৫ইং। ৬. রাজশাহী শহরের মীরের চক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শহরে এরূপ নযীর কম নয়।

অধ্যায়-১১

الفصل الحادى عشر

উপসংহার

الخاتمة

একটি আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মপন্থার উপরে। এই কর্মপন্থা বাস্তবায়নের জন্য সাংগঠনিক ঐকান্তিকতা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। এজন্য যোগ্য নেতৃত্ব ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী অপরিহার্য হিসাবে বিবেচিত হয়। আন্দোলনের আদর্শ এদের দ্বারা সাধারণ মানুষের নিকটে পৌঁছে থাকে এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অনুপ্রাণিত হ'য়ে মানুষ তা গ্রহণ করে। এমনকি এ আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্য তারা জীবন ও সম্পদ কুরবানী দিতেও দ্বিধাবোধ করেনা। এই প্রেক্ষিতে আমরা আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনকে একটি সংস্কারবাদী ও আদর্শ আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করতে পারি। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই আন্দোলনটি ভারত উপমহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং মুসলিম সমাজের সংস্কারের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। এ আন্দোলনের কার্যক্রমের ধারা এত ব্যাপক যে, এর উপরে তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা শ্রমসাধ্য। তবুও বিষয়টির উপরে প্রথম আনুষ্ঠানিক গবেষণা প্রচেষ্টা হিসাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করে এ আন্দোলনের একটি সমন্বিত রূপরেখা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি মাত্র।

পরিশেষে বলা চলে যে, আহ্‌লেহাদীছ কোন ইজম বা মতবাদের (School of thought) নাম নয়। এটি একটি পথের নাম। যে পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র পথ। যে পথের শেষ ঠিকানা জান্নাত। মতবাদ বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে মানুষকে তার সার্বিক জীবনে সকল দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানায় এ আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে জড়তাগ্রস্থ ভারতীয় মুসলিম সমাজে তাকলীদে শাখ্‌ছীর বদলে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের জায্‌বা সৃষ্টি হয়।

যুগজিজ্ঞাসার জওয়াব দানের জন্য ইজতিহাদের পরিচর্যা শুরু হয়। পূর্বনির্ধারিত উছূল বা আইনসূত্রের আলোকে কুরআন-সুন্নাহ্‌কে বিচার না করে বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের আলোকে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান তালাশে উলামায়ে কেরাম ব্রতী হন। মুসলমানগণ তাদের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে সরাসরি আলো গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়।

এই আন্দোলনের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, প্রকৃতি ও গতিধারা সম্পর্কে দু'খন্ডে ভূমিকা ও উপসংহারসহ মোট ১১টি অধ্যায়ে বিভাজন করে সন্দর্ভটি রচনা করা হ'ল।

والله أعلم بالصدق و الصواب و إليه المرجع والمآب - لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، واعف عنا واغفرلنا و ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين - اللهم اغفر للباحث الفقير إلى مغفرتك الواسعة الكبير و تقبل سعيه و جهوده بقبول حسن و اجعلها وسيلة لنجاته و لوالديه فى الاخرة و اغفر له و لاهل بيته و لوالديه و لأساتذه الكرام و لأحبائه المخلصين العظام و للمؤمنين و المؤمنات الذين بذلوا جهودهم ليلا و نهارا لإقامة شريعة الوحى المنزل على نبيه الاخر صلى الله عليه و سلم فى جميع شئون الحياة و شعوبها اجمعين ، امين - و صلى الله على نبينا محمد و اله و صحبه و سلم -

أهل الحديث هم أهل النبي و إن + لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا

পরিশিষ্ট-ক

الضميمة (الف)

১- নেপালে আহলেহাদীছ আন্দোলন (حركة أهل الحديث فى نيبال) ঃ

উত্তরে চীনের তিব্বত অঞ্চল ও বাকী তিনদিকে ভারত বেষ্টিত পৃথিবীর একমাত্র ঘোষিত স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র নেপালের বর্তমান জনসংখ্যা ১ কোটি আশি লক্ষ।[১] অধিকাংশ হিন্দু ও বৌদ্ধ এবং ১০% শতাংশ মুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে ২% শতাংশ আহলেহাদীছ। বাদবাকী ব্রেলভী ও দেওবন্দী হানাফী। তবে ব্রেলভীদের সংখ্যা বেশী। অন্য কোন মাযহাবের লোক নেই। প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে, নেপালে ধর্মান্তর করণ সরকারীভাবে নিষিদ্ধ।[২]

পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত ৯৯০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ও ১৪৪-২৪১ কিলোমিটার প্রস্থ ৫৪ হাজার বর্গমাইলের চিরস্বাধীন এই দেশটির ৬৪ শতাংশ এলাকা পাহাড় বেষ্টিত, যা মনুষ্যবসতির অযোগ্য। দেশটি ১৪টি অঞ্চল ও ৭৫টি জেলা নিয়ে গঠিত।[৩] তন্মধ্যে হিম্‌লা ও জুম্‌লা ব্যতীত প্রায় সকল জেলাতেই মুসলমান রয়েছে। নারায়নী অঞ্চলের রুটাহাট জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা সর্বাধিক। অন্যদিকে লুম্বানী অঞ্চলের কপিলবস্তু জেলায় আহলেহাদীছ মুসলমানের সংখ্যা সর্বাধিক। নারায়নী অঞ্চলের পারসা জেলার বীরগঞ্জ সি,ডি,ও-র বাহুওয়ারী মহল্লার মুজাহেদীন পরিবারগুলি নেপালের সর্বপ্রাচীন আহলেহাদীছ পরিবার বলে খ্যাত। এই জেলার বাহুওয়ারী, দেওরবানা ও ইসলামপুরের সকল মুসলমান আহলেহাদীছ এবং রতনপুর, কাঞ্চনপুর ও বালুওয়া গ্রামের অধিকাংশ বাশিন্দা আহলেহাদীছ।

নেপালের আহলেহাদীছ এলাকাসমূহ নিম্নরূপঃ ১। লুম্বানী অঞ্চলের মধ্যে কপিলবস্তু, রুপনডিহি ও নাওয়ালপারাসী জেলা ২। নারায়নী অঞ্চলের মধ্যে বারাহ, পারসা ও রুটাহাট জেলা ৩। রাপ্‌তী অঞ্চলের মধ্যে দাঙ্গা জেলা ৪। জনকপুর অঞ্চলের মধ্যে ধানূসা জেলা ৫। সাগরমাথা অঞ্চলের মধ্যে সিরহা জিলা ৬। কুশী অঞ্চলের মধ্যে সুন্‌সারী জেলা ৭। মীচী অঞ্চলের মধ্যে ঝাপা

জেলা এবং ৮। বাগমতি অঞ্চলের মধ্যে রাজধানী কাঠমন্ডু শহরে কয়েকঘর আহ্লেহাদীছ আছেন। কুশী ও মীচী অঞ্চলের আহ্লেহাদীছগণ সবাই বাঙ্গালী।

কপিলবস্তু জেলা শহর হ'তে তিনমাইল উত্তরে গৌতম বুদ্ধের রাজধানী তেলাওয়া কোর্ট অবস্থিত। অনেকের ধারণা কুরআনে বর্ণিত নবী 'যুলকিফ্ল' (ذو الكفل) -এর নামানুসারে কপিলবস্তু নামকরণ করা হয়েছে। এমনকি বুদ্ধই সেই নবী কি-না, কে বলবে?

নেপালের বর্ষিয়ান আহ্লেহাদীছ আলিম খ্যাতনামা লেখক ও বাগ্মী, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী কেন্দ্রীয় কমিটির একমাত্র নেপালী সদস্য মাওলানা আব্দুর রউফ ঝান্ডানগরী (৮০) বলেন যে, নেপালে কখন থেকে ইসলাম প্রবেশ লাভ করেছে, তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও এটা যে পার্শ্ববর্তী ভারতের উত্তর প্রদেশের বস্তী, গোন্ডা, গোরক্ষপুর এবং বাংলাদেশ এলাকা হ'তে আগত মুসলমানদের একনিষ্ঠ প্রচারের মাধ্যমেই ঘটেছে, এটা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যায়। একই সাথে শহীদায়েন-এর জিহাদ আন্দোলনের ঢেউ ও এখানে লাগে এবং আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের সূচনা হয়। লুম্বানী অঞ্চলের রূপনডিহি জেলার ভিঁসাগাহান গ্রামের মরহুম মাওলানা সা'দী শায়খুল ইসলাম মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২)-এর ছাত্র ছিলেন। তাঁর আন্দোলনের ফলে আশপাশের কয়েকটি গ্রামের লোক 'আহলেহাদীছ' হয়ে যায়। আহ্লেহাদীছ এলাকাগুলি সাধারণতঃ সীমান্ত এলাকা বরাবর অবস্থিত। নারায়নী অঞ্চলের রুটাহাট জেলা বিহারের নিকটবর্তী হওয়ায় এখানে ছাদেকপুরী পরিবারের প্রভাব অধিক পড়ে। ফলে এখানে বহু আহ্লেহাদীছ রয়েছেন। যদিও সাধারণভাবে ব্রেলভী হানাফীদের সংখ্যাই বেশী। নেপালে কোন শী'আ নেই।[৪]

বাংলাদেশে শহীদায়েনের খলীফা রফী মোল্লার একমাত্র জীবিত পৌত্র বর্তমানে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরের শ্রীমন্তপুর গ্রামের বাশিন্দা খ্যাতনামা আলিম মাওলানা আহমাদ হুসাইন (৭৯) বিন সাখাওয়াতুল্লাহ বিন রফী মন্ডল বলেন যে, নেপালের ঝাপা ও ভদ্রপুর এলাকার বিরাট সংখ্যক আহলেহাদীছ অধিবাসী তাঁদের মুরীদ এবং অনেকে নদী ভাঙ্গনের ফলে বাংলাদেশের মূল কেন্দ্র নারায়ণপুর প্রভৃতি এলাকা হ'তে হিজরত করে পার্শ্ববর্তী নেপালের এইসব

অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন।[৫] বলা বাহুল্য নেপালের কুশী ও মীচী অঞ্চলের আহলেহাদীছগণ নিয়মিত বাংলায় কথা বলেন ও তাঁদের পারিবারিক জীবনে বাঙ্গালী রসম-রেওয়াজ চালু আছে।[৬]

উপরের দু'টি বর্ণনা হ'তে ধরে নেওয়া যায় যে, নেপালে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন শুরু হয়েছে প্রথমে জিহাদ আন্দোলনের প্রভাবে বাংগালী ও বিহারী প্রচারকদের মাধ্যমে ও মিয়াঁ ছাহেবের ছাত্র মাওলানা সা'দীর মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে ভারতের উত্তর প্রদেশের বস্তী ও গোন্ডা জেলার উলামায়ে আহলেহাদীছের মাধ্যমে। এর আরেকটি প্রমাণ হ'ল এই যে, নেপালের নারায়নী অঞ্চলের পারসা জেলার বীরগঞ্জ সি,ডি,ও-র বাহুওয়ারী মহল্লার অধিকাংশ বাশিন্দা মুজাহেদীনে বালাকোটের বংশধর। তাঁরা বালাকোট যুদ্ধের (৬ই মে ১৮৩১ ইং) পর থেকেই এখানে বসবাস করছেন। বর্তমানে এই বংশের সেরা আলিম হলেন মাওলানা জামীল আহমাদ (৪৫) ও মাওলানা ডাঃ কাফীলুর রহমান(৫৫)। নেপালী আলিমদের ধারণামতে এরাই হলেন নেপালের সর্বপ্রাচীন আহলেহাদীছ বাশিন্দা।

নেপালে আহ্‌লেহাদীছের অন্যান্য তথ্যাবলী

১। বিভিন্ন শহরে আহ্‌লেহাদীছ জামে মসজিদঃ

নেপালের বড় শহরগুলির মধ্যে পারসা জেলার বীরগঞ্জ সি, ডি, ও-তে বাহুওয়ারী মহল্লার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও সবচেয়ে প্রাচীন। অতঃপর নগর পঞ্চায়েত শহরের হিসাবে কপিলবস্তু জেলার অন্তর্গত তাওলহুয়া বা তাউলিয়া শহরের মসজিদ কপিলবস্তু সহ সমগ্র নেপালের মধ্যে মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা বড় জামে মসজিদ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট বহু মসজিদ আছে। কিন্তু প্রধানতঃ আর্থিক কারণে সেগুলির অধিকাংশই কাঁচা। রাজধানী কাঠমন্ডুতে কোন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ নেই। সেখানে হানাফীদের মোট চারটি মসজিদ আছে। একটি ঘন্টাঘরের উত্তর পার্শ্বে ব্রেলভীদের কাশ্মীরী মসজিদ। ২য়-ঘন্টাঘরের দক্ষিনপার্শ্বে দেউবন্দীদের নেপালী মসজিদ ৩য়-মেইনবাজারে অবস্থিত দেওবন্দী-ব্রেলভীদের মিলিত রাক্বী মসজিদ ৪র্থ-কাঠমন্ডু থেকে বারো মাইল দূরে ভগতপুরের দেওবন্দী মসজিদ।

২। আহ্‌লেহাদীছ মাদরাসাঃ

(১) জামে'আ সিরাজুল উলূম আস্-সালাফিইয়াহ্ঃ ১৯১৪ সালে মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝান্ডানগরীর পিতা আলহাজ্জ নে'মাতুল্লাহ বিন মোতী খান বিন বখ্তিয়ার খান (বস্তী, উত্তর প্রদেশ, ভারত) কর্তৃক অত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি প্রথমে দেউবন্দী হানাফী ছিলেন। একবার মাদরাসার জালসায় মাওলানা ছানাউল্লাহ্ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮)-কে দাওয়াত দিয়ে আনা হয়। তাঁর বক্তৃতায় তিনি প্রভাবিত হন। পরে বিহারের মশহুর ছাপড়া জালসা শোনার পরে তিনি আহ্‌লেহাদীছ হয়ে যান। মাদরাসাটি উত্তর প্রদেশের বঢ়নী বাজার (BARHNI) রেলষ্টেশন সীমানা হ'তে আনুমানিক মাত্র দশহাত উত্তরে কপিলবস্তু জেলার প্রাণকেন্দ্র ঝান্ডানগর বা বর্তমান কৃষ্ণনগর বাজারে অবস্থিত। কাঠমন্ডু হ'তে কৃষ্ণনগর সরাসরি কোচ চলাচল করে। মাওলানা ঝান্ডানগরী স্বয়ং মাদরাসার পরিচালক। এই মাদরাসা পরিচালনার জন্য তাঁর পিতা ৭০০শত বিঘা কৃষি জমি ওয়াক্ফ করে দেন। যদিও তাঁর জন্মস্থান এখানে থেকে ২০ কিঃমিঃ উত্তরে 'কাদারবাট্ওয়া' গ্রামে, যেখানে সবাই আহ্‌লেহাদীছ। বর্তমানে সমস্ত নেপালে এটি সকল দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড় মাদরাসা। অবশ্য বয়সের হিসাবে নারায়নী অঞ্চলে রুটাহাট জেলার রাজপূর গ্রামের মাদরাসা মাহমূদিয়াহ্ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। গত ১৯৮৬ সালে হানাফী পরিচালিত এই মাদরাসার শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে।

(২) আল-মা'হাদ আল-ইসলামী তাওলহুয়াঃ কপিলবস্তু জেলার নগরপঞ্চায়েত শহর তাওলহুয়া সি,ডি, ও-কেন্দ্রে ১৯৮১ সালে আহ্‌লেহাদীছদের এই দ্বীনী দরস্গাহ্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাদরাসায় বর্তমানে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ফারেগ তিনজন সঊদী মাবঊছ সহ অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী কার্যরত রয়েছেন। তন্মধ্যে নেপালের একমাত্র ইসলামী পত্রিকা উর্দূ মাসিক 'নূরে তাওহীদ'-এর সম্পাদক জনাব আব্দুল্লাহ মাদানী অন্যতম। এই মাদরাসা সংলগ্ন জামে মসজিদটিই বর্তমানে নেপালের সবচেয়ে বড় জামে মসজিদ হিসাবে পরিগণিত।

(৩) জামে'আ সালাফিইয়াহ জনকপুরঃ শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রী বলে খ্যাত সীতা বা

জানকীর পিতা রাজা জানক-এর রাজধানী জানাকপুরে ১৯৭০ সালে এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৪) মাদরাসা আরাবিয়াহ কানযুল উলূম সালাফিইয়াহ, রংপুর (কানাইয়া)। বীরগঞ্জ শহর হতে বারো কিলোমিটার পূর্বে বারাহ্ জেলায় অবস্থিত।

(৫) মাদরাসা আরাবিয়াহ মাখ্যানুল উলূম সালাফিইয়াহ, রামওল, জেলা-সিরহা। এখানে মাওলানা উসাইদ রহমানী নামক জনৈক আহলেহাদীছ আলিম অন্যূন ৪০ বৎসর যাবত দাওয়াত ও ইছলাহের কাজ করে আসছেন।

(৬) মাদরাসা দারুল হুদা সালাফিইয়াহ কুমিয়াহী (শ্রীপুর), জেলা- সুনসারী, কৃশী অঞ্চল।

(৭) মাদরাসা ইসলামিয়া রুহিমারী, পোঃ ও জেলা- ঝাপা, মিচি অঞ্চল। শেষোক্ত মাদরাসা দু'টি বাংগালীদের। তাদের ঘরে এখন ও বাংলা বেশ জোরে শোরেই চালু আছে। সুনসারী এলাকা বিহারের সংগে এবং রুহিমারী এলাকা পশ্চিম বঙ্গের সীমানা সংলগ্ন।

উপরে বর্ণিত মাদরাসাগুলি ছাড়াও শহরে গ্রামে ছোটখাট মক্তব ও মাদরাসা সমূহ চালু আছে।

৩। আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র সমূহঃ

আন্দোলনের প্রাচীন কেন্দ্র হিসাবে মাদরাসা সিরাজুল উলূম, ঝান্ডানগর-কে ধরা যায়, যা রাজধানী কাঠমন্ডু হতে সড়কপথে ৩৫০ কিলোমিটার দূরে লুম্বানী অঞ্চলের কপিলবস্তু জেলায় অবস্থিত। মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝান্ডানগরীর প্রধান কর্মস্থল এখানেই। এখানকার শিক্ষক ও ছাত্র বৃন্দ সকলেই কমবেশী আন্দোলনে জড়িত আছেন। মাওলানার লেখনী ও বাগ্মিতা নেপালে ও ভারতে খুবই জনপ্রিয়। কৃষ্ণনগর শহরে বর্তমানে ৬৫ ঘর আহলেহাদীছ আছেন।

আন্দোলনের নতুন কেন্দ্র কপিলবস্তু জেলার হেড অফিস (C.D.O) তাওলহুয়া শহরের মাদরাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, যা ঝান্ডানগর হ'তে রেল ও সড়কপথে ২৫+২০=৪৫ কিঃমিঃ পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে বিশেষ করে তরুণ কর্মী ও আন্দোলনগতপ্রাণ সঊদী মাবউছ মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানীর

(৩৩) উৎসাহে শিক্ষকগণ প্রতি ১৫দিন অন্তর গ্রামে চলে যান ও দাওয়াতী মজলিস করেন। ছাত্র-শিক্ষক মিলিত ভাবেও মাঝে মধ্যে অনুষ্ঠান করেন।[৭] সেখানে অন্যান্য ওলামায়ে কেরামকে ও দাওয়াত দিয়ে আনা হয়। নিম্নে অঞ্চলওয়ারী আন্দোলনের বিবরন দেওয়া হ'ল। -

১. লুম্বানী অঞ্চলঃ নেপালে আহলেহাদীছ আন্দোলন সামষ্টিক উদ্যোগের চেয়ে ব্যক্তি উদ্যোগেই বেশী হয়েছে। আন্দোলনের কেন্দ্র বলে পরিচিত লুম্বানী অঞ্চলের কপিলবস্তু জেলার ঝান্ডানগর বা কৃষ্ণনগর শহরে যে ৬৫ ঘর আহলেহাদীছ আছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব রিয়াযী (৫৫)-এর মরহুম পিতা মাওলানা মিয়াঁ মুহাম্মাদ যাকারিয়া ছাহেবের তাবলীগের ফলেই আহলেহাদীছ হয়েছেন। কৃষ্ণনগর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী ভারতের উত্তর প্রদেশের বঢ়নী এলাকার বহু লোক তাঁর প্রভাবে আহলেহাদীছ হন। এমনি ভাবে মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ছাহেবের নয় বছরের একটানা প্রচেষ্টার ফলে তাওলহুয়া থেকে তিনমাইল দক্ষিণে 'পূখর ভাটুয়া' গ্রামের সমস্ত ব্রেলভী হানাফী ১৯৬৪ সালের দিকে 'আহলেহাদীছ' হয়ে যান। এতদ্ব্যতীত এই অঞ্চলে কপিলবস্তু জেলার মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফ (৬০), মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী (৩৩), মাওলানা আব্দুল হাই মাদানী (৩০), মাওলানা মোস্তফা মাদানী (৩৮) এবং রূপনডিহি জেলার প্রসিদ্ধ বাগ্মী মাওলানা আব্দুর রহীম আমজাদ রিয়াযী নেপালী (৫০), মাওলানা শফীকুর রহমান ফায়যী (৪৫), মাওলানা আব্দুর রহমান রিয়াযী (৫০), মাওলানা কলীমুল্লাহ সঊদী মাবঊছ প্রমুখ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

২. জনকপুর অঞ্চলঃ এই অঞ্চলে বিহারের মধুবণ জেলার মাওলানা শামসুল হক ছাহেবের তাবলীগে আহলেহাদীছের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এমনিভাবে তাঁর সহোদর বড় ভাই মরহুম মাওলানা আয়নুল হক-এর খিদমত ও ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। তবে এঁরা কেউ নেপালের স্থায়ী বাশিন্দা হননি। বর্তমানে এই অঞ্চলে ধানূসা জেলার মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম সালাফী দারভাঙ্গাবী (৪৫), মাওলানা হাবীবুর রহমান, মাওলানা আব্দুস সামী' প্রমুখ সঊদী মাবঊছগণ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ জোরে শোরে চালিয়ে যাচ্ছেন।

(৩) **নারায়নী অঞ্চলের** পারসা জেলার শায়খ আব্দুল মতীন সালাফী ইসলামপুরী (৫০), ডাঃ মাওলানা কফীলুর রহমান দারভাংগাবী (৫০) প্রমুখ দাওয়াতের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

(৪) **সাগরমাথা অঞ্চলে** সিরহা জেলার মাওলানা নূর মুহাম্মাদ সালাফী, মাওলানা উসাইদ রহমানী ও মাওলানা মুহাম্মাদ শু'আইব (সঊদী মাবঊছ) দায়িত্ব পালন করছেন।

(৫) **কুশী অঞ্চলে** ঝাপা জেলায় মাওলানা আব্দুর রঊফ কাসেমী আন্দোলনে রত আছেন।

মোটকথা ভারতের উত্তর প্রদেশের উলামায়ে আহলেহাদীছ বস্তী জেলার দারুল হুদা ইউসুফপুর এবং নেপালের জামে'আ সিরাজুল উলূম-এর প্লাটফরম থেকেই নেপালে আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। বর্তমানে যারা নেপালী আলিম, তাঁদের অধিকাংশই পার্শ্ববর্তী ভারতের উত্তর প্রদেশেরই মূল বাশিন্দা ছিলেন।

প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ উলামায়ে মারহুমীন-যাঁরা নেপালে অবদান রেখেছেনঃ-

১- **মাওলানা সা'দী।** যিনি মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্র ছিলেন। ইনি লুম্বানী অঞ্চলের রূপনডিহি জেলার ভিসাঁগাহান গ্রামের বাশিন্দা ছিলেন। এই গ্রামের আশপাশের কয়েকটি গ্রাম এখনও আহলেহাদীছ।

২- **এতদ্ব্যতীত হিন্দুস্থানের** যেসকল আলিম নেপালে এসে আহলেহাদীছ আন্দোলনে অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে উত্তর প্রদেশের বস্তী জেলার বেত্‌নার গ্রামের মাওলানা মিয়াঁ মুহাম্মাদ যাকারিয়া সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইনি জামে'আ সিরাজুল উলূমের শিক্ষক হিসাবে ১৯১৬ সালে নেপালে আগমন করেন ও ঝান্ডানগরে বসতি স্থাপন করেন। দীর্ঘ ৬০ বছর যাবত তিনি উক্ত মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন এবং ৮২ বছর বয়সে ১৯৮৬ সালে ইন্তেকাল করেন। প্রধানতঃ তাঁর চেষ্টাতেই ঝান্ডানগরে ৬৫ ঘর লোক বর্তমানে আহলেহাদীছ।

৩- **মাওলানা আবদুল গফুর বিস্‌কুহারী।** ইনি ও বস্তী জেলার বাশিন্দা। ১২ বছর জামে'আ সিরাজুল উলূমে শিক্ষকতা করার পর ১৯৬৪ সালে স্বদেশে চলে

যান। ১৯৮৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

৪- মাওলানা আবদুর রহমান বীজওয়ারী। ইনি ও বস্তী জেলার বাশিন্দা। ইল্‌মে ফারাইযের মশহুর আলিম। বারো বছর যাবত জামে'আ সিরাজুল উলূমে শিক্ষকতা করার পর ১৯৫৯ সালের দিকে দেশে ফিরে মারা গেছেন।

৫- মাওলানা মুহাম্মাদ যামান ছাহেব রহমানী। ইনি বস্তী জেলার উত্‌রীবাজারের বাশিন্দা। তিন বারে পুরা ত্রিশ বছর জামে'আ সিরাজুল উলূমে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭০ সালে দেশে ফিরে সম্ভবতঃ ১৯৭৪ সালে মারা গিয়েছেন।

৬- মাওলানা আবদুর রহমান। ইনি বস্তী জেলার ডুক্‌মী গ্রামের বাশিন্দা। ৫/৭ বছর জামে'আ সিরাজুল উলূমের শিক্ষক ছিলেন। প্রায় ৫০ বছর পূর্বে দেশে গিয়েছেন। বর্তমানে মৃত।

৭- মাওলানা মুহাম্মাদ খলীল ছাহেব। ইনিও বস্তী জেলার বাশিন্দা। সিরাজুল উলূমে ১২ বছর যাবৎ শিক্ষক ছিলেন। ৫০ বছর পূর্বে দেশে ফিরে গিয়েছেন। বর্তমানে মৃত।

নেপালের প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ উলামায়ে কেরাম ও সুধীবৃন্দঃ-

১। মাওলানা আবদুর রঊফ ঝান্ডানগরী (৮০)। জামে'আ সিরাজুল উলূমের পরিচালক, বর্ষিয়ান আলিম, খ্যাতনামা বাগ্মী, লেখক ও গ্রন্থকার, রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর একমাত্র নেপালী প্রতিনিধি।

২। মাওলানা আবদুর রহীম আমজাদ রিয়াযী নেপালী (৫০)। বর্তমানে নেপালের সেরা বাগ্মী হিসাবে প্রসিদ্ধ। লুম্বানী অঞ্চলের রূপনডিহি জেলার পারাওয়া গ্রামে বাড়ী, পোঃ খুনগাঈ।

৩। মাওলানা আবদুল্লাহ মাদানী ঝান্ডানগরী (৩৩)। ইনি সঊদী মাবউছ এবং তাউলহুয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। নেপালের একমাত্র ইসলামী পত্রিকা উর্দূ মাসিক 'নূরে তাওহীদ'-এর মালিক ও সম্পাদক। আন্দোলনগতপ্রাণ এই উৎসাহী তরুণ আলিম ভবিষ্যতে নেপালে আহলেহাদীছ আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করা যায়।

৪। বর্তমানে নেপালের মোট ২১ জন সঊদী মাবঊছের মধ্যে ১৬জনই আহলেহাদীছ। তাঁরা স্ব স্ব কর্মস্থলে ও গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

৫। এতদ্ব্যতীত মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব রিয়াযী (৫৫), মাওলানা আবদুর রহমান নদভী (৬০), মাওলানা হাকীকুল্লাহ ফায়যী (৫০) প্রমুখ ছাড়াও নাদ্ওয়াতুল উলামা লাক্ষ্ণৌ, ফায়যে আম মৌ, রিয়াযুল উলূম দিল্লী, দারুল উলূম আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ দারভাঙ্গা, বিহার হ'তে ফারেগ বহু ওলামায়ে কেরাম রয়েছেন।

৬। নেপালের নামকরা আহলেহাদীছ সুধীবৃন্দের মধ্যে কাঠমন্ডু কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট তাহের আলী- যিনি ইতিমধ্যে কয়েকটি যরূরী আরবী বই নেপালী ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন এবং কাঠমন্ডুর ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক হাবীবুল্লাহ্র নাম উল্লেখযোগ্য।

৭। নেপালে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর একমাত্র ছাত্র মাওলানা সা'দী আহলেহাদীছ ছিলেন।

৮। নেপালের সঊদী মাবঊছদের তত্ত্বাবধায়ক 'মুশরিফ' মাওলানা আবদুল্লাহ মাদানী আহলেহাদীছ।[৮]

একটি মজার বিষয় এই যে, নেপালের উল্লেখযোগ্য আলিমগণ বলতে গেলে কেউই নেপালী ভাষায় কথা বলেন না। তাঁদের বক্তব্য হলো যে, তাঁরা নেপালী ভাষা জানেন না। এমনকি কাঠমন্ডুর ঘন্টাঘর দেওবন্দী মসজিদের দীর্ঘ ৪২ বৎসরের প্রবীণ নেপালী ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ হায়াত দেউবন্দীও নেপালী ভাষা বলতে পারেন না। সকলেই উর্দূ বলেন ও লেখেন।

উল্লেখ্য যে, (১) নেপালের সেরা আলিম মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝান্ডানগরী আহলেহাদীছ (২) নেপালের সবচেয়ে বড় মাদরাসা সিরাজুল উলূম আহলেহাদীছদের (৩) সবচেয়ে বড় মসজিদ তাওলহুয়া আহলেহাদীছদের (৪) একমাত্র ইসলামী পত্রিকা 'নূরে তাওহীদ' আহলেহাদীছ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। (৫) নেপালের একমাত্র রাবেতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝান্ডানগরী আহলেহাদীছ (৬) নেপালের বর্তমান সেরা বাগ্মী মাওলানা আব্দুর রহীম আমজাদ আহলেহাদীছ।

১। মাওলানা আবদুর রঊফ ঝান্ডানগরী (জন্ম ঃ ১৯১০ খৃঃ)

মাওলানা আবদুর রঊফ বিন নে'মাতুল্লাহ্ বিন মোতী খান বিন বখ্‌তিয়ার খান (বস্তী, ইউপি, ভারত) নেপালের কপিলবস্তু জেলার ঝান্ডানগর হ'তে ২০ কিলোমিটার উত্তরে 'কাদারবাটুয়া' গ্রামের এক স্বচ্ছল দেওবন্দী হানাফী আলিম পরিবারে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত ভোঁতা মেধার অধিকারী ছিলেন। পড়ার ভয়ে ঘরের অন্ধকার কোণে লুকিয়ে বেড়াতেন।

শিক্ষাজীবনঃ ধনী পিতা স্বীয় দুর্বল মেধার সন্তানকে লেখাপড়া শিখানোর জন্য বস্তী জেলার খ্যাতনামা শিক্ষক মিয়াঁ মালেক আলী ছাহেবকে গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের। ছাত্রমহলে 'কসাই' নাম পড়ে গিয়েছিল। শিশু আবদুর রঊফকে তিনি নির্দয়ভাবে পিটাতেন। তবু লেখাপড়ার স্বার্থে পিতা এগুলি বরদাশ্‌ত করতেন। পরবর্তীকালে মাওলানা আবদুর রঊফ তাঁর আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন যে, শিশুকালে উস্তাদের মারের ভয়ে যেভাবে দিনরাত খেটে পড়া তৈরী করতাম, বড় হ'য়ে সেটাই আমার অভ্যাসে পরিণত হয় এবং বলা চলে যে, ছোটবেলায় উস্তাদের মারের ভীতিই ছিল আমার পরবর্তী জীবনের উন্নতির চাবিকাঠি।'

গৃহশিক্ষকের নিকটে পাঠগ্রহণ শেষে তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত ঝান্ডানগর মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে মাওলানা খলীল আহমাদ বিসকূহারীর নিকটে মীযান, মুনশা'আব পড়েন। বলা বাহুল্য এখানে ও রীতিমত মারপিটের মধ্য দিয়েই তাঁর লেখাপড়া চলে। অতঃপর তিনি 'নাদ্‌ওয়াতুল উলামা' লাক্ষ্মৌতে যান। তখন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলিম মাওলানা হাফীযুল্লাহ নাদ্‌ভী আ'যমী নাদ্‌ওয়ার মুহ্‌তামিম ছিলেন। কিন্তু পদ্ধতিগত কারণে ভর্তি হ'তে না পারায় বেনারসের মদনপুরা মাদরাসায় গিয়ে ভর্তি হন এবং সেখানে মাওলানা মুনীর আহমদের নিকটে পড়তে থাকেন। মাওলানা স্বীয় আত্মজীবনীতে বলেন যে, 'এই সময় আমার তবীয়ত পড়াশুনার কষ্ট সহ্যের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে গিয়েছিল।'

বেনারস থাকাকালীন মায়ের কঠিন অসুখের খবর শুনে দেশে ফেরেন এবং ঝান্ডানগরে বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক মাওলানা আবদুল গফূর ও অন্যান্য শিক্ষকমন্ডলীর নিকটে পড়তে থাকেন। এখানে ৬ষ্ঠ জামা'আত শেষ করার পর তিনি 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া' দিল্লী গমন করেন। তখন সেখানে মাওলানা

আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়হী, নাযীর আহমাদ আমলুবী, ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, আবদুর রহমান নাহ্ভী প্রমুখ খ্যাতনামা বিদ্বানগণ শিক্ষকের পদে বৃত ছিলেন। মাওলানা আবদুর রঊফ সেখানে ভর্তি পরীক্ষায় টিকে গিয়ে ৭ম জামা'আতে ভর্তি হন। অক্লান্ত খাটুনীর মধ্য দিয়ে লেখাপড়ার ফল এই দাঁড়ায় যে, তিনি সর্বদা ক্লাশে প্রথম ও সেরা ছাত্র হিসাবে গণ্য হ'তেন এবং দারুল হাদীছ রহমানিয়ার সর্বশেষ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কর্মজীবন ঃ শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র হিসাবে শিক্ষাজীবন শেষ করার সাথে সাথে তিনি দারুল হাদীছ রহমানিয়ার শিক্ষক পদে বৃত হন। পঞ্চম জামা'আত পর্যন্ত পড়ানো সত্ত্বেও বিলাতী, পাঞ্জাবী, বিহারী, বাংগালী সকল এলাকার ছাত্র তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু বছর না পেরোতেই মাদরাসাতে সংঘটিত এক দুঃখজনক ঘটনায় ইউ,পি-এর সমস্ত ছাত্র চলে যায়। ফলে তিনিও তাদের সাথে মাদরাসা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অতঃপর তিনি ঝান্ডানগর মাদরাসা সিরাজুল উলূমে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সেখানে দু'বছর অবস্থানের পর সাবেক শিক্ষাস্থল জামে'আ রহমানিয়া মদনপুরা, বেনারসে আহূত হন। সেখানে তিন বছর থাকার পর পিতার আহবানে বাধ্য হ'য়ে তিনি পুনরায় ঝান্ডানগরে ফিরে আসেন। এখানে এসে শিক্ষকতার সাথে সাথে মাদরাসার দেখাশুনার কাজেও তাঁকে অংশ নিতে হয়। শিক্ষকতা ও কর্মজীবনের বাকী অংশটি সম্ভবতঃ এই মাদরাসাকে কেন্দ্র করেই চলতে থাকে। বর্তমানে তিনি পিতার মৃত্যুর পরে নেপালের এই শ্রেষ্ঠ মাদরাসাটির তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বলাবাহুল্য ছাত্রজীবনে তিনি যেমন একজন অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিলেন, শিক্ষকতার জীবনেও তেমনি একজন সফল শিক্ষক হিসাবে সকল মহলের প্রশংসা ভাজন হয়েছেন।

বাগ্মীতাঃ বেনারসের মদনপুরায় ছাত্রজীবনে সাপ্তাহিক 'আন্জুমান' থেকেই তাঁর মধ্যে বাগ্মীতার স্ফুরণ ঘটে। 'চরিত্র' বিষয়ক কথিকার উপরে প্রথম বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে ভয়ে তাঁর দেহ কাঁপতে থাকে। এক পর্যায়ে তাঁর হাতে ধরে রাখা নোট কপিগুলি অজান্তে খসে পড়ে। কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারেননি। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি বলেন- 'এটাই ছিল সেই ব্যক্তির জীবনে প্রথম বক্তৃতার অভিজ্ঞতা যিনি পরবর্তীতে দেড়লক্ষ লোকের বিরাট সমাবেশে নির্ভয়ে বক্তৃতা করে শ্রোতাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।' ছাত্রজীবনে

তিনি নিয়মিত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বক্তৃতার অনুশীলন করতেন, যা তাঁকে পরবর্তী জীবনে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হ'তে সাহায্য করে। দারুল হাদীছ রহমানিয়া থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যে ছাত্র প্রতিনিধিদল পাঠানো হ'ত, তাতে প্রায়ই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। দারুল হাদীছ রহমানিয়াতে প্রদত্ত তাঁর শিক্ষাজীবনের সর্বশেষ বক্তৃতা ছিল সত্যিই স্মরণীয়। উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন দিল্লীর জামে'আ মিল্লীয়ার প্রধান ডঃ যাকির হুসাইন (পরবর্তীতে ভারতের প্রেসিডেন্ট), উক্ত জামে'আর অন্যতম অধ্যাপক হাফেয আসলাম জয়রাজপুরী (মুন্‌কিরে হাদীছ), তাফসীরের অধ্যাপক মাওলানা আবদুল হাই, তিরমিযীর খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩ / ১৮৬৫-১৯৩৫)-সহ দিল্লীর আশপাশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরা উস্তায ও উলামায়ে কেরাম। উক্ত মজলিসের সভাপতি ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (১৮৯০-১৯৪১খৃঃ)। 'খতমে নবুঅতের দার্শনিক তাৎপর্য' শীর্ষক উক্ত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বাছাই করা তিনজন ছাত্রকে শিক্ষকগণ মনোনীত করেন- (১) মাওলানা আবদুর রঊফ (২) আবদুল লতীফ পাঞ্জাবী (৩) আবদুল ওয়াজেদ মাদ্রাজী। শেষোক্ত দু'জনকে ২০ মিনিট করে সময় দিলেও মাওলানা আবদুর রঊফকে দেওয়া হয় মাত্র পাঁচ মিনিট সময়। আল্লাহ্‌র রহমতে মাত্র দু'মিনিটে সমস্ত হলঘর না'রায়ে তাকবীরে মুখরিত হয়ে ওঠে। অতঃপর পাঁচ মিনিট শেষ হ'তেই সমস্ত হল যেন আনন্দে ফেটে পড়ে। শেষ নবীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় দু'লাইনের কবিতা দিয়েই তিনি সেদিনের বক্তৃতা শেষ করেছিলেন- যা সকল শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করেছিল-

هر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا هم نے + کوئی دین دین محمد سا نه پایا هم نے

هم هوئے خیر امم تجه سے هی اے خیر رسل + تیرے بڑهنے سے قدم آگے بڑهایا هم نے

অনুবাদঃ

চারিদিকে চিন্তার ঘোড়া দৌড়ে থেমে গেছি মোরা,
কোন দ্বীন দ্বীনে মুহাম্মাদীর চেয়ে উত্তম পাইনি মোরা।
তোমার কারণেই মোরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হে শ্রেষ্ঠ রাসূল!
তুমি আগে বেড়েছ তাই মোরা বেড়েছি আগে হে রাসূল!

লেখনীঃ বাগ্মীতার সাথে সাথে আল্লাহ পাক তাঁর মধ্যে লেখনীর যোগ্যতা দান করেছিলেন। ছাত্রজীবনেই তিনি লেখার অভ্যাস গড়ে তোলেন এবং অধিকাংশ সময় পাঠ্যসূচীর বাইরের বই লাইব্রেরী থেকে নিয়ে পড়তেন। মুহাম্মাদ জুনাগড়ীর (১৮৯০-১৯৪১) সম্পাদনায় 'আখবারে মুহাম্মাদী' দিল্লী এবং ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮) সম্পাদনায় 'আখবারে আহলেহাদীছ' অমৃতসরে তিনি নিয়মিত লিখতেন। ছাত্রজীবন শেষ করেও তিনি বহু পত্রিকায় লিখেছেন। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তাঁর হিসাব মতে উপমহাদেশের ২০টি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধসমূহের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩,০০০ হাযারের বেশী হবে। ১৯৮৭ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ২৪। যেগুলির কোন কোনটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০০। সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩,০০০ হাযারের মত হবে। যার মধ্যে সেরা গ্রন্থ হ'ল 'ছিয়ানাতুল হাদীছ' - যা হাদীছ বিরোধী বা হাদীছে সন্দেহ পোষণকারীদের জওয়াবে লিখিত। ৪০০ শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই বইটি ১৯৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৮৭ সালে এর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত খেলাফতে রাশেদার সময়কালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচারের উপরে দলীলভিত্তিক আলোচনায় সমৃদ্ধ ৫০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ خلافت راشده کا عهده زرین বইটিও খুবই মূল্যবান। তাঁর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপির সংখ্যা ১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২৫। তন্মধ্যে 'ঈমান ও আমল' গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০০ এবং লেখকের বর্ণনামতে এটি তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এতদ্ব্যতীত তিনি লিখেছেন জামে'আ সিরাজুল উলূমের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৪ হ'তে ১৯৮০ পর্যন্ত সময়ের বিস্তারিত ইতিহাস। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০০ হাযার। 'সীরাতুন্নবী' শীর্ষক তাঁর ২৫০ পৃষ্ঠার বইটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৯]

১৯৮৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারীতে যখন লেখক তাঁর সঙ্গে 'তাওলহুয়া' (নেপাল) গিয়ে সাক্ষাত করেন, তখনও তিনি রীতিমত ব্যস্ত মানুষ। বললেন 'গতমাসে রাবেতার বৈঠকে যোগদানশেষে সঊদী আরব থেকে দেশে ফিরে একটুও বিশ্রাম নেইনি। ছুটে বেড়াচ্ছি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জালসা-সেমিনার ইত্যাদিতে।' এই ব্যস্ততার মধ্যেও যে তিনি লেখার সময় পান কখন সেটাই চিন্তার বিষয়। বলাবাহুল্য নেপালের তিনি সকল আলিমের শিরোমণি, অধিকাংশ আলিমের বুযর্গ উস্তায এবং সকল স্তরের মানুষের নিকটে প্রিয় বাগ্মী। বলা চলে নেপালে

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের তিনিই একচ্ছত্র অধিনায়ক।

২। মাওলানা আবদুল্লাহ বিন আবদুত্ তাওয়াব বিন যাকারিয়া

মাওলানা আবদুল্লাহ মাদানী (৩৩) বর্তমানে নেপালে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের একজন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ আলিম। তাঁর চাচা মাওলানা আবদুল ওয়াহ্‌হাব রিয়াযী (৫৫) ঝান্ডানগরী বর্তমানে নেপালের প্রসিদ্ধ আলিম ও আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মীপুরুষ। তাঁর দাদা মাওলানা মিয়াঁ মুহাম্মাদ যাকারিয়া ছিলেন জামে'আ সিরাজুল উলূমের একটানা ৬০ বৎসরের স্বনামধন্য শিক্ষক ও ঝান্ডানগরের আহ্‌লেহাদীছদের মুরশিদ।

জন্ম ও শিক্ষাজীবনঃ মাওলানা আব্দুল্লাহ ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই নেপালের লুম্বানী অঞ্চলের কপিলবস্তু জেলার ঝান্ডানগরে জন্মগ্রহণ করেন। জামে'আ সিরাজুল উলূমে প্রাথমিক শিক্ষাশেষে পার্শ্ববর্তী ভারতের উত্তর প্রদেশের বস্তী জেলার মাদরাসা ইসলামিয়া আকরাহ্‌রা-তে তিনবছর পড়াশুনা করেন। সেখান থেকে ১৯৭০ সালে জামে'আ সালাফিইয়াহ্ বেনারসে ভর্তি হন। সেখানে ছয় বৎসর পড়াশুনার পর নাদ্‌ওয়াতুল উলামা লাক্ষ্ণৌ-তে চলে যান। সেখানে এক বৎসর অধ্যয়নের পর ১৯৭৭ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। সেখানে চার বছরে শরীয়াহ অনুষদের ইসলামী ফিক্‌হ বিভাগ হ'তে ১৯৮১ সালে 'লেসান্স' ডিগ্রী হাছিল করেন। অতঃপর একই বছরে 'দারুল ইফতার' মাবউছ হিসাবে সঊদী সরকারের চাকুরী নিয়ে দেশে ফেরেন।

কর্মজীবনঃ মাবউছ হিসাবে দেশে ফিরে তিনি প্রথমে জামে'আ সালাফিইয়াহ্ জনকপুরে চার বছর শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ১৯৮৫ সাল থেকে তিন বছর কাঠমন্ডুর নেপালী (দেউবন্দী) জামে মসজিদে 'রিয়াযুছ ছালেহীন' নামক হাদীছ সংকলন থেকে দৈনিক এক ওয়াক্ত করে দরসে হাদীছ পেশ করতেন। ১৯৮৬ সালে তিনি নেপালে কর্মরত সঊদী মাবউছদের মুশরিফ বা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, যা এখনও আছে। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারী থেকে তিনি কপিলবস্তু জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র তাওলহুয়া-তে অবস্থিত 'আল-মা'হাদ আল-ইসলামী'-তে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন।

১৯৮৮ সালের মে মাস থেকে তিনি নিজ উদ্যোগে 'নূরে তাওহীদ' নামে একটি

একটি উর্দূ মাসিক পত্রিকা বের করছেন, যা সমগ্র নেপালে বর্তমানে একমাত্র ইসলামী পত্রিকা।

তাঁর অনুদিত ও প্রকাশিত কিছু বই-পুস্তিকাও রয়েছে। যেমন- ১। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮)-এর 'ইসলাম আওর আহ্‌লেহাদীছ' পুস্তিকাটি কাঠমন্ডু কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব তাহের আলীর মাধ্যমে নেপালী ভাষায় অনুবাদ করিয়ে তিনি নিজ খরচে ছেপে বিলি করেছেন। ২। কুয়েত হ'তে প্রকাশিত ও মুহাম্মাদ জামীল যাইনু প্রণীত "খুয্ আক্বীদাতাকা" পুস্তিকাটিও তিনি উক্ত জজ ছাহেবের দ্বারা নেপালী ভাষায় অনুবাদ করিয়েছেন। কিন্তু এখনও ছাপা হয়নি। ৩। সঊদী আরবের প্রধান মুফতী শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায রচিত 'নাওয়াকিযুল ইসলাম' এবং ৪। মাহমূদ ছাওয়াফ রচিত ইমাম আবু দাঊদ (রহঃ)-এর জীবনী ও তাঁর সুনাম সম্পর্কিত আরবী বইয়ের নেপালী অনুবাদ অর্ধেক সমাপ্ত হয়েছে। ৫। কুয়েত হ'তে প্রকাশিত 'সুন্নাত ও বিদ'আত' পুস্তিকাটিরও অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেছেন। আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের জন্য তাঁর যথেষ্ট দরদ ও উৎসাহ রয়েছে এবং যথাসাধ্য তিনি দাওয়াত চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই দু'জন প্রবীণ ও নবীন আলিমের সাথে অন্যান্য উলামায়ে কেরাম যথাসাধ্য আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। এঁদের অনেকের সাথেই লেখকের প্রত্যক্ষ আলোচনার সুযোগ হয়েছে।[১০] প্রকাশ থাকে যে, বিগত ১৯৯১ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখে নেপালে সর্বপ্রথম আহ্‌লেহাদীছ সংগঠন হিসাবে 'জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ নেপাল' (جمعية أهلحديث نيپال) গঠিত হয়েছে। মাওলানা আব্দুর রঊফ 'আমীর' ও মাওলানা আবদুল্লাহ মাদানী 'নায়েবে আমীর' নিযুক্ত হয়েছেন।[১১]

টীকাসমূহ-১৯

১. নেপাল সরকারের প্রকাশিত গাইড পৃঃ ৩,৫।

২. মাওলানা আবদুল্লাহ আবদুত্ তাওয়াব আল-মাদানী ঝান্ডানগরী (৩৩); ক্বারী মুহাম্মদ মুসলিম (২৩), উভয়ে শিক্ষক, আল-মা'হাদ আল-ইসলামী তাওলহুয়া, জেলা- কপিলবস্তু, লুম্বানী অঞ্চল, নেপাল। তাং- ৮.২.৮৯ইং।

৩. ঐ এবং সরকারী গাইড পৃঃ ৩।

৪. মাওলানা আবদুর রঊফ ঝান্ডানগরী (৮০), সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর জেলা- কপিলবস্তু, নেপাল। তাং ৮.২.৮৯।

৫. মাওলানা আহমাদ হোসায়েন শ্রীমন্তপুরী (৭৯), সাং শ্রীমন্তপুর, পোঃ হাটগাছি, থানা- ইটাহার, জেলা- পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। তাং- ২৮.১.৮৯ ইং।

৬. মাওলানা আবদুল্লাহ মাদানী, সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলা- কপিলবস্তু, নেপাল। তাং ৮.২.৮৯ ইং।

৭. নেপালের শ্রেষ্ঠ তাওলহুয়া মসজিদে এমনই এক অনুষ্ঠানে ৮.২.৮৯ ইং তারিখে লেখক নিজে হাযির ছিলেন ও বক্তৃতা করেছিলেন। সেখানে নেপালের শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে মাওলানা আবদুর রঊফ ঝান্ডানগরী (৮০), তাঁর ভাই মাওলানা আবদুর রহমান নদভী (৬০), মাওলানা আবদুল ওয়াহ্‌হাব রিয়াযী (৫৫) মাওলানা হাকীকুল্লাহ ফায়যী (৫০), মাওলানা আবদুল্লাহ মাদানী (৩৩) সহ বিশিষ্ট উলামা ও সুধীমন্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

৮. তথ্যাবলীঃ মাওলানা আবদুর রঊফ ঝান্ডানগরী, মাওলানা আবদুল্লাহ মাদানী, মাওলানা আবদুল হাই ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম হ'তে প্রাপ্ত। তাং- ৭, ৮ ও ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯।

৯. মাসিক 'আত্‌-তাও'ইয়াহ' (৪, জোগাবাঈ, নয়াদিল্লী-১১০০২৫) ১ম বর্ষ ১০-১১ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৮৭, ২য় বর্ষ ১ম , ২য় ও ৩য় সংখ্যা যথাক্রমে মে, জুন ও জুলাই ১৯৮৭ অবলম্বনে। প্রবন্ধঃ কুছ্‌ আপ্‌নে বারে মেঁ, লেখকঃ মাওলানা আবদুর রঊফ রহ্‌মানী। এতদ্ব্যতীত তাঁর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত।

১০. ৮. ২. ৮৯ ইং তারিখে তাউলিয়া মাদরাসায় বসে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

১১. আবদুল্লাহ মাদানী ঝাণ্ডানগরী, সাক্ষাতকারঃ হোটেল মেরিডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল, কুয়েত সিটি, কক্ষ নং ৪১৬, তাং ২২.১.৯২ ইং।

২-আফগানিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলন (حركة أهل الحديث فى أفغانستان)ঃ

আধুনিক যুগে আফগানিস্তানে আহলেহদীছ আন্দোলন খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে আল্লামা শাহ ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১)-এর জিহাদ আন্দোলন থেকে শুরু হয়। পরবর্তীতে শায়খ হাবীবুল্লাহ কান্দাহারীর নিকট হ'তে আল্লামার 'তাক্বভিয়াতুল ঈমান' বইটি পাঠ করে গযনীর খ্যাতনামা আউলিয়া পরিবারের সন্তান মাওলানা আবদুল্লাহ গযনবী (১২৩০-১২৯৮/১৮১৫-১৮৮০) হাদীছের কিতাবসমূহ বিশেষ করে বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করার পর হাদীছ অনুযায়ী ছালাত আদায় শুরু করেন। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী আউলিয়াদের

মাযার যেয়ারত ও সাহায্য প্রার্থনার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। সকলকে কিতাব ও সুন্নাতের পায়রবী করার জন্য দাওয়াত ও তাবলীগ শুরু করে দেন। অনেক লোক শিরক ও বিদ'আত ছেড়ে দিয়ে 'আহলেহাদীছ' হ'য়ে যান। কিন্তু বিদ'আতপন্থী উলামা ও স্থানীয় সর্দারগণ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন এবং কাবুলের আমীরের নির্দেশে তিনি মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য হন। বহু স্থান ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তিনি দিল্লী আসেন ও সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২) -এর নিকট হ'তে ইল্মে হাদীছে সনদ লাভ করেন। এই সময় (১০ই মে ১৮৫৭) সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হ'লে ঐ সালেই তিনি পাঞ্জাবে ও পরে গযনী ফিরে যান। কিন্তু একমাসের মধ্যে পুনরায় তাঁকে আমীরের হুকুমে দেশ ছাড়তে হয়। এরপর তিনি পরিবারবর্গ নিয়ে আফগানিস্তানের স্বাধীন পাহাড়ী এলাকা ইয়াগিস্তানে গমন করেন ও সেখানে কিতাব ও সুন্নাতের দাওয়াত শুরু করেন। কিন্তু সেখানকার বিদ'আতপন্থী আলিমরা তাঁকে বরদাশ্ত করল না। একদিন একদল সশস্ত্র লোক এসে তাঁর ঘর জ্বালিয়ে দিল ও কয়েকজন আহলেহাদীছকে আহত করে চলে গেল। এরপর তিনি ১২ জন পুত্র ও ১৫ জন কন্যাসহ বিরাট পরিবার নিয়ে পাহাড়ী এলাকার যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই স্থানীয় আলিমদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। কোথাও স্থায়ী হ'তে পারেননি। এই সময় কাবুলের আমীর দোস্ত মুহাম্মাদ খান মারা গেলে তিনি পুনরায় গযনীতে স্বগৃহে ফিরে যান। কিন্তু ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। মোল্লা মিশকী, মোল্লা নাছরুল্লাহ প্রমুখ আলিমগণ তাঁকে 'কাফের' ফৎওয়া দেবার পর আমীর আফযাল খান মাওলানাকে বেত্রাঘাত ও গাধার পিঠে শহর প্রদক্ষিণের নির্দেশ দেন। ফলে তাঁকে ও তাঁর বড় তিনপুত্র মাওলানা আবদুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মাদ ও মাওলানা আবদুল জাব্বারকে বেত্রাঘাত ও শহর প্রদক্ষিণের পর দু'বছর করে কারাদন্ড দেওয়া হয়। পরবর্তী আমীর আযম খান ও তাঁকে বরদাশ্ত করেননি। মোল্লা আবদুর রহমান প্রমুখ আলিমদের প্ররোচনায় তিনি মাওলানাকে সপরিবারে বহিষ্কার করেন। ফলে তিনি প্রথমে পেশোয়ার ও পরে পাঞ্জাবের অমৃতসর এসে বসবাস শুরু করেন ও এখানেই ১২৯৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৮০ সালে ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ১২ জন পুত্রের সকলেই 'মুহাদ্দিছ' ছিলেন। মূলতঃ তাঁদেরই দাওয়াত ও তাবলীগে আফগানিস্তানের মানুষ আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের খ্যাতনামা আলিম ও রাজনীতিবিদ এবং পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের প্রথম সভাপতি মাওলানা দাঊদ গযনবী ইবনে আবদুল জাব্বার (১৩১২-১৩৮৩/১৮৯৫-১৯৬৩)

মাওলানা আবদুল্লাহ গযনবীর স্বনামধন্য পৌত্র ছিলেন।[১]

দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৩৮৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৪ সালে 'জামা'আতুদ্ দা'ওয়াহ ইলাল কিতাবে ওয়াস্ সুন্নাহ' নামে আফগানিস্তানে আহলেহাদীছদের একটি সংগঠন কায়েম হয়। দেওবন্দী হানাফী আলিম মাওলানা জামীলুর রহমান ১৯৮৩ সালের দিকে আহলেহাদীছ হওয়ার পরে[২] ১৯৮৬-তে তিনি এ সংগঠনের 'আমীর' হন এবং সংগঠনকে দু'টি খাতে বিভক্ত করেন। এক ভাগে আলিমগণ জনগণকে কিতাব ও সুন্নাতের দাওয়াত দিতে থাকেন ও একভাগে আফগানিস্তানের কম্যুনিষ্ট হুকুমতের বিরুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তুলে সশস্ত্র জিহাদ শুরু করেন। অতঃপর তাঁর নেতৃত্বে ৫০০০ হাযার আহলেহাদীছ মুজাহিদের সশস্ত্র বাহিনী শাওয়াল ১৪১০ হিজরী মোতাবেক ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে আফগানিস্তানের কুনাড় প্রদেশ স্বাধীন করেন ও সেখানে ইসলামী হুকুমত কায়েম করেন। সাথে সাথে কিতাব ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী সেখানে ইসলামী শাসন জারি হয় এবং অন্যান্য সকল আফগান এলাকার তুলনায় এখানকার আইন শৃংখলা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং জনসাধারণের শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়। কিন্তু সাইয়িদ আহমদ ব্রেলভী (১২০১-১২৪৬/১৭৮৬-১৮৩১) ও আল্লামা ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) -এর ন্যায় তাঁকে ও ঘরের শত্রুদের হামলার শিকার হ'তে হয়। 'জামা'আতে ইসলামী পাকিস্তান' প্রভাবিত গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের 'হিযবে ইসলামী'র নেতৃত্বে সাতদলীয় (হানাফী) মুজাহিদ জোট ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৯১ সালের ২২শে আগষ্ট ভোর রাতে ''দারুল খিলাফত আস্'আদাবাদ'-এর উপরে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দেয়। বহু লোককে হতাহত করে এবং অনেককে নৃশংসভাবে নাক-কান, হাত-পা কেটে জীবন্ত নদীতে ডুবিয়ে মারে। অতঃপর ৩০শে আগষ্ট তারিখে পার্শ্ববর্তী বাজোড় নামক স্থানে আততায়ীর মাধ্যমে আমীর মাওলানা জামীলুর রহমানকে হত্যা করে।[৩] কিন্তু অসমযোদ্ধা বীর জাহাঁদাদ খানের নেতৃত্বে আহলেহাদীছ মুজাহিদগণ অবিলম্বে তাদের রাজধানী পুনরুদ্ধার করে এবং বর্তমানে তারা স্বাধীন কুনাড় রাজ্য পরিচালনা করছে। (শেষোক্ত বীরের সাথে লেখকের সাক্ষাৎ ঘটেছে লাহোরের আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে।- তাং ১.১০.১৯৯২ ইং)।

আফগানিস্তানের 'নূরিস্তান' আহলেহাদীছদের অন্য আরেকটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত এলাকা। মাওলানা মুহাম্মাদ আফযাল এই রাজ্যের 'আমীর'। সাঈদাবাদ (পূর্বনাম নেকসুক) এ রাজ্যের রাজধানী বা 'দারুল খিলাফত'। ১৩৯৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৮ সালে এই স্বাধীন আহলেহাদীছ এলাকা কায়েম

হয়। এর সরকারী নাম 'দৌলতে ইনকিলাবী ইসলামী আফগানিস্তান'। লাল, কালো, সাদা ও সবুজ চার রংয়ের নিজস্ব পতাকা, নিজস্ব পুলিশ, সেনাবাহিনী ও সরকারী আদালত রয়েছে।[৪] আফগানিস্তানের পূর্ব প্রান্তের কুনাড় ও লাগমান প্রদেশদ্বয়ের তিনটি উপত্যকা নিয়ে গঠিত[৫] 'নূরিস্তান'-ই আফগানিস্তানের সর্বাধিক আহ্‌লেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকা।[৬] এর বর্তমান আয়তন ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার বা বারো হাযার বর্গমাইল।[৭] জনসংখ্যা বর্তমানে পাঁচ লাখের মত।[৮] এটি পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম তিনটি এলাকায় বিভক্ত। প্রত্যেকটির মধ্যে সুউচ্চ পাহাড় রয়েছে। যা পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। রাজধানী সাঈদাবাদ পূর্ব নূরিস্তানে অবস্থিত।[৯] আফগানী ভাষার বাইরে এদের নিজস্ব নূরিস্তানী ভাষা রয়েছে।[১০] এখানে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য বেচাকেনা হয়। পাকিস্তানী ও আফগানী মুদ্রা চালু আছে।[১১] আদালতে কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালিত হয়।[১২] এখনও সেখানে বিদ্যুৎ, টেলিফোন বা আধুনিক ডাক ব্যবস্থা চালু হয়নি।[১৩]

এখানে সূদী কারবার নিষিদ্ধ। মেয়েদের কড়া পর্দা ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক গ্রামে জুম'আ মসজিদ মাত্র একটাই আছে। সেখানে পুরুষের সাথে মেয়েদেরও পর্দার মধ্যে জুম'আ আদায়ের ব্যবস্থা আছে। বিবাহ পদ্ধতি সহজ করা হয়েছে। দাড়ি না রাখাকে কঠিন অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। দাড়িবিহীন লোককে কোন সরকারী চাকুরী দেওয়া হয় না। পরস্পরকে সালাম না দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করাকে সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। তাদের মেহমানদারী খুবই প্রসিদ্ধ। নাচ-গান ও অশ্লীল ছবি প্রদর্শন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।[১৪] বাইরে যাওয়ার সময় মেয়েরা বড় চাদর গায়ে দিয়ে থাকেন। পায়ে হাঁটা বা গাধা, ঘোড়া, খচ্চর ব্যতীত অন্য কোন যানবাহন নেই।[১৫] রেডিও স্টেশন নেই।[১৬]

নূরিস্তানের লোকেরা নিজেদেরকে 'কুরায়েশ' বংশীয় বলে দাবী করেন। মক্কা বিজয়ের সময়ে এদের পূর্বপুরুষ মক্কা থেকে পালিয়ে ইরাক আসেন। সেখান থেকে পরে এখানে আসেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত এরা সকলে 'কাফের' ছিল। এজন্য এলাকার নাম তখন 'কাফিরিস্তান' ছিল। আফগান শাসক আমীর আবদুর রহমান ১৮৯৬ সালে প্রথম পশ্চিম নূরিস্তান জয় করেন ও এখান থেকে ২০০ লোক কাবুলে নিয়ে যান। তার পর বছর মধ্য নূরিস্তান ও তার পরের বছর পূর্ব নূরিস্তান দখল করেন ও প্রত্যেক এলাকায় সরকারী 'মুবাল্লিগ' প্রেরণ করেন, যাদের অনেকেই স্থানীয়দের হাতে নিহত হন। এইভাবে এখানে প্রথম ইসলাম আসে। এরা প্রথমে হানাফী ও বিভিন্ন শিরক-বিদ'আতে অভ্যস্ত ছিলেন।[১৭]

সম্ভবতঃ ১৯৫৫ সালের দিকে কিংবা তার কিছু পূর্বে এতদঞ্চলে প্রথম আহলেহাদীছের দাওয়াত পৌঁছে।[১৮] মাওলানা ইবরাহীম (১৯২২-১৯৮৬), মাওলানা মুহাম্মাদ আফযাল, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক্ব প্রমুখ আহলেহাদীছ উলামায়ে কেরাম এখানে এসে 'দারসে হাদীছ' শুরু করেন। এতে স্থানীয় হানাফী আলিমগণ ক্ষেপে গিয়ে সরকারকে রিপোর্ট করলে তাঁদেরকে বন্দী করা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষ ব্যাপারটা বুঝে ফেলে ও দলে দলে লোক 'আহলেহাদীছ' হওয়া শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে সেখানকার অবস্থা হ'ল এই যে, পূর্ব নূরিস্তানে ৮০% শতাংশ, মধ্য নূরিস্তানের ওয়াদী পারূন-এ ১০০%, কেন্তুয়াতে ৯০% শতাংশ লোক আহলেহাদীছ হয়ে যান। যারা এখনো হানাফী আছেন, তাদের মধ্যে বর্তমানে শিরক নেই বললেও চলে।[১৯]

টীকাসমূহ-২০

১. ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি, তারীখে আহলেহাদীছ (ওখ্লা, নয়াদিল্লীঃ মাকতাবা তাওহীদ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩) পৃঃ ৪৪৫-৪৪৮।

২. আবদুর রহমান কীলানী, সারগুযাস্তে নূরিস্তান (লাহোরঃ মাকতাবাতুস সালাম, ১৯৮৬) পৃঃ ৭৬।

৩. হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ 'হাদেছায়ে কুনাড় আওর শায়খ জামীলুর রহমান কি শাহাদাত' সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম (লাহোরঃ ৪৩ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ১৫ই নভেম্বর ১৯৯১) পৃঃ ৯-১৪; শায়খ জামীলুর রহমান কা প্রেস কন্ফারেন্স সে খেতাব (পেশোয়ারঃ পোঃ বক্স নং ১২০১২, তাং ১৮-১-১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ)।

৪. সারগুযাস্তে নূরিস্তান পৃঃ ৬৯, ৩৮, ৫১, ৪৯)।

৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৭।

৬. নূরিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'মাওলানা ফযল আহমাদ কা এক আহাম ইন্টারভিউ' উর্দূ মাসিক 'তাহরীকে খেলাফত' সম্পাদকঃ নাঈমুল হক নাঈম (পেশোয়ারঃ জামে'আ আছারিয়াহ পোঃ বক্স নং ১৭৩, অক্টোবর '৮৭- মার্চ '৮৮ সংখ্যা) পৃঃ ৪।

৭. সারগুযাস্ত পৃঃ ৩৭।

৮. প্রাগুক্ত ইন্টারভিউ; সেখানে ৪ লাখের কম নয় বলা হয়েছে।

৯. সারগুযাস্ত পৃঃ ৩৮

১০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৭

১১. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৮

১২. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৪

১৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬

১৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৮

১৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪২

১৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬২

১৭. যাকিউর রহমান লাক্ষাবী, প্রবন্ধঃ 'নূরিস্তান' মাসিক তাহ্রীকে খেলাফত (পেশোয়ার, এপ্রিল ১৯৮৬ সংখ্যা, সম্পাদক-আবু মাসঊদ) পৃঃ ১-১৫; এখানে জনৈক সাইয়িদ করীম-এর বংশধারা ইকরামা বিন আবু জাহ্ল পর্যন্ত উল্লেখিত হয়েছে। -ঐ পৃঃ ১২; , আরবী মাসিক 'ওয়া ইসলামাহ' নিবন্ধঃ 'তারীখু নূরিস্তান' (পেশোয়ার পোঃ বক্স নং ১৭৩, পাকিস্তান) পৃঃ ১১।

১৮. সারগুযাস্ত পৃঃ ৪০; তথ্যদাতা নূরুল্লাহ বিন খায়রুল্লাহ নূরিস্তানী ও আবদুছ ছবূর সালাফী নূরিস্তানীর মতে ১৯৪০-এর দিকে সেখানে প্রথম সালাফী দাওয়াত শুরু হয়। উক্ত দু'জন মুজাহিদ জিহাদ ফ্রন্ট হ'তে সদ্য করাচী এলে তাদের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাত হয়। তাং ২৬-১২-৮৮ইং সকালে।

১৯. সারগুযাস্ত পৃঃ ৪০-৪১; যাকিউর রহমান লাক্ষাবী, 'তাহ্রীক কি ইবতিদা ও ইবতিলা' তাহ্রীকে খিলাফত মে ১৯৮৬, পৃঃ ৯-১২।

৩- মালদ্বীপে আহ্লেহাদীছ আন্দোলন (حركة أهل الحديث فى مالديف) ঃ

হিন্দুস্থানে মুসলিম বিজয়ের পূর্বে দক্ষিণ এশিয়ার যেসকল এলাকায় আরব বণিক ও মুহাদ্দিছগণের মাধ্যমে ইসলাম আগমন করে, ভারত মহাসাগরীয় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মালদ্বীপ ছিল তার অন্যতম। লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, আল্কাতরা ইত্যাদি ধাতুর আধিক্য থাকার কারনে আরবগন এই দ্বীপাঞ্চলকে 'জাযীরাতুল মুহ্ল' বল্ত। সংস্কৃত ভাষায় 'জাযীরাহ্' -কে 'দ্বীপ' (ديب) বলা হয়। ফলে আরবী-সংস্কৃত মিশ্রিত 'মুহলদীব' (مهل ديب) পরবর্তীতে 'মালদ্বীপ' নামে পরিচিত হয়। এটি ছিল আরব বণিকদের অন্যতম আকর্ষণীয় ব্যবসাকেন্দ্র। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী আরবদের সঙ্গে মিশ্ররক্তের। ইবনে বতুতা (মৃঃ ৭৭৯/১৩৭৬ খৃঃ) মালদ্বীপ ভ্রমণে এসে এখানে ইয়ামনের বহু আলিম ও নাবিককে দেখতে পান। মুহাম্মাদ তুগলকের শাসনামলে (৭২৫-৫২/১৩২৫-৫১ খৃঃ) এই দ্বীপের সকলে মুসলিম ছিলেন। সেইসময় খাদীজা নাম্নী জনৈকা বাংগালী মহিলা এই দ্বীপ শাসন করতেন। মালদ্বীপের সকল অধিবাসী পূর্বের ন্যায় এখনও মুসলমান।[১] এই ক্ষুদ্রতম দ্বীপরাষ্ট্রের আয়তন মাত্র ২৯৮ বর্গ কিলোমিটার।

ছোটবড় ১২০১টি দ্বীপের মধ্যে মনুষ্য বাসোপযোগী ২০০ দ্বীপের অন্যূন দুই লাখ দশ হাজার অধিবাসীর সকলেই মুসলমান ও 'শাফেঈ' মাযহাবভুক্ত। ১৩৯৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৪ সালে সঊদী সরকারের পক্ষ হ'তে প্রেরিত মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারেগ কয়েকজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুবাল্লিগের মাধ্যমে সেখানে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন শুরু হয়। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারেগ মাবঊছ শায়খ ইসমাঈল মুহাম্মাদ মালদ্বীপী এব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

প্রথমে তাঁরা মালদ্বীপের রাজধানী মালে-তে "মাদ্‌রাসা ত্বাইয়িবাহ্‌" নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাপারে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শায়খ আবদুছ ছামাদ হিন্দী ও মালদ্বীপের শায়খ ইসমাঈল মালদ্বীপী প্রধান ভূমিকা রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনবছরের মাথায় সরকারের পক্ষ হ'তে উক্ত মাদরাসা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৮ সালের শেষদিকে বর্তমান শাসক মামূন আবদুল কাইয়ূম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ১৪০০ হিজরী মোতাবেক ১৯৮০ সালে মাদরাসা পুনরায় চালু হয় এবং ১৪০১ হিজরীর ১২ই রবীউল আউয়াল হ'তে পুনরায় নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বলা আবশ্যক যে, মালদ্বীপের দীর্ঘ ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম ধর্মীয় মাদরাসা এবং প্রথম আহলেহাদীছ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে তাফসীর, হাদীছ, তাওহীদ, সীরাত, উছূলে ফিক্‌হ, উছূলে হাদীছ, ইতিহাস, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজী ভাষা, গণিত, ভূগোল ইত্যাদি পড়ানো হয়। এতদ্ব্যতীত হিফ্‌যে কুরআনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

মাদরাসায় শিক্ষাদান ছাড়াও আন্দোলনের ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। যেমন-

১- রাজধানী মালে-র চারটি মসজিদ যথা মসজিদে গাযী, মসজিদে নূর, মসজিদে শহীদ ও মসজিদে বান্‌দার-এ বড়দের জন্য নিয়মিত দরসে হাদীছ চালু করা হয়।

২- শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীমের গৃহে প্রতি রাত্রিতে সর্বসাধারণের জন্য হাদীছ, তাফসীর ও তাওহীদের দরস চল্‌তে থাকে।

৩- বিভিন্ন দ্বীপে তাবলীগী টীম প্রেরিত হয়।

৪- শায়খ হুসাইন ইউসুফ আলী, শায়খ উছমান আবদুল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ রাজধানীর বিভিন্ন মসজিদ ছাড়াও বাইরে বিভিন্ন দ্বীপে গিয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

৫- এছাড়া গত ১৯৮৫ সালে আন্দোলনের দায়িত্বশীলগণ ৫০,০০০ হাযার

আমেরিকান ডলারের এক বিরাট পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। যেখানে বড় আকারের আরও একটি মাদারাসা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও অন্যান্য প্রকল্প রয়েছে। 'মা'হাদ উম্মুল কুরা আল-ইসলামী' নামে 'হাতাদো' নামক স্থানে একটি ইসলামিক ইনষ্টিটিউটের ভিত্তি বিগত ২৬-৯-১৪০৩ হিঃ মোতাবেক ১৯৮৩ সালে স্থাপিত হয়েছে। যেখানে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিফটে ছয় বছরের শিক্ষাক্রমসহ বক্তৃতাকক্ষ ও লাইব্রেরী ইত্যাদি রয়েছে।

এইভাবে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন ক্রমেই সেখানে জোরদার হচ্ছে দেখে বিরোধীপক্ষের টনক নড়ে এবং গত ১৯৮৫ মোতাবেক ১৪০৫ হিজরীর শা'বান মাসের প্রথম দিকে হঠাৎ এক রাত্রিতে শায়খ ইবরাহীমের বাড়ীতে দরস চলা অবস্থায় পুলিশে হানা দেয় এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীম ও শায়খ আবুবকর ইবরাহীমসহ মোট ৫৬ জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় ও যথারীতি সকলকেই কারাদন্ড দেওয়া হয়।

এইভাবে বাধা-বিপত্তির মধ্যদিয়ে বর্তমানে সেখানে আহলেহাদীছ আন্দোলন জারি আছে।[২] মালদ্বীপের অনেক ছাত্র পাকিস্তানের বিভিন্ন আহলেহাদীছ প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে। জামে' 'আবুবকর আল-ইসলামিয়াহ' করাচীতে অধ্যয়নরত কিছু মালদ্বীপী ছাত্রের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীম মাদানী ও শায়খ মুহাম্মাদ হুসায়েন মালদ্বীপীর নেতৃত্বে পূর্বের চেয়ে অনেক সহজে বর্তমানে সেখানে আহলেহাদীছ আন্দোলন ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

টীকাসমূহ-২১

১. সুলায়মান নাদভী (১৩০২-৭২ / ১৮৮৪-১৯৫৩ খৃঃ), আরব ও হিন্দ কে তা'আল্লুক্বাত এলাহাবাদঃ হিন্দুস্থান প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৯৩০ সাল) পৃঃ ২৬৩-৬৫।

২. মালদ্বীপে দায়িত্ব পালনরত জনৈক সঊদী মাবঊছের প্রেরিত আরবী প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ দিল্লীর খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলিম মাওলানা আবদুল হামীদ রহমানীর নিকট হ'তে প্রাপ্ত (৯.১.৮৯ ইং) এবং বিভিন্ন সূত্র অবলম্বনে লিখিত।

৪- শ্রীলংকায় আহলেহাদীছ আন্দোলন (حركة أهل الحديث في سريلنكا) ঃ

ভারত মহাসাগরের বুকে 'সৌন্দর্য্যের রাণী' বলে খ্যাত ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকার

আয়তন ৬৫,৬০৯ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ১ কোটি ৬০ লাখের কিছু বেশী, যার শতকরা একশত ভাগই শিক্ষিত। জনসংখ্যার শতকরা ৬৪ জন বৌদ্ধ, ২০ জন হিন্দু, ৮ জন খৃষ্টান ও ৭ জন মুসলমান। হযরত আদম (আঃ)-এর 'অবতরণ স্থল' (Adams peak) হিসাবে সিংহল (سرنديب) দ্বীপের প্রাচীন খ্যাতি আছে। আরবরা এই দ্বীপকে তাদের 'পিতৃভূমি' মনে করে প্রতি বছর আদম (আঃ)-এর কথিত পদচিহ্নের যেয়ারতে আসত।[১] পক্ প্রণালী ও মান্নার উপসাগর শ্রীলংকাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও রামেশ্বর দ্বীপ, মান্নার দ্বীপ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি দ্বীপ ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছে। যার দৈর্ঘ্য মাত্র ৩৪ কিলোমিটার। এই সেতুবন্ধকে Adams bridge বলে। ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্য শ্রীলংকার নিকটতম প্রতিবেশী। শ্রীলংকার সরকারী ভাষা সিংহলী ও তামিল।[২]

শ্রীলংকায় আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৪৭ সালে শায়খ আবদুল হামীদ বিন আদম পিল্লাইল বিক্‌রী (پلّائے البكرى) -এর মাধ্যমে, যিনি ১৯৭৫ সালে মক্কা শরীফে ইন্তেকাল করেন। শ্রীলংকার মুসলিম সমাজ প্রায় সকলেই 'শাফেঈ' মাযহাবভুক্ত হ'লেও তারা নানাবিধ শির্‌ক ও বিদ'আতে ডুবে ছিল। শৈশবে শায়খ আবদুল হামীদ স্বীয় গ্রাম 'বারকাদানিয়া' (BARKADANIA) ও নিকটস্থ মাদরাসায় কিছু লেখাপড়া শিখেন। অতঃপর ভারতে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি মাদ্রাজের ভিল্লোর (VILLOUR) মাদরাসায় ভর্তি হন। কিন্তু মনের মত না হওয়ায় অবশেষে পাকিস্তানে পাড়ি জমান। সেখানে গিয়ে তিনি করাচীর বান্‌স রোডে অবস্থিত 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহ্‌লেহাদীছ' পরিচালিত মাদরাসা দারুস সালাম-এ ভর্তি হন। এখানে কুরআন ও হাদীছের নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা দেখে তিনি মুগ্ধ হন ও মন দিয়ে লেখাপড়া করতে থাকেন। লেখাপড়া শেষে উস্তাদদের পরামর্শে তিনি সঊদী আরবে পাড়ি জমান। সেখানে গিয়ে তিনি মদীনা শরীফে নাজ্‌দের মাশায়েখদের হাল্‌কায়ে দারসে বসে যান। এখানে তাঁর প্রিয় উস্তাদগণের মধ্যে শায়খ মুহাম্মাদ ত্বাইয়িব আনছারী ছিলেন অন্যতম। এখানকার শিক্ষাগুণে তিনি তাওহীদ-এর মর্মকথা বুঝতে সক্ষম হন এবং নির্ভেজাল তাওহীদ সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর দেশে ফিরে তিনি প্রথমে নিজ গ্রামবাসীকে খাঁটি তাওহীদের দিকে আহ্বান জানান। গ্রামে তখন প্রায় এক হাযার মুসলিম পরিবার বসবাস করছিল। তাদের অধিকাংশই তাঁর হাতে নতুনভাবে বায়'আত গ্রহণ করে এবং কবর পূজাসহ যাবতীয় শরীয়ত বিরোধী রসম-রেওয়াজ থেকে তওবা করে। তাদের সহযোগিতায় তিনি দু'টি 'মাযার' ভেঙ্গে ফেলেন। তৃতীয় আরেকটি মাযার ভাঙ্গার

পরিকল্পনা নিলে কবর পূজারীরা গিয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে শায়খ আবদুল হামীদসহ মোট দশজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। বিরোধীপক্ষ তাঁদের বিরুদ্ধে ইবাদতখানা ভাঙ্গার কেইস দায়ের করেছিল। শায়খ ছাহেব আদালতে প্রমাণ পেশ করে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি কোন ইবাদতখানা ভাঙ্গেননি বরং মাযার ভেঙ্গেছেন। আর মাযার বা কবর কখনো মুসলমানদের ইবাদতখানা নয়। এতে তিনি বেকসুর খালাস পেলেন। শুধু তাই নয়, ঐ গ্রামের প্রায় তিনশত বছরের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মসজিদটিতে সরকারের পক্ষ হ'তে তাঁকে ইমাম নিযুক্ত করা হয়। এখানে তিনি নিশ্চিন্ত মনে তাওহীদ ও সুন্নাহ্‌র প্রচার চালাতে শুরু করেন এবং এখানেই তিনি 'জমঈয়াতু আন্‌ছারিস্ সুন্নাহ' (جمعية أنصار السنة) নামে সর্ব প্রথম আহলেহাদীছ সংগঠন কায়েম করেন।

এরপর তিনি পার্শ্ববর্তী 'তালগাছ পিটিয়া' (TALGASPITIA) গ্রামে গমন করেন ও সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। ফলে অধিকাংশ গ্রামবাসী তাঁর দাওয়াত কবুল করে ও সেখানে সংগঠনের দ্বিতীয় একটি শাখা কায়েম হয়। এরপর তৃতীয় আরেকটি গ্রাম 'প্যানাগামুয়া' (PANAGAMUWA)-তে গিয়ে দাওয়াত দিলে তারা সকলেই আহলেহাদীছ হয়ে যায় এবং সংগঠনের তৃতীয় শাখা খোলা হয়। এ গ্রামগুলি ছিল 'কুরুনেগ্যালে' (KURUNEGALE) জেলার অন্তর্ভুক্ত। এরপর তাঁর ডাক এলো শ্রীলংকার পূর্ব এলাকা হ'তে, যে এলাকায় সর্বাধিক মুসলমানের বাস। তিনি উক্ত এলাকার প্রসিদ্ধ শহর 'কালমুনাই' (KALMUNAI) গমন করেন ও তাদেরকে দাওয়াত দেন। দাওয়াতে কিছু লোক সাড়া দেয় এবং সেখানে সংগঠনের একটি শাখা কায়েম হয়। কিন্তু অন্যদের পক্ষ থেকে তাঁকে বহু কষ্ট পেতে হয়, যা তিনি অসীম ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করেন। অতঃপর এই এলাকার বিদ'আতী আলিমদের সাথে ১৯৫১ সালে প্রকাশ্য মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিজয় তাঁর পদচুম্বন করে। কিন্তু বিরোধী আলিমগণ জনসংখ্যার জোরে উল্টা প্রচার করে। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত মুনাযারা সারা শ্রীলংকায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এবং আন্দোলনের অগ্রগতির শুভ সূচনা হয়। উক্ত মুনাযারার পরে শায়খ ছাহেব 'তুলূ'উল হক' (طلوع الحق) নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'তামিল' ভাষায় প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটিই বর্তমানে সংগঠনের মুখপত্র। এরপর তিনি গ্রামে একটি মাদরাসা কায়েম করেন। কিছুদিন পর ১৯৬৫ সালে তিনি সেখান থেকে কিছু ছেলেকে মক্কায় পাঠান ও দারুল হাদীছ আল-খায়রিয়াহ্-তে ভর্তি করান। ১৯৬৯ সালে মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন এবং ১৯৭৯ সালে সেখানকার 'দা'ওয়াহ' অনুষদ হ'তে ফারেগ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ও বর্তমানে সঊদী

আরবের গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায-এর ইঙ্গিতে তিনি শ্রীলংকা ফিরে আসেন ও সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর ১৯৮৩ সালে 'মা'হাদ দারুত্ তাওহীদ আস্-সালাফিইয়াহ' নামে একটি মাদরাসা কায়েম করেন। বর্তমানে সেখানে ১৪৫ জন ছাত্র পড়াশুনা করছে ও ১০জন শিক্ষক রয়েছেন।

শ্রীলংকায় আহলেহাদীছ আন্দোলন 'আনছারুস সুন্নাহ' (সুন্নাতের সাহায্যকারীগণ) নামে চল্ছে। যার মূল কেন্দ্র উক্ত 'মা'হাদ দারুত্ তাওহীদ' এবং পরিচালক বা সংগঠনের প্রধান হলেন মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক। কলম্বো শহরে ও তাঁদের অফিস আছে। কলম্বো মহানগরীতে ৫০টি জামে মসজিদ রয়েছে। যার মধ্যে একটি পাকিস্তানী মেমন (হানাফী)-দের ও বাকী সবই শাফেঈদের।[১]

টীকাসমূহ-২২

১. সুলায়মান নাদভী (১৩০২-৭২ / ১৮৮৪-১৯৫৩ খৃঃ), আরব ও হিন্দ কে তা'আল্লুক্বাত এলাহাবাদঃ হিন্দুস্থান প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৯৩০ সাল) পৃঃ ১।

২.ডঃ আ. ফ. ম. কামালউদ্দীন, মাধ্যমিক ভূগোল (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক ১৯৯৪ শিক্ষা বছরে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ধারিত।) পৃঃ ১৯৯।

৩. এশিয়া মহাদেশের রাষ্ট্রসমূহের আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে লেখকের সাথে কলম্বোর হোটেল হিলটন ইন্টারন্যাশনাল-এর ৬১০নং কক্ষে মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীকের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত। - তাং-২৮.৮.৯৩ ইং।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ শায়খ আবুবকর ছিদ্দীক। অধ্যক্ষ, মা'হাদ দারুত্ তাওহীদ, পারাকাহা ডেনিয়া (PARAKAHA DENIYA), ভিউদা (VEUDA), ভায়া-কুরুনেগ্যালে (KURUNEGALE), শ্রীলংকা।

পরিশিষ্ট-খ

الضميمة (ب)

১নং ছবিঃ জামে'আ রহীমিয়া, দিল্লী, ভারত

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীর (১১১৪-৭৬/১৭০৩-৬২খৃঃ পিতা মাওলানা আবদুর রহীম প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর জামে'আ রহীমিয়ার বর্তমান দফতর ও সদর দরওয়াজা। এর পার্শ্বেই অলিউল্লাহ পরিবারের কবরস্থান অবস্থিত। ছবিঃ ৬ই জানুয়ারী ১৯৮৯।

২ নং ছবিঃ মসজিদে ফাটক হাবাশ খাঁ, দিল্লী, ভারত

দিল্লী ছদর বাজারের ফাটক হাবাশ খাঁ জামে মসজিদের বর্তমান দৃশ্য। মিয়াঁ নযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২) এখানে দরস দিয়েছেন ও তাঁর নামে 'জামে'আ নযীর হুসাইন' আজও এখানে চালু আছে। ছবিঃ ৬ই জানুয়ারী ১৯৮৯।

৩নং ছবিঃ হাকিমপুর জামে মসজিদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকালঃ সম্ভবতঃ ১৮৩৩ খৃঃ)

বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলাধীন হাকিমপুর জিহাদ কেন্দ্রের ঐতিহাসিক জামে মসজিদ। মাওলানা এনায়েত আলী ১৮৩৩ সালের দিকে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এরই প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, যশোর, রাজশাহীসহ বিভিন্ন অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। ছবিঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯।

৪ নং ছবিঃ (সূর্য) নারায়ণপুর কেন্দ্র , চাপাই নবাবগঞ্জ, বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠাকালঃ সম্ভবতঃ ১৮৪০ খৃঃ

জিহাদের উদ্দেশ্যে রফীক মন্ডল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লোক ও রসদ সরবরাহ কেন্দ্র। নদী ভাঙ্গনের ধ্বংসাবশেষের উপরে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান জামে মসজিদ। ছবিঃ ৭.১.৯২ইং

৫নং ছবিঃ সপুরা কেন্দ্র, রাজশাহী, বাংলাদেশ (প্রতিষ্ঠাকালঃ১৮৪৯ খৃঃ-এর কিছু পূর্বে)
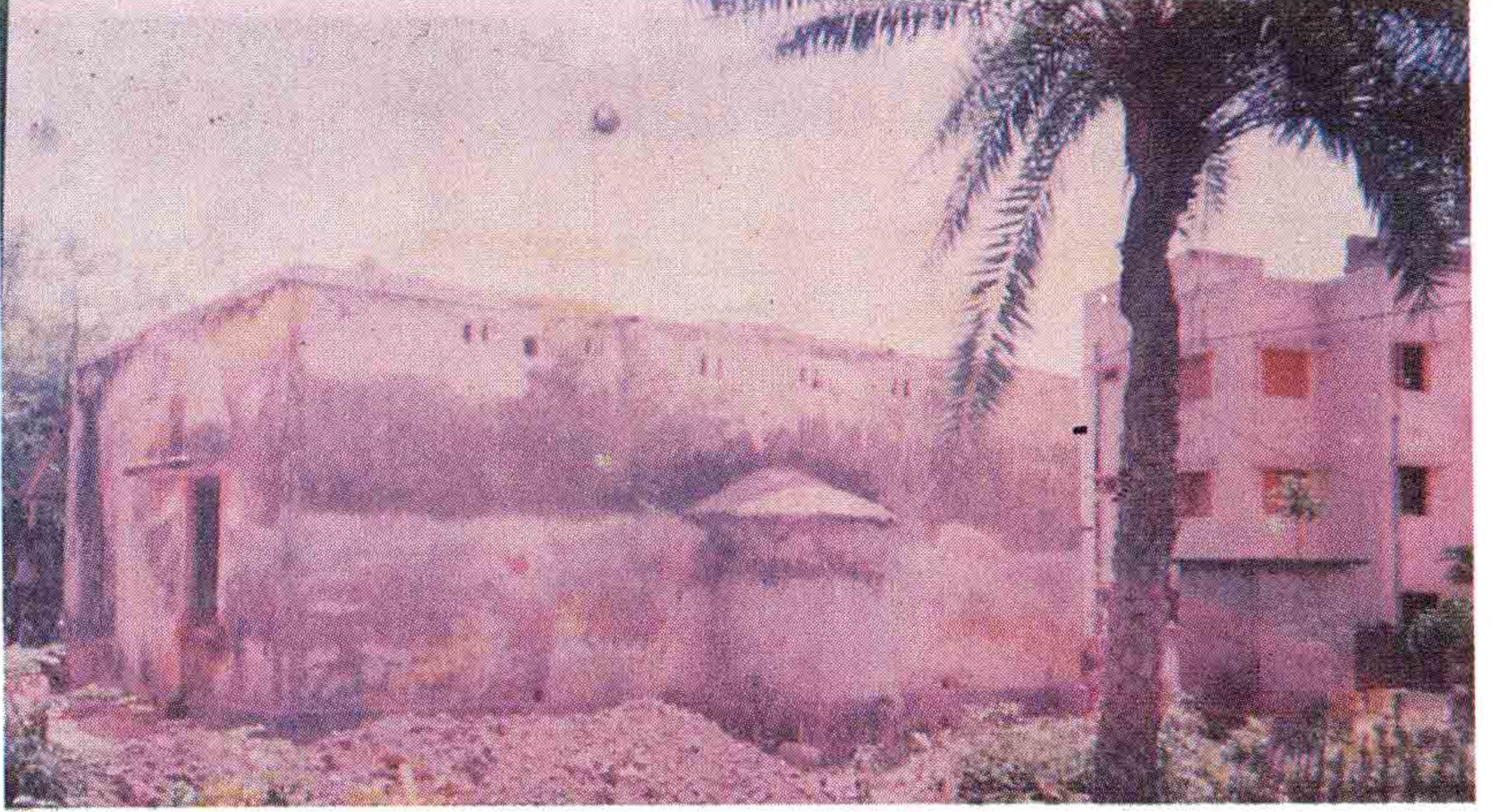
মাওলানা এনায়েত আলীর হাতে বায়'আতকারী ঝাবু সরদার ও ঝাগু সরদার প্রতিষ্ঠিত উত্তরবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জিহাদ কেন্দ্র ও মসজিদ। ১৯৫৯ সালে এই মসজিদের মেহরাবের দেওয়াল থেকে যে শিলালিপি উদ্ধার করে বর্তমানে রাজশাহী মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে, তাতে মসজিদের প্রতিষ্ঠাকাল ১২১৮ হিজরী লিখিত আছে। মূল মসজিদটি রাজশাহী সেনানিবাসের মধ্যে ছিল- যা ১৯৯০ সালে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। উপরের ছবিটি দ্বিতীয় বারে স্থানান্তরিত মসজিদের ছবি। শিলালিপিটি প্রথম মসজিদের হ'তে পারে [বরেন্দ্র মিউজিয়াম, রাজশাহী। শিলালিপি ক্রমিক সংখ্যা ২৮৮৭, সংগ্রহঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯]। ছবিঃ ১৯শে এপ্রিল, ১৯৯০।

৬নং ছবিঃ শিমুলবাড়ী কেন্দ্র, গাইবান্ধা। প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৮৫০খৃঃ-এর পরে।

সিরাজগঞ্জের জনৈক 'হজ' ছাহেব ও তদীয় পুত্র আলহাজ্জ আবদুস সুবহান এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ছবিঃ ১২.২.৯৬ ইং।

৭নং ছবিঃ কুলসোনা কেন্দ্র, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (প্রতিষ্ঠাকালঃ১৮৬০ খৃঃ-এর কিছু পূর্বে)
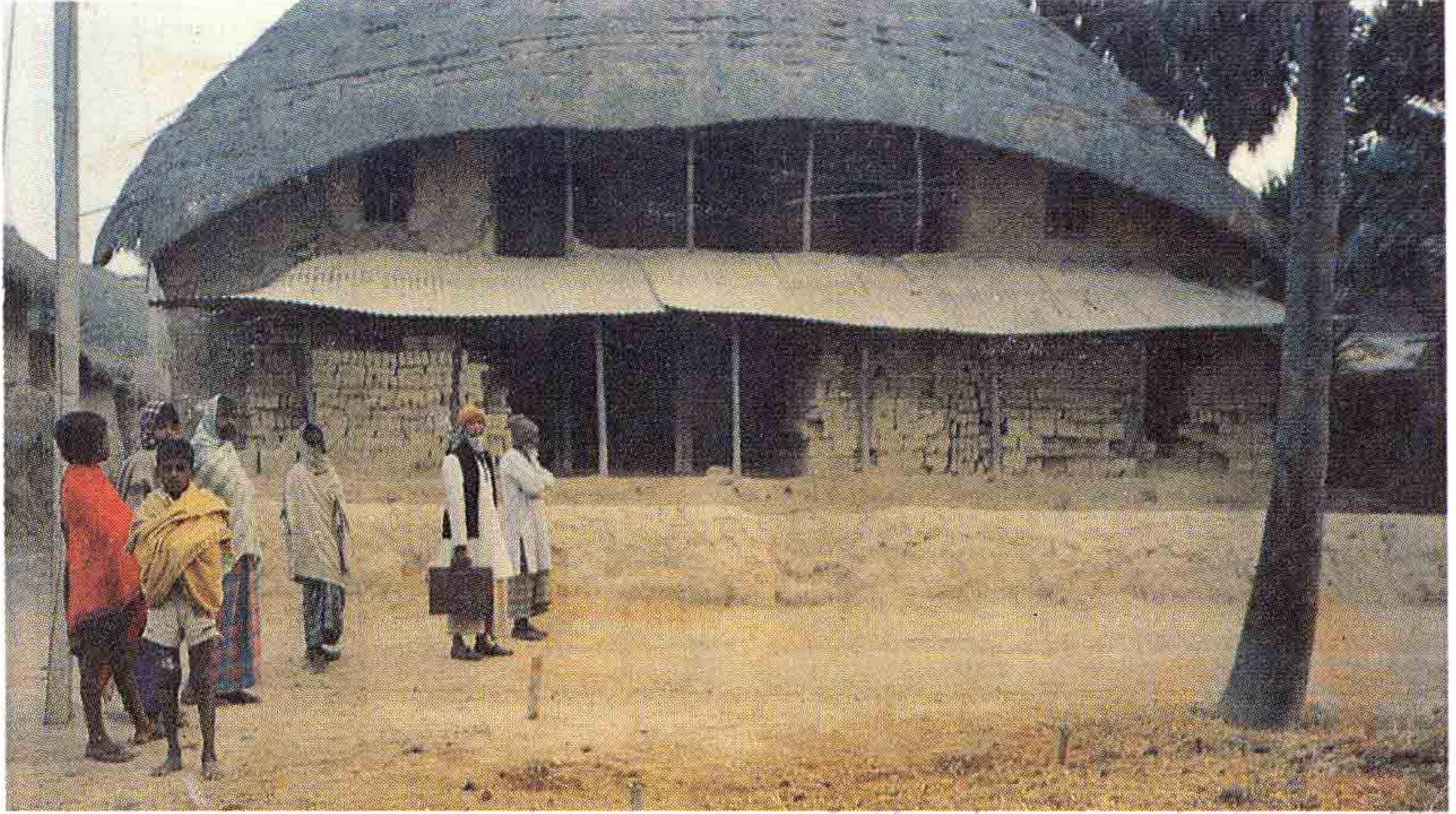
রাজশাহীর গাযী মাওলানা নাযীরুদ্দীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এখানে বসেই গাযী নাযীরুদ্দীনের ভাতিজা ও জামাতা বিখ্যাত আলিম মাওলানা নেয়ামাতুল্লাহ (১৮৫৯-১৯৪৩ খৃঃ)দরস দিতেন। বর্তমানে এটিকে 'কল্যাণঘর' নাম দেওয়া হয়েছে এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ে পরিণত করা হয়েছে। ছবিঃ ১৭ই জানুয়ারী ১৯৮৯।

৮নং ছবিঃ সোন্দাবাড়ী কেন্দ্র, বগুড়া, বাংলাদেশ (বিহারের দিলালপুর কেন্দ্রের শাখা হিসাবে সম্ভবতঃ ১৮৭০ খৃঃ-এর কিছু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত)

সোন্দাবাড়ী হ'তে অর্ধ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মেঘাগাছা সরকার বাড়ী জামে মসজিদ। এখানেই প্রথমে আন্দোলনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সোন্দাবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। সোন্দাবাড়ীতে মুজাহিদ কবরস্থান রয়েছে। ছবিঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯১।

৯ নং ছবিঃ জামিরা কেন্দ্র, রাজশাহী, প্রতিষ্ঠাকালঃ সম্ভবতঃ ১৮৯০ খৃঃ।

মুর্শিদাবাদের বিলবাড়ি কেন্দ্রের মাওলানা আবদুল্লাহ এলাহাবাদী (মৃঃ সম্ভবতঃ ১৩১৮/১৯০০ খৃঃ)-এর খলীফা হিসাবে মাওলানা মুহাম্মাদ বিন কারামাতুল্লাহ এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ছবিঃ ১২.২.৯৬ ইং।

১০ নং ছবিঃ দুয়ারী কেন্দ্র, রাজশাহী। প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯০০ খৃষ্টাব্দ।

কুমিল্লার গাযী আকরাম আলী খান (১৮৫৫-১৯৩৭ খৃঃ) এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ছবিঃ ১৩.২.৯৬ ইং।

১১ নং ছবিঃ গাযী মাখদূম হুসাইন ওরফে মাৰ্জ্জুম হোসেন-এর ব্যবহৃত বদনা

সাং- ভালুকা চাঁদপুর, সাতক্ষীরা। খাঁটি তামার এই বদনাটির ওজন ১২০০ গ্রাম, উচ্চতা সাড়ে ৬˝ ও ব্যাস ২৪˝। সংগ্রহঃ ২৩.১২.১৯৮৯খৃঃ

---

১২ নং ছবিঃ শোকগাথা। সমীরুদ্দীন, যমীরুদ্দীন ও জামা'আতুল্লাহ নামক তিন সহোদর শহীদ ভাইয়ের স্মরণে।
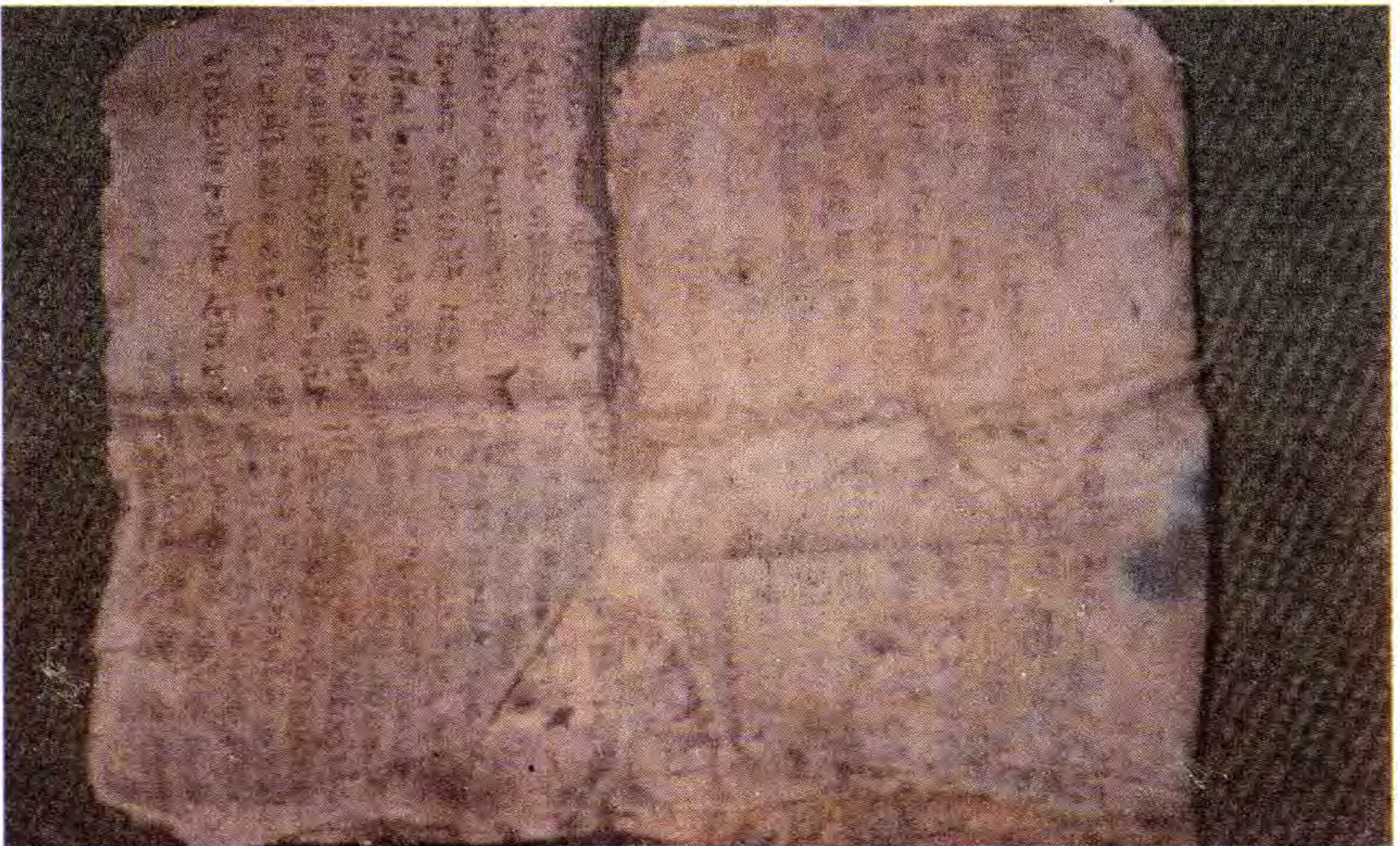
সাং -ঝাড়াবর্ষা, থানা-সাঘাটা, যেলা-গাইবান্ধা। সংগ্রহঃ ১৩.১০.১৯৮৯খৃঃ।

১৩ নং ছবিঃ জিহাদের তরবারী, খাপ ও ব্যাজ। মালিকঃ গাযী এফাযুদ্দীন হাক্কানী।

খোলাহাটি, গাইবান্ধা। তরবারীর দৈর্ঘ্যঃ সাড়ে ৩৮"। ১৯শে জুলাই '৯১- তে মালিকের উত্তরাধিকারীদের পক্ষ হ'তে তরবারী ও ব্যাজ গবেষককে উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়।

১৪ নং ছবিঃ **'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'**-এর পাঁচ তলা ভবন।
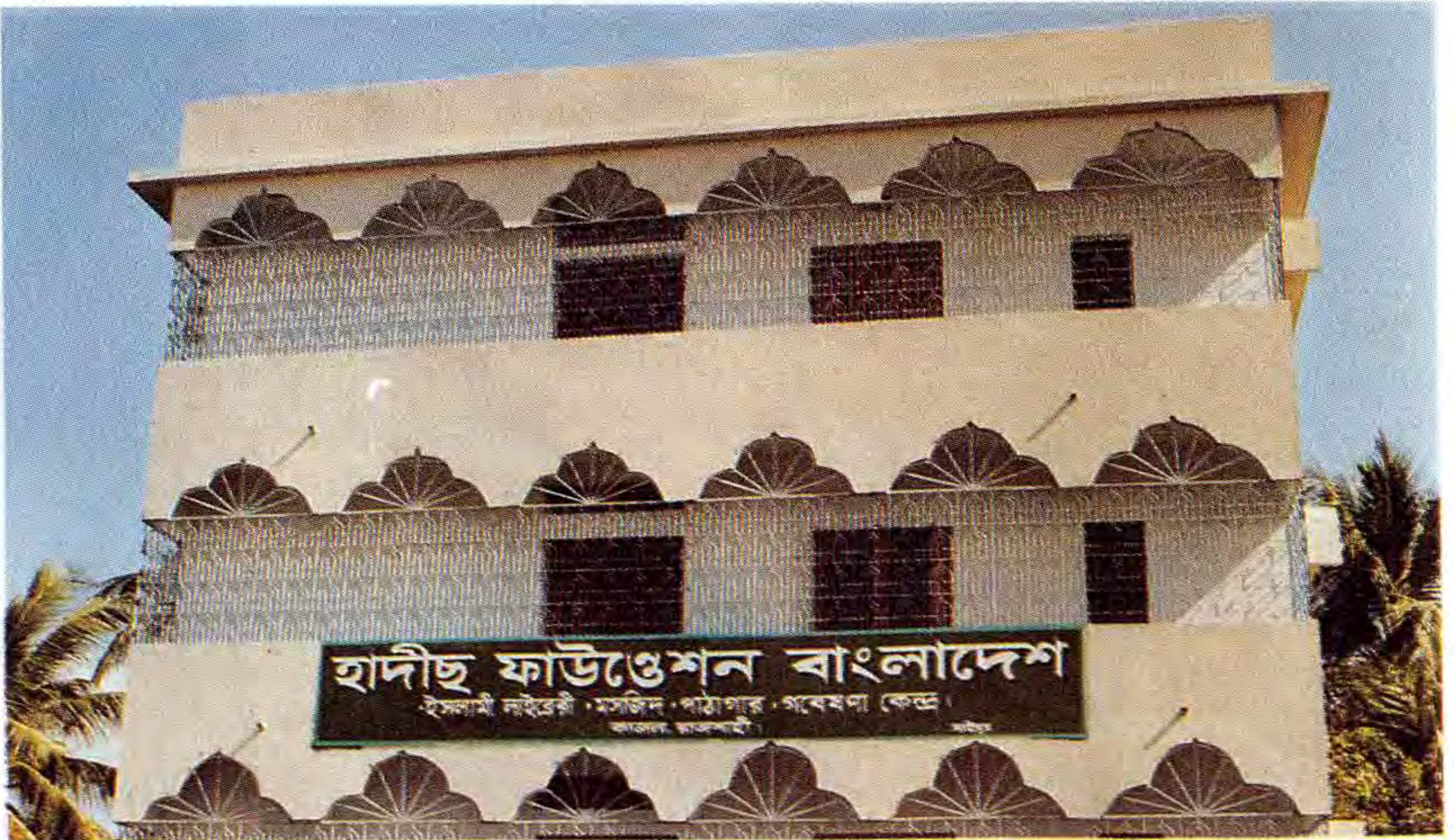
প্রতিষ্ঠাঃ ১৫ই নভেম্বর ১৯৯২। নির্মানঃ ১৯৯৫ খৃঃ। মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে ইসলামী গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থা (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেইট সংলগ্ন)। ছবিঃ ১৩.২.৯৬ ইং।

গ্রন্থপঞ্জী

المراجعات

ক- আরবী, ফারসী, উর্দূ

(الف) كتب العربية والفارسية والأردية

অমৃতসরী, ছানাউল্লাহ, মাওলানা, আহলেহাদীছ কা মাযহাব, লাহোরঃ দারুস সালাফিইয়াহ, ১৪০৫/১৯৮৫।০ ফুতূহাতে আহলেহাদীছ, মাকতাবা শু'আইব, করাচী-১, ১৯৬০।

আতীকুর রহমান, ডক্টর, আল্লামা শাওক্ব নিমভীঃ হায়াত ও খিদমাত, পাটনাঃ ১৯৮৭।

আমেদী, সায়ফুদ্দীন আবুল হাসান আলী, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম প্রেসের নাম নেই। ১৩৮৭/১৯৬৮ খৃঃ।

আযমী, মুছতফা মুহাম্মাদ, দিরাসাত ফিল হাদীছিন নবভী ওরা তারীখু তাদভীনিহি, রিয়ায বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখ বিহীন।

আল-'আব্বাদ, আবদুল মুহসিন, আর-রাদ্দু 'আলা মান কায্যাবা বিল আহাদীছিছ ছাহীহাহ ফিল মাহদীল মুনতাযার। মদীনাঃ রশীদ প্রেস ১৪০২//১৯৮২।

আল-'আরাবী, খালেদ, দা'ওয়াতি তাওহীদ ও 'আকাইদি আহলেহাদীছ, উড়িষ্যাঃ ১৩৭৭/১৯৫৮ খৃঃ।

আল-আশ'আরী, আলী আবুল হুসাইন, ০ মাক্বালাতুল ইসলামিঈন ওয়া ইখতিলাফুল মুছাল্লিঈন, প্রেসের নাম ও তারিখবিহীন। ০আল-ইবানাহ আন উছূলিদ্ দিয়ানাহ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৭/ ১৯৮৭ খৃঃ।

আল-আশক্বার, সুলাইমান মুহাম্মাদ, যুবদাতুত্ তাফসীর (শাওকানীর 'ফাৎহুল ক্বাদীর'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) কুয়েতঃ ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়, ১৪০৬/১৯৮৬।

আল-খতীব, 'উজাজ, ডক্টর, আল-মুখতাছারুল ওয়াজীয ফী উলূমিল হাদীছ বৈরুতঃ মুআসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫/১৯৮৫।

আলবানী, নাছিরুদ্দীন মুহাম্মাদ, আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন বি-নাফ্সিহী ফিল আক্বাইদি ওয়াল আহকাম, কুয়েতঃ দারুস সালাফিইয়াহ্, ১৪০৬/১৯৮৬।

আলী ক্বারী, মোল্লা, মিরক্বাত শরহ মিশকাত (দিল্লীঃ কুতুবখানা ইশা'আতুল ইসলাম, তারিখ বিহীন।

আলূসী, মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন, তাফসীর রূহুল বায়ান, মিসরঃ ইদারাহ তাবা'আতুল মুনীরিয়াহ, তাবি।

আবু ইয়ালা, মুহাম্মাদ আবুল হুসাইন, ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ, বৈরুতঃ তারিখবিহীন।

আবুদাউদ, সুলায়মান বিনুল আশ'আছ, সুনানু আবিদাউদ, বৈরুতঃ মাকতাবা আছারিয়াহ, তারিখবিহীন।

আবু যোহরা, মুহাম্মাদ, আল-মাযাহিবুল ইসলামিয়াহ, মিসরঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তারিখবিহীন।

আবুল হাসান ওবায়দুল্লাহ খান, হাকীম, ইসলামী সিয়াসাত ইয়া সিয়াসী ইসলাম, শ্রীনগরঃ ১৯৭৮।

আবুল হাসান, মুহাম্মাদ আয্-যাফ্রুল মুবীন-উর্দূ (লাহোরঃ ১৯৭৬)।

আবদুর রহমান আবদুল খালেক, আল-উছূলুল ইল্মিয়াহ লিদ্ দা'ওয়াতিস সালাফিইয়াহ, কুয়েতঃ ১৪০৩/১৯৮২।

আবদুল ওয়াহ্হাব, মাওলানা, মুকাম্মাল নামায, করাচীঃ ১৪০৪/১৯৮৪।

আবদুল্লাহ বিন আহমাদ, ইমাম, কিতাবুস সুন্নাহ, মক্কাঃ উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪০৬/১৯৮৬।

আবদুস সাত্তার, মাওলানা, ০ তাফসীরে সাত্তারী (উর্দূ), করাচীঃ মাকতাবা আইয়ূবিয়াহ, ১৯৬৫। ০ কুরআন মজীদ বা-দো তরজমা (উর্দূ) করাচীঃ দারুস সালাম, ১৯৮২। ০ খুৎবায়ে ছাদারাত, দিল্লীঃ ১৩৫১ হ'তে ১৩৫৬ হিজরীর মধ্যে।

আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম, 'মুসনাদ' (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ২য় সংস্করণ, 'কানযুল উম্মাল' সহ , ১৩৯৮/১৯৭৮।

আহমাদ আমীন, ডক্টর, ফাজ্রুল ইসলাম (কায়রোঃ মাকতাবা নাহ্যাহ মিছরিয়াহ, ১৯৭৫)

আসক্বালানী, ইবনু হাজার, আহমাদ — ০ ফাৎহুল বারী, কায়রোঃ খায়রিয়াহ প্রেস, ১৩১৯/১৯০১ খৃঃ; কায়রোঃ মাকতাবা সালাফিইয়াহ, ৩য় সংস্করণ ১৪০৭/১৯৮৭। ০ শারহু নুখ্‌বাতিল ফিক্‌র, দেউবন্দঃ মাকতাবা থানবী, তাবি। ০ মুকাদ্দামা ফাৎহুল বারী, কায়রোঃ ১৩৪৭/১৯২৯।

ইউসুফ, ছালাহুদ্দীন হাফেয, — তাহরীকে জিহাদ আহলেহাদীছ আওর আহনাফ (উর্দূ) গুজরানওয়ালা- পাকিস্তানঃ ১৪০৬/১৯৮৬।

ইকরাম, মুহাম্মাদ শায়খ, — রূদে কাওছার, লাহোরঃ ফিরোয সন্‌স, ১৯৬৮।

ইবনু আবদিল বার্র, ইউসুফ আবু উমার, — জামি'উ বায়ানিল ইল্‌মি ওয়া ফায্‌লিহী, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ, তারিখবিহীন।

ইবনু আবেদীন, মুহাম্মাদ আমীন, — রাদ্দুল মুহতার ওরফে 'ফাতাওয়া শামী' দিল্লীঃ ১২৭২ হিঃ; বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র ১৩৯৯/১৯৭৯।

ইবনু আবদুল ওয়াহ্‌হাব, মুহাম্মাদ, — কিতাবুত তাওহীদ, বৈরুতঃ 'আলামুল কুতুব, ১৪০৬/১৯৮৬।

ইবনু আবী শায়বা, মুহাম্মাদ, ইমাম, — আল-কিতাবুল মুছান্নাফ, বোম্বাই, ১৩৯৯/১৯৭৯।

ইবনুল কাইয়িম, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ — ০ মুখতাছার ছাওয়াইকুল মুরসালাহ আলাল জাহ্‌মিয়াহ, রিয়ায আল-হাদীছাহ, রিয়াযঃ তারিখবিহীন। ০ ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন আন রাব্বিল আলামীন বৈরুতঃ দারুল জীল, ১৯৭৩।

ইবনু কাছীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল, — তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৪০৮/১৯৮৮।

ইবনু খাইয়াত্ব, খলীফা আবু আমর — ০ কিতাবুত্ ত্ববাক্বাত, রিয়াযঃ দার ত্বাইয়িবাহ, ১৪০২/১৯৮২। ০ তারীখু খলীফা বিন খাইয়াত্ব, রিয়াযঃ দার তাইয়িবা ১৪০৫/১৯৮৫।

ইবনু খাল্‌দূন, আবদুর রহমান, — তারীখু ইবনি খাল্‌দূন, বৈরুতঃ মুওয়াস্ সাসাতুল আলমী, তারিখবিহীন।

ইবনু খাল্লেকান, আহমাদ কাযী, অফ্ইয়াতুল আ'ইয়ান ফী আম্বাই আব্নাইয্ যামান মিসরঃ মায়মানিয়াহ্ প্রেস, ১৩১০/১৮৯২ খৃঃ।

ইবনুছ ছালাহ্ উছমান আবু আমর, কিতাবু উলূমিল হাদীছ ওরফে মুকাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ, মিসরঃ সা'আদাহ প্রেস, ১৩২৬ হিঃ

ইবনু তায়মিয়াহ, আহমাদ, ইমাম ০ মিনহাজুস্ সুন্নাহ, প্রেসের নাম ও তারিখবিহীন। ০ মাজমূউল ফাতাওয়া, মক্কাঃ মাকতাবা নাহ্যাতুল হাদীছাহ, ১৪০৪/১৯৮৪। ০ আল-উবূদিয়াহ, রিয়াযঃ দারুল ইফতা ১৪০৪/১৯৮৪। ০ ফাৎওয়া হামাভিয়াহ্ কুব্রা, লাহোরঃ মাকতাবা সালাফিইয়াহ ১৪০৪/১৯৮৪।

ইবনু নাদীম, কিতাবুল ফিহ্রিস্ত, বৈরুতঃ মাকতাবা খাইয়াত্ব, তা বি।

ইবনু মান্দাহ, মুহাম্মাদ, ইমাম, কিতাবুল ঈমান, মদীনাঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০১/১৯৮১।

ইবনু সা'আদ, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, 'আত-ত্বাবাক্বাতুল কুব্রা' বৈরুতঃ দার ছাদির ১৪০৫/১৯৮৫।

ইবনু রাজাব, আবদুর রহমান যয়নুদ্দীন, কিতাবুয যায়ল 'আলা ত্বাবাক্বাতিল হানাবিলাহ বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ১৩৭২/১৯৫২।

ইবনু হযম, আবু মুহাম্মাদ ইমাম, ০ কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহ্ওয়া ওয়ান নিহাল (শহরস্তানীর 'মিলাল'সহ) বৈরুতঃ মাকতাবা খাইয়াত্ব ১৩২১/১৯০৩। ০ আল-মুহাল্লা, দামেস্কঃ ১৩৪৭/১৯২৮ খৃঃ।

ইবনু হাজার, আহমাদ আলে বিতামী, তাৎহীরুল জানান ওয়াল আরকান আন দারানিশ শিরকে ওয়াল কুফরান, কুয়েতঃ ১৩৯৪ হিঃ।

ইবনু হিশাম, আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক, সীরাতু ইব্নি হিশাম, কুয়েতঃ ১৪০৫/১৯৮৫ (পরিমার্জিত); মিসরঃ বাবী হালবী প্রেস, ২য় সংস্করণ ১৩৭৫/১৯৫৫।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা ০ 'মিন আত্বইয়াবিল মুনাহ ফী ইল্মিল মুছত্বালাহ' ১৪০০ হিঃ/১৯৮০ খৃঃ)

ওয়াযীরাবাদী, ফযলে এলাহী, জিহাদে কাশ্মীর, করাচীঃ ১৪০৮/১৯৮৮।

ওয়াযীরুল ইয়ামানী, মুহাম্মাদ আবু আবদুল্লাহ, আর-রওযুল বাসিম ফিয-যাব্বি 'আন সুন্নাতি আবিল ক্বাসিম, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ১৩৯৯ হিঃ।

কাইয়ূম খিযির, ছাদিকপুর-পাটনা, কুরবানগাহে আযাদীয়ে ওয়াত্বন, পাটনাঃ ১৯৭৮।

কীলানী, আবদুর রহমান, সারগুযাস্তে নূরিস্তান, লাহোরঃ ১৯৮৬।

কুরায়শী, ইশতিয়াক হুসাইন, বার্রে আযীম পাক ও হিন্দ কী মিল্লাতে ইসলামিয়াহ (উর্দু অনুবাদঃ বেলাল আহমদ যুবায়রী) করাচী বিশ্ব-বিদ্যালয়, ১৯৬৭।

ছাদ্রুশ শারী'আহ, উবায়দুল্লাহ বিন মাসঊদ, তাওযীহ শারহ্ তানক্বীহুল উছূল, কলিকাতাঃ ১২৭৮/১৮৬১।

ছালাহুদ্দীন মকবুল আহমাদ, দা'ওয়াতু শায়খিল ইসলাম (জোগাবাঈ, নয়াদিল্লীঃ ১৪১২/১৯৯২

ছাবূনী, আবদুর রহমান, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ ছাফাত-কুয়েতঃ ১৪০৪/১৯৮৪

ছিদ্দীক হাসান খান, নওয়াব, ক্বাৎফুছ ছামার ফী বায়ানি আক্বীদাতি আহ্লিল আছার, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ১৪০৪ হিঃ। ০ ফাৎহুল বায়ান ফী মাক্বাছিদিল কুরআন, ভূপাল-ভারতঃ ১২৯১ হিঃ। ০ ফাৎহুল বাব লি-আক্বাইদি উলিল-আল্বাব-(উর্দূ) বেনারসঃ সাঈদুল মাতাবে, ১৩০৫/১৮৮ ০ ইবক্বাউল মিনান বি-ইলক্বাইল মিহান (উর্দূ) লাহোরঃ দারুদ্ দাওয়াতিস্ সালাফিইয়াহ্ ১৯৮৬।

ছুবহী ছালেহ, ডক্টর, উলূমুল হাদীছ ওয়া মুছত্বালাহুহু দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৩/১৯৬৩।

জয়পুরী, ইউসুফ মাওলানা, হাক্বীক্বাতুল ফিক্হ, বোম্বাইঃ (সম্পাদনাঃ দাউদ রায) তারিখ বিহীন।

জিওন মোল্লা, আহমাদ হাফেয, নূরুল আন্ওয়ার (ক্বামারুল আক্বমারসহ) করাচীঃ কালাম কোম্পানী, তারিখবিহীন।

জীলানী, আবদুল কাদের, শায়খ, কিতাবুল গুনিয়াহ, মিসরঃ ১৩৪৬ হিঃ

জুনাগড়ী, মুহাম্মাদ মাওলানা ০ সায়েফে মুহাম্মাদী (দিল্লী আযাদ বারকী প্রেস, ১৩৪৮/১৯৩২; ০ শাম্‌'এ মুহাম্মাদী (দিল্লীঃ হায়াদার বারকী প্রেস, ১৩৫৩/১৯৩৭; ০ 'ত্বরীক্বে মুহাম্মাদী (করাচী-৬ঃ মাকতাবা মুহাম্মাদীয়া, তাবি; 'হেদায়াতে মুহাম্মাদী (দিল্লীঃ বাড়াহ সদর, তাবি।

জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়া মিসরঃ দারুল হিলাল, ১৯৫৭।

ঝাংগুরী, আবদুর রহমান, ফাতাওয়া ওলামায়ে কেরাম বার তাক্বর্রুরি ইমাম' দিল্লীঃ আর্মী প্রেস, তাবি।

তাব্‌রেযী, মুহাম্মাদ আল-খত্বীব, ০ মিশকাতুল মাছাবীহ, বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫/ ১৯৮৫; দিল্লীঃ আছাহ্‌হুল মাতাবে প্রেস ১৩৫০/১৯৩২।

তাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর, ইমাম, জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ১৪০৭/১৯৮৭

তিরমিযী, মুহাম্মাদ আবু ঈসা, ইমাম, জামি' তিরমিযী, দিল্লীঃ মুজতাবায়ী প্রেস ১৩০৮ হিঃ; বৈরুতঃ (তাহকীক, ফুয়াদ আবদুল বাকী), ১৪০৮ হিঃ

থানেশ্বরী, মুহাম্মাদ জা'ফর, তাওয়ারীখে আজীব, দিল্লী ঃ ১৩৪৪/১৯২৫।

দাউদী, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ, ত্বাবাক্বাতুল মুফাস্‌সিরীন, কায়রোঃ মাকতাবা ওয়াহ্‌বাহ ১৩৯২/১৯৭২।

দীনাওয়ারী, ইবনু কুতায়বাহ, ইমাম, তাবীলু মুখ্‌তালাফিল হাদীছ ফির রাদ্দি 'আলা আ'দা'ই আহ্‌লিল হাদীছ, মিসরঃ কুর্দিস্তান প্রেস ১৩২৬/১৯০৮।

দেহলভী, ওয়ালিউল্লাহ শাহ, ০ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, মিসরঃ ১৩২২ হি; কায়রোঃ দারুত্‌ তুরাছ, ১৩৫৫ হিঃ।
০ ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদি ওয়াত্‌ তাক্বলীদ (আরবী-উর্দূ), লাহোরঃ ছিদ্দীকী প্রেস, তারিখবিহীন।

০ আল-ইনছাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখ্‌তিলাফ, বৈরূতঃ দারুন নাফাইস, ১৩৯৭/১৯৭৭। ০ আল-আক্বীদাতুল হাসানাহ, আকবরাবাদ-দিল্লীঃ ১৩০৪/১৮৮৬। ০ ফুয়ূযুল হারামাইন (আরবী-উর্দূ), দিল্লীঃ মাতবা'আ আহমাদী, ১৩০৮/১৮৯০। ০ সাৎ'আত (উর্দূ অনুবাদঃ মুহাম্মাদ মতীন হাশেমী) লাহোরঃ ইদারা ছাক্বাফাতি ইসলামিয়াহ, ১৯৮৬। ০ তাফ্‌হীমাতুল ইলাহিয়াহ্‌, বিজনৌর-ভারতঃ ১৩৫৫ হিঃ। ০ আল-ফাওযুল কাবীর (আরবী), কানপুর ছাপা, ১৩৬৯ হিজরীতে ঢাকায় লিখিত; ঐ (ফারসী) দিল্লীঃ মুজতাবায়ী; ঐ (উর্দূ) দিল্লীঃ মাকতাবা বুরহান। ০ অছিয়াতনামা (ফারসী), কানপুর, ভারতঃ ১২৭৩ হিঃ। ০ ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা (ফারসী) রায়বেরেলীঃ ছিদ্দীকী প্রেস, তাবি; ঐ, (উর্দূ অনুবাদ) করাচীঃ তাবি।

দেহলভী, নযীর হুসাইন, মিয়াঁ, ০ মি'ইয়ারুল হাক্ব, দিল্লীঃ ১৩৩৭/১৯১৯। ০ ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ, দিল্লীঃ ১৪০৯/১৯৮৮।

দেহলভী, মিরযা হায়রাত, হায়াতে ত্বাইয়িবা, লাহোরঃ মাকতাবাতুস সালাম, ১৯৫৮ খৃঃ

দেহলভী, শায়খ আহমাদ, তারীখু আহ্‌লিল হাদীছ (আরবী), লাহোরঃ ১৩৫২ হিঃ।

নওশাহ্‌রাবী, আবু ইয়াহ্‌ইয়া ইমাম খান, তারাজিমে উলামায়ে হাদীছ হিন্দ, লায়ালপুর-পাকিস্তানঃ ১৩৯১/১৯৮১।

নাদভী, আবুল হাসান আলী, সৈয়দ, সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ, লাক্ষ্ণৌঃ ১৯৩৯ খৃঃ

নাদভী, মাসঊদ আলম, ০ হিন্দুস্তান কী পহেলী ইসলামী তাহরীক, দিল্লীঃ মাকতাবা ইসলামী ১৯৮১। ০ ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী আওর উন্‌কে আফ্‌কার পর এক নযর, লাহোরঃ ১৪০৬/১৯৮৫।

নাদভী, রঈস আহমাদ, জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাছ্নীফী খিদমাত, বেনারসঃ ১৪০০/১৯৮০।

নাদভী, সুলায়মান সাইয়িদ, আরব ও হিন্দ কে তা'আল্লুক্বাত, এলাহাবাদঃ হিন্দুস্তান প্রেস, ১৯৩০।

নবভী, মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া, রিয়াযুছ ছালেহীন, সুরাবায়া-ইন্দোনেশিয়াঃ তারিখবিহীন।

নাসাঈ, আহমাদ বিন শু'আইব, ইমাম, সুনানুন নাসাঈ (তা'লীক্বাত সালাফিইয়া সহ), লাহোরঃ ১৩৭৬/১৯৫৬।

ফিরিওয়াঈ, আবদুর রহমান, জুহূদ মুখ্লিছাহ ফী খিদমাতিস্ সুন্নাতিল মুত্বাহ্হারাহ, বেনারসঃ মাতবা'আ সালাফিইয়াহ, ১৪০৬/১৯৮৬।

ফিরিস্তা, মুহাম্মাদ কাসিম হিন্দুশাহ, তারীখে ফিরিস্তা (ফারসী), কানপুরঃ নওলকিশোর ১৩০১/১৮৮৩ খৃঃ।

ফুল্লানী, ছালেহ ইমাম, ঈক্বাযু হিমামি উলিল আবছার, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ১৩৯৮/১৯৭৮।

বরকতুল্লাহ, শাহযাদা, মুখতাছার সাওয়ানিহ্ জামা'আতে 'আলিয়াহ মুজাহিদীন, পেশোয়ারঃ তাবি (বক্তৃতা ১৯৪৮)।

বাগদাদী, আবদুল কাহির ০ আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক্ব, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তারিখ বিহীন। ০ কিতাবু উছূলিদ দীন, ইস্তাম্বুলঃ দাওলাহ প্রেস ১৩৪৬/১৯২৮।

বাগদাদী, আবুবকর আল-খত্বীব ০ শারফু আছহাবিল হাদীছ লাহোরঃ রিপন প্রেস, তারিখ বিহীন। ০ তারীখু বাগদাদ, কায়রোঃ ১৩৪৯/১৯৩১।

বাগাভী, মুহিউস সুন্নাহ, ইমাম, শারহুস-সুন্নাহ, বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩/১৯৮৩।

বাহ্রুল উলূম, আবদুল আলী, ফাওয়াতিহুর রাহমূত শারহু মুসাল্লামুছ ছুবূত, লাক্ষ্ণৌঃ ১২৯৫/১৮৭৮।

বালাযুরী, আবুল হাসান আহমাদ, ফুতূহুল বুলদান, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল

ইলমিয়াহ, ১৪০৩/১৯৮৩।

বায়হাক্বী, আবুবকর আহমাদ, ইমাম — ০ আল-ই'তিক্বাদ 'আলা মাযহাবিস সালাফ আহ্‌লিস্ সুন্নাহ, ফায়ছালাবাদ-পাকিস্তানঃ হাদীছ একাডেমী, তারিখবিহীন। ০ সুনানুল কুব্‌রা, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ্, তাবি। ০ দালাইলুন নবু'অত, বৈরুতঃ ১৪০৫/১৯৮৫।

বেনারসী, সাঈদ মাওলানা, — কায়ফিয়াতে মুনাযারায়ে মুর্শিদাবাদ, বেনারসঃ সাঈদুল মাতাবে, তাবি।

বেলায়েত আলী, মাওলানা, — 'আমল বিল হাদীছ (ফারসী-উর্দূ) দিল্লীঃ মাতবা'আ ফারুকী, তারিখবিহীন।

বিহারী, ফযল হুসাইন, — আল-হায়াত বা'দাল মামাত (উর্দূ) করাচীঃ ১৩৭৯/১৯৫৯।

বুখারী, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল, ইমাম, — ছহীহুল বুখারী, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ, তাবি; ঐ মীরাট ছাপাঃ ১৩২৮ হিঃ।

মাওয়ার্দী, আবুল হাসান আলী, ইমাম, — তাফসীরুল মাওয়ার্দী, কুয়েতঃ ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়, ১৪০২/১৯৮২।

মাক্বদেসী, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ, — আহ্‌সানুত তাক্বাসীম ফী মা'রিফাতিল আক্বালীম, লন্ডনঃ ই, জে, ব্রীল, ১৯০৬ খৃঃ

মাগরাভী, মুহাম্মাদ, আল-মুফাস্‌সিরূন — বায়নাত তাবীল ওয়াল ইছবাত ফী আয়াতিছছিফাত, রিয়াযঃ দার ত্বাইয়িবা, ১৪০৫/১৯৮৫।

মানছূর পুরী, সুলায়মান মুহাম্মাদ, — রাহমাতুল-লিল-'আলামীন, দিল্লীঃ ১৯৮০।

মারকাযী দারুল ইমারত, — মাশরেক্বী পাকিস্তান কী তাবলীগী ও তানযীমী রিপোর্ট, মারকাযী গোরাবায়ে আহলেহাদীছ করাচী, ১৯৬৮।

মালেক, ইমাম, — মুওয়াত্ত্বা (মুলতান, পাকিস্তানঃ মাকতাবা ফারূকীয়া, তাবি।

মেহের, গোলাম রাসূল — ০ সারগুযাস্তে মুজাহিদীন, লাহোরঃ শাইখ গোলাম আলী এন্ড সন্‌স, তারিখবিহীন। ০ জামা'আতে মুজাহিদীন, ঐ তাবি।

০ সাইয়িদ আহমাদ শহীদ, ঐ, তাবি।

মুবারকপুরী, ক্বাযী আত্বহার, ০ আল-ইক্বদুছ ছামীন ফী ফুতূহিল হিন্দ ওয়া মান ওয়ারাদা ফীহা মিনাছ ছাহাবাতি ওয়াত্ তাবেঈন, কায়রোঃ দারুল আনছার ১৩৯৯/১৯৭৯। ০ রিজালুস্ সিন্দ ওয়াল হিন্দ, ঐ ১৩৯৮/১৯৭৮।

মুসলিম বিনুল হাজ্জাজ, ইমাম, ছহীহ মুসলিম, বৈরুতঃ দারুল ফিক্র ১৪০৩ হিঃ।

মুহাম্মাদ বিন আহমাদ কে, বি, ০ আল-হারাকাতুস সালাফিইয়াহ বে-কেরালা, তিরূর-কেরালাঃ ১৯৮২। ০ নাদ্ওয়াতুল মুজাহিদীন ওয়া আহদাফুহা, ঐ তাবি।

মুহাম্মাদ মুবারক, হায়াতুশ শায়খ নাযীর হুসাইন দেহলভী (উর্দূ), আহলেহাদীছ ট্রাষ্ট, কোর্ট রোড, করাচী-১, তাবি।

মুহিউদ্দীন, মাওলানা, সাব'আ মুআ'ল্লাক্বাত(আরবী-উর্দূ), ঢাকাঃ ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৫।

যামাখ্শারী, জারুল্লাহ,মাহমূদ বিন উমার, আল-কাশ্শাফ আন হাক্বাইক্বিত্ তান্‌যীল ওয়া 'উয়ূনিল আক্বাভীল ফী উজূহিত্ তাভীল, মিসরঃ ১৩৪৪ হিঃ।

যাহাবী, শামসুদ্দীন, মুহাম্মাদ, মুখ্তাছারুল 'উলু লি-'আলিইল গাফ্ফার, বৈরুতঃ আল-মাক্তাবুল ইসলামী, ১৪০১/১৯৮১। ০ তাযকেরাতুল হুফ্ফায, হায়দরাবাদঃ দাক্ষিণাত্য, ১৩৩৩/১৯১৫ খৃঃ; বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ, তাবি। ০ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, বৈরুতঃ ১৪০২/১৯৮২।

যুবায়রী, আবদুর রহীম মৌলবী ০ মাজমূ'আ রাসাইলে তিস্'আ, দিল্লীঃ মাতবা'আ ফারূকী, তাবি। ০ তায্কেরায়ে ছাদিক্বাহ (উর্দূ), কলিকাতাঃ মাতবা'আ উছমানী, স্থানের নাম উল্লেখ নেই'। ১৩১৯/১৯০১

রহমানী, আবদুল হামীদ, তাক্বরীরু মালদীফ (আরবী) জনৈক সঊদী মাবঊছ-এর প্রতিবেদন

রহমানী, আবেদ হাসান, জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদ্‌রীসী খিদ্‌মাত, বেনারসঃ ১৪০০/১৯৮০ খৃঃ।

রহমানী, নাযীর আহমাদ, আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, বেনারসঃ ১৯৮৬।

রায্‌যাকী, শাহেদ হুসাইন, ইল্‌মে হাদীছ মে বার্রে আযীম পাক ও হিন্দ কা হিস্‌সা (মূল ইংরেজী হ'তে অনুবাদ) লাহোরঃ ইদারা ছাক্বাফাতি ইসলামিয়াহ, ১৯৭৭।

রাযী, মুহাম্মাদ বিন ওমর আল-ফখর, ইমাম, মাফাতীহুল গায়েব ওরফে তাফসীরুল কাবীর, মিসরঃ বাহিইয়াহ প্রেস ১৩৫৩/১৯৩৪।

রিযা, রশীদ সৈয়দ, মুখতাছার তাফসীরুল মানার, বৈরুতঃ ১৪০৪/১৯৮৪।

লালকাঈ, হিবাতুল্লাহ, ইমাম, শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহ্‌লিস্‌ সুন্নাহ, রিয়াযঃ দার ত্বাইয়িবাহ সম্ভবতঃ ১৪০২/১৯৮২।

লাক্ষ্ণৌবী, আব্দুল হাই, শারহু বেক্বায়াহ (মুক্বাদ্দামা) দিল্লীঃ ১৩২৭ হিঃ। o নাফে' কাবীর (জামে ছাগীর-এর মুক্বাদ্দামা), লাক্ষ্ণৌঃ ১২৯১ হিঃ।

শহরস্তানী, মুহাম্মাদ বিন আবদুল করীম, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তাবি।

শহীদ, সাইয়িদ আহমাদ, ছিরাতে মুস্তাক্বীম (ফারসী হ'তে উর্দূ অনুবাদঃ আনুবাদকের নাম নেই)। করাচীঃ কালাম কোম্পানী, তারিখবিহীন।

শহীদ, ইসমাঈল শাহ, তানভীরুল আইনাইন ফী ইছবাতি রাফ্'ইল ইয়াদাইন (আরবী-উর্দূ) মীরাট ছাপা, ১২৭৯

শাওকানী, মুহাম্মদ বিন আলী, ইমাম o ইরশাদুল ফুহূল ইলা তাহক্বীক্বিল হাক্বি মিন ইল্‌মিল উছূল, মিসরঃ বাবী হাল্‌বী প্রেস, ১৩৫৬/১৯৩৭।o নায়লুল আওত্বার শারহু মুন্‌তাক্বাল আখ্‌বার মিসরঃ বাবী হালবী, তারিখবিহীন। o আল-ক্বাওলুল মুফীদ ফী আদিল্লাতিল ইজতিহাদি ওয়াত্‌ তাক্বলীদ, মিসরঃ ১৩৪০ হিঃ। o তাফসীর ফাৎহুল ক্বাদীর, মিসরঃ ১৩৫০ হিঃ।

শাওক্বী যায়েফ, ডক্‌টর, আল-মাদারিসুন নাহ্‌ভিয়াহ, কায়রোঃ ১৯৭২খৃঃ।

শাকির, আহমাদ মুহাম্মাদ, আল-বা'ইছুল হাছীছ শারহু ইখ্‌তিছারি উলূমিল হাদীছ বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ১৪০৩/১৯৮৩।

শাত্বেবী, আবু ইসহাক্ব, আল-মুওয়াফিক্বাত ফী উছূলিশ শারী'আহ, মিসরঃ মাকতাবা তিজারিয়াহ কুব্‌রা, ১৩৯৫/১৯৭৫।

শাফেঈ, মুহাম্মাদ বিন ইদরীস, ইমাম, আর-রিসালাহ, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ, তারিখবিহীন।

শা'রানী, আবদুল ওয়াহ্‌হাব, কিতাবুল মীযান, দিল্লীঃ আকমালুল মাতাবে, ১২৮৬ হিঃ।

শাহপুরী, আবাদ, সাইয়িদ বাদশাহ কা ক্বাফেলা, লাহোরঃ ১৯৮১ খৃঃ।

শিয়ালকোটি, ইবরাহীম মীর, তারীখে আহলেহাদীছ, ওখ্‌লা- নয়াদিল্লীঃ ১৯৮৩।

সাবাঈ, মুছত্বাফা ডক্‌টর, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত্‌ তাশ্‌রী'ইল ইসলামী, বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী ১৩৯৬/১৯৭৬।

সালাফী, আবদুল গাফ্‌ফার, দাস্‌তূর জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ, করাচী- পাকিস্তানঃ ১৯৬৩।

সালাফী, মুহাম্মাদ উযাইর, হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক, বেনারসঃ ১৯৭৯।

সাবিক, সৈয়দ, আল-আক্বাইদুল ইসলামিয়াহ বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ১৪০২/১৯৮২।

সিন্ধী, মুহাম্মাদ মুঈন বিন মুহাম্মাদ, দিরাসাতুল লাবীব ফিল উস্‌ওয়াতিল হাসানাহ বিল হাবীব, লাহোরঃ বায়তুস্‌ সাল্‌ত্বানাহ, ১২৮৪/১৮৬৮ খৃঃ।

সিন্ধূ, মুহাম্মাদ আশরাফ, হাকীম, নাতায়েজুত্‌ তাক্‌লীদ, লাহোরঃ ১৩৬৪/১৯৪৫ খৃঃ।

সুবকী, তাজুদ্দীন আবদুল ওয়াহ্‌হাব, ত্বাবাক্বাতুশ শাফে'ঈয়াহ আল-কুব্‌রা বৈরুতঃ অফসেট ছাপা, তারিখবিহীন।

সৈয়ূতী, জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ০ ত্বাবাক্বাতুল হুফ্‌ফায, কায়রোঃ মাকতাবা ওয়াহ্‌বাহ ১৩৯৩/১৯৭৩। ০ তাদ্‌রীবুর রাবী শারহু

তাক্বরীবিন নবভী মদীনাঃ আল-মাকতাবাতুল ইল্‌মিয়াহ, ১৩৭৯/১৯৫৯।

হাকেম, আবু আবদুল্লাহ, ইমাম, আল-মুস্তাদ্‌রাক আলাছ ছাহীহায়েন (তালখীছসহ), বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, তারিখবিহীন।

হামাভী, শিহাবুদ্দীন ইয়াকূত, মু'জামুল বুলদান, বৈরুতঃ দার ছাদির, তাবি।

হারাস, মুহাম্মাদ খলীল, শারহুল আক্বীদাতিল ওয়াসিত্বিয়াহ (মূলঃ ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ) রিয়াযঃ দারুল ইফতা ১৪০৩/১৯৮৩।

হালীম, মুহাম্মাদ, মুজাদ্দিদে আযম, লাহোরঃ ১৯৬৮খৃঃ।

হাস্‌সান বিন ছাবিত, দীওয়ানু হাস্‌সান, দার বৈরুতঃ ১৩৯৮/১৯৭৮।

হিন্দ, মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, লাম্‌হাতুন আন জমঈয়তি আহ্‌লিল হাদীছ (আরবী লিফলেট) দিল্লীঃ ১৯৮৯ খৃঃ।

হুসাইনী, আবিদ আলী, ভূপাল, তাহরীকাতে আযাদী কে আয়নে মেঁ (বুধওয়ারা-ভূপালঃ ভূপাল বুক হাউস, তাবি।

খ-বাংলা

(ب) كتب البنغالية

আইনুল বারী, শেখ, কাদিয়ানী কাহিনী, কলিকাতাঃ ১৯৮৬ খৃঃ।

আখতার হোসেন, শেখ, সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, দৌলতপুর, খুলনাঃ ১৯৮৬।

আবদুর রহমান, মুহাম্মাদ, আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী ঢাকাঃ ১৯৮৩।

আবদুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন, ঢাকাঃ ১৯৮৫।

আল-কোরায়শী, আব্দুল্লাহেল কাফী মোহাম্মাদ ০ ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, ঢাকাঃ১৯৬৩। ০ আহলেহাদীস পরিচিতি, ঢাকাঃ ১৯৮৩।

আল-গালিব, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি (মূলঃ আবদুর রহমান আবদুল খালেক), ঢাকাঃ ১৪০৫/১৯৮৫।

আহমদ,আবুল মনসুর, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকাঃ ১৯৬৮।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, গঠনতন্ত্র, প্রকাশকঃ কেন্দ্রীয় কমিটি, দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। প্রকাশকালঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫।

ইবনে আহমাদ সালাফী, আহলেহাদীসের প্রকৃত পরিচয়, কলিকাতাঃ ১ম সংস্করণ, ১৯৮০।

এনামুল হক, ডক্‌টর, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকাঃ আদিল ব্রাদার্স, ১৯৪৮।

এবনে গোলাম সামাদ, ডক্টর, বাংলাদেশে ইসলাম, ই, ফা, বা, ঢাকাঃ ১৯৮৭।

ওসমান গণী, মোহাম্মাদ, আনোয়ারুল মুকাল্লেদীন, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫।

ওয়াসেকপুরী, আবদুর রশীদ, সুধীবৃন্দের তুলিতে মওলানা আকরাম খাঁ, ঢাকাঃ ১৯৭১।

কামাল উদ্দীন, আ. ফ. ম. ডক্টর, মাধ্যমিক ভূগোল ঃ জাতীয় শিক্ষাবোর্ড ঢাকা, ১৯৯৪।

কুরায়শী, গোলাম সামদানী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছ, গঠনতন্ত্র, পাবনা, প্রকাশকালঃ অক্টোবর ১৯৪৮।

নেয়ামাতুল্লাহ, মওলানা, ধোকাভঞ্জন, প্রকাশকঃ বর্ধমান জেলা জমঈয়তে আহলেহাদীস, ১৪০৪/১৯৮৪।

ফছিহুদ্দীন, মুন্‌শী, ছায়ফল মোমেনিন, কলিকাতাঃ ২য় সংস্করণ ১৩৩১ বাংলা।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, পরিচিতি-ক (লিফলেট) রাজশাহী কেন্দ্রীয় কার্যালয় হ'তে।

মতিউর রহমান, মোহাম্মাদ, তরীকায়ে মোহাম্মাদিয়া, সাতক্ষীরাঃ ১৯৮৭।

মাহমুদুল হাসান, সৈয়দ, ডক্‌টর, ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুসলিম ও বৃটিশ শাসন), ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৮৪।

হান্টার, ডব্লিউ, ডব্লিউ, দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স (অনুবাদঃ এম, আনিসুজ্জামান) ঢাকাঃ ১৯৮২।

গ-ইংরেজী

(ج) كتب الإنكلزية

Ahmed, Queamuddin, Dr. THE WAHABI MOVEMENT IN NIDIA (Ph. D. thesis, Patna University) calcutta : 1966.

Ali A. K. M. Yaqub, Dr. ASPECTS OF SOCIETY AND CULTURE OF

THE BARIND 1200-1576 A. D. (Unpublished Ph.D. thesis, Rajshahi University 1982).

Ibrahimi, Sikandar Ali, Dr. MOULANA KARAMAT ALI AND HIS PROJECTS OF REFORMS. (Unpublished Ph.D. thesis, R. U. 1981)

Ishaq, Muhammad Dr. INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE (Ph.D. thesis puslished by Dacca University, 2nd. Ed. 1976.

Khan, Muinuddin Ahmed, Dr. HISTORY OF THE FARAIDI MOVEMENT. (Ph.D. thesis Published by Islamic Foundation Dhaka 1984.

khudabaksh, Salahuddin and Margoliouth, D. S. THE RENAISSANCE OF ISLAM (Trans. from German). Delhi: 1979.

Mallik, Azizur Rahman, Dr. BRITISH POLICY AND THE MUSLIMS IN BENGAL (1757-1856). Ph. D. thesis published by Bangla Academy Dacca, 1977.

Macgregor, John. P. MUSLIM INSTITUTIONS, London: George allien and Unwin Ltd. 1961.

Murray, Titas INDIAN ISLAM, New Delhi 1979.

Pakistan Historical Society, HISTORY OF THE FREDOM MOVEMENT, Karachi 1960.

Schacht, Joseph, ORIGINS OF MUHAMMADAN JURISPRUDENCE London, Oxford University Press 1959.

Smith, wilfred Cantwell, * MODERN ISLAM IN INDIA, London: Victor Gollance Ltd. 1946. * ISLAM IN MODERN HISTORY Princeton University Press, 1957.

Triton, A. S. ISLAM BELIEF AND PRACTICES Hutchinson's University Library, 1951.

Turist Guide — The Government of Nepal.

Watt, Montgomery, W. ISLAMIC PHILOSOPHY AND THEOLOGY. Edinburgh University Press, 1962.

Zwemer S. M. ACROSS THE WORLD OF ISLAM Newyork. Flemming H. Revel Co. N. D.

ঘ-প্রবন্ধ, পত্রিকা ও সাময়িকী

(د) المضامين والأخبارات و المجلات

আখবারে আহলেহাদীছ (উর্দূ সাপ্তাহিক) — অমৃতসরঃ পূর্ব পাঞ্জাব, ভারত, সম্পাদকঃ মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী।

আজাদ (বাংলা দৈনিক) — ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা।

আত-তাও'ইয়াহ (উর্দূ মাসিক) — সম্পাদকঃ আশেক আলী আছারী, ৪, জোগাবাঈ, নয়াদিল্লী -২৫

আরাফাত (বাংলা সাপ্তাহিক) — সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহমান বি.এ.বি-টি, ৮৬ কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা-১।

আল-ই'তিছাম (উর্দূ সাপ্তাহিক) — লাহোর, শীশমহল রোড, সম্পাদক-আলীম নাছেরী।

আল-ফুরক্বান (আরবী মাসিক) — সম্পাদকঃ জাসেম মুহাম্মাদ আল-আউন ছাফাত-কুয়েতঃ ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ১৯৯০।

আহলেহাদিস (বাংলা মাসিক) — ১ নং মারকুইস লেন, কলিকাতা-১৬; সম্পাদকঃ মোহাম্মদ বাবর আলী।

আহলেহাদীস (বাংলা মাসিক) — ১ নং মারকুইস লেন, কলিকাতা-১৬;

সম্পাদকঃ হাফেয শেখ আইনুল বারী।

ইনকিলাব (বাংলা দৈনিক) ২/১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।

ওয়া ইসলামাহ্ (আরবী মাসিক) পেশোয়ার , পাকিস্তানঃপোঃ বক্স ১৭৩।

তর্জুমানুল হাদীছ (অধুনালুপ্ত বাংলা মাসিক) ঢাকাঃ ৮৬, কাজী আলাউদ্দীন রোড।

তর্জুমানুল হাদীছ (উর্দূ মাসিক) লাহোরঃ ৫০, লোয়ার মাল রোড,
সম্পাদকঃ প্রফেসর সাজেদ মীর।

তা'মীরে মিল্লাত (উর্দূ পাক্ষিক) নাদ্‌ওয়াতুল উলামার মুখপত্র, লাক্ষ্ণৌ, ভারত।

তাহরীকে খিলাফত (উর্দূ মাসিক) পেশোয়ার ঃ জামে'আ আছারিয়াহ্, পোঃ বক্স ১৭৩।

তা'লীমুল ইসলাম (উর্দূ মাসিক) মামূঁ কান্‌জন, ফায়ছালাবাদ, পাকিস্তান।

মা'আরিফ (উর্দূ মাসিক) দারুল মুছান্নিফীন, আযমগড়, ইউ, পি, ভারত।

স্মরণিকা, পঞ্চম কেন্দ্রীয় কনফারেন্স '৮৫, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস।

স্মরণিকা, জাতীয় সম্মেলন '৯১, বাংলাদেশ আহ্‌লেহাদীছ যুবসংঘ।

স্মরণিকা, হাজী আবদুল্লাহ্ লাইব্রেরী (১৮৮২-১৯৮২), ২৬-এ নূর আলী লেন,
তাঁতীবাগান, কলিকাতা-১৪।

ISLAMIC CULTURE "Mahisantosh: A Site of historical and archaeological interest in Bangladesh" by A.K.M. Yaqub Ali, Hydrabad, 1984.

THE MOSLEM WORLD "Islam in India to-day" by H. Craemer, (Research Journal) Newyork, 1931. Editor, S.M. Zwemer.

ঙ - অভিধান ও বিশ্বকোষ

(৫) المعجمات والموسوعات

আফরিকী, ইবনু মানযূর জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ, লিসানুল আরব (বৈরূতঃ দারুল ফিক্র তারিখ বিহীন)

আবদুল বাকী, মুহাম্মাদ ফুয়াদ, আল-মু'জামুল মুফাহ্রিস লি-আল্ফাযিল কুরআনিল করীম, বৈরূতঃ দারুল জীল, ১৪০৭/১৯৮৭।

আহমাদ বিন ফারিস, মু'জামু মিক্বইয়াসিল লুগাহ (আরবী), বৈরূতঃ দারুল ফিক্র ১৩৯৯/১৯৭৯।

(রচয়িতার নাম নেই), আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব (আরবী), বৈরূতঃ দারুল ফিক্র তারিখবিহীন।

আল-বুস্তানী, বুতরুস কুৎরুল মুহীত্ব (আরবী), বৈরূতঃ মাকতাবা লুবনান, ১৯৬৯।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকাঃ ১৯৮৬।

লাক্ষৌবী, মুহায্যাব, মুহায্যাবুল লুগাত (উর্দূ), লাক্ষ্ণৌ, তারিখবিহীন।

লুইস মালূফ, ফাদার, ০ আল-মুন্জিদ (আরবী-উর্দূ), করাচীঃ ১৯৬৭। ০ আল-মুন্জিদ (আরবী), বৈরূতঃ দারুল মাশরিক, ১৯৮৬।

দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়াহ (উর্দূ বিশ্বকোষ) লাহোর, ১৩৮৮/১৯৬৮।

Americana Corporation ENCYCLOPAEDIA AMERICANA, Newyork 1949 & 1981.

Gibb, H.A.R. & others ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM Leiden : Brill, 1960 & 1971.

James Hastings, ENCYCLOPAEDIA OF RELIGION AND ETHICS, GREAT BRITAIN. N.D.

المحتويات

شبه القارة الهندية -

و قد سافر الأخ الفاضل بلدان شبه القارة لجمع المعلومات على الحركة و بذل جهوده الجبارة فى هذا الصدد- ولفضيلة الدكتور مؤلفات عديدة فى شتى المواضيع الإسلامية كما له يد طولى فى ترجمة الكتب الدينية من اللغة العربية و الإنجلزية إلى اللغة البنغالية - أدعو الله تعالى أن يحفظه و يرعاه و أن يطيل عمره و يتقبل بحثه و كتابه و يثيب على ما بذل جهوده فى خدمة الدين الحنيف و أن ينفع به الإسلام و المسلمين و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم -

محمد عبد الصمد السلفى

الليسانس من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مبعوث من وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية

بالمملكة العربية السعودية إلى بنغلاديش

مدير المركز الإسلامى السلفى ، نودابارا ، راجشاهى

نائب أمير الأول، جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

مقدمة الكتاب من قبل فضيلة الشيخ/ عبد الصمد السلفي مبعوث من وزارة الأوقاف للمملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين - والصلوة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله عبد المطلب و على آله و أصحابه و من تبعهم بأحسان إلى يوم الدين و بعد :

فإن لعلماء السلف دورا كبيرا فى خدمة الكتاب و السنة الصحيحة و الرد على نزعات الفلسفية التى دخلت على الفكر الإسلامى من أعدائه من الجهمية و القدرية و الصوفية و ما إلى ذلك - لأجل ذلك فقدنشط علماء السلف فى الرد على أهل التعطيل و الذب عن الكتاب و السنة و جرت سلسلة الردود من القرون الأولى إلى عصر شيخ الإسلام إبن تيمية و إلى يومنا هذا- و قد صنف السلف فى ذلك مؤلفات كثيرة تبين فساد آرآء و معتقدات هؤلاء المعطلة الذين أعمتهم أنوار النصوص الشرعية من الكتاب و السنة -

و فى عصرنا هذا ألف كثير من العلماء المحققين تاليفات كثيرة و منهم أخونا الفاضل الشيخ / الدكتور محمد أسد الله الغالب ، الأستاذ المشارك فى القسم اللغة العربية فى الجامعة الحكومية راجشاهى ، بنغلاديش - فهذا الكتاب القيم هو رسالته الدكتوراة على موضوع : حركة أهل الحديث ، نشأتها و تطوراتها، خاصة فى جنوب آسيا - التى قدمها الشيخ على الجامعة و قد نال الدكتوراة عليها فى سنة ١٩٩٢م - و قد ذكر فضيلة الدكتور فى كتابه عقائد السلف أصحاب الحديث و مناهجهم من أوائل الإسلام حتى اليوم خاصة فى جنوب آسيا و حقا أجاد فى ذلك كما تبين تاريخ أهل الحديث و حركاتهم مع ذكر ترجمة بعض علماء الكبار و خدماتهم فى

حركة أهل الحديث : نشأتها و تطوراتها، خاصة فى جنوب آسيا

تاليف : د. محمد أسد الله الغالب

الطبع الأول : راجشاهى ١٤١٦/ ١٩٩٦م

الناشر: حديث فاونديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث للطباعة و النشر)
كاجلا، راجشاهى ، بنغلاديش
فون : راجشاهى ٦٣٧٨ (٠٧٢١)
دكا: فون و فاكس : ٨٣٦٧٧٦

Contents

حركة أهل الحديث

نشأتها و تطوراتها

خاصة فى جنوب آسيا

د. محمد أسد الله الغالب